রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

উপন্যাস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

সম্মুখীন পৃষ্ঠা

নিবেদন

কোনো প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের রচনাবলী প্রকাশ, বিশেষত যাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ কোনোক্রমেই দুর্লভ হয়ে ওঠে নি, সচরাচর সরকারী প্রকাশন উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হয় না। সেই বিবেচনায় বর্তমান রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ সরকারী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ১৯৬১ সালে তদানীন্তন রাজ্য সরকার সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার একটি বিশেষ উপলক্ষ ছিল দেশব্যাপী কবির জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব। কিন্তু এবারের রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের পটভূমিকায় কোনো উৎসবের পরিবেশ নেই, বরং এক বিপরীত প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমান রাজ্য সরকার এই রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আজ দেশব্যাপী যে-সংকীর্ণতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং সুস্থ জীবনের পরিপন্থী ভ্রান্ত মূল্যবোধ আমাদের মানবিক আবেদনকে ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরম অবলম্বন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার এই আয়োজন।

অপর দিকে বিপুল আয়তন রবীন্দ্রসাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন অদ্যাবধি সম্পূর্ণ হয় নি। অথচ যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য সংকলন ও প্রকাশ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান পুরুষ এখনো এই সংকলন কার্যে নিরত রয়েছেন। তাঁদের সহায়তায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই সংস্করণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার রবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজকে যতদূর সাধ্য সম্পূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। রবীন্দ্র-রচনা রক্ষা, সংকলন এবং সুসম্পাদিতভাবে প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্তীকালের উপরেই বিশেষভাবে ন্যস্ত। যতই কালক্ষেপ ঘটবে ততই রবীন্দ্র-রচনার সম্পূর্ণ সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ জটিল ও কঠিন হয়ে পড়বে।

রাজ্য সরকার এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা-সংবলিত বর্তমান রচনাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে তাঁদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনুমানিক ষোলো খণ্ডে এই রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করেছেন।

কেবল এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা সংকলন নয়, অদ্যাবধি প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনায় পাঠের বিভিন্নতা হেতু অচিরে যে-জটিল সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে সে-কারণেও আদর্শ পাঠ-সংবলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করবেন। বর্তমান রচনাবলী এই দিক দিয়ে ভাবীকালের কাজকে বহুলাংশে সুগম করে তুলবে আশা করা যায়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৫০ বৎসর পর, ১৯৯১ সালে কপিরাইট উত্তীর্ণ হবার পূর্বে রবীন্দ্র-রচনার পাঠ ও সম্পাদনাকর্মে যে-যত্ন প্রত্যাশিত সে-বিষয়ে সম্পাদক-মণ্ডলী বিশেষভাবে অবহিত।

রাজ্য সরকার সাধারণ পাঠকের সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কথা চিন্তা করে এবং একই সঙ্গে প্রকাশন সৌষ্ঠব ও সম্পাদনার মান অক্ষুণ্ণ রেখে এই রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন। কাগজ মুদ্রণ ইত্যাদির দুর্মূল্যতা সত্ত্বেও রচনাবলীর দাম সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে রাজ্য সরকার সরকারী তহবিল থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন।

মানবিক মূল্যবোধের কঠিন পরীক্ষার দিনে সংঘবদ্ধ জনশক্তি আজ 'মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে' না মেনে নিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী তাঁদের শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হলে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

অষ্টম খণ্ডের প্রস্তুতিপর্বে সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান ঘটেছে। বর্তমান সংস্করণ রচনাবলীর পরিকল্পনার সূচনা থেকে তাঁর নেতৃত্ব এবং উপদেশ আমাদের বিশেষ ভরসাস্থল ছিল। শোকার্তচিত্তে সে কথা স্মরণ করি।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান প্রকল্প যাঁর আগ্রহে এবং উৎসাহে গৃহীত হয়েছিল, সম্পাদনা এবং প্রকাশনার কাজে যাঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চতর শিক্ষামন্ত্রী শম্ভু ঘোষের প্রয়াণে সেই পৃষ্ঠপোষকতা থেকে সম্পাদকমণ্ডলী বঞ্চিত হবে, সে কথাও শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

বিশ্বভারতী
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
রবীন্দ্রভবন। শান্তিনিকেতন

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ড সম্পাদনকার্যে সম্পাদকমণ্ডলীর সহায়কবর্গের নিষ্ঠা বিশেষভবে উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ-ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও মুদ্রণকার্যে শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেডের কর্মীগণ সহযোগিতা ও বিশেষ শ্রমস্বীকার করেছেন। সম্পাদনা, মুদ্রণ সৌষ্ঠব, বিশেষত চিত্র নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে যাঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে তাঁদের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

ঘরে-বাইরে

প্রকাশ : ১৯১৬

১৩২২ সালে সবুজপত্র-এ প্রকাশের পর ১৯১৬ খৃস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত বহু অংশ বর্জিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯২০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত পরিবর্ধিত সংস্করণে পূর্ববর্তী সংস্করণে বর্জিত অংশের সমস্তই পুনরায় গৃহীত হয়। বর্তমান সংস্করণ সেই সংস্করণের অনুসারী।

শ্রীমান্ প্রমথনাথ চৌধুরী
কল্যাণীয়েষু

মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ— শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্তে সেই-যে উষাসতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?

আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল শ্যামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের। তাঁর রূপ রূপের গর্বকে লজ্জা দিত।

আমি মায়ের মতো দেখতে এই কথা সকলে বলে। তা নিয়ে ছেলেবেলায় একদিন আয়নার উপর রাগ করেছি। মনে হত আমার সর্বাঙ্গে এ যেন একটা অন্যায়— আমার গায়ের রঙ, এ যেন আমার আসল রঙ নয়, এ যেন আর-কারও জিনিস, একেবারে আগাগোড়া ভুল।

সুন্দরী তো নই, কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশ পাই দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম। বিবাহের সম্বন্ধ হবার সময় আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাত দেখে বলেছিল, এ মেয়েটি সুলক্ষণা, এ সতীলক্ষ্মী হবে। মেয়েরা সবাই বললে, তা হবেই তো, বিমলা যে ওর মায়ের মতো দেখতে।

রাজার ঘরে আমার বিয়ে হল। তাঁদের কোন্ কালের বাদশাহের আমলের সম্মান। ছেলেবেলায় রূপকথার রাজপুত্রের কথা শুনেছি, তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল। রাজার ঘরের ছেলে, দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যে-সব কুমারী শিবপূজা করে এসেছে তাদেরই একাগ্র মনের কামনা দিয়ে সেই মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কী চোখ, কী নাক! তরুণ গোঁফের রেখা ভ্রমরের দুটি ডানার মতো, যেমন কালো, তেমনি কোমল।

স্বামীকে দেখলুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন-কি তাঁর রঙ দেখলুম আমারই মতো। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সংকোচ ছিল সেটা কিছু ঘুচল বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল। নিজের জন্যে লজ্জায় নাহয় মরেই যেতুম, তবু মনে মনে যে রাজপুত্রটি ছিল তাকে একবার চোখে চোখে দেখতে পেলুম না কেন?

কিন্তু রূপ যখন চোখের পাহারা এড়িয়ে লুকিয়ে অন্তরে দেখা দেয় সেই বুঝি ভালো। তখন সে যে ভক্তির অমরাবতীতে এসে দাঁড়ায়, সেখানে তাকে কোনো সাজ করে আসতে হয় না। ভক্তির আপন সৌন্দর্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে কেওড়া-জলের-ছিটে-দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখতেন, তিনি খেতে বসলে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর সেই হৃদয়ের সুধারসের ধারা কোন্ অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম।

সেই ভক্তির সুরটি কি আমার মনের মধ্যে ছিল না? ছিল। তর্ক না, ভালোমন্দের তত্ত্বনির্ণয় না, সে কেবলমাত্র একটি সুর! সমস্ত জীবনকে যদি জীবনবিধাতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি স্তবগান করে বাজিয়ে যাবার কোনো সার্থকতা থাকে, তবে সেই প্রভাতের সুরটি আপনার কাজ আরম্ভ করেছিল।

মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদুরটি যেন শুকতারার মতো জ্বলে উঠল। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে

উঠে বললেন, ও কি বিমল, করছ কী! আমার সে লজ্জা ভুলতে পারব না। তিনি হয়তো ভাবলেন, আমি লুকিয়ে পুণ্য অর্জন করছি। কিন্তু নয়, নয়, সে আমার পুণ্য নয়— সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পুজা করতে চায়।

আমার শ্বশুর-পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা। তার কতক কায়দা-কানুন মোগল-পাঠানের, কতক বিধিবিধান মনুপরাশরের। কিন্তু আমার স্বামী একেবারে একেলে। এ বংশে তিনিই প্রথম রীতিমত লেখাপড়া শেখেন আর এম. এ. পাস করেন। তাঁর বড়ো দুই ভাই মদ খেয়ে অল্প বয়সে মারা গেছেন; তাঁদের ছেলেপুলে নেই। আমার স্বামী মদ খান না, তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই; এ বংশে এটা এত খাপছাড়া যে সকলে এতটা পছন্দ করে না, মনে করে যাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই অত্যন্ত নির্মল হওয়া তাদেরই সাজে। কলঙ্কের প্রশস্ত জায়গা তারার মধ্যে নেই, চাঁদের মধ্যেই আছে।

বহুকাল হল আমার শ্বশুর-শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে। আমার দিদিশাশুড়িই ঘরের কর্ত্রী। আমার স্বামী তাঁর বক্ষের হার, তাঁর চক্ষের মণি। এইজন্যেই আমার স্বামী কায়দার গণ্ডি ডিঙিয়ে চলতে সাহস করতেন। এইজন্যেই তিনি যখন মিস গিল্‌বিকে আমার সঙ্গিনী আর শিক্ষক নিযুক্ত করলেন তখন ঘরে বাইরে যত রসনা ছিল তার সমস্ত রস বিষ হয়ে উঠল, তবু আমার স্বামীর জেদ বজায় রইল।

সেই সময়েই তিনি বি. এ. পাস করে এম. এ. পড়ছিলেন। কলেজে পড়বার জন্যে তাঁকে কলকাতায় থাকতে হত। তিনি প্রায় রোজই আমাকে একটি করে চিঠি লিখতেন, তার কথা অল্প, তার ভাষা সাদা, তাঁর হাতের সেই গোটা গোটা গোল গোল অক্ষরগুলি যেন স্নিগ্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত।

একটি চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তাঁর চিঠিগুলি রাখতুম আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম। তখন আমার সেই রূপকথার রাজপুত্র অরুণালোকে চাঁদের মতো মিলিয়ে গেছে। সেদিন আমার সত্যকার রাজপুত্র বসেছে আমার হৃদয়-সিংহাসনে। আমি তাঁর রানী, তাঁর পাশে আমি বসতে পেরেছি; কিন্তু তার চেয়ে আনন্দ, তাঁর পায়ের কাছে আমার যথার্থ স্থান।

আমি লেখাপড়া করেছি, সুতরাং এখনকার কালের সঙ্গে আমার এখনকার ভাষাতেই পরিচয় হয়ে গেছে। আমার আজকের এই কথাগুলো আমার নিজের কাছেই কবিত্বের মতো শোনাচ্ছে। এ কালের সঙ্গে যদি আমার মোকাবিলা না হত তা হলে আমার সেদিনকার সেই ভাবটাকে সোজা গদ্য বলেই জানতুম— মনে জানতুম মেয়ে হয়ে জন্মেছি এ যেমন আমার ঘর-গড়া কথা নয় তেমনি মেয়েমানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও তেমনি সহজ কথা, এর মধ্যে বিশেষ কোনো-একটা অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য আছে কিনা সেটা এক মুহূর্তের জন্যে ভাববার দরকার নেই।

কিন্তু সেই কিশোর বয়স থেকে আজ এই যৌবনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পেঁছিতে-না-পেঁছিতে আর-এক যুগে এসে পড়েছি। যেটা নিশ্বাসের মতো সহজ ছিল এখন সেটাকে কাব্যকলার মতো করে গড়ে তোলবার উপদেশ আসছে। এখনকার ভাবুক পুরুষেরা সধবার পাতিব্রত্যে এবং বিধবার ব্রহ্মচর্যে যে কী অপূর্ব কবিত্ব আছে, সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বলছেন। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে জীবনের এই জায়গায় কেমন করে সত্যে আর সুন্দরে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন কি কেবলমাত্র সুন্দরের দোহাই দিলে আর সত্যকে ফিরে পাওয়া যাবে?

মেয়েমানুষের মন সবই যে এক-ছাঁচে-ঢালা তা আমি মনে করি নে। কিন্তু এটুকু জানি, আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিসটি ছিল, সেই ভক্তি করবার ব্যগ্রতা। সে যে আমার সহজ ভাব তা আজকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি, যখন সেটা বাইরের দিক থেকে আর সহজ নেই।

এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পুজার অবকাশ দিতে চাইতেন না। সেই

ছিল তাঁর মহত্ত্ব। তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে, কেননা সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে থাকে। তাতে পূজারী ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ।

কিন্তু, এত সেবা আমার জন্যে কেন। সাজসজ্জা দাসদাসী জিনিসপত্রের মধ্য দিয়ে যেন আমার দুই কূল ছাপিয়ে তাঁর আদরের বান ডেকে বইল। এই-সমস্তকে ঠেলে আমি নিজেকে দান করব কোন্ ফাঁকে! আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল। প্রেম যে স্বভাববৈরাগী; সে যে পথের ধারে ধুলার 'পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়, সে তো বৈঠকখানার চিনের টবে আপনার ঐশ্বর্য মেলতে পারে না।

আমাদের অন্তঃপুরে যে-সমস্ত সাবেক দস্তুর চলিত ছিল আমার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ ঠেলতে পারতেন না। দিনে-দুপুরে যখন-তখন অবাধে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারত না। আমি জানতুম ঠিক কখন তিনি আসবেন; তাই যেমন-তেমন এলোমেলো হয়ে আমাদের মিলন ঘটতে পারত না। আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল; সে আসত ছন্দের ভিতর দিয়ে, যতির ভিতর দিয়ে। দিনের কাজ সেরে গা ধুয়ে, যত্ন করে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, কোঁচানো শাড়িটি প'রে, ছড়িয়ে-পড়া দেহমনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার থালায় নিবেদন করে দিতুম। সেই সময়টুকু অল্প, কিন্তু অল্পের মধ্যে সে অসীম।

আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ। এ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কোনোদিন তর্ক করি নি। কিন্তু আমার মন বলে, ভক্তিতে মানুষকে সমান হবার বাধা দেয় না। ভক্তিতে মানুষকে উপরের দিকে তুলে সমান করতে চায়। তাই সমান হতে থাকবার আনন্দ তাতে বরাবর পাওয়া যায়, কোনোদিন তা চুকে গিয়ে হেলার জিনিস হয়ে ওঠে না। প্রেমের থালায় ভক্তির পূজা আরতির আলোর মতো—পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুয়ের উপরেই সে আলো সমান হয়ে পড়ে। আমি আজ নিশ্চয় জেনেছি, স্ত্রীলোকের ভালোবাসা পূজা করেই পূজিত হয়—নইলে সে ধিক্ ধিক্। আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে—প্রদীপের পোড়া তেলই নীচের দিকে পড়তে পারে।

প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাও নি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাই নি তা দিয়ে ভালোবেসেছ। আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়ে নি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায় তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস পড়েছে তা দেখেছি, আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমনি করে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য! এতে আমার মনে গর্ব আসে, আমার মনে হয় এ আমারই ঐশ্বর্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। তখন রানীর সিংহাসনে বসে মানের দাবি করি; সে দাবি কেবল বাড়তেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সেই গর্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা। শংকর তো ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না করতেন?

আজ মনে পড়ছে সেদিন আমার সৌভাগ্যে সংসারে কত লোকের মনে কত ঈর্ষার আগুন ধিকিধিকি জ্বলেছিল। ঈর্ষা হবারই তো কথা—আমি যে অমনি পেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি। কিন্তু ফাঁকি তো বরাবর চলে না। দাম দিতেই হবে। নইলে বিধাতা সহ্য করেন না—দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন সৌভাগ্যের ঋণ শোধ করতে হয়, তবেই স্বত্ব ধ্রুব হয়ে ওঠে। ভগবান আমাদের দিতেই

পারেন, কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে। পাওয়া জিনিসও আমরা পাই নে এমনি আমাদের পোড়া কপাল।

আমার সৌভাগ্যে কত কন্যার পিতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল। আমার কি তেমনি রূপ, তেমনি গুণ, আমি কি এই ঘরের যোগ্য, এমন কথা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে উঠেছে। আমার দিদিশাশুড়ি শাশুড়ি সকলেরই অসামান্য রূপের খ্যাতি ছিল। আমার দুই বিধবা জায়ের মতো এমন সুন্দরী দেখা যায় না। পরে পরে যখন তাঁদের দুজনেরই কপাল ভাঙল তখন আমার দিদিশাশুড়ি পণ করে বসলেন যে তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট নাতির জন্যে তিনি আর রূপসীর খোঁজ করবেন না। আমি কেবলমাত্র সুলক্ষণের জোরে এই ঘরে প্রবেশ করতে পারলুম, নইলে আমার আর-কোনো অধিকার ছিল না।

আমাদের ঘরে এই ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেটাই নাকি এখানকার নিয়ম, তাই মদের ফেনা আর নটীর নূপুরনিক্কণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড়ো ঘরের ঘরণীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন। অথচ আমার স্বামী মদও ছুঁলেন না, আর নারীমাংসের লোভে পাপের পণ্যশালার দ্বারে দ্বারে মনুষ্যত্বের থলি উজাড় করে ফিরলেন না, এ কি আমার গুণে? পুরুষের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত মনকে বশ করবার মতো কোন্ মন্ত্র বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন? কেবলমাত্রই কপাল, আর-কিছুই না! আর তাঁদের বেলাতেই কি পোড়া বিধাতার হুঁশ ছিল না, সকল অক্ষরই বাঁকা হয়ে উঠল! সন্ধ্যা হতে না হতেই তাঁদের ভোগের উৎসব মিটে গেল, কেবল রূপযৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধরে মিছে জ্বলতে লাগল! কোথাও সংগীত নেই, কেবলমাত্রই জ্বলা!

আমার স্বামীর পৌরুষকে তাঁর দুই ভাজ অবজ্ঞা করবার ভান করতেন। এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো! কথায় কথায় তাঁদের কত খোঁটাই খেয়েছি। আমি যেন আমার স্বামীর সোহাগ কেবল চুরি করে করে নিচ্ছি। কেবল ছলনা, তার সমস্তই কৃত্রিম—এখনকার কালের বিবিয়ানার নির্লজ্জতা! আমার স্বামী আমাকে হাল-ফ্যাশানের সাজে-সজ্জায় সাজিয়েছেন—সেই-সমস্ত রঙ-বেরঙের জ্যাকেট-শাড়ি-শেমিজ-পেটিকোটের আয়োজন দেখে তাঁরা জ্বলতে থাকতেন। রূপ নেই, রূপের ঠাট! দেহটাকে যে একেবারে দোকান করে সাজিয়ে তুললে গো, লজ্জা করে না!

আমার স্বামী সমস্তই জানতেন। কিন্তু মেয়েদের উপর যে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরা। তিনি আমাকে বারবার বলতেন, রাগ কোরো না। মনে আছে আমি একবার তাঁকে বলেছিলুম, মেয়েদের মন বড়োই ছোটো, বড়ো বাঁকা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চীনদেশের মেয়েদের পা যেমন ছোটো, যেমন বাঁকা। সমস্ত সমাজ যে চারি দিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোটো করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেলছে—দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে?

আমার জা'রা তাঁদের দেওরের কাছে যা দাবি করতেন তাই পেতেন। তাঁদের দাবি ন্যায্য কি অন্যায্য তিনি তার বিচারমাত্র করতেন না। আমার মনের ভিতরটা জ্বলতে থাকত যখন দেখতুম তাঁরা এর জন্যে একটুও কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এমন-কি, আমার বড়ো জা, যিনি জপে তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ংকর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য যাঁর মুখে এত বেশি খরচ হত যে মনের জন্যে সিকি পয়সার বাকি থাকত না, তিনি বারবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন যে তাঁকে তাঁর উকিল দাদা বলেছেন, যদি আদালতে তিনি নালিশ করেন তা হলে তিনি—সে কত কী, সে আর ছাই কী লিখব! আমার স্বামীকে কথা দিয়েছি যে, কোনোদিন কোনো কারণেই আমি এঁদের কথার জবাব করব না, তাই জ্বালা আরো আমার অসহ্য হত। আমার মনে হত, ভালো হবার একটা সীমা আছে, সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়। আমার স্বামী বলতেন, আইন কিংবা

সমাজ তাঁর ভাজেদের স্বপক্ষ নয়, কিন্তু একদিন স্বামীর অধিকারে যেটাকে নিজের বলেই তাঁরা নিশ্চিত জেনেছিলেন আজ সেটাকেই ভিক্ষুকের মতো পরের মন জুগিয়ে চেয়ে-চিন্তে নিতে হচ্ছে এ অপমান যে বড়ো কঠিন। এর উপরেও আবার কৃতজ্ঞতা দাবি করা! মার খেয়ে আবার বখশিশ দিতে হবে!—সত্য কথা বলব? অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি, আর-একটু মন্দ হবার মতো তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।

আমার মেজো জা অন্য ধরনের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প, তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করতেন না। বরঞ্চ তাঁর কথাবার্তা-হাসিঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল। যে-সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের রকম-সকম একেবারেই ভালো নয়। তা নিয়ে কেউ আপত্তি করবার লোক ছিল না, কেননা এ বাড়ির ঐ রকমই দস্তুর। আমি বুঝতুম আমার স্বামী যে অকলঙ্ক আমার এই বিশেষ সৌভাগ্য তাঁর কাছে অসহ্য। তাই তাঁর দেওরের যাতায়াতের পথে ঘাটে নানারকম ফাঁদ পেতে রাখতেন। এই কথাটা কবুল করতে আমার সব চেয়ে লজ্জা হয় যে, আমার অমন স্বামীর জন্যেও মাঝে মাঝে আমার মনে ভয়-ভাবনা ঢুকত। এখানকার হাওয়াটাই যে ঘোলা, তার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ জিনিসকেও স্বচ্ছ বোধ হয় না। আমার মেজো জা মাঝে মাঝে এক-এক দিন নিজে রেঁধে-বেড়ে দেওরকে আদর করে খেতে ডাকতেন। আমার ভারি ইচ্ছে হত, তিনি যেন কোনো ছুতো ক'রে বলেন, না, আমি যেতে পারব না।—যা মন্দ তার তো একটা শাস্তি পাওনা আছে? কিন্তু, ফি বারেই যখন তিনি হাসিমুখে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতেন আমার মনের মধ্যে একটু কেমন—সে আমার অপরাধ—কিন্তু কী করব, আমার মন মানত না—মনে হত এর মধ্যে পুরুষমানুষের একটু চঞ্চলতা আছে। সে সময়টাতে আমার অন্য সহস্র কাজ থাকলেও কোনো একটা ছুতো করে আমার মেজো জায়ের ঘরে গিয়ে বসতুম। মেজো জা হেসে হেসে বলতেন, বাস্ রে, ছোটোরানীর একদণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই—একেবারে কড়া পাহারা! বলি, আমাদেরও তো এক দিন ছিল, কিন্তু এত করে আগলে রাখতে শিখি নি।

আমার স্বামী এঁদের দুঃখটাই দেখতেন, দোষ দেখতে পেতেন না। আমি বলতুম, আচ্ছা, নাহয় যত দোষ সবই সমাজের, কিন্তু অত বেশি দয়া করবার দরকার কী? মানুষ নাহয় কিছু কষ্টই পেলে, তাই বলেই কি—কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারবার জো নেই। তিনি তর্ক না করে একটুখানি হাসতেন। বোধ হয় আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি কাঁটা ছিল সেটুকু তাঁর অজানা ছিল না। আমার রাগের সত্যিকার ঝাঁঝটুকু সমাজের উপরেও না, আর-কারো উপরেও না, সে কেবল—সে আর বলব না।

স্বামী একদিন আমাকে বোঝালেন—তোমার এই যে-সমস্তকে ওরা মন্দ বলছে যদি সত্যিই এগুলিকে মন্দ জানত তা হলে এতে ওদের এত রাগ হত না।

তা হলে এমন অন্যায় রাগ কিসের জন্যে?

অন্যায় বলব কেমন করে? ঈর্ষা জিনিসটার মধ্যে একটি সত্য আছে, সে হচ্ছে এই যে, যা-কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল।

তা, বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করলেই হয়, আমার সঙ্গে কেন।

বিধাতাকে যে হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

তা, ওঁরা যা পেতে চান তা নিলেই হয়। তুমি তো বঞ্চিত করতে চাও না। পরুন-না শাড়ি-জ্যাকেট গয়না জুতো-মোজা, মেমের কাছে পড়তে চান তো সে তো ঘরেই আছে, আর বিয়েই যদি করতে চান তুমি তো বিদ্যেসাগরের মতো অমন সাতটা সাগর পেরোতে পার তোমার এমন সম্বল আছে।

ঐ তো মুশকিল—মন যা চায় তা হাতে তুলে দিলেও নেবার জো নেই।

তাই বুঝি কেবল ন্যাকামি করতে হয়, যেন যেটা পাই নি সেটা মন্দ, অথচ অন্য কেউ পেলে সর্বশরীর জ্বলতে থাকে।

যে মানুষ বঞ্চিত এমনি করেই সে আপনার বঞ্চনার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে চায়—ঐ তার সান্ত্বনা।

যাই বল তুমি, মেয়েরা বড়ো ন্যাকা। ওরা সত্যি কথাকে কবুল করতে চায় না, ছল করে।

তার মানে ওরা সব চেয়ে বঞ্চিত।

এমনি করে উনি যখন বাড়ির মেয়েদের সব রকম ক্ষুদ্রতাই উড়িয়ে দিতেন আমার রাগ হত। সমাজ কী হলে কী হতে পারত সে-সব কথা কয়ে তো কোনো লাভ নেই, কিন্তু পথে ঘাটে চারি দিকে এই-যে কাঁটা গজিয়ে রইল, এই-যে বাঁকা কথার টিটকারি, এই-যে পেটে এক মুখে এক, একে দয়া করতে পারা যায় না।

সে কথা শুনে তিনি বললেন, যেখানে তোমার নিজের একটু কোথাও বাজে সেইখানেই বুঝি তোমার যত দয়া, আর যেখানে ওদের জীবনের এপিঠ-ওপিঠ ফুঁড়ে সমাজের শেল বিঁধেছে সেখানে দয়া করবার কিছু নেই? যারা পেটেও খাবে না তারাই পিঠেও সইবে?

হবে, হবে, আমারই মন ছোটো। আর-সকলেই ভালো, কেবল আমি ছাড়া। রাগ করে বললুম, তোমাকে তো ভিতরে থাকতে হয় না, সব কথা জান না—এই বলে আমি তাঁকে ও মহলের একটা বিশেষ খবর দেবার চেষ্টা করতেই তিনি উঠে পড়লেন; বললেন, চন্দ্রনাথবাবু অনেকক্ষণ বাইরে বসে আছেন।

আমি বসে বসে কাঁদতে লাগলুম। স্বামীর কাছে এমন ছোটো প্রমাণ হয়ে গেলে বাঁচি কী করে? আমার ভাগ্য যদি বঞ্চিত হত তা হলেও আমি যে কখনো ওদের মতো এমনতরো হতুম না সে তো প্রমাণ করবার জো নেই।

দেখো, আমার এক-একবার মনে হয় রূপের অভিমানের সুযোগ বিধাতা যদি মেয়েদের দেন, তবে অন্য অনেক অভিমানের দুর্গতি থেকে তারা রক্ষা পায়। হীরে-জহরতের অভিমান করাও চলত, কিন্তু রাজার ঘরে তার কোনো অর্থই নেই। তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের। সেখানে আমার স্বামীকেও হার মানতে হবে এটা আমার মনে ছিল। কিন্তু যখনই সংসারের কোনো খিটিমিটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে গেছি তখনই বারবার এমন ছোটো হয়ে গেছি যে, সে আমাকে মেরেছে। তাই তখন আমি তাঁকেই উল্টে ছোটো করতে চেয়েছি। মনে মনে বলেছি, তোমার এ সব কথাকে ভালো বলে মানব না, এ কেবলমাত্র ভালোমানুষি। এ তো নিজেকে দেওয়া নয়, এ অন্যের কাছে ঠকা।

আমার স্বামীর বড়ো ইচ্ছা ছিল আমাকে বাইরে বের করবেন। একদিন আমি তাঁকে বললুম, বাইরেতে আমার দরকার কী?

তিনি বললেন, তোমাকে বাইরের দরকার থাকতে পারে।

আমি বললুম, এতদিন যদি তার চলে গিয়ে থাকে আজও চলবে, সে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে না।

মরে তো মরুক-না, সেজন্য আমি ভাবছি নে—আমি আমার জন্যে ভাবছি।

সত্যি নাকি, তোমার আবার ভাবনা কিসের?

আমার স্বামী হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। আমি তাঁর ধরন জানি, তাই বললুম, না, অমন চুপ করে ফাঁকি দিয়ে গেলে চলবে না, এ কথাটা তোমার শেষ করে যেতে হবে।

তিনি বললেন, কথা কি মুখের কথাতেই শেষ হয়? সমস্ত জীবনে কত কথা শেষ হয় না।

না, তুমি হেঁয়ালি রাখো, বলো।

আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনা-পাওনা বাকি আছে।

কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কমতি হল কোথায়?

এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।

খুব জানি গো খুব জানি।

মনে করছ জানি, কিন্তু জান কি না তাও জান না।

দেখো, তোমার এই কথাগুলো সইতে পারি নে।

সেইজন্যেই তো বলতে চাই নি।

তোমার চুপ করে থাকা আরো সইতে পারি নে।

তাই তো আমার ইচ্ছে, আমি কথাও কইব না, চুপও করব না, তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হও নি, আমিও হই নি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।

পরিচয় তোমার হয়তো বাকি থাকতে পারে, কিন্তু আমার কিছুই বাকি নেই।

বেশ তো, আমারই যদি বাকি থাকে সেটুকু পূরণ করেই দাও-না কেন।

এ কথা নানা রকম আকারে বারবার উঠেছে। তিনি বলতেন, যে পেটুক মাছের ঝোল ভালোবাসে সে মাছকে কেটেকুটে সাঁতলে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতোটি করে নেয়, কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালোবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভর্তি করতে চায় না—সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে তো ভালো, না পারে তো ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে—তার পরে যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাই নি, কিন্তু নিজের শখের বা সুবিধার জন্যে তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করি নি। আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।

এ-সব কথা আমার একেবারেই ভালো লাগত না, কিন্তু সেইজন্যেই যে তখন বের হই নি তা নয়। আমার দিদিশাশুড়ি তখন বেঁচে ছিলেন। তাঁর অমতে আমার স্বামী বিংশ শতাব্দীর প্রায় বিশ আনা দিয়েই ঘর ভর্তি করে তুলেছিলেন, তিনিও সয়েছিলেন; রাজবাড়ির বউ যদি পর্দা ঘুচিয়ে বাইরে বেরোত তা হলেও তিনি সইতেন, তিনি নিশ্চয় জানতেন এটাও একদিন ঘটবে, কিন্তু আমি ভাবতুম এটা এতই কি জরুরি যে তাঁকে কষ্ট দিতে যাব। বইয়ে পড়েছি আমরা খাঁচার পাখি, কিন্তু অন্যের কথা জানি নে, এই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেছে যে বিশ্বেও তা ধরে না। অন্তত তখন তো সেইরকমই ভাবতুম।

আমার দিদিশাশুড়ি যে আমাকে এত ভালোবাসতেন তার গোড়ার কারণটা এই যে, তাঁর বিশ্বাস আমি আমার স্বামীর ভালোবাসা টানতে পেরেছিলুম সেটা যেন কেবল আমারই গুণ, কিংবা আমার গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্ত। কেননা, পুরুষমানুষের ধর্মই হচ্ছে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া। তাঁর অন্য কোনো নাতিকে তাঁর নাতবউরা সমস্ত রূপযৌবন নিয়েও ঘরের দিকে টানতে পারে নি, তাঁরা পাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন, কেউ তাঁদের বাঁচাতে পারলে না। তাঁদের ঘরে পুরুষমানুষের এই মরণের আগুন আমিই নেবালুম এই ছিল তাঁর ধারণা। সেইজন্যেই তিনি আমাকে যেন বুকে করে রেখেছিলেন; আমার একটু অসুখবিসুখ হলে তিনি ভয়ে কাঁপতেন। আমার স্বামী সাহেবের দোকান থেকে যে-সমস্ত সাজসজ্জা এনে সাজাতেন সে তাঁর পছন্দসই ছিল না। কিন্তু তিনি ভাবতেন পুরুষমানুষের এমন কতকগুলো শখ থাকবেই যা নিতান্ত বাজে, যাতে কেবলই লোকসান। তাকে ঠেকাতে গেলেও চলবে না, অথচ সে যদি সর্বনাশ পর্যন্ত না পৌঁছয় তবেই রক্ষে। আমার নিখিলেশ বউকে যদি না সাজাত আর-কাউকে সাজাতে যেত। এইজন্যে ফি বারে যখন আমার জন্যে কোনো নতুন কাপড় আসত তিনি তাই নিয়ে আমার স্বামীকে ডেকে কত ঠাট্টা কত আমোদ করতেন। হতে হতে শেষকালে তাঁরও পছন্দর রঙ ফিরেছিল। কলিযুগের

কল্যাণে অবশেষে তাঁর এমন দশা হয়েছিল যে নাতবউ তাঁকে ইংরিজি বই থেকে গল্প না বললে তাঁর সন্ধ্যা কাটত না।

দিদিশাশুড়ির মৃত্যুর পর আমার স্বামীর ইচ্ছা হল আমরা কলকাতায় গিয়ে থাকি। কিন্তু কিছুতেই আমার মন উঠল না। এ যে আমার শ্বশুরের ঘর, দিদিশাশুড়ি কত দুঃখ কত বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে কত যত্নে একে এতকাল আগলে এসেছেন, আমি সমস্ত দায় একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কলকাতায় চলে যাই তবে যে আমাকে অভিশাপ লাগবে—এই কথাই বারবার আমার মনে হতে লাগল। দিদিশাশুড়ির শূন্য আসন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সাধ্বী আট বছর বয়সে এই ঘরে এসেছেন, আর উনআশি বছরে মারা গেছেন। তাঁর সুখের জীবন ছিল না। ভাগ্য তাঁর বুকে একটার পর একটা কত বাণই হেনেছে, কিন্তু প্রত্যেক আঘাতেই তাঁর জীবন থেকে অমৃত উছলে উঠেছে। এই বৃহৎ সংসার সেই চোখের জলে গলানো পুণ্যের ধারায় পবিত্র। এ ছেড়ে আমি কলকাতার জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে কী করব!

আমার স্বামী মনে করেছিলেন, এই সুযোগে আমার দুই জায়ের উপর এখানকার সংসারের কর্তৃত্ব দিয়ে গেলে তাতে তাঁদের মনেও সান্ত্বনা হত, আর আমাদেরও জীবনটা কলকাতায় একটু ডালপালা মেলবার জায়গা পেত।

আমার ঐখানেই গোল বেধেছিল। ওঁরা যে এতদিন আমাকে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছেন, আমার স্বামীর ভালো ওঁরা কখনো দেখতে পারেন নি—আজ কি তারই পুরস্কার পাবেন?

আর, রাজসংসার তো এইখানেই। আমাদের সমস্ত প্রজা-আমলা, আশ্রিত-অভ্যাগত-আত্মীয়, সমস্তই এখানকার এই বাড়িকে চারি দিকে আঁকড়ে। কলকাতায় আমরা কে তা জানি নে, অন্য কজন লোকই বা জানে! আমাদের মান-সম্মান-ঐশ্বর্যের পূর্ণ মূর্তিই এখানে। এ-সমস্তই ওঁদের হাতে দিয়ে সীতা যেমন নির্বাসনে গিয়েছিলেন তেমনি ক'রে চলে যাব! আর, ওঁরা পিছন থেকে হাসবেন! ওঁরা কি আমার স্বামীর এ দাক্ষিণ্যের মর্যাদা বোঝেন, না তার যোগ্য ওঁরা?

তার পরে যখন কোনোদিন এখানে ফিরে আসতে হবে তখন আমার আসনটি কি আর ফিরে পাব? আমার স্বামী বলতেন, দরকার কী তোমার ঐ আসনের? ও ছাড়াও তো জীবনের আরো অনেক জিনিস আছে, তার দাম অনেক বেশি।

আমি মনে মনে বললুম, পুরুষমানুষ এ-সব কথা ঠিক বোঝে না। সংসারটা যে কতখানি তা ওদের সম্পূর্ণ জানা নেই, সংসারের বাহির-মহলে যে ওদের বাসা। এ জায়গায় মেয়েদের বুদ্ধিমতেই ওদের চলা উচিত।

সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে, একটা তেজ থাকা চাই তো। যাঁরা চিরদিন এমন শত্রুতা করে এসেছেন তাঁদের হাতে সমস্ত দিয়ে-থুয়ে চলে যাওয়া যে পরাভব। আমার স্বামী যদি বা তা মানতে চান আমি তো মানতে দিতে পারব না। আমি মনে মনে জানলুম, এ আমার সতীত্বের তেজ।

আমার স্বামী আমাকে জোর করে কেন নিয়ে গেলেন না? আমি জানি কেন। তাঁর জোর আছে বলেই জোর করেন নি। তিনি আমাকে বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চলবে তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না। আমি অপেক্ষা করে থাকব আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে তো ভালো, যদি না মেলে তো উপায় কী!

কিন্তু তেজ বলে একটা জিনিস আছে—সেদিন আমার মনে হয়েছিল ঐ জায়গায় আমি যেন আমার—না, এ কথা আর মুখে আনাও চলবে না।

রাত্রের সঙ্গে দিনের যে তফাত সেটাকে যদি ঠিক হিসাবমত ক্রমে ক্রমে ঘোচাতে হত তা হলে সে কি কোনো যুগে ঘুচত? কিন্তু সূর্য উঠে পড়ে, অন্ধকার চুকে যায়, অসীম কালের হিসাব মুহূর্তকালে মেটে।

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশীর যুগ এসেছিল, কিন্তু সে যে কেমন করে তা স্পষ্ট বোঝা যায়

না। তার আগেকার সঙ্গে এ যুগের মাঝখানকার ক্রম যেন নেই। বোধ করি সেইজন্যেই নূতন যুগ একেবারে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো আমাদের ভয়-ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কী হল, কী হবে, তা বোঝবার সময় পাই নি।

পাড়ায় বর আসছে, তার বাঁশি বাজছে, তার আলো দেখা দিয়েছে, অমনি মেয়েরা যেমন ছাতে বারান্দায় জানলায় বেরিয়ে পড়ে, তাদের আবরণের দিকে আর মন থাকে না, তেমনি সেদিন সমস্ত দেশের বর আসবার বাঁশি যেমনি শোনা গেল মেয়েরা কি আর ঘরের কাজ নিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারে? হুলু দিতে দিতে, শাঁক বাজাতে বাজাতে, তারা যেখানে দরজা জানলা দেয়ালের ফাঁক পেলে সেইখানেই মুখ বাড়িয়ে দিলে।

সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবিরে লাল হয়ে উঠেছিল। এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্মকর্ম আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা যে সীমাটুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগে ছিল সেদিনও তার বেড়া ভাঙে নি বটে, কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল।

আমার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন তখন থেকেই তিনি দেশের প্রয়োজনের জিনিস দেশেই উৎপন্ন করবেন বলে নানারকম চেষ্টা করছিলেন। আমাদের জেলায় খেজুর গাছ অজস্র—কী করে অনেক গাছ থেকে একটি নলের সাহায্যে একসঙ্গে এক জায়গায় রস আদায় করে সেইখানেই জ্বাল দিয়ে সহজে চিনি করা যেতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি অনেক দিন কাটালেন। শুনেছি উপায় খুব সুন্দর উদ্ভাবন হয়েছিল, কিন্তু তাতে রসের তুলনায় টাকা এত বেশি গলে পড়তে লাগল যে কারবার টিঁকল না। চাষের কাজে নানারকম পরীক্ষা করে তিনি যে-সব ফসল ফলিয়েছিলেন সে অতি আশ্চর্য, কিন্তু তাতে যে টাকা খরচ করেছিলেন সে আরো বেশি আশ্চর্য। তাঁর মনে হল আমাদের দেশে বড়ো বড়ো কারবার যে সম্ভবপর হয় না তার প্রধান কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক নেই। সেই সময় তিনি আমাকে পোলিটিক্যাল ইকনমি পড়াতে লাগলেন। তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে হল সব-প্রথমে দরকার ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় করবার অভ্যাস ও ইচ্ছা আমাদের জন-সাধারণের মনে সঞ্চার ক'রে দেওয়া। একটা ছোটো গোছের ব্যাঙ্ক খুললেন। ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার উৎসাহ গ্রামের লোকের খুব জেগে উঠল, কারণ সুদের হার খুব চড়া ছিল। কিন্তু যে কারণে লোকের উৎসাহ বাড়তে লাগল সেই কারণেই ঐ মোটা সুদের ছিদ্র দিয়ে ব্যাঙ্ক গেল তলিয়ে। এই-সকল কাণ্ড দেখে তাঁর পুরাতন আমলারা অত্যন্ত বিরক্ত ও উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠত, শত্রুপক্ষ ঠাট্টাবিদ্রূপ করত। আমার বড়ো জা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, তাঁর বিখ্যাত উকিল খুড়তুত ভাই তাঁকে বলেছেন যদি জজের কাছে দরবার করা যায় তবে এই পাগলের হাত থেকে এই বনেদি বংশের মানসম্ভ্রম বিষয়সম্পত্তি এখনো রক্ষা হবার উপায় হতে পারে।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল আমার দিদিশাশুড়ির মনে বিকার ছিল না। তিনি আমাকে ডেকে কতবার ভর্ৎসনা করেছেন; বলেছেন, কেন তোরা ওকে সবাই মিলে বিরক্ত করছিস? বিষয়-সম্পত্তির কথা ভাবছিস? আমার বয়সে আমি তিনবার এ সম্পত্তি রিসিভরের হাতে যেতে দেখেছি। পুরুষেরা কি মেয়েমানুষের মতো? ওরা যে উড়নচণ্ডী, ওরা ওড়াতেই জানে। নাতবউ, তোর কপাল ভালো যে সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও উড়ছে না। দুঃখ পাস নি বলেই সে কথা মনে থাকে না।

আমার স্বামীর দানের লিস্ট ছিল খুব লম্বা। তাঁতের কল কিংবা ধান ভানার যন্ত্র কিংবা ঐ রকম একটা-কিছু যে-কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেছে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্যন্ত তিনি সাহায্য করেছেন। বিলাতি কোম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরীযাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশী কোম্পানি উঠল; তার একখানা জাহাজও ভাসে নি, কিন্তু আমার স্বামীর অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ ডুবেছে।

সব চেয়ে আমার বিরক্ত লাগত সন্দীপবাবু যখন দেশের নানা উপকারের ছুতোয় তাঁর টাকা

শুষে নিতেন। তিনি খবরের কাগজ চালাবেন, স্বাদেশিকতা প্রচার করতে যাবেন, ডাক্তারের পরামর্শ-মতে তাঁকে কিছুদিনের জন্যে উটকামন্দে যেতে হবে— নির্বিচারে আমার স্বামী তার খরচ জুগিয়েছেন। এ ছাড়া সংসার-খরচের জন্য নিয়মিত তাঁর মাসিক বরাদ্দ আছে। অথচ আশ্চর্য এই যে, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর যে মতের মিল আছে তাও নয়। আমার স্বামী বলতেন, দেশের খনিতে যে পণ্যদ্রব্য আছে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে যেমন দেশের দারিদ্র্য, তেমনি দেশের চিত্তে যেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার এবং স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র্য আরো গুরুতর। আমি তাঁকে একদিন রাগ করে বলেছিলুম, এরা তোমাকে সবাই ফাঁকি দিচ্ছে। তিনি হেসে বললেন, আমার গুণ নেই, অথচ কেবলমাত্র টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্ছি— আমিই তো ফাঁকি দিয়ে লাভ করে নিলুম।

এই পূর্বযুগের পরিচয় কিছু বলে রাখা গেল, নইলে নবযুগের নাট্যটা স্পষ্ট বোঝা যাবে না।

এই যুগের তুফান যেই আমার রক্তে লাগল আমি প্রথমেই স্বামীকে বললুম, বিলিতি জিনিসে তৈরি আমার সমস্ত পোশাক পুড়িয়ে ফেলব।

স্বামী বললেন, পোড়াবে কেন। যতদিন খুশি ব্যবহার না করলেই হবে।

কী তুমি বলছ 'যতদিন খুশি'! ইহজীবনে আমি কখনো—

বেশ তো, ইহজীবনে তুমি নাহয় ব্যবহার করবে না। ঘটা করে নাই পোড়ালে?

কেন এতে তুমি বাধা দিচ্ছ?

আমি বলছি, গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।

এই উত্তেজনাতেই গড়ে তোলবার সাহায্য হয়।

তাই যদি বল তবে বলতে হয় ঘরে আগুন না লাগালে ঘর আলো করা যায় না। আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজামিলন।

আমার স্বামী বললেন, দেখো, বুঝছি আমার কথা আজ তোমার মনে নিচ্ছে না, তবু আমি এ কথাটি তোমাকে বলছি— ভেবে দেখো। মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেমনি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। আজ আমাদের খাওয়াপরা চলাফেরা ভাবাচিন্তা সমস্তই সমস্ত-পৃথিবীর যোগে। আমি তাই মনে করি এটা প্রত্যেক জাতিরই সৌভাগ্যের যুগ— এই সৌভাগ্যকে অস্বীকার করা বীরত্ব নয়।

তার পরে আর-এক ল্যাঠা। মিস গিল্‌বি যখন আমাদের অন্তঃপুরে এসেছিল তখন তাই নিয়ে কিছুদিন খুব গোলমাল চলেছিল। তার পরে অভ্যাসক্রমে সেটা চাপা পড়ে গেছে। আবার সমস্ত ঘুলিয়ে উঠল। মিস গিল্‌বি ইংরেজ কি বাঙালি অনেক দিন সে কথা আমারও মনে হয় নি, কিন্তু মনে হতে শুরু হল। আমি স্বামীকে বললুম, মিস গিল্‌বিকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। স্বামী চুপ করে রইলেন। আমি সেদিন তাঁকে যা মুখে এল তাই বলেছিলুম, তিনি ম্লান মুখ করে চলে গেলেন। আমি খুব খানিকটা কাঁদলুম। কেঁদে যখন আমার মনটা একটু নরম হল তিনি রাত্রে এসে বললেন, দেখো, মিস গিল্‌বিকে কেবলমাত্র ইংরেজ বলে ঝাপসা করে দেখতে আমি পারি নে। এতদিনের পরিচয়েও কি ঐ নামের বেড়াটা ঘুচবে না? ও যে তোমাকে ভালোবাসে।

আমি একটুখানি লজ্জিত হয়ে অথচ নিজের অভিমানের অল্প একটু ঝাঁজ বজায় রেখে বললুম, আচ্ছা, থাক্‌-না, ওকে কে যেতে বলছে?

মিস গিল্‌বি রয়ে গেল। একদিন গির্জেয় যাবার সময় পথের মধ্যে আমাদেরই একজন দূর-সম্পর্কের আত্মীয় ছেলে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে অপমান করলে। আমার স্বামীই এতদিন সেই ছেলেকে পালন করেছিলেন; তিনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। এই নিয়ে ভারি একটা গোল উঠল।

সেই ছেলে যা বললে সবাই তাই বিশ্বাস করলে। লোকে বললে, মিস গিল্‌বিই তাকে অপমান করেছে এবং তার সম্বন্ধে বানিয়ে বলেছে। আমারও কেমন মনে হল, সেটা অসম্ভব নয়। ছেলেটার মা নেই, তার খুড়ো এসে আমাকে ধরলে। আমি তার হয়ে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোনো ফল হল না।

সেদিনকার দিনে আমার স্বামীর এই ব্যবহার কেউ ক্ষমা করতে পারলে না। আমিও না। আমি মনে মনে তাঁকে নিন্দাই করলুম। এইবার মিস গিল্‌বি আপনিই চলে গেল। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে জল পড়ল, কিন্তু আমার মন গলল না। আহা, মিথ্যা করে ছেলেটার এমন সর্বনাশ করে গেল গো! আর, অমন ছেলে! স্বদেশীর উৎসাহে তার নাওয়া-খাওয়া ছিল না। আমার স্বামী নিজের গাড়ি করে মিস গিল্‌বিকে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। সেটা আমার বড়ো বাড়াবাড়ি বোধ হল। এই কথাটা নিয়ে নানা ডালপালা দিয়ে কাগজে যখন গাল দিলে আমার মনে হল, এই শাস্তি ওঁর পাওনা ছিল।

ইতিপূর্বে আমি আমার স্বামীর জন্যে অনেকবার উদ্‌বিগ্ন হয়েছি, কিন্তু এ-পর্যন্ত তাঁর জন্যে একদিনও লজ্জা বোধ করি নি। এবার লজ্জা হল। মিস গিল্‌বির প্রতি নরেন কী অন্যায় করেছে না-করেছে সে আমি জানি নে, কিন্তু আজকের দিনে তা নিয়ে সদ্‌বিচার করতে পারাটাই লজ্জার কথা। যে ভাবের থেকে নরেন ইংরেজ মেয়ের প্রতি ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে আমি তাকে কিছুতেই দমিয়ে দিতে চাই নে। এই কথাটা আমার স্বামী যে কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না, আমার মনে হল সেটা তাঁর পৌরুষের অভাব। তাই আমার মনে লজ্জা হল।

শুধু তাই নয়, আমার সব চেয়ে বুকে বিঁধেছিল যে, আমাকে হার মানতে হয়েছে। আমার তেজ কেবল আমাকেই দগ্ধ করলে, কিন্তু আমার স্বামীকে উজ্জ্বল করলে না। এই তো আমার সতীত্বের অপমান।

অথচ স্বদেশী কাণ্ডর সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিল না বা তিনি এর বিরুদ্ধ ছিলেন তা নয়। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলতেন, দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।

এমন সময় সন্দীপবাবু স্বদেশী প্রচার করবার জন্যে তাঁর দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। বিকেলবেলায় আমাদের নাটমন্দিরে সভা হবে। আমরা মেয়েরা দালানের এক দিকে চিক ফেলে বসে আছি। 'বন্দে মাতরম্' শব্দের সিংহনাদ ক্রমে ক্রমে কাছে আসছে, আমার বুকের ভিতরটা গুর গুর করে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ পাগড়ি-বাঁধা গেরুয়া-পরা যুবক ও বালকের দল খালি পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আঙিনার মধ্যে, মরা নদীতে প্রথম বর্ষার গেরুয়া বন্যার ধারার মতো, হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ল। লোকে লোকে ভরে গেল। সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা বড়ো চৌকির উপর বসিয়ে দশ-বারো জন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এল। বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! আকাশটা যেন ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়বে মনে হল।

সন্দীপবাবুর ফোটোগ্রাফ পূর্বেই দেখেছিলুম। তখন যে ঠিক ভালো লেগেছিল তা বলতে পারি নে। কুশ্রী দেখতে নয়, এমন-কি রীতিমত সুশ্রীই। তবু জানি নে কেন আমার মনে হয়েছিল উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া—চোখে আর ঠোঁটে কী-একটা আছে যেটা খাঁটি নয়। সেইজন্যেই আমার স্বামী যখন বিনা দ্বিধায় তাঁর সকল দাবি পূরণ করতেন আমার ভালো লাগত না। অপব্যয় আমি সইতে পারতুম, কিন্তু আমার কেবলই মনে হত বন্ধু হয়ে এ লোকটা আমার স্বামীকে ঠকাচ্ছে। কেননা, ভাবখানা তো তপস্বীর মতো নয়, গরিবের মতোও নয়, দিব্যি বাবুর মতো। ভিতরে আরামের লোভ আছে, অথচ—এই রকম নানা কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল। আজ সেই-সব কথা মনে উঠছে—কিন্তু থাক্।

কিন্তু, সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর এই বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে ভেসে যাবার জো হল তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য মূর্তি দেখলুম। বিশেষত এক সময় সূর্য ক্রমে নেমে এসে ছাদের নীচে দিয়ে তাঁর মুখের উপর যখন হঠাৎ রৌদ্র ছড়িয়ে দিলে তখন মনে হল, তিনি যে অমরলোকের মানুষ এই কথাটা দেবতা সেদিন সমস্ত নর-নারীর সামনে প্রকাশ করে দিলেন। বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক কথায় যেন ঝড়ের দমকা হাওয়া। সাহসের অন্ত নেই। আমার চোখের সামনে যেটুকু চিকের আড়াল ছিল সে আমি সইতে পারছিলুম না। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলুম আমার মনে পড়ে না। সমস্ত সভায় এমন একটি লোক ছিল না আমার মুখ দেখবার যার একটু অবকাশ ছিল। কেবল এক সময় দেখলুম কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার হুঁশ ছিল না। আমি কি তখন রাজবাড়ির বউ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি আর তিনি বাংলাদেশের বীর। যেমন আকাশের সূর্যের আলো তাঁর ঐ ললাটের উপর পড়েছে, তেমনি দেশের নারীচিত্তের অভিষেক যে চাই। নইলে তাঁর রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কী করে?

আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারলুম, আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকে তাঁর ভাষার আগুন আরো জ্বলে উঠল। ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা তখন আর রাশ মানতে চাইল না— বজ্রের উপর বজ্রের গর্জন, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চমকানি। আমার মন বললে, আমারই চোখের শিখায় এই আগুন ধরিয়ে দিলে। আমরা কি কেবল লক্ষ্মী, আমরাই তো ভারতী।

সেদিন একটা অপূর্ব আনন্দ এবং অহংকারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর-এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগল গ্রীসের বীরাঙ্গনার মতো আমার চুল কেটে দিই ঐ বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য, আমার এই আজানুলম্বিত চুল। যদি ভিতরকার চিত্তের সঙ্গে বাইরেকার গয়নার যোগ থাকত তা হলে আমার কণ্ঠী, আমার গলার হার, আমার বাজুবন্ধ উল্কা-বৃষ্টির মতো সেই সভায় ছুটে ছুটে খসে খসে পড়ে যেত। নিজের অত্যন্ত একটা ক্ষতি করতে পারলে তবেই যেন সেই আনন্দের উৎসাহবেগ সহ্য করা সম্ভব হতে পারত।

সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী যখন ঘরে এলেন আমার ভয় হতে লাগল পাছে তিনি সেদিনকার বক্তৃতার দীপক রাগিণীর সঙ্গে তান না মিলিয়ে কোনো কথা বলেন, পাছে তাঁর সত্যপ্রিয়তায় কোনো জায়গায় ঘা লাগাতে তিনি একটুও অসম্মতি প্রকাশ করেন— তা হলে সেদিন আমি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা করতে পারতুম।

কিন্তু, তিনি আমাকে কোনো কথাই বললেন না। সেটাও আমাকে ভালো লাগল না। তাঁর উচিত ছিল বলা, আজ সন্দীপের কথা শুনে আমার চৈতন্য হল, এ-সব বিষয়ে আমার অনেক দিনের ভুল ভেঙে গেল। আমার কেমন মনে হল তিনি কেবল জেদ করে চুপ করে আছেন, জোর করেই উৎসাহ প্রকাশ করছেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, সন্দীপবাবু আর কতদিন এখানে আছেন?

স্বামী বললেন, তিনি কাল সকালেই রংপুরে রওনা হবেন।

কাল সকালেই?

হাঁ, সেখানে তাঁর বক্তৃতার সময় স্থির হয়ে গেছে।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলুম। তার পরে বললুম, কোনোমতে কালকের দিনটা থেকে গেলে হয় না?

সে তো সম্ভব নয়, কিন্তু কেন বলো দেখি।

আমার ইচ্ছা আমি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁকে খাওয়াব।

শুনে আমার স্বামী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এর পূর্বে অনেক দিন অনেকবার তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে আমাকে বের হবার জন্যে অনুরোধ করেছেন। আমি কিছুতেই রাজি হই নি।

আমার স্বামী আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে এক রকম করে চাইলেন, আমি তার মানেটা ঠিক বুঝলুম না। ভিতরে হঠাৎ একটু কেমন লজ্জা বোধ হল। বললুম, না না, সে কাজ নেই।

তিনি বললেন, কেনই বা কাজ নেই? আমি সন্দীপকে বলব, যদি কোনো রকমে সম্ভব হয় তা হলে কাল সে থেকে যাবে।

দেখলুম সম্ভব হল।

আমি সত্য কথা বলব। সেদিন আমার মনে হচ্ছিল ঈশ্বর কেন আমাকে আশ্চর্য সুন্দর করে গড়লেন না? কারো মন হরণ করবার জন্যে যে, তা নয়। কিন্তু, রূপ যে একটা গৌরব। আজ এই মহাদিনে দেশের পুরুষেরা দেশের নারীর মধ্যে দেখুক একবার জগদ্ধাত্রীকে। কিন্তু, বাইরের রূপ না হলে তাদের চোখ যে দেবীকে দেখতে পায় না। সন্দীপবাবু কি আমার মধ্যে দেশের সেই জাগ্রত শক্তিকে দেখতে পাবেন? না, মনে করবেন, এ একজন সামান্য মেয়েমানুষ, তাঁর এই বন্ধুর ঘরের গৃহিণীমাত্র?

সেদিন সকালে মাথা ঘষে আমার সুদীর্ঘ এলোচুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ করে জড়িয়েছিলুম। দুপুরবেলায় খাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিজে চুল তখন খোঁপা করে বাঁধবার সময় ছিল না। গায়ে ছিল জরির পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজি শাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড়-দেওয়া হাত-কাটা জ্যাকেট।

আমি ঠিক করেছিলুম এ খুব সংযত সাজ, এর চেয়ে সাদাসিধা আর-কিছু হতে পারে না। এমন সময় আমার মেজো জা এসে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তার পরে ঠোঁটদুটো খুব টিপে একটু হাসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, দিদি, তুমি হাসলে যে?

তিনি বললেন, তোর সাজ দেখছি।

আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বললুম, এমনিই কী সাজ দেখলে?

তিনি আর-একবার একটুখানি বাঁকা হাসি হেসে বললেন, মন্দ হয় নি ছোটোরানী, বেশ হয়েছে। কেবল ভাবছি সেই তোমার বিলিতি দোকানের বুক-কাটা জামাটা পরলেই সাজটা পুরোপুরি হত।

এই বলে তিনি কেবল তাঁর মুখ-চোখ নয়, তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত দেহের ভঙ্গি হাসিতে ভরে ঘর থেকে চলে গেলেন। খুব রাগ হল এবং মনে হল সমস্ত ছেড়েছুড়ে আটপৌরে মোটাগোছের একটা শাড়ি পরি। কিন্তু, সে ইচ্ছা শেষ পর্যন্ত কেন যে পালন করতে পারলুম না তা ঠিক জানি নে। মনে মনে বললুম, আমি যদি বেশ ভদ্ররকম সাজ না করেই সন্দীপবাবুর সামনে বেরোই তা হলে আমার স্বামী রাগ করবেন— মেয়েরা যে সমাজের শ্রী।

ভেবেছিলুম, সন্দীপবাবু একেবারে খেতে যখন বসবেন তখন তাঁর সামনে বেরোব। সেই খাওয়ানো-কর্মটার আড়ালে প্রথম-দেখার সংকোচ অনেকটা কেটে যাবে। কিন্তু, খাবার তৈরি হতে আজ দেরি হচ্ছে, প্রায় একটা বেজে গেছে। তাই আমার স্বামী আলাপ করবার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ঘরে ঢুকে প্রথমটা তাঁর মুখের দিকে চাইতে ভারি লজ্জা ঠেকছিল। কোনোমতে সেটা কাটিয়ে জোর করে বলে ফেললুম, আজ খেতে আপনার দেরি হয়ে গেল।

তিনি অসংকোচে আমার পাশের চৌকিতে এসে বললেন, দেখুন, অন্ন তো রোজই একরকম জোটে, কিন্তু অন্নপূর্ণা থাকেন আড়ালে। আজ অন্নপূর্ণা এলেন, অন্ন নাহয় আড়ালেই রইল।

যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেমনি ব্যবহারে। একটুও দ্বিধা নেই। সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তাঁর অভ্যাস। কেউ কিছু মনে করতে পারে এ-সব তর্ক তাঁর নয়। খুব কাছে এসে বসবার স্বাভাবিক দাবি যেন তাঁর আছে, অতএব এতে যে দোষ দিতে পারে দোষ তারই।

আমার লজ্জা হতে লাগল, পাছে সন্দীপবাবু মনে করেন আমি নেহাত একটা সেকেলে জড়-পদার্থ। মুখের কথা বেশ জ্বল জ্বল করে উঠবে, কোথাও বাধবে না, এক-একটা জবাব শুনে তিনি মনে মনে আশ্চর্য হয়ে যাবেন, এ আমার কিছুতেই ঘটে উঠল না। ভিতরে ভিতরে ভারি কষ্ট হতে লাগল; নিজেকে হাজারবার ভর্ৎসনা করে বললুম, কেন ওঁর সামনে এমন হঠাৎ বের হতে গেলুম।

কোনো রকম করে খাওয়ানোটা হয়ে গেলেই আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলুম; তিনি আবার তেমনি নিঃসংকোচে দরজার কাছে এসে আমার পথ আগলে বললেন, আমাকে পেটুক ঠাওরাবেন না, আমি খাবার লোভে এখানে আসি নি। আমার লোভ কেবল আপনি ডেকেছেন বলে। যদি খাওয়ার পরে অমনি পালান তা হলে অতিথিকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

এমন-সব কথা অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত জোরে না বললে ভারি বদসুর লাগত। আমার স্বামী যে ওঁর পরম বন্ধু, আমি যে ওঁর ভাজের মতো। আমি যখন নিজের সঙ্গে লড়াই করে সন্দীপবাবুর প্রবল আত্মীয়তার সমোচ্চ ক্ষেত্রে ওঠবার চেষ্টা করছি, আমার স্বামী আমার বিভ্রাট দেখে আমাকে বললেন, আচ্ছা, তুমি তা হলে তোমার খাওয়া সেরে চলে এসো।

সন্দীপবাবু বললেন, কিন্তু কথা দিয়ে যান ফাঁকি দেবেন না।

আমি একটু হেসে বললুম, আমি এখনি আসছি।

তিনি বললেন, আপনাকে কেন বিশ্বাস করি নে তা বলি। আজ ন বছর হল নিখিলেশের বিয়ে হয়েছে। এই নটি বছর আপনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে এসেছেন। আবার ফের যদি ন বছর করেন তা হলে আর দেখা হবে না।

আমিও আত্মীয়তা শুরু করে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললুম, কেন, তা হলেই বা দেখা হবে না কেন।

তিনি বললেন, আমার কুষ্ঠিতে আছে আমি অল্প বয়সে মরব। আমার বাপ দাদা কেউ ত্রিশের কোঠা পেরোতে পারেন নি। আমার তো এই সাতাশ হল।

তিনি বুঝেছিলেন কথাটা আমার মনে বাজবে। বাজলও বটে। এবার আমার মৃদুকণ্ঠে বোধ হয় করুণ রসের একটু ছিটে লাগল। আমি বললুম, সমস্ত দেশের আশীর্বাদে আপনার ফাঁড়া কেটে যাবে।

তিনি বললেন, দেশের আশীর্বাদ দেশলক্ষ্মীদের কণ্ঠ থেকেই তো পাব। সেইজন্যেই তো এত ব্যাকুল হয়ে আপনাকে আসতে বলছি, তা হলে আজ থেকেই আমার স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হবে।

স্রোতের জল ঘোলা হলেও অনায়াসে তার ব্যবহার চলে। সন্দীপবাবুর সমস্তই এমনি দ্রুতবেগে সচল যে, আর-এক জনের মুখে যা সইত না তাঁর মুখে তাতে আপত্তি করবার ফাঁক পাওয়া যায় না। হাসতে হাসতে বললেন, দেখুন, আপনার এই স্বামীকে জামিন রেখে দিলুম, আপনি যদি না আসেন তা হলে ইনিও খালাস পাবেন না।

আমি যখন চলে আসছি তিনি আবার বলে উঠলেন, আমার আর-একটু সামান্য দরকার আছে।

আমি থমকে ফিরে দাঁড়ালুম। তিনি বললেন, ভয় পাবেন না, এক প্লাস জল। আপনি দেখেছেন আমি খাবার সময়ে জল খাই নে— খাবার খানিক পরে খাই।

এর পরে আমাকে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল, কেন বলুন দেখি।

কবে তাঁর কঠিন অজীর্ণরোগ হয়েছিল তার ইতিহাস এল। প্রায় সাত মাস ধরে তাঁর কিরকম অসহ্য ভোগ গিয়েছে তাও শুনলুম। অ্যালোপ্যাথ হোমিওপ্যাথ সকল রকমের চিকিৎসকের উপদ্রব পার হয়ে অবশেষে কবিরাজের চিকিৎসায় কিরকম আশ্চর্য ফল পেয়েছেন তার বর্ণনা সেরে হেসে তিনি বললেন, ভগবান আমার ব্যামোগুলোও এমনি করে গড়েছেন যে স্বদেশী বড়িটুকু হাতে-হাতে না পেলে তারা বিদায় হতে চায় না।

আমার স্বামী এতক্ষণ পরে বললেন, আর বিদেশী ওষুধের শিশিগুলোও যে একদণ্ড তোমার আশ্রয় ছাড়তে চায় না, তোমার বসবার ঘরের তিনটি শেল্ফ যে একেবারে—

ওগুলো কী জান? প্যুনিটিভ পুলিসের মতো। প্রয়োজন আছে বলে যে এসেছে তা নয়—আধুনিক কালের শাসনে ওরা ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে—কেবল দণ্ডই দিতে হয়, গুঁতোও কম খাই নে।

আমার স্বামী অত্যুক্তি সইতে পারেন না। কিন্তু অলংকারমাত্রই যে অত্যুক্তি, সে তো বিধাতার তৈরি নয়, মানুষের বানানো। আমি একবার আমার নিজের কোনো একটা মিথ্যার জবাবদিহির ছলে আমার স্বামীকে বলেছিলুম, গাছপালা-পশুপাখিরাই আগাগোড়া সত্য বলে, বেচারাদের মিথ্যা বলবার শক্তি নেই। পশুর চেয়ে মানুষের এইখানে শ্রেষ্ঠতা, আবার পুরুষের চেয়ে মেয়েদের শ্রেষ্ঠতাও এইখানে—মেয়েদেরই বিস্তর অলংকার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়।

ঘর থেকে বাইরে এসে দেখি মেজো জা একটা জানলার খড়খড়ি একটুখানি ফাঁক করে ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে যে? তিনি ফিস ফিস করে উত্তর করলেন, আড়ি পাতছিলুম।

যখন ফিরে এলুম, সন্দীপবাবু করুণ স্বরে বললেন, আপনার আজ বোধ হয় কিছুই খাওয়া হল না।

শুনে আমার ভারি লজ্জা হল। আমি একটু বেশি শীঘ্র ফিরে এসেছি। ভদ্ররকম খাবার জন্যে যতটা সময় দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হয় নি। আজকের আমার খাওয়ার মধ্যে না-খাওয়ার অংশটাই যে বেশি, সময়ের অঙ্ক হিসাব করলে সেটা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু কেউ যে সেই হিসাব করছিল তা আমার মনেও হয় নি।

সন্দীপবাবু বোধ হয় আমার লজ্জাটুকু দেখতে পেলেন, সেইটেই আরো লজ্জা। তিনি বললেন, বনের হরিণীর মতো আপনার তো পালাবার দিকেই ঝোঁক ছিল, তবুও যে এত কষ্ট করে সত্য রক্ষা করলেন এ আমার কম পুরস্কার নয়।

আমি ভালো করে জবাব দিতে পারি নি; মুখ লাল করে ঘেমে একটা সোফার কোণে বসে পড়লুম। দেশের মূর্তিমতী নারীশক্তির মতো যেরকম নিঃসংকোচে এবং সগৌরবে সন্দীপবাবুর কাছে বেরিয়ে কেবলমাত্র দর্শনদানের দ্বারা তাঁর ললাটে জয়মাল্য পরাব কল্পনা করেছিলুম, এ পর্যন্ত তার কিছুই হল না।

সন্দীপবাবু ইচ্ছা করেই আমার স্বামীর সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিলেন। তিনি জানেন, তর্কে তাঁর তীক্ষ্ণধার মনের সমস্ত উজ্জ্বলতা ঝক ঝক করে উঠতে থাকে। এর পরেও আমি বারবার দেখেছি আমি উপস্থিত থাকলেই তিনি তর্ক করবার সামান্য উপলক্ষটুকু ছাড়তেন না।

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র সম্বন্ধে আমার স্বামীর মত কী তিনি জানতেন, সেইটের উল্লেখ করে বললেন, দেশের কাজে মানুষের কল্পনাবৃত্তির যে একটা জায়গা আছে সেটা কি তুমি মান না নিখিল?

একটা জায়গা আছে মানি, কিন্তু সব জায়গাই তার তা মানি নে। দেশ-জিনিসকে আমি খুব সত্যরূপে নিজের মনে জানতে চাই এবং সকল লোককে জানাতে চাই—এতবড়ো জিনিসের সম্বন্ধে কোনো মন-ভোলাবার জাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই লজ্জাও বোধ করি।

তুমি যাকে মায়ামন্ত্র বলছ আমি তাকেই বলি সত্য। আমি দেশকে সত্যই দেবতা বলে মানি। আমি নরনারায়ণের উপাসক—মানুষের মধ্যেই ভগবানের সত্যকার প্রকাশ, তেমনি দেশের মধ্যে।

এ কথা যদি সত্যই বিশ্বাস কর তবে তোমার পক্ষে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সুতরাং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভেদ নেই।

সে কথা সত্য, কিন্তু আমার শক্তি অল্প, অতএব নিজের দেশের পূজার দ্বারাই আমি দেশ-নারায়ণের পূজা করি।

পূজা করতে নিষেধ করি নে, কিন্তু অন্য দেশে যে নারায়ণ আছেন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ক'রে সে পূজা কেমন ক'রে সমাধা হবে?

বিদ্বেষও পূজার অঙ্গ। কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে লড়াই করেই অর্জুন বরলাভ করেছিলেন। আমরা এক দিক দিয়ে ভগবানকে মারব, একদিন তাতেই তিনি প্রসন্ন হবেন।

তাই যদি হয় তবে যারা দেশের ক্ষতি করছে আর যারা দেশের সেবা করছে উভয়েই তাঁর উপাসনা করছে; তা হলে বিশেষ করে দেশভক্তি প্রচার করবার দরকার নেই।

নিজের দেশ সম্বন্ধে আলাদা কথা; ওখানে যে হৃদয়ের মধ্যে পূজার স্পষ্ট উপদেশ আছে।

তা হলে শুধু নিজের দেশ কেন, তার চেয়ে আরো ঢের স্পষ্ট উপদেশ আছে নিজেরই সম্বন্ধে। নিজের মধ্যে যে নরনারায়ণ আছেন তাঁর পূজার মন্ত্রটাই যে দেশ বিদেশে সব চেয়ে বড়ো করে কানে বাজছে।

নিখিল, তুমি যে এই-সব তর্ক করছ এ কেবল বুদ্ধির শুকনো তর্ক। হৃদয় ব'লে একটা পদার্থ আছে তাকে কি একেবারে মানবে না?

আমি তোমাকে সত্য বলছি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য ব'লে চালাতে চাও তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারি নে। আমি যদি নিজের স্বার্থসাধনের জন্যে চুরি করি তা হলে নিজের প্রতি আমার যে সত্য প্রেম তারই কি মূলে ঘা দিই নে? চুরি করতে পারি নে যে তাই। সে কি বুদ্ধি আছে ব'লে না নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে ব'লে?

ভিতরে ভিতরে আমার রাগ হচ্ছিল। আমি আর থাকতে পারলুম না; আমি বলে উঠলুম, ইংরেজ ফরাসি জর্মান রুশ এমন কোন্ সভ্যদেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয়?

সে চুরির জবাবদিহি তাদের করতে হবে, এখনো করতে হচ্ছে। ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায় নি।

সন্দীপবাবু বললেন, বেশ তো আমরাও তাই করব। চোরাই মালে আগে ঘরটা বোঝাই করে তার পরে ধীরে সুস্থে দীর্ঘকাল ধরে আমরাও জবাবদিহি করব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে বললে এখনো তারা জবাবদিহি করছে সেটা কোথায়?

রোম যখন নিজের পাপের জবাবদিহি করছিল তখন তা কেউ দেখতে পায় নি। তখন তার ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। বড়ো বড়ো ডাকাত-সভ্যতারও জবাবদিহির দিন কখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু, একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্ছ না—ওদের পলিটিক্সের ঝুলি-ভরা মিথ্যা-কথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেস্টিজরক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই-যে সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম? আর, এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে না? দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না, আমি বলছি, তারা দেশকেও মানছে না।

আমার স্বামীকে আমি কোনোদিন বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক করতে শুনি নি। আমার সঙ্গে তিনি তর্ক করেছেন, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর এমন গভীর করুণা যে, আমাকে হার মানাতে তাঁর কষ্ট হত। আজ দেখলুম তাঁর অস্ত্রচালনা।

আমার স্বামীর কথাগুলোতে কোনোমতেই আমার মন সায় দিচ্ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, এর উপযুক্ত উত্তর আছে, উপস্থিতমত সে আমার মনে জোগাচ্ছিল না। মুশকিল এই যে, ধর্মের দোহাই দিলে চুপ করে যেতে হয়; এ কথা বলা শক্ত ধর্মকে অতটা দূর পর্যন্ত মানতে রাজি নই। এই তর্ক সম্বন্ধে ভালোরকম জবাব দিয়ে আমি একটা লিখব এবং সেটা সন্দীপবাবুর হাতে দেব আমার মনে এই সংকল্প ছিল। তাই আজকের কথাবার্তাগুলো ঘরে ফিরে এসেই আমি নোট করে নিয়েছি।

এক সময়ে সন্দীপবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, আপনি কী বলেন?

আমি বললুম, আমি বেশি সুক্ষ্মে যেতে চাই নে, আমি মোটা কথাই বলব। আমি মানুষ,

আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ করব; আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব-কুড়ব। আমার রাগ আছে, আমি দেশের জন্যে রাগ করব; আমি কাউকে চাই যাকে কাটব-কুটব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব। আমার মোহ আছে, আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব; আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে আমি মা বলব, দেবী বলব, দুর্গা বলব—যার কাছে আমি বলিদানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই।

সন্দীপবাবু চৌকি থেকে উঠে আকাশে দক্ষিণ হাত আস্ফালন করে বলে উঠলেন, হুরা! হুরা! পরক্ষণেই সংশোধন করে বললেন, বন্দে মাতরং! বন্দে মাতরং!

আমার স্বামীর অন্তরের একটি গভীর বেদনা তাঁর মুখের উপর ছায়া ফেলে চলে গেল। তিনি খুব মৃদুস্বরে বললেন, আমিও দেবতা না, আমি মানুষ, আমি সেইজন্যেই বলছি, আমার যা-কিছু মন্দ কিছুতেই সে আমি আমার দেশকে দেব না, দেব না, দেব না।

সন্দীপবাবু বললেন, দেখো নিখিল, সত্য-জিনিসটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হয়ে আছে। আমাদের সত্যে রঙ নেই, রস নেই, প্রাণ নেই, শুধু কেবল যুক্তি। মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধ'রে বিরাজ করে, আমাদের তর্কের মতো তা বস্তু-হীন নয়। এইজন্যে মেয়েরাই যথার্থ নিষ্ঠুর হতে জানে, পুরুষ তেমন জানে না, কেননা ধর্মবুদ্ধি পুরুষকে দুর্বল করে দেয়; মেয়েরা সর্বনাশ করতে পারে অনায়াসে, পুরুষেও পারে, কিন্তু তাদের মনে চিন্তার দ্বিধা এসে পড়ে; মেয়েরা ঝড়ের মতো অন্যায় করতে পারে—সে অন্যায় ভয়ংকর সুন্দর—পুরুষের অন্যায় কুশ্রী, কেননা তার ভিতরে ভিতরে ন্যায়বুদ্ধির পীড়া আছে। তাই আমি তোমাকে বলে রাখছি আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে। আজ আমাদের ধর্মকর্ম-বিচারবিবেকের দিন নয়, আজ আমাদের নির্বিচার নির্বিকার হয়ে নিষ্ঠুর হতে হবে, অন্যায় করতে হবে, আজ পাপকে রক্তচন্দন পরিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করে নিতে হবে। আমাদের কবি কী বলেছে মনে নেই?—

এসো পাপ, এসো সুন্দরী!
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে ফিরুক সঞ্চরি।
অকল্যাণের বাজুক শঙ্খ,
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক,
নির্লাজ কালো কলুষপঙ্ক
বুকে দাও প্রলয়ংকরী!

আজ ধিক্ থাক্ সেই ধর্মকে যা হাসতে হাসতে সর্বনাশ করতে জানে না।

এই বলে তিনি মেজের উপর দু বার জোরে লাথি মারলেন—কার্পেট থেকে অনেকখানি নিদ্রিত ধুলো চমকে উপরে উঠে পড়ল। দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ যা-কিছুকে বড়ো বলে মেনেছে এক মুহূর্তে তিনি তাকে অপমান করে এমন গৌরবে মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আবার হঠাৎ গর্জে উঠলেন, যে আগুন ঘরকে পোড়ায়, যে আগুন বাহিরকে জ্বালায়, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা, তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর করো।

এই শেষ কটি কথা তিনি যে কাকে বললেন তা ঠিক বোঝা গেল না। মনে করা যেতে পারত তিনি যাকে বন্দে মাতরং বলে বন্দনা করেন তাকে, কিংবা দেশের যে নারী সেই দেশলক্ষ্মীর প্রতিনিধিরূপে তখন সেখানে বর্তমান ছিল তাকে। মনে করা যেতে পারত কবি বাল্মীকি যেমন পাপবুদ্ধির বিরুদ্ধে করুণার আঘাতে এক নিমেষে হঠাৎ প্রথম অনুষ্টুপ উচ্চারণ করেছিলেন

তেমনি সন্দীপবাবুও ধর্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে নিষ্কারুণ্যের আঘাতে এই কথাগুলি হঠাৎ বলে উঠলেন— কিংবা জনসাধারণের মনোহরণ-ব্যবসায়ে চিরাভ্যস্ত অভিনয়কুশলতার এই একটি আশ্চর্য পরিচয় দিলেন।

আরো কিছু বোধ হয় বলতেন, এমন সময়ে আমার স্বামী উঠে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, সন্দীপ, চন্দ্রনাথবাবু এসেছেন।

হঠাৎ চমক ভেঙে ফিরে দেখি সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবেন কিনা ভাবছেন। অস্তোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ। আমাকে আমার স্বামী এসে বললেন, ইনি আমার মাস্টারমশায়। এঁর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি, এঁকে প্রণাম করো।

আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আশীর্বাদ করলেন, মা, ভগবান চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন।

ঠিক সেই সময়ে আমার সেই আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল।

নিখিলেশের আত্মকথা

একদিন আমার মনে বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর আমাকে যা দেবেন আমি তা নিতে পারব। এ পর্যন্ত তার পরীক্ষা হয় নি। এবার বুঝি সময় এল।

মনকে যখন মনে মনে যাচাই করতুম অনেক দুঃখ কল্পনা করেছি। কখনো ভেবেছি দারিদ্র্য, কখনো জেলখানা, কখনো অসম্মান, কখনো মৃত্যু। এমন-কি কখনো বিমলের মৃত্যুর কথাও ভাবতে চেষ্টা করেছি। এ-সমস্তই নমস্কার করে মাথায় করে নেব এ কথা যখন বলেছি বোধ হয় মিথ্যা বলি নি।

কেবল একটা কথা কোনো দিন মনে কল্পনাও করতে পারি নি। আজ সেই কথাটা নিয়ে সমস্ত দিন বসে বসে ভাবছি, এও কি সইবে?

মনের ভিতরে কোন্ জায়গায় একটা কাঁটা বিঁধে রয়েছে। কাজকর্ম করছি, কিন্তু বেদনার অবসান নেই। বোধ হয় যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন সেই একটা ব্যথা পাঁজর কাটতে থাকে। সকালে জেগে উঠেই দেখি দিনের আলোর লাবণ্য শুকিয়ে গেছে। কী? এ কী? কী হয়েছে? এ কালো কিসের কালো? কোথা দিয়ে আমার সমস্ত পূর্ণচাঁদের উপর ছায়া ফেলতে এল?

আমার মনের বোধশক্তি হঠাৎ এমন ভয়ানক বেড়ে উঠেছে যে, যে দুঃখ আমার অতীতের বুকের ভিতর সুখের ছদ্মবেশ পরে লুকিয়ে বসে ছিল তার সমস্ত মিথ্যা আজ আমার নাড়ী টেনে টেনে ছিঁড়ছে, আর যে লজ্জা যে দুঃখ ঘনিয়ে এল ব'লে সে যতই প্রাণপণে ঘোমটা টানছে আমার হৃদয়ের সামনে ততই তার আবরু ঘুচে গেল। আমার সমস্ত হৃদয় দৃষ্টিতে ভরে গিয়েছে—যা দেখবার নয়, যা দেখতে চাই নে, তাও বসে বসে দেখছি।

আমি চিরদিন ঐশ্বর্যের ফাঁকির মধ্যে এতবড়ো কাঙাল হয়ে বসেছিলুম সে কথা এতকাল ভুলিয়ে রেখে আজ হঠাৎ দিনের পর দিনে, মুহূর্তের পর মুহূর্তে, কথার পর কথায়, দৃষ্টির পর দৃষ্টিতে, সেই আমার প্রতারিত জীবনের দুর্ভাগ্য এমন তিল তিল করে প্রকাশ করবার দিন এল কেন? যৌবনের এই নটা বছর মাত্র মায়াকে যা খাজনা দিয়েছি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সত্য সেটাকে সুদে আসলে কড়ায় কড়ায় আদায় করতে থাকবে। ঋণশোধের সম্বল যার একেবারে ফুরোল সব চেয়ে বড়ো ঋণশোধের ভার তারই ঘাড়ে। তবু যেন প্রাণপণে বলতে পারি, হে সত্য, তোমারই জয় হোক।

আমার পিসতুত বোন মুনুর স্বামী গোপাল কাল এসেছিল তার মেয়ের বিয়ের সাহায্য চাইতে।

সে আমার ঘরের আসবাবগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছিল আমার মতো সুখী জগতে আর কেউ নেই। আমি বললুম, গোপাল, মুনুকে বোলো কাল আমি তার ওখানে খেতে যাব। মুনু আপনার হৃদয়ের অমৃতে গরিবের ঘরটিকে স্বর্গ করে রেখেছে। সেই লক্ষ্মীর হাতের অন্ন একবার খেয়ে আসবার জন্যে আমার সমস্ত প্রাণ আজ কাঁদছে। তার ঘরের অভাবগুলিই তার ভূষণ হয়ে উঠেছে। আজ তাকে একবার দেখে আসি গে।—ওগো পবিত্র, জগতে তোমার পবিত্র পায়ের ধুলো আজও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

জোর করে অহংকার করে কী করব? নাহয় মাথা হেঁট করেই বললুম আমার গুণের অভাব আছে। পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সব চেয়ে খোঁজে আমার স্বভাবে হয়তো সেই জোর নেই। কিন্তু, জোর কি শুধু আস্ফালন, শুধু খামখেয়াল, জোর কি এইরকম অসংকোচে পায়ের তলায়—কিন্তু এ সমস্ত তর্ক করা কেন। ঝগড়া করে তো যোগ্যতা লাভ করা যায় না। অযোগ্য, অযোগ্য, অযোগ্য! নাহয় তাই হল—কিন্তু ভালোবাসার তো মূল্যই তাই, সে যে অযোগ্যতাকেও সফল করে তোলে। যোগ্যের জন্যে পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার আছে, অযোগ্যের জন্যেই বিধাতা কেবল এই ভালোবাসাটুকু রেখেছিলেন।

একদিন বিমলকে বলেছিলুম তোমাকে বাইরে আসতে হবে। বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে—সে ছিল ঘরগড়া বিমল, ছোটো জায়গা এবং ছোটো কর্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি। তার কাছ থেকে যে ভালোবাসাটুকু নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি তার হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না সে সামাজিক ম্যুনিসিপালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মতো?

আমি লোভী? যা পেয়েছিলুম তার চেয়ে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার অনেক বেশি? না, আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেইজন্যেই আমি তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিস চাই নি, আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনোমতেই ধরা যায় না। স্মৃতিসংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাই নি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল।

একটা কথা তখন ভাবি নি মানুষকে যদি তার পূর্ণ মুক্তরূপে সত্যরূপেই দেখতে চাই তা হলে তার উপরে একেবারে নিশ্চিত দাবি রাখবার আশা ছেড়ে দিতে হয়। এ কথা কেন ভাবি নি? স্ত্রীর উপর স্বামীর নিত্য-দখলের অহংকারে? না, তা নয়। ভালোবাসার উপর একান্ত ভরসা ছিল বলেই।

সত্যের সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপ সহ্য করবার শক্তি আমার আছে এই অহংকার আমার মনে ছিল। আজ তার পরীক্ষা হচ্ছে। মরি আর বাঁচি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব এই অহংকার এখনো মনে রেখে দিলুম।

আজ পর্যন্ত বিমল এক জায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝতে পারে নি। জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্বলতা বলেই জানি। যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না; ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা সে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়। ধৈর্যের 'পরে বিমলের ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন-কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।

ভেবেছিলুম বড়ো জায়গায় এসে জীবনকে যখন সে বড়ো করে দেখবে তখন দৌরাত্ম্যের প্রতি এই মোহ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু, আজ দেখতে পাচ্ছি ওটা বিমলের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুন ক'রে জিবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্যন্ত জ্বালিয়ে তুলতে চায়; অন্য-সমস্ত স্বাদকে সে একরকম অবজ্ঞা করে।

তেমনি আমার পণ এই যে, কোনো-একটা উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে উন্মত্তের মতো দেশের

কাজে লাগব না। আমি বরঞ্চ কাজের ত্রুটি সহ্য করি তবু চাকর-বাকরকে মারধোর করতে পারি নে, কারও উপর রেগেমেগে হঠাৎ কিছু-একটা বলতে বা করতে আমার সমস্ত দেহমনের ভিতর একটা সংকোচ বোধ হয়। আমি জানি আমার এই সংকোচকে মৃদুতা বলে বিমল মনে মনে অশ্রদ্ধা করে; আজ সেই একই কারণ থেকে সে ভিতরে ভিতরে আমার উপরে রাগ করে উঠছে যখন দেখছে আমি 'বন্দে মাতরম্' হেঁকে চারি দিকে যা-ইচ্ছে তাই করে বেড়াই নে।

আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাই নি এতে সকলেরই অপ্রিয় হয়েছি। দেশের লোক ভাবছে আমি খেতাব চাই কিংবা পুলিসকে ভয় করি; পুলিস ভাবছে ভিতরে আমার কু মতলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভালোমানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছি।

কেননা, আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ ব'লেই জেনে, মানুষকে মানুষ ব'লেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার করে মা বলে দেবী বলে মন্ত্র পড়ে যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপরে কোনো-একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ। চিত্তকে মুক্ত করে দিলেই আমরা আর বল পাই নে। হয় কোনো কল্পনাকে নয় কোনো মানুষকে, নয় ভাটপাড়ার ব্যবস্থাকে আমাদের অসাড় চৈতন্যের পিঠের উপর সওয়ার করে না বসালে সে নড়তে চায় না। যতক্ষণ সহজ সত্যে আমরা স্বাদ পাই নে, যতক্ষণ এইরকম মোহে আমাদের প্রয়োজন আছে, ততক্ষণ বুঝতে হবে স্বাধীনভাবে নিজের দেশকে পাবার শক্তি আমাদের হয় নি। ততক্ষণ, আমাদের অবস্থা যেমনি হোক, হয় কোনো কাল্পনিক ভূত নয় কোনো সত্যকার ওঝা, নয় একসঙ্গে দুইয়ে মিলে আমাদের উপর উৎপাত করবেই।

সেদিন সন্দীপ আমাকে বললে, তোমার অন্য নানা গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তোমার কল্পনা-বৃত্তি নেই, সেইজন্যেই স্বদেশের এই দিব্যমূর্তিকে তুমি সত্য করে দেখতে পার না। দেখলুম বিমলও তাতে সায় দিলে। আমি আর উত্তর করলুম না। তর্কে জিতে সুখ নেই। কেননা, এ তো বুদ্ধির অনৈক্য নয়, এ যে স্বভাবের ভেদ। ছোটো ঘরকন্নার সীমাটুকুর মধ্যে এই ভেদ ছোটো আকারেই দেখা দেয়; সেইজন্যে সেটুকুতে মিলন-গানে তাল কেটে যায় না। বড়ো সংসারে এই ভেদের তরঙ্গ বড়ো; সেখানে এই তরঙ্গ কেবলমাত্র কলধ্বনি করে না, আঘাত করে।

কল্পনাবৃত্তি নেই? অর্থাৎ আমার মনের প্রদীপে তেল বাতি থাকতে পারে, কেবল শিখার অভাব! আমি তো বলি সে অভাব তোমাদেরই। তোমরা চকমকি পাথরের মতো আলোকহীন; তাই এত ঠুকতে হয়, এত শব্দ করতে হয়, তবে একটু একটু স্ফুলিঙ্গ বেরোয়—সেই বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গে কেবল অহংকার বাড়ে, দৃষ্টি বাড়ে না।

আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ করেছি, সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। তার সেই মাংসবহুল আসক্তিই তাকে ধর্ম সম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাড়না করে। তার প্রকৃতি স্থূল অথচ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বলেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে বড়ো নাম দিয়ে সাজিয়ে তোলে। ভোগের তৃপ্তির মতোই বিদ্বেষের আশু চরিতার্থতা তার পক্ষে উগ্ররূপে দরকারি। টাকা সম্বন্ধে সন্দীপের একটা লোলুপতা আছে সে কথা বিমল এর পূর্বে আমাকে অনেকবার বলেছে। আমি যে তা বুঝি নি তা নয়, কিন্তু সন্দীপের সঙ্গে টাকা সম্বন্ধে কৃপণতা করতে পারতুম না। ও যে আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে এ কথা মনে করতেও আমার লজ্জা হত। আমি যে ওকে টাকার সাহায্য করছি সেটা পাছে কুশ্রী হয়ে দেখা দেয় এইজন্যে ও সম্বন্ধে ওকে আমি কোনোরকম তক্‌রার করতে চাইতুম না। আজ কিন্তু বিমলকে এ কথা বোঝানো শক্ত হবে যে, দেশের সম্বন্ধে সন্দীপের মনের ভাবের অনেকখানিই সেই স্থূল লোলুপতার রূপান্তর। সন্দীপকে বিমল মনে মনে পুজা করছে; তাই আজ সন্দীপের সম্বন্ধে বিমলের কাছে কিছু বলতে আমার মন

ছোটো হয়ে যায়, কী জানি হয়তো তার মধ্যে মনের ঈর্ষা এসে বেঁধে—হয়তো অত্যুক্তি এসে পড়ে। সন্দীপের যে ছবি আমার মনে জাগছে তার রেখা হয়তো আমার বেদনার তীব্র তাপে বেঁকেচুরে গিয়েছে। তবু মনে রাখার চেয়ে লিখে ফেলা ভালো।

আমার মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুকে আজ আমার এই জীবনের প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত দেখলুম; তিনি না ভয় করেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে। আমি যে বাড়িতে জন্মেছি এখানে কোনো উপদেশ আমাকে রক্ষা করতে পারত না; কিন্তু ঐ মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্তিখানি নিয়ে আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা করেছেন—তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েছি।

সেই চন্দ্রনাথবাবু সেদিন আমার কাছে এসে বললেন, সন্দীপকে কি এখানে আর দরকার আছে?

কোথাও অমঙ্গলের একটু হাওয়া দিলেই তাঁর চিত্তে গিয়ে ঘা দেয়, তিনি কেমন করে বুঝতে পারেন। সহজে তিনি চঞ্চল হন না কিন্তু সেদিন সামনে তিনি মস্ত বিপদের একটা ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে কত ভালোবাসেন সে তো আমি জানি।

চায়ের টেবিলে সন্দীপকে বললুম, তুমি রংপুরে যাবে না? সেখান থেকে চিঠি পেয়েছি, তারা ভেবেছে আমিই তোমাকে জোর করে ধরে রেখেছি।

বিমল চাদানি থেকে চা ঢালছিল। এক মুহূর্তে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে সন্দীপের মুখের দিকে একবার কটাক্ষমাত্রে চাইলে।

সন্দীপ বললে, আমরা এই-যে চার দিকে ঘুরে ঘুরে স্বদেশী প্রচার করে বেড়াচ্ছি, ভেবে দেখলুম, এতে কেবল শক্তির বাজে খরচ হচ্ছে। আমার মনে হয়, এক-একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে যদি আমরা কাজ করি তা হলে ঢের বেশি স্থায়ী কাজ হতে পারে।

এই বলে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনার কি তাই মনে হয় না?

বিমল কী উত্তর দেবে প্রথমটা ভেবে পেলে না। একটু পরে বললে, দু রকমেই দেশের কাজ হতে পারে। চার দিকে ঘুরে কাজ করা কিংবা এক জায়গায় বসে কাজ করা, সেটা নিজের ইচ্ছা কিংবা স্বভাব-অনুসারে বেছে নিতে হবে। ওর মধ্যে যেভাবে কাজ করা আপনার মন চায় সেইটেই আপনার পথ।

সন্দীপ বললে, তবে সত্য কথা বলি। এতদিন বিশ্বাস ছিল ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেশকে মাতিয়ে বেড়ানোই আমার কাজ। কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝেছিলুম। ভুল বোঝবার একটা কারণ ছিল এই যে, আমার অন্তরকে সব সময়ে পূর্ণ রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস আমি কোনো এক-জায়গায় পাই নি। তাই কেবল দেশে দেশে নতুন নতুন লোকের মনকে উত্তেজিত করে সেই উত্তেজনা থেকেই আমাকে জীবনের তেজ সংগ্রহ করতে হত। আজ আপনিই আমার কাছে দেশের বাণী। এ আগুন তো আজ পর্যন্ত আমি কোনো পুরুষের মধ্যে দেখি নি। ধিক্, এতদিন আপন শক্তির অভিমান করেছিলুম। দেশের নায়ক হবার গর্ব আর রাখি নে। আমি উপলক্ষ মাত্র হয়ে আপনার এই তেজে এইখানে থেকেই সমস্ত দেশকে জ্বালিয়ে তুলতে পারব এ আমি স্পর্ধা করে বলতে পারি। না না, আপনি লজ্জা করবেন না; মিথ্যা লজ্জা সংকোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মউচাকের মক্ষীরানী; আমরা আপনাকে চারি দিকে ঘিরে কাজ করব, কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই, তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট আনন্দহীন হবে। আপনি নিঃসংকোচে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

লজ্জায় এবং গৌরবে বিমলের মুখ লাল হয়ে উঠল এবং চায়ের পেয়ালায় চা ঢালতে তার হাত কাঁপতে লাগল।

চন্দ্রনাথবাবু আর-একদিন এসে বললেন, তোমরা দুজনে কিছুদিনের জন্যে একবার দার্জিলিং বেড়াতে যাও; তোমার মুখ দেখে আমার বোধ হয় তোমার শরীর ভালো নেই। ভালো ঘুম হয় না বুঝি?

বিমলকে সন্ধ্যার সময় বললুম, বিমল, দার্জিলিঙে বেড়াতে যাবে?

আমি জানি দার্জিলিঙে গিয়ে হিমালয় পর্বত দেখবার জন্যে বিমলের খুব শখ ছিল। সেদিন সে বললে, না, এখন থাক্।

দেশের ক্ষতি হবার আশঙ্কা ছিল।

আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোটো জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা; ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে বসে ছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলোচ্ছে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশুনো সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায়। যদি দেখি এই বৃহৎ জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর খাপ খাই নে তা হলে বুঝব এতদিন যা নিয়ে ছিলুম সে কেবল ফাঁকি। সে ফাঁকিতে কোনো দরকার নেই। সে দিন যদি আসে তো ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর-জবরদস্তি? কিসের জন্যে! সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে!

সন্দীপের আত্মকথা

যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, এ কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।

দেশে আপনা-আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়; দেশকে যেদিন লুঠ করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেইদিনই দেশ আমার হবে।

লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব, প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্ছে বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মানতে দেয় না তাকেই আমরা বলি নীতি, এইজন্যেই নীতিকে আজ পর্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠতে পারছে না।

যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠো আলগা হয়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আধমরা এক দল লোক আছে— নীতি সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক। কিন্তু যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই সংকোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যেই প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু দামি সাজিয়ে রেখেছে। তারাই নদী সাঁতরে আসবে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা লাথিয়ে ভাঙবে, পাবার যোগ্য জিনিস ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামি জিনিসের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেননা, চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ করতে ভালোবাসে। তাই আধমরা তপস্বীর হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্তফুলের স্বয়ংবরের মালা পড়তে চায় না। নহবৎখানায় রোশনচৌকি বাজছে— লগ্ন বয়ে যায় যে, মন উদাস হয়ে গেল। বর কে। আমিই বর। যে মশাল জ্বালিয়ে এসে পড়তে পারে বরের আসন তারই। প্রকৃতির বর আসে অনাহূত।

লজ্জা? না, আমি লজ্জা করি নে। যা দরকার আমি তা চেয়ে নিই, না চেয়েও নিই। লজ্জা

ক'রে যারা নেবার যোগ্য জিনিস নিলে না তারা সেই না-নেবার দুঃখটাকে চাপা দেবার জন্যেই লজ্জাটাকে বড়ো নাম দেয়। এই-যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি এ হচ্ছে রিয়ালিটির পৃথিবী। কতকগুলো বড়ো কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে খালি-পেটে খালি-হাতে যে মানুষ এই বস্তুর হাট থেকে চলে গেল সে কেন এই শক্ত মাটির পৃথিবীতে জন্মেছিল? আসমানে আকাশকুসুমের কুঞ্জবনে কতকগুলো মিষ্ট বুলির বাঁধা তানে বাঁশি বাজাবার জন্যে ধর্মবিলাসী বাবুর দলের কাছ থেকে তারা বায়না নিয়েছিল নাকি? আমার সে বাঁশির বুলিতেও দরকার নেই, আমার সে আকাশকুসুমেও পেট ভরবে না। আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দলব, সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই, পেতে আমার সংকোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মতো একেবারে পাতলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চীঁ চীঁ গলার ভর্ৎসনা আমার কানে পৌঁছবে না।

লুকোচুরি করতে আমি চাই নে, কেননা তাতে কাপুরুষতা আছে। কিন্তু দরকার হলে যদি করতে না পারি তবে সেও কাপুরুষতা। তুমি যা চাও তা তুমি দেয়াল গেঁথে রাখতে চাও; সুতরাং আমি যা চাই তা আমি সিঁধ কেটে নিতে চাই। তোমার লোভ আছে তাই তুমি দেওয়াল গাঁথ; আমার লোভ আছে তাই আমি সিঁধ কাটি। তুমি যদি কল কর, আমি কৌশল করব। এইগুলোই হচ্ছে প্রকৃতির বাস্তব কথা। এই কথাগুলোর উপরেই পৃথিবীর রাজ্য-সাম্রাজ্য, পৃথিবীর বড়ো বড়ো কাণ্ডকারখানা চলছে। আর যে-সব অবতার স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেইখানকার ভাষায় কথা কইতে থাকেন তাঁদের কথা বাস্তব নয়। সেইজন্যে এত চীৎকারে সে-সব কথা কেবলমাত্র দুর্বলদের ঘরের কোণে স্থান পায়; যারা সবল হয়ে পৃথিবী শাসন করে তারা সে-সব কথা মানতে পারে না। কেননা মানতে গেলেই বলক্ষয় হয়। তার কারণ, কথাগুলো সত্যই নয়। যারা এ কথা বুঝতে দ্বিধা করে না, মানতে লজ্জা করে না, তারাই কৃতকার্য হল; আর যে হতভাগারা এক দিকে প্রকৃতি আর-এক দিকে অবতারের উৎপাতে বাস্তব অবাস্তব দু নৌকায় পা দিয়ে দুলে মরছে তারা না পারে এগোতে, না পারে বাঁচতে।

এক দল মানুষ বাঁচবে না বলে প্রতিজ্ঞা ক'রে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সূর্যাস্তকালের আকাশের মতো মুমূর্ষুতার একটা সৌন্দর্য আছে, তারা তাই দেখে মুগ্ধ। আমাদের নিখিলেশ সেই জাতের জীব; ওকে নির্জীব বললেই হয়। আজ চার বৎসর আগে ওর সঙ্গে আমার এই নিয়ে একদিন ঘোর তর্ক হয়ে গেছে। ও আমাকে বলে, জোর না হলে কিছু পাওয়া যায় না সে কথা মানি; কিন্তু কাকে জোর বলো, আর কোন্‌ দিকে পেতে হবে তাই নিয়ে তর্ক। আমার জোর ত্যাগের দিকে জোর।

আমি বললুম, অর্থাৎ লোকসানের নেশায় তুমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ।

নিখিলেশ বললে, হাঁ, ডিমের ভিতরকার পাখি যেমন তার ডিমের খোলাটাকে লোকসান করবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। খোলাটা খুব বাস্তব জিনিস বটে, তার বদলে সে পায় হাওয়া, পায় আলো— তোমাদের মতে সে বোধ হয় ঠকে।

নিখিলেশ এইরকম রূপক দিয়ে কথা কয়। তার পরে আর তাকে বোঝানো শক্ত যে তৎসত্ত্বেও সেগুলো কেবলমাত্র কথা, সে সত্য নয়। তা বেশ, ও এইরকম রূপক নিয়েই সুখে থাকে তো থাক্‌— আমরা পৃথিবীর মাংসাশী জীব; আমাদের দাঁত আছে, নখ আছে; আমরা দৌড়তে পারি, ধরতে পারি, ছিঁড়তে পারি— আমরা সকালবেলায় ঘাস খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারই রোমন্থনে দিন কাটাতে পারি নে। অতএব এ পৃথিবীতে আমাদের খাদ্যের যে ব্যবস্থা আছে তোমরা রূপকওয়ালার দল তার দরজা আগলে থাকলে আমরা মানতে পারব না। হয় চুরি করব নয় ডাকাতি করব। নইলে যে আমাদের প্রাণ বাঁচবে না। আমরা তো মৃত্যুর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পদ্মপাতার উপর শুয়ে শুয়ে দশম দশায় প্রাণত্যাগ করতে রাজি নই, তা এতে আমাদের বৈষ্ণব বাবাজিরা যতই দুঃখিত হোন-না কেন।

আমার এই কথাগুলোকে সবাই বলবে, ও তোমার একটা মত। তার কারণ, পৃথিবীতে যারা

সন্দীপবাবু আমার সঙ্গে মতে মিলতেন না। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতুম না। কিন্তু তার দু দিন পরে সকালে যেন ঘুম থেকে উঠেই তিনি একটা আলো দেখতে পেতেন এবং তখনি আমাকে ডাকিয়ে এনে বলতেন, দেখুন, সেদিন আপনি যা বলেছিলেন সেটাই সত্য, আমার সমস্ত তর্ক ভুল। এক-এক দিন বলতেন, আপনার যে পরামর্শটি নিই নি সেইটেতেই আমি ঠকেছি। আচ্ছা, এর রহস্যটা কী আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

ক্রমেই আমার বিশ্বাস পাকা হতে লাগল যে, সেদিন সমস্ত দেশে যা-কিছু কাজ চলছিল তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু, আর তারও মূলে ছিল একজন সামান্য স্ত্রীলোকের সহজ বুদ্ধি। প্রকাণ্ড একটা দায়িত্বের গৌরবে আমার মন ভরে রইল।

আমাদের এই-সমস্ত পরামর্শের মধ্যে আমার স্বামীর কোনো স্থান ছিল না। দাদা যেমন আপনার নাবালক ভাইটিকে খুবই ভালোবাসে, অথচ কাজে কর্মে তার বুদ্ধির উপর কোনো ভরসা রাখে না, সন্দীপবাবু আমার স্বামীর সম্বন্ধে সেইরকম ভাবটা প্রকাশ করতেন। আমার স্বামী যে এ-সব বিষয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মতো, তাঁর বুদ্ধিবিবেচনা একেবারে উল্টোরকম, এ কথা সন্দীপবাবু যেন খুব গভীর স্নেহের সঙ্গে হাসতে হাসতে বলতেন। আমার স্বামীর এই-সমস্ত অদ্ভুত মত ও বুদ্ধিবিপর্যয়ের মধ্যে এমন একটি মজার রস আছে, যেন সেইজন্যেই সন্দীপবাবু তাঁকে আরো বেশি করে ভালোবাসতেন। তাই তিনি নিরতিশয় স্নেহের সঙ্গেই আমার স্বামীকে দেশের সমস্ত দায় থেকে একেবারে রেহাই দিয়েছিলেন।

প্রকৃতির ডাক্তারিতে ব্যথা অসাড় করবার অনেক ওষুধ আছে। যখন কোনো-একটা গভীর সম্বন্ধের নাড়ী কাটা পড়তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে কখন যে সেই ওষুধের জোগান ঘটে তা কেউ জানতে পারে না; অবশেষে একদিন জেগে উঠে দেখা যায় মস্ত একটা ব্যবচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধের মধ্যে যখন ছুরি চলছিল তখন আমার মন এমন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে রইল যে আমি টেরই পেলুম না কত বড়ো নিষ্ঠুর একটা কাণ্ড ঘটছে। এই বুঝি মেয়েদেরই স্বভাব; তাদের হৃদয়াবেগ যখন এক দিকে প্রবল হয়ে জেগে ওঠে অন্য দিকে তাদের আর-কিছুই সাড় থাকে না। এইজন্যেই আমরা প্রলয়ংকরী; আমরা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি, কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়। আমরা নদীর মতো; কূলের মধ্যে দিয়ে যখন বয়ে যাই তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কূল ছাপিয়ে বইতে থাকি তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।

সন্দীপের আত্মকথা

আমি বুঝতে পারছি একটা গোলমাল বেধেছে। সেদিন তার একটু পরিচয় পাওয়া গেল।

নিখিলেশের বৈঠকখানার ঘরটা আমি আসার পর থেকে সদর ও অন্দরে মিশিয়ে একটা উভচর-জাতীয় পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে বাইরের থেকে আমার অধিকার ছিল, ভিতরের থেকে মক্ষীর বাধা ছিল না।

আমাদের এই অধিকার যদি আমরা কিছু-কিছু হাতে রেখে রয়ে-বসে ভোগ করতুম তা হলে হয়তো লোকের একরকম সয়ে যেত। কিন্তু বাঁধ যখন প্রথম ভাঙে তখনি জলের তোড়টা হয় বেশি। বৈঠকখানা-ঘরে আমাদের সভাটা এমনি জোরে চলতে লাগল যে আর-কোনো কথা মনেই রইল না।

বৈঠকখানা-ঘরে যখন মক্ষী আসে আমার ঘর থেকে আমি একরকম করে টের পাই। খানিকটা বালা-চুড়ির খানিকটা এটা-ওটার শব্দ পাওয়া যায়। ঘরের দরজাটা বোধ করি সে একটু অনাবশ্যক জোরে ঘা দিয়েই খোলে। তার পরে বইয়ের আলমারির কাঁচের পাল্লাটা একটু আঁট আছে, সেটা টেনে খুলতে গেলে যথেষ্ট শব্দ হয়ে ওঠে। বৈঠকখানায় এসে দেখি দরজার দিকে পিছন করে মক্ষী

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের এক পৃষ্ঠা

শেল্‌ফ থেকে মনের মতো বই বাছাই করতে অত্যন্ত বেশি মনোযোগী। তখন তাকে এই দুরূহ কাজে সাহায্য করবার প্রস্তাব করতেই সে চমকে উঠে আপত্তি করে, তার পরে অন্য প্রসঙ্গ উঠে পড়ে।

সেদিন বৃহস্পতিবারের বারবেলায় পূর্বোক্ত রকমের শব্দ লক্ষ্য করেই ঘর থেকে রওনা হয়েছিলুম। পথের মাঝখানে বারান্দায় দেখি এক দরোয়ান খাড়া। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই আমি চলেছিলুম, এমন সময় সে পথ আগলে বললে, বাবু, ও দিকে যাবেন না।

যাব না! কেন!

বৈঠকখানা-ঘরে রানীমা আছেন।

আচ্ছা, তোমার রানীমাকে খবর দাও যে সন্দীপবাবু দেখা করতে চান।

না, সে হবে না, হুকুম নেই।

ভারি রাগ হল, গলা একটু চড়িয়ে বললুম, আমি হুকুম করছি তুমি জিজ্ঞাসা করে এসো।

গতিক দেখে দরোয়ান একটু থমকে গেল। তখন আমি তাকে পাশে ঠেলে ঘরের দিকে এগোলুম। যখন প্রায় দরজার কাছ-বরাবর পৌঁচেছি এমন সময় তাড়াতাড়ি সে কর্তব্য পালন করবার জন্যে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললে, বাবু, যাবেন না।

কী! আমার গায়ে হাত! আমি হাত ছিনিয়ে নিয়ে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলুম। এমন সময়ে মক্ষী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখে দরোয়ান আমাকে অপমান করবার উপক্রম করছে।

তার সেই মূর্তি আমি কখনো ভুলব না। মক্ষী যে সুন্দরী সেটা আমার আবিষ্কার। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক ওর দিকে তাকাবে না। লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, যাকে আমাদের রূপরসজ্ঞ লোকেরা নিন্দে করে বলে 'ঢ্যাঙা'। ওর ঐ লম্বা গড়নটিই আমাকে মুগ্ধ করে; যেন প্রাণের ফোয়ারার ধারা, সৃষ্টিকর্তার হৃদয়গুহা থেকে বেগে উপরের দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। ওর রঙ শামলা, কিন্তু সে যে ইস্পাতের তলোয়ারের মতো শামলা—কী তেজ আর কী ধার! সেই তেজ সেদিন ওর সমস্ত মুখে চোখে ঝিক্‌মিক্ করে উঠল। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে তর্জনী তুলে রানী বললে, নন্‌কু, চলা যাও।

আমি বললুম, আপনি রাগ করবেন না, নিষেধ যখন আছে তখন আমিই চলে যাচ্ছি।

মক্ষী কম্পিতস্বরে বললে, না, আপনি যাবেন না, ঘরে আসুন।

এ তো অনুরোধ নয়, এ হুকুম। আমি ঘরে এসে চৌকিতে বসে একটা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগলুম। মক্ষী একটা কাগজের টুকরোয় পেন্‌সিল দিয়ে কী লিখে বেহারাকে ডেকে বললে, বাবুকে দিয়ে এসো।

আমি বললুম, আমাকে মাপ করবেন, ধৈর্য রাখতে পারি নি, দরোয়ানটাকে মেরেছি।

মক্ষী বললে, বেশ করেছেন।

কিন্তু ও বেচারার তো কোনো দোষ নেই, ও তো কর্তব্য পালন করেছে।

এমন সময় নিখিল ঘরে ঢুকল। আমি দ্রুত চৌকি থেকে উঠে তার দিকে পিঠ করে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

মক্ষী নিখিলকে বললে, আজ ননকু দরোয়ান সন্দীপবাবুকে অপমান করেছে।

নিখিল এমনি ভালোমানুষের মতো আশ্চর্য হয়ে বললে 'কেন' যে আমি আর থাকতে পারলুম না। মুখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালুম; ভাবলুম সাধুলোকের সত্যের বড়াই স্ত্রীর কাছে টেঁকে না, যদি তেমন স্ত্রী হয়।

মক্ষী বললে, সন্দীপবাবু বৈঠকখানায় আসছিলেন, সে ওঁর পথ আটক করে বললে হুকুম নেই।

নিখিল জিজ্ঞাসা করলে, কার হুকুম নেই?

মক্ষী বললে, তা কেমন করে বলব!

রাগে ক্ষোভে মক্ষীর চোখ দিয়ে জল পড়ে-পড়ে আর-কি।

দরোয়ানকে নিখিল ডেকে পাঠালে। সে বললে, হজুর, আমার তো কসুর নেই। হুকুম তামিল করেছি।

কার হুকুম?

বড়োরানীমা মেজোরানীমা আমাকে ডেকে বলে দিয়েছেন।

ক্ষণকালের জন্যে সবাই আমরা চুপ করে রইলুম।

দরোয়ান চলে গেলে মক্ষী বললে, ননকুকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।

নিখিল চুপ করে রইল। আমি বুঝলুম ওর ন্যায়বুদ্ধিতে খট্‌কা লাগল। ওর খট্‌কার আর অন্ত নেই।

কিন্তু বড়ো শক্ত সমস্যা! সোজা মেয়ে তো নয়। ননকুকে ছাড়ানোর উপলক্ষে জায়েদের উপর অপমানের শোধ তোলা চাই।

নিখিল চুপ করেই রইল। তখন মক্ষীর চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল। নিখিলের ভালোমানুষির 'পরে তার ঘৃণার আর অন্ত রইল না।

নিখিল কোনো কথা না বলে উঠে ঘর থেকে চলে গেল।

পরদিন সেই দরোয়ানকে দেখা গেল না। খবর নিয়ে শুনলুম, তাকে নিখিল মফস্বলের কোন্ কাজে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছে— দরোয়ানজির তাতে লাভ বৈ ক্ষতি হয় নি।

এইটুকুর ভিতরে নেপথ্যে কত ঝড় বয়ে গেছে সে তো আভাসে বুঝতে পারছি। বারে বারে কেবল এই কথাই মনে হয়— নিখিল অদ্ভুত মানুষ, একেবারে সৃষ্টিছাড়া।

এর ফল হল এই যে, এর পরে কিছুদিন মক্ষী রোজই বৈঠকখানায় এসে বেহারাকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়ে এনে আলাপ করতে আরম্ভ করলে; কোনোরকম প্রয়োজনের কিংবা আকস্মিকতার ছুতোটুকু পর্যন্ত রাখলে না।

এমনি করেই ভাবভঙ্গি ক্রমে আকার-ইঙ্গিতে, অস্পষ্ট ক্রমে স্পষ্টতায় জমে উঠতে থাকে। এ যে ঘরের বউ, বাইরের পুরুষের পক্ষে একেবারে নক্ষত্রলোকের মানুষ। এখানে কোনো বাঁধা পথ নেই। এই পথহীন শূন্যের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে টানাটানি, জানাজানি, অদৃশ্য হাওয়ায় হাওয়ায় সংস্কারের পর্দা একটার পর আর-একটা উড়িয়ে দিয়ে কোন্ এক সময়ে একেবারে উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝখানে এসে পৌঁছনো— সত্যের এ এক আশ্চর্য জয়যাত্রা!

সত্য নয় তো কী! স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের যে মিলের টান, সেটা হল একটা বাস্তব জিনিস; ধুলোর কণা থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারা পর্যন্ত জগতের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ তার পক্ষে; আর, মানুষ তাকে কতকগুলো বচন দিয়ে আড়ালে রাখতে চায়, তাকে ঘরগড়া বিধিনিষেধ দিয়ে নিজের ঘরের জিনিস করে বানাতে বসেছে! যেন সৌরজগৎকে গলিয়ে জামাইয়ের জন্যে ঘড়ির চেন করবার ফরমাশ। তার পরে বাস্তব যেদিন বস্তুর ডাক শুনে জেগে ওঠে, মানুষের সমস্ত কথার ফাঁকি এক মুহূর্তেই উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আপনার জায়গায় এসে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম বল, বিশ্বাস বল, কেউ কি তাকে ঠেকাতে পারে? তখন কত ধিক্‌কার, কত হাহাকার, কত শাসন! কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে কি শুধু মুখের কথায়? সে তো জবাব দেয় না, সে শুধু নাড়া দেয়— সে যে বাস্তব।

তাই চোখের সামনে সত্যের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখতে আমার ভারি চমৎকার লাগছে। কত লজ্জা, কত ভয়, কত দ্বিধা! তাই যদি না থাকবে তবে সত্যের রস রইল কী? এই-যে পা কাঁপতে থাকা, এই-যে থেকে-থেকে মুখ ফেরানো, এ বড়ো মিষ্টি! আর, এই ছলনা শুধু অন্যকে নয়, নিজেকে। বাস্তবকে যখন অবাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তখন ছলনা তার প্রধান অস্ত্র। কেননা, বস্তুকে তার শত্রুপক্ষ লজ্জা দিয়ে বলে, তুমি স্থূল। তাই, হয় তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতে নয় মায়া-আবরণ প'রে বেড়াতে হয়। যে-রকম অবস্থা তাতে সে জোর করে বলতে পারে না যে, হাঁ আমি

স্থূল, কেননা আমি সত্য, আমি মাংস, আমি প্রবৃত্তি, আমি ক্ষুধা, নির্লজ্জ নির্দয়—যেমন নির্লজ্জ নির্দয় সেই প্রচণ্ড পাথর যা বৃষ্টির ধারায় পাহাড়ের উপর থেকে লোকালয়ের মাথার উপরে গড়িয়ে এসে পড়ে, তার পরে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

আমি সমস্তই দেখতে পাচ্ছি। ঐ যে পর্দা উড়ে উড়ে পড়ছে; ঐ যে দেখতে পাচ্ছি প্রলয়ের রাস্তায় যাত্রার সাজসজ্জা চলছে! ঐ যে লাল ফিতেটুকু, ছোট্ট এতটুকু, রাশি রাশি ঘষা চুলের ভিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, ও যে কালবৈশাখীর লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা! ঐ যে পাড়ের এতটুকু ভঙ্গি, ঐ যে জ্যাকেটের এতটুকু ইঙ্গিত, আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি তার উত্তাপ। অথচ এ-সব আয়োজন অনেকটা অগোচরে হচ্ছে এবং অগোচরে থাকছে, যে করছে সেও সম্পূর্ণ জানে না।

কেন জানে না? তার কারণ, মানুষ বরাবর বাস্তবকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে বাস্তবকে স্পষ্ট করে জানবার এবং মানবার উপায় নিজের হাতে নষ্ট করেছে। বাস্তবকে মানুষ লজ্জা করে। তাই মানুষের তৈরি রাশি-রাশি ঢাকাঢুকির ভিতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে নিজের কাজ করতে হয়; এইজন্যে তার গতিবিধি জানতে পারি নে, অবশেষে হঠাৎ যখন সে একেবারে ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে তখন তাকে আর অস্বীকার করবার জো থাকে না। মানুষ তাকে শয়তান বলে বদনাম দিয়ে তাড়াতে চেয়েছে, এইজন্যেই সাপের মূর্তি ধরে স্বর্গোদ্যানে সে লুকিয়ে প্রবেশ করে, আর কানে কানে কথা কয়েই মানবপ্রেয়সীর চোখ ফুটিয়ে দিয়ে তাকে বিদ্রোহী করে তোলে। তার পর থেকে আর আরাম নেই, তার পরে মরণ আর-কি!

আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আসছে, এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠছে। যা চাই সে খুব কাছে আসবে, তাকে মোটা করে পাব, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতে ছাড়ব না—মাঝখানে যা-কিছু আছে তা ভেঙে চুরমার হয়ে ধুলোয় লুটবে, হাওয়ায় উড়বে, এই আনন্দ, এই তো আনন্দ, এই তো বাস্তবের তাণ্ডব-নৃত্য—তার পরে মরণ-বাঁচন, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ তুচ্ছ! তুচ্ছ! তুচ্ছ!

আমার মক্ষীরানী স্বপ্নের ঘোরেই চলছে, সে জানে না কোন্ পথে চলছে। সময় আসবার আগে তাকে হঠাৎ জানিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমি যে কিছুই লক্ষ করি নে এইটে জানানোই ভালো। সেদিন আমি যখন খাচ্ছিলুম মক্ষীরানী আমার মুখের দিকে একরকম করে তাকিয়ে ছিল, একেবারে ভুলে গিয়েছিল এই চেয়ে-থাকার অর্থটা কী। আমি হঠাৎ এক সময়ে তার চোখের দিকে চোখ তুলতেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল, চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। আমি বললুম, আপনি আমার খাওয়া দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। অনেক জিনিস লুকিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু আমার ঐ লোভটা পদে পদে ধরা পড়ে। তা দেখুন, আমি যখন নিজের হয়ে লজ্জা করি নে তখন আপনি আমার হয়ে লজ্জা করবেন না।

সে ঘাড় বেঁকিয়ে আরো লাল হয়ে উঠে বলতে লাগল, না না, আপনি—

আমি বললুম, আমি জানি লোভী মানুষকে মেয়েরা ভালোবাসে, ঐ লোভের উপর দিয়েই তো মেয়েরা তাদের জয় করে। আমি লোভী, তাই বরাবর মেয়েদের কাছ থেকে আদর পেয়ে পেয়ে আজ আমার এমন দশা হয়েছে যে আর লজ্জার লেশমাত্র নেই। অতএব আপনি একদৃষ্টে অবাক হয়ে আমার খাওয়া দেখুন-না, আমি কিচ্ছু কেয়ার করি নে। এই ডাঁটাগুলির প্রত্যেকটিকে চিবিয়ে একেবারে নিঃসত্ত্ব করে ফেলে দেব তবে ছাড়ব, এই আমার স্বভাব।

আমি কিছুদিন আগে আজকালকার দিনের একখানি ইংরেজি বই পড়ছিলুম, তাতে স্ত্রীপুরুষের মিলননীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে। সেইটে আমি ওদের বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিলুম। একদিন দুপুরবেলায় আমি কী জন্যে সেই ঘরে ঢুকেই দেখি মক্ষীরানী সেই বইটা হাতে করে নিয়ে পড়ছে, পায়ের শব্দ পেয়েই তাড়াতাড়ি সেটার উপর আর একটা বই চাপা দিয়ে উঠে পড়ল। যে বইটা চাপা দিল সেটা লংফেলোর কবিতা।

আমি বললুম, দেখুন আপনারা কবিতার বই পড়তে লজ্জা পান কেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। লজ্জা পাবার কথা পুরুষের; কেননা, আমরা কেউ বা অ্যাটর্নি, কেউ বা এঞ্জিনিয়ার। আমাদের যদি কবিতা পড়তেই হয় তা হলে অর্ধেকরাত্রে দরজা বন্ধ করে পড়া উচিত। কবিতার সঙ্গেই তো আপনাদের আগাগোড়া মিল। যে বিধাতা আপনাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি যে গীতিকবি, জয়দেব তাঁরই পায়ের কাছে বসে 'ললিতলবঙ্গলতা'য় হাত পাকিয়েছেন।

মক্ষীরানী কোনো জবাব না দিয়ে হেসে লাল হয়ে চলে যাবার উদ্‌যোগ করতেই আমি বললুম, না, সে হবে না, আপনি বসে বসে পড়ুন। আমি একখানা বই ফেলে গিয়েছিলুম, সেটা নিয়েই দৌড় দিচ্ছি।

আমার বইখানা টেবিল থেকে তুলে নিলুম। বললুম, ভাগ্যে এ বই আপনার হাতে পড়ে নি, তা হলে আপনি হয়তো আমাকে মারতে আসতেন।

মক্ষী বললে, কেন।

আমি বললুম, কেননা, এ কবিতার বই নয়। এতে যা আছে সে একেবারে মানুষের মোটা কথা, খুব মোটা করেই বলা, কোনোরকম চাতুরী নেই। আমার খুব ইচ্ছে ছিল এ বইটা নিখিল পড়ে।

একটুখানি ভ্রূকুঞ্চিত করে মক্ষী বললে, কেন বলুন দেখি।

আমি বললুম, ও যে পুরুষমানুষ, আমাদেরই দলের লোক। এই স্থূল জগৎটাকে ও কেবলই ঝাপসা করে দেখতে চায়, সেইজন্যেই ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধে। আপনি তো দেখছেন সেইজন্যেই আমাদের স্বদেশী ব্যাপারটাকে ও লংফেলোর কবিতার মতো ঠাউরেছে— যেন ফি কথায় মধুর ছন্দ বাঁচিয়ে চলতে হবে এইরকম ওর মতলব। আমরা গদ্যের গদা নিয়ে বেড়াই, আমরা ছন্দ ভাঙার দল।

মক্ষী বললে, স্বদেশীর সঙ্গে এ বইটার যোগ কী?

আমি বললুম, আপনি পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কী স্বদেশ কী অন্য সব বিষয়েই নিখিল বানানো কথা নিয়ে চলতে চায়, তাই পদে পদে মানুষের যেটা স্বভাব তারই সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি বাধে, তখন ও স্বভাবকে গাল দিতে থাকে; কিছুতেই এ কথাটা ও মানতে চায় না যে কথা তৈরি হবার বহু আগেই আমাদের স্বভাব তৈরি হয়ে গেছে, কথা থেমে যাবার বহু পরেও আমাদের স্বভাব বেঁচে থাকবে।

মক্ষী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল; তার পরে গম্ভীরভাবে বললে, স্বভাবের চেয়ে বড়ো হতে চাওয়াটাই কি আমাদের স্বভাব নয়?

আমি মনে মনে হাসলুম— ওগো ও রানী, এ তোমার আপন বুলি নয়, এ নিখিলেশের কাছে শেখা। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ, স্বভাবের রসে দিব্যি টস্‌ টস্‌ করছ; যেমনি স্বভাবের ডাক শুনেছ অমনি তোমার সমস্ত রক্তমাংস সাড়া দিতে শুরু করেছে— এতদিন এরা তোমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছে সেই মায়ামন্ত্রজালে তোমাকে ধরে রাখতে পারবে কেন? তুমি যে জীবনের আগুনের তেজে শিরায় শিরায় জ্বলছ আমি কি জানি নে? তোমাকে সাধুকথার ভিজে গামছা জড়িয়ে ঠাণ্ডা রাখবে আর কতদিন?

আমি বললুম, পৃথিবীতে দুর্বল লোকের সংখ্যাই বেশি; তারা নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ঐ রকমের মন্ত্র দিন রাত পৃথিবীর কানে আউড়ে আউড়ে সবল লোকের কান খারাপ করে দিচ্ছে। স্বভাব যাদের বঞ্চিত ক'রে কাহিল ক'রে রেখেছে তারাই অন্যের স্বভাবকে কাহিল করবার পরামর্শ দেয়।

মক্ষী বললে, আমরা মেয়েরাও তো দুর্বল, দুর্বলের ষড়যন্ত্রে আমাদেরও তো যোগ দিতে হবে।

আমি হেসে বললুম, কে বললে দুর্বল? পুরুষমানুষ তোমাদের অবলা বলে স্তুতিবাদ ক'রে ক'রে তোমাদের লজ্জা দিয়ে দুর্বল করে রেখেছে। আমার বিশ্বাস তোমরাই সবল। তোমরা পুরুষের মন্ত্রে-গড়া দুর্গ ভেঙে ফেলে ভয়ংকরী হয়ে মুক্তি লাভ করবে, এ আমি লিখেপড়ে দিচ্ছি। বাইরেই পুরুষরা হাঁকডাক করে বেড়ায়, কিন্তু তাদের ভিতরটা তো দেখছ— তারা অত্যন্ত বদ্ধ জীব। আজ

পর্যন্ত তারাই তো নিজের হাতে শাস্ত্র গড়ে নিজেকে বেঁধেছে, নিজের ফুঁয়ে এবং আগুনে মেয়ে-জাতকে সোনার শিকল বানিয়ে অন্তরে বাইরে আপনাকে জড়িয়েছে। এমনি করে নিজের ফাঁদে নিজেকে বাঁধবার অদ্ভুত ক্ষমতা যদি পুরুষের না থাকত তা হলে পুরুষকে আজ ধরে রাখত কে। নিজের তৈরি ফাঁদই পুরুষের সব চেয়ে বড়ো উপাস্য দেবতা। তাকেই পুরুষ নানা রঙে রাঙিয়েছে, নানা সাজে সাজিয়েছে, নানা নামে পুজো দিয়েছে। কিন্তু মেয়েরা? তোমরাই দেহ দিয়ে মন দিয়ে পৃথিবীতে রক্তমাংসের বাস্তবকে চেয়েছ, বাস্তবকে জন্ম দিয়েছ, বাস্তবকে পালন করেছ।

মক্ষী শিক্ষিত মেয়ে, সহজে তর্ক করতে ছাড়ে না; সে বললে, তাই যদি সত্যি হত তা হলে পুরুষ কি মেয়েকে পছন্দ করতে পারত?

আমি বললুম, মেয়েরা সেই বিপদের কথা জানে; তারা জানে পুরুষজাতটা স্বভাবত ফাঁকি ভালোবাসে। সেইজন্যে তারা পুরুষের কাছ থেকেই কথা ধার করে ফাঁকি সেজে পুরুষকে ভোলাবার চেষ্টা করে। তারা জানে খাদ্যের চেয়ে মদের দিকেই স্বভাবমাতাল পুরুষজাতটার ঝোঁক বেশি, এইজন্যেই নানা কৌশলে নানা ভাবে ভঙ্গিতে তারা নিজেকে মদ বলেই চালাতে চায়; আসলে তারা যে খাদ্য সেটা যথাসাধ্য গোপন করে রাখে। মেয়েরা বস্তুতন্ত্র, তাদের কোনো মোহের উপকরণের দরকার করে না; পুরুষের জন্যেই তো যত রকম-বেরকম মোহের আয়োজন। মেয়েরা মোহিনী হয়েছে নেহাত দায়ে পড়ে।

মক্ষী বললে, তবে এ মোহ ভাঙতে চান কেন।

আমি বললুম, স্বাধীনতা চাই বলে। দেশেও স্বাধীনতা চাই, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধেও স্বাধীনতা চাই। দেশ আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেইজন্যে আমি কোনো নীতিকথার ধোঁয়ায় তাকে এতটুকু আড়াল করে দেখতে পারব না; আমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, তুমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেইজন্যে মাঝখানে কেবল কতকগুলো কথা ছড়িয়ে মানুষের কাছে মানুষকে দুর্গম দুর্বোধ করে তোলার ব্যবসায় আমি একটুও পছন্দ করি নে।

আমার মনে ছিল যে লোক ঘুমোতে ঘুমোতে চলছে তাকে হঠাৎ চমকিয়ে দেওয়া কিছু নয়। কিন্তু আমার স্বভাবটা যে দুর্দাম, ধীরে সুস্থে চলা আমার চাল নয়। জানি যে কথা সেদিন বললুম তার ভঙ্গিটা তার সুরটা বড়ো সাহসিক; জানি এরকম কথার প্রথম আঘাত কিছু দুঃসহ; কিন্তু মেয়েদের কাছে সাহসিকেরই জয়। পুরুষরা ভালোবাসে ধোঁয়াকে, আর মেয়েরা ভালোবাসে বস্তুকে; সেইজন্যেই পুরুষ পুজো করতে ছোটে তার নিজের আইডিয়ার অবতারকে, আর মেয়েরা তাদের সমস্ত অর্ঘ্য এনে হাজির করে প্রবলের পায়ের তলায়।

আমাদের কথাটা ঠিক যখন গরম হয়ে উঠতে চলেছে এমন সময় আমাদের ঘরের মধ্যে নিখিলের ছেলেবেলাকার মাস্টার চন্দ্রনাথবাবু এসে উপস্থিত। মোটের উপরে পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালোই ছিল, কিন্তু এই-সব মাস্টারমশায়দের উৎপাতে এখান থেকে বাস ওঠাতে ইচ্ছে করে। নিখিলেশের মতো মানুষ মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সংসারটাকে ইস্কুল বানিয়ে রেখে দিতে চায়। বয়স হল, তবু ইস্কুল পিছন-পিছন চলল; সংসারে প্রবেশ করলে, সেখানেও ইস্কুল এসে ঢুকল। উচিত, মরবার সময়ে ইস্কুল-মাস্টারটিকে সহমরণে টেনে নিয়ে যাওয়া। সেদিন আমাদের আলাপের মাঝখানে অসময়ে সেই মূর্তিমান ইস্কুল এসে হাজির। আমাদের সকলেরই ধাতের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছাত্র বাসা করে আছে বোধ করি। আমি যে এ-হেন দুর্বৃত্ত, আমিও কেমন থমকে গেলুম। আর আমাদের মক্ষী, তার মুখ দেখেই মনে হল সে এক মুহূর্তেই ক্লাসের সব চেয়ে ভালো ছাত্রী হয়ে একেবারে প্রথম সারে গম্ভীর হয়ে বসে গেল; তার হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল পৃথিবীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার একটা দায় আছে। এক-একটা মানুষ রেলের পয়েন্ট্‌স্‌ম্যানের মতো পথের ধারে বসে থাকে, তারা ভাবনার গাড়িকে খামকা এক লাইন থেকে আর-এক লাইনে চালান করে দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই সংকুচিত হয়ে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলেন—'মাপ করবেন, আমি'—

কথাটা শেষ করতে না-করতেই মক্ষী তাঁর পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে, আর বললে, মাস্টারমশায়, যাবেন না, আপনি বসুন। সে যেন ডুব-জলে পড়ে গেছে, মাস্টারমশায়ের আশ্রয় চায়। ভীরু! কিংবা আমি হয়তো ভুল বুঝছি। এর ভিতরে হয়তো একটা ছলনা আছে। নিজের দাম বাড়াবার ইচ্ছা। মক্ষী হয়তো আমাকে আড়ম্বর করে জানাতে চায় যে, তুমি ভাবছ তুমি আমাকে অভিভূত করে দিয়েছ, কিন্তু তোমার চেয়ে চন্দ্রনাথবাবুকে আমি ঢের বেশি শ্রদ্ধা করি।—তাই করো-না। মাস্টারমশায়দের তো শ্রদ্ধা করতেই হবে। আমি তো মাস্টারমশায় নই, আমি ফাঁকা শ্রদ্ধা চাই নে। আমি তো বলেইছি, ফাঁকিতে আমার পেট ভরবে না—আমি বস্তু চিনি।

চন্দ্রনাথবাবু স্বদেশীর কথা তুললেন। আমার ইচ্ছা ছিল তাঁকে একটানা বকে যেতে দেব, কোনো জবাব করব না। বুড়োমানুষকে কথা কইতে দেওয়া ভালো; তাতে তাদের মনে হয় তারাই বুঝি সংসারের কলে দম দিচ্ছে, বেচারারা জানতে পারে না তাদের রসনা যেখানে চলছে সংসার তার থেকে অনেক দূরে চলছে। প্রথমে খানিকটা চুপ করেই ছিলুম, কিন্তু সন্দীপচন্দ্রের ধৈর্য আছে এ বদনাম তার পরম শত্রুরাও দিতে পারবে না। চন্দ্রনাথবাবু যখন বললেন, দেখুন, আমরা কোনো দিনই চাষ করি নি, আজ এখনই হাতে হাতে ফসল পাব এমন আশা যদি করি তবে—

আমি থাকতে পারলুম না; আমি বললুম, আমরা তো ফসল চাই নে। আমরা বলি, মা ফলেষু কদাচন।

চন্দ্রনাথবাবু আশ্চর্য হয়ে গেলেন; বললেন, তবে আপনারা কী চান?

আমি বললুম, কাঁটাগাছ, যার আবাদে কোনো খরচ নেই।

মাস্টারমশায় বললেন, কাঁটাগাছ পরের রাস্তা কেবল বন্ধ করে না, নিজের রাস্তাতেও সে জঞ্জাল।

আমি বললুম, ওটা হল ইস্কুলে পড়াবার নীতিবচন। আমরা তো খড়ি হাতে বোর্ডে বচন লিখছি নে। আমাদের বুক জ্বলছে, এখন সেইটেই বড়ো কথা। এখন আমরা পরের পায়ের তেলোর কথা মনে রেখেই পথে কাঁটা দেব; তার পরে যখন নিজের পায়ে বিঁধবে তখন নাহয় ধীরে সুস্থে অনুতাপ করা যাবে। সেটা এমনিই কি বেশি? মরবার বয়স যখন হবে তখন ঠাণ্ডা হবার সময় হবে, যখন জ্বলুনির বয়স তখন ছট্‌ফট্‌ করাটাই শোভা পায়।

চন্দ্রনাথবাবু একটু হেসে বললেন, ছট্‌ফট্‌ করতে চান করুন, কিন্তু সেইটেকেই বীরত্ব কিংবা কৃতিত্ব মনে করে নিজেকে বাহবা দেবেন না। পৃথিবীতে যে জাত আপনার জাতকে বাঁচিয়েছে তারা ছট্‌ফট্‌ করে নি, তারা কাজ করেছে। কাজটাকে যারা বরাবর বাঘের মতো দেখে এসেছে তারাই আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে করে অকাজের অপথ দিয়েই তারা তাড়াতাড়ি সংসারে তরে যাবে।

খুব একটা কড়া জবাব দেবার জন্যই যখন কোমর বেঁধে দাঁড়াচ্ছি এমন সময় নিখিল এল। চন্দ্রনাথবাবু উঠে মক্ষীর দিকে চেয়ে বললেন, আমি এখন যাই মা, আমার কাজ আছে।

তিনি চলে যেতেই আমি আমার সেই ইংরিজি বইটা দেখিয়ে নিখিলকে বললুম, মক্ষীরানীকে এই বইটার কথা বলছিলুম।

পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা মানুষকে মিথ্যের দ্বারা ফাঁকি দিতে হয়, আর এই ইস্কুল-মাস্টারের চিরকেলে ছাত্রটিকে সত্যের দ্বারা ফাঁকি দেওয়াই সহজ। নিখিলকে জেনেশুনে ঠকতে দিলেই তবে ও ভালো করে ঠকে। তাই ওর সঙ্গে দেখা-বিন্তির খেলাই ভালো খেলা।

নিখিল বইটার নাম পড়ে দেখে চুপ ক'রে রইল। আমি বললুম, মানুষ নিজের এই বাসের পৃথিবীটাকে নানান কথা দিয়ে ভারি অস্পষ্ট করে তুলেছে। এই-সব লেখকেরা ঝাঁটা হাতে করে উপরকার ধুলো উড়িয়ে দিয়ে ভিতরকার বস্তুটাকে স্পষ্ট করে তোলবার কাজে লেগেছে; তাই আমি বলছিলুম, এ বইটা তোমার পড়ে দেখা ভালো।

নিখিল বললে, আমি পড়েছি।

আমি বললুম, তোমার কী বোধ হয়?

নিখিল বললে, এরকম বই নিয়ে যারা সত্য-সত্য ভাবতে চায় তাদের পক্ষে ভালো, যারা ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে বিষ।

আমি বললুম, তার অর্থটা কী?

নিখিল বললে, দেখো, আজকের দিনের সমাজে যে লোক এমন কথা বলে যে নিজের সম্পত্তিতে কোনো মানুষের একান্ত অধিকার নেই সে যদি নির্লোভ হয় তবেই তার মুখে এ কথা সাজে, আর সে যদি স্বভাবতই চোর হয় তবে কথাটা তার মুখে ঘোর মিথ্যে। প্রবৃত্তি যদি প্রবল থাকে তবে এ-সব বইয়ের ঠিক মানে পাওয়া যাবে না।

আমি বললুম, প্রবৃত্তিই তো প্রকৃতির সেই গ্যাস্‌পোস্ট যার আলোতে আমরা এ-সব রাস্তার খোঁজ পাই। প্রবৃত্তিকে যারা মিথ্যে বলে তারা চোখ উপড়ে ফেলেই দিব্যদৃষ্টি পাবার দুরাশা করে।

নিখিল বললে, প্রবৃত্তিকে আমি তখনই সত্য বলে মনে মানি যখন তার সঙ্গেসঙ্গেই নিবৃত্তিকেও সত্য বলি। চোখের ভিতরে কোনো জিনিস গুঁজে দেখতে গেলে চোখকেই নষ্ট করি, দেখতেও পাই নে। প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে সত্যকেও দেখতে পায় না।

আমি বললুম, দেখো নিখিল, ধর্মনীতির সোনাবাঁধানো চশমার ভিতর দিয়ে জীবনটাকে দেখা তোমার একটা মানসিক বাবুগিরি; এইজন্যেই কাজের সময় তুমি বাস্তবকে ঝাপসা দেখ, কোনো কাজ তুমি জোরের সঙ্গে করতে পার না।

নিখিল বললে, জোরের সঙ্গে কাজ করাটাকেই আমি কাজ করা বলি নে।

তবে?

মিথ্যা তর্ক করে কী হবে? এ-সব কথা নিয়ে নিষ্ফল বকতে গেলে এর লাবণ্য নষ্ট হয়।

আমার ইচ্ছে ছিল মক্ষী আমাদের তর্কে যোগ দেয়। সে এ পর্যন্ত একটি কথা না বলে চুপ করে বসে ছিল। আজ হয়তো আমি তার মনটাকে কিছু বেশি নাড়া দিয়েছি, তাই মনের মধ্যে দ্বিধা লেগে গেছে—ইস্কুল-মাস্টারের কাছে পাঠ বুঝে নেবার ইচ্ছে হচ্ছে।

কী জানি আজকের মাত্রাটা অতিরিক্ত বেশি হয়েছে কিনা। কিন্তু বেশ করে নাড়া দেওয়াটা দরকার। চিরকাল যেটাকে অনড় বলে মন নিশ্চিন্ত আছে, সেটা যে নড়ে এইটিই গোড়ায় জানা চাই।

নিখিলকে বললুম, তোমার সঙ্গে কথা হল ভালোই হল। আমি আর একটু হলেই এ বইটা মক্ষীরানীকে পড়তে দিচ্ছিলুম।

নিখিল বললে, তাতে ক্ষতি কী? ও বই যখন আমি পড়েছি তখন বিমলই বা পড়বে না কেন? আমার কেবল একটি কথা বুঝিয়ে বলবার আছে। আজকাল য়ুরোপ মানুষের সব জিনিসকেই বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই করছে; এমনিভাবে আলোচনা চলছে যেন মানুষ-পদার্থটা কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব কিংবা জীবতত্ত্ব, কিংবা মনস্তত্ত্ব, কিংবা বড়োজোর সমাজতত্ত্ব। কিন্তু মানুষ যে তত্ত্ব নয়, মানুষ যে সব তত্ত্বকে নিয়ে সব তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্ছে, দোহাই তোমাদের, সে কথা ভুলো না। তোমরা আমাকে বল আমি ইস্কুল-মাস্টারের ছাত্র; আমি নই, সে তোমরা—মানুষকে তোমরা সায়ান্সের মাস্টারের কাছ থেকে চিনতে চাও, তোমাদের অন্তরাত্মার কাছ থেকে নয়।

আমি বললুম, নিখিল, আজকাল তুমি এমন উত্তেজিত হয়ে আছ কেন।

সে বললে, আমি যে স্পষ্ট দেখছি তোমরা মানুষকে ছোটো করছ, অপমান করছ।

কোথায় দেখছ?

হাওয়ার মধ্যে, আমার বেদনার মধ্যে। মানুষের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বড়ো, যিনি তাপস, যিনি সুন্দর, তাঁকে তোমরা কাঁদিয়ে মারতে চাও!

একি তোমার পাগলামির কথা!

নিখিল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দেখো সন্দীপ, মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে, তাই আমি সব সইতে প্রস্তুত হয়েছি, জেনেশুনে, বুঝেসুঝে।

এই কথা বলেই সে ঘরের থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে তার এই কাণ্ড দেখছি, এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দেখি টেবিলের উপর থেকে দুটো-তিনটে বই মেঝের উপর পড়ল আর মক্ষীরানী ত্রস্তপদে আমার থেকে যেন একটু দূর দিয়ে চলে গেল।

অদ্ভুত মানুষ ঐ নিখিলেশ। ও বেশ বুঝেছে ওর ঘরের মধ্যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, কিন্তু তবু আমাকে ঘাড় ধরে বিদেয় করে দেয় না কেন। আমি জানি, ও অপেক্ষা করে আছে বিমল কী করে। বিমল যদি ওকে বলে 'তোমার সঙ্গে আমার জোড় মেলে নি' তবেই ও মাথা হেঁট করে মৃদুস্বরে বলবে, তা হলে দেখছি ভুল হয়ে গেছে। ভুলকে ভুল বলে মানলেই সব চেয়ে বড়ো ভুল করা হয়, এ কথা বোঝবার জোর ওর নেই। আইডিয়ায় মানুষকে যে কত কাহিল করে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হল নিখিল। ওরকম পুরুষমানুষ আর দ্বিতীয় দেখি নি; ও নিতান্তই প্রকৃতির একটা খেয়াল। ওকে নিয়ে একটা ভদ্র রকমের গল্প কি নাটক গড়াও চলে না, ঘর করা তো দূরের কথা।

তার পরে মক্ষী, বেশ বোধ হচ্ছে আজকে ওর ঘোর ভেঙে গেছে। ও যে কোন্‌ স্রোতে ভেসেছে হঠাৎ আজ সেটা বুঝতে পেরেছে। এখন ওকে জেনেশুনে হয় ফিরতে হবে নয় এগোতে হবে। তা নয়, এখন থেকে ও একবার এগোবে, একবার পিছবে। তাতে আমার ভাবনা নেই। কাপড়ে যখন আগুন লাগে তখন ভয়ে যতই ছুটোছুটি করে আগুন ততই বেশি করে জ্বলে ওঠে। ভয়ের ধাক্কাতেই ওর হৃদয়ের বেগ আরো বেশি করে বেড়ে উঠবে। আরো তো এমন দেখেছি। সেই তো বিধবা কুসুম ভয়েতে কাঁপতে কাঁপতেই আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছিল। আর, আমাদের হস্টেলের কাছে যে ফিরিঙ্গি মেয়ে ছিল সে আমার উপরে রাগ করলে এক-একদিন মনে হত সে আমাকে রেগে যেন ছিঁড়ে ফেলে দেবে। সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে যেদিন সে চীৎকার করে 'যাও যাও' বলে আমাকে ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিলে, তার পরে যেমনি আমি চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়েছি অমনি সে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ওদের আমি খুব জানি—রাগ বল, ভয় বল, লজ্জা বল, ঘৃণা বল, এ-সমস্তই জ্বালানি কাঠের মতো ওদের হৃদয়ের আগুনকে বাড়িয়ে তুলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে জিনিস এ আগুনকে সামলাতে পারে সে হচ্ছে আইডিয়াল। মেয়েদের সে বালাই নেই। ওরা পুণ্যি করে, তীর্থ করে, গুরুঠাকুরের পায়ের কাছে গড় হয়ে পড়ে প্রণাম করে—আমরা যেমন করে আপিস করি—কিন্তু আইডিয়ার ধার দিয়ে যায় না।

আমি নিজের মুখে ওকে বেশি কিছু বলব না, এখনকার কালের কতকগুলো ইংরেজি বই ওকে পড়তে দেব। ও ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারুক যে প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডার্ন। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা মডার্ন নয়। 'মডার্ন' এই কথাটার যদি আশ্রয় পায় তা হলেই ও জোর পাবে; কেননা ওদের তীর্থ চাই, গুরুঠাকুর চাই, বাঁধা সংস্কার চাই, শুধু আইডিয়া ওদের কাছে ফাঁকা।

যাই হোক, এ নাট্যটা পঞ্চম অঙ্ক পর্যন্ত দেখা যাক। এ কথা জাঁক করে বলতে পারব না আমি কেবলমাত্র দর্শক, উপরের তলায় রয়াল সীটে বসে মাঝে মাঝে কেবল হাততালি দিচ্ছি। বুকের ভিতরে টান পড়ছে, থেকে থেকে শিরগুলো ব্যথিয়ে উঠছে। রাত্রে বাতি নিবিয়ে বিছানায় যখন শুই তখন এতটুকু ছোঁয়া, এতটুকু চাওয়া, এতটুকু কথা অন্ধকার ভর্তি করে কেবলই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনের ভিতরটায় একটা পুলক ঝিলমিল করতে থাকে, মনে হয় যেন রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে একটা সুরের ধারা বইছে!

এই টেবিলের উপরকার ফোটো-স্ট্যান্ডে নিখিলের ছবির পাশে মক্ষীর ছবি ছিল। আমি সে ছবিটি খুলে নিয়েছিলুম। কাল মক্ষীকে সেই ফাঁকটা দেখিয়ে বললুম, কৃপণের কৃপণতার দোষেই চুরি হয়, অতএব এই চুরির পাপটা কৃপণে চোরে ভাগাভাগি করে নেওয়াই উচিত। কী বলেন?

মক্ষী একটু হাসলে; বললে, ও ছবিটা তো তেমন ভালো ছিল না।

আমি বললুম, কী করা যাবে? ছবি তো কোনোমতেই ছবির চেয়ে ভালো হয় না। ও যা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকব।

মক্ষী একখানা বই খুলে তার পাতা ওল্টাতে লাগল। আমি বললুম, আপনি যদি রাগ করেন আমি ওর ফাঁকটা কোনোরকম করে ভরিয়ে দেব।

আজ ফাঁকটা ভরিয়েছি। আমার এ ছবিটা অল্প বয়সের; তখনকার মুখটা কাঁচা-কাঁচা, মনটাও সেইরকম ছিল। তখনো ইহকাল-পরকালের অনেক জিনিস বিশ্বাস করতুম। বিশ্বাসে ঠকায় বটে, কিন্তু ওর একটা মস্ত গুণ এই—ওতে মনের উপর একটা লাবণ্য দেয়।

নিখিলের ছবির পাশে আমার ছবি রইল, আমরা দুই বন্ধু।

নিখিলেশের আত্মকথা

আগে কোনোদিন নিজের কথা ভাবি নি। এখন প্রায় মাঝে-মাঝে নিজেকে বাইরে থেকে দেখি। বিমল আমাকে কেমন চোখে দেখে সেইটে আমি দেখবার চেষ্টা করি। বড়ো গম্ভীর, সব জিনিসকে বড়ো বেশি গুরুতর করে দেখা আমার অভ্যাস।

আর-কিছু না, জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো। তাই করেই তো চলছে। সমস্ত জগতে আজ যত দুঃখ ঘরে বাইরে ছড়িয়ে আছে তাকে তো আমরা মনে মনে ছায়ার মতো মায়ার মতো উড়িয়ে দিয়ে তবেই অনায়াসে নাচ্ছি খাচ্ছি; তাকে যদি এক মুহূর্ত সত্য বলে ধরে রেখে দেখতে পারতুম তা হলে কি মুখে অন্ন রুচত না চোখে ঘুম থাকত?

কেবল নিজেকেই সেই-সমস্ত উড়ে-যাওয়া ভেসে-যাওয়ার দলে দেখতে পারি নে। মনে করি কেবল আমারই দুঃখ জগতের বুকে অনন্তকালের বোঝা হয়ে হয়ে জমে উঠছে। তাই এত গম্ভীর, তাই নিজের দিকে তাকালে দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়।

ওরে হতভাগা, একবার জগতের সদরে দাঁড়িয়ে সমস্তর সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখ্-না। সেখানে যুগযুগান্তের মহামেলায় লক্ষকোটি লোকের ভিড়ে বিমল তোমার কে। সে তোমার স্ত্রী! কাকে বল তোমার স্ত্রী? ঐ শব্দটাকে নিজের ফুঁয়ে ফুলিয়ে তুলে দিন রাত্রি সামলে বেড়াচ্ছ, জানো বাইরে থেকে একটা পিন ফুটলেই এক মুহূর্তে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সমস্তটা চুপসে যাবে।

আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই! ও যদি বলতে চায় 'না আমি আমিই' তখনি আমি বলব, সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী! স্ত্রী! ওটা কি একটা যুক্তি। ওটা কি একটা সত্য। ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায়?

স্ত্রী! এই কথাটিকে যে আমার জীবনের যা-কিছু মধুর যা-কিছু পবিত্র সব দিয়ে বুকের মধ্যে মানুষ করেছি, একদিনও ওকে ধুলোর উপর নামাই নি। ঐ নামে কত পুজার ধুপ, কত সাহানার বাঁশি, কত বসন্তের বকুল, কত শরতের শেফালি! ও যদি কাগজের খেলার নৌকার মতো আজ হঠাৎ নর্দমার ঘোলা জলে ডুবে যায় তা হলে সেইসঙ্গে আমার—

ঐ দেখো, আমার গাম্ভীর্য! কাকে বলছ নর্দমা, কাকে বলছ ঘোলা জল? ও-সব হল রাগের কথা। তুমি রাগ করবে বলেই জগতে এক জিনিস আর হবে না। বিমল যদি তোমার না হয় তো সে তোমার নয়ই, যতই চাপাচাপি রাগারাগি করবে ততই ঐ কথাটাই আরো বড়ো করে প্রমাণ হবে।

বুক ফেটে যায় যে! তা যাক। তাতে বিশ্ব দেউলে হবে না, এমন-কি তুমিও দেউলে হবে না। জীবনে মানুষ যা-কিছু হারায় তার সকলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশি বড়ো; সমস্ত কান্নার সমুদ্র পেরিয়েও তার পার আছে; এইজন্যেই সে কাঁদে, নইলে কাঁদতও না।

কিন্তু সমাজের দিক থেকে— সে-সব কথা সমাজ ভাবুক গে, যা করতে হয় করুক। আমি কাঁদছি আমার আপন কান্না, সমাজের কান্না নয়। বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তা হলে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে থাক্‌, আমি বিদায় হলুম।

দুঃখ তো আছেই। কিন্তু একটা দুঃখ বড়ো মিথ্যে হবে, সেটা থেকে নিজেকে যে করে পারি বাঁচাবই। কাপুরুষের মতো এ কথা মনে করতে পারব না যে, অনাদরে আমার জীবনের দাম কমে গেল। আমার জীবনের মূল্য আছে; সেই মূল্য দিয়ে আমি কেবল আমার ঘরের অন্তঃপুরটুকু কিনে রাখবার জন্যে আসি নি। আমার যা বড়ো ব্যাবসা সে কিছুতেই দেউলে হবে না, আজ এই কথাটা খুব সত্য করে ভাববার দিন এসেছে।

আজ যেমন নিজেকে তেমনি বিমলকেও সম্পূর্ণ বাইরে থেকে দেখতে হবে। এতদিন আমি আমার মনের কতকগুলি দামি আইডিয়াল দিয়ে বিমলকে সাজিয়েছিলুম। আমার সেই মানসী মূর্তির সঙ্গে সংসারে বিমলের সব জায়গায় যে মিল ছিল তা নয়, কিন্তু তবুও আমি তাকে পুজো করে এসেছি আমার মানসীর মধ্যে।

সেটা আমার গুণ নয়, সেইটেই আমার মহদ্দোষ। আমি লোভী; আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম, বাইরের বিমল তার উপলক্ষ হয়ে পড়েছিল। বিমল যা সে তাইই; তাকে যে আমার খাতিরে তিলোত্তমা হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বকর্মা আমারই ফরমাশ খাটছেন না কি?

তা হলে আজ একবার আমাকে সমস্ত পরিষ্কার করে দেখে নিতে হবে; মায়ার রঙে যে-সব চিত্রবিচিত্র করেছি সে আজ খুব শক্ত করে মুছে ফেলব। এতদিন অনেক জিনিস আমি দেখেও দেখি নি। আজ এ কথা স্পষ্ট বুঝেছি, বিমলের জীবনে আমি আকস্মিক মাত্র; বিমলের সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিলতে পারে সে হচ্ছে সন্দীপ। এইটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কেননা, আজ আমার নিজের কাছেও নিজের বিনয় করবার দিন নেই। সন্দীপের মধ্যে অনেক গুণ আছে যা লোভনীয়, সেই গুণে আমাকেও এতদিন সে আকর্ষণ করে এসেছে, কিন্তু খুব কম করেও যদি বলি তবু এ কথা আজ নিজের কাছে বলতে হবে যে মোটের উপর সে আমার চেয়ে বড়ো নয়। স্বয়ংবরসভায় আজ আমার গলায় যদি মালা না পড়ে, যদি মালা সন্দীপই পায়, তবে এই উপেক্ষায় দেবতা তাঁরই বিচার করলেন যিনি মালা দিলেন, আমার নয়। আজ আমার এ কথা অহংকার করে বলা নয়। আজ নিজের মূল্যকে নিজের মধ্যে যদি একান্ত সত্য করে না জানি ও না স্বীকার করি, আজকেকার এই আঘাতকে যদি আমার এই মানবজন্মের চরম অপমান বলেই মেনে নিতে হয়, তা হলে আমি আবর্জনার মতো সংসারের আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়ব; আমার দ্বারা আর কোনো কাজই হবে না।

অতএব আজ সমস্ত অসহ্য দুঃখের ভিতর দিয়েও আমার মনের মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ জাগুক। চেনাশোনা হল; বাহিরকেও বুঝলুম, অন্তরকেও বুঝলুম। সমস্ত লাভ-লোকসান মিটিয়ে যা বাকি রইল তাই আমি। সে তো পঙ্গু-আমি নয়, দরিদ্র-আমি নয়, সে অন্তঃপুরের রোগীর পথ্যে মানুষ করা রোগা আমি নয়; সে বিধাতার শক্ত হাতের তৈরি আমি। যা তার হবার তা হয়ে গেছে, আর তার কিছুতে মার নেই।

এইমাত্র মাস্টারমশায় আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে বললেন, নিখিল, শুতে যাও, রাত একটা হয়ে গেছে।

অনেক রাত্রে বিমল খুব গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে না পড়লে আমার পক্ষে শুতে যাওয়া ভারি কঠিন

হয়। দিনের বেলা তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তাও চলে, কিন্তু বিছানার মধ্যে একলা রাতের নিস্তব্ধতায় তার সঙ্গে কী কথা বলব? আমার সমস্ত দেহমন লজ্জিত হয়ে ওঠে।

আমি মাস্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি এখনো ঘুমোন নি কেন।

তিনি একটু হেসে বললেন, আমার এখন ঘুমোবার বয়স গেছে, এখন জেগে থাকবার বয়স।

এই পর্যন্ত লেখা হয়ে শুতে যাব-যাব করছি এমন সময়ে আমার জানলার সামনের আকাশে শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ একটা জায়গায় ছিন্ন হয়ে গেল, আর তারই মধ্যে থেকে একটি বড়ো তারা জ্বল জ্বল করে উঠল। আমার মনে হল আমাকে সে বললে কত সম্বন্ধ ভাঙছে গড়ছে স্বপ্নের মতো, কিন্তু আমি ঠিক আছি; আমি বাসরঘরের চিরপ্রদীপের শিখা, আমি মিলনরাত্রির চিরচুম্বন।

সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত বুক ভরে উঠে মনে হল, এই বিশ্ববস্তুর পর্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখলুম —কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয় অস্পষ্ট আয়না। যখনই বলি 'আয়নাটা আমারই করে নিই' 'বাক্সর ভিতর ভরে রাখি' তখনই ছবি সরে যায়। থাক্-না, আমার আয়নাতেই বা কী, আর ছবিতেই বা কী! প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখছে।

একটা শয়তান অন্ধকারের কোণে দাঁড়িয়ে বলছে, এ-সব তোমার ছেলে-ভোলানো কথা! তা হোক-না, ছেলেকে তো ভোলাতেই হবে! লক্ষ ছেলে, কোটি ছেলে, ছেলের পর ছেলে—কত ছেলের কত কান্না। এত ছেলেকে কি মিথ্যে দিয়ে ভোলানো চলে? আমার প্রেয়সী আমাকে ঠকাবে না—সে সত্য, সে সত্য—এইজন্যে বারে বারে তাকে দেখলুম, বারে বারে তাকে দেখব; ভুলের ভিতর দিয়েও তাকে দেখেছি, চোখের জলের ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়েও তাকে দেখা গেল। জীবনের হাটের ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখেছি, হারিয়েছি, আবার দেখেছি, মরণের ফুকোরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েও তাকে দেখব। ওগো নিষ্ঠুর, আর পরিহাস কোরো না। যে পথে তোমার পায়ের চিহ্ন পড়েছে, যে বাতাসে তোমার এলো চুলের গন্ধ ভরে আছে, এবার যদি তার ঠিকানা ভুল করে থাকি তবে সেই ভুলে আমাকে চিরদিন কাঁদিয়ো না। ঐ ঘোমটা-খোলা তারা আমাকে বলছে, না, না, ভয় নেই, যা চিরদিন থাকবার তা চিরদিনই আছে।

এইবার দেখে আসি আমার বিমলকে, সে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে আছে। তাকে না জাগিয়ে তার ললাটে একটি চুম্বন রেখে দিই। সেই চুম্বন আমার পূজার নৈবেদ্য। আমার বিশ্বাস মৃত্যুর পরে আর সবই ভুলব, সব ভুল, সব কান্না, কিন্তু এই চুম্বনের স্মৃতির স্পন্দন কোনো একটা জায়গায় থেকে যাবে—কেননা, জন্মের পর জন্মে এই চুম্বনের মালা যে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে সেই প্রেয়সীর গলায় পরানো হবে বলে।

এমন সময়ে আমার ঘরের মধ্যে আমার মেজো ভাজ এসে ঢুকলেন। তখন আমাদের পাহারার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজল।

ঠাকুরপো, তুমি করছ কী? লক্ষ্মী ভাই, শুতে যাও—তুমি নিজেকে এমন করে দুঃখ দিয়ো না। তোমার চেহারা যা হয়ে গেছে সে আমি চোখে দেখতে পারি নে।

এই বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

আমি একটি কথাও না বলে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে শুতে গেলুম।

বিমলার আত্মকথা

গোড়ায় কিছুই সন্দেহ করি নি, ভয় করি নি; আমি জানতুম দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করছি। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে কী প্রচণ্ড উল্লাস! নিজের সর্বনাশ করাই নিজের সব চেয়ে আনন্দ এই কথা সেদিন প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম।

জানি নে, হয়তো এমনি করেই একটা অস্পষ্ট আবেগের ভিতর দিয়ে এই নেশাটা একদিন আপনিই কেটে যেত। কিন্তু সন্দীপবাবু যে থাকতে পারলেন না, তিনি যে নিজেকে স্পষ্ট করে তুললেন। তাঁর কথার সুর যেন স্পর্শ হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়, তাঁর চোখের চাহনি যেন ভিক্ষা হয়ে আমার পায়ে ধরে। অথচ তার মধ্যে এমন একটা ভয়ংকর ইচ্ছার জোর, যেন সে নিষ্ঠুর ডাকাতের মতো আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়।

আমি সত্য কথা বলব, এই দুর্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়মূর্তি দিন রাত আমার মনকে টেনেছে। মনে হতে লাগল বড়ো মনোহর নিজেকে একেবারে ছারখার করে দেওয়া। তাতে কত লজ্জা, কত ভয়, কিন্তু বড়ো তীব্র মধুর সে।

আর, কৌতূহলের অন্ত নেই— যে মানুষকে ভালো করে জানি নে, যে মানুষকে নিশ্চয় করে পাব না, যে মানুষের ক্ষমতা প্রবল, যে মানুষের যৌবন সহস্রশিখায় জ্বলছে, তার ক্ষুব্ধ কামনার রহস্য— সে কী প্রচণ্ড, কী বিপুল! এ তো কখনো কল্পনাও করতে পারি নি। যে সমুদ্র বহু দূরে ছিল, পড়া বইয়ের পাতায় যার নাম শুনেছি মাত্র, এক ক্ষুধিত বন্যায় মাঝখানের সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে, যেখানে খিড়কির ঘাটে আমি বাসন মাজি, জল তুলি, সেইখানে আমার পায়ের কাছে ফেনা এলিয়ে দিয়ে তার অসীমতা নিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল।

আমি গোড়ায় সন্দীপবাবুকে ভক্তি করতে আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু সে ভক্তি গেল ভেসে। তাঁকে শ্রদ্ধাও করি নে, এমন-কি তাঁকে অশ্রদ্ধাই করি। আমি খুব স্পষ্ট করেই বুঝেছি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। এও আমি, প্রথমে না হোক ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছি যে, সন্দীপের মধ্যে যে জিনিসটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয় সেটা চাঞ্চল্য মাত্র।

তবু আমার এই রক্তে-মাংসে এই ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওঁরই হাতে বাজতে লাগল। সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা করতে চাই এবং এই বীণাটাকে— কিন্তু, বীণা তো বাজল! আর, সেই সুরে যখন আমার দিন রাত্রি ভরে উঠল তখন আমার আর দয়ামায়া রইল না। এই সুরের রসাতলে তুমিও মজো, আর তোমার যা-কিছু আছে সব মজিয়ে দাও, এই কথা আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন আমার রক্তের প্রত্যেক ঢেউ আমাকে বলতে লাগল।

এ কথা আর বুঝতে বাকি নেই যে আমার মধ্যে একটা-কিছু আছে যেটা— কী বলব? যার জন্যে মনে হয় আমার মরে যাওয়াই ভালো।

মাস্টারমশায় যখন একটু ফাঁক পান আমার কাছে এসে বসেন। তাঁর একটা শক্তি আছে তিনি মনটাকে এমন একটা শিখরের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন যেখান থেকে নিজের জীবনের পরিধিটাকে এক মুহূর্তেই বড়ো করে দেখতে পাই— বরাবর যেটাকে সীমা বলে মনে করে এসেছি তখন দেখি সেটা সীমা নয়।

কিন্তু, কী হবে! আমি অমন করে দেখতেই চাই নে। যে নেশায় আমাকে পেয়েছে সেই নেশাটা ছেড়ে যাক এমন ইচ্ছাও যে আমি সত্য করে করতে পারি নে। সংসারের দুঃখ ঘটুক, আমার মধ্যে আমার সত্য পলে পলে কালো হয়ে মরুক, কিন্তু আমার এই নেশা চিরকাল টিঁকে থাক্‌ এই ইচ্ছা যে কিছুতেই ছাড়াতে পারছি নে। আমার ননদ মুনুর স্বামী যখন মদ খেয়ে মুনুকে মারত, তার পরে মেরে অনুতাপে হাউ হাউ করে কাঁদত, শপথ করে বলত 'আর কখনও মদ ছোঁব না', আবার তার পরদিন সন্ধ্যাবেলাতেই মদ নিয়ে বসত— দেখে আমার সর্বাঙ্গ রাগে ঘৃণায় জ্বলত। আজকে দেখি আমার মদ খাওয়া যে তার চেয়ে ভয়ানক— এ মদ কিনে আনতে হয় না, গ্লাসে ঢালতে হয় না—

রক্তের ভিতর থেকে আপনা-আপনি তৈরি হয়ে উঠছে। কী করি! এমনি করেই কি জীবন কাটবে?

এক-একবার চমকে উঠে আপনার দিকে তাকাই আর ভাবি আমি আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন, এক সময়ে হঠাৎ দেখতে পাব এ-আমি সত্য নয়। এ যে ভয়ানক অসংলগ্ন, এর যে আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নেই, এ যে মায়া-জাদুকরের মতো কালো কলঙ্ককে ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে রঙিন করে তুলেছে। এ যে কী হল, কেমন করে হল কিছুই বুঝতে পারছি নে।

একদিন আমার মেজো জা এসে হেসে বললেন, আমাদের ছোটোরানীর গুণ আছে। অতিথিকে এত যত্ন, সে যে ঘর ছেড়ে এক তিল নড়তে চায় না। আমাদের সময়েও অতিথিশালা ছিল, কিন্তু অতিথির এত বেশি আদর ছিল না; তখন একটা দস্তুর ছিল, স্বামীদেরও যত্ন করতে হত। বেচারা ঠাকুরপো একাল ঘেঁষে জন্মেছে বলেই ফাঁকিতে পড়ে গেছে। ওর উচিত ছিল অতিথি হয়ে এ বাড়িতে আসা, তা হলে কিছুকাল টিঁকতে পারত— এখন বড়ো সন্দেহ। ছোটো রাক্ষুসী, একবার কি তাকিয়ে দেখতেও নেই ওর মুখের ছিরি কিরকম হয়ে গেছে!

এ-সব কথা একদিন আমার মনে লাগতই না, তখন ভাবতুম আমি যে ব্রত নিয়েছি এরা তার মানেই বুঝতে পারে না। তখন আমার চারি দিকে একটা ভাবের আবরু ছিল; তখন ভেবেছিলুম, আমি দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছি, আমার লজ্জা-শরমের দরকার নেই।

কিছুদিন থেকে দেশের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এখনকার আলোচনা, মডার্ন কালের স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ এবং অন্য হাজার রকমের কথা। তারই ভিতরে ভিতরে ইংরেজি কবিতা এবং বৈষ্ণব কবিতার আমদানি; সেই-সমস্ত কবিতার মধ্যে এমন একটা সুর লাগানো চলছে যেটা হচ্ছে খুব মোটা তারের সুর। এই সুরের স্বাদ আমার ঘরে আমি এতদিন পাই নি; আমার মনে হতে লাগল, এইটেই পৌরুষের সুর, প্রবলের সুর।

কিন্তু আজ আর কোনো আড়াল রইল না। কেন যে সন্দীপবাবু দিনের পর দিন বিনা কারণে এমন করে কাটাচ্ছেন, কেনই যে আমি যখন-তখন তাঁর সঙ্গে বিনা প্রয়োজনের আলাপ-আলোচনা করছি, আজ তার কিছুই জবাব দেবার নেই।

তাই আমি সেদিন নিজের উপর, আমার মেজো জায়ের উপর, সমস্ত জগতের ব্যবস্থার উপর খুব রাগ করে বললুম, না, আমি আর বাইরের ঘরে যাব না, মরে গেলেও না।

দু দিন বাইরে গেলুম না। সেই দু দিন প্রথম পরিষ্কার করে বুঝলুম কত দূরে গিয়ে পেঁচেছি। মনে হল যেন একেবারে জীবনের স্বাদ চলে গেছে। যেন সমস্তই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঠেলে ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। মনে হল কার জন্যে যেন আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে আছে, যেন সমস্ত গায়ের রক্ত বাইরের দিকে কান পেতে রয়েছে।

খুব বেশি করে কাজ করবার চেষ্টা করলুম। আমার শোবার ঘরের মেজে যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল, তবু নিজে দাঁড়িয়ে ঘড়া-ঘড়া জল ঢালিয়ে সাফ করালুম। আলমারির ভিতর জিনিসপত্র এক ভাবে সাজানো ছিল, সে-সমস্ত বের করে ঝেড়ে-ঝুড়ে বিনা প্রয়োজনে অন্য রকম করে সাজালুম। সেদিন নাইতে আমার বেলা দুটো হয়ে গেল। সেদিন বিকেলে চুল বাঁধা হল না, কোনোমতে এলো চুলটা পাকিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ভাঁড়ার-ঘরটা গোছাবার কাজে লোকজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা গেল। দেখি ইতিমধ্যে ভাঁড়ারে চুরি অনেক হয়ে গেছে; তা নিয়ে কাউকে বকতে সাহস হল না, পাছে এ কথা কেউ মনে মনেও জবাব করে 'এতদিন তোমার চোখ দুটো ছিল কোথা'।

সেদিন ভুতে পাওয়ার মতো এইরকম গোলমাল করে কাটল। তার পরদিনে বই পড়বার চেষ্টা করলুম। কী পড়লুম কিছুই মনে নেই, কিন্তু এক-একবার দেখি ভুলে অন্যমনস্ক হয়ে বই-হাতে ঘুরতে ঘুরতে অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার রাস্তার জানলার একটা খড়খড়ি খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। সেইখান থেকে আঙিনার উত্তর দিকে আমাদের বাইরের এক-সার ঘর দেখা যায়। তার মধ্যে একটা ঘর মনে হল আমার জীবন-সমুদ্রের ও পারে চলে গিয়েছে। সেখানে আর খেয়া

বইবে না। চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি! নিজেকে মনে হল আমি যেন পরশুদিনকার আমির ভূতের মতো, সেই-সব জায়গাতেই আছি তবুও নেই।

এক সময় দেখতে পেলুম— সন্দীপ একখানা খবরের কাগজ হাতে করে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। স্পষ্ট দেখতে পেলুম তাঁর মুখের ভাবে বিষম চাঞ্চল্য। এক-একবার মনে হতে লাগল যেন উঠোনটার উপর, বারান্দার রেলিংগুলোর উপর রেগে রেগে উঠছেন। খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। যদি পারতেন তো খানিকটা আকাশ যেন ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। প্রতিজ্ঞা আর থাকে না। যেই আমি বৈঠকখানার দিকে যাব মনে করছি এমন সময় হঠাৎ দেখি পিছনে আমার মেজো জা দাঁড়িয়ে।

ওলো, অবাক করলি যে!— এই কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। আমার বাইরে যাওয়া হল না।

পরের দিন সকালে গোবিন্দর মা এসে বললে, ছোটোরানীমা ভাঁড়ার দেবার বেলা হল।

আমি বললুম, হরিমতিকে বের করে নিতে বল্। এই বলে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে জানলার কাছে বসে বিলিতি সেলাইয়ের কাজ করতে লাগলুম। এমন সময়ে বেহারা এসে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললে, সন্দীপবাবু দিলেন।— সাহসের আর অন্ত নেই! বেহারাটা কী মনে করলে! বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল— চিঠি খুলে দেখি তাতে কোনো সম্ভাষণ নেই, কেবল এই কটি কথা আছে, 'বিশেষ প্রয়োজন। দেশের কাজ। সন্দীপ।'

রইল আমার সেলাই পড়ে। তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটুখানি চুল ঠিক করে নিলুম। শাড়িটা যেমন ছিল তাই রইল, জ্যাকেট একটা বদল করলুম। আমি জানি তাঁর চোখে এই জ্যাকেটটির সঙ্গে আমার একটি বিশেষ পরিচয় জড়িত আছে।

আমাকে যে বারান্দা দিয়ে বাইরে যেতে হবে তখন সেই বারান্দায় বসে আমার মেজো জা তাঁর নিয়মমত সুপুরি কাটছেন। আজ আমি কিছুই সংকোচ করলুম না। মেজো জা জিজ্ঞাসা করলেন, বলি চলেছ কোথায়?

আমি বললুম, বৈঠকখানাঘরে।

এত সকালে? গোষ্ঠলীলা বুঝি?

আমি কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলুম। মেজো জা গান ধরলেন—

> রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে।
> অগাধ জলের মকর যেমন,
> ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই!

বৈঠকখানাঘরে গিয়ে দেখি, সন্দীপ দরজার দিকে পিঠ করে ব্রিটিশ অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত ছবির তালিকার একখানা বই নিয়ে মন দিয়ে দেখছেন। আর্ট সম্বন্ধে সন্দীপ নিজেকে বিচক্ষণ বলেই জানেন। একদিন আমার স্বামী তাঁকে বললেন যে, আর্টিস্টদের যদি গুরুমশায়ের দরকার হয় তবে তুমি বেঁচে থাকতে যোগ্য লোকের অভাব হবে না।

এমন করে খোঁচা দিয়ে কথা বলা আমার স্বামীর স্বভাব নয়, কিন্তু আজকাল তাঁর মেজাজ একটু বদলে এসেছে; সন্দীপের অহংকারে তিনি ঘা দিতে পারলে ছাড়েন না।

সন্দীপ বললেন, তুমি কি ভাব, আর্টিস্টদের আর গুরুকরণ দরকার নেই?

স্বামী বললেন, আর্ট সম্বন্ধে আর্টিস্টদের কাছ থেকেই আমাদের মতো মানুষকে চিরকাল নতুন নতুন পাঠ নিয়ে চলতে হবে, কেননা এর কোনো একটিমাত্র বাঁধা পাঠ নেই।

সন্দীপ আমার স্বামীর বিনয়কে বিদ্রূপ করে খুব হাসলেন; বললেন, নিখিল, তুমি ভাব দৈন্যটাই হচ্ছে মূলধন, ওটাকে যত খাটাবে ঐশ্বর্য ততই বাড়বে। আমি বলছি, অহংকার যার নেই সে স্রোতের শ্যাওলা, চারি দিকে কেবল ভেসে ভেসে বেড়ায়।

আমার মনের ভাব ছিল অদ্ভুত রকম। এক দিকে ইচ্ছেটা তর্কে আমার স্বামীর জিত হয়,

সন্দীপের অহংকারটা একটু কমে, অথচ সন্দীপের অসংকোচ অহংকারটাই আমাকে টানে—সে যেন দামি হীরের ঝকঝকানি, কিছুতেই তাকে লজ্জা দেবার জো নেই; এমন-কি সূর্যের কাছেও সে হার মানতে চায় না, বরঞ্চ তার স্পর্ধা আরো বেড়ে যায়।

আমি ঘরে ঢুকলুম। জানি আমার পায়ের শব্দ সন্দীপ শুনতে পেলেন, কিন্তু যেন শোনেন নি এমনি ভান করে বইটা দেখতেই লাগলেন। আমার ভয়, পাছে আর্টের কথা পেড়ে বসেন। কেননা, আর্টের ছুতো করে সন্দীপ আমার সামনে যে-সব ছবির যে-সব কথার আলোচনা করতে ভালোবাসেন আজও আমার তাতে লজ্জা বোধ করার অভ্যাস ঘোচে নি। লজ্জা লুকোবার জন্যেই আমাকে দেখাতে হত যেন এর মধ্যে লজ্জার কিছুই নেই!

তাই একবার মুহূর্তকালের জন্য ভাবছিলুম ফিরে চলে যাই, এমন সময়ে খুব একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুখ তুলে সন্দীপ আমাকে দেখে যেন চমকে উঠলেন। বললেন, এই-যে আপনি এসেছেন!

কথাটার মধ্যে, কথার সুরে, তাঁর দুই চোখে, একটা চাপা ভর্ৎসনা। আমার এমন দশা যে, এই ভর্ৎসনাকেও মেনে নিলুম। আমার উপর সন্দীপের যে দাবি জন্মেছে তাতে আমার দু-তিন দিনের অনুপস্থিতিও যেন অপরাধ। সন্দীপের এই অভিমান যে আমার প্রতি অপমান সে আমি জানি, কিন্তু রাগ করবার শক্তি কই!

কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলুম। যদিও আমি অন্য দিকে চেয়েছিলুম তবু বেশ বুঝতে পারছিলুম সন্দীপের দুই চক্ষের নালিশ আমার মুখের সামনে যেন ধন্না দিয়ে পড়েই ছিল, সে আর নড়তে চাচ্ছিল না। এ কী কাণ্ড! সন্দীপ কোনো-একটা কথা তুললে সেই কথার আড়ালে একটু লুকিয়ে বাঁচি যে। বোধ হয় পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট যখন এমনি করে লজ্জা অসহ্য হয়ে এল তখন আমি বললুম, আপনি কী দরকারে আমাকে ডেকেছিলেন?

সন্দীপ ঈষৎ চমকে উঠে বললেন, কেন, দরকার কি থাকতেই হবে? বন্ধুত্ব কি অপরাধ? পৃথিবীতে যা সব চেয়ে বড়ো তার এতই অনাদর? হৃদয়ের পূজাকে কি পথের কুকুরের মতো দরজার বাইরে থেকে খেদিয়ে দিতে হবে মক্ষীরানী?

আমার বুকের মধ্যে দুরদুর করতে লাগল। বিপদ ক্রমশই কাছে ঘনিয়ে আসছে, আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমার মনের মধ্যে পুলক আর ভয় দুইই সমান হয়ে উঠল। এই সর্বনাশের বোঝা আমি আমার পিঠ দিয়ে সামলাব কী করে? আমাকে যে পথের ধুলোর উপর মুখ থুবড়ে পড়তে হবে!

আমার হাত পা কাঁপছিল। আমি খুব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললুম, সন্দীপবাবু, আপনি দেশের কী কাজ আছে বলে আমাকে ডেকেছেন, তাই আমার ঘরের কাজ ফেলে এসেছি।

তিনি একটু হেসে বললেন, আমি তো সেই কথাই আপনাকে বলছিলুম। আমি যে পূজার জন্যেই এসেছি তা জানেন? আপনার মধ্যে আমি আমার দেশের শক্তিকেই প্রত্যক্ষ দেখতে পাই সে কথা কি আপনাকে বলি নি? ভূগোলবিবরণ তো একটা সত্য বস্তু নয়; শুধু সেই ম্যাপটার কথা স্মরণ করে কি কেউ জীবন দিতে পারে? যখন আপনাকে সামনে দেখতে পাই তখনই তো বুঝতে পারি, দেশ কত সুন্দর, কত প্রিয়, প্রাণে তেজে কত পরিপূর্ণ! আপনি নিজের হাতে আমার কপালে জয়টিকা পরিয়ে দেবেন, তবেই তো জানব আমি আমার দেশের আদেশ পেয়েছি; তবেই তো সেই কথা স্মরণ করে লড়তে লড়তে মৃত্যুবাণ খেয়ে যদি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি তবে বুঝব, সে কেবলমাত্র ভূগোলবিবরণের মাটি নয়, সে একখানা আঁচল—কেমন আঁচল জানেন? আপনি সেদিন যে একখানি শাড়ি পরেছিলেন, লাল মাটির মতো তার রঙ, আর তার চওড়া পাড় একটি রক্তের ধারার মতো রাঙা, সেই শাড়ির আঁচল! সে কি আমি কোনোদিন ভুলতে পারব! এই-সব জিনিসই তো জীবনকে সতেজ, মৃত্যুকে রমণীয় করে তোলে।

বলতে বলতে সন্দীপের দুই চোখ জ্বলে উঠল। চোখে সে ক্ষুধার আগুন কি পূজার সে আমি

বুঝতে পারলুম না। আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ল যেদিন আমি প্রথম ওঁর বক্তৃতা শুনেছিলুম। সেদিন, তিনি অগ্নিশিখা না মানুষ সে আমি ভুলে গিয়েছিলুম। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা চলে— তার অনেক কায়দা-কানুন আছে। কিন্তু আগুন যে আর-এক জাতের; সে এক নিমেষে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, প্রলয়কে সুন্দর করে তোলে। মনে হতে থাকে, যে সত্য প্রতিদিনের শুকনো কাঠে হেলাফেলার মধ্যে লুকিয়ে ছিল সে আজ আপনার দীপ্যমান মূর্তি ধরে চারি দিকের সমস্ত কৃপণের সঞ্চয়গুলোকে অট্টহাস্যে দগ্ধ করতে ছুটে চলেছে।

এর পরে আমার কিছু বলবার শক্তি ছিল না। আমার ভয় হতে লাগল এখনি সন্দীপ ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরবেন। কেননা তাঁর হাত চঞ্চল আগুনের শিখার মতোই কাঁপছিল, আর তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার উপর যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো এসে পড়ছিল।

সন্দীপ বলে উঠলেন, আপনারা সব ছোটো ছোটো ঘোরো নিয়মকেই কি বড়ো করে তুলবেন? আপনাদের এমন প্রাণ আছে যার একটু আভাসেই আমরা জীবন-মরণকে তুচ্ছ করতে পারি, সে কি কেবল অন্দরের ঘোমটা-মোড়া জিনিস? আজ আর লজ্জা করবেন না, লোকের কানাঘুষায় কান দেবেন না, আজ বিধিনিষেধে তুড়ি মেরে মুক্তির মাঝখানে ছুটে বেরিয়ে আসুন।

এমনি করে সন্দীপবাবুর কথায় দেশের স্তবের সঙ্গে যখন আমার স্তব মিশিয়ে যায়, তখন সংকোচের বাঁধন আর টেঁকে না, তখন রক্তের মধ্যে নাচন ধরে! যতদিন আর্ট আর বৈষ্ণব কবিতা, আর স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধনির্ণয়, আর বাস্তব-অবাস্তবের বিচার চলছিল ততদিন আমার মন গ্লানিতে কালো হয়ে উঠেছিল। আজ সে অঙ্গারের কালিমায় আবার আগুন ধরে উঠল, সেই দীপ্তিই আমার লজ্জা নিবারণ করলে। মনে হতে লাগল আমি যে রমণী সেটা যেন আমার একটা অপরূপ দৈবী মহিমা।

হায় রে, আমার সেই মহিমা আমার চুলের ভিতর দিয়ে এখনি কেন একটা প্রত্যক্ষ দীপ্তির মতো বেরোয় না! আমার মুখ দিয়ে এমন কোনো একটা কথা উঠছে না কেন যা মন্ত্রের মতো এখনি সমস্ত দেশকে অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত করে দেয়!

এমন সময়ে হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘরের ক্ষেমাদাসী এসে উপস্থিত। সে বলে, আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, আমি চলে যাই, আমি সাত জন্মে এমন— হাউ হাউ হাউ হাউ!

কী? ব্যাপারটা কী?

মেজোরানীমার দাসী থাকো অকারণে গায়ে পড়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে; তাকে যা মুখে আসে তাই বলে গাল দিয়েছে।

আমি যত বলি, 'আচ্ছা সে আমি বিচার করব' কিছুতেই ক্ষেমার কান্না আর থামে না।

সকালবেলায় দীপক রাগিণীর যে সুর এমন জমে উঠেছিল তার উপরে যেন বাসন-মাজার জল ঢেলে দিলে। মেয়েমানুষ যে পদ্মবনের পঙ্কজ তার তলাকার পঙ্ক ঘুলিয়ে উঠল। সেটাকে সন্দীপের কাছে তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে আমাকে তখনি অন্তঃপুরে ছুটতে হল। দেখি আমার মেজো জা সেই বারান্দায় বসে একমনে মাথা নীচু করে সুপুরি কাটছেন, মুখে একটু হাসি লেগে আছে, গুন গুন করে গান করছেন 'রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে'— ইতিমধ্যে কোথাও যে কিছু অনর্থপাত হয়েছে তার কোনো লক্ষণ তাঁর কোনোখানেই নেই।

আমি বললুম, মেজোরানী, তোমার থাকো ক্ষেমাকে এমন মিছিমিছি গাল দেয় কেন।

তিনি ভুরু তুলে আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওমা, সত্যি নাকি? মাগীকে ঝাঁটা-পেটা করে দূর করে দেব। দেখো দেখি, এই সক্কালবেলায় তোমার বৈঠকখানার আসর মাটি ক'রে দিলে! ক্ষেমারও আচ্ছা আক্কেল দেখছি, জানে তার মনিব বাইরের বাবুর সঙ্গে একটু গল্প করছে, একেবারে সেখানে গিয়ে উপস্থিত— লজ্জাশরমের মাথা খেয়ে বসেছে! তা ছোটোরানী, এ-সব ঘরকন্নার কথায় তুমি থেকো না, তুমি বাইরে যাও, আমি যেমন করে পারি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।

আশ্চর্য মানুষের মন। এক মুহূর্তের মধ্যেই তার পালে এমন উল্টো হাওয়া লাগে! এই সকাল-বেলায় ঘরকন্না ফেলে বাইরে সন্দীপের সঙ্গে বৈঠকখানায় আলাপ-আলোচনা করতে যাওয়া, আমার চিরকালের অন্তঃপুরের অভ্যস্ত আদর্শে এমনি সৃষ্টিছাড়া বলে মনে হল যে আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরে চলে গেলুম।

নিশ্চয় জানি ঠিক সময় বুঝে মেজোরানী নিজে থাকোকে টিপে দিয়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়েছেন। কিন্তু আমি এমনি টলমলে জায়গায় আছি যে এ-সব নিয়ে কোনো কথাই কইতে পারি নে। এই তো সেদিন ননকু দরোয়ানকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে প্রথম ঝাঁজে আমার স্বামীর সঙ্গে যেরকম উদ্ধতভাবে ঝগড়া করেছিলুম শেষ পর্যন্ত তা টিঁকল না। দেখতে দেখতে নিজের উত্তেজনাতেই নিজের মধ্যে একটা লজ্জা এল। এর মধ্যে আবার মেজোরানী এসে আমার স্বামীকে বললেন, ঠাকুরপো, আমারই অপরাধ। দেখো ভাই, আমরা সেকেলে লোক, তোমার ঐ সন্দীপ-বাবুর চালচলন কিছুতেই ভালো ঠেকে না—সেইজন্যে ভালো মনে করেই আমি দরোয়ানকে—তা এতে যে ছোটোরানীর অপমান হবে এ কথা মনেও করি নি, বরঞ্চ ভেবেছিলুম উল্টো। হায় রে পোড়া কপাল, আমার যেমন বুদ্ধি!

এমনি করে দেশের দিক থেকে পুজোর দিক থেকে যে কথাটাকে এত উজ্জ্বল করে দেখি সেইটেই যখন নীচের দিক থেকে এমন করে ঘুলিয়ে উঠতে থাকে তখন প্রথমটা হয় রাগ, তার পরেই মনে গ্লানি আসে।

আজ শোবার ঘরে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে জানলার কাছে বসে বসে ভাবতে লাগলুম, চার দিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জীবনটা আসলে কতই সরল হতে পারে। ঐ-যে মেজোরানী নিশ্চিন্তমনে বারান্দায় বসে সুপুরি কাটছেন, ঐ সহজ আসনে বসে সহজ কাজের ধারা আমার কাছে আজ অমন দুর্গম হয়ে উঠল! রোজ রোজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, এর শেষ কোন্‌খানে? আমি কি মরে যাব, সন্দীপ কি চলে যাবে, এ-সমস্তই কি রোগীর প্রলাপের মতো সুস্থ হয়ে উঠে একেবারে ভুলে যাব—না ঘাড়মোড় ভেঙে এমন সর্বনাশের তলায় তলিয়ে যাব যেখান থেকে ইহ-জীবনে আমার আর উদ্ধার নেই? জীবনের সৌভাগ্যকে সরলভাবে গ্রহণ করতে পারলুম না, এমন করে ছারখার করে দিলুম কী করে?

আমার এই শোবার ঘর, যে ঘরে আজ ন বৎসর আগে নতুন বউ হয়ে পা দিয়েছিলুম, সেই ঘরের সমস্ত দেয়াল ছাদ মেজে আমার মুখের দিকে চেয়ে আজ অবাক হয়ে আছে। এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমার স্বামী কলকাতা থেকে ভারতসাগরের কোন্ এক দ্বীপের অনেক দামি এই পরগাছাটি কিনে এনেছিলেন। এই ক-টি মাত্র পাতা, কিন্তু তাতে লম্বা যে একটি ফুলের গুচ্ছ ফুটেছিল সে যেন সৌন্দর্যের কোন্ পেয়ালা একেবারে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া, ইন্দ্রধনু যেন ঐ ক-টি পাতার কোলে ফুল হয়ে জন্ম নিয়ে দোল খাচ্ছে। সেই ফুটন্ত পরগাছাটিকে আমরা দুজনে মিলে আমাদের শোবার ঘরের এই জানলার কাছে টাঙিয়ে রেখেছি। সেই একবার ফুল হয়েছিল, আর হয় নি, আশা আছে আবার আর-একদিন ফুল ফুটবে। আশ্চর্য এই যে অভ্যাসমত আজও এই গাছে আমি রোজ জল দিচ্ছি, আশ্চর্য এই যে সেই নারকেলদড়ি দিয়ে পাকে পাকে আঁট করে বাঁধা এই পাতা-কয়টির বাঁধন আলগা হল না—তার পাতাগুলি আজও সবুজ আছে।

আজ চার বছর হল আমার স্বামীর একটি ছবি হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঐ কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিয়েছিলুম। ওর দিকে দৈবাৎ যখন আমার চোখ পড়ে আর চোখ তুলতে পারি নে। আজ ছ-দিন আগেও রোজ সকালে স্নানের পর ফুল তুলে ঐ ছবির সামনে রেখে প্রণাম করেছি। কত দিন এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার তর্ক হয়ে গেছে।

একদিন তিনি বললেন, তুমি যে আমাকে আমার চেয়ে বড়ো করে তুলে পুজো কর, এতে আমার বড়ো লজ্জা বোধ হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন তোমার লজ্জা?

স্বামী বললেন, শুধু লজ্জা নয়, ঈর্ষা।

আমি বললুম, শোনো একবার কথা। তোমার আবার ঈর্ষা কাকে?

স্বামী বললেন, ঐ মিথ্যে-আমিটাকে। এর থেকে বুঝতে পারি এই সামান্য আমাকে নিয়ে তোমার সন্তোষ নেই, তুমি এমন অসামান্য কাউকে চাও যে তোমার বুদ্ধিকে অভিভূত করে দেবে; তাই আর-একটা আমাকে তুমি মন দিয়ে গড়ে তোমার মন ভোলাচ্ছ।

আমি বললুম, তোমার এই কথাগুলো শুনলে আমার রাগ হয়।

তিনি বললেন, রাগ আমার উপরে করে কী হবে, তোমার অদৃষ্টের উপর করো। তুমি তো আমাকে স্বয়ংবরসভায় বেছে নাও নি, যেমনটি পেয়েছ তেমনি তোমাকে চোখ বুজে নিতে হয়েছে; কাজেই দেবত্ব দিয়ে আমাকে যতটা পার সংশোধন করে নিচ্ছ। দময়ন্তী স্বয়ংবরা হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন, তোমরা স্বয়ংবরা হতে পার নি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্ছ।

সেদিন এই কথাটা নিয়ে এত রাগ করেছিলুম যে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে গিয়েছিল। তাই মনে করে আজ ঐ কুলুঙ্গিটার দিকে চোখ তুলতে পারি নে।

ঐ যে আমার গয়নার বাক্সের মধ্যে আর-এক ছবি আছে। সেদিন বাইরের বৈঠকখানাঘর ঝাড়-পোঁছ করবার উপলক্ষে সেই ফোটোস্ট্যান্ডখানা তুলে এনেছি, সেই যার মধ্যে আমার স্বামীর ছবির পাশে সন্দীপের ছবি আছে। সে ছবি তো পুজো করি নে, তাকে প্রণাম করা চলে না; সে রইল আমার হীরে-মানিক-মুক্তোর মধ্যে ঢাকা, সে লুকোনো রইল বলেই তার মধ্যে এত পুলক। ঘরে সব দরজা বন্ধ করে তবে তাকে খুলে দেখি। রাত্রে আস্তে আস্তে কেরোসিনের বাতিটা উসকে তুলে তার সামনে ঐ ছবিটা ধরে চুপ করে চেয়ে বসে থাকি। তার পরে রোজই মনে করি এই কেরোসিনের শিখায় ওকে পুড়িয়ে ছাই করে চিরদিনের মতো চুকিয়ে ফেলে দিই; আবার রোজই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আমার হীরে-মানিক-মুক্তোর নীচে তাকে চাপা দিয়ে চাবি বন্ধ করে রাখি। কিন্তু, পোড়ারমুখী, এই হীরে-মানিক-মুক্তো তোকে দিয়েছিল কে? এর মধ্যে কত দিনের কত আদর জড়িয়ে আছে। তারা আজ কোথায় মুখ লুকোবে? মরণ হলে যে বাঁচি।

সন্দীপ একদিন আমাকে বলেছিলেন, দ্বিধা করাটা মেয়েদের প্রকৃতি নয়। তার ডাইনে বাঁয়ে নেই, তার একমাত্র আছে সামনে। তিনি বার বার বলেন, দেশের মেয়েরা যখন জাগবে তখন তারা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি স্পষ্ট করে বলবে 'আমরা চাই'— সেই চাওয়ার কাছে কোনো ভালো-মন্দ কোনো সম্ভব-অসম্ভবের তর্কবিতর্ক টিঁকতে পারবে না। তাদের কেবল এক কথা 'আমরা চাই'। 'আমি চাই' এই বাণীই হচ্ছে সৃষ্টির মূল বাণী; সেই বাণীই কোনো শাস্ত্রবিচার না করে আগুন হয়ে সূর্যে তারায় জ্বলে উঠেছে। ভয়ংকর তার প্রণয়ের পক্ষপাত; মানুষকে সে কামনা করেছে বলেই যুগযুগান্তরের লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে তার সেই কামনার কাছে বলি দিতে দিতে এসেছে। সৃজন-প্রলয়ের সেই ভয়ংকরী 'আমি চাই' বাণী আজ মেয়েদের মধ্যেই মূর্তিমতী। সেইজন্যেই ভীরু পুরুষ সৃজনের সেই আদিম বন্যাকে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, পাছে সে তাদের কুমড়োখেতের মাচাগুলোকে অট্টকলহাস্যে ভাসিয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে চলে যায়। পুরুষ মনে করে আছে, এই বাঁধকে সে চিরকালের মতো পাকা করে বেঁধে রেখেছে। জমছে, জল জমছে— হ্রদের জলরাশি আজ শান্ত গম্ভীর; আজ সে চলেও না, আজ সে বলেও না; পুরুষের রান্নাঘরের জলের জালা নিঃশব্দে ভর্তি করে। কিন্তু চাপ আর সইবে না, বাঁধ ভাঙবে; তখন এতদিনের বোবা শক্তি 'আমি চাই' 'আমি চাই' বলে গর্জন করতে করতে ছুটবে।

সন্দীপের এই কথা আমার মনের মধ্যে যেন ডমরু বাজাতে থাকে। তাই আমার আপনার সঙ্গে যখন আপনার বিরোধ বাধে, যখন লজ্জা আমাকে ধিক্‌কার দিতে থাকে, তখন সন্দীপের কথা আমার মনে আসে। তখন বুঝতে পারি আমার এ লজ্জা কেবল লোকলজ্জা, সে আমার মেজো জায়ের মূর্তি ধরে বাইরে বসে বসে সুপুরি কাটতে কাটতে কটাক্ষপাত করছে। তাকে আমি কিসের গ্রাহ্য

করি! 'আমি চাই' এই কথাটাকেই নিঃসংকোচে অবাধে অন্তরে বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে পারাই হচ্ছে আপনার পূর্ণ প্রকাশ, না বলতে পারাই হচ্ছে ব্যর্থতা। কিসের ঐ পরগাছা, কিসের ঐ কুলুঙ্গি— আমার এই উদ্দীপ্ত আমিকে ব্যঙ্গ করে অপমান করে এমন সাধ্য ওদের কী আছে!

এই বলে তখনি ইচ্ছে হল, ঐ পরগাছাটাকে জানলার বাইরে ফেলে দিই, ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি, প্রলয়শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হোক। হাত উঠেছিল, কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল— মেজের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। কী হবে, আমার কী হবে! আমার কপালে কী আছে!

সন্দীপের আত্মকথা

আমি নিজের লেখা আত্মকাহিনী যখন পড়ে দেখি তখন ভাবি, এই কি সন্দীপ? আমি কি কথা দিয়ে তৈরি? আমি কি রক্তমাংসের মলাটে মোড়া একখানা বই?

পৃথিবী চাঁদের মতো মরা জিনিস নয়, সে নিশ্বাস ফেলছে, তার সমস্ত নদীসমুদ্র থেকে বাষ্প উঠছে, সেই বাষ্পে সে ঘেরা; তার চতুর্দিকে ধুলো উড়ছে। সেই ধুলোর ওড়নায় সে ঢাকা। বাইরে থেকে যে দর্শক এই পৃথিবীকে দেখবে এই বাষ্প আর ধুলোর উপর থেকে প্রতিফলিত আলোই কেবল সে দেখতে পাবে। সে কি এর দেশ-মহাদেশের স্পষ্ট সন্ধান পাবে?

এই পৃথিবীর মতো যে মানুষ সজীব তার অন্তর থেকে কেবলই আইডিয়ার নিশ্বাস উঠছে, এইজন্যে বাষ্পে সে অস্পষ্ট। যেখানে তার ভিতরের জলস্থল, যেখানে সে বিচিত্র, সেখানে তাকে দেখা যায় না; মনে হয় সে যেন আলোছায়ার একটা মণ্ডল।

আমার বোধ হচ্ছে যেন সজীব গ্রহের মতো আমি আমার সেই আইডিয়ার মণ্ডলটাকেই আঁকছি। কিন্তু, আমি যা চাই, যা ভাবি, যা সিদ্ধান্ত করছি, আমি যে আগাগোড়া কেবল তাইই তা তো নয়। আমি যা ভালোবাসি নে, যা ইচ্ছে করি নে, আমি যে তাও। আমার জন্মাবার আগেই যে আমার সৃষ্টি হয়ে গেছে; আমি তো নিজেকে বেছে নিতে পারি নি, হাতে যা পেয়েছি তাকে নিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে।

এ কথা আমি বেশ জানি, যে বড়ো সে নিষ্ঠুর। সর্বসাধারণের জন্যে ন্যায়, আর অসাধারণের জন্যে অন্যায়। মাটির তলাটা আগাগোড়া সমান, আগ্নেয় পর্বত তাকে আগুনের শিঙের ভয়ংকর গুঁতো মেরে তবে উঁচু হয়ে ওঠে। সে চার দিকের প্রতি ন্যায়বিচার করে না, তার বিচার নিজের প্রতিই। সফল অন্যায়পরতা এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠুরতার জোরেই মানুষ বল, জাত বল এপর্যন্ত লক্ষপতি মহীপতি হয়ে উঠেছে। ১কে দিব্যি চোখ বুজে গিলে খেয়ে তবেই ২ দুই হয়ে উঠতে পারে, নইলে ১এর সমতল লাইন একটানা হয়ে চলত।

আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকেই প্রচার করি। আমি সকলকে বলি, অন্যায়ই মোক্ষ, অন্যায়ই বহ্নিশিখা; সে যখনি দগ্ধ না করে তখনি ছাই হয়ে যায়। যখনি কোনো জাত বা মানুষ অন্যায় করতে অক্ষম হয়, তখনি পৃথিবীর ভাঙা কুলোয় তার গতি।

কিন্তু তবু এ আমার আইডিয়া, এ পুরোপুরি আমি নয়। যতই অন্যায়ের বড়াই করি-না কেন, আইডিয়ার উড়ুনির মধ্যে ফুটো আছে, ফাঁক আছে, তার ভিতর থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ে— সে নেহাত কাঁচা, অতি নরম। তার কারণ, আমার অধিকাংশ আমার পূর্বেই তৈরি হয়ে গেছে।

আমার চ্যালাদের নিয়ে আমি মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরের পরীক্ষা করি। একদিন বাগানে চড়িভাতি করতে গিয়েছিলুম। একটা ছাগল চরে বেড়াচ্ছিল, আমি সবাইকে বললুম, কে ওর পিছনের একখানা পা এই দা দিয়ে কেটে আনতে পারে? সকলেই যখন ইতস্তত করছিল আমি নিজে

কেটে নিয়ে এলুম। আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে যে লোক নিষ্ঠুর সে এই দৃশ্য দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আমার শান্ত অবিচলিত মুখ দেখে সকলেই নির্বিকার মহাপুরুষ বলে আমার পায়ের ধুলো নিলে। অর্থাৎ সেদিন সকলেই আমার আইডিয়ার বাষ্পমণ্ডলটাই দেখলে; কিন্তু যেখানে আমি—নিজের দোষে না, ভাগ্যদোষে—দুর্বল সকরুণ, যেখানে ভিতরে ভিতরে বুক ফাটছিল, সেখানে আমাকে ঢাকা দেওয়াই ভালো।

বিমল-নিখিলকে নিয়ে আমার জীবনের এই-যে একটা অধ্যায় জমে উঠছে এর ভিতরেও অনেকটা কথা ঢাকা পড়ছে। ঢাকা পড়ত না যদি আমার মধ্যে আইডিয়ার কোনো বালাই না থাকত। আমার আইডিয়া আমার জীবনটাকে নিয়ে আপনার মতলবে গড়ছে, কিন্তু সেই মতলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকি পড়ে থাকছে। সেইটের সঙ্গে আমার মতলবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে না; এইজন্যে তাকে চেপেচুপে ঢেকেঢুকে রাখতে চাই, নইলে সমস্তটাকে সে মাটি করে দেয়।

প্রাণ জিনিসটা অস্পষ্ট, সে যে কত বিরুদ্ধতার সমষ্টি তার ঠিক নেই। আমরা আইডিয়াওয়ালা মানুষ তাকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে একটা কোনো বিশেষ আকারে সুস্পষ্ট করে জানতে চাই; সেই জীবনের সুস্পষ্টতাই জীবনের সফলতা। দিগ্‌বিজয়ী সেকেন্দর থেকে শুরু করে আজকের দিনের আমেরিকার ক্রোড়পতি রকফেলার পর্যন্ত সকলেই নিজেকে তলোয়ারের কিংবা টাকার বিশেষ একটা ছাঁচে ঢেলে জমিয়ে দেখতে পেরেছে বলেই নিজেকে সফল করে জেনেছে।

এইখানেই আমাদের নিখিলের সঙ্গে আমার তর্ক বাধে। আমিও বলি আপনাকে জানো, সেও বলে আপনাকে জানো। কিন্তু সে যা বলে তাতে দাঁড়ায় এই আপনাকে না-জানাটাই হচ্ছে জানা। সে বলে, তুমি যাকে ফল পাওয়া বল সে হচ্ছে আপনাকে বাদ দিয়ে ফলটুকুকে পাওয়া। ফলের চেয়ে আত্মা বড়ো।

আমি বললুম, কথাটা নেহাত ঝাপসা হল।

নিখিল বললে, উপায় নেই। প্রাণটা কলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই বলে প্রাণটাকে কল বলে সোজা করে জানলেই যে প্রাণটাকে জানা হয় তা নয়। তেমনি আত্মা ফলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই আত্মাকে ফলের মধ্যে চরম করে দেখাই যে আত্মাকে সত্য দেখা তা বলব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তবে তুমি কোথায় আত্মাকে দেখছ? কোন্ নাকের ডগায়, কোন্ ভ্রূর মাঝখানে?

সে বললে, আত্মা যেখানে আপনাকে অসীম জানছে, যেখানে ফলকে ছেড়ে এবং ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

তা হলে নিজের দেশ সম্বন্ধে কী বলবে?

ঐ একই কথা। দেশ যেখানে বলে 'আমি আমাকেই লক্ষ্য করব' সেখানে সে ফল পেতে পারে, কিন্তু আত্মাকে হারায়; যেখানে সকলের চেয়ে বড়োকে সকলের বড়ো করে দেখে সেখানে সকল ফলকেই সে খোয়াতে পারে, কিন্তু আপনাকে সে পায়।

ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত কোথায় দেখেছ?

মানুষ এত বড়ো যে সে যেমন ফলকে অবজ্ঞা করতে পারে তেমনি দৃষ্টান্তকেও। দৃষ্টান্ত হয়তো নেই, বীজের ভিতরে ফুলের দৃষ্টান্ত যেমন নেই; কিন্তু বীজের ভিতরে ফুলের বেদনা আছে। তবু, দৃষ্টান্ত কি একেবারেই নেই? বুদ্ধ বহু শতাব্দী ধরে যে সাধনায় সমস্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে রেখেছিলেন সে কি ফলের সাধনা?

নিখিলের কথা আমি যে একেবারেই বুঝতে পারি নে তা নয়। কিন্তু সেইটিই হল আমার মুশকিল। ভারতবর্ষে আমার জন্ম; সাত্ত্বিকতার বিষ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে মরতে চায় না। আপনাকে বঞ্চিত করার পথে চলা যে পাগলামি এ কথা মুখে যতই বলি এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই। এইজন্যেই আমাদের দেশে আজকাল অদ্ভুত ব্যাপার চলছে। ধর্মের ধুয়ো দেশের

ধুয়ো দুটিকেই পুরোদমে একসঙ্গে চালাচ্ছি— ভগবদ্‌গীতা এবং বন্দেমাতরং আমাদের দুইই চাই— তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পষ্ট হতে পারছে না, তাতে একসঙ্গেই গড়ের বাদ্য এবং সানাই বাজানো চলছে, এ আমরা বুঝছি নে। আমার জীবনের কাজ হচ্ছে এই বেসুরো গোলমালটাকে থামানো; আমি গড়ের বাদ্যটাকেই বাহাল রাখব, সানাই আমাদের সর্বনাশ করেছে। প্রবৃত্তির যে জয়পতাকা আমাদের হাতে দিয়ে মা প্রকৃতি, মা শক্তি, মা মহামায়া রণক্ষেত্রে আমাদের পাঠিয়েছেন তাকে আমরা লজ্জা দেব না। প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্মল, যেমন নির্মল ভুঁইচাঁপা ফুল, যে কথায় কথায় স্নানের ঘরে ভিনোলিয়া সাবান মাখতে ছোটে না।

একটা প্রশ্ন ক'দিন ধরে মাথায় ঘুরছে, কেন বিমলের সঙ্গে জীবনটাকে জড়িয়ে ফেলতে দিচ্ছি? আমার জীবনটা তো ভেসে-যাওয়া কলার ভেলা নয় যে যেখানে-সেখানে ঠেকতে ঠেকতে চলবে।

সেই কথাই তো বলছিলুম, যে একটিমাত্র আইডিয়ার ছাঁচে জীবনটাকে পরিমিত করতে চাই জীবন তাকে ছাপিয়ে যায়। থেকে থেকে মানুষ ছিটকে ছিটকে পড়ে। এবার আমি যেন বেশি দূরে ছিটকে পড়েছি।

বিমল যে আমার কামনার বিষয় হয়ে উঠেছে সেজন্যে আমার কোনো মিথ্যে লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট দেখছি ও আমাকে চায়, ঐ তো আমার স্বকীয়া। গাছে ফল বোঁটায় ঝুলে আছে, সেই বোঁটার দাবিকেই চিরকালের বলে মানতে হবে নাকি! ওর যত রস যত মাধুর্য সে যে আমার হাতে সম্পূর্ণ খসে পড়বার জন্যেই; সেইখানেই একেবারে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ওর সার্থকতা; সেই ওর ধর্ম, ওর নীতি। আমি সেইখানেই ওকে পেড়ে আনব, ওকে ব্যর্থ হতে দেব না।

কিন্তু আমার ভাবনা এই যে, আমি জড়িয়ে পড়ছি, মনে হচ্ছে আমার জীবনে বিমল বিষম একটা দায় হয়ে উঠবে। আমি পৃথিবীতে এসেছি কর্তৃত্ব করতে; আমি লোককে চালনা করব কথায় এবং কাজে। সেই লোকের ভিড়ই আমার যুদ্ধের ঘোড়া। আমার আসন তার পিঠের উপরে, তার রাশ আমার হাতে, তার লক্ষ্য সে জানে না— শুধু আমিই জানি; কাঁটায় তার পায়ে রক্ত পড়বে, কাদায় তার গা ভরে যাবে, তাকে বিচার করতে দেব না, তাকে ছোটাব।

সেই আমার ঘোড়া আজ দরজায় দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে, তার হ্রেষাধ্বনিতে সমস্ত আকাশ আজ কেঁপে উঠল, কিন্তু আমি করছি কী? দিনের পর দিন আমার কী নিয়ে কাটছে? ও দিকে আমার এমন শুভদিন যে বয়ে গেল।

আমার ধারণা ছিল আমি ঝড়ের মতো ছুটে চলতে পারি; ফুল ছিঁড়ে আমি মাটিতে ফেলে দিই, কিন্তু তাতে আমার চলার ব্যাঘাত করে না। কিন্তু এবার যে আমি ফুলের চার দিকে ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভ্রমরেরই মতো, ঝড়ের মতো নয়।

তাই তো বলি, নিজের আইডিয়া দিয়ে নিজেকে যে রঙে আঁকি সব জায়গায় সে রঙ তো পাকা হয়ে ধরে না, হঠাৎ দেখতে পাই সেই সামান্য মানুষটাকে। কোনো-এক অন্তর্যামী যদি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখতেন তা হলে নিশ্চয় দেখা যেত আমার সঙ্গে আর ঐ পাঁচুর সঙ্গে বেশি তফাত নেই— এমন-কি, ঐ নিখিলেশের সঙ্গে। কাল রাত্রে আমার আত্মকাহিনীর খাতাটা নিয়ে খুলে পড়ছিলুম। তখন সবে বি.এ. পাস করেছি, ফিলজফিতে মগজ ফেটে পড়ছে বললেই হয়। তখন থেকেই পণ করেছিলুম নিজের হাতে বা পরের হাতে গড়া কোনো মায়াকেই জীবনের মধ্যে স্থান দেব না, জীবনটাকে আগাগোড়া একেবারে নিরেট বাস্তব করে তুলব। কিন্তু তার পর থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত জীবনকাহিনীটাকে কী দেখছি? কোথায় সেই ঠাস-বুনোনি? এ যে জালের মতো; সূত্র বরাবর চলেছে, কিন্তু সূত্র যতখানি ফাঁক তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। এই ফাঁকাটার সঙ্গে লড়াই করে করে একে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না। কিছুদিন বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জোরের সঙ্গেই চলছিলুম, আজ দেখি আবার একটা মস্ত ফাঁক।

আজ দেখি মনের মধ্যে ব্যথা লাগছে। 'আমি চাই, হাতের কাছে এসেছে, ছিঁড়ে নেব'— এ হল

খুব স্পষ্ট কথা, খুব সংক্ষেপ রাস্তা। এই রাস্তায় যারা জোরের সঙ্গে চলতে পারে তারাই সিদ্ধিলাভ করে, এই কথা আমি চিরদিন বলে আসছি। কিন্তু ইন্দ্রদেব এই তপস্যাকে সহজ করতে দিলেন না, তিনি কোথা থেকে বেদনার অপ্সরীকে পাঠিয়ে দিয়ে সাধকের দৃষ্টিকে বাষ্পজালে অস্পষ্ট করে দেন।

দেখছি বিমলা জালে-পড়া হরিণীর মতো ছটফট করছে; তার বড়ো বড়ো দুই চোখে কত ভয় কত করুণা, জোর করে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত— ব্যাধ তো এই দেখে খুশি হয়। আমার খুশি আছে, কিন্তু ব্যথাও আছে। সেইজন্যে কেবলই দেরি হয়ে যাচ্ছে, তেমন জোরে ফাঁস কষতে পারছি নে।

আমি জানি দুবার তিনবার এমন এক-একটা মুহূর্ত এসেছে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আনলে সে একটি কথা বলতে পারত না, সেও বুঝতে পারছিল এখনি একটা কী ঘটতে যাচ্ছে যার পর থেকে জগৎসংসারের সমস্ত তাৎপর্য একেবারে বদলে যাবে— সেই পরম অনিশ্চিতের গুহার সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে, তার দুই চক্ষে ভয় অথচ উদ্দীপনার দীপ্তি, এই সময়টুকুর মধ্যে একটা কিছু স্থির হয়ে যাবে তারই জন্যে সমস্ত আকাশ-পাতাল নিশ্বাস রোধ করে যেন থমকে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেই মুহূর্তগুলিকে বয়ে যেতে দিয়েছি; নিঃসংকোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিই নি। এর থেকে বুঝতে পারছি এতদিন যে-সব বাধা আমার প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল তারা আজ আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েছে।

যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোকবনে রেখেছিল। অত বড়ো বীরের অন্তরের মধ্যে ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সংকোচ ছিল তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সংকোচটুকু না থাকলে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পুজো করত! এই রকমেরই একটু সংকোচ ছিল বলেই যে বিভীষণকে তার মারা উচিত ছিল তাকে রাবণ চিরদিন দয়া এবং অবজ্ঞা করলে, আর ম'ল নিজে।

জীবনের ট্রাজেডি এইখানেই। সে ছোটো হয়ে হৃদয়ের এক তলায় লুকিয়ে থাকে, তার পরে বড়োকে এক মুহূর্তে কাত করে দেয়। মানুষ আপনাকে যা বলে জানে মানুষ তা নয়, সেইজন্যেই এত অঘটন ঘটে।

নিখিল যে এমন অদ্ভুত, তাকে দেখে যে এত হাসি, তবু ভিতরে ভিতরে এও কিছুতে অস্বীকার করতে পারি নে যে সে আমার বন্ধু। প্রথমটা তার কথা বেশি কিছু ভাবি নি; কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে তার কাছে লজ্জা পাচ্ছি, কষ্টও বোধ হচ্ছে। এক-একদিন আগেকার মতো তার সঙ্গে খুব করে গল্প করতে তর্ক করতে যাই, কিন্তু উৎসাহটা কেমন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে— এমন-কি, যা কখনো করি নে তাও করি, তার মতের সঙ্গে মত মেলাবার ভান করে থাকি। কিন্তু এই কপটতা জিনিসটা আমার সয় না, এটা নিখিলেরও সয় না— এইখানে ওর সঙ্গে আমার মিল আছে।

তাই জন্যে আজকাল নিখিলকে এড়িয়ে চলতে চাই, কোনোমতে দেখাটা না হলেই বাঁচি। এই সব হচ্ছে দুর্বলতার লক্ষণ। অপরাধের ভূতটাকে মানবামাত্রই সে একটা সত্যকার জিনিস হয়ে দাঁড়ায়; তখন তাকে যতই অবিশ্বাস করি-না কেন, সে চেপে ধরে। আমি নিখিলের কাছে এইটেই অসংকোচে জানাতে চাই, এ-সব জিনিসকে বড়ো করে বাস্তব করে দেখতে হবে। যা সত্য তার মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের কোনো ব্যাঘাত থাকা উচিত নয়।

কিন্তু এ কথাটা আর অস্বীকার করতে পারছি নে এইবার আমাকে দুর্বল করেছে। আমার এই দুর্বলতায় বিমল মুগ্ধ হয় নি; আমার অসংকোচ পৌরুষের আগুনেই সেই পতঙ্গিনী তার পাখা পুড়িয়েছে। আবেশের ধোঁয়ায় যখন আমাকে আচ্ছন্ন করে তখন বিমলার মনও আবিষ্ট হয়, কিন্তু

তখন ওর মনে ঘৃণা জন্মে; তখন আমার গলা থেকে ওর স্বয়ংবরের মালা ফিরিয়ে নিতে পারে না বটে, কিন্তু সেটা দেখে ও চোখ বুজতে চায়।

কিন্তু ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের দুজনেরই। বিমলাকে যে ছাড়তে পারব এমন শক্তিও নিজের মধ্যে দেখছি নে। তাই বলে নিজের পথটাও আমি ছাড়তে পারব না। আমার পথ লোকের ভিড়ের পথ; এই অন্তঃপুরের খিড়কির দরজার পথ নয়। আমি আমার স্বদেশকে ছাড়তে পারব না, বিশেষত আজকের দিনে; বিমলাকে আজ আমি আমার স্বদেশের সঙ্গে মিশিয়ে নেব। যে পশ্চিমের ঝড়ে আমার স্বদেশলক্ষ্মীর মুখের উপর থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ঘোমটা উড়ে গেছে সেই ঝড়েই বিমলার মুখে বধূর ঘোমটা খুলবে—সেই অনাবরণে তার অগৌরব থাকবে না। জনসমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুলবে তরী, উড়বে তাতে 'বন্দেমাতরং' জয়পতাকা, চারি দিকে গর্জন আর ফেনা—সেই নৌকোই একসঙ্গে আমাদের শক্তির দোলা আর প্রেমের দোলা। বিমলা সেখানে মুক্তির এমন একটা বিরাট রূপ দেখবে যে তার দিকে চেয়ে তার সকল বন্ধন বিনা লজ্জায় এক সময়ে নিজের অগোচরে খসে যাবে। এই প্রলয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে ওর এক মুহূর্তের জন্যে বাধবে না। যে নিষ্ঠুরতাই প্রকৃতির সহজ শক্তি সেই পরমাসুন্দরী নিষ্ঠুরতার মূর্তি আমি বিমলার মধ্যে দেখেছি। মেয়েরা যদি পুরুষের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেত তা হলে পৃথিবীতে কালীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেতুম—সেই দেবী নির্লজ্জ, সে নির্দয়। আমি সেই কালীর উপাসক; বিমলাকে সেই প্রলয়ের মাঝখানে টেনে নিয়ে আমি একদিন কালীর উপাসনা করব। এবার তারই আয়োজন করি।

নিখিলেশের আত্মকথা

ভাদ্রের বন্যায় চারি দিক টলমল করছে; কচি ধানের আভা যেন কচি ছেলের কাঁচা দেহের লাবণ্য। আমাদের বাড়ির বাগানের নীচে পর্যন্ত জল এসেছে। সকালের রৌদ্রটি এই পৃথিবীর উপরে একেবারে অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, নীল আকাশের ভালোবাসার মতো।

আমি কেন গান গাইতে পারি নে! খালের জল ঝিলমিল করছে, গাছের পাতা ঝিকমিক করছে, ধানের খেত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে শিউরে চিকচিকিয়ে উঠছে—এই শরতের প্রভাতসংগীতে আমিই কেবল বোবা! আমার মধ্যে সুর অবরুদ্ধ; আমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা আটকা পড়ে যায়, ফিরে যেতে পায় না! আমার এই প্রকাশহীন দীপ্তিহীন আপনাকে যখন দেখতে পাই তখন বুঝতে পারি পৃথিবীতে কেন আমি বঞ্চিত। আমার সঙ্গ দিনরাত্রি কেউ সইতে পারবে কেন!

বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেইজন্যে এই ন বছরের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যে সে আমার কাছে পুরোনো হয় নি। কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে তো কলধ্বনিত বেগ নয়। আমি কেবল গ্রহণ করতেই পারি, কিন্তু নাড়া দিতে পারি নে। আমার সঙ্গ মানুষের পক্ষে উপবাসের মতো; বিমল এতদিন যে কী দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ছিল তা আজকের ওকে দেখে বুঝতে পারছি। দোষ দেব কাকে?

হায় রে—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আমার মন্দির যে শূন্য থাকবার জন্যেই তৈরি, ওর যে দরজা বন্ধ। আমার যে দেবতা ছিল সে মন্দিরের বাইরেই বসে ছিল, এতকাল তা বুঝতে পারি নি। মনে করেছিলুম অর্ঘ্য সে নিয়েছে, বরও সে দিয়েছে—কিন্তু শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর।

প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে পৃথিবীর এই ভরা যৌবনে আমরা দুজনে শুক্লপক্ষে আমাদের শামলদহ'র বিলে বোটে করে বেড়াতে যেতুম। কৃষ্ণাপঞ্চমীতে যখন সন্ধ্যাবেলাকার জ্যোৎস্না ফুরিয়ে গিয়ে একেবারে তলায় এসে ঠেকত তখন আমরা বাড়ি ফিরে আসতুম। আমি বিমলকে বলতুম, গানকে বারে বারে আপন ধুয়োয় ফিরে আসতে হয়; জীবনে মিলনসংগীতের ধুয়োই হচ্ছে এইখানে, এই খোলা প্রকৃতির মধ্যে; এই ছলছল-করা জলের উপরে যেখানে 'বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ', যেখানে শ্যামল পৃথিবী মাথায় ছায়ার ঘোমটা টেনে নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় কূলে কূলে কান পেতে সারারাত আড়ি পাতছে— সেইখানেই স্ত্রীপুরুষের প্রথম চার চক্ষের মিলন হয়েছিল, দেয়ালের মধ্যে নয়— তাই এখানে আমরা একবার করে সেই আদিযুগের প্রথম মিলনের ধুয়োর মধ্যে ফিরে আসি যে মিলন হচ্ছে হরপার্বতীর মিলন, কৈলাসে মানসসরোবরের পদ্মবনে। আমার বিবাহের পর দু বছর কলকাতায় পরীক্ষার হাঙ্গামে কেটেছে; তার পরে আজ এই সাত বছর প্রতি ভাদ্রমাসের চাঁদ আমাদের সেই জলের বাসরঘরে বিকশিত কুমুদবনের ধারে তার নীরব শুভশঙ্খ বাজিয়ে এসেছে। জীবনের সেই এক সপ্তক এমনি করে কাটল। আজ দ্বিতীয় সপ্তক আরম্ভ হয়েছে।

ভাদ্রের সেই শুক্লপক্ষ এসেছে, সে কথা আমি তো কিছুতেই ভুলতে পারছি নে। প্রথম তিন দিন তো কেটে গেল; বিমলের মনে পড়েছে কিনা জানি নে, কিন্তু মনে করিয়ে দিল না। সব একেবারে চুপ হয়ে গেল, গান থেমে গেছে।

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

বিরহে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে; কিন্তু বিচ্ছেদে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দির বড়ো নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়।

আজ আমার কান্না বেসুরো লাগছে। এ কান্না আমার থামাতেই হবে। আমার এই কান্না দিয়ে বিমলকে আমি বন্দী করে রাখব এমন কাপুরুষ যেন আমি না হই। ভালোবাসা যেখানে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেছে সেখানে কান্না যেন সেই মিথ্যাকে বাঁধতে না চায়। যতক্ষণ আমার বেদনা প্রকাশ পাবে ততক্ষণ বিমল একেবারে মুক্তি পাবে না।

কিন্তু তাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দেব, নইলে মিথ্যার হাত থেকে আমিও মুক্তি পাব না। আজ তাকে আমার সঙ্গে বেঁধে রাখা নিজেকেই মায়ার জালে জড়িয়ে রাখা মাত্র। তাতে কারো কিছুই মঙ্গল নেই, সুখ তো নেইই। ছুটি দাও, ছুটি নাও— দুঃখ বুকের মানিক হবে যদি মিথ্যা থেকে খালাস পেতে পার।

আমার মনে হচ্ছে যেন এইবার আমি একটা জিনিস বুঝতে পারার কিনারায় এসেছি। স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসাটাকে সকলে মিলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তার স্বাভাবিক অধিকার ছাড়িয়ে এত দূর পর্যন্ত তাকে বাড়িয়ে তুলেছি যে, আজ তাকে সমস্ত মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়েও বশে আনতে পারছি নে। ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন করে তুলেছি। এখন তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়, তাকে অবজ্ঞা করবার দিন এসেছে। প্রবৃত্তির হাতের পূজা পেয়ে পেয়ে সে দেবীর রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু তার সামনে পুরুষের পৌরুষ বলি দিয়ে তাকে রক্তপান করাতে হবে এমন পূজা আমরা মানব না। সাজে-সজ্জায় লজ্জা-শরমে গানে-গল্পে হাসি-কান্নায় যে ইন্দ্রজাল সে তৈরি করেছে তাকে ছিন্ন করতে হবে।

কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের উপর বরাবর আমার একটা ঘৃণা আছে। পৃথিবীর সমস্ত ফুলের সাজি, সমস্ত ফলের ডালি কেবলমাত্র প্রেয়সীর পায়ের কাছে পড়ে পঞ্চশরের পূজার উপচার জোগাচ্ছে, জগতের আনন্দলীলাকে এমন করে ক্ষুণ্ণ করতে মানুষ পারে কী করে? এ কোন্ মদের নেশায় কবির চোখ ঢুলে পড়েছে? আমি যে মদ এতদিন পান করছিলুম তার রঙ এত লাল নয়,

কিন্তু তার নেশা তো এমনিই তীব্র। এই নেশার ঝোঁকেই আজ সকাল থেকে গুন গুন করে মরছি—

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

শূন্য মন্দির! বলতে লজ্জা করে না? এত বড়ো মন্দির কিসে তোমার শূন্য হল? একটা মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জেনেছি, তাই বলে জীবনে সমস্ত সত্য আজ উজাড় হয়ে গেল?

শোবার ঘরের শেল্‌ফ থেকে একটা বই আনতে আজ সকালে গিয়েছিলুম। কতদিন দিনের বেলায় আমার শোবার ঘরে আমি ঢুকি নি। আজ দিনের আলোতে ঘরের দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল! সেই আনলাটিতে বিমলের কোঁচানো শাড়ি পাকানো রয়েছে, এক কোণে তার ছাড়া শেমিজ আর জামা ধোবার জন্যে অপেক্ষা করছে। আয়নার টেবিলের উপর তার চুলের কাঁটা, মাথার তেল, চিরুনি, এসেন্সের শিশি, সেইসঙ্গে সিঁদুরের কৌটোটিও! টেবিলের নীচে তার ছোট্ট সেই একজোড়া জরি-দেওয়া চটিজুতো—একদিন যখন বিমল কোনোমতেই জুতো পরতে চাইত না সেই সময়ে আমি ওর জন্যে আমার এক লক্ষ্ণৌয়ের সহপাঠী মুসলমান বন্ধুর যোগে এই জুতো আনিয়ে দিয়েছিলুম। কেবলমাত্র শোবার ঘর থেকে আর ঐ বারান্দা পর্যন্ত এই জুতো পরে যেতে সে লজ্জায় মরে গিয়েছিল। তার পরে বিমল অনেক জুতো ক্ষয় করেছে, কিন্তু এই চটিজোড়াটি সে আদর করে রেখে দিয়েছে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলুম, যখন ঘুমিয়ে থাকি লুকিয়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে তুমি আমার পুজো কর, আমি তোমার পায়ের ধুলো নিবারণ করে আজ আমার এই জাগ্রত দেবতার পুজো করতে এসেছি। বিমল বললে, যাও, তুমি অমন করে বোলো না, তা হলে কক্‌খনো ও জুতো পরব না।—এই আমার চির-পরিচিত শোবার ঘর। এর একটি গন্ধ আছে যা আমার সমস্ত হৃদয় জানে, আর বোধ হয় কেউ তা পায় না। এই-সমস্ত অতি ছোটো ছোটো জিনিসের মধ্যে আমার রসপিপাসু হৃদয় তার কত যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় মেলে রয়েছে তা আজ যেমন করে অনুভব করলুম তেমন আর কোনোদিন করি নি। কেবল মূল শিকড়টি কাটা পড়লেই যে প্রাণ ছুটি পায় তা তো নয়, ঐ চটিজোড়াটা পর্যন্ত তাকে টেনে ধরতে চায়। সেইজন্যই তো লক্ষ্মী ত্যাগ করলেও তাঁর ছিন্নপদ্মের পাপড়িগুলোর চারি দিকে মন এমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। দেখতে দেখতে হঠাৎ কুলুঙ্গিটার উপর চোখ পড়ল। দেখি আমার সেই ছবি তেমনি রয়েছে, তার সামনে অনেক দিনের শুকনো কালো ফুল পড়ে আছে। এমনতরো পুজোর বিকারেও ছবির মুখে কোনো বিকার নেই। এ ঘর থেকে এই শুকিয়ে-যাওয়া কালো ফুলই আজ আমার সত্য উপহার! এরা যে এখনো এখানে আছে তার কারণ, এদের ফেলে দেওয়ারও দরকার নেই। যাই হোক, সত্যকে আমি তার এই নীরস কালো মূর্তিতেই গ্রহণ করলুম—কবে সেই কুলুঙ্গির ভিতরকার ছবিটারই মতো নির্বিকার হতে পারব?

এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেল্‌ফের দিকে যেতে যেতে বললুম, আমিয়েল্‌স জর্নাল বইখানা নিতে এসেছি। এই কৈফিয়তটুকু দেবার কী যে দরকার ছিল তা তো জানি নে। কিন্তু এখানে আমি যেন অপরাধী, যেন অনধিকারী, যেন এমন-কিছুর মধ্যে চোখ দিতে এসেছি যা লুকানো, যা লুকিয়ে থাকবারই যোগ্য। বিমলের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলুম।

বাইরে আমার ঘরে বসে যখন বই পড়া অসম্ভব হয়ে উঠল, যখন জীবনের যা-কিছু সমস্তই যেন অসাধ্য হয়ে দাঁড়াল—কিছু দেখতে বা শুনতে, বলতে বা করতে লেশমাত্র আর প্রবৃত্তি রইল না—যখন আমার সমস্ত ভবিষ্যতের দিন সেই একটা মুহূর্তের মধ্যে জমাট হয়ে অচল হয়ে আমার বুকের উপর পাথরের মতো চেপে বসল, ঠিক সেই সময়ে পঞ্চু একটা ঝুড়িতে গোটাকতক ঝুনো নারকেল নিয়ে আমার সামনে রেখে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, একি পঞ্চু? এ কেন।

পঞ্চু আমার প্রতিবেশী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর প্রজা, মাস্টারমশায়ের যোগে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। একে আমি তার জমিদার নই, তার উপর সে গরিবের একশেষ, ওর কাছ থেকে কোনো উপহার গ্রহণ করবার অধিকার আমার নেই। মনে ভাবছিলুম বেচারা বোধ হয় আজ নিরুপায় হয়ে বকশিশের ছলে অন্নসংগ্রহের এই পন্থা করেছে।

পকেটের টাকার থলি থেকে দুটো টাকা বের করে যখন ওকে দিতে যাচ্ছি তখন ও জোড়-হাত করে বললে, না হুজুর, নিতে পারব না।

সেকি পঞ্চু?

না, তবে খুলে বলি। বড়ো টানাটানির সময় একবার হুজুরের সরকারি বাগান থেকে আমি নারকেল চুরি করেছিলুম। কোন্‌ দিন মরব, তাই শোধ করে দিতে এসেছি।

আমিয়েল্‌স জর্নাল পড়ে আজ আমার কোনো ফল হত না, কিন্তু পঞ্চুর এই এক কথায় আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখদুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন; তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসি-কান্নার পরিমাপ করি।

পঞ্চু আমার মাস্টারমশায়ের একজন ভক্ত। কেমন করে এর সংসার চলে তা আমি জানি। রোজ ভোরে উঠে একটা চাঙারিতে করে পান দোক্তা রঙিন সুতো ছোটো আয়না চিরুনি প্রভৃতি চাষার মেয়েদের লোভনীয় জিনিস নিয়ে হাঁটু-জল ভেঙে বিল পেরিয়ে সে নমঃশূদ্রদের পাড়ায় যায়; সেখানে এই জিনিসগুলোর বদলে মেয়েদের কাছ থেকে ধান পায়। তাতে পয়সার চেয়ে কিছু বেশি পেয়ে থাকে। যেদিন সকাল সকাল ফিরতে পারে সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাতাসাওয়ালার দোকানে বাতাসা কাটতে যায়। সেখান থেকে ফিরে বাড়ি এসে শাঁখা তৈরি করতে বসে—তাতে প্রায় রাত দুপুর হয়ে যায়। এমন বিষম পরিশ্রম করেও বছরের মধ্যে কেবল কয়েক মাস ছেলেপুলে নিয়ে দু-বেলা দু-মুঠো খাওয়া চলে। তার আহারের নিয়ম এই যে, খেতে বসেই সে একঘটি জল খেয়ে পেট ভরায়, আর তার খাদ্যের মস্ত একটা অংশ হচ্ছে সস্তা দামের বীজে-কলা। বছরে অন্তত চার মাস তার একবেলার বেশি খাওয়া জোটে না।

আমি এক সময়ে একে কিছু দান করতে চেয়েছিলুম। মাস্টারমশায় আমাকে বললেন, তোমার দানের দ্বারা মানুষকে তুমি নষ্ট করতে পারো, দুঃখ নষ্ট করতে পারো না। আমাদের বাংলা দেশে পঞ্চু তো একলা নয়। সমস্ত দেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেছে। সেই মাতার দুধ তুমি তো অমন করে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে জোগাতে পারবে না।

এই-সব কথা ভাববার কথা। স্থির করেছিলুম এই ভাবনাতেই প্রাণ দেব। সেদিন বিমলাকে এসে বললুম, বিমল, আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূলচ্ছেদনের কাজে লাগাব।

বিমল হেসে বললে, তুমি দেখছি আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, দেখো শেষে আমাকে ভাসিয়ে চলে যেয়ো না।

আমি বললুম, সিদ্ধার্থের তপস্যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।

এমনি করে কথাটা হাসির উপর দিয়েই গেল। আসলে বিমল স্বভাবত যাকে বলে মহিলা। ও যদিও গরিবের ঘর থেকে এসেছে, কিন্তু ও রানী। ও জানে, যারা নীচের শ্রেণীর, তাদের সুখ-দুঃখ-ভালোমন্দর মাপকাঠি চিরকালের জনাই নীচের দরের। তাদের তো অভাব থাকবেই, কিন্তু সে অভাব তাদের পক্ষে অভাবই নয়। তারা আপনার হীনতার বেড়ার দ্বারাই সুরক্ষিত। যেমন ছোটো পুকুরের জল আপনার পাড়ির বাঁধনেই টিঁকে থাকে। পাড়িকে কেটে বড়ো করতে গেলেই তার জল ফুরিয়ে পাঁক বেরিয়ে পড়ে। যে আভিজাত্যের অভিমানে খুব ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে ভারতবর্ষ খুব ছোটো ছোটো গৌরবের আসন ঘের দিয়ে রেখেছে, যাতে করে ছোটো ভাগের হীনতার গণ্ডির মধ্যেও নিজের মাপ-অনুযায়ী একটা কৌলীন্য এবং স্বাতন্ত্র্যের গর্ব স্থান পায়, বিমলের

রক্তে সেই অভিমান প্রবল। সে ভগবান মনুর দৌহিত্রী বটে। আমার মধ্যে বোধ হয় গুহক এবং একলব্যের রক্তের ধারাটাই প্রবল; আজ যারা আমার নীচে রয়েছে তাদের নীচ বলে আমার থেকে একেবারে দূরে ঠেলে রেখে দিতে পারি নে। আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে, তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।

বিমলকে আমার সাধনার মধ্যে পাই নি। আমার জীবনে আমি বিমলকে এতই প্রকাণ্ড করে তুলেছি যে, তাকে না পাওয়াতে আমার সাধনা ছোটো হয়ে গেছে। আমার জীবনের লক্ষ্যকে কোণে সরিয়ে দিয়েছি, বিমলকে জায়গা দিতে হবে বলে। তাতে করে হয়েছে এই যে, তাকেই দিনরাত সাজিয়েছি পরিয়েছি শিখিয়েছি, তাকেই চিরদিন প্রদক্ষিণ করেছি; মানুষ যে কত বড়ো, জীবন যে কত মহৎ, সে কথা স্পষ্ট করে মনে রাখতে পারি নি।

তবু এর ভিতরেও আমাকে রক্ষা করেছেন আমার মাস্টারমশায়; তিনিই আমাকে যতটা পেরেছেন বড়োর দিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, নইলে আজকের দিনে আমি সর্বনাশের মধ্যে তলিয়ে যেতুম। আশ্চর্য ঐ মানুষটি। আমি ওঁকে আশ্চর্য বলছি এইজন্যে যে আজকের আমার এই দেশের সঙ্গে কালের সঙ্গে ওঁর এমন একটা প্রবল পার্থক্য আছে। উনি আপনার অন্তর্যামীকে দেখতে পেয়েছেন, সেইজন্যে আর কিছুতে ওঁকে ভোলাতে পারে না। আজ যখন আমার জীবনের দেনা-পাওনার হিসাব করি তখন এক দিকে একটা মস্ত ঠিকে-ভুল, একটা বড়ো লোকসান ধরা পড়ে, কিন্তু লোকসান ছাড়িয়ে উঠতে পারে এমন একটি লাভের অঙ্ক আমার জীবনে আছে সে কথা যেন জোর করে বলতে পারি।

আমাকে যখন উনি পড়ানো শেষ করেছেন তার পূর্বেই পিতৃবিয়োগ হয়ে আমি স্বাধীন হয়েছি। আমি মাস্টারমশায়কে বললুম, আপনি আমার কাছেই থাকুন, অন্য জায়গায় কাজ করবেন না।

তিনি বললেন, দেখো, তোমাকে আমি যা দিয়েছি তার দাম পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি যা দিয়েছি তার দাম যদি নিই তা হলে আমার ভগবানকে হাটে বিক্রি করা হবে।

বরাবর তাঁর বাসা থেকে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে চন্দ্রনাথবাবু আমাকে পড়াতে এসেছেন, কোনো-মতেই আমাদের গাড়িঘোড়া তাঁকে ব্যবহার করাতে পারলুম না। তিনি বলতেন, আমার বাবা চিরকাল বটতলা থেকে লালদিঘি পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আপিস করে আমাদের মানুষ করেছেন, শেয়ারের গাড়িতেও কখনো চাপেন নি, আমরা হচ্ছি পুরুষানুক্রমে পদাতিক।

আমি বললুম, নাহয় আমাদের বিষয়কর্মসংক্রান্ত একটা কাজ নিন।

তিনি বললেন, না বাবা, আমাকে তোমাদের বড়োমানুষির ফাঁদে ফেলো না, আমি মুক্ত থাকতে চাই।

তাঁর ছেলে এখন এম. এ. পাস করে চাকরি খুঁজছে। আমি বললুম, আমার এখানে তার একটা কাজ হতে পারে। ছেলেরও সেই ইচ্ছে খুব ছিল। প্রথমে সে তার বাপকে এই কথা জানিয়েছিল, সেখানে সুবিধে পায় নি। তখন লুকিয়ে আমাকে আভাস দেয়। তখনি আমি উৎসাহ করে চন্দ্রনাথবাবুকে বললুম। তিনি বললেন, না, এখানে তার কাজ হবে না—তাকে এতবড়ো সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাতে ছেলে বাপের উপর খুব রাগ করেছে। সে রেগে পত্নীহীন বুড়ো বাপকে একলা ফেলে রেঙুনে চলে গেল।

তিনি আমাকে বারবার বলেছেন, দেখো নিখিল, তোমার সম্বন্ধে আমি স্বাধীন, আমার সম্বন্ধে তুমি স্বাধীন, তোমার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। কল্যাণের সম্বন্ধকে অর্থের অনুগত করলে পরমার্থের অপমান করা হয়।

এখন তিনি এখানকার এন্ট্রেন্স্ স্কুলের হেড্‌মাস্টারি করেন। এতদিন তিনি আমাদের বাড়িতে পর্যন্ত থাকতেন না। এই কিছুদিন থেকে আমি প্রায় সন্ধেবেলায় তাঁর বাসায় গিয়ে রাত্রি এগারোটা

দুপুর পর্যন্ত নানা কথায় কাটিয়ে আসছিলুম। বোধ হয় ভাবলেন তাঁর ছোটো ঘর এই ভাদ্রমাসের গুমটে আমার পক্ষে ক্লেশকর, সেইজন্যেই তিনি নিজে আমার এখানে আশ্রয় নিয়েছেন। আশ্চর্য এই, বড়োমানুষের 'পরেও তাঁর গরিবের মতোই সমান দয়া, বড়োমানুষের দুঃখকেও তিনি অবজ্ঞা করেন না।

বাস্তবকে যত একান্ত করে দেখি ততই সে আমাদের পেয়ে বসে, আভাসমাত্রে সত্যকে যখন দেখি তখনি মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগে। বিমল আজ আমার জীবনে সেই বাস্তবকেই এত বেশি তীব্র করে তুলেছে যে, সত্য আমার পক্ষে আজ আচ্ছন্ন হবার জো হয়েছে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আমার দুঃখের আর সীমা খুঁজে পাচ্ছি নে। তাই আজ আমার এতটুকু ফাঁককে লোক-লোকান্তরে ছড়িয়ে দিয়ে শরতের সমস্ত সকাল ধরে গান গাইতে বসেছি—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর।

যখন চন্দ্রনাথবাবুর জীবনের বাতায়ন থেকে সত্যকে দেখতে পাই তখন ও গানের মানে একেবারেই বদলে যায়, তখন—

বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোয়াঁয়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া?

যত দুঃখ যত ভুল সব যে ঐ সত্যকে না পেয়ে। সেই সত্যকে জীবন ভরে না নিয়ে দিন রাত এমন করে কেমনে কাটবে? আর তো পারি নে, সত্য, তুমি এবার আমার শূন্য মন্দির ভরে দাও।

বিমলার আত্মকথা

সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাংলাদেশের চিত্ত যে কেমন হয়ে গেল তা বলতে পারি নে। ষাট হাজার সগরসন্তানের ছাইয়ের 'পরে এক মুহূর্তে যেন ভাগীরথীর জল এসে স্পর্শ করলে। কত যুগ-যুগান্তরের ছাই, রসাতলে পড়ে ছিল—কোনো আগুনের তাপে জ্বলে না, কোনো রসের মিশালে দানা বাঁধে না—সেই ছাই হঠাৎ একেবারে কথা কয়ে উঠল; বললে : এই-যে আমি!

বইয়ে পড়েছি, গ্রীস দেশের কোন্ মূর্তিকর দেবতার বরে আপনার মূর্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু সেই রূপের থেকে প্রাণের মধ্যে একটা ক্রমশ বিকাশ একটা সাধনার যোগ আছে; কিন্তু আমাদের দেশের শ্মশানের ভস্মরাশির মধ্যে সেই রূপের ঐক্য ছিল কোথায়? সে যদি পাথরের মতো আঁট শক্ত জিনিস হত তা হলেও তো বুঝতুম—অহল্যা পাষাণীও তো একদিন মানুষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ যে সব ছড়ানো, এ যে সৃষ্টিকর্তার মুঠোর ফাঁক দিয়ে কেবলই গলে গলে পড়ে, বাতাসে উড়ে উড়ে যায়, এ যে রাশ হয়ে থাকে, কিছুতে এক হয় না। অথচ সেই জিনিস হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের আঙিনার কাছে এসে মেঘগর্জনে বলে উঠল : অয়মহং ভোঃ!

তাই আমাদের সেদিন মনে হল, এ সমস্তই অলৌকিক। এই বর্তমান মুহূর্ত কোনো সুধা-রসোন্মত্ত দেবতার মুকুটের থেকে মানিকের মতো একেবারে আমাদের হাতের উপর খসে পড়ল; আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের এই বর্তমানের কোনো স্বাভাবিক পারম্পর্য নেই। এ দিনটি আমাদের সেই ওষুধের মতো যা খুঁজে বের করি নি, যা কিনে আনি নি, যা কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া নয়, যা আমাদের স্বপ্নলব্ধ।

সেইজন্যে মনে হল, আমাদের সব দুঃখ সব তাপ আপনি মন্ত্রে সেরে যাবে। সম্ভব-অসম্ভবের কোনো সীমা কোথাও রইল না। কেবলই মনে হতে লাগল, এই হল বলে, হল বলে।

আমাদের সেদিন মনে হয়েছিল ইতিহাসের কোনো বাহন নেই, পুষ্পকরথের মতো সে আপনি চলে আসে। অন্তত তার মাতলিকে কোনো মাইনে দিতে হয় না; তার খোরাকির জন্য কোনো ভাবনা নেই, কেবল ক্ষণে ক্ষণে তার মদের পেয়ালা ভর্তি করে দিতে হয়— আর তার পরেই হঠাৎ একেবারে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি।

আমার স্বামী যে অবিচলিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে তাঁকে যেন একটা বিষাদ এসে আঘাত করত। যেটা সামনে দেখা যাচ্ছে তার উপর দিয়েও তিনি যেন আর একটা-কিছুকে দেখতে পেতেন। মনে আছে সন্দীপের সঙ্গে তর্কে তিনি একদিন বলেছিলেন, সৌভাগ্য হঠাৎ এসে আমাদের দরজার কাছে হাঁক দিয়ে যায় কেবল দেখবার জন্যে যে তাকে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের নেই, তাকে ঘরের মধ্যে নিমন্ত্রণ করে বসাবার কোনো আয়োজন আমরা করি নি।

সন্দীপ বললেন, দেখো নিখিল, তুমি দেবতাকে মান না, সেইজন্যেই এমন নাস্তিকের মতো কথা কও। আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি দেবী বর দিতে এসেছেন, আর তুমি অবিশ্বাস করছ?

আমার স্বামী বললেন, আমি দেবতাকে মানি, সেইজন্যেই অন্তরের মধ্যে নিশ্চিত জানি তাঁর পুজো আমরা জোটাতে পারলুম না। বর দেবার শক্তি দেবতার আছে, কিন্তু বর নেবার শক্তি আমাদের থাকা চাই।

আমার স্বামীর এই রকমের কথায় আমার ভারি রাগ হত। আমি তাঁকে বললুম, তুমি মনে কর দেশের এই উদ্দীপনা এ কেবলমাত্র একটা নেশা। কিন্তু নেশায় কি শক্তি দেয় না?

তিনি বললেন, শক্তি দেয়, কিন্তু অস্ত্র দেয় না।

আমি বললুম, শক্তি দেবতা দেন, সেইটেই দুর্লভ, আর অস্ত্র তো সামান্য কামারেও দিতে পারে।

স্বামী হেসে বললেন, কামার তো অমনি দেয় না, তাকে দাম দিতে হয়।

সন্দীপ বুক ফুলিয়ে বললেন, দাম দেব গো দেব।

স্বামী বললেন, যখন দেবে তখন আমি উৎসবের রোশনচৌকি বায়না দেব।

সন্দীপ বললেন, তোমার বায়নার আশায় আমরা বসে নেই। আমাদের নিকড়িয়া উৎসব কড়ি দিয়ে কিনতে হবে না।

বলে তিনি তাঁর ভাঙা মোটা গলায় গান ধরলেন—

আমার নিকড়িয়া রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।

আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, মক্ষীরানী, গান যখন প্রাণে আসে তখন গলা না থাকলেও যে বাধে না এইটে প্রমাণ করে দেবার জন্যেই গাইলুম। গলার জোরে গাইলে গানের জোর হাল্কা হয়ে যায়। আমাদের দেশে হঠাৎ ভরপুর গান এসে পড়েছে, এখন নিখিল বসে বসে গোড়া থেকে সারগম সাধতে থাকুক, ইতিমধ্যে আমরা ভাঙা গলায় মাতিয়ে তুলব।

আমার ঘর বলে, তুই কোথায় যাবি,
বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি—
আমার প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব
যাক-না উড়ে পুড়ে।

আচ্ছা, নাহয় আমাদের সর্বনাশই হবে, তার বেশি তো নয়? রাজি আছি, তাতেই রাজি আছি।

ওগো, যায় যদি তো যাক-না চুকে,
সব হারাব হাসিমুখে,
আমি এই চলেছি মরণসুধা
নিতে পরান পুরে।

আসল কথা হচ্ছে নিখিল, আমাদের মন ভুলেছে, আমরা সুসাধ্য-সাধনের গণ্ডির মধ্যে টি'কতে পারব না, আমরা অসাধ্য-সাধনের পথে বেরিয়ে পড়ব।

ওগো, আপন যারা কাছে টানে
এ রস তারা কেই বা জানে,
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে
ডাক দিয়েছে দূরে।
এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা
পড়ুক ভেঙে-চুরে।

মনে হল আমার স্বামীর কিছু বলবার আছে, কিন্তু তিনি বললেন না, আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

সমস্ত দেশের উপর এই-যে একটা প্রবল আবেগ হঠাৎ ভেঙে পড়ল, ঠিক এই জিনিসটাই আমার জীবনের মধ্যে আর-এক সুর নিয়ে ঢুকেছিল। আমার ভাগ্য-দেবতার রথ আসছে, কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দে দিনরাত্রি আমার বুকের ভিতর গুর গুর করছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল একটা কী পরমাশ্চর্য এসে পড়ল বলে, তার জন্যে আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। পাপ? যে ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্য, যে ক্ষেত্রে বিচার-বিবেক, যে ক্ষেত্রে দয়া মায়া, সে ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবার পথ হঠাৎ আপনিই যে খুলে গেছে। আমি তো একে কোনোদিন কামনা করি নি, এর জন্যে প্রত্যাশা করে বসে থাকি নি, আমার সমস্ত জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি এর জন্যে আমার তো কোনো জবাবদিহি নেই। এতদিন একমনে আমি যার পূজা করে এলুম বর দেবার বেলা এ যে এল আর-এক দেবতা। তাই, সমস্ত দেশ যেমন জেগে উঠে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছে 'বন্দে মাতরং' আমার প্রাণ তেমনি করে তার সমস্ত শিরা-উপশিরার কুহরে কুহরে আজ বাজিয়ে তুলেছে 'বন্দে'— কোন্ অজানাকে, অপূর্বকে, কোন্ সকল-সৃষ্টি-ছাড়াকে!

দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এই মিল! এক-একদিন অনেক রাত্রে আস্তে আস্তে আমার বিছানা থেকে উঠে খোলা ছাদের উপর দাঁড়িয়েছি। আমাদের বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে আধপাকা ধানের খেত, তার উত্তরে গ্রামের ঘন গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নদীর জল এবং তারও পরপারে বনের রেখা, সমস্তই যেন বিরাট রাত্রির গর্ভের মধ্যে কোন্-এক ভাবী সৃষ্টির ভ্রূণের মতো অস্ফুট আকারে ঘুমিয়ে রয়েছে। আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেয়েছি, আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারই মতো একটি মেয়ে। সে ছিল আপন আঙিনার কোণে, আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েছে। সে কিছুই ভাববার সময় পেলে না, সে চলেছে সামনের অন্ধকারে; একটা দীপ জ্বেলে নেবারও সবুর তার সয় নি। আমি জানি এই সুপ্তরাত্রে তার বুক কেমন করে উঠছে পড়ছে। আমি জানি, যে দূর থেকে বাঁশি ডাকছে ওর সমস্ত মন এমনি করে সেখানে ছুটে গেছে যে ওর মনে হচ্ছে যেন পেয়েছি, যেন পৌঁচেছি, যেন এখন চোখ বুজে চললেও কোনো ভয় নেই। না, এ তো মাতা নয়। সন্তানকে স্তন দিতে হবে, অন্ধকারের প্রদীপ জ্বালাতে হবে, ঘরের ধুলো ঝাঁট দিতে হবে, সে কথা তো এর খেয়ালে আসে না। এ আজ অভিসারিকা। এ আমাদের বৈষ্ণব-পদাবলীর দেশ। এ ঘর ছেড়েছে, কাজ ভুলেছে। এর আছে কেবল অন্তহীন আবেগ; সেই আবেগে সে চলেছে মাত্র, কিন্তু পথে কি কোথায় সে কথা তার মনেও নেই। আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা। আমি ঘরও হারিয়েছি, পথও হারিয়েছি। উপায় এবং লক্ষ্য দুইই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে, কেবল আছে আবেগ আর চলা। ওরে নিশাচরী, রাত যখন রাঙা হয়ে পোহাবে তখন ফেরবার পথের যে চিহ্নও দেখতে পাবি নে। কিন্তু ফিরব কেন, মরব। যে কালো অন্ধকার বাঁশি বাজাল সে যদি আমার সর্বনাশ করে, কিছুই যদি সে আমার বাকি না রাখে, তবে আর আমার ভাবনা কিসের? সব যাবে; আমার কণাও থাকবে না, চিহ্নও থাকবে না, কালোর মধ্যে

আমার সব কালো একেবারে মিশিয়ে যাবে; তার পরে কোথায় ভালো কোথায় মন্দ, কোথায় হাসি কোথায় কান্না!

সেদিন বাংলাদেশে সময়ের কলে পুরো ইস্টিম দেওয়া হয়েছিল। তাই যা সহজে হবার নয় তা দেখতে দেখতে ধাঁ ধাঁ করে হয়ে উঠছিল। বাংলাদেশের যে কোণে আমরা থাকি এখানেও কিছুই আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না এমনি মনে হতে লাগল। এতদিন আমাদের এদিকে বাংলাদেশের অন্য অংশের চেয়ে বেগ কিছু কম ছিল। তার প্রধান কারণ, আমার স্বামী বাইরের দিক থেকে কারও উপর কোনো চাপ দিতে চান না। তিনি বলতেন, দেশের নামে ত্যাগ যারা করবে তারা সাধক, কিন্তু দেশের নামে উপদ্রব যারা করবে তারা শত্রু; তারা স্বাধীনতার গোড়া কেটে স্বাধীনতার আগায় জল দিতে চায়।

কিন্তু সন্দীপবাবু যখন এখানে এসে বসলেন তাঁর চেলারা চার দিক থেকে আনাগোনা করতে লাগল, মাঝে মাঝে হাটে বাজারে বক্তৃতাও হতে থাকল, তখন এখানেও ঢেউ উঠতে লাগল। একদল স্থানীয় যুবক সন্দীপের সঙ্গে জুটে গেল। তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা গ্রামের কলঙ্ক। উৎসাহের দীপ্তির দ্বারা তারাও ভিতরে বাহিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এটা বেশ বোঝা গেল, দেশের হাওয়ার মধ্যে যখন আনন্দ বইতে থাকে তখন মানুষের বিকৃতি আপনি সেরে যায়। মানুষের পক্ষে সুস্থ সরল সবল হওয়া বড়ো কঠিন যখন দেশে আনন্দ না থাকে।

এই সময়ে সকলের চোখে পড়ল আমার স্বামীর এলাকা থেকে বিলিতি নুন বিলিতি চিনি বিলিতি কাপড় এখনো নির্বাসিত হয় নি। এমন-কি, আমার স্বামীর আমলারা পর্যন্ত এই নিয়ে চঞ্চল এবং লজ্জিত হয়ে উঠতে লাগল। অথচ কিছুদিন পূর্বে আমার স্বামী যখন এখানে স্বদেশী জিনিসের আমদানি করেছিলেন তখন এখানকার ছেলেবুড়ো সকলেই তা নিয়ে মনে মনে এবং প্রকাশ্যে হাসাহাসি করেছিল। দিশি জিনিসের সঙ্গে যখন আমাদের স্পর্ধার যোগ ছিল না তখন তাকে আমরা মনে প্রাণে অবজ্ঞা করেছি। এখনো আমার স্বামী তাঁর সেই দিশি ছুরিতে দিশি পেন্সিল কাটেন, খাগড়ার কলমে লেখেন, পিতলের ঘটিতে জল খান এবং সন্ধ্যার সময়ে শামাদানে দিশি বাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করেন; কিন্তু তাঁর এই অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে আমরা মনের মধ্যে কোনো রস পাই নি। বরঞ্চ তখন তাঁর বসবার ঘরে আসবাবের দৈন্যে আমি বরাবর লজ্জা বোধ করে এসেছি, বিশেষত বাড়িতে যখন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা আর কোনো সাহেব-সুবোর সমাগম হত। আমার স্বামী হেসে বলতেন, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি অত বিচলিত হচ্ছ কেন।

আমি বলতুম, ওরা যে আমাদের অসভ্য অজবুগ মনে করে যাবে।

তিনি বলতেন, তা যখন মনে করবে তখন আমিও এই কথা মনে করব ওদের সভ্যতা চামড়ার উপরকার সাদা পালিশ পর্যন্ত, বিশ্বমানুষের ভিতরকার লাল রক্তধারা পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

ওঁর ডেস্কে একটি সামান্য পিতলের ঘটিকে উনি ফুলদানি করে ব্যবহার করতেন। কতদিন কোনো সাহেব আসবার খবর পেলে আমি লুকিয়ে সেটিকে সরিয়ে বিলিতি রঙিন কাচের ফুল-দানিতে ফুল সাজিয়ে রেখেছি।

আমার স্বামী বলতেন, দেখো বিমল, ফুলগুলি যেমন আত্মবিস্মৃত আমার এই পিতলের ঘটিটিও তেমনি। কিন্তু তোমার ঐ বিলিতি ফুলদানি অত্যন্ত বেশি করে জানায় যে ও ফুলদানি, ওতে গাছের ফুল না রেখে পশমের ফুল রাখা উচিত।

তখন এ সম্বন্ধে তাঁর একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন মেজোরানী। তিনি একেবারে হাঁপিয়ে এসে বলতেন, ঠাকুরপো, শুনেছি আজকাল দিশি সাবান উঠেছে নাকি— আমাদের তো ভাই, সাবান মাখার দিন উঠেই গেছে, তবে ওতে যদি চর্বি না থাকে তা হলে মাখতে পারি। তোমাদের বাড়িতে এসে অবধি ঐ এক অভ্যেস হয়ে গেছে। অনেক দিন তো ছেড়েই দিয়েছি, তবু সাবান না মেখে আজও মনে হয় যেন স্নানটা ঠিকমত হল না।

এতেই আমার স্বামী ভারি খুশি। বাক্স বাক্স দিশি সাবান আসতে লাগল। সে কি সাবান না

সাজিমাটির ডেলা? আমি বুঝি জানি নে? স্বামীর আমলে মেজোরানী যে বিলিতি সাবান মাখতেন আজও সমানে তাই চলেছে, একদিনও কামাই নেই। ঐ দিশি সাবান দিয়ে তাঁর কাপড়-কাচা চলতে লাগল।

আর-একদিন এসে বললেন, ভাই ঠাকুরপো, দিশি কলম নাকি উঠেছে, সে তো আমার চাই! মাথা খাও, আমাকে এক বান্ডিল—

ঠাকুরপো মহা উৎসাহিত। কলমের নাম ধরে যত রকমের দাঁতনের কাঠি তখন বেরিয়েছিল সব মেজোরানীর ঘরে বোঝাই হতে লাগল। ওতে ওঁর কোনো অসুবিধা ছিল না, কেননা লেখাপড়ার সম্পর্ক ওঁর ছিল না বললেই হয়। ধোবার বাড়ির হিসেব শজনের ডাঁটা দিয়ে লেখাও চলে। তাও দেখেছি লেখবার বাক্সের মধ্যে ওঁর সেই পুরোনো কালের হাতির দাঁতের কলমটি আছে, যখন কালে-ভদ্রে লেখার শখ যায় তখন ঠিক সেইটেরই উপরে হাত পড়ে।

আসল কথা, আমি যে আমার স্বামীর খেয়ালে যোগ দিই নে, সেইটের কেবল জবাব দেবার জন্যেই উনি এই কান্ডটি করতেন। অথচ আমার স্বামীকে ওঁর এই ছলনার কথা বলবার জো ছিল না। বলতে গেলেই তিনি এমন মুখ করে চুপ করে থাকতেন যে বুঝতুম যে, উল্টো ফল হল। এ-সব মানুষকে ঠকানোর হাত থেকে বাঁচাতে গেলেই ঠকতে হয়।

মেজোরানী সেলাই ভালোবাসেন; একদিন যখন সেলাই করছেন তখন আমি স্পষ্টই তাঁকে বললুম, এ তোমার কী কান্ড! এ দিকে তোমার ঠাকুরপোর সামনে দিশি কাঁচির নাম করতেই তোমার জিব দিয়ে জল পড়ে, ও দিকে সেলাই করবার বেলা বিলিতি কাঁচি ছাড়া যে তোমার এক দন্ড চলে না!

মেজোরানী বললেন, তাতে দোষ হয়েছে কী? কত খুশি হয় বল্‌ দেখি। ছোটোবেলা থেকে ওর সঙ্গে যে একসঙ্গে বেড়েছি, তোদের মতো ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারি নে। পুরুষমানুষ, ওর আর তো কোনো নেশা নেই—এক, এই দিশি দোকান নিয়ে খেলা, আর, ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই—এইখেনেই ও মজবে!

আমি বললুম, যাই বল, পেটে এক মুখে এক ভালো নয়।

মেজোরানী হেসে উঠলেন; বললেন, ওলো সরলা, তুই যে দেখি বড্ড বেশি সিধে, একেবারে গুরুমশায়ের বেতকাঠির মতো। মেয়েমানুষ অত সোজা নয়; সে নরম বলেই অমন একটু-আধটু নুয়ে থাকে, তাতে দোষ নেই।

মেজোরানীর সেই কথাটি ভুলব না, ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই, এইখেনেই ও মজবে।

আজ আমার কেবলই মনে হয়, পুরুষমানুষের একটা নেশা চাই, কিন্তু সে নেশা যেন মেয়ে-মানুষ না হয়।

আমাদের শুকসায়রের হাট এ জেলার মধ্যে মস্ত বড়ো হাট। এখানে জোলার এ ধারে নিত্য বাজার বসে, আর জোলার ও ধারে প্রতি শনিবারে হাট লাগে। বর্ষার পর থেকেই এই হাট বেশি করে জমে। তখন নদীর সঙ্গে জোলার যোগ হয়ে যাতায়াতের পথ সহজ হয়ে যায়। তখন সুতো এবং আগামী শীতের জন্যে গরম কাপড়ের আমদানি খুব বেড়ে ওঠে।

সেই সময়টাতে দিশি কাপড় আর দিশি নুন-চিনির বিরোধ নিয়ে বাংলাদেশের হাটে হাটে তুমুল গন্ডগোল বেধেছে। আমাদের সকলেরই খুব একটা জেদ চড়ে গেছে। আমাকে সন্দীপ এসে বললেন, এত বড়ো হাটবাজার আমাদের হাতে আছে এটাকে আগাগোড়া স্বদেশী করে তুলতে হবে; এই এলাকা থেকে বিলিতি অলক্ষ্মীকে কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করা চাই।

আমি কোমর বেঁধে বললুম, চাই বৈকি।

সন্দীপ বললেন, এ নিয়ে নিখিলের সঙ্গে আমার অনেক কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে, কিছুতে পেরে উঠলুম না। ও বলে, বক্তৃতা পর্যন্ত চলবে, কিন্তু জবরদস্তি চলবে না।

আমি একটু অহংকার করেই বললুম, আচ্ছা, সে আমি দেখছি।

আমি জানি আমার উপর আমার স্বামীর ভালোবাসা কত গভীর। সেদিন আমার বুদ্ধি যদি স্থির থাকত তা হলে আমার পোড়া মুখ নিয়ে এমন দিনে সেই ভালোবাসার উপর দাবি করতে যেতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেত। কিন্তু সন্দীপকে যে দেখাতে হবে আমার শক্তি কত! তাঁর কাছে আমি যে শক্তিরূপিণী! তিনি তাঁর আশ্চর্য ব্যাখ্যার দ্বারা বার বার আমাকে এই কথাই বুঝিয়েছেন যে, পরমাশক্তি এক-একজন বিশেষ মানুষের কাছে এক-একজন বিশেষ মানুষেরই রূপে দেখা দেন; তিনি বলেন, আমরা বৈষ্ণবতত্ত্বের হ্লাদিনীশক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখবার জন্যেই এত ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি, যখন কোথাও দেখতে পাই তখনি স্পষ্ট বুঝতে পারি আমার অন্তরের মধ্যে যে ত্রিভঙ্গ বাঁশি বাজাচ্ছেন তাঁর বাঁশির অর্থটা কী। বলতে বলতে এক-একদিন গান ধরতেন—

যখন দেখা দাও নি, রাধা, তখন বেজেছিল বাঁশি।
এখন চোখে চোখে চেয়ে সুর যে আমার গেল ভাসি।
তখন নানা তানের ছলে
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে,
এখন আমার সকল কাঁদা রাধার রূপে উঠল হাসি।

এই-সব কেবলই শুনতে শুনতে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি বিমলা। আমি শক্তিতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব, আমার কোনো বন্ধন নেই, আমার মধ্যে সমস্তই সম্ভব, আমি যা-কিছুকে স্পর্শ করছি তাকেই নূতন করে সৃষ্টি করছি—নূতন করে সৃষ্টি করেছি আমার এই জগৎকে—আমার হৃদয়ের পরশমণি ছোঁয়াবার আগে শরতের আকাশে এত সোনা ছিল না। আর মুহূর্তে মুহূর্তে আমি নূতন করছি ঐ বীরকে, ঐ সাধককে—ঐ আমার ভক্তকে—ঐ জ্ঞানে উজ্জ্বল, তেজে উদ্দীপ্ত, ভাবের রসে অভিষিক্ত অপূর্ব প্রতিভাকে। আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি, ওর মধ্যে প্রতিক্ষণে আমি নূতন প্রাণ ঢেলে দিচ্ছি, ও আমার নিজেরই সৃষ্টি। সেদিন অনেক অনুরোধ করে সন্দীপ তাঁর একটি বিশেষ ভক্ত বালক অমূল্যচরণকে আমার কাছে এনেছিলেন। একদণ্ড পরেই আমি দেখতে পেলুম তার চোখের তারার মধ্যে একটা নূতন দীপ্তি জ্বলে উঠল, বুঝলুম সে আদ্যা-শক্তিকে দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পারলুম ওর রক্তের মধ্যে আমারই সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়েছে। পরদিন সন্দীপ আমাকে এসে বললেন, এ কী মন্ত্র তোমার, ও বালক তো আর সেই বালক নেই, ওর পলতেয় এক মুহূর্তে শিখা ধরে গেছে। তোমার এ আগুনকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে কে? একে একে সবাই আসবে। একটি একটি করে প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে একদিন যে দেশে দেয়ালির উৎসব লাগবে।

নিজের এই মহিমার নেশায় মাতাল হয়েই আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম, ভক্তকে আমি বরদান করব। আর এও আমার মনে ছিল, আমি যা চাইব তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সেদিন সন্দীপের কাছ থেকে ফিরে এসেই চুল খুলে ফেলে আমি নতুন করে চুল বাঁধলুম। ঘাড়ের থেকে এঁটে চুলগুলোকে মাথার উপরের দিকে টেনে তুলে আমার মেম আমাকে এক-রকম খোঁপা বাঁধতে শিখিয়েছিলেন। আমার স্বামী আমার সেই খোঁপা খুব ভালোবাসতেন; তিনি বলতেন, ঘাড় জিনিসটা যে কত সুন্দর হতে পারে তা বিধাতা কালিদাসের কাছে প্রকাশ না করে আমার মতো অ-কবির কাছে খুলে দেখালেন! কবি হয়তো বলতেন পদ্মের মৃণাল, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যেন মশাল, তার ঊর্ধ্বে তোমার কালো খোঁপার কালো শিখা উপরের দিকে জ্বলে উঠেছে। এই বলে তিনি আমার সেই চুল-তোলা ঘাড়ের উপর—হায় রে, সে কথা আর কেন।

তার পরে তাঁকে ডেকে পাঠালুম। আগে এমন ছোটোখাটো সত্যমিথ্যা নানা ছুতোয় তাঁর ডাক পড়ত। কিছুদিন থেকে ডাকবার সব উপলক্ষই বন্ধ হয়ে গেছে, বানাবার শক্তিও নেই।

নিখিলেশের আত্মকথা

পঞ্চুর স্ত্রী যক্ষ্মায় ভুগে ভুগে মরেছে। পঞ্চুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সমাজ হিসেব করে বলেছে, খরচ লাগবে সাড়ে তেইশ টাকা।

আমি রাগ করে বললুম, নাই বা করলি প্রায়শ্চিত্ত, তোর ভয় কিসের?

সে ক্লান্ত গোরুর মতো তার ধৈর্যভারপূর্ণ চোখ তুলে বললে, মেয়েটি আছে, বিয়ে দিতে হবে। আর, বউয়েরও তো গতি করা চাই।

আমি বললুম, পাপই যদি হয়ে থাকে, এতদিন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত তো কম হয় নি।

সে বললে, আজ্ঞে, কম কী! ডাক্তার-খরচায় জমিজমা কিছু বিক্রি আর বাকি সমস্ত বন্ধক পড়ে গেছে। কিন্তু দান-দক্ষিনে ব্রাহ্মণভোজন না হলে তো খালাস পাই নে।

তর্ক করে কী হবে? মনে মনে বললুম, যে ব্রাহ্মণ ভোজন করে তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে হবে?

একে তো পঞ্চু বরাবরই উপবাসের ধার ঘেঁষে কাটিয়েছে, তার উপরে এই স্ত্রীর চিকিৎসা এবং সৎকার উপলক্ষে সে একেবারে অগাধ জলে পড়ল। এই সময়ে কোনোরকম করে একটা সান্ত্বনা পাবার জন্যে সে এক সন্ন্যাসী সাধুর চেলাগিরি শুরু করলে। তাতে হল এই, তার ছেলেমেয়েরা যে খেতে পাচ্ছে না সেইটে ভুলে থাকবার একটা নেশায় সে ডুবে রইল। বুঝে নিলে সংসারটা কিছুই না; সুখ যেমন নেই তেমনি দুঃখটাও স্বপ্নমাত্র। অবশেষে একদিন রাত্রে ছেলেমেয়ে চারটিকে ভাঙা ঘরে ফেলে রেখে সে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এ-সব কথা আমি কিছুই জানতুম না। আমার মনটার মধ্যে তখন সুরাসুরের মন্থন চলছিল। মাস্টারমশায় যে পঞ্চুর ছেলেমেয়েগুলিকে নিজের বাসায় রেখে মানুষ করছেন সে কথাও আমাকে জানান নি। তখন তাঁর নিজের ছেলে তার বউকে নিয়ে রেঙ্গুন চলে গেছে; ঘরে তিনি একলা, তাঁর আবার সমস্ত দিন ইস্কুল।

এমনি করে এক মাস যখন কেটে গেছে তখন একদিন সকালবেলায় পঞ্চু এসে উপস্থিত। তার বৈরাগ্যের ঘোর ভেঙেছে। যখন তার বড়ো ছেলেমেয়ে দুটি তার কোলের কাছে মাটির উপর বসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে 'বাবা, তুই কোথায় গিয়েছিলি', সব-ছোটো ছেলেটি তার কোল দখল করে বসলে, আর সেজো মেয়েটি পিঠের উপর পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে, তখন কান্নার পর কান্না— কিছুতে তার কান্না থামতে চায় না। বলতে লাগল, মাস্টারবাবু, এগুলোকে দু-বেলা পেট ভরে খাওয়াব সে শক্তিও নেই, আবার এদের ফেলে রেখে দৌড় মারব সে মুক্তিও নেই, এমন করে বেঁধে মার কেন? আমি কী পাপ করেছিলুম?

এ দিকে যে ব্যাবসাটুকু ধরে কোনোমতে তার দিন চলছিল তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রথম দিনকতক ঐ যে মাস্টারমশায়ের ওখানে সে বাসা পেলে সেইটেকেই সে টেনে চলতে লাগল, তার নিজের বাড়িতে নড়বার নাম করতেও চায় না। শেষকালে মাস্টারমশায় তাকে বললেন, পঞ্চু, তুমি বাড়িতে যাও, নইলে তোমার ঘরদুয়ারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তোমাকে কিছু টাকা ধার দিচ্ছি, তুমি কাপড়ের ব্যাবসা করে অল্প অল্প করে শোধ দিয়ো।

প্রথমটা পঞ্চুর মনে একটু খেদ হল; মনে করলে দয়াধর্ম বলে একটা জিনিস জগতে নেই। তার পরে টাকাটা নেবার বেলায় মাস্টারমশায় যখন হ্যান্ডনোট লিখিয়ে নিলেন তখন ভাবলে, শোধ তো করতে হবে, এমন উপকারের মূল্য কী! মাস্টারমশায় কাউকে বাইরের দিকে দান করে ভিতরের দিকে ঋণী করতে নিতান্ত নারাজ; তিনি বলেন, মনের ইজ্জত চলে গেলে মানুষের জাত মারা হয়।

হ্যান্ডনোটে টাকা নেওয়ার পর পঞ্চু মাস্টারমশায়কে খুব বড়ো করে প্রণাম করতে আর পারলে না, পায়ের ধুলোটা বাদ পড়ল। মাস্টারমশায় মনে মনে হাসলেন, তিনি প্রণামটা খাটো

করতে পারলেই বাঁচেন। তিনি বলেন, আমি শ্রদ্ধা করব, আমাকে শ্রদ্ধা করবে, মানুষের সঙ্গে এই সম্বন্ধই আমার খাঁটি; ভক্তি আমার পাওনার অতিরিক্ত।

পঞ্চু কিছু ধুতি-শাড়ি কিছু শীতের কাপড় কিনে আনিয়ে চাষিদের ঘরে ঘরে বেচে বেড়াতে লাগল। নগদ দাম পেত না বটে, তেমনি কিছু বা ধান, কিছু বা পাট, কিছু বা অন্য ফসল, যা হাতে হাতে আদায় করে আনত সেটা দামে কাটা যেত না। দু মাসের মধ্যেই সে মাস্টারমশায়ের এক কিস্তি সুদ এবং আসলের কিছু শোধ করে দিলে এবং এই ঋণশোধের অংশ প্রণামের থেকে কাটান পড়ল। পঞ্চু নিশ্চয় মনে করতে লাগল, মাস্টারমশায়কে সে যে একদিন গুরু বলে ঠাউরেছিল, ভুল করেছিল; লোকটার কাঞ্চনের প্রতি দৃষ্টি আছে।

এই রকমে পঞ্চুর দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে স্বদেশীর বান খুব প্রবল হয়ে এসে পড়ল। আমাদের এবং আশপাশের গ্রাম থেকে যে-সব ছেলে কলকাতার স্কুলে কলেজে পড়ত তারা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এল, তাদের অনেকে স্কুল কলেজ ছেড়ে দিলে। তারা সবাই সন্দীপকে দলপতি করে স্বদেশী-প্রচারে মেতে উঠল। এদের অনেকেই আমার অবৈতনিক স্কুল থেকে এন্‌ট্রেন্স্‌ পাস করে গেছে, অনেককেই আমি কলকাতায় পড়বার বৃত্তি দিয়েছি। এরা একদিন দল বেঁধে আমার কাছে এসে উপস্থিত। বললে, আমাদের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো র‍্যাপার প্রভৃতি একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে।

আমি বললুম, সে আমি পারব না।

তারা বললে, কেন, আপনার লোকসান হবে?

বুঝলুম, কথাটা আমাকে একটু অপমান করে বলবার জন্যে। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, আমার লোকসান নয়, গরিবের লোকসান।

মাস্টারমশায় ছিলেন; তিনি বলে উঠলেন, হাঁ, ওঁর লোকসান বৈকি, সে লোকসান তো তোমাদের নয়।

তারা বললে, দেশের জন্যে—

মাস্টারমশায় তাদের কথা চাপা দিয়ে বললেন, দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই-সমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কী নুন খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ, এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন।

তারা বললে, আমরা নিজেরাও তো দিশি নুন দিশি চিনি দিশি কাপড় ধরেছি।

তিনি বললেন, তোমাদের মনে রাগ হয়েছে, জেদ হয়েছে, সেই নেশায় তোমরা যা করছ খুশি হয়ে করছ। তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ, তোমাদের সেই খুশিতে ওরা তো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরে। ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাঁচনেব টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ছে কেবল-মাত্র কোনোমতে টিঁকে থাকবার জন্যে—ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না—ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়? জীবনের মহলে বরাবর তোমরা এক কোঠায়, ওরা আর-এক কোঠায় কাটিয়ে এসেছে; আর আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও, তোমাদের রাগের ঝাল ওদের দিয়ে মিটিয়ে নেবে? আমি তো একে কাপুরুষতা মনে করি। তোমরা নিজে যত দূর পর্যন্ত পার করো, মরণ পর্যন্ত—আমি বুড়োমানুষ, নেতা বলে তোমাদের নমস্কার করে পিছনে পিছনে চলতে রাজি আছি। কিন্তু ঐ গরিবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয়পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।

তারা প্রায় সকলেই মাস্টারমশায়ের ছাত্র, স্পষ্ট কোনো কটু কথা বলতে পারল না, কিন্তু রাগে

তাদের রক্ত গরম হয়ে বুকের মধ্যে ফুটতে লাগল। আমার দিকে চেয়ে বললে, দেখুন, সমস্ত দেশ আজ যে ব্রত গ্রহণ করেছে কেবল আপনি তাতে বাধা দেবেন?

আমি বললুম, আমি বাধা দিতে পারি এমন সাধ্য আমার কী আছে! আমি বরং প্রাণপণে তার আনুকূল্য করব।

এম. এ. ক্লাসের ছাত্রটি বাঁকা হাসি হেসে বললে, কী আনুকূল্যটা করছেন?

আমি বললুম, দিশি মিল থেকে দিশি কাপড় দিশি সুতো আনিয়ে আমাদের হাটে রাখিয়েছি; এমন-কি, অন্য এলেকার হাটেও আমাদের সুতো পাঠাই—

সে ছাত্রটি বলে উঠল, কিন্তু আমরা আপনার হাটে গিয়ে দেখে এসেছি, আপনার দিশি সুতো কেউ কিনছে না।

আমি বললুম, সে আমার দোষ নয়, আমার হাটের দোষ নয়; তার একমাত্র কারণ, সমস্ত দেশ তোমাদের ব্রত নেয় নি।

মাস্টারমশায় বললেন, শুধু তাই নয়, যারা ব্রত নিয়েছে তারা বিব্রত করবারই ব্রত নিয়েছে। তোমরা চাও, যারা ব্রত নেয় নি তারাই ঐ সুতো কিনে যারা ব্রত নেয় নি এমন লোককে দিয়ে কাপড় বোনাবে, আর যারা ব্রত নেয় নি তাদের দিয়ে এই কাপড় কেনাবে। কী উপায়ে? না তোমাদের গায়ের জোরে আর জমিদারের পেয়াদার তাড়ায়। অর্থাৎ ব্রত তোমাদের, কিন্তু উপবাস করবে ওরা, আর উপবাসের পারণ করবে তোমরা।

সায়ান্স্‌ ক্লাসের ছাত্রটি বললে, আচ্ছা বেশ, উপবাসের কোন্‌ অংশটা আপনারাই নিয়েছেন শুনি।

মাস্টারমশায় বললেন, শুনবে? দিশি মিল থেকে নিখিলের সেই সুতো নিখিলকেই কিনতে হচ্ছে, নিখিলই সেই সুতোয় জোলাদের দিয়ে কাপড় বোনাচ্ছে, তাঁতের ইস্কুল খুলে বসেছে, তার পরে বাবাজির যে-রকম ব্যাবসাবুদ্ধি তাতে সেই সুতোয় গামছা যখন তৈরি হবে তখন তার দাম দাঁড়াবে কিংখাবের টুকরোর মতো, সুতরাং সে গামছা নিজেই কিনে উনি ওঁর বসবার ঘরের পর্দা খাটাবেন, সে পর্দায় ওঁর ঘরের আবরু থাকবে না; ততদিনে তোমাদের যদি ব্রত সাঙ্গ হয় তখন দিশি কারুকার্যের নমুনা দেখে তোমরাই সব চেয়ে চেঁচিয়ে হাসবে—আর, কোথাও যদি সেই রঙিন গামছার অর্ডার এবং আদর মেলে সে ইংরেজের কাছে।

এতদিন ওঁর কাছে আছি, মাস্টারমশায়ের এমনতরো শান্তিভঙ্গ হতে আমি কোনোদিন দেখি নি। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কিছুদিন থেকে ওঁর হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা নিঃশব্দে জমে আসছে; সে কেবল আমাকে ভালোবাসেন ব'লে। সেই বেদনাতেই ওঁর ধৈর্যের বাঁধ ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে দিয়েছে।

মেডিকেল কলেজের ছাত্র বলে উঠল, আপনারা বয়সে বড়ো, আপনাদের সঙ্গে তর্ক আমরা করব না। তা হলে এক কথায় বলুন, আপনাদের হাট থেকে বিলিতি মাল আপনারা সরাবেন না?

আমি বললুম, না, সরাব না, কারণ, সে মাল আমার নয়।

এম. এ. ক্লাসের ছাত্রটি ঈষৎ হেসে বললে, কারণ, তাতে আপনার লোকসান আছে।

মাস্টারমশায় বললেন, হাঁ, তাতে ওঁর লোকসান আছে, সুতরাং সে উনিই বুঝবেন।

তখন ছাত্রেরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে 'বন্দেমাতরং' বলে চীৎকার করে বেরিয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই মাস্টারমশায় পঞ্চুকে আমার কাছে নিয়ে এসে উপস্থিত। ব্যাপার কী?

ওদের জমিদার হরিশ কুণ্ডু পঞ্চুকে একশো টাকা জরিমানা করেছে।

কেন, ওর অপরাধ কী?

ও বিলিতি কাপড় বেচেছে। ও জমিদারকে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বললে, পরের কাছে ধার-করা টাকায় কাপড় কখানা কিনেছে, এইগুলো বিক্রি হয়ে গেলেই ও এমন কাজ আর কখনো করবে না। জমিদার বললে, সে হচ্ছে না, আমার সামনে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্‌, তবে ছাড়া পাবি।

ও থাকতে না পেরে হঠাৎ বলে ফেললে, আমার তো সে সামর্থ্য নেই, আমি গরিব; আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। শুনে জমিদার লাল হয়ে উঠে বললে, হারামজাদা, কথা কইতে শিখেছ বটে—লাগাও জুতি। এই বলে এক চোট অপমান তো হয়েই গেল, তার পরে একশো টাকা জরিমানা।—এরাই সন্দীপের পিছনে পিছনে চীৎকার করে বেড়ায়, বন্দেমাতরং! এরা দেশের সেবক!

কাপড়ের কী হল?

পুড়িয়ে ফেলেছে।

সেখানে আর কে ছিল?

লোকের সংখ্যা ছিল না, তারা চীৎকার করতে লাগল, বন্দেমাতরং। সেখানে সন্দীপ ছিলেন; তিনি একমুঠো ছাই তুলে নিয়ে বললেন, ভাই-সব, বিলিতি ব্যাবসার অন্ত্যেষ্টিসৎকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বলল। এই ছাই পবিত্র, এই ছাই গায়ে মেখে ম্যান্‌চেস্টারের জাল কেটে ফেলে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের সাধনা করতে বেরোতে হবে।

আমি পঞ্চুকে বললুম, পঞ্চু, তোমাকে ফৌজদারি করতে হবে।

পঞ্চু বললে, কেউ সাক্ষী দেবে না।

কেউ সাক্ষী দেবে না? সন্দীপ! সন্দীপ!

সন্দীপ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, কী, ব্যাপারটা কী?

এই লোকটার কাপড়ের বস্তা ওর জমিদার তোমার সামনে পুড়িয়েছে, তুমি সাক্ষী দেবে না?

সন্দীপ হেসে বললে, দেব বৈকি। কিন্তু আমি যে ওর জমিদারের পক্ষে সাক্ষী।

আমি বললুম, সাক্ষী আবার জমিদারের পক্ষে কী? সাক্ষী তো সত্যের পক্ষে!

সন্দীপ বললে, যেটা ঘটেছে সেটাই বুঝি একমাত্র সত্য?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অন্য সত্যটা কী?

সন্দীপ বললে, যেটা ঘটা দরকার। যে সত্যকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। সেই সত্যের জন্যে অনেক মিথ্যে চাই, যেমন মায়া দিয়ে এই জগৎ গড়া হচ্ছে। পৃথিবীতে যারা সৃষ্টি করতে এসেছে তারা সত্যকে মানে না, তারা সত্যকে বানায়।

অতএব—

অতএব তোমরা যাকে মিথ্যে সাক্ষী বল আমি সেই মিথ্যে সাক্ষী দেব। যারা রাজ্য বিস্তার করেছে, সাম্রাজ্য গড়েছে, সমাজ বেঁধেছে, ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করেছে, তারাই তোমাদের বাঁধা সত্যের আদালতে বুক ফুলিয়ে মিথ্যে সাক্ষি দিয়ে এসেছে। যারা শাসন করবে তারা মিথ্যেকে ডরায় না, যারা শাসন মানবে তাদের জন্যেই সত্যের লোহার শিকল। তোমরা কি ইতিহাস পড় নি? তোমরা কি জান না, পৃথিবীর বড়ো বড়ো রান্নাঘরে যেখানে রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে মসলাগুলো সব মিথ্যে?

জগতে অনেক খিচুড়ি পাকানো হয়েছে, এখন—

না গো, তোমরা খিচুড়ি পাকাবে কেন, তোমাদের টুঁটি চেপে ধরে খিচুড়ি গেলাবে। বঙ্গবিভাগ করবে, বলবে তোমাদের সুবিধের জন্যেই; শিক্ষার দরজা এঁটে বন্ধ করতে থাকবে, বলবে তোমাদেরই আদর্শ অত্যুচ্চ করে তোলবার সদভিপ্রায়ে; তোমরা সাধু হয়ে অশ্রুপাত করতে থাকবে, আর আমরা অসাধু হয়ে মিথ্যের দুর্গ শক্ত করে বানাব। তোমাদের অশ্রু টিঁকবে না, কিন্তু আমাদের দুর্গ টিঁকবে।

মাস্টারমশায় আমাকে বললেন, এ-সব তর্ক করবার কথা নয় নিখিল। আমাদের ভিতরেই এবং সকলের মূলেই যে একটি বিরাট সত্য আছে, এ কথা যে লোক নিজের ভিতর থেকেই উপলব্ধি না করতে পারে সে লোক কেমন করে বিশ্বাস করবে যে সেই অন্তরতম সত্যকেই সমস্ত আবরণ মোচন করে প্রকাশ করাই মানুষের চরম লক্ষ্য, বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলা লক্ষ্য নয়।

সন্দীপ হেসে উঠে বললে, আপনার এ কথা মাস্টারমশায়ের মতো কথাই হয়েছে। এ-সব কেবল বইয়ের পাতায় দেখা যায়, চোখের পাতায় দেখছি বাইরের জিনিসকে স্তূপাকার করে তোলাই মানুষের চরম লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যকে যারা বড়োরকম করে সাধন করেছে তারা ব্যাবসার বিজ্ঞাপনে প্রতিদিন বড়ো অক্ষরে মিথ্যা কথা বলে, তারা রাষ্ট্রনীতির সদর-খাতায় খুব মোটা কলমে জাল হিসাব লেখে, তাদের খবরের কাগজ মিথ্যার বোঝাই জাহাজ, আর মাছি যেমন করে সান্নিপাতিক জ্বরের বীজ বহন করে তাদের ধর্মপ্রচারকেরা তেমনি করে মিথ্যাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ায়। আমি তাদেরই শিষ্য—আমি যখন কন্‌গ্রেসের দলে ছিলুম তখন আমি বাজার বুঝে আধ সের সত্যে সাড়ে-পনেরো সের জল মেশাতে কিছুমাত্র লজ্জা করি নি, আজ আমি সে দল থেকে বেরিয়ে এসেছি, আজও আমি এই ধর্মনীতিকেই সার জেনেছি যে, সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ।

মাস্টারমশায় বললেন, সত্যফল-লাভ।

সন্দীপ বললে, হাঁ, সেই ফসল মিথ্যের আবাদে তবে ফলে। পায়ের নীচের মাটি একেবারে চিরে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়ে তবে সেই ফসল ফলে। আর যা সত্য, যা আপনি জন্মায়, সে হচ্ছে আগাছা, কাঁটাগাছ; তার থেকেই যারা ফলের আশা করে তারা কীটপতঙ্গের দল।

এই বলেই সন্দীপ বেগে বেরিয়ে চলে গেল। মাস্টারমশায় একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বললেন, জান নিখিল? সন্দীপ অধার্মিক নয়, ও বিধার্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ; চাঁদই বটে, কিন্তু ঘটনাক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকে গিয়ে পড়েছে।

আমি বললুম, সেইজন্যে চিরদিনই ওর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই, কিন্তু ওর প্রতি আমার স্বভাবের আকর্ষণ আছে। ও আমার অনেক ক্ষতি করেছে, আরো করবে, কিন্তু ওকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারি নে।

তিনি বললেন, সে আমি ক্রমে বুঝতে পারছি। আমি অনেক দিন আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি, সন্দীপকে এতদিন তুমি কেমন করে সহ্য করে আছ। এমন-কি, এক-একদিন আমার সন্দেহ হয়েছে এর মধ্যে তোমার দুর্বলতা আছে। এখন দেখতে পাচ্ছি, ওর সঙ্গে তোমার কথারই মিল নেই, কিন্তু ছন্দের মিল রয়েছে।

আমি কৌতুক করে বললুম, মিত্রে মিত্রে মিলে অমিত্রাক্ষর। হয়তো আমাদের ভাগ্যকবি 'প্যারাডাইস লস্ট্'-এর মতো একটা এপিক লেখবার সংকল্প করেছেন।

মাস্টারমশায় বললেন, এখন পঞ্চুকে নিয়ে কী করা যায়?

আমি বললুম, আপনি বলেছিলেন, যে-বিঘেকয়েক জমির উপর পঞ্চুর বাড়ি আছে সেটাতে অনেক দিন থেকে ওর মৌরসি স্বত্ব জন্মেছে, সেই স্বত্ব কাঁচিয়ে দেবার জন্যে ওর জমিদার অনেক চেষ্টা করছে। ওর সেই জমিটা আমি কিনে নিয়ে সেইখানেই ওকে আমার প্রজা করে রেখে দিই।

আর একশো টাকার জরিমানা?

সে জরিমানার টাকা কিসের থেকে আদায় হবে? জমি যে আমার হবে।

আর ওর কাপড়ের বস্তা?

আমি আনিয়ে দিচ্ছি। আমার প্রজা হয়ে ও যেমন ইচ্ছে বিক্রি করুক, দেখি ওকে কে বাধা দেয়।

পঞ্চু হাত জোড় করে বললে, হুজুর, রাজায় রাজায় লড়াই, পুলিসের দারোগা থেকে উকিল-ব্যারিস্টর পর্যন্ত শকুনি-গৃধিনীর পাল জমে যাবে, সবাই দেখে আমোদ করবে, কিন্তু মরবার বেলায় আমিই মরব।

কেন, তোর কী করবে?

ঘরে আমার আগুন লাগিয়ে দেবে, ছেলেমেয়ে-সুদ্ধু নিয়ে পুড়ব।

মাস্টারমশায় বললেন, আচ্ছা, তোর ছেলেমেয়েরা কিছুদিন আমার ঘরেই থাকবে, তুই ভয় করিস নে; তোর ঘরে বসে তুই যেমন ইচ্ছে ব্যাবসা কর্, কেউ তোর গায়ে হাত দিতে পারবে না। অন্যায়ের কাছে তুই হার মেনে পালাবি এ আমি হতে দেব না। যত সইব বোঝা ততই বাড়বে।

সেইদিনই পঞ্চুর জমি কিনে রেজেস্ট্রি করে আমি দখল করে বসলুম। তার পর থেকে ঝুটোপুটি চলল।

পঞ্চুর বিষয়-সম্পত্তি ওর মাতামহের। পঞ্চু ছাড়া তার ওয়ারেশ কেউ ছিল না এই কথাই সকলের জানা। হঠাৎ কোথা থেকে এক মামী এসে জুটে জীবনস্বত্বের দাবি করে তার পুঁটুলি, তার প্যাঁট্‌রা, হরিনামের ঝুলি এবং একটি প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা ভাইঝি নিয়ে পঞ্চুর ঘরের মধ্যে উপস্থিত।

পঞ্চু অবাক হয়ে বললে, আমার মামী তো বহুকাল হল মারা গেছে।

তার উত্তর, প্রথম পক্ষের মামী মারা গেছে বটে, দ্বিতীয় পক্ষের অভাব হয় নি।

কিন্তু মামার মৃত্যুর অনেক পরে যে মামী মরেছে, দ্বিতীয় পক্ষের তো সময় ছিল না।

স্ত্রীলোকটি স্বীকার করলে দ্বিতীয় পক্ষটি মৃত্যুর পরের নয়, মৃত্যুর পূর্বের। সতীনের ঘর করবার ভয়ে বাপের বাড়ি ছিল, স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রবল বৈরাগ্যে সে বৃন্দাবনে চলে যায়; কুণ্ডু-জমিদারের আমলারা এ-সব কথা কেউ কেউ জানে, বোধ করি প্রজাদেরও কারও কারও জানা আছে, আর জমিদার যদি জোরে হাঁক দেয় তবে বিবাহের সময়ে যারা নিমন্ত্রণ খেয়েছিল তারাও বেরিয়ে আসতে পারে।

সেদিন দুপুরবেলা পঞ্চুর এই দুর্গ্রহ নিয়ে যখন আমি খুব ব্যস্ত আছি এমন সময় অন্তঃপুর থেকে বিমলা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি চমকে উঠলুম; জিজ্ঞাসা করলুম, কে ডাকছে?

বললে, রানীমা।

বড়োরানীমা?

না, ছোটোরানীমা।

ছোটোরানী? মনে হল একশো বছর ছোটোরানী আমাকে ডাকে নি।

বৈঠকখানা-ঘরে সবাইকে বসিয়ে রেখে আমি অন্তঃপুরে চললুম। শোবার ঘরে গিয়ে বিমলাকে দেখে আরো আশ্চর্য হলুম, যখন দেখা গেল সর্বাঙ্গে, বেশি নয়, অথচ বেশ একটু সাজের আভাস আছে। কিছুদিন এই ঘরটার মধ্যেও যত্নের লক্ষণ দেখি নি, সব এমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল যে মনে হত, যেন ঘরটা সুদ্ধ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। ওরই মধ্যে আগেকার মতো আজ একটু পারিপাট্য দেখতে পেলুম।

আমি কিছু না বলে বিমলার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিমলার মুখ একটু লাল হয়ে উঠল, সে ডান হাত দিয়ে তার বাঁ হাতের বালা দ্রুতবেগে ঘোরাতে ঘোরাতে বললে, দেখো, সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে কেবল আমাদের এই হাটটার মধ্যেই বিলিতি কাপড় আসছে, এটা কি ভালো হচ্ছে?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কী করলে ভালো হয়?

ঐ জিনিসগুলো বের করে দিতে বলো-না।

জিনিসগুলো তো আমার নয়।

কিন্তু, হাট তো তোমার।

হাট আমার চেয়ে তাদের অনেক বেশি যারা ঐ হাটে জিনিস কিনতে আসে।

তারা দিশি জিনিস কিনুক-না।

যদি কেনে তো আমি খুশি হব, কিন্তু যদি না কেনে?

সে কী কথা। ওদের এত বড়ো আস্পর্ধা হবে? তুমি হলে—

আমার সময় অল্প, এ নিয়ে তর্ক করে কী হবে? আমি অত্যাচার করতে পারব না।

অত্যাচার তো তোমার নিজের জন্যে নয়, দেশের জন্যে—

দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা, সে কথা তুমি বুঝতে পারবে না।

এই বলে আমি চলে এলুম। হঠাৎ আমার চোখের সামনে সমস্ত জগৎ যেন দীপ্যমান হয়ে

উঠল। মাটির পৃথিবীর ভার যেন চলে গেছে, সে যে আপনার জীবপালনের সমস্ত কাজ করেও আপনার নিরন্তর বিকাশের সমস্ত পর্যায়ের ভিতরেও একটি অদ্ভুত শক্তির বেগে দিনরাত্রিকে জপ-মালার মতো ফেরাতে ফেরাতে যুগে যুগে আকাশের মধ্যে ছুটে চলেছে, সেইটে আমি আমার রক্তের মধ্যে অনুভব করলুম। কর্মভারের সীমা নেই, অথচ মুক্তিবেগেরও সীমা নেই। কেউ বাঁধবে না, কেউ বাঁধবে না, কিছুতেই বাঁধবে না। অকস্মাৎ আমার মনের গভীরতা থেকে একটা বিপুল আনন্দ যেন সমুদ্রের জলস্তম্ভের মতো আকাশের মেঘকে গিয়ে স্পর্শ করলে।

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করলুম, হঠাৎ তোমার এ হল কী? প্রথমটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না; তার পরে পরিষ্কার বুঝলুম, এই কয়দিন যে বন্ধন দিনরাত আমার মনের ভিতরে এমন পীড়া দিয়েছে আজ তার একটা মস্ত ফাঁক দেখা গেল। আমি ভারি আশ্চর্য হলুম আমার মনের মধ্যে কোনো ঘোর ছিল না। ফোটোগ্রাফের প্লেটে যে রকম করে ছবি পড়ে আমার দৃষ্টিতে বিমলার সমস্ত-কিছু তেমনি করে অঙ্কিত হল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম বিমলা আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করবার জন্যে বিশেষ করে সাজ করেছে। আজকের দিনের পূর্ব পর্যন্ত আমি কখনোই বিমলাকে এবং বিমলার সাজকে তফাত করে দেখি নি। আজ ওর বিলিতি খোঁপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী বলেই দেখলুম; শুধু তাই নয়, একদিন এই খোঁপা আমার কাছে অমূল্য ছিল, আজ দেখি এ সস্তা দামে বিকোবার জন্যে প্রস্তুত।

সন্দীপের সঙ্গে আমার দেশ নিয়ে পদে পদে বিরোধ হয়, কিন্তু সে সত্যকার বিরোধ। কিন্তু বিমলা দেশের নাম করে যে কথাগুলো বলছে সে কেবলমাত্র সন্দীপের ছায়া দিয়ে গড়া, আইডিয়া দিয়ে নয়; এই ছায়ার যদি বদল হয় ওর কথারও বদল হবে। এই-সমস্তই আমি খুব স্বচ্ছ করে দেখলুম, লেশমাত্র কুয়াশা কোথাও ছিল না।

আমার সেই শোবার ঘরের ভাঙা খাঁচাটির ভিতর থেকে যখন সেই হেমন্ত-মধ্যাহ্নের খোলা আলোর মধ্যে বেরিয়ে এলুম, তখন এক দল শালিখ আমার বাগানের গাছের তলায় অকস্মাৎ কী কারণে ভারি উত্তেজনার সঙ্গে কিচিমিচি বাধিয়েছে; বারান্দার সামনে দক্ষিণে খোয়া-ফেলা রাস্তার দুই ধারে সারি সারি কাঞ্চন গাছ অজস্র গোলাপি ফুলের মুখরতায় আকাশকে অভিভূত করে দিয়েছে; অদূরে মেঠো পথের প্রান্তে শূন্য গোরুর গাড়ি আকাশে পুচ্ছ তুলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, তারই বন্ধনমুক্ত জোড়া গোরুর মধ্যে একটা ঘাস খাচ্ছে, আর-একটা রৌদ্রে শুয়ে পড়ে আছে, আর তার পিঠের উপর একটা কাক ঠোকর মেরে মেরে কীট উদ্ধার করছে—আরামে গোরুটার চোখ বুজে এসেছে। আজ আমার মনে হল, বিশ্বের এই যা-কিছু খুব সহজ অথচ অত্যন্ত বৃহৎ আমি তারই স্পন্দিত বক্ষের খুব কাছে এসে বসেছি, তারই আতপ্ত নিশ্বাস ঐ কাঞ্চন ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে আমার হৃদয়ের উপরে এসে পড়ছে। আমার মনে হল, আমি আছি এবং সমস্তই আছে এই দুইয়ে মিলে আকাশ জুড়ে যে সংগীত বাজছে সে কী উদার, কী গভীর, কী অনির্বচনীয় সুন্দর!

তার পরে মনে পড়ল, দারিদ্র্য এবং চাতুরীর ফাঁদে আটকা পড়া পঞ্চু; সেই পঞ্চুকে যেন দেখলুম আজ হেমন্তের রৌদ্রে বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ-বাট জুড়ে ঐ গোরুটার মতো চোখ বুজে পড়ে আছে কিন্তু আরামে নয়, ক্লান্তিতে, ব্যাধিতে, উপবাসে। সে যেন বাংলার সমস্ত গরিব রায়তের প্রতিমূর্তি। দেখতে পেলুম পরম আচারনিষ্ঠ ফোঁটাকাটা স্থূলতনু হরিশ কুণ্ডু। সেও ছোটো নয়, সেও বিরাট, সে যেন বাঁশবনের তলায় বহুকালের বদ্ধ পচা দিঘির উপর তেলা সবুজ একটা অখণ্ড সরের মতো এ পার থেকে ও পার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিষ-বুদ্‌বুদ উদ্‌গার করছে।

যে প্রকাণ্ড তামসিকতা এক দিকে উপবাসে কৃশ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর-এক দিকে মুমূর্ষুর রক্তশোষণে স্ফীত হয়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত করে পড়ে আছে, শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই কাজটা মুলতবি হয়ে পড়ে রয়েছে

শত শত বৎসর ধরে। আমার মোহ ঘুচুক, আমার আবরণ কেটে যাক, আমার পৌরুষ অন্তঃপুরের স্বপ্নের জালে ব্যর্থ হয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন। আমরা পুরুষ, মুক্তিই আমাদের সাধনা, আইডিয়ালের ডাক শুনে আমরা সামনের দিকে ছুটে চলে যাব, দৈত্যপুরীর দেয়াল ডিঙিয়ে বন্দিনী লক্ষ্মীকে আমাদের উদ্ধার করে আনতে হবে। যে মেয়ে তার নিপুণ হাতে আমাদের সেই অভিযানের জয়পতাকা তৈরি করে দিচ্ছে সেই আমাদের সহধর্মিণী, আর ঘরের কোণে যে আমাদের মায়াজাল বুনছে তার ছদ্মবেশ ছিন্ন করে তার মোহমুক্ত সত্যকার পরিচয় যেন আমরা পাই— তাকে আমাদের নিজেরই কামনার রসে-রঙে অপ্সরী সাজিয়ে তুলে যেন নিজের তপস্যা-ভঙ্গ করতে না পাঠাই। আজ আমার মনে হচ্ছে আমার জয় হবে; আমি সহজের রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, সহজ চোখে সব দেখছি; আমি মুক্তি পেয়েছি, আমি মুক্তি দিলুম— যেখানে আমার কাজ সেইখানেই আমার উদ্ধার।

আমি জানি বেদনায় বুকের নাড়ীগুলো আবার এক-একদিন টন্‌টন্ করে উঠবে। কিন্তু সেই বেদনাকেও আমি এবার চিনে নিয়েছি; তাকে আমি আর শ্রদ্ধা করতে পারব না। আমি জানি সে কেবলমাত্রই আমার— তার দাম কিসের? যে দুঃখ বিশ্বের সেই তো আমার গলার হার হবে। হে সত্য, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও— কিছুতেই আমাকে ফিরে যেতে দিয়ো না ছলনার ছদ্মস্বর্গলোকে। আমাকে একলাপথের পথিক যদি কর সে পথ তোমারই পথ হোক! আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তোমার জয়ভেরী বেজেছে আজ।

সন্দীপের আত্মকথা

সেদিন অশ্রুজলের বাঁধ ভাঙে আর-কি। আমাকে বিমলা ডাকিয়ে আনলে, কিন্তু খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বের হল না, তার দুই চোখ ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল। বুঝলুম নিখিলের কাছে কোনো ফল পায় নি। যেমন করে হোক ফল পাবে সেই অহংকার ওর মনে ছিল, কিন্তু সে আশা আমার মনে ছিল না। পুরুষেরা যেখানে দুর্বল মেয়েরা সেখানে তাদের খুব ভালো করেই চেনে, কিন্তু পুরুষেরা যেখানে খাঁটি পুরুষ মেয়েরা সেখানকার রহস্য ঠিক ভেদ করতে পারে না। আসল কথা, পুরুষ মেয়ের কাছে রহস্য, আর মেয়ে পুরুষের কাছে রহস্য, এই যদি না হবে তা হলে এই দুটো জাতের ভেদ জিনিসটা প্রকৃতির পক্ষে নেহাত একটা অপব্যয় হত।

অভিমান! যেটা দরকার সেটা ঘটল না কেন সে হিসেব মনে নেই, কিন্তু, আমি যেটা মুখ ফুটে চাইলুম সেটা কেন ঘটল না এইটেই হল খেদ। ওদের ঐ আমির দাবিটাকে নিয়ে যে কত রঙ, কত ভঙ্গি, কত কান্না, কত ছল, কত হাবভাব তার আর অন্ত নেই; ঐটেতেই তো ওদের মাধুর্য। ওরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ব্যক্তিবিশেষ। আমাদের যখন বিধাতা তৈরি করছিলেন তখন ছিলেন তিনি ইস্কুলমাস্টার, তখন তাঁর ঝুলিতে কেবল পুঁথি আর তত্ত্ব, আর ওদের বেলা তিনি মাস্টারিতে জবাব দিয়ে হয়ে উঠেছেন আর্টিস্ট; তখন তুলি আর রঙের বাক্স।

তাই সেই অশ্রুভরা অভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জল-ভরা আগুন-ভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে আমার ভারি মিষ্টি দেখতে লাগল। আমি খুব কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলুম; সে হাত ছাড়িয়ে নিলে না, থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল। বললুম, মক্ষী, আমরা দুজনে সহযোগী, আমাদের এক লক্ষ্য। বোসো তুমি।

এই বলে বিমলাকে একটা চৌকিতে বসিয়ে দিলুম। আশ্চর্য! এতখানি বেগ কেবল এইটুকুতে এসে ঠেকে গেল; বর্ষার যে পদ্মা ভাঙতে ভাঙতে ডাকতে ডাকতে আসছে, মনে হয় সামনে কিছু আর রাখবে না, সে হঠাৎ একটা জায়গায় যেন বিনা কারণে তার ভাঙনের সোজা লাইন ছেড়ে একে-বারে এ পার থেকে ও পারে চলে গেল। তার তলার দিকে কোথায় কী বাধা লুকিয়ে ছিল মকর-বাহিনী নিজেও তা জানত না। আমি বিমলার হাত চেপে ধরলুম, আমার দেহবীণার ছোটো বড়ো

সমস্ত তার ভিতরে ভিতরে ঝংকার দিয়ে উঠল; কিন্তু ঐ আস্থায়ীতেই কেন থেমে গেল, অন্তরা পর্যন্ত কেন পৌঁছল না? বুঝতে পারলুম জীবনের স্রোতঃপথের গভীরতম তলাটা বহুকালের গতি দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে; ইচ্ছার বন্যা যখন প্রবল হয়ে বয় তখন সেই তলার পথটাকে কোথাও বা ভাঙে, আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়। ভিতরে একটা সংকোচ কোথাও রয়ে গেছে, সেটা কী? সে কোনো একটা জিনিস নয়, সে অনেকগুলোতে জড়ানো। সেইজন্যে তার চেহারা স্পষ্ট বুঝতে পারি নে, এই কেবল বুঝি সেটা একটা বাধা। এই বুঝি, আমি আসলে যা তা আদালতের সাক্ষ্য দ্বারা কোনো কালে পাকা দলিলে প্রমাণ হবে না। আমি নিজের কাছে নিজে রহস্য, সেইজন্যেই নিজের উপর এমন প্রবল টান; ওকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ চিনে ফেললেই ওকে টান মেরে ফেলে দিয়ে একেবারে তুরীয় অবস্থা হয়ে যেত।

চৌকিতে বসে দেখতে দেখতে বিমলার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মনে মনে সে বুঝলে তার একটা ফাঁড়া কেটে গেল। ধূমকেতু তো পাশ দিয়ে সোঁ করে চলে গেল, কিন্তু তার আগুনের পুচ্ছের ধাক্কায় ওর মনপ্রাণ কিছুক্ষণের জন্য যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ল। আমি এই ঘোরটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে বললুম, বাধা আছে, কিন্তু তা নিয়ে খেদ করব না, লড়াই করব। কী বল রানী?

বিমলা একটু কেশে তার বদ্ধ স্বরকে কিছু পরিষ্কার করে নিয়ে শুধু বললে, হাঁ।

আমি বললুম, কী করে কাজটা আরম্ভ করতে হবে তারই প্ল্যানটা একটু স্পষ্ট করে ঠিক করে নেওয়া যাক।

বলে আমি আমার পকেট থেকে পেন্‌সিল-কাগজ বের করে নিয়ে বসলুম। কলকাতা থেকে আমাদের দলের যে-সব ছেলে এসে পড়েছে তাদের মধ্যে কিরকম কাজের বিভাগ করে দিতে হবে তারই আলোচনা করতে লাগলুম। এমন সময়ে হঠাৎ মাঝখানে বিমলা বলে উঠল, এখন থাক্‌ সন্দীপবাবু, আমি পাঁচটার সময় আসব, তখন সব কথা হবে। এই বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

বুঝলুম, এতক্ষণ চেষ্টা করে কিছুতে আমার কথায় বিমলা মন দিতে পারছিল না; নিজের মনটাকে নিয়ে এখন কিছুক্ষণ ওর একলা থাকা চাই। হয়তো বিছানায় পড়ে ওকে কাঁদতে হবে।

বিমলা চলে গেলে ঘরের ভিতরকার হাওয়া যেন আরো বেশি মাতাল হয়ে উঠল। সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তবে যেমন আকাশের মেঘ রঙে রঙে রঙিন হয়ে ওঠে, তেমনি বিমলা চলে যাওয়ার পরে আমার মনটা রঙিয়ে রঙিয়ে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল ঠিক সময়টাকে বয়ে যেতে দিয়েছি। এ কী কাপুরুষতা! আমার এই অদ্ভুত দ্বিধায় বিমলা বোধ হয় আমার 'পরে অবজ্ঞা করেই চলে গেল! করতেও পারে।

এই নেশার আবেশে রক্তের মধ্যে যখন ঝিমঝিম করছে এমন সময়ে বেহারা এসে খবর দিলে অমূল্য আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ক্ষণকালের জন্য ইচ্ছে হল তাকে এখন বিদায় করে দিই, কিন্তু মন স্থির করবার পূর্বেই সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল।

তার পর নুন-চিনি-কাপড়ের লড়াইয়ের খবর। তখনি ঘরের হাওয়া থেকে নেশা ছুটে গেল। মনে হল স্বপ্ন থেকে জাগলুম। কোমর বেঁধে দাঁড়ালুম। তার পরে, চলো রণক্ষেত্রে! হর হর ব্যোম ব্যোম!

খবর এই, হাটে কুণ্ডুদের যে-সব প্রজা মাল আনে তারা বশ মেনেছে। নিখিলের পক্ষের আমলারা প্রায় সকলেই গোপনে আমাদের দলে। তারা অন্তরটিপুনি দিচ্ছে। মাড়োয়ারিরা বলছে, আমাদের কাছ থেকে কিছু দণ্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন, নইলে ফতুর হয়ে যাব। মুসলমানেরা কিছুতেই বাগ মানছে না।

একটা চাষি তার ছেলেমেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জর্মন শাল কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের দলের এখানকার গ্রামের একজন ছেলে তার সেই শাল-কটা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই

নিয়ে গোলমাল চলছে। আমরা তাকে বলছি, তোকে দিশি গরম কাপড় কিনে দিচ্ছি। কিন্তু সস্তা দামের দিশি গরম কাপড় কোথায়? রঙিন কাপড় তো দেখি নে। কাশ্মীরী শাল তো ওকে কিনে দিতে পারি নে। সে এসে নিখিলের কাছে কেঁদে পড়েছে। তিনি সেই ছেলেটার নামে নালিশ করবার হুকুম দিয়েছেন। নালিশের ঠিকমত তদ্‌বির যাতে না হয় আমলারা তার ভার নিয়েছে, এমন-কি, মোক্তার আমাদের দলে।

এখন কথা হচ্ছে, যার কাপড় পোড়াব তার জন্যে যদি দিশি কাপড় কিনে দিতে হয়, তার পরে আবার মামলা চলে, তা হলে তার টাকা পাই কোথায়! আর, ঐ পুড়তে পুড়তে বিলিতি কাপড়ের ব্যাবসা যে গরম হয়ে উঠবে। নবাব যখন বেলোয়ারি ঝাড় ভাঙার শব্দে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ঘরে ঝাড় ভেঙে বেড়াত তখন ঝাড়ওয়ালার ব্যাবসার খুব উন্নতি হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সস্তা অথচ দিশি গরম কাপড় বাজারে নেই। শীত এসে পড়েছে, এখন বিলিতি শাল-র‍্যাপার-মেরিনো রাখব কি তাড়াব?

আমি বললুম, যে লোক বিলিতি কাপড় কিনবে তাকে দিশি কাপড় বখশিশ দেওয়া চলবে না। দণ্ড তারই হওয়া চাই, আমাদের নয়। মামলা যারা করতে যাবে তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেব, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না। ওহে অমূল্য, অমন চমকে উঠলে চলবে না। চাষির খোলায় আগুন দিয়ে রোশনাই করায় আমার শখ নেই। কিন্তু এ হল যুদ্ধ। দুঃখ দিতে যদি ডরাও তা হলে মধুর রসে ডুব মারো, রাধা-ভাবে ভোর হয়ে ক বলতেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ো।

আর বিলিতি গরম কাপড়? যত অসুবিধেই হোক, ও কিছুতেই চলবে না। বিলিতির সঙ্গে কোনো কারণেই কোনোখানেই রফা করতে পারব না। বিলিতি রঙিন র‍্যাপার যখন ছিল না তখন চাষির ছেলে মাথার উপর দিয়ে দোলাই জড়িয়ে শীত কাটাত, এখনও তাই করবে। তাদের তাতে শখ মিটবে না জানি, কিন্তু শখ মেটাবার সময় এখন নয়।

হাটে যারা নৌকো আনে তাদের মধ্যে অনেককে ছলে বলে বাধ্য করবার পথে কতকটা আনা গেছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হচ্ছে মিরজান, সে কিছুতেই নরম হল না। এখানকার নায়েব কুলদাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, ওর ঐ নৌকোখানা ডুবিয়ে দিতে পার কিনা। সে বললে, সে আর শক্ত কী, পারি; কিন্তু দায় তো শেষকালে আমার ঘাড়ে পড়বে না? আমি বললুম, দায়টাকে কারও ঘাড়ে পড়বার মতো আলগা জায়গায় রাখা উচিত নয়, তবু নিতান্তই যদি পড়ো-পড়ো হয় তো আমিই ঘাড় পেতে দেব।

হাট হয়ে গেলে মিরজানের খালি নৌকো ঘাটে বাঁধা ছিল। মাঝিও ছিল না। নায়েব কৌশল করে একটা যাত্রার আসরে তাদের নিমন্ত্রণ করিয়েছিল। সেই রাত্রে নৌকোটাকে খুলে স্রোতের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ফুটো করে তার মধ্যে রাবিশের বস্তা চাপিয়ে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল।

মিরজান সমস্তই বুঝলে। সে একেবারে আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বললে, হজুর, গোস্তাকি হয়েছিল, এখন—

আমি বললুম, এখন সেটা এমন স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে কী করে?

তার জবাব না দিয়ে সে বললে, সে নৌকোখানার দাম দু হাজার টাকার কম হবে না হজুর। এখন আমার হুঁশ হয়েছে, এবারকার মতো কসুর যদি মাপ করেন—

বলে সে আমার পায়ে জড়িয়ে ধরল। তাকে বললুম আর দিন-দশেক পরে আমার কাছে আসতে। এই লোকটাকে যদি এখন দু হাজার টাকা দেওয়া যায় তা হলে একে কিনে রাখতে পারি। এরই মতো মানুষকে দলে আনতে পারলে তবে কাজ হয়। কিছু বেশি করে টাকা জোগাড় করতে না পারলে কোনো ফল হবে না।

বিকেলবেলায় বিমলা ঘরে আসবামাত্র চৌকি থেকে উঠে তাকে বললুম, রানী, সব হয়ে এসেছে, আর দেরি নেই, এখন টাকা চাই।

বিমলা বললে, টাকা? কত টাকা?

আমি বললুম, খুব বেশি নয়, কিন্তু যেখান থেকে হোক টাকা চাই।

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, কত চাই বলুন।

আমি বললুম, আপাতত কেবল পঞ্চাশ হাজার মাত্র।

টাকার সংখ্যাটা শুনে বিমলা ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলে, কিন্তু বাইরে সেটা গোপন করে গেল। বার বার সে কী করে বলবে যে 'পারব না'?

আমি বললুম, রানী, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পার তুমি। করেওছ। কী যে করেছ যদি দেখাতে পারতুম তো দেখতে। কিন্তু এখন তার সময় নয়; একদিন হয়তো সময় আসবে। এখন টাকা চাই।

বিমলা বললে, দেব।

আমি বুঝলুম, বিমলা মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে ওর গয়না বেচে দেবে। আমি বললুম, তোমার গয়না এখন হাতে রাখতে হবে, কখন কী দরকার হয় বলা যায় না।

বিমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বললুম, তোমার স্বামীর টাকা থেকে এ টাকা নিতে হবে।

বিমলা আরো স্তম্ভিত হয়ে গেল। খানিক পরে সে বললে, তাঁর টাকা আমি কেমন করে নেব?

আমি বললুম, তার টাকা কি তোমার টাকা নয়?

সে খুব অভিমানের সঙ্গেই বললে, নয়।

আমি বললুম, তা হলে সে টাকা তারও নয়। সে টাকা দেশের। দেশের যখন প্রয়োজন আছে তখন এ টাকা নিখিল দেশের কাছ থেকে চুরি করে রেখেছে।

বিমলা বললে, আমি সে টাকা পাব কী করে?

যেমন করে হোক। তুমি সে পারবে। যাঁর টাকা তুমি তাঁর কাছে এনে দেবে। বন্দেমাতরং! 'বন্দেমাতরং' এই মন্ত্রে আজ লোহার সিন্দুকের দরজা খুলবে, ভাণ্ডার-ঘরের প্রাচীর ভাঙবে, আর যারা ধর্মের নাম করে সেই মহাশক্তিকে মানে না তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে। মক্ষী, বলো বন্দেমাতরং!

বন্দেমাতরং!

•

আমরা পুরুষ, আমরা রাজা, আমরা খাজনা নেব। আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীকে লুঠ করছি। আমরা যতই তার কাছে দাবি করেছি ততই সে আমাদের বশ মেনেছে। আমরা পুরুষ আদিকাল থেকে ফল পেড়েছি, গাছ কেটেছি, মাটি খুঁড়েছি, পশু মেরেছি, পাখি মেরেছি, মাছ মেরেছি। সমুদ্রের তলা থেকে, মাটির নীচে থেকে, মৃত্যুর মুখের থেকে আদায়, আদায়, আমরা কেবলই আদায় করে এসেছি। আমরা সেই পুরুষজাত। বিধাতার ভাণ্ডারের কোনো লোহার সিন্দুককে আমরা রেয়াত করি নি, আমরা ভেঙেছি আর কেড়েছি।

এই পুরুষের দাবি মেটানোই হচ্ছে ধরণীর আনন্দ। দিনরাত সেই অন্তহীন দাবি মেটাতে মেটাতেই পৃথিবী উর্বরা হয়েছে, সুন্দরী হয়েছে, সার্থক হয়েছে, নইলে জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়ে সে আপনাকে আপনি জানত না। নইলে তার হৃদয়ের সকল দরজাই বন্ধ থাকত, তার খনির হীরে খনিতেই থেকে যেত, তার শুক্তির মুক্তো আলোতে উদ্ধার পেত না।

আমরা পুরুষ কেবল আমাদের দাবির জোরে মেয়েদের আজ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছি। কেবলই আমাদের কাছে আপনাকে দিতে দিতে তারা ক্রমে ক্রমে আপনাকে বড়ো করে বেশি করে পেয়েছে। তারা তাদের সমস্ত সুখের হীরে এবং দুঃখের মুক্তো আমাদের রাজকোষে জমা করে দিতে গিয়েই তবে তার সন্ধান পেয়েছে। এমনি করে পুরুষের পক্ষে নেওয়াই হচ্ছে যথার্থ দান, আর মেয়েদের পক্ষে দেওয়াই হচ্ছে যথার্থ লাভ।

বিমলার কাছে খুব একটা বড়ো হাঁক হেঁকেছি। মনের ধর্মই নাকি আপনার সঙ্গে না-হক

ঝগড়া করা, তাই প্রথমটা একটা খটকা লেগেছিল। মনে হয়েছিল, এটা বড়ো বেশি কঠিন হল। একবার ভাবলুম ওকে ডেকে বলি, না, তোমার এ-সব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে কাজ নেই, তোমার জীবনে কেন এমন অশান্তি এনে দেব। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গিয়েছিলুম, পুরুষজাত এইজন্যেই তো সকর্মক, আমরা অকর্মকদের মধ্যে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে অশান্তি ঘটিয়ে তাদের অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলব যে। আমরা আজ পর্যন্ত মেয়েদের যদি কাঁদিয়ে না আসতুম তা হলে তাদের দুঃখের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের দরজা যে আঁটাই থাকত। পুরুষ যে ত্রিভুবনকে কাঁদিয়ে ধন্য করবার জন্যেই। নইলে তার হাত এমন সবল, তার মুঠো এমন শক্ত হবে কেন।

বিমলার অন্তরাত্মা চাইছে যে, আমি সন্দীপ তার কাছে খুব বড়ো দাবি করব, তাকে মরতে ডাক দেব। এ না হলে সে খুশি হবে কেন। এতদিন সে ভালো করে কাঁদতে পায় নি বলেই তো আমার পথ চেয়ে বসে ছিল। এতদিন সে কেবলমাত্র সুখে ছিল বলেই তো আমাকে দেখবামাত্র তার হৃদয়ের দিগন্তে দুঃখের নববর্ষা একেবারে নীল হয়ে ঘনিয়ে এল। আমি যদি দয়া করে তার কান্না থামাতেই চাই তা হলে জগতে আমার দরকার ছিল কী!

আসলে আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি খটকা বেধেছিল তার প্রধান কারণ, এটা যে টাকার দাবি। টাকা জিনিসটা যে পুরুষমানুষের। ওটা চাইতে যাওয়ার মধ্যে একটু ভিক্ষুকতা এসে পড়ে। সেইজন্যে টাকার অঙ্কটাকে বড়ো করতে হল। এক-আধ হাজার হলে সেটাতে অত্যন্ত চুরির গন্ধ থাকে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজারটা হল ডাকাতি।

তা ছাড়া, আমার খুব ধনী হওয়া উচিত ছিল। এতদিন কেবলমাত্র টাকার অভাবে আমার অনেক ইচ্ছা পদে পদে ঠেকে গেছে; এটা, আর যাকে হোক, আমাকে কিছুতেই শোভা পায় না। আমার ভাগ্যের পক্ষে এটা অন্যায় যদি হত তাকে মাপ করতুম, কিন্তু এটা রুচিবিরুদ্ধ, সুতরাং অমার্জনীয়। বাসা ভাড়া করলে মাসে মাসে আমি যে তার ভাড়ার জন্যে মাথায় হাত দিয়ে ভাবব, আর রেলে চাপবার সময় অনেক চিন্তা করে টাকার থলি টিপে টিপে ইন্টারমিডিয়েটের টিকিট কিনব, এটা আমার মতো মানুষের পক্ষে তো দুঃখকর নয়, হাস্যকর। আমি বেশ দেখতে পাই, নিখিলের মতো মানুষের পক্ষে পৈতৃক সম্পত্তিটা বাহুল্য। ও গরিব হলে ওকে কিছুই বেমানান হত না। তা হলে ও অনায়াসে অকিঞ্চনতার স্যাক্‌রা গাড়িতে ওর চন্দ্রমাস্টারের জুড়ি হতে পারত।

আমি জীবনে অন্তত একবার পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতে নিয়ে নিজের আরামে এবং দেশের প্রয়োজনে দু দিনে সেটা উড়িয়ে দিতে চাই। আমি আমীর, আমার এই গরিবের ছদ্মবেশটা দু দিনের জন্যেও ঘুচিয়ে একবার আয়নায় আপনাকে দেখে নিই, এই আমার একটা শখ আছে।

কিন্তু বিমলা পঞ্চাশ হাজারের নাগাল সহজে কোথাও পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। হয়তো শেষকালে সেই দু-চার হাজারেই ঠেকবে। তাই সই। 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' বলেছে; কিন্তু ত্যাগটা যখন নিজের ইচ্ছায় নয় তখন হতভাগ্য পণ্ডিত বারো আনা, এমন-কি, পনেরো আনাও ত্যজতি।

এই পর্যন্ত লিখেছি, এ গেল আমার খাসের কথা। এ-সব কথা আমার অবকাশের সময় আরো ফুটিয়ে তোলা যাবে। এখন অবকাশ নেই। এখানকার নায়েব খবর পাঠিয়েছে, এখনি একবার তার কাছে যাওয়া চাই; শুনছি একটা গোলমাল বেধেছে।

নায়েব বললে, যে লোকটার দ্বারা নৌকো ডোবানো হয়েছিল পুলিস তাকে সন্দেহ করেছে; লোকটা পুরোনো দাগী, তাকে নিয়ে টানাটানি চলছে। লোকটা সেয়ানা, তার কাছ থেকে কথা আদায় করা শক্ত হবে। কিন্তু বলা যায় কি, বিশেষত নিখিল রেগে রয়েছে, নায়েব স্পষ্ট তো কিছু করতে পারবে না। নায়েব আমাকে বললে, দেখুন, আমাকে যদি বিপদে পড়তে হয় আমি আপনাকে ছাড়ব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আমাকে যে জড়াবে তার ফাঁস কোথায়?

নায়েব বললে, আপনার লেখা একখানা, আর অমূল্যবাবুর লেখা তিনখানা চিঠি আমার কাছে আছে।

এখন বুঝছি, যে চিঠিখানা লিখে নায়েব আমার কাছ থেকে জবাব আদায় করে রেখেছিল সেটা এই কারণেই জরুরি, তার আর-কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ-সব চাল নূতন শেখা যাচ্ছে। যেমন করে শত্রুর নৌকো ডুবিয়েছি প্রয়োজন হলেই তেমনি করে যে মিত্রকেও অনায়াসে ডোবাতে পারি, আমার 'পরে নায়েবের এই শ্রদ্ধাটুকু ছিল। শ্রদ্ধা আরো অনেকখানি বাড়ত যদি চিঠিখানার জবাব লিখে না দিয়ে মুখে দেওয়া যেত।

এখন কথা হচ্ছে এই, পুলিসকে ঘুষ দেওয়া চাই এবং যদি আরো কিছুদূর গড়ায় তা হলে যে লোকটার নৌকো ডুবনো গেছে আপসে তারও ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এখন বেশ বুঝতে পারছি, এই-যে বেড়-জালটি পাতা হচ্ছে এর মুনাফার একটা মোটা অংশ নায়েবের ভাগেও পড়বে। কিন্তু মনে মনে সে কথাটা চেপেই রাখতে হচ্ছে। মুখে আমিও বলছি বন্দেমাতরং, আর সেও বলছে বন্দেমাতরং।

এ-সব ব্যাপারে যে আসবাব দিয়ে কাজ চালাতে হয় তার ফাটা অনেক, যেটুকু পদার্থ টিঁকে থাকে তার চেয়ে গলে পড়ে ঢের বেশি। ধর্মবুদ্ধিটা না কি লুকিয়ে মজ্জার মধ্যে সেঁধিয়ে বসে আছে, সেইজন্যে নায়েবটার উপর প্রথম দফায় খুব রাগ হয়েছিল, আর-একটু হলেই দেশের লোকের কপটতা সম্বন্ধে খুব কড়া কথা এই ডায়ারিতে লিখতে বসেছিলুম। কিন্তু ভগবান যদি থাকেন তাঁর কাছে আমার এই কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার করতেই হবে তিনি আমার বুদ্ধিটাকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন; নিজের ভিতরে কিংবা নিজের বাইরে কিছু অস্পষ্ট থাকবার জো নেই। অন্য যাকেই ভোলাই, নিজেকে কখনোই ভোলাই নে। সেইজন্যে বেশিক্ষণ রাগতে পারলুম না। যেটা সত্য সেটা ভালোও নয় মন্দও নয়, সেটা সত্য, এইটেই হল বিজ্ঞান। মাটি যতটা জল শুষে নেয় সেটুকু বাদে যে জলটা থাকে সেইটে নিয়েই জলাশয়। বন্দেমাতরমের নীচের তলার মাটিতে খানিকটা জল শুষবে; সে জল আমিও শুষব, ঐ নায়েবও শুষবে; তার পরেও যেটা থাকবে সেইটেই হল বন্দেমাতরং। একে কপটতা বলে গাল দিতে পারি, কিন্তু এটা সত্য, একে মানতে হবে। পৃথিবীর সকল বড়ো কাজেরই তলায় একটা স্তর জমে যেটা কেবল পাঁক; মহাসমুদ্রের নীচেও সেটা আছে।

তাই বড়ো কাজ করবার সময় এই পাঁকের দাবির হিসেবটি ধরা চাই। অতএব নায়েব কিছু নেবে এবং আমারও কিছু প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনটা বড়ো প্রয়োজনের অন্তর্গত। কারণ, ঘোড়াই কেবল দানা খাবে তা নয়, চাকাতেও কিছু তেল দিতে হয়।

যাই হোক টাকা চাই। পঞ্চাশ হাজারের জন্যে সবুর করলে চলবে না। এখনি যা পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করতে হবে। আমি জানি, এই সমস্ত জরুর যখন তাগিদ করে আখেরকে তখন ভাসিয়ে দিতে হয়। আজকের দিনের পাঁচ হাজার পরশু দিনের পঞ্চাশ হাজারের অঙ্কুর মুড়িয়ে খায়। আমি তো তাই নিখিলকে বলি, যারা ত্যাগের রাস্তায় চলে তাদের লোভকে দমন করতেই হয় না, যারা লোভের রাস্তায় চলে পদে পদে তাদের লোভকে ত্যাগ করতে হয়। পঞ্চাশ হাজারকে আমি ত্যাগ করলুম, নিখিলের মাস্টারমশায় চন্দ্রবাবুকে ওটা ত্যাগ করতে হয় না।

ছটা যে রিপু আছে তার মধ্যে প্রথম দুটো এবং শেষ দুটো হচ্ছে পুরুষের, আর মাঝখানের দুটো হচ্ছে কাপুরুষের। কামনা করব, কিন্তু লোভ থাকবে না, মোহ থাকবে না। তা থাকলেই কামনা হল মাটি। মোহ জিনিসটা থাকে অতীতকে আর ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে। বর্তমানকে পথ ভোলাবার ওস্তাদ হচ্ছে তারা। এখনই যেটা দরকার সেটাতে যারা মন দিতে পারে নি, যারা অন্য-কালের বাঁশি শুনছে, তারা বিরহিণী শকুন্তলার মতো; কাছের অতিথির হাঁক তারা শুনতে পায় না, সেই শাপে দূরের যে অতিথিকে তারা মুগ্ধ হয়ে কামনা করে তাকে হারায়। যারা কামনার তপস্বী তাদেরই জন্যে মোহমুদ্গর। কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ!

সেদিন আমি বিমলার হাত চেপে ধরেছিলুম, তারই রেশ ওর মনের মধ্যে বাজছে। আমার মনেও তার ঝংকারটা থামে নি। এই রেশটুকুকে তাজা রেখে দিতে হবে। এইটেকেই যদি বার বার অভ্যস্ত করে মোটা করে তুলি তা হলে এখন যেটা গানের উপর দিয়ে চলছে তখন সেটা তর্কে এসে নাববে। এখন আমার কোনো কথায় বিমলা 'কেন' জিজ্ঞাসা করবার ফাঁক পায় না। যে-সব মানুষের মোহ জিনিসটাতে দরকার আছে তাদের বরাদ্দ বন্ধ করে কী হবে? এখন আমার কাজের ভিড়, অতএব এখনকার মতো রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্যন্তই থাক্, তলানি পর্যন্ত গেলে গোলমাল বাধবে। যখন তার ঠিক সময় আসবে তখন তাকে অবজ্ঞা করব না। হে কামী, লোভকে ত্যাগ করো এবং মোহকে ওস্তাদের হাতের বীণাযন্ত্রের মতো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তার মিহি তারে মিড় লাগাতে থাকো।

এ দিকে কাজের আসর আমাদের জমে উঠেছে। আমাদের দলবল ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে গেছে। ভাই-বেরাদর বলে অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারব না। ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে হাঁউ করে ওঠে, একদিন ওদের ভালুক-নাচ নাচাব।

নিখিল বলে, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিস হয় তা হলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।

আমি বলি, তা হতে পারে, কিন্তু কোন্‌খানটাতে আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতেই জোর করে ওদের বসিয়ে দিতে হবে, নইলে ওরা বিরোধ করবেই।

নিখিল বলে, বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে বুঝি তুমি বিরোধ মেটাতে চাও?

আমি বলি, তোমার প্ল্যান কী?

নিখিল বলে, বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে বুঝি তুমি বিরোধ মেটাতে চাও?

আমি জানি, সাধুলোকের লেখা গল্পের মতো নিখিলের সব তর্কই শেষকালে একটা উপদেশে এসে ঠেকবেই। আশ্চর্য এই, এতদিন এই উপদেশ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে, কিন্তু আজও এগুলোকে ও নিজেও বিশ্বাস করে! সাধে আমি বলি, নিখিল হচ্ছে একেবারে জন্ম-স্কুলবয়। গুণের মধ্যে, ও খাঁটি মাল। চাঁদ সদাগরের মতো ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েছে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মানতে চায় না। মুশকিল এই, এদের কাছে মরাটা শেষ প্রমাণ নয়, ওরা চক্ষু বুজে ঠিক করে রেখেছে তার উপরেও কিছু আছে।

অনেক দিন থেকে আমার মনে একটি প্ল্যান আছে; সেটা যদি খাটাবার সুযোগ পাই তা হলে দেখতে দেখতে সমস্ত দেশে আগুন লেগে যাবে। দেশকে চোখে দেখতে না পেলে আমাদের দেশের লোক জাগবে না। দেশের একটা দেবীপ্রতিমা চাই। কথাটা আমার বন্ধুদের মনে লেগেছিল; তারা বললে, আচ্ছা, একটা মূর্তি বানানো যাক। আমি বললুম, আমরা বানালে চলবে না, যে প্রতিমা চলে আসছে তাকেই আমাদের স্বদেশের প্রতিমা করে তুলতে হবে। পূজার পথ আমাদের দেশে গভীর করে কাটা আছে, সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আনতে হবে।

এই নিয়ে নিখিলের সঙ্গে কিছুকাল পূর্বে আমার খুব তর্ক হয়ে গেছে। নিখিল বললে, যে কাজকে সত্য বলে শ্রদ্ধা করি তাকে সাধন করবার জন্যে মোহকে দলে টানা চলবে না।

আমি বললুম, মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, মোহ নইলে ইতর লোকের চলেই না; আর পৃথিবীর বারো-আনা ভাগ ইতর। সেই মোহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই সকল দেশে দেবতার সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ আপনাকে চেনে।

নিখিল বললে, মোহকে ভাঙবার জন্যেই দেবতা। রাখবার জন্যেই অপদেবতা।

আচ্ছা বেশ, অপদেবতাই সই, সেটাকে নইলে কাজ এগোয় না। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে মোহটা খাড়াই আছে, তাকে সমানে খোরাক দিচ্ছি, অথচ তার কাছ থেকে কাজ আদায় করছি নে।

এই দেখো-না, ব্রাহ্মণকে ভূদেব বলছি, তার পায়ের ধুলো নিচ্ছি, দান-দক্ষিনেরও অন্ত নেই, অথচ এতবড়ো একটা তৈরি জিনিসকে বৃথা নষ্ট হতে দিচ্ছি, কাজে লাগাচ্ছি নে। ওদের ক্ষমতাটা যদি পুরো ওদের হাতে দেওয়া যায় তা হলে সেই ক্ষমতা দিয়ে যে আমরা আজ অসাধ্য সাধন করতে পারি। কেননা, পৃথিবীতে এক দল জীব আছে তারা পদতলচর, তাদের সংখ্যাই বেশি; তারা কোনো কাজই করতে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধুলো পায়, তা পিঠেই হোক আর মাথাতেই হোক। এদের খাটাবার জন্যেই মোহ একটা মস্ত শক্তি। সেই শক্তিশেলগুলোকে এতদিন আমাদের অস্ত্রশালায় শান দিয়ে এসেছি, আজ সেটা হানবার দিন এসেছে—আজ কি তাদের সরিয়ে ফেলতে পারি?

কিন্তু নিখিলকে এ-সব কথা বোঝানো ভারি শক্ত। সত্য জিনিসটা ওর মনে একটা নিছক প্রেজুডিসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সত্য বলে কোনো-একটা বিশেষ পদার্থ আছে। আমি ওকে কতবার বলেছি, যেখানে মিথ্যাটা সত্য সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমাদের দেশ এই কথাটা বুঝত বলেই অসংকোচে বলতে পেরেছে, অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যাই সত্য। সেই মিথ্যা থেকে ভ্রষ্ট হলেই সত্য থেকে সে ভ্রষ্ট হবে। দেশের প্রতিমাকে যে লোক সত্য বলে মানতে পারে দেশের প্রতিমা তার মধ্যে সত্যের মতোই কাজ করবে। আমাদের যে রকমের স্বভাব কিংবা সংস্কার তাতে আমরা দেশকে সহজে মানতে পারি নে, কিন্তু দেশের প্রতিমাকে অনায়াসে মানতে পারি। এটা যখন জানা কথা, তখন যারা কাজ উদ্ধার করতে চায় তারা এইটে বুঝেই কাজ করবে।

নিখিল হঠাৎ ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠে বললে, সত্যের সাধনা করবার শক্তি তোমরা খুইয়েছ বলেই তোমরা হঠাৎ আকাশ থেকে একটা মস্ত ফল পেতে চাও। তাই শত শত বৎসর ধরে দেশের যখন সকল কাজই বাকি তখন তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে হাত পেতে বসে রয়েছ।

আমি বললুম, অসাধ্য সাধন করা চাই, সেইজন্যেই দেশকে দেবতা করা দরকার।

নিখিল বললে, অর্থাৎ সাধ্যের সাধনায় তোমাদের মন উঠছে না। যা-কিছু আছে সমস্ত এমনিই থাকবে, কেবল তার ফলটা হবে আজগুবি।

আমি বললুম, নিখিল, তুমি যা বলছ ওগুলো উপদেশ। একটা বিশেষ বয়সে ওর দরকার থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের যখন দাঁত ওঠে তখন ও চলবে না। স্পষ্টই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, কোনোদিন স্বপ্নেও যার আবাদ করি নি সেই ফসল হুহু করে ফলে উঠছে। কিসের জোরে? আজ দেশকে দেবতা বলে মনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি বলে। এইটেকেই মূর্তি দিয়ে চিরন্তন করে তোলা এখনকার প্রতিভার কাজ। প্রতিভা তর্ক করে না, সৃষ্টি করে। আজ দেশ যা ভাবছে আমি তাকে রূপ দেব। আমি ঘরে ঘরে গিয়ে বলে বেড়াব, দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন, তিনি পুজো চান। আমরা ব্রাহ্মণদের গিয়ে বলব, দেবীর পূজারি তোমরাই, সেই পুজো বন্ধ আছে বলেই তোমরা নাবতে বসেছ। তুমি বলবে, আমি মিথ্যা বলছি। না, এ সত্য। আমার মুখ থেকে এই কথাটি শোনবার জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা করে রয়েছে, সেইজন্যেই বলছি এ কথা সত্য। যদি আমার বাণী আমি প্রচার করতে পারি তা হলে তুমি দেখতে পাবে এর আশ্চর্য ফল।

নিখিল বললে, আমার আয়ু কতদিনই বা? তুমি যে ফল দেশের হাতে তুলে দেবে তারও পরের ফল আছে, সেটা হয়তো এখন দেখা যাবে না।

আমি বললুম, আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার।

নিখিল বললে, আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।

আসল কথা বাঙালির যে একটা বড়ো ঐশ্বর্য আছে কল্পনাবৃত্তি সেটা হয়তো নিখিলের ছিল, কিন্তু বাইরের থেকে একটা ধর্মবৃত্তির বনস্পতি বড়ো হয়ে উঠে ওটাকে নিজের আওতায় মেরে ফেললে বলে। ভারতবর্ষে এই-যে দুর্গা-জগদ্ধাত্রীর পূজা বাঙালি উদ্‌ভাবন করেছে এইটেতে সে

নিজের আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছে। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, এ দেবী পোলিটিকাল দেবী। মুসলমানের শাসনকালে বাঙালি যে দেশশক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর কামনা করেছিল এ দুই দেবী তারই দুই রকমের মূর্তি। সাধনার এমন আশ্চর্য বাহ্যরূপ ভারতবর্ষের আর কোন্ জাত গড়তে পেরেছে?

কল্পনার দিব্যদৃষ্টি নিখিলের একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে বলেই সে আমাকে অনায়াসে বলতে পারলে, মুসলমান-শাসনে বর্গি বল, শিখ বল, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিল। বাঙালি তার দেবীমূর্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র পড়ে ফল কামনা করেছিল; কিন্তু দেশ দেবী নয়, তাই ফলের মধ্যে কেবল ছাগমহিষের মুণ্ডপাত হল। যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব সেইদিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়ো, যিনি সত্য দেবতা, তিনি সত্য ফল দেবেন।

মুশকিল হচ্ছে, কাগজে কলমে লিখলে নিখিলের কথা শোনায় ভালো। কিন্তু আমার কথা কাগজে লেখবার নয়, লোহার খন্তা দিয়ে দেশের বুক চিরে চিরে লেখবার। পণ্ডিত যে রকম কৃষিতত্ত্ব ছাপার কালিতে লেখে সে রকম নয়, লাঙলের ফলা দিয়ে চাষি যে রকম মাটির বুকে আপনার কামনা অঙ্কিত করে সেইরকম।

বিমলার সঙ্গে যখন আমার দেখা হল আমি বললুম, যে দেবতার সাধনা করবার জন্যে লক্ষ যুগের পর পৃথিবীতে এসেছি তিনি যতক্ষণ আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখা দিয়েছেন ততক্ষণ তাঁকে আমার সমস্ত দেহমন দিয়ে কি বিশ্বাস করতে পেরেছি? তোমাকে যদি না দেখতুম তা হলে আমার সমস্ত দেশকে আমি এক করে দেখতে পেতুম না, এ কথা আমি তোমাকে কতবার বলেছি—জানি নে তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পার কিনা। এ কথা বোঝানো ভারি শক্ত যে, দেবলোকে দেবতারা থাকেন অদৃশ্য, মর্ত্যলোকেই তাঁরা দেখা দেন।

বিমলা এক রকম করে আমার দিকে চেয়ে বললে, তোমার কথা খুব স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি। এই প্রথম বিমলা আমাকে 'আপনি' না বলে 'তুমি' বললে।

আমি বললুম, অর্জুন যে কৃষ্ণকে তাঁর সামান্য সারথিরূপে সর্বদা দেখতেন তাঁরও একটি বিরাট রূপ ছিল, সেও একদিন অর্জুন দেখেছিলেন; তখন তিনি পুরো সত্য দেখেছিলেন। আমার সমস্ত দেশের মধ্যে আমি তোমার সেই বিরাট রূপ দেখেছি। তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার; তোমারই কালো চোখের কাজল মাখা পল্লব আমি দেখতে পেয়েছি নদীর নীল জলের বহুদূরপারের বনরেখার মধ্যে; আর কচি ধানের খেতের উপর দিয়ে তোমার ছায়া-আলোর রঙিন ডুরেশাড়িটি লুটিয়ে লুটিয়ে যায়; আর তোমার নিষ্ঠুর তেজ দেখেছি জ্যৈষ্ঠের যে রৌদ্রে সমস্ত আকাশটা যেন মরুভূমির সিংহের মতো লাল জিব বের করে দিয়ে হা হা করে শ্বসতে থাকে। দেবী যখন তাঁর ভক্তকে এমন আশ্চর্য রকম করে দেখা দিয়েছেন তখন তাঁরই পুজো আমি আমার সমস্ত দেশে প্রচার করব, তবে আমার দেশের লোক জীবন পাবে। 'তোমারই মুরতি গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।' কিন্তু সে কথা সকলে স্পষ্ট করে বোঝে নি। তাই আমার সংকল্প, সমস্ত দেশকে ডাক দিয়ে আমার দেবীর মূর্তিটি নিজের হাতে গড়ে এমন করে তার পুজো দেব যে কেউ তাকে আর অবিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি আমাকে সেই বর দাও, সেই তেজ দাও।

বিমলার চোখ বুজে এল। সে যে আসনে বসেছিল সেই আসনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে যেন পাথরের মূর্তির মতোই স্তব্ধ হয়ে রইল। আমি আর খানিকটা বললেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। খানিক পরে সে চোখ মেলে বলে উঠল, ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েছ, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারও নেই। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, আজ তোমার ইচ্ছার বেগ কেউ সামলাতে পারবে না। রাজা আসবে তোমার পায়ের কাছে তার রাজদণ্ড ফেলে দিতে, ধনী আসবে তার ভাণ্ডার তোমার কাছে উজাড় করে দেবার জন্যে, যাদের আর-কিছুই নেই তারাও কেবলমাত্র মরবার জন্যে তোমার কাছে এসে সেধে পড়বে। ভালো-মন্দর বিধিবিধান সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে। রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কী দেখেছ তা জানি নে, কিন্তু আমি

আমার এই হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম। তার কাছে আমি কোথায় আছি! সর্বনাশ গো সর্বনাশ, কী তার প্রচণ্ড শক্তি! যতক্ষণ না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচি নে, আমি তো আর পারি নে, আমার যে বুক ফেটে গেল!

বলতে বলতে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর পড়ে গিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তার পরে ফুলে ফুলে কান্না— কান্না— কান্না।

এই তো হিপনটিজ্‌ম্‌। এই শক্তিই পৃথিবী জয় করবার শক্তি। কোনো উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই সম্মোহন। কে বলে সত্যমেব জয়তে? জয় হবে মোহের। বাঙালি সে কথা বুঝেছিল; তাই বাঙালি এনেছিল দশভুজার পূজা, বাঙালি গড়েছিল সিংহবাহিনীর মূর্তি। সেই বাঙালি আবার আজ মূর্তি গড়বে, জয় করবে বিশ্ব কেবল সম্মোহনে। বন্দেমাতরং!

আস্তে আস্তে হাতে ধরে বিমলাকে চৌকির উপরে উঠিয়ে বসালুম। এই উত্তেজনার পরে অবসাদ আসবার আগেই তাকে বললুম, বাংলাদেশে মায়ের পূজা প্রতিষ্ঠা করবার ভার তিনি আমার উপরেই দিয়েছেন, কিন্তু আমি যে গরিব।

বিমলার মুখ তখনও লাল, চোখ তখনও বাষ্পে ঢাকা; সে গদ্‌গদ কণ্ঠে বললে, তুমি গরিব কিসের? যার যা-কিছু আছে সব যে তোমারই। কিসের জন্যে বাক্স ভরে আমার গয়না জমে রয়েছে? আমার সমস্ত সোনা-মানিক তোমার পুজোয় নাও-না কেড়ে, আমার কিছুই দরকার নেই।

এর আগে আর-একবার বিমলা গয়না দিতে চেয়েছিল; আমার কিছুতে বাধে না, ঐখানটায় বাধল। সংকোচটা কিসের আমি ভেবে দেখেছি। চিরদিন পুরুষই মেয়েকে গয়না দিয়ে সাজিয়ে এসেছে, মেয়ের হাত থেকে গয়না নিতে গেলে কেমন যেন পৌরুষে ঘা পড়ে।

কিন্তু এখানে নিজেকে ভোলা চাই। আমি নিচ্ছি নে। এ মায়ের পূজা, সমস্তই সেই পূজায় ঢালব। এমন সমারোহ করে করতে হবে যে তেমন পূজা এ দেশে কেউ কোনো দিন দেখে নি। চিরদিনের মতো নূতন বাংলার ইতিহাসের মর্মের মাঝখানে এই পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এই পূজাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠদানরূপে দেশকে দিয়ে যাব। দেবতার সাধনা করে দেশের মূর্খেরা, দেবতার সৃষ্টি করবে সন্দীপ।

এ তো গেল বড়ো কথা। কিন্তু ছোটো কথাও যে পাড়তে হবে। আপাতত অন্তত তিন হাজার টাকা না হলে তো চলবেই না, পাঁচ হাজার হলেই বেশ সুডোল ভাবে চলে। কিন্তু এতবড়ো উদ্দীপনার মুখে হঠাৎ এই টাকার কথাটা কি বলা চলে? অথচ আর সময় নেই।

সংকোচের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে ফেললুম, রানী, এ দিকে যে ভাণ্ডার শূন্য হয়ে এল, কাজ বন্ধ হয় ব'লে।

অমনি বিমলার মুখে একটা বেদনার কুঞ্চন দেখা দিল। আমি বুঝলুম, বিমলা ভাবছে, আমি এখনি বুঝি সেই পঞ্চাশ হাজার দাবি করছি। এই নিয়ে ওর বুকের উপর পাথর চেপে রয়েছে; বোধ হয় সারারাত ভেবেছে, কিন্তু কোনো কিনারা পায় নি। প্রেমের পূজার আর কোনো উপচার তো হাতে নেই, হৃদয়কে তো স্পষ্ট করে আমার পায়ে ঢেলে দিতে পারছে না, সেইজন্যে ওর মন চাচ্ছে এই মস্ত একটা টাকাকে ওর অবরুদ্ধ আদরের প্রতিরূপ করে আমার কাছে এনে দিতে। কিন্তু কোনো রাস্তা না পেয়ে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ওর ঐ কষ্টটা আমার বুকে লাগছে। ও যে এখন সম্পূর্ণ আমারই; উপড়ে তোলবার দুঃখ এখন তো আর দরকার নেই, এখন ওকে অনেক যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আমি বললুম, রানী, এখন সেই পঞ্চাশ হাজারের বিশেষ দরকার নেই, হিসেব করে দেখছি পাঁচ হাজার, এমন কি তিন হাজার হলেও চলে যাবে।

হঠাৎ টানটা কমে গিয়ে বিমলার হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে যেন একটা গানের মতো বললে, পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব।

যে সুরে রাধিকা গান গেয়েছিল—

বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
স্বর্গে মর্ত্যে তিন ভুবনে নাইকো যাহার মূল।
বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে,
সবার কানে বাজবে না সে—
দেখ্ লো চেয়ে যমুনা ওই ছাপিয়ে গেল কূল।

এ ঠিক সেই সুরই, আর সেই গানই, আর সেই একই কথা—'পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব'। 'বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল!' বাঁশির ভিতরকার ফাঁকটি সরু বলেই, চার দিকে তার বাধা বলেই, এমন সুর। অতিলোভের চাপে বাঁশিটি যদি ভেঙে আজ চ্যাপটা করে দিতুম তা হলে শোনা যেত, কেন, এত টাকায় তোমার দরকার কী? আর, আমি মেয়েমানুষ, অত টাকা পাবই বা কোথা? ইত্যাদি ইত্যাদি। রাধিকার গানের সঙ্গে তার একটি অক্ষরও মিলত না। তাই বলছি, মোহটাই হল সত্য, সেইটেই বাঁশি, আর মোহ বাদ দিয়ে সেটা হচ্ছে ভাঙা বাঁশির ভিতরকার ফাঁক—সেই অত্যন্ত নির্মল শূন্যতাটা যে কী তার আস্বাদ নিখিল আজকাল কিছু পেয়েছে, ওর মুখ দেখলেই সেটা বোঝা যায়। আমার মনেও কষ্ট লাগে। কিন্তু নিখিলের বড়াই, ও সত্যকে চায়, আমার বড়াই আমি মোহটাকে পারতপক্ষে হাত থেকে ফসকাতে দেব না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। অতএব এ নিয়ে দুঃখ করে কী হবে?

বিমলার মনটাকে সেই উপরের হাওয়াতেই উড়িয়ে রাখবার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা সংক্ষেপে সেরে ফেলে, ফের আবার সেই মহিষমর্দিনীর পুজোর মন্ত্রণায় বসে গেলুম। পুজোটা হবে কবে এবং কখন? নিখিলের এলাকায় রুইমারিতে অঘ্রানের শেষে যে হোসেনগাজির মেলা হয় সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসে, সেইখানে পুজোটা যদি দেওয়া যায় তা হলে খুব জমাট হয়। বিমলা উৎসাহিত হয়ে উঠল। ও মনে করলে এ তো বিলিতি কাপড় পোড়ানো নয়, লোকের ঘর জ্বালানো নয়, এত বড়ো সাধু প্রস্তাবে নিখিলের কোনো আপত্তি হবে না। আমি মনে মনে হাসলুম—যারা ন বছর দিনরাত্তির একসঙ্গে কাটিয়েছে তারাও পরস্পরকে কত অল্প চেনে! কেবল ঘরকন্নার কথাটুকুতেই চেনে, ঘরের বাইরের কথা যখন হঠাৎ উঠে পড়ে তখন তারা আর থই পায় না। ওরা ন বছর ধরে বসে বসে এই কথাটাই ক্রমাগত বিশ্বাস করে এসেছে যে, ঘরের সঙ্গে বাইরের অবিকল মিল বুঝি আছেই; আজ ওরা বুঝতে পারছে কোনোদিন যে-দুটোকে মিলিয়ে নেওয়া হয় নি আজ তারা হঠাৎ মিলে যাবে কী করে।

যাক, যারা ভুল বুঝেছিল তারা ঠেকতে ঠেকতে ঠিক করে বুঝে নিক, তা নিয়ে আমার বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই। বিমলাকে তো এই উদ্দীপনার বেগে বেলুনের মতো অনেকক্ষণ উড়িয়ে রাখা সম্ভব নয়, অতএব এই হাতের কাজটা যত শীঘ্র পারা যায় সেরে নিতে হচ্ছে। বিমলা যখন চৌকি থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত গেছে আমি নিতান্ত যেন উড়ো রকমভাবে বললুম, রানী, তা হলে টাকাটা কবে—

বিমলা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, এই মাসের শেষে মাস-কাবারের সময়-

আমি বললুম, না, দেরি হলে চলবে না।

তোমার কবে চাই?

কালই।

আচ্ছা, কালই এনে দেব।

নিখিলেশের আত্মকথা

আমার নামে কাগজে প্যারাগ্রাফ এবং চিঠি বেরোতে শুরু হয়েছে; শুনছি একটা ছড়া এবং ছবি বেরোবে তারও উদ্যোগ হচ্ছে। রসিকতার উৎস খুলে গেছে, সেইসঙ্গে অজস্র মিথ্যেকথার ধারা-বর্ষণে সমস্ত দেশ একেবারে পুলকিত। জানে যে এই পঙ্কিল রসের হোরিখেলায় পিচকিরিটা তাদেরই হাতে; আমি ভদ্রলোক রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলেছি, আমার গায়ের আবরণখানা সাদা রাখবার উপায় নেই।

লিখেছে, আমার এলেকায় আপামর সাধারণ সকলেই স্বদেশীর জন্যে একেবারে উৎসুক হয়ে রয়েছে, কেবল আমার ভয়েই কিছু করতে পারছে না, দুই-এক জন সাহসী যারা দিশি জিনিস চালাতে চায় জমিদারি চালে আমি তাদের বিধিমতে উৎপীড়ন করছি। পুলিসের সঙ্গে আমার তলে তলে যোগ আছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমি গোপনে চিঠি চালাচালি করছি এবং বিশ্বস্তসূত্রে খবরের কাগজ খবর পেয়েছে যে, পৈতৃক খেতাবের উপরেও স্বোপার্জিত খেতাব যোগ করে দেবার জন্যে আমার আয়োজন ব্যর্থ হবে না। লিখেছে, 'স্বনামা পুরুষো ধন্য, কিন্তু দেশের লোক বিনামার ফরমাশ দিয়েছে, সে খবরও আমরা রাখি।' আমার নামটা স্পষ্ট করে দেয় নি, কিন্তু বাইরের অস্পষ্টতার ভিতর থেকে সেটা খুব বড়ো করে ফুটে উঠেছে।

এ দিকে মাতৃবৎসল হরিশ কুণ্ডুর গুণগান করে কাগজে চিঠির পর চিঠি বেরোচ্ছে। লিখেছে, মায়ের এমন সেবক দেশে যদি বেশি থাকত তা হলে এত দিনে ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানা-ঘরের চিমনি-গুলো পর্যন্ত বন্দেমাতরমের সুরে সমস্বরে রামশিঙে ফুঁকতে থাকত।

এ দিকে আমার নামে লাল কালিতে লেখা একখানা চিঠি এসেছে, তাতে খবর দিয়েছে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ লিভারপুলের নিমকহালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বলেছে, ভগবান পাবক এখন থেকে এই পাবনের কাজে লাগলেন; মায়ের যারা সন্তান নয় তারা যাতে মায়ের কোল জুড়ে থাকতে না পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

নাম সই করেছে, 'মায়ের কোলের অধম শরিক, শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।'

আমি জানি, এ সমস্তই আমার এখানকার সব ছাত্রদের রচনা। আমি ওদের দুই-একজনকে ডেকে সেই চিঠিখানা দেখালুম। বি.এ. গম্ভীরভাবে বললে, আমরাও শুনেছি দেশে একদল লোক মরিয়া হয়ে রয়েছে, স্বদেশীর বাধা দূর করতে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই।

আমি বললুম, তাদের অন্যায় জবরদস্তিতে দেশের একজন লোকও যদি হার মানে তা হলে সেটাতে সমস্ত দেশের পরাভব।

ইতিহাসে এম.এ. বললেন, বুঝতে পারছি নে।

আমি বললুম, আমাদের দেশ দেবতাকে থেকে পেয়াদাকে পর্যন্ত ভয় করে করে আধমরা হয়ে রয়েছে, আজ তোমরা মুক্তির নাম করে সেই জুজুর ভয়কে ফের আর-এক নামে যদি দেশে চালাতে চাও, অত্যাচারের দ্বারা কাপুরুষতাটার উপরে যদি তোমাদের দেশের জয়ধ্বজা রোপণ করতে চাও, তা হলে দেশকে যারা ভালোবাসে তারা সেই ভয়ের শাসনের কাছে এক চুল মাথা নিচু করবে না।

ইতিহাসে এম.এ. বললেন, এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে রাজ্যশাসন ভয়ের শাসন নয়?

আমি বললুম, এই ভয়ের শাসনের সীমা কোন্ পর্যন্ত সেইটের দ্বারাই দেশের মানুষ কতটা স্বাধীন জানা যায়। ভয়ের শাসন যদি চুরি ডাকাতি এবং পরের প্রতি অন্যায়ের উপরেই টানা যায় তা হলে বোঝা যায় যে প্রত্যেক মানুষকে অন্য মানুষের আক্রমণ থেকে স্বাধীন করবার জন্যেই এই শাসন। কিন্তু মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে, এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয় তা হলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হল মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা।

ইতিহাসে এম.এ. বললেন, অন্য দেশের সমাজেও কি ইচ্ছাকে গোড়া ঘেঁষে কাটবার কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেই?

আমি বললুম, কে বললে নেই? মানুষকে নিয়ে দাস-ব্যাবসা যে দেশে যে পরিমাণে আছে সে পরিমাণেই মানুষ আপনাকে নষ্ট করছে।

এম.এ. বললেন, তা হলে ঐ দাস-ব্যাবসাটা মানুষেরই ধর্ম, ওটাই মনুষ্যত্ব।

বি.এ. বললেন, সন্দীপবাবু এ সম্বন্ধে সেদিন যে দৃষ্টান্ত দিলেন সেটা আমাদের মনে খুব লেগেছে। এই যে ও পারে হরিশ কুণ্ডু আছেন জমিদার, কিংবা সানকিভাঙার চক্রবর্তীরা, ওঁদের সমস্ত এলেকা ঝাঁট দিয়ে আজ এক ছটাক বিলিতি নুন পাবার জো নেই। কেন? কেননা বরাবরই ওঁরা জোরের উপরে চলেছেন; যারা স্বভাবতই দাস, প্রভু না থাকাটাই হচ্ছে তাদের সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ।

এফ.এ.-প্লাক্‌ড্‌ ছোকরাটি বললে, একটা ঘটনা জানি, চক্রবর্তীদের একটি কায়স্থ প্রজা ছিল: সে তার একটা হাট নিয়ে চক্রবর্তীদের কিছুতে মানছিল না। মামলা করতে করতে শেষকালে তার এমন দশা হল যে খেতে পায় না। যখন দুদিন তার ঘরে হাঁড়ি চড়ল না তখন স্ত্রীর রুপোর গয়না বেচতে বেরোল; এই তার শেষ সম্বল। জমিদারের শাসনে গ্রামের কেউ তার গয়না কিনতেও সাহস করে না। জমিদারের নায়েব বললে, আমি কিনব, পাঁচ টাকা দামে। দাম তার টাকা ত্রিশ হবে। প্রাণের দায়ে পাঁচ টাকাতেই যখন সে রাজি হল তখন তার গয়নার পুঁটুলি নিয়ে নায়েব বললে, এই পাঁচ টাকা তোমার খাজনা-বাকিতে জমা করে নিলুম। এই কথা শুনে আমরা সন্দীপবাবুকে বলেছিলুম, চক্রবর্তীকে আমরা বয়কট করব। সন্দীপবাবু বললেন, এই-সমস্ত জ্যান্ত লোককেই যদি বাদ দাও তা হলে কি ঘাটের মড়া নিয়ে দেশের কাজ করবে? এরা প্রাণপণে ইচ্ছে করতে জানে, এরাই তো প্রভু। যারা ষোলো আনা ইচ্ছে করতে জানে না তারা হয় এদের ইচ্ছেয় চলবে নয় এদের ইচ্ছেয় মরবে। তিনি আপনার সঙ্গে তুলনা করে বললেন, আজ চক্রবর্তীর এলেকায় একটি মানুষ নেই যে স্বদেশী নিয়ে টুঁ শব্দটি করতে পারে, অথচ নিখিলেশ হাজার ইচ্ছে করলেও স্বদেশী চালাতে পারবেন না।

আমি বললুম, আমি স্বদেশীর চেয়ে বড়ো জিনিস চালাতে চাই, সেইজন্যে স্বদেশী চালানো আমার পক্ষে শক্ত। আমি মরা খুঁটি চাই নে তো, আমি জ্যান্ত গাছ চাই। আমার কাজে দেরি হবে।

ঐতিহাসিক হেসে বললে, আপনি মরা খুঁটিও পাবেন না, জ্যান্ত গাছও পাবেন না। কেননা, সন্দীপবাবুর কথা আমি মানি, পাওয়া মানেই কেড়ে নেওয়া। এ কথা শিখতে আমাদের সময় লেগেছে; কেননা, এগুলো ইস্কুলের শিক্ষার উল্টো শিক্ষা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, কুণ্ডুদের গোমস্তা গুরুচরণ ভাদুড়ি টাকা আদায় করতে বেরিয়েছিল। একটা মুসলমান প্রজার বেচে-কিনে নেবার মতো কিছু ছিল না। ছিল তার যুবতী স্ত্রী। ভাদুড়ি বললে, তোর বউকে নিকে দিয়ে টাকা শোধ করতে হবে। নিকে করবার উমেদার জুটে গেল, টাকাও শোধ হল। আপনাকে বলছি, স্বামীটার চোখের জল দেখে আমার রাত্রে ঘুম হয় নি, কিন্তু যতই কষ্ট হোক আমি এটা শিখেছি যে, যখন টাকা আদায় করতেই হবে তখন যে মানুষ ঋণীর স্ত্রীকে বেচিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে পারে মানুষ-হিসেবে সে আমার চেয়ে বড়ো; আমি পারি নে, আমার চোখে জল আসে, তাই সব ফেঁসে যায়। আমার দেশকে কেউ যদি বাঁচায় তবে এই-সব গোমস্তা, এই-সব কুণ্ডু, এই-সব চক্রবর্তীরা।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম; বললুম, তাই যদি হয়, তবে এই-সব গোমস্তা এই-সব কুণ্ডু এই-সব চক্রবর্তীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার কাজই আমার। দেখো, দাসত্বের যে বিষ মজ্জার মধ্যে আছে সেইটেই যখন সুযোগ পেয়ে বাইরে ফুটে ওঠে তখনি সেটা সাংঘাতিক দৌরাত্ম্যের আকার ধরে। বউ হয়ে যে মার খায় শাশুড়ি হয়ে সে-ই সব চেয়ে বড়ো মার মারে। সমাজে যে মানুষ মাথা হেঁট করে থাকে সে যখন বরযাত্র হয়ে বেরোয় তখন তার উৎপাতে মানী গৃহস্থের মান রক্ষা করা অসাধ্য। ভয়ের শাসনে তোমরা নির্বিচারে কেবলই সকল-তাতেই সকলকে মেনে এসেছ, সেইটেকেই

ধর্ম বলতে শিখেছ, সেইজন্যেই আজকে অত্যাচার করে সকলকে মানানোটাকেই তোমরা ধর্ম বলে মনে করছ। আমার লড়াই দুর্বলতার ঐ নিদারুণতার সঙ্গে।

আমার এ-সব কথা অত্যন্ত সহজ কথা, সরল লোককে বললে বুঝতে তার মুহূর্তমাত্র দেরি হয় না, কিন্তু আমাদের দেশে যে-সব এম.এ. ঐতিহাসিক বুদ্ধির প্যাঁচ কষছে সত্যকে পরাস্ত করবার জন্যেই তাদের প্যাঁচ।

এ দিকে পঞ্চুর জাল মামীকে নিয়ে ভাবছি। তাকে অপ্রমাণ করা কঠিন। সত্য ঘটনার সাক্ষীর সংখ্যা পরিমিত, এমন-কি সাক্ষী না থাকাও অসম্ভব নয়, কিন্তু যে ঘটনা ঘটে নি জোগাড় করতে পারলে তার সাক্ষীর অভাব হয় না। আমি যে মৌরসি স্বত্ব পঞ্চুর কাছ থেকে কিনেছি সেইটে কাঁচিয়ে দেবার এই ফন্দি।

আমি নিরুপায় দেখে ভাবছিলুম পঞ্চুকে আমার নিজ এলাকাতেই জমি দিয়ে ঘর বাড়ি করিয়ে দিই। কিন্তু মাস্টারমশায় বললেন, অন্যায়ের কাছে সহজে হার মানতে পারব না, আমি নিজে চেষ্টা দেখব।

আপনি চেষ্টা দেখবেন?

হাঁ আমি।

এ-সমস্ত মামলা-মকদ্দমার ব্যাপার, মাস্টারমশায় যে কী করতে পারেন বুঝতে পারলুম না। সন্ধ্যাবেলায় যে সময়ে রোজ আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেদিন দেখা হল না। খবর নিয়ে জানলুম, তিনি তাঁর কাপড়ের বাক্স আর বিছানা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন; চাকরদের কেবল এইটুকু বলে গেছেন, তাঁর ফিরতে দু-চার দিন দেরি হবে। আমি ভাবলুম, সাক্ষী সংগ্রহ করবার জন্যে তিনি পঞ্চুদের মামার বাড়িতেই বা চলে গেছেন, তা যদি হয় আমি জানি সে তাঁর বৃথা চেষ্টা হবে। জগদ্ধাত্রী-পুজো মহরম এবং রবিবারে জড়িয়ে তাঁর ইস্কুলের কয়দিন ছুটি ছিল; তাই ইস্কুলেও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না।

হেমন্তের বিকেলের দিকে দিনের আলোর রঙ যখন ঘোলা হয়ে আসতে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে মনেরও রঙ বদল হয়ে আসে। সংসারে অনেক লোক আছে যাদের মনটা কোঠাবাড়িতে বাস করে। তারা 'বাহির' বলে পদার্থকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলতে পারে। আমার মনটা আছে যেন গাছতলায়। বাইরের হাওয়ার সমস্ত ইশারা একেবারে গায়ের উপরে এসে পড়ে, আলো-অন্ধকারের সমস্ত মীড় বুকের ভিতরে বেজে ওঠে। দিনের আলো যখন প্রখর থাকে তখন সংসার তার অসংখ্য কাজ নিয়ে চার দিকে ভিড় করে দাঁড়ায়, তখন মনে হয় জীবনে এ ছাড়া আর কিছুরই দরকার নেই, কিন্তু যখন আকাশ ম্লান হয়ে আসে, যখন স্বর্গের জানলা থেকে মর্ত্যের উপর পর্দা নেমে আসতে থাকে, তখন আমার মন বলে, জগতে সন্ধ্যা আসে সমস্ত সংসারটাকে আড়াল করবার জন্যেই, এখন কেবল একের সঙ্গ অনন্ত অন্ধকারকে ভরে তুলবে এইটেই ছিল জলস্থল-আকাশের একমাত্র মন্ত্রণা। দিনের বেলা যে প্রাণ অনেকের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠবে সন্ধ্যার সময় সেই প্রাণই একের মধ্যে মুদে আসবে, আলো-অন্ধকারের ভিতরকার অর্থটাই ছিল এই। আমি সেটাকে অস্বীকার করে কঠিন হয়ে থাকতে পারি নে। তাই সন্ধ্যাটি যেই জগতের উপর প্রেয়সীর কালো চোখের তারার মতো অনিমেষ হয়ে ওঠে তখন আমার সমস্ত দেহমন বলতে থাকে, সত্য নয়, এ কথা কখনোই সত্য নয় যে, কেবলমাত্র কাজই মানুষের আদি অন্ত; মানুষ একান্তই মজুর নয়, হোক-না সে সত্যের মজুরি, ধর্মের মজুরি। সেই তারার-আলোয়-ছুটি-পাওয়া কাজের-বাইরেকার মানুষ, সেই অন্ধকারের-অমৃতে-ডুবে-মরবার মানুষটিকে তুই কি চিরদিনের মতো হারালি নিখিলেশ? সমস্ত সংসারের অসংখ্যতাও যে জায়গায় মানুষকে লেশমাত্র সঙ্গ দিতে পারে না সেইখানে যে লোক একলা হয়েছে সে কী ভয়ানক একলা!

সেদিন বিকেলবেলাটা ঠিক যখন সন্ধ্যার মোহানাটিতে এসে পৌঁচেছে তখন আমার কাজ ছিল না, কাজে মনও ছিল না, মাস্টারমশায়ও ছিলেন না, শূন্য বুকটা যখন আকাশে কিছু একটা আঁকড়ে

ধরতে চাচ্ছিল তখন আমি বাড়ি-ভিতরের বাগানে গেলুম। আমার চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বড়ো শখ। আমি টবে করে নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা বাগানে সাজিয়েছিলুম, যখন সমস্ত গাছ ভরে ফুল ফুটে উঠত তখন মনে হত সবুজ সমুদ্রে ঢেউ লেগে রঙের ফেনা উঠেছে। কিছুকাল আমি বাগানে যাই নি, আজ মনে মনে একটু হেসে বললুম, আমার বিরহিণী চন্দ্রমল্লিকার বিরহ ঘুচিয়ে আসি গে।

বাগানে যখন ঢুকলুম তখন কৃষ্ণ-প্রতিপদের চাঁদটি ঠিক আমাদের পাঁচিলের উপরটিতে এসে মুখ বাড়িয়েছে। পাঁচিলের তলাটিতে নিবিড় ছায়া, তারই উপর দিয়ে বাঁকা হয়ে চাঁদের আলো বাগানের পশ্চিম দিকে এসে পড়েছে। ঠিক আমার মনে হল চাঁদ যেন হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে অন্ধকারের চোখ টিপে ধরে মুচকে হাসছে।

পাঁচিলের যে ধারটিতে গ্যালারির মতো করে থাকে থাকে চন্দ্রমল্লিকার টব সাজানো রয়েছে সেই দিকে গিয়ে দেখি সেই পুষ্পিত সোপানশ্রেণীর তলায় ঘাসের উপরে কে চুপ করে শুয়ে আছে। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। আমি কাছে যেতেই সেও চমকে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

তার পর কী করা যায়? আমি ভাবছি আমি এইখান থেকে ফিরে যাব কিনা, বিমলাও নিশ্চয় ভাবছিল সে উঠে চলে যাবে কিনা। কিন্তু থাকাও যেমন শক্ত, চলে যাওয়াও তেমনি। আমি কিছু-একটা মনস্থির করার পূর্বেই বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

সেই একটুখানি সময়ের মধ্যেই বিমলার দুর্বিষহ দুঃখ আমার কাছে যেন মূর্তিমান হয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্তে আমার নিজের জীবনের নালিশ কোথায় দূরে ভেসে গেল। আমি তাকে ডাকলুম, বিমলা!

সে চমকে দাঁড়াল। কিন্তু তখনো সে আমার দিকে ফিরল না। আমি তার সামনে এসে দাঁড়ালুম। তার দিকে ছায়া, আমার মুখের উপর চাঁদের আলো পড়ল। সে দুই হাত মুঠো করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম, বিমলা, আমার এই পিঁজরের মধ্যে চারি দিক বন্ধ, তোমাকে কিসের জন্যে এখানে ধরে রাখব? এমন করে তো তুমি বাঁচবে না।

বিমলা চোখ বুজেই রইল, একটি কথাও বললে না।

আমি বললুম, তোমাকে যদি এমন জোর করে বেঁধে রাখি তা হলে আমার সমস্ত জীবন যে একটা লোহার শিকল হয়ে উঠবে। তাতে কি আমার কোনো সুখ আছে?

বিমলা চুপ করেই রইল।

আমি বললুম, এই আমি তোমাকে সত্য বলছি, আমি তোমাকে ছুটি দিলুম। আমি যদি তোমার আর-কিছু না হতে পারি অন্তত আমি তোমার হাতের হাতকড়া হব না।

এই বলে আমি বাড়ির দিকে চলে গেলুম। না না, এ আমার ঔদার্য নয়, এ আমার ঔদাসীন্য তো নয়ই। আমি যে ছাড়তে না পারলে কিছুতেই ছাড়া পাব না। যাকে আমার হৃদয়ের হার করব তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা করে রেখে দিতে পারব না। অন্তর্যামীর কাছে আমি জোড়-হাতে কেবল এই প্রার্থনাই করছি আমি সুখ না পাই নেই পেলুম, দুঃখ পাই সেও স্বীকার, কিন্তু আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ো না। মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে রাখার চেষ্টা যে নিজেরই গলা চেপে ধরা। আমার সেই আত্মহত্যা থেকে আমাকে বাঁচাও।

বৈঠকখানার ঘরে এসে দেখি মাস্টারমশায় বসে আছেন। তখন ভিতরে ভিতরে আবেগে আমার মন দুলছে। মাস্টারমশায়কে দেখে আমি অন্য কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার আগে বলে উঠলুম, মাস্টারমশায়, মুক্তিই হচ্ছে মানুষের সব চেয়ে বড়ো জিনিস। তার কাছে আর-কিছুই নেই, কিছুই না।

মাস্টারমশায় আমার এই উত্তেজনায় আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কিছু না বলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বললুম, বই পড়ে কিছুই বোঝা যায় না। শাস্ত্রে পড়েছিলুম ইচ্ছাটাই বন্ধন; সে নিজেকে

বাঁধে, অন্যকে বাঁধে। কিন্তু, শুধু কেবল কথা ভয়ানক ফাঁকা। সত্যি যেদিন পাখিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি সেদিন বুঝতে পারি পাখিই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আমি আপনাকে বলছি, পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ বুঝতে পারছে না। সবাই মনে করছে, সংস্কার আর-কোথাও করতে হবে। আর কোথাও না, কোথাও না, কেবল ইচ্ছের মধ্যে ছাড়া।

মাস্টারমশায় বললেন, আমরা মনে করি, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে হাতে করে পাওয়াই স্বাধীনতা; কিন্তু আসলে, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।

আমি বললুম, মাস্টারমশায়, অমন করে কথায় বলতে গেলে টাক-পড়া উপদেশের মতো শোনায়; কিন্তু যখনি চোখে ওকে আভাসমাত্রেও দেখি তখন যে দেখি ঐটেই অমৃত। দেবতারা এইটেই পান করে অমর। সুন্দরকে আমরা দেখতেই পাই নে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই। বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেক্‌জান্ডার করেন নি, এ কথা যে তখন মিথ্যেকথা যখন এটা শুকনো গলায় বলি। এই কথা কবে গান গেয়ে বলতে পারব? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই-সব প্রাণের কথা ছাপার বইকে ছাপিয়ে পড়বে কবে, একেবারে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার নির্ঝরের মতো?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাস্টারমশায় কদিন ছিলেন না, কোথায় ছিলেন তা জানিও নে। একটু লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি ছিলেন কোথায়?

মাস্টারমশায় বললেন, পঞ্চুর বাড়িতে।

পঞ্চুর বাড়িতে? এই চার দিন সেখানেই ছিলেন?

হাঁ, মনে ভাবলুম, যে মেয়েটি পঞ্চুর মামী সেজে এসেছে তার সঙ্গেই কথাবার্তা কয়ে দেখব। আমাকে দেখে প্রথমটা সে একটু আশ্চর্য হয়ে গেল; ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও যে এতবড়ো অদ্ভুত কেউ হতে পারে এ কথা সে মনে করতেও পারে নি। দেখলে যে আমি রয়েই গেলুম। তার পরে তার লজ্জা হতে লাগল। আমি তাকে বললুম, মা, আমাকে তো তুমি অপমান করে তাড়াতে পারবে না। আর, আমি যদি থাকি তা হলে পঞ্চুকেও রাখব; ওর মা-হারা সব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, তারা পথে বেরোবে এ তো আমি দেখতে পারব না। দুদিন আমার কথা চুপ করে শুনলে; হাঁও বলে না, নাও বলে না; শেষকালে আজ দেখি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধছে। বললে, আমরা বৃন্দাবনে যাব, আমাদের পথ-খরচ দাও। বৃন্দাবনে যাবে না জানি, কিন্তু একটু মোটারকম পথ-খরচ দিতে হবে। তাই তোমার কাছে এলুম।

আচ্ছা, সে যা দরকার তা দেব।

বুড়িটা লোক খারাপ নয়। পঞ্চু ওকে জলের কলসী ছুঁতে দেয় না, ঘরে এলে হাঁ-হাঁ করে ওঠে —তাই নিয়ে ওর সঙ্গে খুঁটিনাটি চলছিল। কিন্তু ওর হাতে আমার খেতে আপত্তি নেই শুনে আমাকে যত্নের একশেষ করেছে। চমৎকার রাঁধে। আমার উপরে পঞ্চুর ভক্তিশ্রদ্ধা যা একটুখানি ছিল তাও এবার চুকে গেল। আগে ওর ধারণা ছিল অন্তত, আমি লোকটা সরল; কিন্তু এবার ওর ধারণা হয়েছে আমি যে বুড়িটার হাতে খেলুম সেটা কেবল তাকে বশ করবার ফন্দি। সংসারে ফন্দিটা চাই বটে, কিন্তু তাই বলে একেবারে ধর্মটা খোয়ানো? মিথ্যে সাক্ষীতে আমি বুড়ির উপর যদি টেক্কা দিতে পারতুম তা হলে বটে বোঝা যেত। যা হোক, বুড়ি বিদায় হলেও কিছুদিন আমাকে পঞ্চুর ঘর আগলে থাকতে হবে, নইলে হরিশ কুণ্ডু কিছু-একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বসবে। সে নাকি ওর পারিষদদের কাছে বলেছে, আমি ওর একটা জাল মামী জুটিয়ে দিলুম, ও বেটা আমার উপর টেক্কা মেরে কোথা থেকে এক জাল বাবার জোগাড় করেছে! দেখি ওর বাবা ওকে বাঁচায় কী করে।

আমি বললুম, ও বাঁচতেও পারে, মরতেও পারে, কিন্তু এই যে এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরি করছে, ধর্মে, সমাজে, ব্যবসায়ে, সেটার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যদি হারও হয় তা হলেও আমরা সুখে মরতে পারব।

বিমলার আত্মকথা

এক জন্মে যে এতটা ঘটতে পারে সে মনেও করা যায় না। আমার যেন সাত জন্ম হয়ে গেল। এই কয় মাসে হাজার বছর পার হয়ে গেছে। সময় এত জোরে চলছিল যে, চলছে বলে বুঝতেই পারি নি। সেদিন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পেরেছি।

বাজার থেকে বিদেশী মাল বিদায় করবার কথা যখন স্বামীর কাছে বলতে গেলুম তখন জানতুম এই নিয়ে খানিকটা কথা-কাটাকাটি চলবে। কিন্তু আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে, তর্কের দ্বারা তর্ককে নিরস্ত করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। আমার চার দিকের বায়ুমণ্ডলে একটা জাদু আছে। সন্দীপের মতো অতবড়ো একটা পুরুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো যে আমার পায়ের কাছে এসে ভেঙে পড়ল। আমি তো ডাক দিই নি, সে আমার এই হাওয়ার ডাক। আর সেদিন দেখলুম সেই অমূল্যকে, আহা সে ছেলেমানুষ, কাঁচ মুরলী বাঁশিটির মতো সরল এবং সরস, সে আমার কাছে যখন এল তখন ভোরবেলাকার নদীর মতো দেখতে দেখতে তার জীবনের ধারার ভিতর থেকে একটি রঙ ফুটে উঠল। দেবী তাঁর ভক্তের মুখের দিকে চেয়ে যে কিরকম মুগ্ধ হতে পারেন সেদিন অমূল্যর দিকে চেয়ে আমি তা বুঝতে পারলুম। আমার শক্তির সোনার কাঠি যে কেমনতরো কাজ করে এমনি করে তো তা দেখতে পেয়েছি।

তাই সেদিন নিজের 'পরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বজ্রবাহিনী বিদ্যুৎশিখার মতো আমার স্বামীর কাছে গিয়েছিলুম। কিন্তু, হল কী? আজ ন বছরে একদিনও স্বামীর চোখে এমন উদাস দৃষ্টি দেখি নি। সে যেন মরুভূমির আকাশের মতো, তার নিজের মধ্যেও একটুখানি রসের বাষ্প নেই, আর যার দিকে তাকিয়ে আছে তার মধ্যেও যেন কোথাও কিছুমাত্র রঙ দেখা যাচ্ছে না। একটু যদি রাগও করতেন তা হলেও বাঁচতুম। কোথাও তাঁকে ছুঁতেও পারলুম না। মনে হল আমি মিথ্যে। যেন আমি স্বপ্ন; স্বপ্নটা যেই ভেঙে গেল, অমনি কেবল অন্ধকার রাত্রি।

এতকাল রূপের জন্যে আমার রূপসী জা'দের ঈর্ষা করে এসেছি। মনে জানতুম বিধাতা আমাকে শক্তি দেন নি, আমার স্বামীর ভালোবাসাই আমার একমাত্র শক্তি। আজ যে শক্তির মদ পেয়ালা ভরে খেয়েছি, নেশা জমে উঠেছে। এমন সময় হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল। এখন বাঁচি কী করে!

তাড়াতাড়ি খোঁপা বাঁধতে বসেছিলুম! লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! মেজোরানীর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বলে উঠলেন, কী লো ছোটোরানী, খোঁপাটা যে মাথা ডিঙিয়ে লাফ মারতে চায়, মাথাটা ঠিক আছে তো?

সেদিন বাগানে স্বামী আমাকে অনায়াসে বললেন, তোমাকে ছুটি দিলুম। ছুটি কি এতই সহজে দেওয়া যায় কিংবা নেওয়া যায়? ছুটি কি একটা জিনিস? ছুটি যে ফাঁকা। মাছের মতো আমি যে চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েছি, হঠাৎ আকাশে তুলে ধরে যখন বললে 'এই তোমার ছুটি'—তখন দেখি এখানে আমি চলতেও পারি নে, বাঁচতেও পারি নে।

আজ শোবার ঘরে যখন ঢুকি তখন শুধু দেখি আসবাব, শুধু আলনা, শুধু আয়না, শুধু খাট! এর উপরে সেই সর্বব্যাপী হৃদয়টি নেই। রয়েছে ছুটি, কেবল ছুটি, একটা ফাঁক। ঝর্না একেবারে শুকিয়ে গেল, পাথর আর নুড়িগুলো বেরিয়ে পড়েছে। আদর নেই, আসবাব!

এ জগতে সত্য আমার পক্ষে কোথায় কতটুকু টিঁকে আছে সে সম্বন্ধে হঠাৎ যখন এতবড়ো একটা ধাঁধা লাগল তখন আবার দেখা হল সন্দীপের সঙ্গে। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের ধাক্কা লেগে সেই আগুন তো আবার তেমনি করেই জ্বলল। কোথায় মিথ্যে? এ যে ভরপুর সত্য, দুই কূল ছাপিয়ে-পড়া সত্য। এই যে মানুষগুলো সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কথা কচ্ছে, হাসছে—ঐ যে বড়োরানী মালা জপছেন, মেজোরানী থাকো দাসীকে নিয়ে হাসছেন, পাঁচালির গান গাচ্ছেন—আমার ভিতরকার এই আবির্ভাব যে এই-সমস্তর চেয়ে হাজার গুণে সত্য।

সন্দীপ বললেন, পঞ্চাশ হাজার চাই। আমার মাতাল মন বলে উঠল, পঞ্চাশ হাজার কিছুই নয়, এনে দেব! কোথায় পাব, কী করে পাব, সেও কি একটা কথা! এই তো আমি নিজে এক মুহূর্তে কিছু-না থেকে একেবারে সব-কিছুকে যেন ছাড়িয়ে উঠেছি! এমনি করেই এক ইশারায় সব ঘটনা ঘটবে। পারব, পারব, পারব! একটুও সন্দেহ নেই।

চলে তো এলুম। তার পর চার দিকে চেয়ে দেখি, টাকা কই? কল্পতরু কোথায়? বাহিরটা মনকে এমন করে লজ্জা দেয় কেন? কিন্তু তবু টাকা এনে দেবই। যেমন করেই হোক, তাতে গ্লানি নেই। যেখানে দীনতা সেখানেই অপরাধ, শক্তিকে কোনো অপরাধ স্পর্শই করে না। চোরই চুরি করে, বিজয়ী রাজা লুঠ করে নেয়। কোথায় মালখানা, সেখানে কার হাতে টাকা জমা হয়, পাহারা দেয় কারা, এই সব সন্ধান করছি! অর্ধেক রাত্রে বাহির-বাড়িতে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দফতরখানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কাটিয়েছি। ঐ লোহার গরাদের মুঠো থেকে পঞ্চাশ হাজার ছিনিয়ে নেব কী করে? মনে দয়া ছিল না। যারা পাহারা দিচ্ছে তারা যদি মন্ত্রে ঐখানে মরে পড়ে তা হলে এখনি আমি উন্মত্ত হয়ে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যেতে পারি। এই বাড়ির রানীর মনের মধ্যে ডাকাতের দল খাঁড়া হাতে নৃত্য করতে করতে দেবীর কাছে বর মাগতে লাগল— কিন্তু বাইরের আকাশ নিঃশব্দ হয়ে রইল, প্রহরে প্রহরে পাহারা বদল হতে লাগল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল, বৃহৎ রাজবাড়ি নির্ভয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে রইল।

শেষকালে একদিন অমূল্যকে ডাকলুম। বললুম, দেশের জন্যে টাকার দরকার, খাজাঞ্চির কাছ থেকে এ টাকা বের করে আনতে পারবে না?

সে বুক ফুলিয়ে বললে, কেন পারব না?

হায় রে, আমিও সন্দীপের কাছে এমনি করে বলেছিলুম 'কেন পারব না'। অমূল্যর বুক-ফোলানো দেখে একটুও আশ্বাস পেলুম না।

জিজ্ঞাসা করলুম, কী করবে বলো দেখি।

অমূল্য এমনি-সব আজগুবি প্ল্যান বলতে লাগল যে, সে মাসিক কাগজের ছোটো গল্পে ছাড়া আর কোথাও প্রকাশ করবারই যোগ্য নয়।

আমি বললুম, না অমূল্য, ও-সব ছেলেমানুষি রাখো।

সে বললে, আচ্ছা, টাকা দিয়ে ঐ পাহারার লোকদের বশ করব।

টাকা পাবে কোথায়?

সে অম্লানমুখে বললে, বাজার লুঠ করে।

আমি বললুম, ও-সব দরকার নেই, আমার গয়না আছে তাই দিয়ে হবে।

অমূল্য বললে, কিন্তু খাজাঞ্চির উপর ঘুষ চলবে না। খুব একটা সহজ ফিকির আছে।

কিরকম?

সে আপনার শুনে কাজ নেই। সে খুব সহজ।

তবু শুনি।

অমূল্য কোর্তার পকেট থেকে প্রথমে একটা পকেট-এডিশন গীতা বের করে টেবিলের উপর রাখলে, তার পরে একটি ছোটো পিস্তল বের করে আমাকে দেখালে, আর কিছু বললে না।

কী সর্বনাশ! আমাদের বুড়ো খাজাঞ্চিকে মারার কথা মনে করতে ওর এক মুহূর্তও দেরি হল না। ওর মুখখানি এমনতরো যে মনে হয়, একটা কাক মারাও ওর পক্ষে শক্ত, অথচ মুখের কথা একেবারে অন্য জাতের। আসল কথা, এই সংসারে বুড়ো খাজাঞ্চি যে কতখানি সত্য তা ও একেবারে দেখতে পাচ্ছে না, সেখানে যেন ফাঁকা আকাশ। সেই আকাশে প্রাণ নেই, ব্যথা নেই, কেবল শ্লোক আছে : ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

আমি বললুম, বল কী অমূল্য! আমাদের রায়-মশায়ের যে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে, তার যে—

স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই এমন মানুষ এ দেশে পাব কোথায়? দেখুন, আমরা যাকে দয়া বলি সে কেবল নিজের 'পরেই দয়া, পাছে নিজের দুর্বল মনে ব্যথা লাগে সেইজন্যেই অন্যকে আঘাত করতে পারি নে, এই তো হল কাপুরুষতার চূড়ান্ত!

সন্দীপের মুখের বুলি বালকের মুখে শুনে বুক কেঁপে উঠল। ও যে নিতান্ত কাঁচা, ভালোকে ভালো বলে বিশ্বাস করবারই যে ওর সময়। আহা, ওর যে বাঁচবার বয়েস, বাড়বার বয়েস। আমার ভিতরে মা জেগে উঠল যে! নিজের দিক থেকে আমার ভালোও ছিল না, মন্দও ছিল না, ছিল কেবল মরণ মধুর রূপ ধ'রে; কিন্তু যখন এই আঠারো বছরের ছেলে এমন অনায়াসে মনে করতে পারলে একজন বুড়োমানুষকে বিনা দোষে মেরে ফেলাই ধর্ম তখন আমার গা শিউরে উঠল। যখন দেখতে পেলুম ওর মনে পাপ নেই তখন ওর এই কথার পাপ বড়ো ভয়ংকর হয়ে আমার কাছে দেখা দিলে। যেন বাপমায়ের অপরাধকে কচি ছেলের মধ্যে দেখতে পেলুম।

বিশ্বাসে উৎসাহে ভরা বড়ো বড়ো ঐ দুটি সরল চোখের দিকে চেয়ে আমার প্রাণের ভিতর কেমন করতে লাগল। অজগর সাপের মুখের মধ্যে ঢুকতে চলেছে, একে কে বাঁচাবে? আমার দেশ কেন সত্যিকার মা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এই ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরছে না? কেন একে বলছে না 'ওরে বাছা আমাকে তুই বাঁচিয়ে কী করবি তোকে যদি বাঁচাতে না পারলুম'?

জানি জানি, পৃথিবীর বড়ো বড়ো প্রতাপ শয়তানের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে, কিন্তু মা যে আছে একলা দাঁড়িয়ে এই শয়তানের সমৃদ্ধিকে তুচ্ছ করবার জন্যে। মা তো কার্যসিদ্ধি চায় না, সে সিদ্ধি যতবড়ো সিদ্ধিই হোক, মা যে বাঁচাতে চায়। আজ আমার সমস্ত প্রাণ চাচ্ছে এই ছেলেটিকে দুই হাতে টেনে ধরে বাঁচাবার জন্যে।

কিছু আগেই ওকে ডাকাতি করতে বলেছিলুম, এখন যতবড়ো উল্টো কথাই বলি সেটাকে ও মেয়েমানুষের দুর্বলতা বলে হাসবে। মেয়েমানুষের দুর্বলতাকে ওরা তখনি মাথা পেতে নেয় যখন সে পৃথিবী মজাতে বসে।

অমূল্যকে বললুম, যাও, তোমাকে কিছু করতে হবে না, টাকা সংগ্রহ করবার ভার আমারই উপর।

যখন সে দরজা পর্যন্ত গেছে তাকে ডাক দিয়ে ফেরালুম; বললুম, অমূল্য, আমি তোমার দিদি। আজ ভাইফোঁটার পাঁজির তিথি নয়, কিন্তু ভাইফোঁটার আসল তিথি বছরে তিন শো পঁয়ষট্টি দিন। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন!

হঠাৎ আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে অমূল্য একটু থমকে রইল। তার পরেই প্রণাম করে আমার পায়ের ধুলো নিলে। উঠে যখন দাঁড়াল তার চোখ ছল্‌ছল্‌ করছে।

ভাই আমার, আমি তো মরতেই বসেছি, তোমার সব বালাই নিয়ে যেন মরি— আমা হতে তোমার কোনো অপরাধ যেন না হয়!

অমূল্যকে বললুম, তোমার পিস্তলটি আমাকে প্রণামী দিতে হবে।

কী করবে দিদি?

মরণ প্র্যাকটিস করব।

এই তো চাই দিদি, মেয়েদেরও মরতে হবে, মারতে হবে। এই বলে অমূল্য পিস্তলটি আমার হাতে দিলে।

অমূল্য তার তরুণ মুখের দীপ্তিরেখা আমার জীবনের মধ্যে নূতন উষার প্রথম অরুণলেখাটির মতো এঁকে দিয়ে গেল। পিস্তলটাকে বুকের কাপড়ের ভিতর নিয়ে বললুম, এই রইল আমার উদ্ধারের শেষ সম্বল, আমার ভাইফোঁটার প্রণামী।

নারীর হৃদয়ে যেখানে মায়ের আসন আমার সেইখানকার জানলাটি হঠাৎ এই একবার খুলে গিয়েছিল। তখন মনে হল, এখন থেকে বুঝি তবে খোলাই রইল।

কিন্তু শ্রেয়ের পথ আবার বন্ধ হয়ে গেল, প্রেয়সী নারী এসে মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলে।

পরের দিনে সন্দীপের সঙ্গে আবার দেখা। একটা উলঙ্গ পাগলামি আবার হৃৎপিণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য শুরু করে দিলে। কিন্তু এ কী এ! এই কি আমার স্বভাব? কখনোই না।

এই নির্লজ্জকে এই নিদারুণকে এর আগে কোনোদিন দেখি নি। সাপুড়ে হঠাৎ এসে এই সাপকে আমার আঁচলের ভিতর থেকে বের করে দেখিয়ে দিলে; কিন্তু কখনোই এ আমার আঁচলের মধ্যে ছিল না, এ ঐ সাপুড়েরই চাদরের ভিতরকার জিনিস। অপদেবতা কেমন করে আমার উপর ভর করেছে! আজ আমি যা-কিছু করছি সে আমার নয়, সে তারই লীলা।

সেই অপদেবতা একদিন রাঙা মশাল হাতে করে এসে আমাকে বললে, আমিই তোমার দেশ, আমিই তোমার সন্দীপ, আমার চেয়ে বড়ো তোমার আর কিছুই নেই, বন্দেমাতরং! আমি হাত জোড় করে বললুম, তুমিই আমার ধর্ম, তুমিই আমার স্বর্গ, আমার যা-কিছু আছে সব তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দেব। বন্দেমাতরং!

পাঁচ হাজার চাই? আচ্ছা, পাঁচ হাজারই নিয়ে যাব। কালই চাই? আচ্ছা, কালই পাবে। কলঙ্কে দুঃসাহসে ঐ পাঁচ হাজার টাকার দান মদের মতো ফেনিয়ে উঠবে; তার পরে মাতালের উৎসব; অচলা পৃথিবী পায়ের তলায় টলমল করতে থাকবে, চোখের উপর আগুন ছুটবে, কানের ভিতর ঝড়ের গর্জন জাগবে, সামনে কী আছে কী নেই তা বুঝতেই পারব না; তার পরে টলতে টলতে পড়ব গিয়ে মরণের মধ্যে; সমস্ত আগুন এক নিমিষে নিবে যাবে, সমস্ত ছাই হাওয়ায় উড়বে— কিছুই আর বাকি থাকবে না।

টাকা কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে কথা এর আগে কোনো মতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না। সেদিন তীব্র উত্তেজনার আলোতে এই টাকাটা হঠাৎ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখতে পেলুম।

ফি বছর আমার স্বামী পুজোর সময় তাঁর বড়ো ভাজ আর মেজো ভাজকে তিন হাজার টাকা করে প্রণামী দিয়ে থাকেন। সেই টাকা বছরে বছরে তাঁদের নামে ব্যাঙ্কে জমা হয়ে সুদে বাড়ছে। এবারেও নিয়মমত প্রণামী দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জানি টাকাটা এখনো ব্যাঙ্কে পাঠানো হয় নি। কোথায় আছে তাও আমার জানা। আমাদের শোবার ঘরের সংলগ্ন কাপড়-ছাড়বার ছোটো কুঠরির কোণে লোহার সিন্দুক আছে, তারই মধ্যে টাকাটা তোলা হয়েছে।

ফি বছরে এই টাকা নিয়ে আমার স্বামী কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা দিতে যান; এবারে তাঁর আর যাওয়া হল না। এইজন্যেই তো দৈবকে মানি। এই টাকা দেশ নেবেন বলেই আটক আছে। এ টাকা ব্যাঙ্কে নিয়ে যায় সাধ্য কার? আর এই টাকা আমি না নিই এমন সাধ্যই বা আমার কই? প্রলয়ংকরী খর্পর বাড়িয়ে দিয়েছেন; বলছেন, আমি ক্ষুধিত, আমাকে দেঁ! আমি আমার বুকের রক্ত দিলুম, ঐ পাঁচ হাজার টাকায়। মা গো, এই টাকা যার গেল তার সামান্যই ক্ষতি হবে, কিন্তু আমাকে এবার তুমি একেবারে ফতুর করে নিলে।

এর আগে কতদিন বড়োরানী-মেজোরানীকে আমি মনে মনে চোর বলেছি; আমার বিশ্বাস-পরায়ণ স্বামীকে ভুলিয়ে তাঁরা ফাঁকি দিয়ে কেবল টাকা নিচ্ছেন, এই ছিল আমার নালিশ। তাঁদের স্বামীদের মৃত্যুর পরে অনেক সরকারি জিনিসপত্র তাঁরা লুকিয়ে সরিয়েছেন, এ কথা অনেকবার স্বামীকে বলেছি। তিনি তার কোনো জবাব না করে চুপ করে থাকতেন। তখন আমার রাগ হত; আমি বলতুম, দান করতে হয় হাতে তুলে দান করো, কিন্তু চুরি করতে দেবে কেন। বিধাতা সেদিন আমার এই নালিশ শুনে মুচকে হেসেছিলেন, আজ আমি আমার স্বামীর সিন্দুক থেকে ঐ বড়োরানীর মেজোরানীর টাকা চুরি করতে চলেছি!

রাত্রে আমার স্বামী সেই ঘরেই তাঁর জামাকাপড় ছাড়েন, সেই জামার পকেটেই তাঁর চাবি থাকে। সেই চাবি বের করে নিয়ে লোহার সিন্দুক খুললুম। অল্প যে একটু শব্দ হল, মনে হল

সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল। হঠাৎ একটা শীতে আমার হাত-পা হিম হয়ে বুকের মধ্যে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকল।

লোহার সিন্দুকের মধ্যে একটা টানা দেরাজ আছে। সেইটে খুলে দেখলুম নোট নেই, কাগজের মোড়কে ভাগ করা গিনি সাজানো। প্রতি মোড়কে কত গিনি আছে, আমার কত দরকার, সে তখন হিসেব করবার সময় নয়। কুড়িটি মোড়ক ছিল, সব-ক'টা নিয়েই আমার আঁচলে বাঁধলুম।

কম ভারী নয়! চুরির ভারে আমার মন যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল! হয়তো নোটের তাড়া হলে সেটাকে এত বেশি চুরি বলে মনে হত না। এ যে সব সোনা!

সেই রাত্রে নিজের ঘরে যখন চোর হয়ে ঢুকতে হল তখন থেকে এ ঘর আমার আর আপন রইল না। এ ঘরে আমার কত বড়ো অধিকার! চুরি করে সব খোয়ালুম।

মনে মনে জপতে লাগলুম, বন্দেমাতরং, বন্দেমাতরং! দেশ, আমার দেশ, আমার সোনার দেশ! সব সোনা সেই দেশের সোনা, এ আর কারও নয়!

কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে মন যে দুর্বল হয়ে থাকে। স্বামী পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, চোখ বুজে তাঁর ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলুম। অন্তঃপুরের খোলা ছাদের উপর গিয়ে সেই আঁচলে-বাঁধা চুরির উপর বুক দিয়ে মাটিতে পড়ে রইলুম, সেই মোড়কগুলো বুকে বাজতে লাগল। নিস্তব্ধ রাত্রি আমার শিয়রের কাছে তর্জনী তুলে রইল। ঘরকে তো আমি দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারলুম না। আজ ঘরকে লুটেছি, দেশকেই লুটেছি; এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না, দেশও হয়ে গেল পর। আমি যদি ভিক্ষে করে দেশের সেবা করতুম এবং সেই সেবা সম্পূর্ণ না করেও মরে যেতুম, তবে সেই অসমাপ্ত সেবাই হত পুজো, দেবতা তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু চুরি তো পুজো নয়; এ জিনিস কেমন করে দেশের হাতে তুলে দেব! চোরাই মালে দেশের ভরা ডোবাতে বসলুম গো! নিজে মরতে বসেছি, কিন্তু দেশকে আঁকড়ে ধরে তাকে সুদ্ধ কেন অশুচি করি!

এ টাকা লোহার সিন্দুকে ফেরবার পথ বন্ধ। আবার এই রাত্রে সেই ঘরে ফিরে গিয়ে সেই চাবি নিয়ে সেই সিন্দুক খোলবার শক্তি আমার নেই। আমি তা হলে স্বামীর ঘরের চৌকাঠের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। এখন সামনে-রাস্তা ছাড়া রাস্তাই নেই।

কত টাকা নিলুম তাই যে বসে বসে গুনব, সে আমি লজ্জায় পারলুম না। ও যেমন ঢাকা আছে তেমনি ঢাকা থাক্, চুরির হিসেব করব না।

শীতের অন্ধকার রাত্রে আকাশে একটুও বাষ্প ছিল না; সমস্ত তারাগুলি ঝক্ ঝক্ করছে। আমি ছাদের উপর শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম দেশের নাম করে ঐ তারাগুলি যদি একটি একটি মোহরের মতো আমাকে চুরি করতে হত, অন্ধকারের বুকের মধ্যে সঞ্চিত ঐ তারাগুলি, তার পরদিন থেকে চিরকালের জন্যে রাত্রি একেবারে বিধবা, নিশীথের আকাশ একেবারে অন্ধ, তা হলে সে চুরি যে সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি হত। আজ আমি এই-যে চুরি করে আনলুম এও তো টাকাচুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের আলো-চুরিরই মতো; এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি, বিশ্বাস-চুরি, ধর্ম-চুরি।

ছাদের উপর পড়ে রাত্রি কেটে গেল। সকালে যখন বুঝলুম আমার স্বামী এতক্ষণে উঠে চলে গেছেন তখন সর্বাঙ্গে শাল মুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চললুম। তখন মেজোরানী ঘটিতে করে তাঁর বারান্দার টবের গাছ-ক'টিতে জল দিচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, ওলো ছোটোরানী, শুনেছিস খবর?

আমি চুপ করে দাঁড়ালুম, আমার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। মনে হতে লাগল, আঁচলে বাঁধা গিনিগুলো শালের ভিতর থেকে বড়ো বেশি উঁচু হয়ে আছে। মনে হল, এখনি আমার কাপড়

ছি'ড়ে গিনিগ্‌লো বারান্দাময় ঝন্ ঝন্ করে ছড়িয়ে পড়বে, নিজের ঐশ্বর্য চুরি করে ফতুর হয়ে গেছে এমন চোর আজ এই বাড়ির দাসী-চাকরদের কাছেও ধরা পড়ে যাবে।

মেজোরানী বললেন, তোদের দেবীচৌধ্‌রানীর দল ঠাকুরপোর তহবিল ল্‌ঠ করবে শাসিয়ে বেনামি চিঠি লিখেছে।

আমি চোরের মতোই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল্‌ম।

আমি ঠাকুরপোকে বলছিল্‌ম তোমার শরণাপন্ন হতে। দেবী, প্রসন্ন হও গো, তোমার দলবল ঠেকাও। আমরা তোমার বন্দেমাতরমের শিন্নি মানছি। দেখতে দেখতে অনেক কাণ্ডই তো হল, এখন দোহাই তোমার, ঘরে সি'দটা ঘটতে দিয়ো না।

আমি কিছ্‌ না বলে তাড়াতাড়ি আমার শোবার ঘরে চলে গেল্‌ম। চোরাবালিতে পা দিয়ে ফেলেছি, আর ওঠবার জো নেই, এখন যত ছট্‌ফট্ করব ততই ডুবতে থাকব।

এ টাকাটা এক্ষনি আমার আঁচল থেকে খসিয়ে সন্দীপের হাতে দিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচি, এ বোঝা আমি আর বইতে পারি নে, আমার পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্ছে।

সকালবেলাতেই খবর পেল্‌ম সন্দীপ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আজ আর আমার সাজ-সজ্জা ছিল না, শাল ম্‌ড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেল্‌ম।

ঘরের মধ্যে ঢ্‌কেই দেখি সন্দীপের সঙ্গে অম্‌ল্য বসে আছে। মনে হল আমার মানসম্ভ্রম যা-কিছ্‌ বাকি ছিল সমস্ত যেন ঝিম্ ঝিম্ করে আমার গা বেয়ে নেবে গিয়ে পায়ের তলা দিয়ে একেবারে মাটির মধ্যে চলে গেল। নারীর চরম অমর্যাদা ঐ বালকের সামনে আজ আমাকে উদ্‌ঘাটিত করে দিতে হবে। আমার এই চুরির কথা এরা আজ দলের মধ্যে বসে আলোচনা করছে? এর উপরে অল্প একট্‌খানিও আবর্‌ রাখতে দেয় নি!

প্‌র্‌ষমান্‌ষকে আমরা ব্‌ঝব না। ওরা যখন ওদের উদ্দেশ্যের রথ টানবার পথ তৈরি করতে বসে তখন বিশ্বের হৃদয়কে ট্‌করো ট্‌করো করে ভেঙে পথের খোয়া বিছিয়ে দিতে ওদের একট্‌ও বাধে না। ওরা নিজের হাতে স্‌ষ্টি করবার নেশায় যখন মেতে ওঠে তখন স্‌ষ্টিকর্তার স্‌ষ্টিকে চুরমার করতেই ওদের আনন্দ। আমার এই মর্মান্তিক লজ্জা ওদের চোখের কোণেও পড়বে না, প্রাণের 'পরে দরদ নেই ওদের, ওদের যত ব্যগ্রতা সব উদ্দেশ্যের দিকে। হায় রে, এদের কাছে আমি কেই বা! বন্যার ম্‌খের কাছে একটা মেঠো ফ্‌লের মতো।

কিন্তু আমাকে এমন করে নিবিয়ে ফেলে সন্দীপের লাভ হল কী? এই পাঁচ হাজার টাকা? কিন্তু আমার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে বেশি কিছ্‌ ছিল না কি? ছিল বৈকি। সেই খবর তো সন্দীপের কাছেই শ্‌নেছিল্‌ম, আর সেই শ্‌নেই তো আমি সংসারের সমস্তকে তুচ্ছ করতে পেরে-ছিল্‌ম। আমি আলো দেব, আমি জীবন দেব, আমি শক্তি দেব, আমি অম্‌ত দেব, সেই বিশ্বাসে সেই আনন্দে দ্‌ই ক্‌ল ছাপিয়ে আমি বাহির হয়ে পড়েছিল্‌ম। আমার সেই আনন্দকে যদি কেউ প্‌র্ণ করে তুলত তা হলে আমি মরে গিয়েও বাঁচতুম, আমার সমস্ত সংসার ভাসিয়ে দিয়েও আমার লোকসান হত না।

আজ কি এরা বলতে চায় এ সমস্তই মিথ্যে কথা? আমার মধ্যে যে দেবী আছে ভক্তকে বরাভয় দেবার শক্তি তার নেই? আমি যে স্তবগান শ্‌নেছিল্‌ম, যে গান শ্‌নে স্বর্গ হতে ধ্‌লোয় নেমে এসেছিল্‌ম, সে কি এই ধ্‌লোকে স্বর্গ করবার জন্যে নয়? সে কি স্বর্গকেই মাটি করবার জন্যে?

সন্দীপ আমার ম্‌খের দিকে তার তীব্র দ্‌ষ্টি রেখে বললে, টাকা চাই রানী!

অম্‌ল্য আমার ম্‌খের দিকে চেয়ে রইল, সেই বালক, সে আমার মায়ের গর্ভে জন্মায় নি বটে, কিন্তু সে তো তার মায়ের গর্ভে জন্মেছিল—সেই মা, সে যে একই মা! আহা, ঐ কচি ম্‌খ, ঐ স্নিগ্ধ চোখ, ঐ তর্‌ণ বয়েস! আমি মেয়েমান্‌ষ, আমি ওর মায়ের জাত, ও আমাকে বললে কিনা 'আমার হাতে বিষ তুলে দাও', আর আমি ওর হাতে বিষই তুলে দেব!

টাকা চাই রানী!—

রাগে লজ্জায় আমার ইচ্ছে হল সেই সোনার বোঝা সন্দীপের মাথার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমি কিছুতেই আঁচলের গিরে যেন খুলতে পারছিলুম না, থরথর করে আমার আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল। তার পর টেবিলের উপর সেই কাগজের মোড়কগুলো যখন পড়ল তখন সন্দীপের মুখ কালো হয়ে উঠল। সে নিশ্চয় ভাবলে ঐ মোড়কগুলোর মধ্যে আধুলি আছে। কী ঘৃণা! অক্ষমতার উপরে কী নিষ্ঠুর অবজ্ঞা! মনে হল ও যেন আমাকে মারতে পারে। সন্দীপ ভাবলে, আমি বুঝি ওর সঙ্গে দর করতে বসেছি, ওর পাঁচ হাজার টাকার দাবি দু-তিন শো টাকা দিয়ে রফা করতে চাই। একবার মনে হল, এই মোড়কগুলো নিয়ে ও জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ও কি ভিক্ষুক? ও যে রাজা!

অমূল্য জিজ্ঞাসা করলে, আর নেই রানীদিদি?

করুণায় ভরা তার গলা। আমার মনে হল আমি বুঝি চীৎকার করে কেঁদে উঠব। প্রাণপণে হৃদয়কে যেন চেপে ধরে একটু কেবল ঘাড় নাড়লুম। সন্দীপ চুপ করে রইল; মোড়কগুলো ছুঁলেও না, একটা কথাও বললে না।

চলে যাব ভাবছি, কিন্তু কিছুতেই আমার পা চলছে না। পৃথিবী দু-ফাঁক হয়ে আমাকে যদি টেনে নিত তা হলেই এই মাটির পিণ্ড মাটির মধ্যে আশ্রয় পেয়ে বাঁচত।

আমার অপমান ঐ বালকের বুকে গিয়ে বাজল। সে হঠাৎ খুব একটা আনন্দের ভান করে বলে উঠল, এই কম কী! এতেই ঢের হবে। তুমি আমাদের বাঁচিয়েছ রানীদিদি।

বলেই সে একটা মোড়ক খুলে ফেললে, গিনিগুলো ঝক ঝক করে উঠল।

এক মুহূর্তে সন্দীপের মুখের যেন একটা কালো মোড়ক খুলে গেল। তারও মুখ-চোখ আনন্দে ঝক ঝক করতে লাগল। মনের ভিতরকার এই হঠাৎ উল্টো হাওয়ার দমকা সামলাতে না পেরে সে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এল। কী তার মতলব ছিল জানি নে। আমি বিদ্যুতের মতো অমূল্যের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলুম, হঠাৎ একটা চাবুক খেয়ে তার মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে সন্দীপকে ঠেলা দিলুম। পাথরের টেবিলের উপর মাথাটা তার ঠক করে ঠেকল, তার পরে সেখান থেকে সে মাটিতে পড়ে গেল, কিছুক্ষণ তার আর সাড়া রইল না। এই প্রবল চেষ্টার পরে আমার শরীরে আর একটুও বল ছিল না, আমি চৌকির উপরে বসে পড়লুম। অমূল্যের মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল, সে সন্দীপের দিকে ফিরেও তাকালে না, আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমার পায়ের কাছে বসল। ওরে ভাই, ওরে বাছা, তোর এই শ্রদ্ধাটুকু আজ আমার শূন্য বিশ্বপাত্রের শেষ সুধাবিন্দু। আর আমি পারলুম না, আমার কান্না ভেঙে পড়ল। আমি দুই হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। মাঝে মাঝে আমার পায়ের উপর অমূল্যের করুণ হাতের স্পর্শ যতই পাই আমার কান্না ততই ফেটে পড়তে চায়।

খানিকক্ষণ পরে সামলে উঠে চোখ খুলে দেখি যেন একেবারে কিছুই হয় নি এমনিভাবে সন্দীপ টেবিলের কাছে বসে গিনিগুলো রুমালে বাঁধছে। অমূল্য আমার পায়ের কাছ থেকে উঠে দাঁড়াল, ছল ছল করছে তার চোখ।

সন্দীপ অসংকোচে আমাদের মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, ছ হাজার টাকা।

অমূল্য বললে, এত টাকা তো আমাদের দরকার নেই সন্দীপবাবু। হিসেব করে দেখেছি, সাড়ে তিন হাজার টাকা হলেই আমাদের এখনকার কাজ উদ্ধার হবে।

সন্দীপ বললে, আমাদের কাজ তো কেবলমাত্র এখনকার কাজই নয়। আমাদের যা দরকার তার কি সংখ্যা আছে?

অমূল্য বললে, তা হোক, ভবিষ্যতে যা দরকার হবে তার জন্যে আমি দায়ী, আপনি ঐ আড়াই হাজার টাকা রানীদিদিকে ফিরিয়ে দিন।

সন্দীপ আমার মুখের দিকে চাইলে। আমি বলে উঠলুম, না না, ও টাকা আমি আর ছুঁতেও চাই নে। ও নিয়ে তোমাদের যা-খুশি তাই করো।

সন্দীপ অমূল্যর দিকে চেয়ে বললে, মেয়েরা যেমন করে দিতে পারে এমন কি পুরুষ পারে?

অমূল্য উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, মেয়েরা যে দেবী!

সন্দীপ বললে, আমরা পুরুষরা বড়ো জোর আমাদের শক্তিকে দিতে পারি, মেয়েরা যে আপনাকে দেয়। ওরা আপনার প্রাণের ভিতর থেকে সন্তানকে জন্ম দেয়, পালন করে, বাহির থেকে নয়। এই দানই তো সত্য দান।

এই বলে সন্দীপ আমার দিকে চেয়ে বললে, রানী, আজ তুমি যা দিলে এ যদি কেবলমাত্র টাকা হত তা হলে আমি এ ছুঁতুম না, তুমি আপনার প্রাণের চেয়ে বড়ো জিনিস দিয়েছ।

মানুষের বোধ হয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্ছে, কিন্তু আমার আর-একটা বুদ্ধি ভোলে। সন্দীপের চরিত্র নেই, সন্দীপের শক্তি আছে। সেইজন্যে ও যে মুহূর্তে প্রাণকে জাগিয়ে তোলে সেই মুহূর্তেই মৃত্যুবাণও মারে। দেবতার অক্ষয় তূণ ওর হাতে আছে, কিন্তু তূণের মধ্যে দানবের অস্ত্র।

সন্দীপের রুমালে সব গিনি ধরছিল না; সে বললে, রানী, তোমার একখানি রুমাল আমাকে দিতে পার?

আমি রুমাল বের করে দিতেই সেই রুমালটি নিয়ে সে মাথায় ঠেকালে, তার পরেই আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে আমাকে প্রণাম করে বললে, দেবী, তোমাকে এই প্রণামটি দেবার জন্যেই ছুটে এসেছিলুম, তুমি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তোমার ঐ ধাক্কাই আমার বর। ঐ ধাক্কা আমি মাথায় করে নিয়েছি। ব'লে মাথায় যেখানে লেগেছিল সেইখানটা আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি কি সত্যি ভুল বুঝেছিলুম? সন্দীপ কি দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে তখন আমাকে প্রণাম করতেই এসেছিল? তার মুখে চোখে হঠাৎ যে মত্ততা ফেনিয়ে উঠল সে তো, মনে হল, অমূল্যও দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু স্তবগানে সন্দীপ এমন আশ্চর্য সুর লাগাতে জানে যে তর্ক করতে পারি নে, সত্য দেখবার চোখ যেন কোন্‌ আফিমের নেশায় বুজে আসে। সন্দীপকে আমি যে আঘাত করেছি সে আঘাত সে আমাকে দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিলে, তার মাথার ক্ষত আমার বুকের ভিতরে রক্তপাত করতে লাগল। সন্দীপের প্রণাম যখন পেলুম আমার চুরি তখন মহিমান্বিত হয়ে উঠল। টেবিলের উপরকার গিনিগুলি সমস্ত লোকনিন্দাকে, ধর্মবুদ্ধির সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা করে ঝক ঝক করে হাসতে লাগল।

আমারই মতো অমূল্যেরও মন ভুলে গেল। ক্ষণকালের জন্যে সন্দীপের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা প্রতিরুদ্ধ হয়েছিল সে আবার বাধামুক্ত হয়ে উছলে উঠল, আমার পূজায় এবং সন্দীপের পূজায় তার হৃদয়ের পুষ্পপাত্রটি পূর্ণ হয়ে গেল। সরল বিশ্বাসের কী স্নিগ্ধসুধা ভোরবেলাকার শুকতারার আলোটির মতো তার চোখ থেকে বিকীর্ণ হতে লাগল! আমি পূজা দিলেম, আমি পূজা পেলেম, আমার পাপ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। অমূল্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বললে, বন্দেমাতরং!

কিন্তু স্তবের বাণী তো সব সময়ে শুনতে পাই নে। নিজের মনের ভিতর থেকে নিজের 'পরে নিজের শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখবার সম্বল আমার যে কিছুই নেই। আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারি নে। সেই লোহার সিন্দুক আমার দিকে ভ্রূকুটি করে থাকে, আমাদের পালঙ্ক আমার দিকে যেন একটা নিষেধের হাত বাড়ায়। আপনার ভিতরে আপনার এই অপমান থেকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে; কেবলই মনে হয় সন্দীপের কাছে গিয়ে আপনার স্তব শুনি গে। আমার অতলস্পর্শ গ্লানির গহ্বর থেকে জগতে সেই একটুমাত্র পূজার বেদী জেগে আছে; সেখান থেকে যেখানেই পা বাড়াই

সেইখানেই শূন্য। তাই দিনরাত্রি ঐ বেদী আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই। স্তব চাই, স্তব চাই, দিনরাত্রি স্তব চাই! ঐ মদের পেয়ালা একটুমাত্র খালি হতে থাকলেই আমি আর বাঁচি নে। তাই সমস্ত দিনই সন্দীপের কাছে গিয়ে তার কথা শোনবার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদছে; আমার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পাবার জন্যে আজ পৃথিবীর মধ্যে সন্দীপকে আমার এত দরকার।

আমার স্বামী দুপুরবেলা যখন খেতে আসেন আমি তাঁর সামনে বসতে পারি নে; অথচ না-বসাটা এতই বেশি লজ্জা যে সেও আমি পারি নে, আমি তাঁর একটু পিছনের দিকে এমন করে বসি যে তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি ঘটে না। সেদিন তেমনি করে বসে আছি, তিনি খাচ্ছেন, এমন সময় মেজোরানী এসে বসলেন; বললেন, ঠাকুরপো, তুমি ঐ-সব ডাকাতির শাসানি-চিঠি হেসে উড়িয়ে দাও, কিন্তু আমার ভয় হয়। আমাদের এবারকার প্রণামীর টাকাটা তুমি এখনো ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দাও নি?

আমার স্বামী বললেন, না, সময় পাই নি।

মেজোরানী বললেন, দেখো ভাই, তুমি বড়ো অসাবধান, ও টাকাটা—

স্বামী হেসে বললেন, সে যে আমার শোবার ঘরের পাশের ঘরে লোহার সিন্দুকে আছে।

যদি সেখান থেকে নেয় বলা যায় কি?

আমার ও ঘরেও যদি চোর ঢোকে তা হলে কোন্‌দিন তোমাকেও চুরি হতে পারে।

ওগো, আমাকে কেউ নেবে না, ভয় নেই তোমার। নেবার মতো জিনিস তোমার আপনার ঘরেই আছে। না ভাই, ঠাট্টা না, তুমি ঘরে টাকা রেখো না।

সদর-খাজনা চালান যেতে আর দিন-পাঁচেক আছে, সেইসঙ্গেই ও টাকাটা আমি কলকাতার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব।

দেখো ভাই, ভুলে বোসো না, তোমার যে-রকম ভোলা মন কিছুই বলা যায় না।

এ ঘর থেকে যদি টাকা চুরি যায় তা হলে আমারই টাকা চুরি যাবে, তোমার কেন যাবে বউরানী?

ঠাকুরপো, তোমার ঐ-সব কথা শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে। আমি কি আমার-তোমার ভেদ করে কথা কচ্ছি? তোমারই যদি চুরি যায় সে কি আমাকে বাজবে না? পোড়া বিধাতা সব কেড়ে নিয়ে আমার যে লক্ষ্মণ দেওরটি রেখেছেন তাঁর মূল্য বুঝি আমি বুঝি নে? আমি ভাই তোমাদের বড়োরানীর মতো দিনরাত্রি দেবতা নিয়ে ভুলে থাকতে পারি নে, দেবতা আমাকে যা দিয়েছেন সেই আমার দেবতার চেয়েও বেশি। কী লো ছোটোরানী, তুই যে একেবারে কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে রইলি? জান ভাই ঠাকুরপো, ছোটোরানী মনে ভাবে আমি তোমাকে খোশামোদ করি। তা, তেমন দায়ে পড়লে খোশামোদই করতে হত। কিন্তু, তুমি কি আমাদের তেমনি দেওর যে খোশামোদের অপেক্ষা রাখ? যদি হতে ঐ মাধব চক্রবর্তীর মতো তা হলে আমাদের বড়োরানীরও দেবসেবা আজ ঘুচে যেত, আধপয়সাটির জন্যে তোমার হাতে পায়ে ধরাধরি করেই দিন কাটত। তাও বলি, তা হলে ওর উপকার হত, বানিয়ে বানিয়ে তোমার নিন্দে করবার এত সময় পেত না।

এমনি করে মেজোরানী অনর্গল বকে যেতে লাগলেন, তারই মাঝে মাঝে ছেঁচকিটা ঘণ্টটা চিংড়িমাছের মুড়োটার প্রতিও ঠাকুরপোর মনোযোগ আকর্ষণ করা চলতে থাকল। আমার তখন মাথা ঘুরছে। আর তো সময় নেই, এখনি একটা উপায় করতে হবে। কী হতে পারে, কী করা যেতে পারে, এই কথা যখন বার বার মনকে জিজ্ঞাসা করছি তখন মেজোরানীর বকুনি আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হতে লাগল। বিশেষত আমি জানি মেজোরানীর চোখে কিছুই এড়ায় না; তিনি ক্ষণে ক্ষণে আমার মুখের দিকে চাচ্ছিলেন, কী দেখছিলেন জানি নে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আমার মুখে সমস্ত কথাই যেন স্পষ্ট ধরা পড়ছিল।

দুঃসাহসের অন্ত নেই। আমি যেন নিতান্ত সহজ কৌতুকে হেসে উঠলুম; বলে উঠলুম, আসল কথা, আমার 'পরেই মেজোরানীর যত অবিশ্বাস, চোর ডাকাত সমস্ত বাজে কথা।

মেজোরানী মুচকে হেসে বললেন, তা ঠিক বলেছিস লো; মেয়েমানুষের চুরি বড়ো সর্বনেশে। তা, আমার কাছে ধরা পড়তেই হবে, আমি তো আর পুরুষমানুষ নই। আমাকে ভোলাবি কী দিয়ে?

আমি বললুম, তোমার মনে এতই যদি ভয় থাকে তবে আমার যা-কিছু আছে তোমার কাছে নাহয় জামিন রাখি, যদি কিছু লোকসান করি তো কেটে নিয়ো।

মেজোরানী হেসে বললেন, শোনো একবার, ছোটোরানীর কথা শোনো। এমন লোকসান আছে যা ইহকাল-পরকালে জামিন দিয়ে উদ্ধার হয় না।

আমাদের এই কথাবার্তার মধ্যে আমার স্বামী একটি কথাও বললেন না। তাঁর খাওয়া হয়ে যেতেই তিনি বাইরে চলে গেলেন, আজকাল তিনি আর বিশ্রাম করতে ঘরের মধ্যে বসেন না।

আমার অধিকাংশ দামি গয়না ছিল খাজাঞ্চির জিম্মায়। তবু আমার নিজের কাছে যা ছিল তার দাম ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আমি সেই গয়নার বাক্স নিয়ে মেজোরানীর কাছে খুলে দিলুম; বললুম, মেজোরানী, আমার এই গয়না রইল তোমার কাছে। এখন থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।

মেজোরানী গালে হাত দিয়ে বললেন, ওমা, তুই যে অবাক করলি! তুই কি সত্যি ভাবিস তুই আমার টাকা চুরি করবি এই ভয়ে রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না?

আমি বললুম, ভয় করতেই বা দোষ কী? সংসারে কে কাকে চেনে বলো মেজোরানী।

মেজোরানী বললেন, তাই আমাকে বিশ্বাস করে শিক্ষা দিতে এসেছ বুঝি? আমার নিজের গয়না কোথায় রাখি ঠিক নেই, তোমার গয়না পাহারা দিয়ে আমি মরি আর-কি! চার দিকে দাসী চাকর ঘুরছে, তোমার ও গয়না তুমি নিয়ে যাও ভাই।

মেজোরানীর কাছ থেকে চলে এসেই বাইরের বৈঠকখানা-ঘরে অমূল্যকে ডেকে পাঠালুম। অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গে দেখি সন্দীপ এসে উপস্থিত। আমার তখন দেরি করবার সময় ছিল না; আমি সন্দীপকে বললুম, অমূল্যর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা আছে, আপনাকে একবার—

সন্দীপ কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, অমূল্যকে আমার থেকে আলাদা করে দেখ না কি? তুমি যদি আমার কাছ থেকে ওকে ভাঙিয়ে নিতে চাও তা হলে আমি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না।

আমি এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দীপ বললে, আচ্ছা বেশ, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথা শেষ করে নিয়ে তার পরে আমার সঙ্গেও একটু বিশেষ কথা কবার অবসর দিতে হবে কিন্তু, নইলে আমার হার হবে। আমি সব মানতে পারি, হার মানতে পারি নে। আমার ভাগ সকলের ভাগের বেশি। এই নিয়ে চিরজীবন বিধাতার সঙ্গে লড়ছি। বিধাতাকে হারাব, আমি হারব না।

তীব্র কটাক্ষে অমূল্যকে আঘাত করে সন্দীপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অমূল্যকে বললুম, লক্ষ্মী ভাই আমার, তোমাকে একটি কাজ করে দিতে হবে।

সে বললে, তুমি যা বলবে আমি প্রাণ দিয়ে করব দিদি।

শালের ভিতর থেকে গয়নার বাক্স বের করে তার সামনে রেখে বললুম, আমার এই গয়না বন্ধক দিয়ে হোক, বিক্রি করে হোক, আমাকে ছ হাজার টাকা যত শীঘ্র পার এনে দিতে হবে।

অমূল্য ব্যথিত হয়ে বলে উঠল, না দিদি, না, গয়না বিক্রি বন্ধক না, আমি তোমাকে ছ হাজার টাকা এনে দেব।

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, ও-সব কথা রাখো, আমার আর একটুও সময় নেই। এই নিয়ে যাও গয়নার বাক্স, আজ রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় যাও, পরশুর মধ্যে ছ হাজার টাকা আমাকে এনে দিতে হবে।

অমূল্য বাক্সের ভিতর থেকে হীরের চিকটা আলোতে তুলে ধরে আবার বিষণ্নমুখে রেখে দিলে। আমি বললুম, এই-সব হীরের গয়না ঠিক দামে সহজে বিক্রি হবে না, সেইজন্যে আমি তোমাকে

যে গয়না দিচ্ছি এর দাম ত্রিশ হাজারেরও বেশি হবে। এ-সবই যদি যায় সেও ভালো, কিন্তু ছ হাজার টাকা আমার নিশ্চয়ই চাই।

অমূল্য বললে, দেখো দিদি, তোমার কাছ থেকে এই-যে ছ হাজার টাকা নিয়েছেন সন্দীপবাবু এর জন্যে আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেছি। বলতে পারি নে এ কী লজ্জা। সন্দীপবাবু বলেন, দেশের জন্যে লজ্জা বিসর্জন করতে হবে। তা হয় তো হবে। কিন্তু এ যেন একটু আলাদা কথা। দেশের জন্যে মরতে ভয় করি নে, মারতে দয়া করি নে এই শক্তি পেয়েছি; কিন্তু তোমার হাত থেকে এই টাকা নেওয়ার গ্লানি কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছি নে। এইখানে সন্দীপবাবু আমার চেয়ে অনেক শক্ত, ওঁর একটিতলও ক্ষোভ নেই। উনি বলেন টাকা যার বাক্সে ছিল টাকা যে সত্যি তারই এই মোহটা কাটানো চাই, নইলে বন্দেমাতরং মন্ত্র কিসের!

বলতে বলতে অমূল্য উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগল। আমাকে শ্রোতা পেলে ওর এই-সব কথা বলবার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। ও বলতে লাগল, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আত্মাকে তো কেউ মারতে পারে না। কাউকে বধ করা, ও একটা কথা মাত্র। টাকা হরণ করাও সেইরকম একটা কথা। টাকা কার? ওকে কেউ সৃষ্টি করে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ও তো কারও আত্মার অঙ্গ নয়। ও আজ আমার, কাল আমার ছেলের, আর-একদিন আমার মহাজনের। সেই চঞ্চল টাকা যখন তত্ত্বত কারোই নয় তখন তোমার অকর্মণ্য ছেলের হাতে না পড়ে দেশসেবকদের সেবায় যদি লাগে তা হলে তাকে নিন্দা করলেই সে কি নিন্দিত হবে?

সন্দীপের মুখের কথা যখন এই বালকের মুখে শুনি তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকে। যারা সাপুড়ে তারা বাঁশি বাজিয়ে সাপ নিয়ে খেলুক, মরতে যদি হয় তারা জেনেশুনে মরুক। কিন্তু, আহা, এরা যে কাঁচা, সমস্ত বিশ্বের আশীর্বাদ এদের যে নিয়ত রক্ষা করতে চায়, এরা সাপকে সাপ না জেনে হাসতে হাসতে তার সঙ্গে খেলা করতে যখন হাত বাড়ায় তখনি স্পষ্ট বুঝতে পারি এই সাপটা কী ভয়ংকর অভিশাপ! সন্দীপ ঠিকই বুঝেছে— আমি নিজে তার হাতে মরতে পারি, কিন্তু এই ছেলেটিকে তার হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আমি বাঁচাব।

আমি একটু হেসে অমূল্যকে বললুম, তোমাদের দেশসেবকদের সেবার জন্যেও টাকার দরকার আছে বুঝি?

অমূল্য সগর্বে মাথা তুলে বললে, আছে বৈকি। তারাই যে আমাদের রাজা, দারিদ্র্যে তাদের শক্তিক্ষয় হয়। আপনি জানেন, সন্দীপবাবুকে ফার্স্ট্ ক্লাস ছাড়া অন্য গাড়িতে কখনো চড়তে দিই নে। রাজভোগে তিনি কখনো লেশমাত্র সংকুচিত হন না। তাঁর এই মর্যাদা তাঁকে রাখতে হয় তাঁর নিজের জন্যে নয়, আমাদের সকলের জন্যে। সন্দীপবাবু বলেন, সংসারে যারা ঈশ্বর ঐশ্বর্যের সম্মোহনই হচ্ছে তাদের সব চেয়ে বড়ো অস্ত্র। দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে দুঃখগ্রহণ করা নয়, সে হচ্ছে আত্মঘাত।

এমন সময় নিঃশব্দে সন্দীপ হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি আমার গয়নার বাক্সর উপর শাল চাপা দিলুম। সন্দীপ বাঁকা সুরে জিজ্ঞাসা করলে, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথার পালা এখনো ফুরোয় নি বুঝি?

অমূল্য একটু লজ্জিত হয়ে বললে, না, আমাদের কথা হয়ে গেছে। বিশেষ কিছু না।

আমি বললুম, না অমূল্য, এখনো হয় নি।

সন্দীপ বললে, তা হলে দ্বিতীয়বার সন্দীপের প্রস্থান?

আমি বললুম, হাঁ।

তা হলে সন্দীপকুমারের পুনঃপ্রবেশ—

সে আজ নয়, আমার সময় হবে না।

সন্দীপের চোখদুটো জ্বলে উঠল; বললে, কেবল বিশেষ কাজেরই সময় আছে, আর সময় নষ্ট করবার সময় নেই!

ঈর্ষা! প্রবল যেখানে দুর্বল সেখানে অবলা আপনার জয়ডঙ্কা না বাজিয়ে থাকতে পারে কি? আমি তাই খুব দৃঢ়স্বরেই বললুম, না, আমার সময় নেই।

সন্দীপ মুখ কালি করে চলে গেল। অমূল্য কিছু উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললে, রানীদিদি, সন্দীপ-বাবু বিরক্ত হয়েছেন।

আমি তেজের সঙ্গে বললুম, বিরক্ত হবার ওঁর কারণও নেই, অধিকারও নেই! একটি কথা তোমাকে বলে রাখি অমূল্য, আমার এই গয়না-বিক্রির কথা তুমি প্রাণান্তেও সন্দীপবাবুকে বলতে পারবে না।

অমূল্য বললে, না, বলব না।

তা হলে আর দেরি কোরো না, আজ রাত্রের গাড়িতেই তুমি চলে যাও।

এই বলে অমূল্যের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম! বাইরে এসে দেখি বারান্দায় সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলুম এখনি সে অমূল্যকে ধরবে। সেইটে বাঁচাবার জন্যে তাঁকে ডাকতে হল, সন্দীপবাবু, কী বলতে চাচ্ছিলেন?

আমার কথা তো বিশেষ কথা নয়, কেবল বাজে কথা, সময় যখন নেই তখন—

আমি বললুম, আছে সময়।

অমূল্য চলে গেল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বললে, অমূল্যর হাতে একটা কী বাক্স দিলে, ওটা কিসের বাক্স?

বাক্সটা সন্দীপের চোখ এড়াতে পারে নি। আমি একটু শক্ত করেই বললুম, আপনাকে যদি বলবার হত তা হলে আপনার সামনেই দিতুম।

তুমি কি ভাবছ অমূল্য আমাকে বলবে না?

না, বলবে না।

সন্দীপের রাগ আর চাপা রইল না; একেবারে আগুন হয়ে উঠে বললে, তুমি মনে করছ তুমি আমার উপর প্রভুত্ব করবে। পারবে না। ঐ অমূল্য, ওকে যদি আমার পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিই তা হলে সেই ওর সুখের মরণ হয়, ওকে তুমি তোমার পদানত করবে—আমি থাকতে সে হবে না।

দুর্বল, দুর্বল! এতদিন পরে সন্দীপ বুঝতে পেরেছে, ও আমার কাছে দুর্বল। তাই হঠাৎ এই অসংযত রাগ। ও বুঝতে পেরেছে, আমার যে শক্তি আছে তার সঙ্গে জোরজবরদস্তি খাটবে না, আমার কটাক্ষের ঘায়ে ওর দুর্গের প্রাচীর আমি ভেঙে দিতে পারি। সেইজন্যেই আজ এই আস্ফালন। আমি একটি কথা না বলে একটুখানি কেবল হাসলুম। এতদিন পরে আমি ওর উপরের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছি; আমার এ জায়গাটুকু যেন না হারায়, যেন না নাবি। আমার দুর্গতির মধ্যেও যেন আমার মান একটু থাকে।

সন্দীপ বললে, আমি জানি তোমার ও বাক্স গয়নার বাক্স।

আমি বললুম, আপনি যেমন-খুশি আন্দাজ করুন, আমি বলব না।

তুমি অমূল্যকে আমার চেয়ে বেশি বিশ্বাস কর? জান, ঐ বালক আমার ছায়ার ছায়া, আমার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি, আমার পাশ থেকে সরে গেলে ও কিছুই নয়।

যেখানে ও আপনার প্রতিধ্বনি নয় সেইখানে ও অমূল্য, সেইখানে আমি ওকে আপনার প্রতি-ধ্বনির চেয়ে বিশ্বাস করি।

মায়ের পুজা-প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমার সমস্ত গয়না আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত আছ সে কথা ভুললে চলবে না। সে তোমার দেওয়াই হয়ে গেছে।

দেবতা যদি আমার কোনো গয়না বাকি রাখেন তা হলে সেই গয়না দেবতাকে দেব। আমার যে গয়না চুরি যায় সে গয়না দেব কেমন করে?

দেখো, তুমি আমার কাছ থেকে অমন করে ফসকে যাবার চেষ্টা কোরো না। এখন আমার কাজ

আছে, সেই কাজ আগে হয়ে যাক, তার পরে তোমাদের ঐ মেয়েলি ছলাকলা বিস্তারের সময় হবে। তখন সেই লীলায় আমিও যোগ দেব।

যে মুহূর্তে আমি আমার স্বামীর টাকা চুরি করে সন্দীপের হাতে দিয়েছি সেই মুহূর্ত থেকেই আমাদের সম্বন্ধের ভিতরকার সুরটুকু চলে গেছে। কেবল যে আমারই সমস্ত মূল্য ঘুচিয়ে দিয়ে আমি কানা কড়ার মতো সস্তা হয়ে গেছি তা নয়, আমার 'পরে সন্দীপেরও শক্তি ভালো করে খেলবার আর জায়গা পাচ্ছে না—মুঠোর মধ্যে যা এসে পড়ে তার উপর আর তীর মারা চলে না। সেইজন্যে সন্দীপের আজ আর সেই বীরের মূর্তি নেই। ওর কথার মধ্যে কলহের কর্কশ ইতর আওয়াজ লাগছে।

সন্দীপ আমার মুখের উপর তার উজ্জ্বল চোখদুটো তুলে বসে রইল, দেখতে দেখতে তার চোখ যেন মধ্যাহ্ন-আকাশের তৃষ্ণার মতো জ্বলে উঠতে লাগল। তার পা দুই-একবার চঞ্চল হয়ে উঠল; বুঝতে পারলুম সে উঠি-উঠি করছে, এখনি সে উঠে এসে আমাকে চেপে ধরবে। আমার বুকের ভিতরে দুলতে লাগল, সমস্ত শরীরের শির দব্ দব্ করছে, কানের মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করছে, বুঝলুম আর-একটু বসে থাকলে আমি আর উঠতে পারব না। প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে চৌকি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে উঠেই দরজার দিকে ছুটলুম। সন্দীপের রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠের মধ্যে থেকে গুমরে উঠল, কোথায় পালাও রানী?

পরক্ষণেই সে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে ধরতে এল। এমন সময় বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যেতেই সন্দীপ তাড়াতাড়ি চৌকিতে ফিরে এসে বসল। আমি বইয়ের শেল্‌ফের দিকে মুখ করে বইগুলোর নামের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আমার স্বামী ঘরে ঢোকবামাত্রই সন্দীপ বলে উঠল, ওহে নিখিল, তোমার শেল্‌ফে ব্রাউনিং নেই? আমি মক্ষীরানীকে আমাদের সেই কলেজ-ক্লাবের কথা বলছিলুম—মনে আছে তো ব্রাউনিঙের সেই কবিতাটা তর্জমা নিয়ে আমাদের চার জনের মধ্যে লড়াই? বল কী, মনে নেই? সেই যে—

> She should never have looked at me,
> If she meant I should not love her!
> There are plenty..men you call such,
> I suppose..she may discover
> All her soul to, if she pleases,
> And yet leave much as she found them;
> But I'm not so, and she knew it
> When she fixed me, glancing round them.

আমি হিঁচড়ে-মিচড়ে তার একটা বাংলা করেছিলুম, কিন্তু সেটা এমন হল না 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'। এক সময়ে ঠাউরেছিলুম কবি হলেম বুঝি, আর দেরি নেই, বিধাতা দয়া করে আমার সে ফাঁড়া কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু আমাদের দক্ষিণাচরণ, সে যদি আজ নিমক-মহালের ইন্‌স্‌পেক্টর না হত তা হলে নিশ্চয় কবি হতে পারত, সে খাসা তর্জমাটি করেছিল—পড়ে মনে হয় ঠিক যেন বাংলা ভাষা পড়ছি, যে দেশ জিয়োগ্রাফিতে নেই এমন কোনো দেশের ভাষা নয়—

> আমায় ভালো বাসবে না সে এই যদি তার ছিল জানা,
> তবে কি তার উচিত ছিল আমার পানে দৃষ্টি হানা?
> তেমন-তেমন অনেক মানুষ আছে তো এই ধরাধামে
> (যদিচ ভাই, আমি তাদের গণি নেকো মানুষ নামে)—

যাদের কাছে সে যদি তার খুলে দিত প্রাণের ঢাকা,
তবু তারা রইত খাড়া যেমন ছিল তেমনি ফাঁকা।
আমি তো নই তাদের মতন সে কথা সে জানত মনে
যখন মোরে বাঁধল ধ'রে বিন্ধ ক'রে নয়নকোণে।

না মক্ষীরানী, তুমি মিথ্যে খুঁজছ; নিখিল বিবাহের পর থেকে কবিতা পড়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছে, বোধ হয়, ওর আর দরকার হয় না। আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম কাজের তাড়ায়, কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন 'কাব্যজ্বরো মনুষ্যাণাং' আমাকে ধরবে-ধরবে করছে।

আমার স্বামী বললেন, আমি তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেছি সন্দীপ।

সন্দীপ বললে, কাব্যজ্বর সম্বন্ধে?

স্বামী ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে বললেন, কিছুদিন ধরে ঢাকা থেকে মৌলবি আনাগোনা করতে আরম্ভ করেছে, এ অঞ্চলের মুসলমানদের ভিতরে ভিতরে খেপিয়ে তোলবার উদ্‌যোগ চলেছে। তোমার উপর ওরা বিরক্ত হয়ে আছে, হঠাৎ একটা-কিছু উৎপাত করতে পারে।

পালাতে পরামর্শ দাও নাকি?

আমি খবর দিতে এসেছি, পরামর্শ দিতে চাই নে।

আমি যদি এখানকার জমিদার হতুম তা হলে ভাবনার কথা হত মুসলমানদেরই, আমার নয়। তুমি আমাকেই উদ্‌বিগ্ন করে না তুলে ওদের দিকে যদি একটু উদ্‌বেগের চাপ দাও তা হলে সেটা তোমার এবং আমার উভয়েরই যোগ্য হয়। জান, তোমার দুর্বলতায় পাশের জমিদারদের পর্যন্ত তুমি দুর্বল করে তুলেছ?

সন্দীপ, আমি তোমাকে পরামর্শ দিই নি, তুমিও আমাকে পরামর্শ না দিলে চলত। ওটা বৃথা হচ্ছে। আর-একটি কথা আমার বলবার আছে। তোমরা কিছুদিন থেকে দলবল নিয়ে আমার প্রজাদের 'পরে ভিতরে ভিতরে উৎপাত করছ। আর চলবে না, এখন তোমাকে আমার এলেকা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে।

মুসলমানের ভয়ে না আরো কোনো ভয় আছে?

এমন ভয় আছে যে ভয় না থাকাই কাপুরুষতা, আমি সেই ভয় থেকেই বলছি তোমাকে যেতে হবে সন্দীপ। আর দিন-পাঁচেক পরে আমি কলকাতায় যাচ্ছি, সেই সময় তোমারও আমার সঙ্গে যাওয়া চাই। আমাদের কলকাতার বাড়িতে থাকতে পার, তাতে কোনো বাধা নেই।

আচ্ছা, পাঁচ দিন ভাববার সময় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে মক্ষীরানী, তোমার মউচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জনগান করে নেওয়া যাক। হে আধুনিক বাংলার কবি, খোলো তোমার দ্বার, তোমার বাণী লুঠ করে নিই— চুরি তোমারই, তুমি আমারই গানকে তোমার গান করেছ— নাহয় নাম তোমার হল, কিন্তু গান আমার। এই বলে তার বেসুর-ঘেঁষা মোটা ভাঙা গলায় ভৈরবীতে গান ধরলে—

মধুঋতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে।
যাওয়া-আসার কান্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে।
যায় যে জনা সেই শুধু যায়, ফুল ফোটা তো ফুরোয় না হায়—
ঝরবে যে ফুল সেই কেবলি ঝরে পড়ে বেলাশেষে।
যখন আমি ছিলেম কাছে তখন কত দিয়েছি গান;
এখন আমার দূরে-যাওয়া, এরও কি গো নাই কোনো দান?
পুষ্পবনের ছায়া ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে—
আগুন-ভরা ফাগুনকে তোর কাঁদায় যেন আষাঢ় এসে।

সাহসের অন্ত নেই, সে সাহসের কোনো আবরণও নেই— একেবারে আগুনের মতো নগ্ন।

তাকে বাধা দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না; তাকে নিষেধ করা যেন বজ্রকে নিষেধ করা, বিদ্যুৎ সে নিষেধ হেসে উড়িয়ে দেয়।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম। বাড়ির ভিতরের দিকে যখন চলে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি অমূল্য কোথা থেকে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। বললে রানীদিদি, তুমি কিছু ভেবো না। আমি চললুম, কিছুতেই নিষ্ফল হয়ে ফিরব না।

আমি তার নিষ্ঠাপূর্ণ তরুণ মুখের দিকে চেয়ে বললুম, অমূল্য, নিজের জন্যে ভাবব না, যেন তোমাদের জন্যে ভাবতে পারি।

অমূল্য চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, তোমার মা আছেন?

আছেন।

বোন?

নেই, আমি মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা আমার অল্প বয়সে মারা গেছেন।

যাও তুমি, তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও অমূল্য।

দিদি, আমি যে এখানে আমার মাকেও দেখছি আমার বোনকেও দেখছি।

আমি বললুম, অমূল্য, আজ রাত্রে যাবার আগে তুমি এখান থেকে খেয়ে যেয়ো।

সে বললে, সময় হবে না দিদিরানী, তোমার প্রসাদ আমার সঙ্গে দিয়ো আমি নিয়ে যাব।

তুমি কী খেতে ভালোবাস অমূল্য?

মায়ের কাছে থাকলে পৌষে পেট ভরে পিঠে খেতুম। ফিরে এসে তোমার হাতের তৈরি পিঠে খাব দিদিরানী।

নিখিলেশের আত্মকথা

রাত্রি তিনটের সময় জেগে উঠেই আমার হঠাৎ মনে হয়, যে জগতে আমি একদিন বাস করতুম সে যেন মরে ভূত হয়ে আমার এই বিছানা, এই ঘর, এই-সব জিনিসপত্র দখল করে বসে আছে। আমি বেশ বুঝতে পারলুম মানুষ কেন পরিচিত লোকের ভূতকেও ভয় করে। চিরকালের জানা যখন এক মুহূর্তে অজানা হয়ে ওঠে তখন সে এক বিভীষিকা। জীবনের সমস্ত ব্যবহার যে সহজ স্রোতে চলছিল আজ তাকে যখন এমন খাদে চালাতে হবে যে খাদ এখনও কাটা হয় নি তখন বিষম ধাঁধা লেগে যায়; তখন নিজের স্বভাবকে বাঁচিয়ে চলা শক্ত হয়; তখন নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমিও বুঝি আর-একজন কেউ।

কিছুদিন থেকে বুঝতে পারছি সন্দীপের দলবল আমাদের অঞ্চলে উৎপাত শুরু করেছে। যদি আমার স্বভাবে স্থির থাকতুম তা হলে সন্দীপকে জোরের সঙ্গে বলতুম, এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু গোলেমালে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছি। আমার পথ আর সরল নেই। সন্দীপকে চলে যেতে বলার মধ্যে আমার একটা লজ্জা আসে। ওর সঙ্গে আর-একটা কথা এসে পড়ে; তাতে নিজের কাছে ছোটো হয়ে যাই।

দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিস ছিল, সে তো কেবল আমার গৃহস্থ-আশ্রম বা সংসারযাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ। সেইজন্যেই বাইরের দিক থেকে ওর উপরে একটুও জোর দিতে পারলুম না; দিতে গেলেই মনে হয়, আমার দেবতাকে অপমান করছি। এ কথা কাউকে বোঝাতে পারব না। আমি হয়তো অদ্ভুত। সেইজন্যেই হয়তো ঠকলুম। কিন্তু আমার বাইরেকে ঠকা থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভিতরকে ঠকাই কী করে?

যে সত্য অন্তর থেকে বাইরেকে সৃষ্টি করে তোলে আমি সেই সত্যের দীক্ষা নিয়েছি। তাই আজ আমাকে বাইরের জাল এমন করে ছিন্ন করতে হল। আমার দেবতা আমাকে বাইরের দাসত্ব

থেকে মুক্তি দেবেন। হৃদয়ের রক্তপাত করে সেই মুক্তি আমি পাব। কিন্তু যখন পাব তখন অন্তরের রাজত্ব আমার হবে।

সেই মুক্তির স্বাদ এখনই পাচ্ছি। থেকে থেকে অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার অন্তরের ভোরের পাখি গান গেয়ে উঠছে। যে বিমলা মায়ায় তৈরি সেই স্বপ্ন ছুটে গেলেও ক্ষতি হবে না, আমার ভিতরের পুরুষটি এই আশ্বাসবাণী থেকে থেকে বলে উঠছে।

মাস্টারমশায়ের কাছে খবর পেলুম সন্দীপ হরিশ কুণ্ডুর সঙ্গে যোগ দিয়ে খুব ধুম করে মহিষমর্দিনী পুজোর আয়োজন করছে। এই পুজোর খরচা হরিশ কুণ্ডু তার প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করতে লেগে গেছে। আমাদের কবিরত্ন আর বিদ্যাবাগীশ-মশায়কে দিয়ে একটি স্তব রচনা করা হচ্ছে যার মধ্যে দুই অর্থ হয়। মাস্টারমশায়ের সঙ্গে এই নিয়ে সন্দীপের একটু তর্কও হয়ে গেছে। সন্দীপ বলে, দেবতার একটা এভোল্যুশন আছে; পিতামহরা যে দেবতা সৃষ্টি করেছিলেন পৌত্রেরা যদি সেই দেবতাকে আপনার মতো না করে তোলে তা হলে যে নাস্তিক হয়ে উঠবে। পুরাতন দেবতাকে আধুনিক করে তোলাই আমার মিশন, দেবতাকে অতীতের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই আমার জন্ম। আমি দেবতার উদ্ধারকর্তা।

ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি সন্দীপ হচ্ছে আইডিয়ার জাদুকর; সত্যকে আবিষ্কার করায় ওর কোনো প্রয়োজন নেই, সত্যের ভেলকি বানিয়ে তোলাতেই ওর আনন্দ। মধ্য আফ্রিকায় যদি ওর জন্ম হত তা হলে নরবলি দিয়ে নরমাংস ভোজন করাই যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা এই কথা নূতন যুক্তিতে প্রমাণ করে ও পুলকিত হয়ে উঠত। ভোলানোই যার কাজ নিজেকেও না ভুলিয়ে সে থাকতে পারে না। আমার বিশ্বাস, সন্দীপ কথার মন্ত্রে যতবার নূতন-নূতন কুহক সৃষ্টি করে প্রত্যেকবার নিজেই মনে করে 'সত্যকে পেয়েছি', তার এক সৃষ্টির সঙ্গে আর-এক সৃষ্টির যতই বিরোধ থাক্।

যাই হোক দেশের মধ্যে মায়ার এই তাড়িখানা বানিয়ে তোলায় আমি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারব না। যে তরুণ যুবকেরা দেশের কাজে লাগতে চাচ্ছে গোড়া থেকেই তাদের নেশা অভ্যাস করানোর চেষ্টায় আমার যেন কোনো হাত না থাকে। মন্ত্রে ভুলিয়ে যারা কাজ আদায় করতে চায় তারা কাজটারই দাম বড়ো করে দেখে, যে মানুষের মনকে ভোলায় সেই মনের দাম তাদের কাছে কিছুই নেই। প্রমত্ততা থেকে দেশকে যদি বাঁচাতে না পারি, তবে দেশের পুজো হবে দেশের বিষ-নৈবেদ্য, দেশের কাজ বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্রের মতো দেশের বুকে এসে বাজবে।

বিমলার সামনেই সন্দীপকে বলেছি, তোমাকে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এতে হয়তো বিমলা এবং সন্দীপ দুজনেই আমার মতলবকে ভুল বুঝবে। কিন্তু, এই ভুল বোঝার ভয় থেকে মুক্তি চাই। বিমলাও আমাকে ভুল বুঝুক।

ঢাকা থেকে মৌলবি প্রচারকের আনাগোনা চলছে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতোই ঘৃণা করত। কিন্তু দুই-এক জায়গায় গোরু জবাই দেখা দিল। আমি আমার মুসলমান প্রজারই কাছে তার প্রথম খবর পাই এবং তার প্রতিবাদও শুনি। এবারে বুঝলুম, ঠেকানো শক্ত হবে। ব্যাপারটার মূলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে অকৃত্রিম করে তোলা হবে। সেইটেই তো আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চাল।

আমার প্রধান প্রধান হিন্দু প্রজাকে ডাকিয়ে অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শাক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কী? মুসলমানকেও নিজের ধর্মমতে চলতে দিতে হবে। তোমরা গোলমাল কোরো না।

তারা বললে, মহারাজ, এতদিন তো এ-সব উপসর্গ ছিল না।

আমি বললুম, ছিল না, সে ওদের ইচ্ছা। আবার ইচ্ছা করেই যাতে নিবৃত্ত হয় সেই পথই দেখো। সে তো ঝগড়ার পথ নয়।

তারা বললে, না মহারাজ, সেদিন নেই, শাসন না করলে কিছুতেই থামবে না।

আমি বললুম, শাসনে গোহিংসা তো থামবেই না, তার উপরে মানুষের প্রতি হিংসা বেড়ে উঠতে থাকবে।

এদের মধ্যে একজন ছিল, ইংরেজি-পড়া; সে এখনকার বুলি আওড়াতে শিখেছে। সে বললে, দেখুন, এটা তো কেবল একটা সংস্কারের কথা নয়, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, এ দেশে গোরু যে—

আমি বললুম, এ দেশে মহিষেও দুধ দেয়, মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।

ইংরেজি-পড়া বললে, এর পিছনে কে আছে সেটা কি দেখতে পাচ্ছেন না? মুসলমানেরা জানতে পেরেছে তাদের শাস্তি হবে না। পাঁচুড়েতে কী কাণ্ড তারা করেছে শুনেছেন তো?

আমি বললুম, এই যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপরে হানা সম্ভব হচ্ছে, এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েছি; ধর্ম যে এমনি করেই বিচার করেন। আমরা যা এতকাল ধরে জমিয়েছি আমাদের উপরেই তা খরচ হবে।

ইংরেজি-পড়া বললে, আচ্ছা, ভালো, তাই খরচ হয়ে যাক। কিন্তু এর মধ্যে আমাদেরও একটা সুখ আছে, আমাদেরই এবার জিত, যে আইন ওদের সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি সেই আইনকে আজ আমরা ধূলিসাৎ করেছি; এতদিন ওরা রাজা ছিল, আজ ওদেরও আমরা ডাকাতি ধরাব। এ কথা ইতিহাসে কেউ লিখবে না, কিন্তু এ কথা চিরদিন আমাদের মনে থাকবে।

এ দিকে কাগজে কাগজে অখ্যাতিতে আমি বিখ্যাত হয়ে পড়লুম। শুনছি, চক্রবর্তীদের এলাকায় নদীর ধারে শ্মশানঘাটে দেশসেবকের দল আমার কুশপুত্তলি বানিয়ে খুব ধুম করে সেটাকে দাহ করেছে; তার সঙ্গে আরো অনেক অপমানের আয়োজন ছিল। এরা কাপড়ের কল খুলে যৌথ কারবার করবে বলে আমাকে খুব বড়ো শেয়ার কেনাতে এসেছিল। আমি বলেছিলুম, যদি কেবল আমার এই ক-টি টাকা লোকসান যেত খেদ ছিল না, কিন্তু তোমরা যদি কারখানা খোল তবে অনেক গরিবের টাকা মারা যাবে এইজন্যেই আমি শেয়ার কিনব না।

কেন মশাই? দেশের হিত কি আপনি পছন্দ করেন না?

কারবার করলে দেশের হিত হতেও পারে, কিন্তু 'দেশের হিত করব' বললেই তো কারবার হয় না। যখন ঠাণ্ডা ছিলুম তখন আমাদের ব্যাবসা চলে নি— আর খেপে উঠেছি বলেই কি আমাদের ব্যাবসা হুহু করে চলবে?

এক কথায় বলুন-না আপনি শেয়ার কিনবেন না।

কিনব যখন তোমাদের ব্যাবসাকে ব্যাবসা বলে বুঝব। তোমাদের আগুন জ্বলছে বলেই যে তোমাদের হাঁড়িও চড়বে সেটার তো কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখছি নে।

এরা মনে করে আমি খুব হিসাবি, আমি কৃপণ। আমার স্বদেশী কারবারের হিসাবের খাতাটা এদের খুলে দেখাতে ইচ্ছা করে। আর, সেই যে একদিন মাতৃভূমিতে ফসলের উন্নতি করতে বসেছিলুম তার ইতিহাস এরা বুঝি জানে না! ক' বছর ধরে জাভা মরিশস থেকে আখ আনিয়ে চাষ করালুম; সরকারি কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষের পরামর্শে যত রকমের কর্ষণ বর্ষণ হতে পারে তার কিছুই বাকি রাখি নি, অবশেষে তার থেকে ফসলটা কী হল? সে আমার এলাকার চাষিদের চাপা অট্টহাস্য। আজও সেটা চাপা রয়ে গেছে। তার পরে সরকারি কৃষিপত্রিকা তর্জমা করে যখন ওদের কাছে জাপানি সিম কিংবা বিদেশী কাপাসের চাষের কথা বলতে গেছি তখন দেখতে পেয়েছি, সেই পুরোনো চাপা হাসি আর চাপা থাকে না। দেশে তখন দেশসেবকদের কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, বন্দেমাতরং মন্ত্র তখন নীরব। আর সেই যে আমার কলের জাহাজ— দূর হোক সে-সব কথা

তুলে লাভ কী? দেশহিতের যে আগুন—এরা জ্বালালে তাতে আমারই কুশপুত্তলি দগ্ধ হয়ে যদি থামে তবে তো রক্ষা।

এ কী খবর! আমাদের চকুয়ার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গেছে। কাল রাত্রে সদর-খাজনার সাড়ে সাত হাজার টাকার এক কিস্তি সেখানে জমা হয়েছিল, আজ ভোরে নৌকা করে আমাদের সদরে রওনা হবার কথা। পাঠাবার সুবিধা হবে বলে নায়েব ট্রেজরি থেকে টাকা ভাঙিয়ে দশ কুড়ি টাকার নোট করে তাড়াবন্দি করে রেখেছিল। অর্ধেক রাত্রে ডাকাতের দল বন্দুক-পিস্তল নিয়ে মালখানা লুটেছে। কাসেম সর্দার পিস্তলের গুলি খেয়ে জখম হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ডাকাতরা কেবল ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি দেড় হাজার টাকার নোট ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে চলে এসেছে। অনায়াসে সব টাকাই নিয়ে আসতে পারত। যাই হোক, ডাকাতের পালা শেষ হল, এইবার পুলিসের পালা আরম্ভ হবে। টাকা তো গেছেই, এখন শান্তিও থাকবে না।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখি সেখানে খবর রটে গেছে। মেজোরানী এসে বললেন, ঠাকুরপো, এ কী সর্বনাশ!

আমি উড়িয়ে দেবার জন্যে বললুম, সর্বনাশের এখনো অনেক বাকি আছে। এখনো কিছুকাল খেয়ে পরে কাটাতে পারব।

না ভাই, ঠাট্টা নয়, তোমারই উপর এদের এত রাগ কেন! ঠাকুরপো, তুমি নাহয় ওদের একটু মন রেখেই চলো-না। দেশসুদ্ধ লোককে কি—

দেশসুদ্ধ লোকের খাতিরে দেশকে সুদ্ধ মজাতে পারব না তো।

এই সেদিন শুনলুম নদীর ধারে তোমাকে নিয়ে ওরা এক কাণ্ড করে বসেছে! ছি ছি! আমি তো ভয়ে মরি! ছোটোরানী মেমের কাছে পড়েছে, ওর তো ভয়ডর নেই— আমি কেনারাম পুরুতকে ডাকিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে বাঁচি। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, তুমি কলকাতায় যাও—এখানে থাকলে ওরা কোন্‌দিন কী করে বসে।

মেজোরানীদিদির ভয় ভাবনা আজ আমার প্রাণে সুধা বর্ষণ করলে। অন্নপূর্ণা, তোমাদের হৃদয়ের দ্বারে আমাদের ভিক্ষা কোনোদিন ঘুচবে না।

ঠাকুরপো, তোমার শোবার ঘরের পাশে ঐ-যে টাকাটা রেখেছ ওটা ভালো করছ না। কোন্‌দিক থেকে ওরা খবর পাবে আর শেষকালে—আমি টাকার জন্যে ভাবি নে ভাই, কী জানি—

আমি মেজোরানীকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বললুম, আচ্ছা, ও টাকাটা বের করে এখনি আমাদের খাতাঞ্জিখানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। পরশুদিনই কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে আসব।

এই বলে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি পাশের ঘর বন্ধ। দরজাটা ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে বিমলা বললে, আমি কাপড় ছাড়ছি।

মেজোরানী বললেন, এই সকালবেলাতেই ছোটোরানীর সাজ হচ্ছে! অবাক করলে! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বসবে! ওলো, ও দেবীচৌধুরানী, লুটের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি?

আর-একটু পরে এসে সব ঠিক করা যাবে এই বলে বাইরে এসে দেখি সেখানে পুলিস-ইন্‌স্‌পেক্টর উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু সন্ধান পেলেন?

সন্দেহ তো করছি।

কাকে?

ঐ কাসেম সর্দারকে।

সেকি কথা! ঐ তো জখম হয়েছে।

জখম কিছু নয়; পায়ের চামড়া ঘেঁষে একটুখানি রক্ত পড়েছে, সে ওর নিজেরই কীর্তি।

কাসেমকে আমি কোনোমতেই সন্দেহ করতে পারি নে, ও বিশ্বাসী।

বিশ্বাসী সে কথা মানতে রাজি আছি, কিন্তু তাই বলেই যে চুরি করতে পারে না তা বলা যায় না। এও দেখেছি পঁচিশ বৎসর যে লোক বিশ্বাস রক্ষা করে এসেছে সেও এক দিন হঠাৎ—

তা যদি হয় আমি ওকে জেলে দিতে পারব না।

আপনি দেবেন কেন? যার হাতে দেবার ভার সেই দেবে।

কাসেম ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি টাকাটা ফেলে রাখলে কেন?

ঐ ধোঁকাটা মনে জন্মে দেবার জন্যেই। আপনি যাই বলুন, লোকটা পাকা। ও আপনাদের কাছারিতে পাহারা দেয়, এ দিকে কাছাকাছি এ অঞ্চলে যত চুরি ডাকাতি হয়েছে নিশ্চয় তার মূলে ও আছে।

লাঠিয়ালরা পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি সেরে এক রাত্রেই কেমন করে ফিরে এসে মনিবের কাছারিতে হাজরি লেখাতে পারে ইন্‌স্‌পেক্টর তার অনেক দৃষ্টান্ত দেখালেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কাসেমকে এনেছেন?

তিনি বললেন, না, সে থানায় আছে, এখনই ডেপুটিবাবু তদন্ত করতে আসবেন।

আমি বললুম, আমি তাকে দেখতে চাই।

কাসেমের সঙ্গে দেখা হবামাত্র সে আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললে, খোদার কসম, মহারাজ, আমি এ কাজ করি নি।

আমি বললুম, কাসেম, আমি তোমাকে সন্দেহ করি নে। ভয় নেই তোমার; বিনা দোষে তোমার শাস্তি ঘটতে দেব না।

কাসেম ডাকাতদের ভালো বর্ণনা করতে পারলে না; কেবল খুবই অত্যুক্তি করতে লাগল— চারশো-পাঁচশো লোক, এত-বড়ো-বড়ো বন্দুক তলোয়ার ইত্যাদি। বুঝলুম এ-সমস্ত বাজে কথা; হয় ভয়ের দৃষ্টিতে সব বেড়ে উঠেছে নয় পরাভবের লজ্জা চাপা দেবার জন্যে বাড়িয়ে তুলেছে। ওর ধারণা, হরিশ কুণ্ডুর সঙ্গে আমার শত্রুতা, এ তারই কাজ; এমন-কি, তাদের একাম সর্দারের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে বলে তার বিশ্বাস।

আমি বললুম, দেখ্‌ কাসেম, আন্দাজের উপর ভর করে খবরদার পরের নাম জড়াস নে। হরিশ কুণ্ডু এর মধ্যে আছে কি না সে কথা বানিয়ে তোলবার ভার তোর উপর নেই।

বাড়ি ফিরে এসে মাস্টারমশায়কে ডেকে পাঠালুম। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, আর কল্যাণ নেই। ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসিয়েছি, এখন দেশের সমস্ত পাপ উদ্ধত হয়ে ফুটে বেরোবে, তার আর কোনো লজ্জা থাকবে না।

আপনি কি মনে করেন, এ কাজ—

আমি জানি নে, কিন্তু পাপের হাওয়া উঠেছে। দাও, দাও, তোমার এলাকা থেকে ওদের এখনই বিদায় করে দাও।

আর একদিন সময় দিয়েছি, পরশু এরা সব যাবে।

দেখো, আমি একটি কথা বলি, বিমলাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। এখান থেকে তিনি বাইরেটাকে সংকীর্ণ করে দেখছেন, সব মানুষের সব জিনিসের ঠিক পরিমাণ বুঝতে পারছেন না। ওঁকে তুমি একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে দাও; মানুষকে, মানুষের কর্মক্ষেত্রকে, উনি একবার বড়ো জায়গা থেকে দেখে নিন।

আমিও ঐ কথাই ভাবছিলুম।

কিন্তু আর দেরি কোরো না। দেখো নিখিল, মানুষের ইতিহাস পৃথিবীর সমস্ত দেশকে সমস্ত জাতকে নিয়ে তৈরি হয়ে উঠছে, এইজন্যে পলিটিক্সেও ধর্মকে বিকিয়ে দেশকে বাড়িয়ে তোলা চলবে না। আমি জানি য়ুরোপ এ কথা মনের সঙ্গে মানে না, কিন্তু তাই বলেই যে য়ুরোপই আমাদের গুরু এ আমি মানব না। সত্যের জন্যে মানুষ মরে অমর হয়, কোনো জাতিও যদি মরে তা হলে মানুষের ইতিহাসে সেও অমর হবে। সেই সত্যের অনুভূতি জগতের মধ্যে এই ভারতবর্ষেই খাঁটি

হয়ে উঠুক শয়তানের অভ্রভেদী অট্টহাসির মাঝখানে। কিন্তু বিদেশ থেকে এ কী পাপের মহামারী এসে আমাদের দেশে প্রবেশ করলে!

সমস্ত দিন এই-সব নানা হাঙ্গামে কেটে গেল। শ্রান্ত হয়ে রাত্রে শুতে গেলুম। সেই টাকাটা আজ বের না করে কাল সকালে বের করে নেব স্থির করেছি।

রাত্রে কখন এক সময়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার। একটা কিসের শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি। বুঝি কেউ কাঁদছে।

থেকে থেকে বাদলা রাতের দমকা হাওয়ার মতো চোখের জলে ভরা এক-একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হল, আমার এই ঘরটার বুকের ভিতরকার কান্না।

আমার ঘরে আর কেউ নেই। বিমলা কিছুদিন থেকে কোনো-একটা পাশের ঘরে শোয়। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি বিমলা মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে।

এ-সব কথা লিখতে পারা যায় না। এ যে কী, তা কেবল তিনিই জানেন যিনি বিশ্বের মর্মের মধ্যে বসে জগতের সমস্ত বেদনাকে গ্রহণ করছেন। আকাশ মূক, তারাগুলি নীরব, রাত্রি নিস্তব্ধ— তারই মাঝখানে ঐ একটি নিদ্রাহীন কান্না!

আমরা এই-সব সুখদুঃখকে সংসারের সঙ্গে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভালো মন্দ একটা-কিছু নাম দিয়ে চুকিয়ে ফেলে দিই। কিন্তু অন্ধকারের বক্ষ ভাসিয়ে দিয়ে এই-যে ব্যথার উৎস উঠছে এর কি কোনো নাম আছে! সেই নিশীথরাত্রে সেই লক্ষকোটি তারার নিঃশব্দতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি যখন ওর দিকে চেয়ে দেখলুম তখন আমার মন সভয়ে বলে উঠল, আমি একে বিচার করবার কে! হে প্রাণ, হে মৃত্যু, হে অসীম বিশ্ব, হে অসীম বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাদের মধ্যে যে রহস্য রয়েছে আমি জোড় হাতে তাকে প্রণাম করি।

একবার ভাবলুম ফিরে যাই। কিন্তু পারলুম না। নিঃশব্দে বিমলার শিয়রের কাছে বসে তার মাথার উপর হাত রাখলুম। প্রথমটা তার সমস্ত শরীর কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠল, তার পরেই সেই কঠিনতা যেন ফেটে ভেঙে কান্না সহস্রধারায় বয়ে যেতে লাগল। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এত কান্না যে কোথায় ধরতে পারে সে তো ভেবে পাওয়া যায় না।

আমি আস্তে আস্তে বিমলার মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম। তার পরে কখন এক সময়ে হাৎড়ে হাৎড়ে সে আমার পা-দুটো টেনে নিলে, বুকের উপরে এমনি করে চেপে ধরলে যে আমার মনে হল সেই আঘাতে তার বুক ফেটে যাবে।

বিমলার আত্মকথা

আজ সকালে অমূল্যর কলকাতা থেকে ফেরবার কথা। বেহারাকে বলে রেখেছি সে এলেই যেন খবর দেয়। কিন্তু, স্থির থাকতে পারছি নে। বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসে রইলুম।

অমূল্যকে যখন আমার গয়না বেচবার জন্যে কলকাতায় পাঠালুম তখন নিজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বুঝি মনেই ছিল না। এ কথা একবারও আমার বুদ্ধিতে এলই না যে সে ছেলেমানুষ, অত টাকার গয়না কোথাও বেচতে গেলে সবাই তাকে সন্দেহ করবে। মেয়েমানুষ আমরা এত অসহায় যে আমাদের নিজের বিপদ অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে আমাদের যেন উপায় নেই। আমরা মরবার সময় পাঁচ জনকে ডুবিয়ে মারি।

বড়ো অহংকার করে বলেছিলুম, অমূল্যকে বাঁচাব। যে নিজে তলিয়ে যাচ্ছে সে নাকি অন্যকে বাঁচাতে পারে! হায় হায়, আমিই বুঝি ওকে মারলুম। ভাই আমার, আমি তোর এমনি দিদি, যেদিন

মনে মনে তোর কপালে ভাইফোঁটা দিলুম সেই দিনই বুঝি যম মনে মনে হাসলে! আমি যে অকল্যাণের বোঝাই নিয়ে ফিরছি আজ।

আমার আজ মনে হচ্ছে মানুষকে এক-এক সময়ে যেন অমঙ্গলের প্লেগে ধরে, হঠাৎ কোথা হতে তার বীজ এসে পড়ে আর এক রাত্রেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সেই সময়ে সকল সংসার থেকে খুব দূরে কোথাও তাকে সরিয়ে রাখা যায় না কি? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার ছোঁয়াচ যে বড়ো ভয়ানক। সে যে বিপদের মশালের মতো, নিজে পুড়তে থাকে সংসারে আগুন লাগাবার জন্যেই।

নটা বাজল। আমার কেমন বোধ হচ্ছে, অমূল্য বিপদে পড়েছে, ওকে পুলিসে ধরেছে। আমার গয়নার বাক্স নিয়ে থানায় গোলমাল পড়ে গেছে—কার বাক্স, ও কোথা থেকে পেলে, তার জবাব তো শেষ কালে আমাকেই দিতে হবে। সমস্ত পৃথিবীর লোকের সামনে কী জবাবটা দেব? মেজোরানী, এতকাল তোমাকে বড়ো অবজ্ঞাই করেছি। আজ তোমার দিন এল। তুমি আজ সমস্ত পৃথিবীর রূপ ধরে শোধ তুলবে। হে ভগবান, এইবার আমাকে বাঁচাও, আমার সমস্ত অহংকার ভাসিয়ে দিয়ে মেজোরানীর পায়ের তলায় পড়ে থাকব!

আর থাকতে পারলুম না, তখনই বাড়ির ভিতরে মেজোরানীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তিনি তখন বারান্দায় রোদ্দুরে বসে পান সাজছেন, পাশে থাকো বসে। থাকোকে দেখে মুহূর্তের জন্যে মনটা সংকুচিত হল; তখনই সেটা কাটিয়ে নিয়ে মেজোরানীর পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি বলে উঠলেন, ও কী লো ছোটোরানী, তোর হল কী? হঠাৎ এত ভক্তি কেন।

আমি বললুম, দিদি, আজ আমার জন্মতিথি। অনেক অপরাধ করেছি—করো দিদি, আশীর্বাদ করো, আর যেন কোনোদিন তোমাদের কোনো দুঃখ না দিই। আমার ভারি ছোটো মন।

বলেই তাঁকে আবার প্রণাম করে তাড়াতাড়ি উঠে এলুম। তিনি পিছন থেকে বলতে লাগলেন, বলি ও ছুটু, তোর জন্মতিথি, এ কথা আগে বলিস নি কেন। আমার এখানে দুপুর বেলা তোর নিমন্তন্ন রইল। লক্ষ্মী বোন, ভুলিস নে।

ভগবান, এমন কিছু করো যাতে আজ আমার জন্মতিথি হয়। একেবারে নতুন হতে পারি নে কি। সব ধুয়ে মুছে আর-একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা করো প্রভু!

বাইরে বৈঠকখানা ঘরে যখন ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় সেখানে সন্দীপ এসে উপস্থিত হল। বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠল। আজ সকালের আলোয় তার যে মুখ দেখলুম তাতে প্রতিভার জাদু একটুও ছিল না। আমি বলে উঠলুম, আপনি যান এখান থেকে।

সন্দীপ হেসে বললে, অমূল্য তো নেই, এবারে বিশেষ কথার পালা যে আমার।

পোড়া কপাল! যে অধিকার আমিই দিয়েছি সে অধিকার আজ ঠেকাই কী করে! বললুম, আমার একলা থাকবার দরকার আছে।

রানী, আর-একজন লোক ঘরে থাকলেও একলা থাকার ব্যাঘাত হয় না। আমাকে তুমি মনে কোরো না ভিড়ের লোক, আমি সন্দীপ, লক্ষ লোকের মাঝেও আমি একলা।

আপনি আর-এক সময় আসবেন, আজ সকালে আমি—

অমূল্যর জন্যে অপেক্ষা করছেন?

আমি বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উদ্‌যোগ করছি এমন সময় সন্দীপ তার শালের ভিতর থেকে আমার গয়নার বাক্স বের করে ঠক করে পাথরের টেবিলের উপর রাখলে।

আমি চমকে উঠলুম; বললুম, তা হলে অমূল্য যায় নি?

কোথায় যায় নি?

কলকাতায়?

সন্দীপ একটু হেসে বললে, না।

বাঁচলুম। আমার ভাইফোঁটা বাঁচল। আমি চোর, বিধাতার দণ্ড ঐ পর্যন্তই পৌঁছক—অমূল্য রক্ষা পাক।

সন্দীপ আমার মুখের ভাব দেখে বিদ্রূপ করে বললে, এত খুশি রানী? গয়নার বাক্সর এত দাম? তবে কোন্ প্রাণে এই গয়না দেবীর পূজায় দিতে চেয়েছিলে? দিয়ে তো ফেলেছ, দেবতার হাত থেকে আবার কি ফিরিয়ে নিতে চাও?

অহংকার মরতে মরতেও ছাড়ে না; ইচ্ছে হল দেখিয়ে দিই, এ গয়নার 'পরে আমার সিকি পয়সার মমতা নেই। আমি বললুম, এ গয়নায় আপনার যদি লোভ থাকে নিয়ে যান-না।

সন্দীপ বললে, আজ বাংলাদেশে যেখানে যত ধন আছে সমস্তর 'পরেই আমার লোভ। লোভের মতো এত বড়ো মহৎ বৃত্তি কি আর-কিছু আছে? পৃথিবীর যারা ইন্দ্র লোভ তাদের ঐরাবত। তা হলে এ-সমস্ত গয়না আমার?

এই বলে সন্দীপ বাক্সটি তুলে নিয়ে শালের মধ্যে ঢাকা দিতেই অমূল্য ঘরের মধ্যে ঢুকল। তার চোখের গোড়ায় কালি পড়েছে, মুখ শুকনো, উস্কখুস্ক চুল; একদিনেই তার তরুণ-বয়সের লাবণ্য যেন ঝরে গিয়েছে। তাকে দেখবামাত্রই আমার বুকের ভিতরটায় কামড়ে উঠল।

অমূল্য আমার দিকে না তাকিয়েই একেবারে সন্দীপকে গিয়ে বললে, আপনি গয়নার বাক্স আমার তোরঙ্গ থেকে বের করে এনেছেন?

গয়নার বাক্স তোমারই নাকি?

না, কিন্তু তোরঙ্গ আমার।

সন্দীপ হা হা করে হেসে উঠল। বললে, তোরঙ্গ সম্বন্ধে আমি-তুমির ভেদবিচার তো তোমার বড়ো সূক্ষ্ম হে অমূল্য! তুমিও মরবার আগে ধর্মপ্রচারক হয়ে মরবে দেখছি।

অমূল্য চৌকির উপর বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের উপর মাথা রাখলে। আমি তার কাছে এসে তার মাথায় হাত রেখে বললুম, অমূল্য, কী হয়েছে?

তখনি সে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, দিদি, এ গয়নার বাক্স আমিই নিজের হাতে তোমাকে এনে দেব এই আমার সাধ ছিল, সন্দীপবাবু তা জানতেন, তাই উনি তাড়াতাড়ি—

আমি বললুম, কী হবে আমার ঐ গয়নার বাক্স নিয়ে? ও যাক-না, তাতে ক্ষতি কী?

অমূল্য বিস্মিত হয়ে বললে, যাবে কোথায়?

সন্দীপ বললে, এ গয়না আমার, এ আমার রানীর দেওয়া অর্ঘ্য।

অমূল্য পাগলের মতো বলে উঠল, না না না, কখনোই না! দিদি, এ আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েছি, এ তুমি আর কাউকে দিতে পারবে না!

আমি বললুম, ভাই, তোমার দান চিরদিন আমার মনে রইল, কিন্তু গয়নায় যার লোভ সে নিয়ে যাক-না।

অমূল্য তখন হিংস্র জন্তুর মতো সন্দীপের দিকে তাকিয়ে গুমরে গুমরে বললে, দেখুন সন্দীপবাবু, আপনি জানেন, আমি ফাঁসিকে ভয় করি নে। এ গয়নার বাক্স যদি আপনি নেন—

সন্দীপ বিদ্রূপের হাসি হাসবার চেষ্টা করে বললে, অমূল্য, তোমারও এত দিনে জানা উচিত তোমার শাসনকে আমি ভয় করি নে। মক্ষীরানী, এ গয়না আজ আমি নেব বলে আসি নি, তোমাকে দেব বলেই এসেছিলুম। কিন্তু আমার জিনিস তুমি যে অমূল্যর হাত থেকে নেবে সেই অন্যায় নিবারণ করবার জন্যেই প্রথমে এ বাক্সে আমার দাবি স্পষ্ট করে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। এখন আমার এই জিনিস তোমাকে আমি দান করছি। এই রইল। এবারে ঐ বালকের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া করো, আমি চললুম। কিছুদিন থেকে তোমাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ কথা চলছে, আমি তার মধ্যে নেই, যদি কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটে ওঠে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। অমূল্য, তোমার তোরঙ্গ বই প্রভৃতি যা-কিছু আমার ঘরে ছিল সমস্তই বাজারে তোমার বাসাঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার ঘরে তোমার কোনো জিনিস রাখা চলবে না।

এই বলে সন্দীপ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল।

আমি বললুম, অমূল্য, তোমাকে আমার গয়না বিক্রি করতে দিয়ে অবধি মনে আমার শান্তি ছিল না।

কেন দিদি।

আমার ভয় হচ্ছিল এ গয়নার বাক্স নিয়ে পাছে তুমি বিপদে পড়, পাছে তোমাকে কেউ চোর বলে সন্দেহ করে ধরে। আমার সে ছ হাজার টাকায় কাজ নেই। এখন আমার একটি কথা তোমাকে শুনতে হবে—এখনই তুমি বাড়ি যাও, যাও তোমার মায়ের কাছে।

অমূল্য চাদরের ভিতর থেকে একটা পুঁটলি বের করে বললে, দিদি, ছ হাজার টাকা এনেছি।

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় পেলে?

তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, গিনির জন্যে অনেক চেষ্টা করলুম সে হল না, তাই নোট এনেছি।

অমূল্য, মাথা খাও, সত্যি করে বলো, এ টাকা কোথায় পেলে?

সে আপনাকে বলব না।

আমি চোখে যেন অন্ধকার দেখতে লাগলুম। বললুম, কী কাণ্ড করেছ অমূল্য? এ টাকা কি—

অমূল্য বলে উঠল, আমি জানি তুমি বলবে এ টাকা আমি অন্যায় করে এনেছি—আচ্ছা, তাই স্বীকার। কিন্তু যতবড়ো অন্যায় ততবড়োই দাম, সে দাম আমি দিয়েছি। এখন এ টাকা আমার।

এ টাকার সমস্ত বিবরণ আমার আর শুনতে ইচ্ছে হল না। শিরগুলো সংকুচিত হয়ে আমার সমস্ত শরীরকে যেন গুটিয়ে আনতে লাগল। আমি বললুম, নিয়ে যাও অমূল্য, এ টাকা যেখান থেকে নিয়ে এসেছ এখনই সেখানে দিয়ে এসো।

সে যে বড়ো শক্ত কথা।

না, শক্ত নয় ভাই। কী কুক্ষণে তুমি আমার কাছে এসেছিলে! সন্দীপও তোমার যতবড়ো অনিষ্ট করতে পারে নি আমি তাই করলুম!

সন্দীপের নামটা যেন তাকে খোঁচা মারলে। সে বললে, সন্দীপ! তোমার কাছে এলুম বলেই তো ওকে চিনতে পেরেছি। জানো দিদি, তোমার কাছ থেকে সেদিন ও যে ছ হাজার টাকার গিনি নিয়ে গেছে তার থেকে এক পয়সাও খরচ করে নি। এখান থেকে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রুমাল থেকে সমস্ত গিনি মেজের উপর ঢেলে রাশ করে তুলে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বললে, এ টাকা নয়, এ ঐশ্বর্য-পারিজাতের পাপড়ি, এ অলকাপুরীর বাঁশি থেকে সুরের মতো ঝরে পড়তে পড়তে শক্ত হয়ে উঠেছে, একে তো ব্যাঙ্কনোটে ভাঙানো চলে না। এ যে সুন্দরীর কণ্ঠহার হয়ে থাকবার কামনা করছে—ওরে অমূল্য, তোরা একে স্থূলদৃষ্টিতে দেখিস নে, এ হচ্ছে লক্ষ্মীর হাসি, ইন্দ্রাণীর লাবণ্য—না না, ঐ অরসিক নায়েবটার হাতে পড়বার জন্যে এর সৃষ্টি হয় নি। দেখো অমূল্য, নায়েবটা নিছক মিথ্যা কথা বলেছে, পুলিস সেই নৌকোচুরির কোনো খবর পায় নি, ও এই সুযোগে কিছু করে নিতে চায়। নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠি-তিনটে আদায় করতে হবে।—আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেমন করে?—সন্দীপ বললে, জোর করে, ভয় দেখিয়ে।—আমি বললুম, রাজি আছি, কিন্তু এই গিনিগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে।—সন্দীপ বললে, আচ্ছা, সে হবে।—কেমন করে ভয় দেখিয়ে নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠিগুলি আদায় করে পুড়িয়ে ফেলেছি সে অনেক কথা। সেই রাত্রেই আমি সন্দীপের কাছে এসে বলেছি, আর ভয় নেই, গিনিগুলি আমাকে দিন, কাল সকালেই আমি দিদিকে ফিরিয়ে দেব।—সন্দীপ বললে, এ কোন্ মোহ তোমাকে পেয়ে বসল! এবার দিদির আঁচলে দেশ ঢাকা পড়ল বুঝি! বলো বন্দেমাতরং! ঘোর কেটে যাক।—তুমি তো জান দিদি, সন্দীপ কী মন্ত্র জানে। গিনি তারই কাছে রইল। আমি অন্ধকার-রাত্রে পুকুরের ঘাটের চাতালের উপর বসে বন্দেমাতরং জপতে লাগলুম। কাল যখন তুমি গয়না বেচতে দিলে তখন সন্ধ্যার সময় আবার ওর কাছে গেলুম। বেশ বুঝলুম, তখন ও আমার উপরে রাগে জ্বলছে। সে রাগ প্রকাশ করলে না; বললে, দেখো, যদি আমার কোনো বাক্সয় সে গিনি

থাকে তো নিয়ে যাও। বলে আমার গায়ের উপর চাবির গোছাটা ফেলে দিলে। কোথাও নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় রেখেছেন বলুন। সন্দীপ বললে, আগে তোমার মোহ ভাঙবে, তার পরে আমি বলব। এখন নয়।— আমি দেখলুম, কিছুতেই তাকে নড়াতে পারব না, তখন আমাকে অন্য উপায় নিতে হয়েছিল। এর পরেও ওকে এই ছ হাজার টাকার নোট দেখিয়ে সেই গিনি-ক'টা নেবার অনেক চেষ্টা করেছি। গিনি এনে দিচ্ছি বলে আমাকে ভুলিয়ে রেখে ওর শোবার ঘর থেকে আমার তোরঙ্গ ভেঙে গয়নার বাক্স নিয়ে তোমার কাছে এসেছে! এ বাক্স তোমার কাছে আমাকে নিয়ে আসতে দিলে না! আবার বলে কি না, এ গয়না ওরই দান! আমাকে যে কতখানি বঞ্চিত করেছে সে আমি কাকে বলব! এ আমি কখনো মাপ করতে পারব না। দিদি, ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেছে। তুমিই ছুটিয়ে দিয়েছ।

আমি বললুম, ভাই আমার, আমার জীবন সার্থক হয়েছে। কিন্তু, অমূল্য, এখনো বাকি আছে। শুধু মায়া কাটালে হবে না, যে কালি মেখেছি সে ধুয়ে ফেলতে হবে। দেরি কোরো না, অমূল্য, এখনই যাও এ টাকা যেখান থেকে এনেছ সেইখানেই রেখে এসো। পারবে না, লক্ষ্মী ভাই?

তোমার আশীর্বাদে পারব দিদি।

এ শুধু তোমার একলার পারা নয়। এর মধ্যে যে আমারও পারা আছে। আমি মেয়েমানুষ, বাইরের রাস্তা আমার বন্ধ, নইলে তোমাকে আমি যেতে দিতুম না, আমিই যেতুম! আমার পক্ষে এইটেই সব চেয়ে কঠিন শাস্তি যে, আমার পাপ তোমাকে সামলাতে হচ্ছে।

ও কথা বোলো না দিদি। যে রাস্তায় চলেছিলুম সে তোমার রাস্তা নয়। সে রাস্তা দুর্গম বলেই আমার মনকে টেনেছিল। দিদি, এবার তোমার রাস্তায় ডেকেছ— এ রাস্তা আমার আরো হাজার গুণে দুর্গম হোক, কিন্তু তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে জিতে আসব, কোনো ভয় নেই। তা হলে এ টাকা যেখান থেকে এনেছি সেইখানেই ফিরিয়ে দিতে হবে এই তোমার হুকুম?

আমার হুকুম নয় ভাই, উপরের হুকুম।

সে আমি জানি নে। সেই উপরের হুকুম তোমার মুখ দিয়ে এসেছে এই আমার যথেষ্ট। কিন্তু দিদি, তোমার কাছে আমার নিমন্তন্ন আছে। সেইটে আজ আদায় করে তবে যাব। প্রসাদ দিতে হবে। তার পরে সন্ধের মধ্যেই যদি পারি কাজ সেরে আসব।

হাসতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল; বললুম, আচ্ছা।

অমূল্য চলে যেতেই আমার বুক দমে গেল। কোন্ মায়ের বাছাকে বিপদে ভাসালুম! ভগবান, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন সর্বনেশে ঘটা করে কেন! এত লোককে নিমন্ত্রণ! আমার একলায় কুলোল না? এত মানুষকে দিয়ে তার ভার বহন করাবে! আহা, ঐ ছেলেমানুষকে কেন মারবে!

তাকে ফিরে ডাকলুম, অমূল্য! আমার গলা এমন ক্ষীণ হয়ে বাজল সে শুনতে পেলে না। দরজার কাছে গিয়ে আবার ডাকলুম, অমূল্য! তখন সে চলে গেছে।

বেহারা, বেহারা!

কী রানীমা?

অমূল্যবাবুকে ডেকে দে।

কী জানি, বেহারা অমূল্যর নাম বোধ হয় জানে না, তাই সে একটু পরেই সন্দীপকে ডেকে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বললে, যখন তাড়িয়ে দিলে তখনি জানতুম ফিরে ডাকবে। যে চাঁদের টানে ভাঁটা সেই চাঁদের টানেই জোয়ার। এমনি নিশ্চয় জানতুম তুমি ডাকবে যে, আমি দরজার কাছে অপেক্ষা করে বসেছিলুম। যেমনি তোমার বেহারাকে দেখেছি অমনি সে কিছু বলবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি, এখনি যাচ্ছি। ভোজপুরীটা আশ্চর্য

হয়ে হাঁ করে রইল। ভাবলে লোকটা মন্ত্রসিদ্ধ। মক্ষীরানী, সংসারে সব চেয়ে বড়ো লড়াই এই মন্ত্রের লড়াই। সম্মোহনে সম্মোহনে কাটাকাটি। এর বাণ শব্দভেদী বাণ। আবার, নিঃশব্দভেদী বাণও আছে। এতদিন পরে এ লড়াইয়ে সন্দীপের সমকক্ষ মিলেছে। তোমার তূণে অনেক বাণ আছে রণরঙ্গিণী! পৃথিবীর মধ্যে দেখলুম, কেবল তুমিই সন্দীপকে আপন ইচ্ছামতে ফেরাতে পারলে, আবার আপন ইচ্ছামতে টেনে আনলে। শিকার তো এসে পড়ল। এখন একে নিয়ে কী করবে বলো। একেবারে নিঃশেষে মারবে না তোমার খাঁচায় পুরে রাখবে? কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখছি, রানী, এই জীবটিকে বধ করাও যেমন শক্ত, বন্ধ করাও তেমনি। অতএব দিব্য অস্ত্র তোমার হাতে যা আছে তার পরীক্ষা করতে বিলম্ব কোরো না।

সন্দীপের মনের ভিতরে একটা পরাভবের সংশয় এসেছে বলেই সে আজ এমন অনর্গল বকে গেল। আমার বিশ্বাস, ও জানত আমি অমূল্যকেই ডেকেছি; বেহারা খুব সম্ভব তারই নাম বলেছিল; ও তাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে এসে উপস্থিত হয়েছে। আমাকে বলতে দেবার সময় দিলে না যে, ওকে ডাকি নি, অমূল্যকে ডেকেছি। কিন্তু আস্ফালন মিথ্যে, এবার দুর্বলকে দেখতে পেয়েছি। এখন আমার জয়লব্ধ জায়গাটির সূচ্যগ্রভূমিও ছাড়তে পারব না।

আমি বললুম, সন্দীপবাবু, আপনি গল্‌ গল্‌ করে এত কথা বলে যান কেমন করে? আগে থাকতে বুঝি তৈরি হয়ে আসেন?

এক মুহূর্তে সন্দীপের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। আমি বললুম, শুনেছি কথকদের খাতায় নানা রকমের লম্বা লম্বা বর্ণনা লেখা থাকে, যখন যেটা যেখানে দরকার খাটিয়ে দেয়। আপনার সে-রকম খাতা আছে নাকি?

সন্দীপ চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, বিধাতার প্রসাদে তোমাদের তো হাবভাব-ছলাকলার অন্ত নেই, তার উপরেও দর্জির দোকান স্যাকরার দোকান তোমাদের সহায়, আর বিধাতা কি আমাদেরই এমনি নিরস্ত্র করে রেখেছেন যে—

আমি বললুম, সন্দীপবাবু, খাতা দেখে আসুন; এ কথাগুলো ঠিক হচ্ছে না। দেখছি এক-একবার আপনি উল্টোপাল্টা বলে বসেন; খাতা-মুখস্থ'র ঐ একটা মস্ত দোষ।

সন্দীপ আর থাকতে পারলে না; একেবারে গর্জে উঠল, তুমি! তুমি আমাকে অপমান করবে! তোমার কী না আমার কাছে ধরা পড়েছে বলো তো! তোমার যে—

ওর মুখ দিয়ে আর কথা বেরোল না। সন্দীপ যে মন্ত্রব্যবসায়ী, মন্ত্র যে মুহূর্তে খাটে না সে মুহূর্তেই ওর আর জোর নেই, রাজা থেকে একেবারে রাখাল হয়ে যায়। দুর্বল! দুর্বল! ও যতই রূঢ় হয়ে উঠে কর্কশ কথা বলতে লাগল ততই আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। আমাকে বাঁধবার নাগপাশ ওর ফুরিয়ে গেছে, আমি মুক্তি পেয়েছি। বাঁচা গেছে, বাঁচা গেছে, অপমান করো, আমাকে অপমান করো, এইটেই তোমার সত্য। আমাকে স্তব কোরো না, সেইটেই মিথ্যা।

এমন সময় আমার স্বামী ঘরের মধ্যে এলেন। অন্য দিন সন্দীপ মুহূর্তেই আপনাকে যে-রকম সামলে নেয় আজ তার সে শক্তি ছিল না। আমার স্বামী তার মুখের দিকে চেয়ে একটু আশ্চর্য হলেন। আগে হলে আমি এতে লজ্জা পেতুম। কিন্তু স্বামী যাই মনে করুন-না আমি আজ খুশি হলুম। আমি ঐ দুর্বলকে দেখে নিতে চাই।

আমরা দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইলুম দেখে আমার স্বামী একটু ইতস্তত করে চৌকিতে বসলেন; বললেন, সন্দীপ, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম, শুনলুম এই ঘরেই আছ।

সন্দীপ কথাটার উপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিয়ে বললে, হাঁ, মক্ষীরানী সকালেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যে মউচাকের দাসমক্ষিকা, কাজেই হুকুম শুনেই সব কাজ ফেলে চলে আসতে হল।

স্বামী বললেন, কাল কলকাতায় যাচ্ছি, তোমাকে যেতে হবে।

সন্দীপ বললে, কেন বলো দেখি। আমি কি তোমার অনুচর নাকি?

আচ্ছা, তুমিই কলকাতায় চলো, আমিই তোমার অনুচর হব।

কলকাতায় আমার কাজ নেই।

সেইজন্যেই তো কলকাতায় যাওয়া তোমার দরকার। এখানে তোমার বড্ড বেশি কাজ।

আমি তো নড়ছি নে।

তা হলে তোমাকে নাড়াতে হবে।

জোর?

হাঁ, জোর।

আচ্ছা বেশ, নড়ব। কিন্তু জগৎটা তো কলকাতা আর তোমার এলেকা এই দুই ভাগে বিভক্ত নয়। ম্যাপে আরো জায়গা আছে।

তোমার গতিক দেখে মনে হয়েছিল, জগতে আমার এলেকা ছাড়া আর-কোনো জায়গাই নেই।

সন্দীপ তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, মানুষের এমন অবস্থা আসে যখন সমস্ত জগৎ এতটুকু জায়গায় এসে ঠেকে। তোমার এই বৈঠকখানাটির মধ্যে আমার বিশ্বকে আমি প্রত্যক্ষ করে দেখেছি, সেইজন্যেই এখান থেকে নড়ি নে। মক্ষিরানী, আমার কথা এরা কেউ বুঝতে পারবে না, হয়তো তুমিও বুঝবে না। আমি তোমাকে বন্দনা করি। আমি তোমারই বন্দনা করতে চললুম। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্র বদল হয়ে গেছে। বন্দে মাতরং নয় : বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং। মা আমাদের রক্ষা করেন, প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন, বড়ো সুন্দর সেই বিনাশ। সেই মরণনৃত্যের নূপুর-ঝংকার বাজিয়ে তুলেছ আমার হৃৎপিণ্ডে। এই কোমলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বাংলাদেশের রূপ তুমি তোমার এই ভক্তের চক্ষে এক মুহূর্তে বদলে দিয়েছ। দয়ামায়া তোমার নেই গো; এসেছ মোহিনী, তুমি তোমার বিষপাত্র নিয়ে; সেই বিষ পান করে, সেই বিষে জর্জর হয়ে, হয় মরব নয় মৃত্যুঞ্জয় হব। মাতার দিন আজ নেই। প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া! দেবতা স্বর্গ ধর্ম সত্য সব তুমি তুচ্ছ করে দিয়েছ, পৃথিবীর আর-সমস্ত সম্বন্ধ আজ ছায়া, নিয়ম-সংযমের সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন। প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া! তুমি যে দেশে দুটি পা দিয়ে দাঁড়িয়েছ তার বাইরের সমস্ত পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারই ছাইয়ের উপর আনন্দে তাণ্ডবনৃত্য করতে পারি! এরা ভালোমানুষ, এরা অত্যন্ত ভালো, এরা সবার ভালো করতে চায়— যেন সবই সত্য। কখনোই না, এমন সত্য বিশ্বে আর কোথাও নেই, এই আমার একমাত্র সত্য। বন্দনা করি তোমাকে! তোমার প্রতি নিষ্ঠা আমাকে নিষ্ঠুর করেছে, তোমার 'পরে ভক্তি আমার মধ্যে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়েছে! আমি ভালো নই, আমি ধার্মিক নই, আমি পৃথিবীতে কিছুই মানি নে, আমি যাকে সকলের চেয়ে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি কেবলমাত্র তাকেই মানি।

আশ্চর্য! আশ্চর্য! এই কিছু-আগেই আমি একে সমস্ত মন দিয়ে ঘৃণা করেছিলুম। যাকে ছাই বলে দেখেছিলুম তার মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে উঠেছে। এ একেবারে খাঁটি আগুন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিধাতা এমন করে মিশিয়ে কেন মানুষকে তৈরি করেন? সে কি কেবল তাঁর অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাবার জন্যে? আধ ঘণ্টা আগেই আমি মনে মনে ভাবছিলুম এই মানুষটাকে একদিন রাজা বলে ভ্রম হয়েছিল বটে, কিন্তু এ যাত্রার দলের রাজা। তা নয়, তা নয়; যাত্রার দলের পোশাকের মধ্যেও এক-এক সময়ে রাজা লুকিয়ে থেকে যায়। এর মধ্যে অনেক লোভ, অনেক স্থূল, অনেক ফাঁকি আছে; স্তরে স্তরে মাংসের মধ্যে এ ঢাকা; কিন্তু তবুও— আমরা জানি নে, আমরা শেষ কথাটাকে জানি নে, এইটেই স্বীকার করা ভালো; আপনাকেও জানি নে। মানুষ বড়ো আশ্চর্য; তাকে নিয়ে কী প্রচণ্ড রহস্যই তৈরি হচ্ছে তা সেই রুদ্র দেবতাই জানেন! মাঝের থেকে দগ্ধ হয়ে গেলুম! প্রলয়! প্রলয়ের দেবতাই শিব, তিনিই আনন্দময়, তিনি বন্ধন মোচন করবেন।

কিছুদিন থেকে বারেবারে মনে হচ্ছে আমার দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারছে সন্দীপের এই প্রলয়রূপ ভয়ংকর; আর-এক বুদ্ধি বলছে এই তো মধুর। জাহাজ যখন

ডোবে তখন চার দিকে যারা সাঁতার দেয় তাদের টেনে নেয়; সন্দীপ যেন সেই মরণের মূর্তি, ভয় ধরবার আগেই ওর প্রচণ্ড টান এসে ধরে—সমস্ত আলো সমস্ত কল্যাণ থেকে, আকাশের মুক্তি থেকে, নিশ্বাসের বাতাস থেকে, চিরদিনের সঞ্চয় থেকে, প্রতিদিনের ভাবনা থেকে, চোখের পলকে একটা নিবিড় সর্বনাশের মধ্যে একেবারে লোপ করে দিতে চায়। কোন্ মহামারীর দূত হয়ে ও এসেছে, অশিবমন্ত্র পড়তে পড়তে রাস্তা দিয়ে চলেছে, আর ছুটে আসছে দেশের সব বালকরা সব যুবকরা। বাংলাদেশের হৃদয়পদ্মে যিনি মা বসে আছেন তিনি কেঁদে উঠেছেন; তাঁর অমৃত-ভাণ্ডারের দরজা ভেঙে ফেলে এরা সেখানে মদের ভাণ্ড নিয়ে পানসভা বসিয়েছে, ধুলার উপর ঢেলে ফেলতে চায় সব সুধা, চুরমার করতে চায় চিরদিনের সুধাপাত্র। সবই বুঝলুম, কিন্তু মোহকে তো ঠেকিয়ে রাখতে পারি নে। সত্যের কঠোর তপস্যার পরীক্ষা করবার জন্যে সত্যদেবেরই এই কাজ—মাতলামি স্বর্গের সাজ পরে এসে তাপসদের সামনে নৃত্য করতে থাকে। বলে, তোমরা মূঢ়, তপস্যায় সিদ্ধি হয় না, তার পথ দীর্ঘ, তার কাল মন্থর; তাই বজ্রধারী আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি তোমাদের বরণ করব; আমি সুন্দরী, আমি মত্ততা, আমার আলিঙ্গনেই নিমেষের মধ্যে সমস্ত সিদ্ধি।

একটুখানি চুপ করে থেকে সন্দীপ আবার আমাকে বললে, এবার দূরে যাবার সময় এসেছে দেবী। ভালোই হয়েছে। তোমার কাছে আসার কাজ আমার হয়ে গেছে। তার পরেও যদি থাকি তা হলে একে-একে আবার সব নষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড়ো তাকে লোভে পড়ে সস্তা করতে গেলেই সর্বনাশ ঘটে; মুহূর্তের অন্তরে যা অনন্ত তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়। আমরা সেই অনন্তকে নষ্ট করতে বসেছিলুম, ঠিক এমন সময়ে তোমারই বজ্র উদ্যত হল, তোমার পূজাকে তুমি রক্ষা করলে আর তোমার এই পূজারিকেও। আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল। দেবী, আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলুম; আমার মাটির মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না, এ মন্দির প্রত্যেক পলকে ভাঙবে-ভাঙবে করছিল; আজ তোমার বড়ো মূর্তিকে বড়ো মন্দিরে পূজা করতে চললুম, তোমার কাছ থেকে দূরেই তোমাকে সত্য করে পাব—এখানে তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, সেখানে তোমার কাছ থেকে বর পাব।

টেবিলের উপর আমার গয়নার বাক্স ছিল। আমি সেটা তুলে ধরে বললুম, আমার এই গয়না আমি তোমার হাত দিয়ে যাঁকে দিলুম তাঁর চরণে তুমি পৌঁছে দিয়ো।

আমার স্বামী চুপ করে রইলেন। সন্দীপ বেরিয়ে চলে গেল।

অমূল্যের জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরি করতে বসেছিলুম এমন সময় মেজোরানী এসে বললেন, কী লো ছুটু, নিজের জন্মতিথিতে নিজেকে খাওয়াবার উজ্যুগ হচ্ছে বুঝি?

আমি বললুম, নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খাওয়াবার নেই নাকি?

মেজোরানী বললেন, আজ তো তোর খাওয়াবার কথা নয়, আমরা খাওয়াব। সেই জোগাড়ও তো করছিলুম, এমন সময় খবর শুনে পিলে চমকে গেছে; আমাদের কোন্ কাছারিতে নাকি পাঁচ-ছ শো ডাকাত পড়ে ছ হাজার টাকা লুটে নিয়েছে। লোকে বলছে এইবার তারা আমাদের বাড়ি লুট করতে আসবে।

এই খবর শুনে আমার মনটা হালকা হল। এ তবে আমাদেরই টাকা। এখনই অমূল্যকে ডাকিয়ে বলি, এই ছ হাজার টাকা এইখানেই আমার সামনে আমার স্বামীর হাতে সে ফিরিয়ে দিক, তার পরে আমার যা বলবার সে আমি তাঁকে বলব।

মেজোরানী আমার মুখের ভাব লক্ষ করে বললেন, অবাক করলে! তোর মনে একটুও ভয়ডর নেই?

আমি বললুম, আমাদের বাড়ি লুট করতে আসবে এ আমি বিশ্বাস করতে পারি নে।

বিশ্বাস করতে পার না! কাছারি লুট করবে এইটেই বা বিশ্বাস করতে কে পারত?

কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে পুলিপিঠের মধ্যে নারকেলের পুর দিতে লাগলুম। আমার মুখের দিকে খানিক ক্ষণ তাকিয়ে তিনি বললেন, যাই, ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠাই, আমাদের সেই ছ হাজার টাকাটা এখনই বের করে নিয়ে কলকাতায় পাঠাতে হবে, আর দেরি করা নয়।

এই বলে তিনি চলে যেতেই আমি পিঠের বারকোশ সেইখানে আলগা ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি সেই লোহার সিন্দুকের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম। আমার স্বামীর এমনি ভোলা-মন যে দেখি তাঁর যে জামার পকেটে চাবি থাকে সে জামাটা তখনও আলনায় ঝুলছে। চাবির রিং থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটা খুলে আমার জ্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেললুম।

এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়ল। বললুম, কাপড় ছাড়ছি।—শুনতে পেলুম মেজোরানী বললেন, এই কিছু আগে দেখি পিঠে তৈরি করছে, আবার এখনই সাজ করবার ধুম পড়ে গেল! কত লীলাই যে দেখব! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বসবে? ওলো, ও দেবীচৌধুরানী, লুঠের মাল বোঝাই হচ্ছে নাকি?

কী মনে করে একবার আস্তে আস্তে লোহার সিন্দুকটা খুললুম। বোধ হয় মনে ভাবছিলুম যদি সমস্তটা স্বপ্ন হয়, যদি হঠাৎ সেই ছোটো দেরাজটা টেনে খুলতেই দেখি সেই কাগজের মোড়কগুলি ঠিক তেমনিই সাজানো রয়েছে। হায় রে, বিশ্বাসঘাতকের নষ্ট বিশ্বাসের মতোই সব শূন্য।

মিছামিছি কাপড় ছাড়তেই হল। কোনো দরকার নেই, তবু নতুন করে চুল বাঁধলুম। মেজো-রানীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন 'বলি এত সাজ কিসের' আমি বললুম, জন্মতিথির।

মেজোরানী হেসে বললেন, একটা কিছু ছুতো পেলেই অমনি সাজ। ঢের দেখেছি, তোর মতো এমন ভাবুনে দেখি নি।

অমূল্যকে ডাকবার জন্যে বেহারার খোঁজ করছি, এমন সময় সে এসে পেন্‌সিলে লেখা একটি ছোটো চিঠি আমার হাতে দিলে। তাতে অমূল্য লিখেছে, দিদি, খেতে ডেকেছিলে, কিন্তু সবুর করতে পারলুম না। আগে তোমার আদেশ পালন করে আসি, তার পরে তোমার প্রসাদ গ্রহণ করব। হয়তো ফিরে আসতে সন্ধ্যা হবে।

অমূল্য কার হাতে টাকা ফেরাতে চলল, আবার কোন্ জালের মধ্যে নিজেকে জড়াতে গেল। আমি তাকে তীরের মতো কেবল ছুঁড়তেই পারি, কিন্তু লক্ষ্য ভুল হলে তাকে আর কোনোমতে ফেরাতে পারি নে।

এই অপরাধের মূলে যে আমি আছি এই কথাটা এখনই স্বীকার করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু মেয়েরা সংসারে বিশ্বাসের উপরেই বাস করে, সেই যে তাদের জগৎ। সেই বিশ্বাসকে লুকিয়ে ফাঁকি দিয়েছি এই কথাটা জানিয়ে তার পরে সংসারে টিঁকে থাকা আমাদের পক্ষে বড়ো কঠিন। যা আমরা ভাঙব ঠিক তার উপরেই যে আমাদের দাঁড়াতে হবে, সেই ভাঙা জিনিসের খোঁচা নড়তে-চড়তে আমাদের প্রতি মুহূর্তেই বাজতে থাকবে। অপরাধ করা শক্ত নয়, কিন্তু সেই অপরাধের সংশোধন করা মেয়েদের পক্ষে যত কঠিন এমন আর কারও নয়।

কিছুদিন থেকে আমার স্বামীর সঙ্গে বেশ সহজে কথাবার্তা কওয়ার প্রণালীটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই হঠাৎ এতবড়ো একটা কথা কেমন করে এবং কখন যে তাঁকে বলব তা কিছুতেই ভেবে পেলুম না। আজ তিনি অনেক দেরিতে খেতে এসেছেন; তখন বেলা দুটো। অন্যমনস্ক হয়ে কিছুই প্রায় খেতে পারলেন না। আমি যে তাঁকে একটু অনুরোধ করে খেতে বলব সে অধিকারটুকু খুইয়েছি। মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছলুম।

একবার ভাবলুম সংকোচ কাটিয়ে বলি, ঘরের মধ্যে একটু বিশ্রাম করো সে, তোমাকে বড়ো ক্লান্ত দেখাচ্ছে। একটু কেশে কথাটা যেই তুলতে যাচ্ছি এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে

দারোগাবাবু কাসেম সর্দারকে নিয়ে এসেছে। আমার স্বামী উদ্‌বিগ্নমুখে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

তিনি বাইরে যাওয়ার একটু পরেই মেজোরানী এসে বললেন, ঠাকুরপো কখন খেতে এলেন আমাকে খবর দিলি নে কেন? আজ তাঁর খাবার দেরি দেখে নাইতে গেলুম, এরই মধ্যে কখন—

কেন, কী চাই।

শুনছি তোরা কাল কলকাতায় যাচ্ছিস। তা হলে আমি এখানে থাকতে পারব না। বড়োরানী তাঁর রাধাবল্লভ ঠাকুরকে ছেড়ে কোথাও নড়বেন না। কিন্তু আমি এই ডাকাতির দিনে যে তোমাদের এই শূন্য ঘর আগলে বসে কথায় কথায় চমকে চমকে মরব সে আমি পারব না। কাল যাওয়াই তো ঠিক?

আমি বললুম, হাঁ ঠিক। মনে মনে ভাবলুম, সেই যাওয়ার আগে এইটুকু সময়ের মধ্যে কত ইতিহাসই যে তৈরি হয়ে উঠবে তার ঠিকানা নেই। তার পরে কলকাতাতেই যাই কি এখানেই থাকি সব সমান। তার পর থেকে সংসারটা যে কেমন, জীবনটা যে কী, কে জানে! সব ধোঁয়া, স্বপ্ন।

এই-যে আমার অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়ে উঠল বলে, আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র আছে, এই সময়টাকে কেউ এক দিন থেকে আর-এক দিন পর্যন্ত সরিয়ে সরিয়ে টেনে টেনে খুব দীর্ঘ করে দিতে পারে না? তা হলে এরই মধ্যে আমি ধীরে ধীরে একবার সমস্তটা যথাসাধ্য সেরে-সুরে নিই; অন্তত এই আঘাতটার জন্য নিজেকে এবং সংসারকে প্রস্তুত করে তুলি। প্রলয়ের বীজ যতক্ষণ মাটির নীচে থাকে ততক্ষণ অনেক সময় নেয়; সে এত সময় যে মনে হয়, ভয়ের বুঝি কোনো কারণ নেই। কিন্তু মাটির উপর একবার যেই এতটুকু অঙ্কুর দেখা দেয় অমনি দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে; তখন তাকে কোনোমতে আঁচল দিয়ে, বুক দিয়ে, প্রাণ দিয়ে চাপা দেবার আর সময় পাওয়া যায় না।

মনে করছি কিছুই ভাবব না, অসাড় হয়ে চুপ করে পড়ে থাকব, তার পরে মাথার উপরে যা এসে পড়ে পড়ুক গে। পরশুদিনের মধ্যেই তো যা হবার তা হয়ে যাবে—জানাশোনা, হাসাহাসি, কাঁদাকাটি, প্রশ্ন, প্রশ্নের জবাব, সবই।

কিন্তু অমূল্যের সেই আত্মোৎসর্গের-দীপ্তিতে-সুন্দর বালকের মুখখানি যে কিছুতে ভুলতে পারছি নে। সে তো চুপ করে বসে ভাগ্যের প্রতীক্ষা করে নি, সে যে ছুটে গেল বিপদের মাঝখানে। আমি নারীর অধম তাকে প্রণাম করি—সে আমার বালক দেবতা, সে আমার কলঙ্কের বোঝা একেবারে খেলাচ্ছলে কেড়ে নিতে এসেছে! সে আমার মার নিজের মাথায় নিয়ে আমাকে বাঁচাবে, ভগবানের এমন ভয়ানক দয়া আমি সইব কেমন করে! বাছা আমার, তোমাকে প্রণাম! ভাই আমার, তোমাকে প্রণাম! নির্মল তুমি, সুন্দর তুমি, বীর তুমি, নির্ভীক তুমি, তোমাকে প্রণাম! জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হয়ে আমার কোলে এসো এই বর আমি কামনা করি।

এর মধ্যে চার দিকে নানা গুজব জেগে উঠছে, পুলিস আনাগোনা করছে, বাড়ির দাসী-চাকররা সবাই উদ্‌বিগ্ন। ক্ষেমা দাসী আমাকে এসে বললে, ছোটোরানীমা, আমার এই সোনার পৈঁচে আর বাজুবন্ধ তোমার লোহার সিন্দুকে তুলে রেখে দাও।—ঘরের ছোটোরানীই দেশ জুড়ে এই দুর্ভাবনার জাল তৈরি করে নিজে তার মধ্যে আটকা পড়ে গেছে, এ কথা বলি কার কাছে? ক্ষেমার গয়না, থাকোর জমানো টাকা, আমাকে ভালোমানুষের মতো নিতে হল। আমাদের গয়লানী একটা টিনের বাক্সোয় করে একটি বেনারসি কাপড় এবং তার আর-আর দামি সম্পত্তি আমার কাছে রেখে গেল; বললে, রানীমা, এই বেনারসি কাপড় তোমারই বিয়েতে আমি পেয়েছিলুম।

কাল যখন আমারই ঘরের লোহার সিন্দুক খোলা হবে তখন এই ক্ষেমা, থাকো, গয়লানী—থাক্, সে কথা কল্পনা করে হবে কী! বরঞ্চ ভাবি, কালকের দিনের পর আর-এক বৎসর কেটে গেছে, আবার আর-একটা তেসরা মাঘের দিন এসেছে, সেদিনও কি আমার সংসারের সব কাটা ঘা এমনি কাটাই থেকে যাবে?

অমূল্য লিখেছে, সে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফিরবে। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে একা বসে চুপ করে থাকতে পারি নে। আবার পিঠে তৈরি করতে গেলুম। যা তৈরি হয়েছে তা যথেষ্ট, কিন্তু আরো করতে হবে। এত কে খাবে? বাড়ির সমস্ত দাসী-চাকরদের খাইয়ে দেব। আজ রাত্রেই খাওয়াতে হবে। আজ রাত পর্যন্ত আমার দিনের সীমা। কালকের দিন আর আমার হাতে নেই।

পিঠের পর পিঠে ভাজছি, বিশ্রাম নেই। এক-একবার মনে হচ্ছে যেন উপরে আমার মহলের দিকে কী-একটা গোলমাল চলছে। হয়তো আমার স্বামী লোহার সিন্দুক খুলতে এসে চাবি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই নিয়ে মেজোরানী দাসী-চাকরকে ডেকে একটা তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়েছেন। না, আমি শুনব না, কিচ্ছু শুনব না, দরজা বন্ধ করে থাকব। দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি থাকো তাড়াতাড়ি আসছে; সে হাঁপিয়ে বললে, ছোটোরানী মা! আমি বলে উঠলুম, যা যা, বিরক্ত করিস নে, আমার এখন সময় নেই।—থাকো বললে, মেজোরানীমা'র বোনপো নন্দবাবু কলকাতা থেকে এক কল এনেছেন সে মানুষের মতো গান করে, তাই মেজোরানীমা তোমাকে ডাকতে পাঠিয়েছেন।

হাসব কি কাঁদব তাই ভাবি! এর মাঝখানেও গ্রামোফোন! তাতে যতবার দম দিচ্ছে সেই থিয়েটারের নাকি সুর বেরোচ্ছে; ওর কোনো ভাবনা নেই। যন্ত্র যখন জীবনের নকল করে তখন তা এমনি বিষম বিদ্রূপ হয়েই ওঠে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। জানি, অমূল্য এলেই আমাকে খবর পাঠাতে দেরি করবে না; তবু থাকতে পারলুম না, বেহারাকে ডেকে বললুম, অমূল্যবাবুকে খবর দাও। বেহারা খানিকটা ঘুরে এসে বললে, অমূল্যবাবু নেই।

কথাটা কিছুই নয়, কিন্তু হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় করে উঠল। অমূল্যবাবু নেই—সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে এ কথাটা যেন কান্নার মতো বাজল। নেই, সে নেই! সে সূর্যাস্তের সোনার রেখাটির মতো দেখা দিলে, তার পরে আর সে নেই! সম্ভব-অসম্ভব কত দুর্ঘটনার কল্পনাই আমার মাথার মধ্যে জমে উঠতে লাগল। আমিই তাকে মৃত্যুর মধ্যে পাঠিয়েছি, সে যে কোনো ভয় করে নি সে তারই মহত্ত্ব, কিন্তু এর পরে আমি বেঁচে থাকব কেমন করে?

অমূল্যর কোনো চিহ্নই আমার কাছে ছিল না; কেবল ছিল তার সেই ভাইফোঁটার প্রণামী, সেই পিস্তলটি। মনে হল এর মধ্যে দৈবের ইঙ্গিত রয়েছে। আমার জীবনের মূলে যে কলঙ্ক লেগেছে, বালক-বেশে আমার নারায়ণ সেটি ঘুচিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে রেখে দিয়েই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কী ভালোবাসার দান! কী পাবনমন্ত্র তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন!

বাক্স খুলে পিস্তলটি বের করে দুই হাতে তুলে আমার মাথায় ঠেকালুম। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের ঠাকুরবাড়ি থেকে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম।

রাত্রে লোকজনদের পিঠে খাওয়ানো গেল। মেজোরানী এসে বললেন, নিজে নিজেই খুব ধুম করে জন্মতিথি করে নিলি যা হোক। আমাদের বুঝি কিছু করতে দিবি নে? এই বলে তিনি তাঁর সেই গ্রামোফোনটাতে যত রাজ্যের নটীদের মিহি চড়া সুরের দ্রুত তানের কসরত শোনাতে লাগলেন; মনে হতে লাগল যেন গন্ধর্বলোকের সুরওয়ালা ঘোড়ার আস্তাবল থেকে চিঁহি চিঁহি শব্দে হ্রেষাধ্বনি উঠছে।

খাওয়ানো শেষ করতে অনেক রাত হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল আজ রাতে আমার স্বামীর পায়ের ধুলো নেব। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। আজ সমস্ত দিন তাঁর অনেক ঘুরাঘুরি অনেক ভাবনা গিয়েছে। খুব সাবধানে মশারি একটুখানি খুলে তাঁর পায়ের কাছে আস্তে আস্তে মাথা রাখলুম। চুলের স্পর্শ লাগতেই ঘুমের ঘোরে তিনি তাঁর পা দিয়ে আমার মাথাটা একটু ঠেলে দিলেন।

পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে বসলুম। দূরে একটা শিমুল গাছ অন্ধকারে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে আছে; তার সমস্ত পাতা ঝরে গিয়েছে, তারই পিছনে সপ্তমীর চাঁদ ধীরে ধীরে অস্ত গেল।

আমার হঠাৎ মনে হল আকাশের সমস্ত তারা যেন আমাকে ভয় করছে, রাত্রিবেলাকার এই প্রকাণ্ড জগৎ আমার দিকে যেন আড়চোখে চাইছে। কেননা আমি যে একলা; একলা মানুষের মতো এমন সৃষ্টিছাড়া আর কিছুই নেই। যার সমস্ত আত্মীয়স্বজন একে একে মরে গিয়েছে সেও একলা নয়, মৃত্যুর আড়াল থেকেও সে সঙ্গ পায়। কিন্তু যার সমস্ত আপন মানুষ পাশেই রয়েছে, তবু কাছে নেই, যে মানুষ পরিপূর্ণ সংসারের সকল সঙ্গ থেকেই একেবারে খসে পড়ে গিয়েছে, মনে হয় যেন অন্ধকারে তার মুখের দিকে চাইলে সমস্ত নক্ষত্রলোকের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি যেখানে রয়েছি সেইখানেই নেই, যারা আমাকে ঘিরে রয়েছে আমি তাদের কাছে থেকেই দূরে। আমি চলছি, ফিরছি, বেঁচে আছি একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে যেন পদ্মপাতার উপরকার শিশির-বিন্দুর মতো।

কিন্তু মানুষ যখন বদলে যায় তখন তার আগাগোড়া সমস্ত বদল হয় না কেন। হৃদয়ের দিকে তাকালে দেখতে পাই যা ছিল তা সবই আছে, কেবল নড়ে-চড়ে গিয়েছে। যা সাজানো ছিল আজ তা এলোমেলো, যা কণ্ঠের হারে গাঁথা ছিল আজ তা ধুলোয়। সেইজন্যেই তো বুক ফেটে যাচ্ছে। ইচ্ছা করে মরি; কিন্তু সবই যে হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে আছে, মরার ভিতরে তো শেষ দেখতে পাচ্ছি নে। আমার মনে হচ্ছে যেন মরার মধ্যেও আরো ভয়ানক কান্না। যা-কিছু চুকিয়ে দেবার তা বাঁচার ভিতর দিয়েই চুকোতে পারি—অন্য উপায় নেই।

এবারকার মতো একবার আমাকে মাপ করো, হে আমার প্রভু। যা-কিছুকে তুমি আমার জীবনের ধন বলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে সে-সমস্তকেই আমি আমার জীবনের বোঝা করে তুলেছি। আজ তা আর বহনও করতে পারছি নে, ত্যাগ করতেও পারছি নে। আর-একদিন তুমি আমার ভোর-বেলাকার রাঙা আকাশের ধারে দাঁড়িয়ে যে বাঁশি বাজিয়েছিলে সেই বাঁশিটি বাজাও, সব সমস্যা সহজ হয়ে যাক; তোমার সেই বাঁশির সুরটি ছাড়া ভাঙাকে কেউ জুড়তে পারে না, অপবিত্রকে কেউ শুভ্র করতে পারে না। সেই বাঁশির সুরে আমার সংসারকে তুমি নতুন করে সৃষ্টি করো। নইলে আমি আর কোনো উপায় দেখি নে।

মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম; একটা কোনো দয়া কোথাও থেকে চাই, একটা কোনো আশ্রয়, একটু ক্ষমার আভাস, একটা এমন আশ্বাস যে সব চুকে যেতেও পারে। মনে মনে বললুম, আমি দিনরাত ধর্না দিয়ে পড়ে থাকব প্রভু, আমি খাব না, আমি জলস্পর্শ করব না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্বাদ এসে পৌঁছয়।

এমন সময় পায়ের শব্দ শুনলুম। আমার বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। কে বলে দেবতা দেখা দেন না! আমি মুখ তুলে চাইলুম না, পাছে আমার দৃষ্টি তিনি সইতে না পারেন। এসো, এসো, এসো—তোমার পা আমার মাথায় এসে ঠেকুক, আমার এই বুকের কাঁপনের উপর এসে দাঁড়াও, প্রভু—আমি এই মুহূর্তেই মরি!

আমার শিয়রের কাছে এসে বসলেন। কে। আমার স্বামী! আমার স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই দেবতারই সিংহাসন নড়ে উঠেছে যিনি আমার কান্না আর সইতে পারলেন না। মনে হল মূর্ছা যাব। তার পরে আমার শিরার বাঁধন যেন ছিঁড়ে ফেলে আমার বুকের বেদনা কান্নার জোয়ারে ভেসে বেরিয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তাঁর পা চেপে ধরলুম; ঐ পায়ের চিহ্ন চিরজীবনের মতো ঐখানে আঁকা হয়ে যায় না কি?

এইবার তো সব কথা খুলে বললেই হত। কিন্তু এর পরে কি আর কথা আছে? থাক্ গে আমার কথা।

তিনি আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। আশীর্বাদ পেয়েছি। কাল যে অপমান আমার জন্যে আসছে সেই অপমানের ডালি সকলের সামনে মাথায় তুলে নিয়ে আমার দেবতার পায়ে সরল হয়ে প্রণাম করতে পারব।

কিন্তু এই মনে করে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, আজ ন বছর আগে যে নহবত বেজেছিল সে

আর ইহজন্মে কোনো দিন বাজবে না। এ ঘরে আমাকে বরণ করে এনেছিল যে! ওগো, এই জগতে কোন্ দেবতার পায়ে মাথা কুটে মরলে সেই বউ চন্দন চেলি পরে সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে? কত দিন লাগবে আর, কত যুগ, কত যুগান্তর, সেই ন বছর আগেকার দিনটিতে আর-একটিবার ফিরে যেতে? দেবতা নতুন সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে?

নিখিলেশের আত্মকথা

আজ আমরা কলকাতায় যাব। সুখদুঃখ কেবলই জমিয়ে তুলতে থাকলে বোঝা ভারী হয়ে ওঠে। কেননা বসে থাকাটা মিথ্যে, সঞ্চয় করাটা মিথ্যে। আমি যে এই ঘরের কর্তা এটা বানানো জিনিস, সত্য এই যে আমি জীবনপথের পথিক। ঘরের কর্তাকে তাই বারেবারে ঘা লাগবে, তার পরে শেষ আঘাত আছে মৃত্যু। তোমার সঙ্গে আমার যে মিলন সে মিলন চলার মুখে; যতদূর পর্যন্ত এক পথে চলা গেল ততদূর পর্যন্তই ভালো, তার চেয়ে বেশি টানাটানি করতে গেলেই মিলন হবে বাঁধন। সে বাঁধন আজ রইল পড়ে; এবার বেরিয়ে পড়লুম, চলতে চলতে যেটুকু চোখে চোখে মেলে, হাতে হাতে ঠেকে সেইটুকুই ভালো। তার পরে? তার পরে আছে অনন্ত জগতের পথ, অসীম জীবনের বেগ—তুমি আমাকে কতটুকু বঞ্চনা করতে পারো প্রিয়ে? সামনে যে বাঁশি বাজছে কান দিয়ে যদি শুনি তো শুনতে পাই, বিচ্ছেদের সমস্ত ফাটলগুলোর ভিতর দিয়ে তার মাধুর্যের ঝর্না ঝরে পড়ছে। লক্ষ্মীর অমৃতভাণ্ডার ফুরোবে না বলেই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের পাত্র ভেঙে দিয়ে কাঁদিয়ে হাসেন। আমি ভাঙা পাত্র কুড়োতে যাব না, আমি আমার অতৃপ্তি বুকে নিয়েই সামনে চলে যাব।

মেজোরানীদিদি এসে বললেন, ঠাকুরপো, তোমার বইগুলো সব বাক্স ভরে গোরুর গাড়ি বোঝাই করে যে চলল তার মানে কী বলো তো।

আমি বললুম, তার মানে ঐ বইগুলোর উপর থেকে এখনো মায়া কাটাতে পারি নি।

মায়া কিছু থাকলেই যে বাঁচি। কিন্তু এখানে আর ফিরবে না নাকি?

আনাগোনা চলবে, কিন্তু পড়ে থাকা আর চলবে না।

সত্যি নাকি? তা হলে একবার এসো, একবার দেখো সে কত জিনিসের উপরে আমার মায়া।— এই বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন।

তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি ছোটোবড়ো নানা রকমের বাক্স আর পুঁটুলি। একটা বাক্স খুলে দেখালেন, এই দেখো ঠাকুরপো, আমার পান-সাজার সরঞ্জাম। কেয়াখয়ের গুঁড়িয়ে বোতলের মধ্যে পুরেছি; এই-সব দেখছ এক-এক-টিন মসলা। এই দেখো তাস, দশ-পঁচিশও ভুলি নি, তোমাদের না পাই আমি খেলবার লোক জুটিয়ে নেবই। এই চিরুনি তোমারই স্বদেশী চিরুনি, আর এই—

কিন্তু ব্যাপারটা কী মেজোরানী? এ-সব বাক্সয় তুলেছ কেন?

আমি যে তোমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছি।

সে কী কথা?

ভয় নেই ভাই, ভয় নেই, তোমার সঙ্গেও ভাব করতে যাব না, ছোটোরানীর সঙ্গেও ঝগড়া করব না। মরতেই তো হবে, তাই সময় থাকতে গঙ্গাতীরের দেশে আশ্রয় নেওয়া ভালো। ম'লে তোমাদের সেই নেড়া-বটতলায় পোড়াবে সে কথা মনে হলে আমার মরতে ঘেন্না ধরে, সেইজন্যেই তো এতদিন ধরে তোমাদের জ্বালাচ্ছি।

এতক্ষণ পরে আমার এই বাড়ি যেন কথা কয়ে উঠল। আমার বয়স যখন ছয় তখন ন বছর বয়সে মেজোরানী আমাদের এই বাড়িতে এসেছেন। এই বাড়ির ছাদে দুপুরবেলায় উঁচু পাঁচিলের কোণের

ছায়ায় বসে ওঁর সঙ্গে খেলা করেছি। বাগানে আমড়াগাছে চড়ে উপর থেকে কাঁচা আমড়া ফেলেছি, তিনি নীচে বসে সেগুলি কুচি-কুচি করে তার সঙ্গে নুন লঙ্কা ধনেশাক মিশিয়ে অপথ্য তৈরি করেছেন। পুতুলের বিবাহের ভোজ উপলক্ষে যে-সব উপকরণ ভাঁড়ার-ঘর থেকে গোপনে সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল তার ভার ছিল আমারই উপরে, কেননা ঠাকুরমার বিচারে আমার কোনো অপরাধের দণ্ড ছিল না। তার পরে যে-সব শৌখিন জিনিসের জন্যে দাদার 'পরে তাঁর আবদার ছিল সে আবদারের বাহক ছিলুম আমি; আমি দাদাকে বিরক্ত করে করে যেমন করে হোক কাজ উদ্ধার করে আনতুম। তার পরে মনে পড়ে, তখনকার দিনে জ্বর হলে কবিরাজের কঠোর শাসনে তিন দিন কেবল গরম জল আর এলাচদানা আমার পথ্য ছিল; মেজোরানী আমার দুঃখ সইতে পারতেন না, কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে খাবার এনে দিয়েছেন, এক-একদিন ধরা পড়ে তাঁকে ভর্ৎসনাও সইতে হয়েছে। তার পরে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের রঙ নিবিড় হয়ে উঠেছে; কত ঝগড়াও হয়েছে; বিষয়ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক ঈর্ষা সন্দেহ এবং বিরোধও এসে পড়েছে; আবার তার মাঝখানে বিমল এসে পড়ে কখনো কখনো এমন হয়েছে যে মনে হয়েছে, বিচ্ছেদ বুঝি আর জুড়বে না। কিন্তু তার পরে প্রমাণ হয়েছে, অন্তরের মিল সেই বাইরের ক্ষতের চেয়ে অনেক প্রবল। এমনি করে শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত একটি সত্য সম্বন্ধ দিনে দিনে অবিচ্ছিন্ন হয়ে জেগে উঠেছে; সেই সম্বন্ধের শাখাপ্রশাখা এই বৃহৎ বাড়ির সমস্ত ঘরে আঙিনায় বারান্দায় ছাদে বাগানে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে সমস্তকে অধিকার করে দাঁড়িয়েছে। যখন দেখলুম মেজোরানী তাঁর সমস্ত ছোটোখাটো জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্স বোঝাই করে আমাদের বাড়ির থেকে যাবার মুখ করে দাঁড়িয়েছেন, তখন এই চিরসম্বন্ধটির সমস্ত শিকড়গুলি পর্যন্ত আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠল। আমি বেশ বুঝতে পারলুম কেন মেজোরানী, যিনি ন বছর বয়স থেকে আর এ-পর্যন্ত কখনো একদিনের জন্যও এ বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাটান নি, তিনি তাঁর সমস্ত অভ্যাসের বাঁধন কেটে ফেলে অপরিচিতের মধ্যে ভেসে চললেন। অথচ সেই আসল কারণটির কথা মুখ ফুটে বলতেই চান না, অন্য কত রকমের তুচ্ছ ছুতো তোলেন। এই ভাগ্যকর্তৃক বঞ্চিতা পতিপুত্রহীনা নারী সংসারের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র সম্বন্ধকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত অমৃত দিয়ে পালন করেছেন, তার বেদনা যে কত গভীর সে আজ তাঁর এই ঘরময় ছড়াছড়ি বাক্স-পুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে যত স্পষ্ট করে বুঝলুম এমন আর কোনো দিন বুঝি নি। আমি বুঝেছি টাকাকড়ি-ঘরদুয়ারের ভাগ নিয়ে, ছোটোখাটো সামান্য সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে, বিমলের সঙ্গে আমার সঙ্গে তাঁর যে বার বার ঝগড়া হয়ে গেছে তার কারণ বৈষয়িকতা নয়; তার কারণ তাঁর জীবনের এই একটিমাত্র সম্বন্ধে তাঁর দাবি তিনি প্রবল করতে পারেন নি, বিমল কোথা থেকে হঠাৎ মাঝখানে এসে একে ম্লান করে দিয়েছে, এইখানে তিনি নড়তে-চড়তে ঘা পেয়েছেন, অথচ তাঁর নালিশ করবার জোর ছিল না। বিমলও এক রকম করে বুঝেছিল আমার উপর মেজোরানীর দাবি কেবল-মাত্র সামাজিকতার দাবি নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর; সেইজন্যে আমাদের এই আশৈশবের সম্পর্কটির 'পরে তার এতটা ঈর্ষা। আজ বুকের দরজাটার কাছে আমার হৃদয় ধক ধক করে ঘা দিতে লাগল। একটা তোরঙ্গের উপর বসে পড়লুম; বললুম, মেজোরানীদিদি, আমরা দুজনেই এই বাড়িতে যেদিন নতুন দেখা দিয়েছি সেইদিনের মধ্যে আর-একবার ফিরে যেতে বড়ো ইচ্ছে করে।

মেজোরানী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, না ভাই, মেয়ে জন্ম নিয়ে আর নয়! যা সয়েছি তা একটা জন্মের উপর দিয়েই যাক, ফের আর কি সয়?

আমি বলে উঠলুম, দুঃখের ভিতর দিয়ে যে মুক্তি আসে সেই মুক্তি দুঃখের চেয়ে বড়ো।

তিনি বললেন, তা হতে পারে, ঠাকুরপো, তোমরা পুরুষমানুষ, মুক্তি তোমাদের জন্যে। আমরা মেয়েরা বাঁধতে চাই, বাঁধা পড়তে চাই; আমাদের কাছ থেকে তোমরা সহজে ছাড়া পাবে না গো।

ডানা যদি মেলতে চাও আমাদের সুদ্ধু নিতে হবে, ফেলতে পারবে না। সেইজন্যেই তো এই-সব বোঝা সাজিয়ে রেখেছি। তোমাদের একেবারে হাল্কা হতে দিলে কি আর রক্ষা আছে!

আমি হেসে বললুম, তাই তো দেখছি; বোঝা বলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এই বোঝা বইবার মজুরি তোমরা পুষিয়ে দাও বলেই আমরা নালিশ করি নে।

মেজোরানী বললেন, আমাদের বোঝা হচ্ছে ছোটো জিনিসের বোঝা। যাকেই বাদ দিতে যাবে সেই বলবে 'আমি সামান্য, আমার ভার কতটুকুই বা', এমনি করে হালকা জিনিস দিয়েই আমরা তোমাদের মোট ভারী করি।—কখন বেরোতে হবে ঠাকুরপো?

রাত্তির সাড়ে এগারোটায়, সে এখনো ঢের সময় আছে।

দেখো ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটি, আমার একটি কথা রাখতে হবে, আজ সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে দুপুরবেলায় একটু ঘুমিয়ে নিয়ো; গাড়িতে রাত্তিরে তো ভালো ঘুম হবে না। তোমার শরীর এমন হয়েছে দেখলেই মনে হয়, আর-একটু হলেই ভেঙে পড়বে। চলো, এখনি তোমাকে নাইতে যেতে হবে।

এমন সময় ক্ষেমা মস্ত একটা ঘোমটা টেনে মৃদুস্বরে বললে, দারোগাবাবু কাকে সঙ্গে করে এনেছে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মেজোরানী রাগ করে উঠে বললেন, মহারাজ চোর না ডাকাত যে দারোগা তার সঙ্গে লেগেই রয়েছে। বলে আয় গে, মহারাজ এখন নাইতে গেছেন।

আমি বললুম, একবার দেখে আসি গে, হয়তো কোনো জরুরি কাজ আছে।

মেজোরানী বললেন, না, সে হবে না। ছোটোরানী কাল বিস্তর পিঠে তৈরি করেছে, দারোগাকে সেই পিঠে খেতে পাঠিয়ে তার মেজাজ ঠাণ্ডা করে রাখছি।

বলে তিনি আমাকে হাতে ধরে টেনে স্নানের ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমি ভিতর থেকে বললুম, আমার সাফ কাপড় যে এখনো—

তিনি বললেন, সে আমি ঠিক করে রাখব, ততক্ষণ তুমি স্নান করে নাও।

এই উৎপাতের শাসনকে অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই; সংসারে এ যে বড়ো দুর্লভ। থাক্ গে, দারোগাবাবু বসে বসে পিঠে খাক গে। নাহয় হল আমার কাজের অবহেলা।

ইতিমধ্যে সেই ডাকাতি নিয়ে দারোগা দু-পাঁচ জনকে ধরা-পাকড়া করছেই। রোজই একটা-না-একটা নিরীহ লোককে ধরে বেঁধে এনে আসর গরম করে রেখেছে। আজও বোধ হয় তেমনি কোন্-এক অভাগাকে পাকড়া করে এনেছে। কিন্তু পিঠে কি একলা দারোগাই খাবে? সে তো ঠিক নয়। দরজায় দমাদম ঘা লাগালুম।

মেজোরানী বাইরে থেকে বললেন, জল ঢালো, জল ঢালো, মাথা গরম হয়ে উঠেছে বুঝি?

আমি বললুম, পিঠে দুজনের মতো সাজিয়ে পাঠিয়ো; দারোগা যাকে চোর বলে ধরেছে পিঠে তারই প্রাপ্য, বেহারাকে বলে দিয়ো তার ভাগে যেন বেশি পড়ে।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্নান সেরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। দেখি দরজার বাইরে মাটির উপরে বিমল বসে। এ কি আমার সেই বিমল, সেই তেজে অভিমানে ভরা গরবিনী। কোন্ ভিক্ষা মনের মধ্যে নিয়ে এ আমার দরজাতেও বসে থাকে! আমি একটু থমকে দাঁড়াতেই সে উঠে মুখ একটু নিচু করে আমাকে বললে, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

আমি বললুম, তা হলে এসো আমাদের ঘরে।

কোনো বিশেষ কাজে কি তুমি বাইরে যাচ্ছ?

হাঁ, কিন্তু থাক্ সে কাজ, আগে তোমার সঙ্গে—

না, তুমি কাজ সেরে এসো, তার পরে তোমার খাওয়া হলে কথা হবে।

বাইরে গিয়ে দেখি দারোগার পাত্র শূন্য। সে যাকে ধরে এনেছে সে তখনো বসে বসে পিঠে খাচ্ছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, এ কী, অমূল্য যে!

সে এক-মুখ পিঠে নিয়ে বললে, আজ্ঞে হাঁ। পেট ভরে খেয়ে নিয়েছি, এখন কিছু যদি না মনে করেন তা হলে যে কটা বাকি আছে রুমালে বেঁধে নিই।

বলে পিঠেগুলো সব রুমালে বেঁধে নিলে।

আমি দারোগার দিকে চেয়ে বললুম, ব্যাপারখানা কী?

দারোগা হেসে বললে, মহারাজ, চোরের হেঁয়ালি তো হেঁয়ালিই রয়ে গেছে, তার উপরে চোরাই মালের হেঁয়ালি নিয়ে মাথা ঘোরাচ্ছি।

এই বলে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলে একতাড়া নোট সে আমার সামনে ধরলে। বললে, এই মহারাজের ছ হাজার টাকা।

কোথা থেকে বেরোল?

আপাতত অমূল্যবাবুর হাত থেকে। উনি কাল রাত্রে আপনার চকুয়া কাছারির নায়েবের কাছে গিয়ে বললেন, চোরাই নোট পাওয়া গেছে।—চুরি যেতে নায়েব এত ভয় পায় নি যেমন এই চোরাই মাল ফিরে পেয়ে। তার ভয় হল সবাই সন্দেহ করবে এ নোট সেই লুকিয়ে রেখেছিল, এখন বিপদের সম্ভাবনা দেখে একটা অসম্ভব গল্প বানিয়ে তুলেছে। সে অমূল্যবাবুকে খাওয়াবার ছল করে বসিয়ে রেখেই থানায় খবর দিয়েছে। আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েই ভোর থেকে ওঁকে নিয়ে পড়েছি। উনি বললেন, কোথা থেকে পেয়েছি সে আপনাকে বলব না। আমি বললুম, না বললে আপনি তো ছাড়া পাবেন না। উনি বলেন, মিথ্যে বলব। আমি বলি, আচ্ছা, তাই বলুন। উনি বলেন, ঝোপের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি। আমি বললুম, মিথ্যে কথা অত সহজ নয়। কোথায় ঝোপ, সেই ঝোপের মধ্যে আপনি কী দরকারে গিয়েছিলেন, সমস্ত বলা চাই। উনি বললেন, সে-সমস্ত বানিয়ে তোলবার আমি যথেষ্ট সময় পাব, সেজন্যে কিছু চিন্তা করবেন না।

আমি বললুম, হরিচরণবাবু, ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে মিছিমিছি টানাটানি করে কী হবে?

দারোগা বললেন, শুধু ভদ্রলোকের ছেলে নয়, উনি নিবারণ ঘোষালের ছেলে, তিনি আমার ক্লাস-ফ্রেন্ড ছিলেন। মহারাজ, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ব্যাপারখানা কী। অমূল্য জানতে পেরেছেন কে চুরি করেছে, এই বন্দেমাতরমের হুজুক উপলক্ষে তাকে উনি চেনেন। নিজের ঘাড়ে দায় নিয়ে তাকে উনি বাঁচাতে চান। এই-সব হচ্ছে ওঁর বীরত্ব।—বাবা, আমাদেরও বয়েস একদিন তোমাদেরই মতো ঐ আঠারো-উনিশ ছিল; পড়তুম রিপন কলেজে, একদিন স্ট্যান্ডে এক গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে পাহারাওয়ালার জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রায় জেলখানার সদর-দরজার দিকে ঝুঁকেছিলুম, দৈবাৎ ফসকে গেছে।—মহারাজ, এখন চোর ধরা-পড়া শক্ত হল, কিন্তু আমি বলে রাখছি কে এর মূলে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কে।

আপনার নায়েব তিনকড়ি দত্ত আর ঐ কাসেম সর্দার।

দারোগা তাঁর এই অনুমানের পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে যখন চলে গেলেন আমি অমূল্যকে বললুম, টাকাটা কে নিয়েছিল আমাকে যদি বল কারও কোনো ক্ষতি হবে না।

সে বললে, আমি।

কেমন করে? ওরা যে বলে ডাকাতের দল—

আমি একলা।

অমূল্য যা বললে সে অদ্ভুত। নায়েব রাত্রে আহার সেরে বাইরে বসে আঁচাচ্ছিল, সে জায়গাটা ছিল অন্ধকার। অমূল্যর দুই পকেটে দুই পিস্তল, একটাতে ফাঁকা টোটা আর একটাতে গুলি ভরা। ওর মুখের আধখানাতে ছিল কালো মুখোশ। হঠাৎ একটা বুল্‌স্‌-আই লণ্ঠনের আলো

নায়েবের মুখে ফেলে পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করতেই সে হাঁউমাউ শব্দ করে মূর্ছা গেল; দু-চারজন বরকন্দাজ ছুটে আসতেই তাদের মাথার উপর পিস্তলের আওয়াজ করে দিলে, তারা যে যেখানে পারলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। কাসেম সর্দার লাঠি হাতে ছুটে এল, তার পা লক্ষ্য করে গুলি মারতেই সে বসে পড়ল। তার পরে ঐ নায়েবকে দিয়ে লোহার সিন্দুক খুলিয়ে ছ হাজার টাকার নোটগুলো নিয়ে আমাদের কাছারির এক ঘোড়া মাইল পাঁচ-ছয় ছুটিয়ে সেই ঘোড়াটাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে পরদিন সকালে আমার এখানে এসে পৌঁচেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, এ কাজ কেন করতে গেলে?

সে বললে, আমার বিশেষ দরকার ছিল।

তবে আবার ফিরিয়ে দিলে কেন।

যাঁর হুকুমে ফিরিয়ে দিলুম তাঁকে ডাকুন, তাঁর সামনে আমি বলব।

তিনি কে?

ছোটোরানীদিদি।

বিমলকে ডেকে পাঠালুম। সে একখানি সাদা শাল মাথার উপর দিয়ে ফিরিয়ে গা ঢেকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুকল; পায়ে জুতোও ছিল না। দেখে আমার মনে হল বিমলকে এমন যেন আর কখনো দেখি নি; সকালবেলাকার চাঁদের মতো ও যেন আপনাকে প্রভাতের আলো দিয়ে ঢেকে এনেছে!

অমূল্য বিমলের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার আদেশ পালন করে এসেছি দিদি। টাকা ফিরিয়ে দিয়েছি।

বিমল বললে, বাঁচিয়েছ ভাই।

অমূল্য বললে, তোমাকে স্মরণ করেই একটি মিথ্যা কথাও বলি নি। আমার বন্দেমাতরং মন্ত্র রইল তোমার পায়ের তলায়। ফিরে এসে এই বাড়িতে ঢুকেই তোমার প্রসাদও পেয়েছি।

বিমলা এ কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। অমূল্য পকেট থেকে রুমাল বের করে তার গ্রন্থি খুলে সঞ্চিত পিঠেগুলি দেখালে। বললে, সব খাই নি, কিছু রেখেছি—তুমি নিজের হাতে আমার পাতে তুলে দিয়ে খাওয়াবে বলে এইগুলি জমানো আছে।

আমি বুঝলুম, এখানে আমার আর দরকার নেই; ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। মনে ভাবলুম, আমি তো কেবল বকে বকেই মরি, আর ওরা আমার কুশপুত্তলির গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা পরিয়ে নদীর ধারে দাহ করে। কাউকে তো মরার পথ থেকে ফেরাতে পারি নে, যে পারে সে ইঙ্গিতেই পারে। আমাদের বাণীতে সেই অমোঘ ইঙ্গিত নেই। আমরা শিখা নই, আমরা অঙ্গার; আমরা নিবোনো; আমরা দীপ জ্বালাতে পারব না। আমার জীবনের ইতিহাসে সেই কথাটাই প্রমাণ হল, আমার সাজানো বাতি জ্বলল না।

আবার আস্তে আস্তে অন্তঃপুরে গেলুম। বোধ হয় আর-একবার মেজোরানীর ঘরের দিকে আমার মনটা ছুটল। আমার জীবনও এ সংসারে কোনো একটা জীবনের বীণায় সত্য এবং স্পষ্ট আঘাত দিয়েছে এটা অনুভব করা আজ আমার যে বড়ো দরকার; নিজের অস্তিত্বের পরিচয় তো নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না, বাইরে আর-কোথাও যে তার খোঁজ করতে হয়।

মেজোরানীর ঘরের সামনে আসতেই তিনি বেরিয়ে এসে বললেন, এই-যে ঠাকুরপো, আমি বলি বুঝি তোমার আজও দেরি হয়। আর দেরি নেই, তোমার খাবার তৈরি রয়েছে, এখনই আসছে।

আমি বললুম, ততক্ষণ সেই টাকাটা বের করে ঠিক করে রাখি।

আমার শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে মেজোরানী জিজ্ঞাসা করলেন, দারোগা যে এল, সেই চুরির কোনো আশকারা হল না কি?

সেই ছ হাজার টাকা ফিরে পাবার ব্যাপারটা মেজোরানীর কাছে আমার বলতে ইচ্ছে হল না। আমি বললুম, সেই নিয়েই তো চলছে।

লোহার সিন্দুকের ঘরে গিয়ে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দেখি সিন্দুকের চাবিটাই নেই। অদ্ভুত আমার অন্যমনস্কতা! এই চাবির রিং নিয়ে আজ সকাল থেকে কতবার কত বাক্স খুলেছি, আলমারি খুলেছি, কিন্তু একবারও লক্ষ্যই করি নি যে, সে চাবিটা নেই।

মেজোরানী বললেন, চাবি কই?

আমি তার জবাব না করে এ পকেট ও পকেট নাড়া দিলুম, দশবার করে সমস্ত জিনিসপত্র হাঁটকে খোঁজাখুঁজি করলুম। আমাদের বোঝবার বাকি রইল না যে, চাবি হারায় নি, কেউ একজন রিং থেকে খুলে নিয়েছে। কে নিতে পারে? এ ঘরে তো--

মেজোরানী বললেন, ব্যস্ত হোয়ো না, আগে তুমি খেয়ে নাও। আমার বিশ্বাস, তুমি অসাবধান বলেই ছোটোরানী ঐ চাবিটা বিশেষ করে তার বাক্সে তুলে রেখেছে।

আমার ভারি গোলমাল ঠেকতে লাগল। আমাকে না জানিয়ে বিমল রিং থেকে চাবি বের করে নেবে, এ তার স্বভাব নয়। আমার খাবার সময় আজ বিমল ছিল না; সে তখন রান্নাঘর থেকে ভাত আনিয়ে অমূল্যকে নিজে বসে খাওয়াচ্ছিল। মেজোরানী তাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলেন, আমি বারণ করলুম।

খেয়ে উঠেছি এমন সময় বিমল এল। আমার ইচ্ছা ছিল মেজোরানীর সামনে এই চাবি-হারানোর কথাটার আলোচনা না হয়। কিন্তু সে আর ঘটল না। বিমল আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুরপোর লোহার সিন্দুকের চাবি কোথায় আছে জানিস?

বিমল বললে, আমার কাছে।

মেজোরানী বললেন, আমি তো বলেছিলুম। চারি দিকে চুরিডাকাতি হচ্ছে, ছোটোরানী বাইরে দেখাত ওর ভয় নেই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সাবধান হতে ছাড়ে নি।

বিমলার মুখ দেখে মনে কেমন একটা খটকা লাগল; বললুম, আচ্ছা, চাবি এখন তোমার কাছেই থাক্, বিকেলে টাকাটা বের করে নেব।

মেজোরানী বলে উঠলেন, আবার বিকেলে কেন ঠাকুরপো, এইবেলা ওটা বের করে নিয়ে খাজাঞ্চির কাছে পাঠিয়ে দাও।

বিমল বললে, টাকাটা আমি বের করে নিয়েছি।

চমকে উঠলুম।

মেজোরানী জিজ্ঞাসা করলেন, বের করে নিয়ে রাখলি কোথায়?

বিমল বললে, খরচ করে ফেলেছি।

মেজোরানী বললেন, ওমা, শোনো একবার! এত টাকা খরচ করলি কিসে?

বিমল তার কোনো উত্তর করলে না। আমিও তাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলুম না; দরজা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেজোরানী বিমলকে কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন; আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, বেশ করেছে নিয়েছে। আমার স্বামীর পকেটে বাক্সে যা-কিছু টাকা থাকত সব আমি চুরি করে লুকিয়ে রাখতুম; জানতুম সে টাকা পাঁচ ভূতে লুটে খাবে। ঠাকুরপো, তোমারও প্রায় সেই দশা; কত খেয়ালেই যে টাকা ওড়াতে জান। তোমাদের টাকা যদি আমরা চুরি করি তবেই সে টাকা রক্ষা পাবে। এখন চলো, একটু শোবে চলো।

মেজোরানী আমাকে শোবার ঘরে ধরে নিয়ে গেলেন, আমি কোথায় চলেছি আমার মনেও ছিল না। তিনি আমার বিছানার পাশে বসে প্রফুল্লমুখে বললেন, ওলো ও ছুটু, একটা পান দে তো ভাই। তোরা যে একেবারে বিবি হয়ে উঠলি। পান নেই ঘরে? নাহয় আমার ঘর থেকেই আনিয়ে দে-না।

আমি বললুম, মেজোরানী, তোমার তো এখনো খাওয়া হয় নি।

তিনি বললেন, কোন্ কালে।

এটা একেবারে মিথ্যে কথা। তিনি আমার পাশে বসে যা-তা বকতে লাগলেন, কত রাজ্যের কত বাজে কথা। দাসী এসে দরজার বাইরে থেকে খবর দিলে বিমলের ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। বিমল কোনো সাড়া দিলে না। মেজোরানী বললেন, ও কী, এখনো তোর খাওয়া হয় নি বুঝি? বেলা যে ঢের হল।

এই বলে জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেলেন।

সেই ছ হাজার টাকার ডাকাতির সঙ্গে এই লোহার সিন্দুকের টাকা বের করে নেওয়ার যে যোগ আছে তা বুঝতে পারলুম। কিরকমের যোগ সে কথা জানতেও ইচ্ছা করল না; কোনোদিন সে প্রশ্নও করব না।

বিধাতা আমাদের জীবন-ছবির দাগ একটু ঝাপসা করেই টেনে দেন; আমরা নিজের হাতে সেটাকে কিছু কিছু বদলে মুছে পুরিয়ে দিয়ে নিজের মনের মতো একটা স্পষ্ট চেহারা ফুটিয়ে তুলব এই তাঁর অভিপ্রায়। সৃষ্টিকর্তার ইশারা নিয়ে নিজের জীবনটাকে নিজে সৃষ্টি করে তুলব, একটা বড়ো আইডিয়াকে আমার সমস্তর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে দেখাব, এই বেদনা বরাবর আমার মনে আছে।

এই সাধনাতে এতদিন কাটিয়েছি। প্রবৃত্তিকে কত বঞ্চিত করেছি, নিজেকে কত দমন করেছি, সেই অন্তরের ইতিহাস অন্তর্যামীই জানেন। শক্ত কথা এই যে কারও জীবন একলার জিনিস নয়; সৃষ্টি যে করবে সে নিজের চার দিককে নিয়ে যদি সৃষ্টি না করে তবে ব্যর্থ হবে। মনের মধ্যে তাই একান্ত একটা প্রয়াস ছিল যে বিমলকেও এই রচনার মধ্যে টানব। সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাকে ভালো যখন বাসি তখন কেন পারব না, এই ছিল আমার জোর।

এমন সময় স্পষ্ট দেখতে পেলুম নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চারি দিককে যারা সহজেই সৃষ্টি করতে পারে তারা এক জাতের মানুষ, আমি সে জাতের না। আমি মন্ত্র নিয়েছি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারি নি। যাদের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছি তারা আমার আর-সবই নিয়েছে, কেবল আমার এই অন্তরতম জিনিসটি ছাড়া। আমার পরীক্ষা কঠিন হল। সব চেয়ে যেখানে সহায় চাই সব চেয়ে সেখানেই একলা হলুম। এই পরীক্ষাতেও জিতব এই আমার পণ রইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার দুর্গম পথ আমার একলারই পথ।

আজ সন্দেহ হচ্ছে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁত করে ঢালাই করব আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা তো ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে করে গড়ে তুলতে গেলেই মরে গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয়।

এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাত হয়ে গেছি তা জানতেই পারি নি। বিমল নিজে যা হতে পারত তা আমার চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারে নি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ ক্ষইয়ে ফেলেছে। এই ছ হাজার টাকা আজ ওকে চুরি করে নিতে হয়েছে; আমার সঙ্গে ও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারে নি, কেননা ও বুঝেছে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলরূপে পৃথক। আমাদের মতো একরোখা আইডিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে তারা মেলে, যারা মেলে না তারা আমাদের ঠকায়। সরল মানুষকেও আমরা কপট করে তুলি। আমরা সহধর্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।

আবার কি সেই গোড়ায় ফেরা যায় না? তা হলে একবার সহজের রাস্তায় চলি। আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোনো আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে চাইব না; কেবল আমার ভালোবাসার বাঁশি বাজিয়ে বলব, তুমি আমাকে ভালোবাসো, সেই ভালোবাসার আলোতে তুমি যা তারই পূর্ণ

বিকাশ হোক, আমার ফর্মাশ একেবারে চাপা পড়ুক, তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছা আছে তারই জয় হোক—আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক।

কিন্তু আমাদের মধ্যেকার যে বিচ্ছেদটা ভিতরে ভিতরে জমছিল সেটা আজ এমনতরো একটা ক্ষতর মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে যে, আর কি তার উপর স্বভাবের শুশ্রূষা কাজ করতে পারবে? যে আব্রুর আড়ালে প্রকৃতি আপনার সংশোধনের কাজ নিঃশব্দে করে সেই আব্রু যে একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল। ক্ষতকে ঢাকা দিতে হয়, এই ক্ষতকে আমার ভালোবাসা দিয়ে ঢাকব; বেদনাকে আমার হৃদয় দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে বাইরের স্পর্শ থেকে আড়াল করে রাখব; একদিন এমন হবে যে এই ক্ষতর চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না। কিন্তু, আর কি সময় আছে? এতদিন গেল ভুল বুঝতে, আজকের দিন এল ভুল ভাঙতে, কতদিন লাগবে ভুল শোধরাতে! তার পরে? তার পরে ক্ষত শুকোতেও পারে, কিন্তু ক্ষতিপূরণ কি আর কোনো কালে হবে?

একটা কী খট্ করে উঠল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, বিমল দরজার কাছ থেকে ফিরে যাচ্ছে। বোধ হয় দরজার পাশে এসে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, ঘরে ঢুকবে কি না-ঢুকবে ভেবে পাচ্ছিল না, শেষে ফিরে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ডাকলুম, বিমল! সে থমকে দাঁড়াল, তার পিঠ ছিল আমার দিকে। আমি তাকে হাতে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলুম।

ঘরে এসেই মেঝের উপর পড়ে মুখের উপর একটা বালিশ আঁকড়ে ধরে তার কান্না। আমি একটি কথা না বলে তার হাত ধরে মাথার কাছে বসে রইলুম।

কান্নার বেগ থেমে গিয়ে উঠে বসতেই, আমি তাকে আমার বুকের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলুম। সে একটু জোর করে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর বার বার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল। আমি পা সরিয়ে নিতেই সে দুই হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে গদ্‌গদ স্বরে বললে, না না না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না, আমাকে পুজো করতে দাও।

আমি তখন চুপ করে রইলুম। এ পুজোয় বাধা দেবার আমি কে! যে পুজো সত্য সে পুজোর দেবতাও সত্য—সে দেবতা কি আমি যে আমি সংকোচ করব?

বিমলার আত্মকথা

চলো, চলো, এইবার বেরিয়ে পড়ো সকল ভালোবাসা যেখানে পুজোর সমুদ্রে মিশেছে সেই সাগর-সংগমে। সেই নির্মল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পঙ্কের ভার মিলিয়ে যাবে। আর আমি ভয় করি নে, আপনাকেও না, আর-কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি; যা পোড়বার ত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন।

আজ রাত্রে কলকাতায় যেতে হবে। এতক্ষণ অন্তর-বাহিরের নানা গোলমালে জিনিসপত্র গোছাবার কাজে মন দিতে পারি নি। এইবার বাক্সগুলো টেনে নিয়ে গোছাতে বসলুম। খানিক বাদে দেখি আমার স্বামীও আমার পাশে এসে জুটলেন। আমি বললুম, না, ও হবে না। তুমি যে একটু ঘুমিয়ে নেবে আমাকে কথা দিয়েছ।

আমার স্বামী বললেন, আমিই যেন কথা দিয়েছি, কিন্তু আমার ঘুম তো কথা দেয় নি, তার যে দেখা নেই।

আমি বললুম, না, সে হবে না, তুমি শুতে যাও।

তিনি বললেন, তুমি একলা পারবে কেন।

খুব পারব।

আমি না হলেও তোমার চলে এ জাঁক তুমি করতে চাও করো, কিন্তু তুমি না হলে আমার চলে না। তাই একলা-ঘরে কিছুতেই আমার ঘুম এল না।

এই বলে তিনি কাজে লেগে গেলেন। এমন সময় বেহারা এসে জানালে, সন্দীপবাবু এসেছেন, তিনি খবর দিতে বললেন।

খবর কাকে দিতে বললেন সে কথা জিজ্ঞাসা করবার জোর ছিল না। আমার কাছে এক মুহূর্তে আকাশের আলোটা যেন লজ্জাবতী লতার মতো সংকুচিত হয়ে গেল।

আমার স্বামী বললেন, চলো বিমল, শুনে আসি সন্দীপ কী বলে। ও তো বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল, আবার যখন ফিরে এসেছে তখন বোধ হয় বিশেষ কোনো কথা আছে।

যাওয়ার চেয়ে না-যাওয়াটাই বেশি লজ্জা বলে স্বামীর সঙ্গে বাইরে গেলুম। বৈঠকখানার ঘরে সন্দীপ দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো ছবি দেখছিল। আমরা যেতেই বলে উঠল, তোমরা ভাবছ লোকটা ফেরে কেন। সৎকার সম্পূর্ণ শেষ না হলে প্রেত বিদায় হয় না।

এই বলে চাদরের ভিতর থেকে সে একটা রুমালের পুঁটলি বের করে টেবিলের উপরে খুলে ধরলে। সেই গিনিগুলো। বললে, নিখিল, ভুল কোরো না, ভেবো না হঠাৎ তোমাদের সংসর্গে পড়ে সাধু হয়ে উঠেছি। অনুতাপের অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে এই ছ হাজার টাকার গিনি ফিরিয়ে দেবার মতো ছিঁচকাঁদুনে সন্দীপ নয়। কিন্তু—

এই বলে সন্দীপ কথাটা আর শেষ করলে না। একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে চেয়ে বললে, মক্ষীরানী, এতদিন পরে সন্দীপের নির্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেছে। রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেছি সে নিতান্ত ফাঁকি নয়, তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই। সেই আমার সর্বনাশিনী কিন্তুর হাতে দিয়ে গেলুম আমার পুজো। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখলুম পৃথিবীতে কেবলমাত্র তারই ধন আমি নিতে পারব না—তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব দেবী! এই নাও!

বলে সেই গয়নার বাক্সটিও বের করে টেবিলের উপর রেখে সন্দীপ দ্রুত চলে যাবার উপক্রম করলে। আমার স্বামী তাকে ডেকে বললেন, শুনে যাও, সন্দীপ।

সন্দীপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, আমার সময় নেই নিখিল। খবর পেয়েছি মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মতো লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে রাখবার মতলব করেছে। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার দরকার। উত্তরের গাড়ি ছাড়তে আর পঁচিশ মিনিট মাত্র আছে। অতএব এখনকার মতো চললুম; তার পরে আবার একটু অবকাশ পেলে তোমাদের সঙ্গে বাকি সমস্ত কথা চুকিয়ে দেব। যদি আমার পরামর্শ নাও, তুমিও বেশি দেরি কোরো না। মক্ষীরানী, বন্দে প্রলয়-রূপিণীং হৃৎপিণ্ডমালিনীং!

এই বলে সন্দীপ প্রায় ছুটে চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। গিনি আর গয়নাগুলো যে কত তুচ্ছ সে আর-কোনোদিন এমন করে দেখতে পাই নি। কত জিনিস সঙ্গে নেব, কোথায় কী ধরাব, এই কিছু আগে তাই ভাবছিলুম, এখন মনে হল কোনো জিনিসই নেবার দরকার নেই—কেবল বেরিয়ে চলে যাওয়াটাই দরকার।

আমার স্বামী চৌকি থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বললেন, আর তো বেশি সময় নেই, এখন কাজগুলো সেরে নেওয়া যাক।

এমন সময় চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সংকুচিত হলেন; বললেন, মাপ কোরো মা, খবর দিয়ে আসতে পারি নি। নিখিল, মুসলমানের দল ক্ষেপে উঠেছে। হরিশ কুণ্ডুর কাছারি লুঠ হয়ে গেছে। সেজন্যে ভয় ছিল না, কিন্তু মেয়েদের উপর তারা যে অত্যাচার আরম্ভ করেছে সে তো প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায় না।

আমার স্বামী বললেন, আমি তবে চললুম।

আমি তাঁর হাত ধরে বললুম, তুমি গিয়ে কী করতে পারবে? মাস্টারমশায়, আপনি ওঁকে বারণ করুন।

চন্দ্রনাথবাবু বললেন, মা, বারণ করবার তো সময় নেই।

আমার স্বামী বললেন, কিছু ভেবো না বিমল।

জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম, তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। হাতে তাঁর কোনো অস্ত্রও ছিল না।

একটু পরেই মেজোরানী ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকেই বললেন, করলি কী ছুটু, কী সর্বনাশ করলি? ঠাকুরপোকে যেতে দিলি কেন।

বেহারাকে বললেন, ডাক্ ডাক্, শিগগির দেওয়ানবাবুকে ডেকে আন্।

দেওয়ানবাবুর সামনে মেজোরানী কোনো দিন বেরোন নি। সেদিন তাঁর লজ্জা ছিল না। বললেন, মহারাজকে ফিরিয়ে আনতে শিগগির সওয়ার পাঠাও।

দেওয়ানবাবু বললেন, আমরা অনেক মানা করেছি, তিনি ফিরবেন না।

মেজোরানী বললেন, তাঁকে বলে পাঠাও, মেজোরানীর ওলাউঠো হয়েছে, তাঁর মরণকাল আসন্ন।

দেওয়ান চলে গেলে মেজোরানী আমাকে গাল দিতে লাগলেন, রাক্ষুসী, সর্বনাশী! নিজে মরলি নে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি!

দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানলার সামনে পশ্চিম-দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত শজনে-গাছটার পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সেই সূর্যাস্তের প্রত্যেক রেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। অস্তমান সূর্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুই ভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল, একটা প্রকাণ্ড পাখির ডানা মেলার মতো—তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে-থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল আজকের দিনটা যেন হুহু করে উড়ে চলেছে রাত্রের সমুদ্র পার হবার জন্যে।

অন্ধকার হয়ে এল। দূর গ্রামে আগুন লাগলে থেকে থেকে যেমন তার শিখা আকাশে লাফিয়ে উঠতে থাকে তেমনি বহু দূর থেকে এক-একবার এক-একটা কলরবের ঢেউ অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন ফেঁপে উঠতে লাগল।

ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠল। আমি জানি মেজোরানী সেই ঘরে গিয়ে জোড়হাত করে বসে আছেন। আমি এই রাস্তার ধারের জানলা ছেড়ে এক পা কোথাও নড়তে পারলুম না। সামনেকার রাস্তা, গ্রাম, আরো দূরেকার শস্যশূন্য মাঠ এবং তারও শেষ প্রান্তে গাছের রেখা ঝাপসা হয়ে এল। রাজবাড়ির বড়ো দিঘিটা অন্ধের চোখের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকের ফটকের উপরকার নবতখানাটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী-যেন একটা দেখতে পাচ্ছে।

রাত্রিবেলাকার শব্দ যে কত রকমের ছদ্মবেশ ধরে তার ঠিকানা নেই। কাছে কোথায় একটা ডাল নড়ে, মনে হয় দূরে যেন কে ছুটে পালাচ্ছে। হঠাৎ বাতাসে একটা দরজা পড়ল, মনে হল সেটা যেন সমস্ত আকাশের বুক ধড়াস করে ওঠার শব্দ।

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারের কালো গাছের সারের নীচে দিয়ে আলো দেখতে পাই, তার পরে আর দেখতে পাই নে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনি, তার পরে দেখি ঘোড়সোয়ার রাজবাড়ির গেট থেকেই বেরিয়ে ছুটে চলছে।

কেবলই মনে হতে লাগল, আমি মরলেই সব বিপদ কেটে যাবে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি সংসারকে আমার পাপ নানা দিক থেকে মারতে থাকবে। মনে পড়ল সেই পিস্তলটা বাক্সের মধ্যে আছে। কিন্তু এই পথের ধারের জানলা ছেড়ে পিস্তল নিতে যেতে পা সরল না, আমি যে আমার ভাগ্যের প্রতীক্ষা করছি।

রাজবাড়ির দেউড়ির ঘণ্টায় ঢং ঢং করে দশটা বাজল।

তার খানিক পরে দেখি রাস্তায় অনেকগুলি আলো, অনেক ভিড়। অন্ধকারে সমস্ত জনতা এক হয়ে জুড়ে গিয়ে মনে হল একটা প্রকাণ্ড কালো অজগর এঁকেবেঁকে রাজবাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকতে আসছে।

দেওয়ানজি দূরে লোকের শব্দ শুনে গেটের কাছে ছুটে গেলেন। সেই সময় একজন সওয়ার এসে পৌঁছতেই দেওয়ানজি ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, জটাধর, খবর কী?

সে বললে, খবর ভালো নয়।

প্রত্যেক কথা উপর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলুম।

তার পরে কী চুপিচুপি বললে, শোনা গেল না।

তার পরে একটা পাল্কি আর তারই পিছনে একটা ডুলি ফটকের মধ্যে ঢুকল। পাল্কির পাশে পাশে মথুর ডাক্তার আসছিলেন। দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবু কী মনে করেন?

ডাক্তার বললেন, কিছু বলা যায় না। মাথায় বিষম চোট লেগেছে।

আর অমূল্যবাবু?

তাঁর বুকে গুলি লেগেছিল, তাঁর হয়ে গেছে।

চতুরঙ্গ

প্রকাশ : ১৯১৬

১৯১৬ সালে চতুরঙ্গ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে সবুজপত্রে মুদ্রিত যে অংশগুলি বর্জিত হয় ১৩৪১ সংস্করণে "চতুরঙ্গের পরিশিষ্ট"রূপে সেগুলি সংকলিত। বস্তুত 'পরিত্যক্ত' বলে চিহ্নিত রচনাংশগুলির মধ্যে 'দামিনী' অংশের ৩ সংখ্যক অধ্যায়ের পৃষ্ঠা ১৫৭, ছত্র ৪-১২ প্রথম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থের পরিশিষ্টে বর্জিতাংশগুলি সংযোজিত হল।

এই বইখানির নাম চতুরঙ্গ।
'জ্যাঠামশায়' 'শচীশ' 'দামিনী' ও
'শ্রীবিলাস' ইহার চারি অংশ।

জ্যাঠামশায়

আমি পাড়াগাঁ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কালেজে প্রবেশ করিলাম। শচীশ তখন বি. এ. ক্লাসে পড়িতেছে। আমাদের বয়স প্রায় সমান হইবে।

শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম; তাই একমুহূর্তে তাহাকে ভালোবাসিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শচীশের সঙ্গে যারা পড়ে তাদের অনেকেরই তার উপরে একটা বিষম বিদ্বেষ। আসল কথা, যাহারা দশের মতো, বিনা কারণে দশের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে না। কিন্তু মানুষের ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় তখন অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে পূজা করে আবার অকারণে কেহ-বা তাহাকে প্রাণপণে অপমান করিয়া থাকে।

আমার মেসের ছেলেরা বুঝিয়াছিল, আমি শচীশকে মনে মনে ভক্তি করি। এটাতে সর্বদাই তাহাদের যেন আরামের ব্যাঘাত করিত। তাই আমাকে শুনাইয়া শচীশের সম্বন্ধে কটু কথা বলিতে তাহাদের একদিনও কামাই যাইত না। আমি জানিতাম, চোখে বালি পড়িলে রগড়াইতে গেলেই বাজে বেশি; কথাগুলো যেখানে কর্কশ সেখানে জবাব না করাই ভালো। কিন্তু একদিন শচীশের চরিত্রের উপর লক্ষ করিয়া এমন-সব কুৎসা উঠিল, আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আমার মুশকিল, আমি শচীশকে জানিতাম না। অপর পক্ষে কেহ-বা তার পাড়াপড়শি, কেহ-বা তার কোনো-একটা সম্পর্কে কিছু-একটা। তারা খুব তেজের সঙ্গে বলিল, এ একেবারে খাঁটি সত্য; আমি আরও তেজের সঙ্গে বলিলাম, আমি এর সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না। তখন মেসসুদ্ধ সকলে আস্তিন গুটাইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি তো ভারি অভদ্র লোক হে!

সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া আমার কান্না আসিল। পরদিন ক্লাসের একটা ফাঁকে শচীশ যখন গোলদিঘির ছায়ায় ঘাসের উপর আধ-শোওয়া অবস্থায় একটা বই পড়িতেছে আমি বিনা পরিচয়ে তার কাছে আবোল-তাবোল কী যে বকিলাম তার ঠিক নাই। শচীশ বই মুড়িয়া আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তার চোখ যারা দেখে নাই তারা বুঝিবে না এই দৃষ্টি যে কী।

শচীশ বলিল, যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালোবাসে বলিয়া নয়। তাই যদি হইল, তবে কোনো একটা নিন্দা যে সত্য নয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ছটফট করিয়া লাভ কী?

আমি বলিলাম, তবু দেখুন, মিথ্যাবাদীকে—

শচীশ বাধা দিয়া বলিল, ওরা তো মিথ্যাবাদী নয়। আমাদের পাড়ায় পক্ষাঘাতে একজন কলুর ছেলের গা-হাত কাঁপে, সে কাজ করিতে পারে না। শীতের দিনে আমি তাকে একটা দামি কম্বল দিয়াছিলাম। সেইদিন আমার চাকর শিবু রাগে গরগর করিতে করিতে আসিয়া বলিল, বাবু, ও বেটার কাঁপুনি-টাঁপুনি সমস্ত বদমায়েশি!—আমার মধ্যে কিছু ভালো আছে এ কথা যারা উড়াইয়া দেয় তাদের সেই শিবুর দশা। তারা যা বলে তা সত্যই বিশ্বাস করে। আমার ভাগ্যে একটা কোনো দামি কম্বল অতিরিক্ত জুটিয়াছিল, রাজ্যসুদ্ধ শিবুর দল নিশ্চয় স্থির করিয়াছে, সেটাতে আমার অধিকার নাই—আমি তা লইয়া তাদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে লজ্জা বোধ করি।

ইহার কোনো উত্তরে না দিয়া আমি বলিয়া উঠিলাম, এরা যে বলে আপনি নাস্তিক, সে কি সত্য?

শচীশ বলিল, হাঁ, আমি নাস্তিক।

আমার মাথা নিচু হইয়া গেল। আমি মেসের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিলাম যে, শচীশ কখনোই নাস্তিক হইতে পারে না।

শচীশ সম্বন্ধে গোড়াতেই আমি দুইটা মস্ত ঘা খাইয়াছি। আমি তাহাকে দেখিয়াই মনে করিয়াছিলাম সে ব্রাহ্মণের ছেলে। মুখখানি যে দেবমূর্তির মতো সাদা-পাথরে কোঁদা। তার উপাধি শুনিয়াছিলাম মল্লিক; আমাদেরও গাঁয়ে মল্লিক-উপাধিধারী এক ঘর কুলীন ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু জানিয়াছি, শচীশ সোনার বেনে। আমাদের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর—জাতি হিসাবে সোনার বেনেকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করিয়া থাকি। আর নাস্তিককে নরঘাতকের চেয়ে, এমন-কি গো-খাদকের চেয়েও পাপিষ্ঠ বলিয়া জানিতাম।

কোনো কথা না বলিয়া শচীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখনও দেখিলাম মুখে সেই জ্যোতি, যেন অন্তরের মধ্যে পূজার প্রদীপ জ্বলিতেছে।

কেহ কোনোদিন মনে করিতে পারিত না আমি কোনো জন্মে সোনার বেনের সঙ্গে একসঙ্গে আহার করিব এবং নাস্তিক্যে আমার গোঁড়ামি আমার গুরুকে ছাড়াইয়া উঠিবে। ক্রমে আমার ভাগ্যে তাও ঘটিল।

উইল্‌কিন্‌স্‌ আমাদের কালেজের সাহিত্যের অধ্যাপক। যেমন তাঁর পাণ্ডিত্য, ছাত্রদের প্রতি তেমনি তাঁর অবজ্ঞা। এদেশী কালেজে বাঙালি ছেলেকে সাহিত্য পড়ানো শিক্ষকতার কুলিমজুরি করা, ইহাই তাঁর ধারণা। এইজন্য মিলটন-শেক্‌স্‌পীয়র পড়াইবার ক্লাসেও তিনি ইংরেজি বিড়াল শব্দের প্রতিশব্দ বলিয়া দিতেন মার্জারজাতীয় চতুষ্পদ, a quadruped of feline species। কিন্তু নোট লওয়া সম্বন্ধে শচীশের মাপ ছিল। তিনি বলিতেন, শচীশ, তোমাকে এই ক্লাসে বসিতে হয় সে লোকসান আমি পূরণ করিয়া দিব, তুমি আমার বাড়ি যাইয়ো, সেখানে তোমার মুখের স্বাদ ফিরাইতে পারিবে।

ছাত্রেরা রাগ করিয়া বলিত, শচীশকে সাহেব যে এত পছন্দ করে তার কারণ ওর গায়ের রঙ কটা, আর ও সাহেবের মন ভোলাইবার জন্য নাস্তিকতা ফলাইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো বুদ্ধিমান আড়ম্বর করিয়া সাহেবের কাছ হইতে পজিটিভিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে বই ধার চাহিতে গিয়াছিল; সাহেব বলিয়াছিলেন, তোমরা বুঝিবে না। তারা যে নাস্তিকতা-চর্চারও অযোগ্য এই কথায় নাস্তিকতা এবং শচীশের বিরুদ্ধে তাহাদের ক্ষোভ কেবল বাড়িয়া উঠিতেছিল।

২

মত এবং আচরণ সম্বন্ধে শচীশের জীবনে নিন্দার কারণ যাহা যাহা আছে তাহা সংগ্রহ করিয়া আমি লিখিলাম। ইহার কিছু আমার সঙ্গে তার পরিচয়ের পূর্বেকার অংশ, কিছু অংশ পরের।

জগমোহন শচীশের জ্যাঠা। তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়, তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধজাহাজের কাপ্তেনের যেমন জাহাজ চালানোর চেয়ে জাহাজ ডোবানোই বড়ো ব্যাবসা, তেমনি যেখানে সুবিধা সেইখানেই আস্তিক্যধর্মকে ডুবাইয়া দেওয়াই জগমোহনের ধর্ম ছিল। ঈশ্বরবিশ্বাসীর সঙ্গে তিনি এই পদ্ধতিতে তর্ক করিতেন—

ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া
সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে ঈশ্বর নাই
অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে ঈশ্বর নাই

অথচ তোমরা তাঁর মুখের উপর জবাব দিয়া বলিতেছ যে ঈশ্বর আছেন। এই পাপের শাস্তি-স্বরূপে তেত্রিশ কোটি দেবতা তোমাদের দুই কান ধরিয়া জরিমানা আদায় করিতেছে।

বালক-বয়সে জগমোহনের বিবাহ হইয়াছিল। যৌবনকালে যখন তাঁর স্ত্রী মারা যান তার পূর্বেই তিনি ম্যাল্‌থস পড়িয়াছিলেন; আর বিবাহ করেন নাই।

তাঁর ছোটো ভাই হরিমোহন ছিলেন শচীশের পিতা। তিনি তাঁর বড়ো ভাইয়ের এমনি উলটা প্রকৃতির যে, সে কথা লিখিতে গেলে গল্প সাজানো বলিয়া লোকে সন্দেহ করিবে। কিন্তু গল্পই লোকের বিশ্বাস কাড়িবার জন্য সাবধান হইয়া চলে, সত্যের সে দায় নাই বলিয়া সত্য অদ্ভুত হইতে ভয় করে না। তাই, সকাল এবং বিকাল যেমন বিপরীত, সংসারে বড়ো ভাই এবং ছোটো ভাই তেমনি বিপরীত—এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

হরিমোহন শিশুকালে অসুস্থ ছিলেন। তাগাতাবিজ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, সন্ন্যাসীর জটা-নিংড়ানো জল, বিশেষ বিশেষ পীঠস্থানের ধুলা, অনেক জাগ্রত ঠাকুরের প্রসাদ ও চরণামৃত, গুরু-পুরোহিতের অনেক টাকার আশীর্বাদে তাঁকে যেন সকল অকল্যাণ হইতে গড়বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

বড়ো বয়সে তাঁর আর ব্যামো ছিল না, কিন্তু তিনি যে বড়োই কাহিল, সংসার হইতে এ সংস্কার ঘুচিল না। কোনোক্রমে তিনি বাঁচিয়া থাকুন, এর বেশি তাঁর কাছে কেহ কিছু দাবি করিত না। তিনিও এ সম্বন্ধে কাহাকেও নিরাশ করিলেন না, দিব্য বাঁচিয়া রহিলেন। কিন্তু শরীরটা যেন গেল-গেল এই ভাব করিয়া সকলকে শাসাইয়া রাখিলেন। বিশেষত তাঁর পিতার অল্প বয়সে মৃত্যুর নজিরের জোরে মা-মাসির সমস্ত সেবাযত্ন তিনি নিজের দিকে টানিয়া লইলেন। সকলের আগে তাঁর আহার, সকলের হইতে তাঁর আহারের আয়োজন স্বতন্ত্র, সকলের চেয়ে তাঁর কাজ কম, সকলের চেয়ে তাঁর বিশ্রাম বেশি। কেবল মা-মাসির নয়, তিনি যে তিন-ভুবনের সমস্ত ঠাকুর-দেবতার বিশেষ জিম্মায় এ তিনি কখনো ভুলিতেন না। কেবল ঠাকুর-দেবতা নয়, সংসারে যেখানে যার কাছে যে পরিমাণে সুবিধা পাওয়া যায় তাকে তিনি সেই পরিমাণেই মানিয়া চলিতেন; থানার দারোগা, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদের রাজপুরুষ, খবরের কাগজের সম্পাদক, সকলকেই যথোচিত ভয় ভক্তি করিতেন—গো-ব্রাহ্মণের তো কথাই নাই।

জগমোহনের ভয় ছিল উলটা দিকে। কারও কাছে তিনি লেশমাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহমাত্র পাছে কারও মনে আসে, এই ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদিগকে তিনি দূরে রাখিয়া চলিতেন। তিনি যে দেবতা মানিতেন না তার মধ্যেও তাঁর ঐ ভাবটা ছিল। লৌকিক বা অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাতজোড় করিতে নারাজ।

যথাকালে, অর্থাৎ যথাকালের অনেক পূর্বে, হরিমোহনের বিবাহ হইয়া গেল। তিন মেয়ে, তিন ছেলের পরে শচীশের জন্ম। সকলেই বলিল, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে শচীশের চেহারার আশ্চর্য মিল। জগমোহনও তাকে এমনি করিয়া অধিকার করিয়া বসিলেন যেন সে তাঁরই ছেলে।

ইহাতে যেটুকু লাভ ছিল হরিমোহন প্রথমটা সেইটুকুর হিসাব খতাইয়া খুশি ছিলেন। কেননা জগমোহন নিজে শচীশের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন। ইংরেজি-ভাষায় অসামান্য ওস্তাদ বলিয়া জগমোহনের খ্যাতি। কাহারও মতে তিনি বাংলার মেকলে, কাহারও মতে বাংলার জন্‌সন্‌। শামুকের খোলার মতো তিনি যেন ইংরেজি বই দিয়া ঘেরা। নুড়ির রেখা ধরিয়া পাহাড়ে-ঝর্নার পথ যেমন চেনা যায় তেমনি বাড়ির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ অংশে তাঁর চলাফেরা তাহা মেজে হইতে কড়ি পর্যন্ত ইংরেজি বইয়ের বোঝা দেখিলেই বুঝা যাইত।

হরিমোহন তাঁর বড়ো ছেলে পুরন্দরকে স্নেহের রসে একেবারে গলাইয়া দিয়াছেন। সে যাহা চাহিত তাহাতে তিনি না করিতে পারিতেন না। তার জন্য সর্বদাই তাঁর চোখে যেন জল ছলছল করিত—তাঁর মনে হইত, কোনো কিছুতে বাধা দিলে সে যেন বাঁচিবে না। পড়াশুনা কিছু তার হইলই না, সকাল সকাল বিবাহ হইয়া গেল এবং সেই বিবাহের চতুঃসীমানার মধ্যে কেহই তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। হরিমোহনের পুত্রবধূ ইহাতে উদ্যমের সহিত আপত্তি প্রকাশ করিত

এবং হরিমোহন তাঁর পুত্রবধূর উপর অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিতেন, ঘরে তার উৎপাতেই তাঁর ছেলেকে বাহিরে সান্ত্বনার পথ খুঁজিতে হইতেছে।

এই-সকল কাণ্ড দেখিয়াই পিতৃস্নেহের বিষম বিপত্তি হইতে শচীশকে বাঁচাইবার জন্য জগমোহন তাহাকে নিজের কাছ হইতে একটুও ছাড়া দিলেন না। শচীশ দেখিতে দেখিতে অল্প বয়সেই ইংরেজি লেখায় পড়ায় পাকা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেইখানেই তো থামিল না। তার মগজের মধ্যে মিল-বেন্থামের অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া সে যেন নাস্তিকতার মশালের মতো জ্বলিতে লাগিল।

জগমোহন শচীশের সঙ্গে এমন চালে চলিতেন যেন সে তাঁর সমবয়সী। গুরুজনকে ভক্তি করাটা তাঁর মতে একটা ঝুটা সংস্কার; ইহাতে মানুষের মনকে গোলামিতে পাকা করিয়া দেয়। বাড়ির কোনো-এক নূতন জামাই তাঁকে 'শ্রীচরণেষু' পাঠ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিল। তাহাকে তিনি নিম্নলিখিত প্রণালীতে উপদেশ দিয়াছিলেন : মাই ডিয়ার নরেন, চরণকে শ্রী বলিলে যে কী বলা হয় তা আমিও জানি না, তুমিও জান না, অতএব ওটা বাজে কথা; তার পরে, আমাকে একেবারে বাদ দিয়া আমার চরণে তুমি কিছু নিবেদন করিয়াছ, তোমার জানা উচিত আমার চরণটা আমারই এক অংশ, যতক্ষণ ওটা আমার সঙ্গে লাগিয়া আছে ততক্ষণ উহাকে তফাত করিয়া দেখা উচিত না; তার পরে, ঐ অংশটা হাতও নয়, কানও নয়, ওখানে কিছু নিবেদন করা পাগলামি; তার পরে শেষ কথা এই যে, আমার চরণ-সম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করিলে ভক্তিপ্রকাশ করা হইতে পারে, কারণ কোনো কোনো চতুষ্পদ তোমাদের ভক্তিভাজন, কিন্তু ইহাতে আমার প্রাণীতত্ত্বঘটিত পরিচয়-সম্বন্ধে তোমার অজ্ঞতা সংশোধন করিয়া দেওয়া আমি উচিত মনে করি।

এমন সকল বিষয়ে শচীশের সঙ্গে জগমোহন আলোচনা করিতেন যাহা লোকে সচরাচর চাপা দিয়া থাকে। এই লইয়া কেহ আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন, বোলতার বাসা ভাঙিয়া দিলেই তবে বোলতা তাড়ানো যায়, তেমনি এ-সব কথায় লজ্জা করাটা ভাঙিয়া দিলেই লজ্জার কারণটাকে খেদানো হয়; শচীশের মন হইতে আমি লজ্জার বাসা ভাঙিয়া দিতেছি।

৩

লেখাপড়া-শেখা সারা হইল। এখন হরিমোহন শচীশকে তার জ্যাঠার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু বঁড়শি তখন গলায় বাধিয়াছে, বিঁধিয়াছে; তাই এক পক্ষের টান যতই বাড়িল অপর পক্ষের বাঁধনও ততই আঁটিল। ইহাতে হরিমোহন ছেলের চেয়ে দাদার উপরে বেশি রাগ করিতে লাগিলেন; দাদার সম্বন্ধে রঙবেরঙের নিন্দায় পাড়া ছাইয়া দিলেন।

শুধু যদি মত-বিশ্বাসের কথা হইত হরিমোহন আপত্তি করিতেন না; মুরগি খাইয়া লোক-সমাজে সেটাকে পাঁঠা বলিয়া পরিচয় দিলেও তিনি সহ্য করিতেন। কিন্তু ইঁহারা এত দূরে গিয়াছিলেন যে মিথ্যার সাহায্যেও ইঁহাদিগকে ত্রাণ করিবার উপায় ছিল না। যেটাতে সব চেয়ে বাধিল সেটা বলি :

জগমোহনের নাস্তিকধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা। সেই ভালো-করার মধ্যে অন্য যে-কোনো রস থাক্ একটা প্রধান রস এই ছিল যে, নাস্তিকের পক্ষে লোকের ভালো-করার মধ্যে নিছক নিজের লোকসান ছাড়া আর কিছুই নাই— তাহাতে না আছে পুণ্য, না আছে পুরস্কার, না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বক্‌শিশের বিজ্ঞাপন বা চোখরাঙানি। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে' আপনার গরজটা কী? তিনি বলিতেন, কোনো গরজ নাই, সেইটেই আমার সব চেয়ে বড়ো গরজ। তিনি শচীশকে বলিতেন, দেখ্ বাবা, আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুকে মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেকে মানিবার জোর বেশি।

'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনের' প্রধান চেলা ছিল তাঁর শচীশ। পাড়ায় চামড়ার গোটাকয়েক বড়ো আড়ত। সেখানকার যত মুসলমান ব্যাপারী এবং চামারদের লইয়া জ্যাঠায় ভাইপোয় মিলিয়া এমনি ঘনিষ্ঠ-রকমের হিতানুষ্ঠানে লাগিয়া গেলেন যে, হরিমোহনের ফোঁটা-তিলক আগুনের শিখার মতো জ্বলিয়া তাঁর মগজের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবার জো করিল। দাদার কাছে শাস্ত্র বা আচারের দোহাই পাড়িলে উলটা ফল হইবে, এইজন্য তাঁর কাছে তিনি পৈতৃক সম্পত্তির অন্যায় অপব্যয়ের নালিশ তুলিলেন। দাদা বলিলেন, তুমি পেটমোটা পুরুতপাণ্ডার পিছনে যে টাকাটা খরচ করিয়াছ আমার খরচের মাত্রা আগে সেই পর্যন্ত উঠুক তার পরে তোমার সঙ্গে বোঝা-পড়া হইবে।

বাড়ির লোক একদিন দেখিল, বাড়ির যে মহলে জগমোহন থাকেন সেই দিকে একটা বৃহৎ ভোজের আয়োজন হইতেছে। তার পাচক এবং পরিবেষকের দল সব মুসলমান। হরিমোহন রাগে অস্থির হইয়া শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই নাকি যত তোর চামার বাবাদের ডাকিয়া এই বাড়িতে আজ খাওয়াইবি?

শচীশ কহিল, আমার সম্বল থাকিলে খাওয়াইতাম, কিন্তু আমার তো পয়সা নাই। জ্যাঠামশায় উহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

পুরন্দর রাগিয়া ছটফট করিয়া বেড়াইতেছিল। সে বলিতেছিল, কেমন উহারা এ বাড়িতে আসিয়া খায় আমি দেখিব।

হরিমোহন দাদার কাছে আপত্তি জানাইলে জগমোহন কহিলেন, তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ আমি কথা কই না। আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব ইহাতে বাধা দিয়ো না।

তোমার ঠাকুর?

হাঁ, আমার ঠাকুর।

তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ?

ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমরা সজীবকে মানি তাহাকে চোখে দেখা যায়, কানে শোনা যায়—তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।

তোমার এই চামার মুসলমান দেবতা?

হাঁ, আমার এই চামার মুসলমান দেবতা। তাহাদের আশ্চর্য এই এক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না। আমি সেই আশ্চর্য রহস্য দেখিতে ভালোবাসি, তাই আমার ঠাকুরকে আমার ঘরে ডাকিয়াছি। দেবতাকে দেখিবার চোখ যদি তোমার অন্ধ না হইত তবে তুমি খুশি হইতে।

পুরন্দর তার জ্যাঠার কাছে গিয়া খুব চড়া গলায় কড়া কড়া কথা বলিল এবং জানাইল আজ সে একটা বিষম কাণ্ড করিবে।

জগমোহন হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাঁদর, আমার দেবতা যে কতবড়ো জাগ্রত দেবতা তাহা তাঁর গায়ে হাত দিতে গেলেই বুঝিবি, আমাকে কিছুই করিতে হইবে না।

পুরন্দর যতই বুক ফুলাইয়া বেড়াক সে তার বাবার চেয়েও ভিতু। যেখানে তার আবদার সেখানেই তার জোর। মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘাঁটাইতে সে সাহস করিল না। শচীশকে আসিয়া গালি দিল। শচীশ তার আশ্চর্য দুই চক্ষু দাদার মুখের দিকে তুলিয়া চাহিয়া রহিল, একটি কথাও বলিল না। সেদিনকার ভোজ নির্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

৪

এইবার হরিমোহন দাদার সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। যাহা লইয়া ইঁহাদের সংসার চলে সেটা দেবত্র সম্পত্তি। জগমোহন বিধর্মী আচারভ্রষ্ট এবং সেই কারণে সেবায়েত হইবার অযোগ্য, এই বলিয়া জেলাকোর্টে হরিমোহন নালিশ রুজু করিয়া দিলেন। মাতব্বর সাক্ষীর অভাব ছিল না; পাড়াসুদ্ধ লোক সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত।

অধিক কৌশল করিতে হইল না। জগমোহন আদালতে স্পষ্টই কবুল করিলেন, তিনি দেব-দেবী মানেন না; খাদ্য-অখাদ্য বিচার করেন না; মুসলমান ব্রহ্মার কোন্‌খান হইতে জন্মিয়াছে তাহা তিনি জানেন না এবং তাহাদের সঙ্গে তাঁর খাওয়াদাওয়া-চলার কোনো বাধা নাই।

মুনসেফ জগমোহনকে সেবায়েত পদের অযোগ্য বলিয়া রায় দিলেন। জগমোহনের পক্ষের আইনজ্ঞরা আশা দিলেন এ রায় হাইকোর্টে টিঁকিবে না। জগমোহন বলিলেন, আমি আপিল করিব না। যে ঠাকুরকে আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতা মানিবার মতো বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মতো ধর্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।

বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিল, খাইবে কী?

তিনি বলিলেন, কিছু না খাবার জোটে তো খাবি খাইব।

এই মকদ্দমা জয় লইয়া আস্ফালন করা হরিমোহনের ইচ্ছা ছিল না। তাঁর ভয় ছিল পাছে দাদার অভিশাপের কোনো কুফল থাকে। কিন্তু পুরন্দর একদিন চামারদের বাড়ি হইতে তাড়াইতে পারে নাই, সেই আগুন তার মনে জ্বলিতেছিল। কার দেবতা যে জাগ্রত এইবার সেটা তো প্রত্যক্ষ দেখা গেল। তাই পুরন্দর ভোরবেলা হইতে ঢাকঢোল আনাইয়া পাড়া মাথায় করিয়া তুলিল। জগমোহনের কাছে তাঁর এক বন্ধু আসিয়াছিল, সে কিছু জানিত না। সে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারখানা কী হে? জগমোহন বলিলেন, আজ আমার ঠাকুরের ধুম করিয়া ভাসান হইতেছে, তারই এই বাজনা। দুই দিন ধরিয়া পুরন্দর নিজে উদ্‌যোগ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দিল। পুরন্দর যে এই বংশের কুলপ্রদীপ, সকলে তাহা ঘোষণা করিতে লাগিল।

দুই ভাইয়ে ভাগাভাগি হইয়া কলিকাতার ভদ্রাসন-বাটীর মাঝামাঝি প্রাচীর উঠিয়া গেল।

ধর্ম সম্বন্ধে যেমনি হউক, খাওয়াপরা টাকাকড়ি সম্বন্ধে মানুষের একটা স্বাভাবিক সুবুদ্ধি আছে বলিয়া মানবজাতির প্রতি হরিমোহনের একটা শ্রদ্ধা ছিল। তিনি নিশ্চয় ঠাওরাইয়াছিলেন তাঁর ছেলে এবার নিঃস্ব জগমোহনকে ছাড়িয়া অন্তত আহারের গন্ধে তাঁর সোনার খাঁচাকলের মধ্যে ধরা দিবে। কিন্তু বাপের ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধি কোনোটাই পায় নাই, শচীশ তার পরিচয় দিল। সে তার জ্যাঠার সঙ্গেই রহিয়া গেল।

জগমোহনের চিরকাল শচীশকে এমনি নিতান্তই আপনার বলিয়া জানা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে আজ এই ভাগাভাগির দিনে শচীশ যে তাঁরই ভাগে পড়িয়া গেল ইহাতে তাঁর কিছুই আশ্চর্য বোধ হইল না।

কিন্তু হরিমোহন তাঁর দাদাকে বেশ চিনিতেন। তিনি লোকের কাছে রটাইতে লাগিলেন যে শচীশকে আটকাইয়া জগমোহন নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিবার কৌশল খেলিতেছেন। তিনি অত্যন্ত সাধু হইয়া প্রায় অশ্রুনেত্রে সকলকে বলিলেন, দাদাকে কি আমি খাওয়াপরার কষ্ট দিতে পারি? কিন্তু তিনি আমার ছেলেকে হাতে রাখিয়া এই-যে শয়তানি চাল চালিতেছেন ইহা আমি কোনোমতেই সহিব না। দেখি তিনি কতবড়ো চালাক।

কথাটা বন্ধুপরম্পরায় জগমোহনের কানে যখন পৌঁছিল তখন তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। এমন কথা যে উঠিতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই বলিয়া নিজেকে নির্বোধ বলিয়া ধিক্‌কার দিলেন। শচীশকে বলিলেন, গুডবাই শচীশ!

শচীশ বুঝিল, যে বেদনা হইতে জগমোহন এই বিদায়বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তার উপরে

আর কথা চলিবে না। আজ আঠারো বৎসর আজন্মকালের নিরবচ্ছিন্ন সংস্রব হইতে শচীশকে বিদায় লইতে হইল।

শচীশ যখন তার বাক্স ও বিছানা গাড়ির মাথায় চাপাইয়া দিয়া তাঁর কাছ হইতে চলিয়া গেল জগমোহন দরজা বন্ধ করিয়া তাঁর ঘরের মধ্যে মেঝের উপর শুইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল, তাঁর পুরাতন চাকর ঘরে আলো দিবার জন্য দরজায় ঘা দিল—তিনি সাড়া দিলেন না।

হায় রে, প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন! মানুষের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের পরিমাপ যে খাটে না। মাথা গণনায় যে মানুষটি কেবল এক, হৃদয়ের মধ্যে সে যে সকল গণনার অতীত। শচীশকে কি এক-দুই-তিনের কোঠায় ফেলা যায়? সে যে জগমোহনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সমস্ত জগৎকে অসীমতায় ছাইয়া ফেলিল।

শচীশ কেন গাড়ি আনাইয়া তার উপরে আপনার জিনিসপত্র তুলিল জগমোহন তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও করিলেন না। বাড়ির যে বিভাগে তার বাপ থাকেন শচীশ সে দিকে গেল না, সে তার এক বন্ধুর মেসে গিয়া উঠিল। নিজের ছেলে যে কেমন করিয়া এমন পর হইয়া যাইতে পারে তাহা স্মরণ করিয়া হরিমোহন বারংবার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তাঁর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল।

বাড়ি ভাগ হইয়া যাইবার পর পুরন্দর জেদ করিয়া তাহাদের অংশে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করাইল এবং সকালে সন্ধ্যায় শাঁখঘণ্টার আওয়াজে জগমোহনের কান ঝালাপালা হইয়া উঠিতেছে ইহাই কল্পনা করিত আর সে লাফাইতে থাকিত।

শচীশ প্রাইভেট টুইশনি লইল এবং জগমোহন একটা এন্‌ট্রেন্স স্কুলের হেডমাস্টারি জোগাড় করিলেন। হরিমোহন আর পুরন্দর এই নাস্তিক শিক্ষকের হাত হইতে ভদ্রঘরের ছেলেদিগকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

৫

কিছুকাল পরে শচীশ একদিন দোতলায় জগমোহনের পড়িবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত। ইহাদের মধ্যে প্রণাম করিবার প্রথা ছিল না। জগমোহন শচীশকে আলিঙ্গন করিয়া চৌকিতে বসাইলেন। বলিলেন, খবর কী?

একটা বিশেষ খবর ছিল।

ননিবালা তার বিধবা মায়ের সঙ্গে তার মামার বাড়িতে আশ্রয় লইয়াছিল। যতদিন তার মা বাঁচিয়া ছিল কোনো বিপদ ঘটে নাই। অল্পদিন হইল মা মরিয়াছে। মামাতো ভাইগুলো দুশ্চরিত্র। তাহাদেরই এক বন্ধু ননিবালাকে তার আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কিছুদিন বাদে ননির 'পরে তার সন্দেহ হইতে থাকে এবং সেই ঈর্ষায় তাহাকে অপমানের একশেষ করে। যে বাড়িতে শচীশ মাস্টারি করে তারই পাশের বাড়িতে এই কাণ্ড। শচীশ এই হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতে চায়। কিন্তু তার না আছে অর্থ, না আছে ঘরদুয়ার, তাই সে তার জ্যাঠার কাছে আসিয়াছে। এ দিকে মেয়েটির সন্তান-সম্ভাবনা।

জগমোহন তো একেবারে আগুন। সেই পুরুষটাকে পাইলে এখনই তার মাথা গুঁড়া করিয়া দেন এমনি তাঁর ভাব। তিনি এ-সব ব্যাপারে শান্ত হইয়া সকল দিক চিন্তা করিবার লোক নন। একেবারে বলিয়া বসিলেন, তা বেশ তো, আমার লাইব্রেরি-ঘর খালি আছে; সেইখানে আমি তাকে থাকিতে দিব।

শচীশ আশ্চর্য হইয়া কহিল, লাইব্রেরি-ঘর! কিন্তু বইগুলো?

যতদিন কাজ জোটে নাই কিছু কিছু বই বিক্রি করিয়া জগমোহন দিন চালাইয়াছেন। এখন অল্প যা বই বাকি আছে তা শোবার ঘরেই ধরিবে।

জগমোহন বলিলেন, মেয়েটিকে এখনই লইয়া এসো।

শচীশ কহিল, তাকে আনিয়াছি, সে নীচের ঘরে বসিয়া আছে।

জগমোহন নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, সিঁড়ির পাশের ঘরে একখানা কাপড়ের পুঁটুলির মতো জড়োসড়ো হইয়া মেয়েটি এক কোণে মাটির উপরে বসিয়া আছে।

জগমোহন ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাঁর মেঘগম্ভীর গলায় বলিয়া উঠিলেন, এসো আমার মা এসো। ধুলায় কেন বসিয়া?

মেয়েটি মুখের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

জগমোহনের চোখে সহজে জল আসে না; তাঁর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। তিনি শচীশকে বলিলেন, শচীশ, এই মেয়েটি আজ যে লজ্জা বহন করিতেছে সে যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা। আহা, ওর উপরে এতবড়ো বোঝা কে চাপাইল!

মা, আমার কাছে তোমার লজ্জা খাটিবে না। আমাকে আমার ইস্কুলের ছেলেরা পাগলা জগাই বলিত, আজও আমি সেই পাগল আছি।—বলিয়া জগমোহন নিঃসংকোচে মেয়েটির দুই হাত ধরিয়া মাটি হইতে তাকে দাঁড় করাইলেন; মাথা হইতে তার ঘোমটা খসিয়া পড়িল।

নিতান্ত কচিমুখ, অল্প বয়স, সে মুখে কলঙ্কের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই। ফুলের উপরে ধুলা লাগিলেও যেমন তার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না তেমনি এই শিরীষফুলের মতো মেয়েটির ভিতরকার পবিত্রতার লাবণ্য তো ঘোচে নাই। তার দুই কালো চোখের মধ্যে আহত হরিণীর মতো ভয়, তার সমস্ত দেহলতাটির মধ্যে লজ্জার সংকোচ, কিন্তু এই সরল সকরুণতার মধ্যে কালিমা তো কোথাও নাই।

ননিবালাকে জগমোহন তাঁর উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন, মা, এই দেখো আমার ঘরের শ্রী। সাত জন্মে ঝাঁট পড়ে না; সমস্ত উলটাপালটা; আর আমার কথা যদি বল, কখন নাই কখন খাই তার ঠিকানা নাই। তুমি আসিয়াছ এখন আমার ঘরের শ্রী ফিরিবে, আর পাগলা জগাইও মানুষের মতো হইয়া উঠিবে।

মানুষ যে মানুষের কতখানি তা আজকের পূর্বে ননিবালা অনুভব করে নাই, এমন-কি, মা থাকিতেও না। কেননা মা তো তাকে মেয়ে বলিয়া দেখিত না, বিধবা মেয়ে বলিয়া দেখিত; সেই সম্বন্ধের পথ যে আশঙ্কার ছোটো ছোটো কাঁটায় ভরা ছিল। কিন্তু, জগমোহন সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও ননিবালাকে তার সমস্ত ভালোমন্দর আবরণ ভেদ করিয়া এমন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন কী করিয়া!

জগমোহন একটি বুড়ি ঝি রাখিয়া দিলেন এবং ননিবালাকে কোথাও কিছু সংকোচ করিতে দিলেন না। ননির বড়ো ভয় ছিল জগমোহন তার হাতে খাইবেন কি না, সে যে পতিতা। কিন্তু এমনি ঘটিল জগমোহন তার হাতে ছাড়া খাইতেই চান না; সে নিজে রাঁধিয়া কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে তিনি খাইবেন না, এই তাঁর পণ।

জগমোহন জানিতেন, এইবার আর-একটা মস্ত নিন্দার পালা আসিতেছে। ননিও তাহা বুঝিত, এবং সেজন্য তার ভয়ের অন্ত ছিল না। দু-চার দিনের মধ্যেই শুরু হইল। ঝি আগে মনে করিয়াছিল, ননি জগমোহনের মেয়ে; সে একদিন আসিয়া ননিকে কী-সব বলিল এবং ঘৃণা করিয়া চাকরি ছাড়িয়া দিয়া গেল। জগমোহনের কথা ভাবিয়া ননির মুখ শুকাইয়া গেল। জগমোহন কহিলেন, মা, আমার ঘরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, তাই নিন্দায় কোটালের বান ডাকিবার সময় আসিল; কিন্তু ঢেউ যতই ঘোলা হউক আমার জ্যোৎস্নায় তো দাগ লাগিবে না।

জগমোহনের এক পিসি হরিমোহনের মহল হইতে আসিয়া কহিলেন, ছি ছি, এ কী কান্ড জগাই! পাপ বিদায় করিয়া দে।

জগমোহন কহিলেন, তোমরা ধার্মিক, তোমরা এমন কথা বলিতে পার, কিন্তু পাপ যদি বিদায় করি তবে এই পাপিষ্ঠের গতি কী হইবে?

কোনো এক সম্পর্কের দিদিমা আসিয়া বলিলেন, মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দে, হরিমোহন সমস্ত খরচ দিতে রাজি আছে।

জগমোহন কহিলেন, মা যে! টাকার সুবিধা হইয়াছে বলিয়াই খামকা মাকে হাসপাতালে পাঠাইব হরিমোহনের এ কেমন কথা?

দিদিমা গালে হাত দিয়া কহিলেন, মা বলিস কাকে রে?

জগমোহন কহিলেন, জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তাঁকে। যিনি প্রাণসংশয় করিয়া ছেলেকে জন্ম দেন তাঁকে। সেই ছেলের পাষণ্ড বাপকে তো আমি বাপ বলি না। সে বেটা কেবল বিপদ বাধায়, তার তো কোনো বিপদই নাই।

হরিমোহনের সর্বশরীর ঘৃণায় যেন ক্লেদসিক্ত হইয়া গেল। গৃহস্থের ঘরের দেয়ালের ও পাশেই বাপ-পিতামহের ভিটায় একটা ভ্রষ্টা মেয়ে এমন করিয়া বাস করিবে, ইহা সহ্য করা যায় কী করিয়া?

এই পাপের মধ্যে শচীশ ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত আছে এবং তার নাস্তিক জ্যাঠা ইহাতে তাকে প্রশ্রয় দিতেছে এ কথা বিশ্বাস করিতে হরিমোহনের কিছুমাত্র বিলম্ব বা দ্বিধা হইল না। বিষম উত্তেজনার সঙ্গে সে কথা তিনি সর্বত্র রটাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এই অন্যায় নিন্দা কিছুমাত্র কমে সেজন্য জগমোহন কোনো চেষ্টাই করিলেন না। তিনি বলিলেন, আমাদের নাস্তিকের ধর্মশাস্ত্রে ভালো কাজের জন্য নিন্দার নরকভোগ বিধান। জনশ্রুতি যতই নূতন নূতন রঙে নূতন নূতন রূপ ধরিতে লাগিল শচীশকে লইয়া ততই তিনি উচ্চহাস্যে আনন্দসম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এমন কুৎসিত ব্যাপার লইয়া নিজের ভাইপোর সঙ্গে এমন কাণ্ড করা হরিমোহন বা তাঁর মতো অন্য কোনো ভদ্রশ্রেণীর লোক কোনোদিন শোনেন নাই।

জগমোহন বাড়ির যে অংশে থাকেন, ভাগ হওয়ার পর হইতে পুরন্দর তার ছায়া মাড়ায় নাই। সে প্রতিজ্ঞা করিল, মেয়েটাকে পাড়া হইতে তাড়াইবে তবে অন্য কথা।

জগমোহন যখন ইস্কুলে যাইতেন তখন তাঁর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিবার সকল রাস্তাই বেশ ভালো করিয়া বন্ধসন্ধ করিয়া যাইতেন এবং যখন একটুমাত্র ছুটির সুবিধা পাইতেন একবার করিয়া দেখিয়া যাইতে ছাড়িতেন না।

একদিন দুপুরবেলায় পুরন্দর নিজেদের দিকের ছাদের পাঁচিলের উপরে মই লাগাইয়া জগমোহনের অংশে লাফ দিয়া পড়িল। তখন আহারের পর ননিবালা তার ঘরে শুইয়া ঘুমাইতেছিল; দরজা খোলাই ছিল।

পুরন্দর ঘরে ঢুকিয়া নিদ্রিত ননিকে দেখিয়া বিস্ময়ে এবং রাগে গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, তাই বটে! তুই এখানে!

জাগিয়া উঠিয়া পুরন্দরকে দেখিয়া ননির মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। সে পলাইবে কিংবা একটা কথা বলিবে এমন শক্তি তার রহিল না। পুরন্দর রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ডাকিল, ননি!

এমন সময়ে জগমোহন পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিলেন, বেরো আমার ঘর থেকে বেরো।

পুরন্দর ক্রুদ্ধ বিড়ালের মতো ফুলিতে লাগিল। জগমোহন কহিলেন, যদি না যাও আমি পুলিস ডাকিব।

পুরন্দর একবার ননির দিকে অগ্নিকটাক্ষ ফেলিয়া চলিয়া গেল। ননি মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

জগমোহন বুঝিলেন ব্যাপারটা কী। তিনি শচীশকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন, শচীশ জানিত পুরন্দরই ননিকে নষ্ট করিয়াছে; পাছে তিনি রাগ করিয়া গোলমাল করেন এইজন্য তাঁকে

কিছু বলে নাই। শচীশ মনে জানিত, কলিকাতা শহরে আর-কোথাও পুরন্দরের উৎপাত হইতে ননির নিস্তার নাই, একমাত্র জ্যাঠার বাড়িতে সে কখনো পারৎপক্ষে পদার্পণ করিবে না।

ননি একটা ভয়ের হাওয়ায় কয়দিন যেন বাঁশপাতার মতো কাঁপিতে লাগিল। তার পরে একটি মৃত সন্তান প্রসব করিল।

পুরন্দর একদিন লাথি মারিয়া ননিকে অর্ধরাত্রে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। তার পরে অনেক খোঁজ করিয়া তাহাকে পায় নাই। এমন সময়ে জ্যাঠার বাড়িতে তাহাকে দেখিয়া ঈর্ষার আগুনে তার পা হইতে মাথা পর্যন্ত জ্বলিতে লাগিল। তার মনে হইল একে তো শচীশ নিজের ভোগের জন্য ননিকে তার হাত হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছে, তার পরে পুরন্দরকেই বিশেষভাবে অপমান করিবার জন্য তাহাকে একেবারে তার বাড়ির পাশেই রাখিয়াছে। এ তো কোনোমতেই সহ্য করিবার নয়।

কথাটা হরিমোহন জানিতে পারিলেন। ইহা হরিমোহনকে জানিতে দিতে পুরন্দরের কিছুমাত্র লজ্জা ছিল না। পুরন্দরের এই-সমস্ত দুষ্কৃতির প্রতি তাঁর একপ্রকার স্নেহই ছিল।

শচীশ যে নিজের দাদা পুরন্দরের হাত হইতে এই মেয়েটাকে ছিনাইয়া লইবে ইহা তাঁর কাছে বড়োই অশাস্ত্রীয় এবং অস্বাভাবিক বোধ হইল। পুরন্দর এই অসহ্য অপমান ও অন্যায় হইতে আপন প্রাপ্য উদ্ধার করিয়া লইবে, এই তাঁর একান্ত মনের সংকল্প হইয়া উঠিল। তখন তিনি নিজে টাকা সাহায্য করিয়া ননির একটা মিথ্যা মা খাড়া করিয়া জগমোহনের কাছে নাকী কান্না কাঁদিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। জগমোহন তাকে এমন ভীষণ মূর্তি ধরিয়া তাড়া করিলেন যে, সে আর সে দিকে ঘেঁষিল না।

ননি দিনে দিনে ম্লান হইয়া যেন ছায়ার মতো হইয়া মিলাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। তখন ক্রিস্ট্‌মাসের ছুটি। জগমোহন এক মুহূর্ত ননিকে ছাড়িয়া বাহিরে যান না।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি তাকে স্কটের একটা গল্প বাংলা করিয়া পড়িয়া শুনাইতেছেন, এমন সময়ে ঘরের মধ্যে পুরন্দর আর-একজন যুবককে লইয়া ঝড়ের মতো প্রবেশ করিল। তিনি যখন পুলিস ডাকিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে সেই যুবকটি বলিল, 'আমি ননির ভাই, আমি উহাকে লইতে আসিয়াছি।'

জগমোহন তার কোনো উত্তর না করিয়া পুরন্দরকে ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে সিঁড়ির কাছ পর্যন্ত লইয়া গিয়া এক ধাক্কায় নীচের দিকে রওনা করিয়া দিলেন। অন্য যুবকটিকে বলিলেন, পাষণ্ড, লজ্জা নাই তোমার? ননিকে রক্ষা করিবার বেলা তুমি কেহ নও, আর সর্বনাশ করিবার বেলা তুমি ননির ভাই?

সে লোকটি প্রস্থান করিতে বিলম্ব করিল না, কিন্তু দূর হইতে চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, পুলিসের সাহায্যে সে তার বোনকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবে। এ লোকটা সত্যই ননির ভাই বটে। শচীশই যে ননির পতনের কারণ সেই কথা প্রমাণ করিবার জন্য পুরন্দর তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছিল।

ননি মনে মনে বলিতে লাগিল, ধরণী, দ্বিধা হও।

জগমোহন শচীশকে ডাকিয়া বলিলেন, ননিকে লইয়া আমি পশ্চিমে কোনো-একটা শহরে চলিয়া যাই; সেখানে যা-হয় একটা জুটাইয়া লইব; যেরূপ উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে এখানে থাকিলে ও মেয়েটা আর বাঁচিবে না।

শচীশ কহিল, দাদা যখন লাগিয়াছেন তখন যেখানে যাও উৎপাত সঙ্গে সঙ্গে চলিবে।

তবে উপায়?

উপায় আছে। আমি ননিকে বিবাহ করিব।

বিবাহ করিবে?

হাঁ, সিভিল বিবাহের আইনমতে।

জগমোহন শচীশকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁর চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন অশ্রুপাত তাঁর বয়সে আর কখনো তিনি করেন নাই।

৬

বাড়ি-বিভাগের পর হরিমোহন একদিনও জগমোহনকে দেখিতে আসেন নাই। সেদিন উষ্কখুষ্ক আলুথালু হইয়া আসিয়া উপস্থিত। বলিলেন, দাদা, এ কী সর্বনাশের কথা শুনিতেছি?

জগমোহন কহিলেন, সর্বনাশের কথাই ছিল, এখন তাহা হইতে রক্ষার উপায় হইতেছে।

দাদা, শচীশ তোমার ছেলের মতো—তার সঙ্গে ঐ পতিতা মেয়ের তুমি বিবাহ দিবে?

শচীশকে আমি ছেলের মতো করিয়াই মানুষ করিয়াছি; আজ তা আমার সার্থক হইল, সে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

দাদা, আমি তোমার কাছে হার মানিতেছি—আমার আয়ের অর্ধ অংশ আমি তোমার নামে লিখিয়া দিতেছি; আমার উপরে এমন ভয়ানক করিয়া শোধ তুলিয়ো না।

জগমোহন চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বটে! তুমি তোমার এঁটো পাতের অর্ধেক আমাকে দিয়া কুকুর ভুলাইতে আসিয়াছ! আমি তোমার মতো ধার্মিক নই, আমি নাস্তিক, সে কথা মনে রাখিয়ো। আমি রাগের শোধও লই না, অনুগ্রহের ভিক্ষাও লই না।

হরিমোহন শচীশের মেসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কহিলেন, এ কী শুনি! তোর কি মরিবার আর জায়গা জুটিল না? এমন করিয়া কুলে কলঙ্ক দিতে বসিলি?

শচীশ বলিল, কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা, নহিলে বিবাহ করিবার শখ আমার নাই।

হরিমোহন কহিলেন, তোর কি ধর্মজ্ঞান একটুও নাই? ঐ মেয়েটা তোর দাদার স্ত্রীর মতো, উহাকে তুই—

শচীশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, স্ত্রীর মতো! এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিবেন না।

ইহার পরে হরিমোহন যা মুখে আসিল তাই বলিয়া শচীশকে গাল পাড়িতে লাগিলেন। শচীশ কোনো উত্তর করিল না।

হরিমোহনের বিপদ ঘটিয়াছে এই যে, পুরন্দর নির্লজ্জের মতো বলিয়া বেড়াইতেছে যে, শচীশ যদি ননিকে বিবাহ করে তবে সে আত্মহত্যা করিয়া মরিবে। পুরন্দরের স্ত্রী বলিতেছে, তাহা হইলে তো আপদ চোকে, কিন্তু সে তোমার ক্ষমতায় কুলাইবে না। হরিমোহন পুরন্দরের এই শাসানি সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করেন তা নয়, অথচ তাঁর ভয়ও যায় না।

শচীশ এতদিন ননিকে এড়াইয়া চলিত; একলা তো একদিনও দেখা হয় নাই, তার সঙ্গে দুটা কথা হইয়াছে কিনা সন্দেহ। বিবাহের কথা যখন পাকাপাকি ঠিক হইয়া গেছে তখন জগমোহন শচীশকে বলিলেন, বিবাহের পূর্বে নিরালায় একদিন ননির সঙ্গে ভালো করিয়া কথাবার্তা কহিয়া লও, একবার দুজনের মন-জানাজানি হওয়া দরকার।

শচীশ রাজি হইল।

জগমোহন দিন ঠিক করিয়া দিলেন। ননিকে বলিলেন, মা, আমার মনের মতো করিয়া কিন্তু আজ তোমাকে সাজিতে হইবে।

ননি লজ্জায় মুখ নিচু করিল।

না মা, লজ্জা করিলে চলিবে না, আমার বড়ো মনের সাধ, আজ তোমার সাজ দেখিব—এ তোমাকে পুরাইতে হইবে।

এই বলিয়া চুমকি-দেওয়া বেনারসি শাড়ি, জামা ও ওড়না, যা তিনি নিজে পছন্দ করিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন, ননির হাতে দিলেন।

ননি গড় হইয়া পায়ের ধুলো লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া পা সরাইয়া লইয়া কহিলেন, এতদিনে তবু তোমার ভক্তি ঘোচাইতে পারিলাম না! আমি নাহয় বয়সেই বড়ো হইলাম, কিন্তু মা, তুমি যে মা বলিয়া আমার বড়ো। এই বলিয়া তার মস্তক চুম্বন করিয়া বলিলেন, ভবতোষের বাড়ি আমার নিমন্ত্রণ আছে, ফিরিতে কিছু রাত হইবে।

ননি তাঁর হাত ধরিয়া বলিল, বাবা, তুমি আজ আমাকে আশীর্বাদ করো।

মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি বুড়ো বয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকি পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ঐ মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।

বলিয়া চিবুক ধরিয়া ননির মুখটি তুলিয়া কিছুক্ষণ নীরবে তার দিকে চাহিয়া রহিলেন; ননির দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় ভবতোষের বাড়ি লোক ছুটিয়া গিয়া জগমোহনকে ডাকিয়া আনিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন, বিছানার উপর ননির দেহ পড়িয়া আছে; তিনি যে কাপড়গুলি দিয়াছিলেন সেইগুলি পরা, হাতে একখানি চিঠি, শিয়রের কাছে শচীশ দাঁড়াইয়া। জগমোহন চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন :

বাবা, পারিলাম না, আমাকে মাপ করো। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাঁকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই। তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম।

—পাপিষ্ঠা ননিবালা।

শচীশ

নাস্তিক জগমোহন মৃত্যুর পূর্বে ভাইপো শচীশকে বলিলেন, যদি শ্রাদ্ধ করিবার শখ থাকে বাপের করিস, জ্যাঠার নয়।

তাঁর মৃত্যুর বিবরণটা এই :

যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজ-তক্‌মা-পরা চাপরাসির ভয়ে লোকে ব্যস্ত হইয়াছিল। শচীশের বাপ হরিমোহন ভাবিলেন, তাঁর প্রতিবেশী চামার-গুলোকে সকলের আগে প্লেগে ধরিবে, সেই সঙ্গে তাঁরও গুষ্টিসুদ্ধ সহমরণ নিশ্চিত। ঘর ছাড়িয়া পালাইবার পূর্বে তিনি একবার দাদাকে গিয়া বলিলেন, দাদা, কালনায় গঙ্গার ধারে বাড়ি পাইয়াছি, যদি—

জগমোহন বলিলেন, বিলক্ষণ। এদের ফেলিয়া যাই কী করিয়া?

কাদের?

ঐ-যে চামারদের।

হরিমোহন মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। শচীশকে তার মেসে গিয়া বলিলেন, চল্‌।

শচীশ বলিল, আমার কাজ আছে।

পাড়ার চামারগুলোর মুর্দফরাশির কাজ?

আজ্ঞা হাঁ, যদি দরকার হয় তবে তো—

'আজ্ঞা হাঁ' বৈ কি! যদি দরকার হয় তবে তুমি তোমার চোদ্দ পুরুষকে নরকস্থ করিতে পার। পাজি! নচ্ছার! নাস্তিক!

ভরা কলির দুর্লক্ষণ দেখিয়া হরিমোহন হতাশ হইয়া বাড়ি ফিরিলেন। সেদিন তিনি খুদে অক্ষরে দুর্গানাম লিখিয়া দিস্তাখানেক বালির কাগজ ভরিয়া ফেলিলেন।

হরিমোহন চলিয়া গেলেন। পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না। জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই।

তিনি চেষ্টা করিয়া নিজের বাড়িতে প্রাইভেট হাসপাতাল বসাইলেন। শচীশের সঙ্গে আমরা দুই-একজন ছিলাম শুশ্রূষাব্রতী; আমাদের দলে একজন ডাক্তারও ছিলেন।

আমাদের হাসপাতালে প্রথম রোগী জুটিল একজন মুসলমান, সে মরিল। দ্বিতীয় রোগী স্বয়ং জগমোহন, তিনিও বাঁচিলেন না। শচীশকে বলিলেন, এতদিন যে ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিশ চুকাইয়া লইলাম—কোনো খেদ রহিল না।

শচীশ জীবনে তার জ্যাঠামশায়কে প্রণাম করে নাই, মৃত্যুর পর আজ প্রথম ও শেষবারের মতো তাঁর পায়ের ধুলা লইল।

ইহার পর শচীশের সঙ্গে যখন হরিমোহনের দেখা হইল তিনি বলিলেন, নাস্তিকের মরণ এমনি করিয়াই হয়।

শচীশ সগর্বে বলিল, হাঁ।

২

এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিলে তার আলো যেমন হঠাৎ চলিয়া যায় জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশ তেমনি করিয়া কোথায় যে গেল জানিতেই পারিলাম না।

জ্যাঠামশায়কে শচীশ যে কতখানি ভালোবাসিত আমরা তা কল্পনা করিতে পারি না। তিনি শচীশের বাপ ছিলেন, বন্ধু ছিলেন, আবার ছেলেও ছিলেন বলিতে পারা যায়। কেননা নিজের সম্বন্ধে তিনি এমন ভোলা এবং সংসার সম্বন্ধে এমন অবুঝ ছিলেন যে তাঁকে সকল মুশকিল হইতে বাঁচাইয়া চলা শচীশের এক প্রধান কাজ ছিল। এমনি করিয়া জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়াই শচীশ আপনার যাহা-কিছু পাইয়াছে এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা-কিছু দিয়াছে। তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদের শূন্যতা প্রথমটা শচীশের কাছে যে কেমনতরো ঠেকিয়াছিল তা ভাবিয়া ওঠা যায় না। সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না; সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই; এক ভাবে যাহা 'না' আর-এক ভাবে তাহা যদি 'হাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।

দুই বছর ধরিয়া শচীশ দেশে দেশে ফিরিল, তার কোনো খোঁজ পাইলাম না। আমাদের দলটিকে লইয়া আমরা আরো জোরের সঙ্গে কাজ চালাইতে লাগিলাম। যারা ধর্ম নাম দিয়া কোনো একটা-কিছু মানে আমরা গায়ে পড়িয়া তাহাদিগকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইতে লাগিলাম, এবং বাছিয়া বাছিয়া এমন-সকল ভালো কাজে লাগিয়া গেলাম যাহাতে দেশের ভালোমানুষের ছেলে আমাদিগকে ভালো কথা না বলে। শচীশ ছিল আমাদের ফুল, সে যখন সরিয়া দাঁড়াইল তখন নিতান্ত কেবল আমাদের কাঁটাগুলো উগ্র এবং উলঙ্গ হইয়া উঠিল।

৩

দুই বছর শচীশের কোনো খবর পাইলাম না। শচীশকে একটুও নিন্দা করিতে আমার মন সরে না, কিন্তু মনে মনে এ কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, যে সুরে শচীশ বাঁধা ছিল এই নাড়া খাইয়া তাহা নামিয়া গেছে। একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া একবার জ্যাঠামশায় বলিয়াছিলেন : সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া। যাদের সুর দুর্বল পোদ্দার তাহাদিগকে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়; এই বৈরাগীগুলো সেই ফেলিয়া-দেওয়া মেকি টাকা, জীবনের কারবারে অচল। অথচ এরা জাঁক করিয়া বেড়ায় যে এরাই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে সংসার হইতে তার কোনোমতে ফস্‌কাইবার জো নাই। শুকনো পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, গাছ তাকে ঝরাইয়া ফেলে বলিয়াই— সে যে আবর্জনা।—

এত লোক থাকিতে শেষকালে শচীশই কি সেই আবর্জনার দলে পড়িল? শোকের কালো কষ্টিপাথরে এই কথাটা কি লেখা হইয়া গেল যে, জীবনের হাটে শচীশের কোনো দর নাই?

এমন সময় শোনা গেল চাটগাঁয়ের কাছে কোন্‌-এক জায়গায় শচীশ— আমাদের শচীশ— লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে কীর্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

একদিন কোনোমতে ভাবিয়া পাই নাই শচীশের মতো মানুষ কেমন করিয়া নাস্তিক হইতে পারে, আজ কিছুতে বুঝিতে পারিলাম না লীলানন্দ স্বামী তাহাকে কেমন করিয়া নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়।

এ দিকে, আমরা মুখ দেখাই কেমন করিয়া? শত্রুর দল যে হাসিবে। শত্রুও তো এক-আধ জন নয়।

দলের লোক শচীশের উপর ভয়ংকর চটিয়া গেল। অনেকেই বলিল, তারা প্রথম হইতেই স্পষ্ট জানিত শচীশের মধ্যে বস্তু কিছুই নাই, কেবল ফাঁকা ভাবুকতা।

আমি যে শচীশকে কতখানি ভালোবাসি এবার তাহা বুঝিলাম। আমাদের দলকে সে যে এমন করিয়া মৃত্যুবাণ হানিল, তবু কিছুতে তার উপর রাগ করিতে পারিলাম না।

৪

গেলাম লীলানন্দ স্বামীর খোঁজে। কত নদী পার হইলাম, মাঠ ভাঙিলাম, মুদির দোকানে রাত কাটাইলাম, অবশেষে এক গ্রামে গিয়া শচীশকে ধরিলাম। তখন বেলা দুটো হইবে।

ইচ্ছা ছিল শচীশকে একলা পাই। কিন্তু জো কী! যে শিষ্যবাড়িতে স্বামীজি আশ্রয় লইয়াছেন তার দাওয়া আঙিনা লোকে লোকারণ্য। সমস্ত সকাল কীর্তন হইয়া গেছে। যে-সব লোক দূর হইতে আসিয়াছে তাহাদের আহারের জোগাড় চলিতেছে।

আমাকে দেখিয়া শচীশ ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। আমি অবাক হইলাম। শচীশ চিরদিন সংযত, তার স্তব্ধতার মধ্যে তার হৃদয়ের গভীরতার পরিচয়। আজ মনে হইল শচীশ নেশা করিয়াছে।

স্বামীজি ঘরের মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন। দরজার একটা পাল্লা একটু খোলা ছিল। আমাকে দেখিতে পাইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন, শচীশ!

ব্যস্ত হইয়া শচীশ ঘরে গেল। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করিলেন, ও কে?

শচীশ বলিল, শ্রীবিলাস, আমার বন্ধু।

তখনি লোকসমাজে আমার নাম রটিতে শুরু হইয়াছিল। আমার ইংরেজি বক্তৃতা শুনিয়া কোনো একজন বিদ্বান ইংরেজ বলিয়াছিলেন, ও লোকটা এমন— থাক্, সে-সব কথা লিখিয়া অনর্থক শত্রুবৃদ্ধি করিব না। আমি যে ধুরন্ধর নাস্তিক এবং ঘণ্টায় বিশ-পঁচিশ মাইল বেগে আশ্চর্য কায়দায় ইংরেজি বুলির চৌঘুড়ি হাঁকাইয়া চলিতে পারি, এ কথা ছাত্রসমাজ হইতে শুরু করিয়া ছাত্রদের পিতৃসমাজ পর্যন্ত রাষ্ট্র হইয়াছিল।

আমার বিশ্বাস, আমি আসিয়াছি জানিয়া স্বামীজি খুশি হইলেন। তিনি আমাকে দেখিতে চাহিলেন। ঘরে ঢুকিয়া একটা নমস্কার করিলাম; সে নমস্কারে কেবলমাত্র দুইখানা হাত খাঁড়ার মতো আমার কপাল পর্যন্ত উঠিল, মাথা নিচু হইল না। আমরা জ্যাঠামশায়ের চেলা, আমাদের নমস্কার গুণহীন ধনুকের মতো নমো অংশটা ত্যাগ করিয়া বিষম খাড়া হইয়া উঠিয়াছিল।

স্বামীজি সেটা লক্ষ করিলেন এবং শচীশকে বলিলেন, তামাকটা সাজিয়া দাও তো হে শচীশ।

শচীশ তামাক সাজিতে বসিল। তার টিকা যেমন ধরিতে লাগিল আমিও তেমনি জ্বলিতে লাগিলাম। কোথায় যে বসি ভাবিয়া পাইলাম না। আসবাবের মধ্যে এক তক্তপোশ, তার উপরে স্বামীজির বিছানা পাতা। সেই বিছানার এক পাশে বসাটা অসংগত মনে করি না— কিন্তু কী জানি, সে ঘটিয়া উঠিল না, দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

দেখিলাম, স্বামীজি জানেন আমি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের বৃত্তিওয়ালা। বলিলেন, বাবা, ডুবুরি মুক্তা তুলিতে সমুদ্রের তলায় গিয়া পৌঁছায়, কিন্তু সেখানেই যদি টিঁকিয়া যায় তবে রক্ষা নাই— মুক্তির জন্য তাকে উপরে উঠিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয়। বাঁচিতে চাও যদি বাপু, তবে এবার বিদ্যা-সমুদ্রের তলা হইতে ডাঙার উপরে উঠিতে হইবে। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের বৃত্তি তো পাইয়াছ এবার প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের নিবৃত্তিটা একবার দেখো।

শচীশ তামাক সাজিয়া তাঁর হাতে দিয়া তাঁর পায়ের দিকে মাটির উপরে বসিল। স্বামী তখনই

শচীশের দিকে তাঁর পা ছড়াইয়া দিলেন। শচীশ ধীরে ধীরে তাঁর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

দেখিয়া আমার মনে এতবড়ো একটা আঘাত বাজিল যে ঘরে থাকিতে পারিলাম না। বুঝিয়াছিলাম, আমাকে বিশেষ করিয়া ঘা দিবার জন্যই শচীশকে দিয়া এই তামাক-সাজানো, এই পা-টেপানো।

স্বামী বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অভ্যাগত সকলের খিচুড়ি খাওয়া হইল। বেলা পাঁচটা হইতে আবার কীর্তন শুরু হইয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলিল।

রাত্রে শচীশকে নিরালা পাইয়া বলিলাম, শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কী বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে? জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু কি এতবড়ো মৃত্যু?

আমার শ্রীবিলাস নামের প্রথম দুটো অক্ষরকে উলটাইয়া দিয়া শচীশ কিছু-বা স্নেহের কৌতুকে কিছু-বা আমার চেহারার গুণে আমাকে বিশ্রী বলিয়া ডাকিত। সে বলিল, বিশ্রী, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এ মুক্তিই বা ছাড়ি কেন। এ দুটো ব্যাপারই সেই আমার এক জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড এ তুমি নিশ্চয় জানিয়ো।

আমি বলিলাম, যাই বল, এই তামাক-সাজানো পা-টেপানো এ-সমস্ত উপসর্গ জ্যাঠামশায়ের ছিল না— মুক্তির এ চেহারা নয়।

শচীশ কহিল, সে যে ছিল ডাঙার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায় আমার হাত-পা-কে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর এ যে রসের সমুদ্র, এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা। তাই তো গুরু আমাকে এমন করিয়া চারি দিক হইতে সেবার মধ্যে আটকাইয়া ধরিয়াছেন; আমি পা টিপিয়া পার হইতেছি।

আমি বলিলাম, তোমার মুখে এ কথা মন্দ শোনায় না, কিন্তু যিনি তোমার দিকে এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন তিনি—

শচীশ কহিল, তাঁর সেবার দরকার নাই বলিয়াই এমন করিয়া পা বাড়াইয়া দিতে পারেন, যদি দরকার থাকিত তবে লজ্জা পাইতেন। দরকার যে আমারই।

বুঝিলাম, শচীশ এমন একটা জগতে আছে আমি যেখানে একেবারেই নাই। মিলনমাত্র যে আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে-আমি শ্রীবিলাস নয়, সে-আমি 'সর্বভূত'; সে আমি একটা আইডিয়া।

এই ধরনের আইডিয়া জিনিসটা মদের মতো; নেশার বিহ্বলতায় মাতাল যাকে-তাকে বুকে জড়াইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে পারে, তখন আমিই কী আর অন্যই কী। কিন্তু এই বুকে-জড়ানোতে মাতালের যতই আনন্দ থাক, আমার তো নাই; আমি তো ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা-বন্যার একটা ঢেউমাত্র হইতে চাই না— আমি যে আমি।

বুঝিলাম, তর্কের কর্ম নয়। কিন্তু শচীশকে ছাড়িয়া যাওয়া আমার সাধ্য ছিল না; শচীশের টানে এই দলের স্রোতে আমিও গ্রাম হইতে গ্রামে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে নেশায় আমাকেও পাইল; আমিও সবাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম, অশ্রুবর্ষণ করিলাম, গুরুর পা টিপিয়া দিতে লাগিলাম এবং একদিন হঠাৎ কী-এক আবেশে শচীশের এমন একটি অলৌকিক রূপ দেখিতে পাইলাম যাহা বিশেষ কোনো-একজন দেবতাতেই সম্ভব।

৫

আমাদের মতো এতবড়ো দুটো দুর্ধর্ষ ইংরেজিওয়ালা নাস্তিককে দলে জুটাইয়া লীলানন্দ স্বামীর নাম চারি দিকে রটিয়া গেল। কলিকাতাবাসী তাঁর ভক্তেরা এবার তাঁকে শহরে আসিয়া বসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল।

তিনি কলিকাতায় আসিলেন।

শিবতোষ বলিয়া তাঁর একটি পরম ভক্ত শিষ্য ছিল। কলিকাতায় থাকিতে স্বামী তারই বাড়িতে থাকিতেন; সমস্ত দলবল সমেত তাঁহাকে সেবা করাই তার জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল।

সে মরিবার সময় অল্পবয়সের নিঃসন্তান স্ত্রীকে জীবনস্বত্ব দিয়া তার কলিকাতার বাড়ি ও সম্পত্তি গুরুকে দিয়া যায়; তার ইচ্ছা ছিল এই বাড়িই কালক্রমে তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ-স্থল হইয়া উঠে। এই বাড়িতেই ওঠা গেল।

গ্রামে গ্রামে যখন মাতিয়া বেড়াইতেছিলাম সে একরকম ভাবে ছিলাম, কলিকাতায় আসিয়া সে নেশা জমাইয়া রাখা আমার পক্ষে শক্ত হইল। এতদিন একটা রসের রাজ্যে ছিলাম, সেখানে বিশ্বব্যাপিনী নারীর সঙ্গে চিত্তব্যাপী পুরুষের প্রেমের লীলা চলিতেছিল; গ্রামের গোরুচরা মাঠ, খেয়াঘাটের বটচ্ছায়া, অবকাশের আবেশে ভরা মধ্যাহ্ন এবং ঝিল্লিরবে আকম্পিত সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধতা তাহারই সুরে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। যেন স্বপ্নে চলিতেছিলাম, খোলা আকাশে বাধা পাই নাই—কঠিন কলিকাতায় আসিয়া মাথা ঠুকিয়া গেল, মানুষের ভিড়ের ধাক্কা খাইলাম—চটক ভাঙিয়া গেল। একদিন যে এই কলিকাতার মেসে দিনরাত্রি সাধনা করিয়া পড়া করিয়াছি, গোলদিঘিতে বন্ধুদের সঙ্গে মিলিয়া দেশের কথা ভাবিয়াছি, রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনীতে ভলান্-টিয়ারি করিয়াছি, পুলিসের অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া জেলে যাইবার জো হইয়াছি; এইখানে জ্যাঠামশায়ের ডাকে সাড়া দিয়া ব্রত লইয়াছি যে, সমাজের ডাকাতি প্রাণ দিয়া ঠেকাইব, সকল রকম গোলামির জাল কাটিয়া দেশের লোকের মনটাকে খালাস করিব; এইখানকার মানুষের ভিতর দিয়া আত্মীয়-অনাত্মীয় চেনা-অচেনা সকলের গালি খাইতে খাইতে পালের নৌকা যেমন করিয়া উজান জলে বুক ফুলাইয়া চলিয়া যায় যৌবনের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত তেমনি করিয়া চলিয়াছি; ক্ষুধাতৃষ্ণা সুখদুঃখ ভালোমন্দের বিচিত্র সমস্যায়-পাক-খাওয়া মানুষের ভিড়ের সেই কলিকাতায় অশ্রুবাষ্পাচ্ছন্ন রসের বিহ্বলতা জাগাইয়া রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ক্ষণে ক্ষণে মনে হইতে লাগিল আমি দুর্বল, আমি অপরাধ করিতেছি, আমার সাধনার জোর নাই। শচীশের দিকে তাকাইয়া দেখি, কলিকাতা শহরটা যে দুনিয়ার ভূবৃত্তান্তে কোনো-একটা জায়গায় আছে এমন চিহ্নই তার মুখে নাই, তার কাছে এ সমস্তই ছায়া।

৬

শিবতোষের বাড়িতে গুরুর সঙ্গেই একত্র আমরা দুই বন্ধু বাস করিতে লাগিলাম। আমরাই তাঁর প্রধান শিষ্য, তিনি আমাদিগকে কাছছাড়া করিতে চাহিলেন না।

গুরুকে লইয়া গুরুভাইদের লইয়া দিনরাত রসের ও রসতত্ত্বের আলোচনা চলিল। সেই-সব গভীর দুর্গম কথার মাঝখানে হঠাৎ এক-এক বার ভিতরের মহল হইতে একটি মেয়ের গলার উচ্চহাসি আসিয়া পৌঁছিত। কখনো কখনো শুনিতে পাইতাম একটি উচ্চসুরের ডাক—'বামী'। আমরা ভাবের যে-আশমানে মনটাকে বুঁদ করিয়া দিয়াছিলাম তার কাছে এগুলি অতি তুচ্ছ, কিন্তু হঠাৎ মনে হইত অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝরঝর করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। আমাদের দেয়ালের পাশের অদৃশ্যলোক হইতে ফুলের ছিন্ন পাপড়ির মতো জীবনের ছোটো ছোটো পরিচয়

যখন আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া যাইত তখন আমি মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতাম রসের লোক তো ঐখানেই—যেখানে সেই বামীর আঁচলে ঘরকন্নার চাবির গোচ্ছা বাজিয়া ওঠে, যেখানে রান্নাঘর হইতে রান্নার গন্ধ উঠিতে থাকে, যেখানে ঘর ঝাঁট দিবার শব্দ শুনিতে পাই, যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে তীব্রে স্থূলে সূক্ষ্মে মাখামাখি—সেইখানেই রসের স্বর্গ।

বিধবার নাম ছিল দামিনী। তাকে আড়ালে-আবডালে ক্ষণে ক্ষণে চকিতে দেখিতে পাইতাম। আমরা দুই বন্ধু গুরুর এমন একাত্ম ছিলাম যে অল্পকালের মধ্যেই আমাদের কাছে দামিনীর আর আড়াল-আবডাল রহিল না।

দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী; বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে।

শচীশের ডায়ারিতে এক জায়গায় আছে :

ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি—অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ; সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।

দামিনী সম্বন্ধে গোড়াকার দিকের কথাটা বলিয়া লই। পাটের ব্যবসায়ে একদিন যখন তার বাপ অন্নদাপ্রসাদের তহবিল মুনাফার হঠাৎ-প্লাবনে উপছিয়া পড়িল সেই সময়ে শিবতোষের সঙ্গে দামিনীর বিবাহ। এতদিন কেবলমাত্র শিবতোষের কুল ভালো ছিল, এখন তার কপাল ভালো হইল। অন্নদা জামাইকে কলিকাতায় একটি বাড়ি এবং যাহাতে খাওয়াপরার কষ্ট না হয় এমন সংস্থান করিয়া দিলেন। ইহার উপরে গহনাপত্র কম দেন নাই।

শিবতোষকে তিনি আপন আপিসে কাজ শিখাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবতোষের স্বভাবতই সংসারে মন ছিল না। একজন গনৎকার তাহাকে একদিন বলিয়া দিয়াছিল কোন্-এক বিশেষ যোগে বৃহস্পতির কোন্-এক বিশেষ দৃষ্টিতে সে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠিবে। সেই দিন হইতে জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায় সে কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীয় পদার্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে বসিল। ইতিমধ্যে লীলানন্দ স্বামীর কাছে সে মন্ত্র লইল।

এ দিকে ব্যবসায়ের উলটা হাওয়ার ঝাপটা খাইয়া অন্নদার ভরা পালের ভাগ্যতরী একেবারে কাত হইয়া পড়িল। এখন বাড়িঘর সমস্ত বিক্রি হইয়া আহার চলা দায়।

একদিন শিবতোষ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির ভিতরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিল, স্বামীজি আসিয়াছেন, তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন, কিছু উপদেশ দিবেন। দামিনী বলিল, না, এখন আমি যাইতে পারিব না। আমার সময় নাই।

সময় নাই! শিবতোষ কাছে আসিয়া দেখিল, দামিনী অন্ধকার ঘরে বসিয়া গহনার বাক্স খুলিয়া গহনাগুলি বাহির করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, এ কী করিতেছ? দামিনী কহিল, আমি গহনা গুছাইতেছি।

এই জন্যই সময় নাই! বটে! পরদিন দামিনী লোহার সিন্দুক খুলিয়া দেখিল তার গহনার বাক্স নাই। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার গহনা? স্বামী বলিল, সে তো তুমি তোমার গুরুকে নিবেদন করিয়াছ। সেইজন্যই তিনি ঠিক সেই সময়ে তোমাকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি যে অন্তর্যামী; তিনি তোমার কাঞ্চনের লোভ হরণ করিলেন।

দামিনী আগুন হইয়া কহিল, দাও আমার গহনা।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিল, কেন, কী করিবে?

দামিনী কহিল, আমার বাবার দান, সে আমি আমার বাবাকে দিব।

শিবতোষ কহিল, তার চেয়ে ভালো জায়গায় পড়িয়াছে। বিষয়ীর পেট না ভরাইয়া ভক্তের সেবায় তাহার উৎসর্গ হইয়াছে।

এমনি করিয়া ভক্তির দস্যুবৃত্তি শুরু হইল। জোর করিয়া দামিনীর মন হইতে সকল প্রকার বাসনা-কামনার ভূত ঝাড়াইবার জন্য পদে পদে ওঝার উৎপাত চলিতে লাগিল। যে সময়ে দামিনীর বাপ এবং তার ছোটো ছোটো ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়িতে প্রত্যহ ষাট-সত্তরজন ভক্তের সেবার অন্ন তাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া তরকারিতে সে নুন দেয় নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিয়াছে তবু তার তপস্যা এমনি করিয়া চলিতে লাগিল।

এমন সময় তার স্বামী মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল। সমস্ত সম্পত্তি-সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।

৭

ঘরের মধ্যে অবিশ্রাম ভক্তির ঢেউ উঠিতেছে। কত দূর হইতে কত লোক আসিয়া গুরুর শরণ লইতেছে। আর দামিনী বিনা চেষ্টায় ইঁহার কাছে আসিতে পারিল, অথচ সেই দুর্লভ সৌভাগ্যকে সে দিনরাত অপমান করিয়া খেদাইয়া রাখিল!

গুরু যেদিন তাকে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতে ডাকিতেন সে বলিত, আমার মাথা ধরিয়াছে। যেদিন তাঁহাদের সন্ধ্যাবেলাকার আয়োজনে কোনো বিশেষ ত্রুটি লক্ষ করিয়া তিনি দামিনীকে প্রশ্ন করিতেন সে বলিত, আমি থিয়েটারে গিয়াছিলাম। এ উত্তরটা সত্য নহে, কিন্তু কটু। ভক্ত মেয়ের দল আসিয়া দামিনীর কাণ্ড দেখিয়া গালে হাত দিয়া বসিত। একে তো তার বেশভূষা বিধবার মতো নয়, তার পরে গুরুর উপদেশবাক্যের সে কাছ দিয়া যায় না, তার পরে এতবড়ো মহাপুরুষের এত কাছে থাকিলে আপনিই যে একটি সংযমে শুচিতায় শরীর মন আলো হইয়া ওঠে এর মধ্যে তার কোনো লক্ষণ নাই। সকলেই বলিল, ধন্যি বটে! ঢের ঢের দেখিয়াছি, কিন্তু এমন মেয়েমানুষ দেখি নাই।

স্বামীজি হাসিতেন। তিনি বলিতেন, যার জোর আছে ভগবান তারই সঙ্গে লড়াই করিতে ভালোবাসেন। এক দিন এ যখন হার মানিবে তখন এর মুখে আর কথা থাকিবে না।

তিনি অত্যন্ত বেশি করিয়া ইহাকে ক্ষমা করিতে লাগিলেন। সেই রকমের ক্ষমা দামিনীর কাছে আরো বেশি অসহ্য হইতে লাগিল, কেননা তাহা যে শাসনের নামান্তর। গুরু দামিনীর সঙ্গে ব্যবহারে অতিরিক্ত ভাবে যে মাধুর্য প্রকাশ করিতেন এক দিন হঠাৎ শুনিতে পাইলেন দামিনী কোনো-এক সঙ্গিনীর কাছে তারই নকল করিয়া হাসিতেছে।

তবু তিনি বলিলেন, যা অঘটন তা ঘটিবে এবং সেইটে দেখাইবার জন্যই দামিনী বিধাতার উপলক্ষ হইয়া আছে—ও বেচারার দোষ নাই।

আমরা প্রথম আসিয়া কয়েকদিন দামিনীর এই অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তার পরে অঘটন ঘটিতে শুরু হইল।

আর লিখিতে ইচ্ছা হয় না—লেখাও কঠিন। জীবনের পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যে জাল বোনা হইতে থাকে তার নক্‌শা কোনো শাস্ত্রের নয়, ফরমাশের নয়—তাই তো ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা খাইতে হয়, এত কান্না ফাটিয়া পড়ে।

বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন্ ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া

গেল, আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশির-ভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল। দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে এমন সুন্দর হইয়া উঠিল যে, তার মাধুর্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্তবৎসলের যেন বিশেষ একটি বর আসিয়া পৌঁছিল।

এমনি করিয়া দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীশ তার শোভা দেখিতে লাগিল। কিন্তু আমি বলিতেছি শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।

শচীশের বসিবার ঘরে চীনামাটির ফলকের উপর লীলানন্দ স্বামীর ধ্যানমূর্তির একটি ফোটোগ্রাফ ছিল। একদিন সে দেখিল, তাহা ভাঙিয়া মেজের উপরে টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়া আছে। শচীশ ভাবিল, তার পোষা বিড়ালটা এই কাণ্ড করিয়াছে। মাঝে মাঝে আরো এমন অনেক উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল যা বন্য বিড়ালেরও অসাধ্য।

চারি দিকের আকাশে একটা চঞ্চলতার হাওয়া উঠিল। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ ভিতরে ভিতরে খেলিতে লাগিল। অন্যের কথা জানি না, ব্যথায় আমার মনটা টনটন করিতে থাকিত। এক-এক বার ভাবিতাম দিনরাত্রি এই রসের তরঙ্গ আমার সহিল না—ইহার মধ্য হইতে একেবারে এক ছুটে দৌড় দিব; সেই-যে চামারদের ছেলেগুলাকে লইয়া সর্বপ্রকার রসবর্জিত বাংলা বর্ণমালার যুক্ত-অক্ষরের আলোচনা চলিত সে আমার বেশ ছিল।

একদিন শীতের দুপুরবেলায় গুরু যখন বিশ্রাম করিতেছেন এবং ভক্তেরা ক্লান্ত, শচীশ কী একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাঠের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মেজের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে, পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।

ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।

৮

গুরুজি প্রতি বছরে একবার করিয়া কোনো দুর্গম জায়গায় নির্জনে বেড়াইতে যাইতেন। মাঘ মাসে সেই তাঁর সময় হইয়াছে। শচীশ বলিল, আমি সঙ্গে যাইব।

আমি বলিলাম, আমিও যাইব। রসের উত্তেজনায় আমি একেবারে মজ্জায় মজ্জায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। কিছুদিন ভ্রমণের ক্লেশ এবং নির্জনে বাস আমার নিতান্ত দরকার ছিল।

স্বামীজি দামিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইব। অন্যবারে এই সময়ে যেমন তুমি তোমার মাসির বাড়ি গিয়া থাকিতে, এবারেও সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিই।

দামিনী বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।

স্বামীজি কহিলেন, পারিবে কেন। সে যে বড়ো শক্ত পথ।

দামিনী বলিল, পারিব। আমাকে লইয়া কিছু ভাবিতে হইবে না।

স্বামী দামিনীর এই নিষ্ঠায় খুশি হইলেন। অন্য অন্য বছর এই সময়টাই দামিনীর ছুটির দিন ছিল, সংবৎসর ইহারই জন্য তার মন পথ চাহিয়া থাকিত। স্বামী ভাবিলেন, এ কী অলৌকিক কাণ্ড। ভগবানের রসের রসায়নে পাথরকে নবনী করিয়া তোলে কেমন করিয়া!

কিছুতে ছাড়িল না, দামিনী সঙ্গে গেল।

৯

সেদিন প্রায় ছয় ঘণ্টা রৌদ্রে হাঁটিয়া আমরা যে জায়গায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম সেটা সমুদ্রের মধ্যে একটা অন্তরীপ। একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ; নারিকেলবনের পল্লববীজনের সঙ্গে শান্তপ্রায় সমুদ্রের অলস কল্লোল মিশিতেছিল। ঠিক মনে হইল, যেন ঘুমের ঘোরে পৃথিবীর একখানি ক্লান্ত হাত সমুদ্রের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। সেই হাতের তেলোর উপরে একটি নীলাভ সবুজ রঙের ছোটো পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে অনেক কালের খোদিত এক গুহা আছে। সেটি বৌদ্ধ কি হিন্দু, তার গায়ে যে-সব মূর্তি তাহা বুদ্ধের না বাসুদেবের, তার শিল্পকলায় গ্রীকের প্রভাব আছে কি নাই, এ লইয়া পণ্ডিতমহলে গভীর একটা অশান্তির কারণ ঘটিয়াছে।

কথা ছিল গুহা দেখিয়া আমরা লোকালয়ে ফিরিব। কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই। দিন তখন শেষ হয়, তিথি সেদিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। গুরুজি বলিলেন, আজ এই গুহাতেই রাত কাটাইতে হইবে।

আমরা সমুদ্রের ধারে বনের তলায় বালুর 'পরে তিন জনে বসিলাম। সমুদ্রের পশ্চিম প্রান্তে সূর্যাস্তটি আসন্ন অন্ধকারের সম্মুখে দিবসের শেষ প্রণামের মতো নত হইয়া পড়িল। গুরুজি গান ধরিলেন— আধুনিক কবির গানটা তাঁর চলে—

পথে যেতে তোমার সাথে
　　মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে, সাঁঝের আলো
　　মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।

সেদিন গানটি বড়ো জমিল। দামিনীর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। স্বামীজি অন্তরা ধরিলেন—

দেখা তোমায় হোক বা না হোক
তাহার লাগি করব না শোক,
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার
　　চরণ ঢাকি এলোকেশে।

স্বামী যখন থামিলেন সেই আকাশ-ভরা সমুদ্র-ভরা সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের রসে একটি সোনালি রঙের পাকা ফলের মতো ভরিয়া উঠিল। দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল— অনেক-ক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

১০

শচীশের ডায়ারিতে লেখা আছে :

গুহার মধ্যে অনেকগুলি কামরা। আমি তার মধ্যে একটাতে কম্বল পাতিয়া শুইলাম।

সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো— তার ভিজা নিশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে; সে অনন্ত কাল এই গুহার মধ্যে বন্দী; তার মন নাই— সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে— সে নিঃশব্দে কাঁদে।

ক্লান্তি একটা ভারের মতো আমার সমস্ত শরীরকে চাপিয়া ধরিল, কিন্তু কোনোমতেই ঘুম আসিল না। একটা কী পাখি, হয়তো বাদুড় হইবে, ভিতর হইতে বাহিরে কিংবা বাহির হইতে ভিতরে

ঝপ ঝপ ডানার শব্দ করিতে করিতে অন্ধকার হইতে অন্ধকারে চলিয়া গেল। আমার গায়ে তার হাওয়া দিতে সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

মনে করিলাম, বাহিরে গিয়া শুইব। কোন্ দিকে যে গুহার দ্বার তা ভুলিয়া গেছি। গুঁড়ি মারিয়া এক দিকে চলিতে চেষ্টা করিয়া মাথা ঠেকিয়া গেল, আর-এক দিকে মাথা ঠুকিলাম, আর-এক দিকে একটা ছোটো গর্তের মধ্যে পড়িলাম— সেখানে গুহার ফাটল-চোঁয়ানো জল জমিয়া আছে।

শেষে ফিরিয়া আসিয়া কম্বলটার উপর শুইলাম। মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।

ঘুমাইতে পারিলে বাঁচি; আমার জাগ্রৎচৈতন্য এত বড়ো সর্বনাশা অন্ধকারের নিবিড় আলিঙ্গন সহিতে পারে না, এ কেবল মৃত্যুরই সহে।

জানি না কতক্ষণ পরে— সেটা বোধ করি ঠিক ঘুম নয়— অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা!

তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁয়া আছে— এর রোঁয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম ল্যাজ কিছুই জানা নাই— তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ!

ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে— ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে— সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।

অবশেষে আমার ঘোরটা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তার গায়ে রোঁয়া নাই, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম।

অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?

গুহা হইতে ফিরিয়া আসিলাম। গ্রামে মন্দিরের কাছে গুরুজির কোনো শিষ্যবাড়ির দোতলার ঘরগুলিতে আমাদের বাসা ঠিক হইয়াছিল।

গুহা হইতে ফেরার পর হইতে দামিনীকে আর বড়ো দেখা যায় না। সে আমাদের জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু পারতপক্ষে দেখা দেয় না। সে এখানকার পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছে, সমস্ত দিন তাদেরই মধ্যে এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায়।

গুরুজি কিছু বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, মাটির বাসার দিকেই দামিনীর টান, আকাশের দিকে নয়। কিছুদিন যেমন সে দেবপূজার মতো করিয়া আমাদের সেবায় লাগিয়াছিল এখন তাহাতে ক্লান্তি দেখিতে পাই, ভুল হয়, কাজের মধ্যে তার সেই সহজ শ্রী আর দেখা যায় না।

গুরুজি আবার তাকে মনে মনে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দামিনীর ভুরুর মধ্যে কয়দিন হইতে একটা ভ্রূকুটি কালো হইয়া উঠিতেছে এবং তার মেজাজের হাওয়াটা কেমন যেন এলোমেলো বহিতে শুরু করিয়াছে।

দামিনীর এলোখোঁপাবাঁধা ঘাড়ের দিকে, ঠোঁটের মধ্যে, চোখের কোণে এবং ক্ষণে ক্ষণে হাতের একটা আক্ষেপে একটা কঠোর অবাধ্যতার ইশারা দেখা যাইতেছে।

আবার গুরুজি গানে কীর্তনে বেশি করিয়া মন দিলেন। ভাবিলেন, মিষ্টগন্ধে উড়ো ভ্রমরটা আপনি ফিরিয়া আসিয়া মধুকোষের উপর স্থির হইয়া বসিবে। হেমন্তের ছোটো ছোটো দিনগুলো গানের মদে ফেনাইয়া যেন উপচিয়া পড়িল।

কিন্তু কই, দামিনী তো ধরা দেয় না! গুরুজি ইহা লক্ষ করিয়া একদিন হাসিয়া বলিলেন, ভগবান শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন, হরিণী পালাইয়া এই শিকারের রস আরো জমাইয়া তুলিতেছে; কিন্তু মরিতেই হইবে।

প্রথমে দামিনীর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় তখন সে ভক্তমণ্ডলীর মাঝে প্রত্যক্ষ ছিল না, কিন্তু সেটা আমরা খেয়াল করি নাই। এখন সে যে নাই সেইটেই আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তাকে না দেখিতে পাওয়াটাই ঝোড়ো হাওয়ার মতো আমাদিগকে এ দিক ও দিক হইতে ঠেলা দিতে লাগিল। গুরুজি তার অনুপস্থিতিটাকে অহংকার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, সুতরাং সেটা তাঁর অহংকারে কেবলই ঘা দিতে থাকিত। আর আমি—আমার কথাটা বলিবার প্রয়োজন নাই।

একদিন গুরুজি সাহস করিয়া দামিনীকে যথাসম্ভব মৃদুমধুর সুরে বলিলেন, দামিনী, আজ বিকালের দিকে তোমার কি সময় হইবে? তা হইলে—

দামিনী কহিল, না।

কেন বলো দেখি।

পাড়ায় নাড়ু কুটিতে যাইব।

নাড়ু কুটিতে? কেন।

নন্দীদের বাড়ি বিয়ে।

সেখানে কি তোমার নিতান্তই—

হাঁ, আমি তাদের কথা দিয়াছি।

আর কিছু না বলিয়া দামিনী একটা দমকা হাওয়ার মতো চলিয়া গেল। শচীশ সেখানে বসিয়াছিল, সে তো অবাক। কত মানী গুণী ধনী বিদ্বান তার গুরুর কাছে মাথা নত করিয়াছে, আর ঐ একটুখানি মেয়ে ওর কিসের এমন অকুণ্ঠিত তেজ!

আর-একদিন সন্ধ্যার সময় দামিনী বাড়ি ছিল। সেদিন গুরু একটু বিশেষভাবে একটা বড়ো

রকমের কথা পাড়িলেন। খানিক দূর এগোতেই তিনি আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া একটা যেন ফাঁকা কিছু বুঝিলেন। দেখিলেন, আমরা অন্যমনস্ক। পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, দামিনী যেখানে বসিয়া জামায় বোতাম লাগাইতেছিল সেখানে সে নাই। বুঝিলেন, আমরা দুইজনে ঐ কথাটাই ভাবিতেছি যে, দামিনী উঠিয়া চলিয়া গেল। তাঁর মনে ভিতরে ভিতরে ঝুমঝুমির মতো বার বার বাজিতে লাগিল যে দামিনী শুনিল না, তাঁর কথা শুনিতেই চাহিল না। যাহা বলিতেছিলেন তার খেই হারাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আর থাকিতে পারিলেন না। দামিনীর ঘরের কাছে আসিয়া বলিলেন, দামিনী, এখানে একলা কী করিতেছ? ও ঘরে আসিবে না?

দামিনী কহিল, না, একটু দরকার আছে।

গুরু উঁকি মারিয়া দেখিলেন, খাঁচার মধ্যে একটা চিল। দিন দুই হইল কেমন করিয়া টেলিগ্রাফের তারে ঘা খাইয়া চিলটা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, সেখানে কাকের দলের হাত হইতে দামিনী তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনে, তার পর হইতে শুশ্রূষা চলিতেছে।

এই তো গেল চিল—আবার দামিনী একটা কুকুরের বাচ্ছা জোটাইয়াছে, তার রূপও যেমন কৌলীন্যও তেমনি। সে একটা মূর্তিমান রসভঙ্গ। করতালের একটু আওয়াজ পাইবামাত্র সে আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বিধাতার কাছে আর্তস্বরে নালিশ করিতে থাকে; সে নালিশ বিধাতা শোনেন না বলিয়াই রক্ষা, কিন্তু যারা শোনে তাদের ধৈর্য থাকে না।

একদিন যখন ছাদের কোণে একটা ভাঙা হাঁড়িতে দামিনী ফুলগাছের চর্চা করিতেছে এমন সময় শচীশ তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজকাল তুমি ওখানে যাওয়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছ কেন।

কোন্‌খানে?

গুরুজির কাছে।

কেন, আমাকে তোমাদের কিসের প্রয়োজন?

প্রয়োজন আমাদের কিছু নাই, কিন্তু তোমার তো প্রয়োজন আছে।

দামিনী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, কিছু না, কিছু না!

শচীশ স্তম্ভিত হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, দেখো, তোমার মন অশান্ত হইয়াছে, যদি শান্তি পাইতে চাও তবে—

তোমরা আমাকে শান্তি দিবে? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলিয়া তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায়? জোড়হাত করি তোমাদের রক্ষা করো আমাকে—আমি শান্তিতেই ছিলাম। আমি শান্তিতেই থাকিব।

শচীশ বলিল, উপরে ঢেউ দেখিতেছ বটে, কিন্তু ধৈর্য ধরিয়া ভিতরে তলাইতে পারিলে দেখিবে সেখানে সমস্ত শান্ত।

দামিনী দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, ওগো, দোহাই তোমাদের, আমাকে আর তলাইতে বলিয়ো না। আমার আশা তোমরা ছাড়িয়া দিলে তবে আমি বাঁচিব।

২

নারীর হৃদয়ের রহস্য জানিবার মতো অভিজ্ঞতা আমার হইল না। নিতান্তই উপর হইতে, বাহির হইতে, যেটুকু দেখিলাম তাহাতে আমার এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেইখানেই তারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরণমালা গাঁথে যে লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে; আর তা যদি না হইল তবে এমন কারো দিকে তারা লক্ষ্য করে যার কণ্ঠে তাদের মালা পোঁছায় না, যে মানুষ ভাবের সূক্ষ্মতায় এমনি

মিলাইয়াছে যেন নাই বলিলেই হয়। মেয়েরা স্বয়ংবরা হইবার বেলায় তাদেরই বর্জন করে যারা আমাদের মতো মাঝারি মানুষ, যারা স্থূলে সূক্ষ্মে মিশাইয়া তৈরি—নারীকে যারা নারী বলিয়াই জানে, অর্থাৎ, এটুকু জানে যে, তারা কাদায় তৈরি খেলার পুতুল নয় আবার সুরে তৈরি বীণার ঝংকারমাত্রও নহে। মেয়েরা আমাদের ত্যাগ করে, কেননা আমাদের মধ্যে না আছে লুব্ধ লালসার দুর্দান্ত মোহ, না আছে বিভোর ভাবুকতার রঙিন মায়া; আমরা প্রবৃত্তির কঠিন পীড়নে তাদের ভাঙিয়া ফেলিতেও পারি না, আবার ভাবের তাপে গলাইয়া আপন কল্পনার ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেও জানি না; তারা যা, আমরা তাদের ঠিক তাই বলিয়াই জানি—এইজন্য তারা যদি বা আমাদের পছন্দ করে, ভালোবাসিতে পারে না। আমরাই তাদের সত্যকার আশ্রয়, আমাদেরই নিষ্ঠার উপর তারা নির্ভর করিতে পারে, আমাদের আত্মোৎসর্গ এতই সহজ যে তার কোনো দাম আছে সে কথা তারা ভুলিয়াই যায়। আমরা তাদের কাছে এইটুকুমাত্র বকশিশ পাই যে, তারা দরকার পড়িলেই নিজের ব্যবহারে আমাদের লাগায়, এবং হয়তো বা আমাদের শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু—যাক, এ-সব খুব সম্ভব ক্ষোভের কথা, খুব সম্ভব এ-সমস্ত সত্য নয়, খুব সম্ভব আমরা যে কিছুই পাই না সেইখানেই আমাদের জিত—অন্তত, সেই কথা বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া থাকি।

দামিনী গুরুজির কাছে ঘেঁষে না তাঁর প্রতি তার একটা রাগ আছে বলিয়া; দামিনী শচীশকে কেবলই এড়াইয়া চলে তার প্রতি তার মনের ভাব ঠিক উলটা রকমের বলিয়া। কাছাকাছি আমিই একমাত্র মানুষ যাকে লইয়া রাগ বা অনুরাগের কোনো বালাই নাই। সেইজন্য দামিনী আমার কাছে তার সেকালের কথা, একালের কথা, পাড়ায় কবে কী দেখিল কী হইল সেই-সমস্ত সামান্য কথা, সুযোগ পাইলেই অনর্গল বকিয়া যায়। আমাদের দোতলার ঘরের সামনে যে খানিকটা ঢাকা ছাদ আছে সেইখানে বসিয়া জাঁতি দিয়া সুপারি কাটিতে কাটিতে দামিনী যাহা-তাহা বকে—পৃথিবীর মধ্যে এই অতি সামান্য ঘটনাটা যে আজকাল শচীশের ভাবে-ভোলা চোখে এমন করিয়া পড়িবে তাহা আমি মনে করিতে পারিতাম না। ঘটনাটা হয়তো সামান্য না হইতে পারে, কিন্তু আমি জানিতাম, শচীশ যে মুল্লুকে বাস করে সেখানে ঘটনা বলিয়া কোনো উপসর্গই নাই; সেখানে হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ও যোগমায়া যাহা ঘটাইতেছে সে একটা নিত্যলীলা, সুতরাং তাহা ঐতিহাসিক নহে—সেখানকার চিরযমুনাতীরের চিরধীর সমীরের বাঁশি যারা শুনিতেছে তারা যে আশ-পাশের অনিত্য ব্যাপার চোখে কিছু দেখে বা কানে কিছু শোনে হঠাৎ তাহা মনে হয় না। অন্তত গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পূর্বে শচীশের চোখ-কান ইহা অপেক্ষা অনেকটা বোজা ছিল।

আমারও একটু ত্রুটি ঘটিতেছিল। আমি মাঝে মাঝে আমাদের রসালোচনার আসরে গরহাজির হইতে শুরু করিয়াছিলাম। সেই ফাঁক শচীশের কাছে ধরা পড়িতে লাগিল। একদিন সে আসিয়া দেখিল, গোয়ালাবাড়ি হইতে এক ভাঁড় দুধ কিনিয়া আনিয়া দামিনীর পোষা বেজিকে খাওয়াইবার জন্য তার পিছনে ছুটিতেছি। কৈফিয়তের হিসাবে এ কাজটা নিতান্তই অচল, সভাভঙ্গ পর্যন্ত এটা মুলতবি রাখিলে লোকসান ছিল না, এমন-কি বেজির ক্ষুধানিবৃত্তির ভার স্বয়ং বেজির 'পরে রাখিলে জীবে দয়ার অত্যন্ত ব্যত্যয় হইত না অথচ নামে রুচির পরিচয় দিতে পারিতাম। তাই হঠাৎ শচীশকে দেখিয়া অপ্রস্তুত হইতে হইল। ভাঁড়টা সেইখানে রাখিয়া আত্মমর্যাদা-উদ্ধারের পন্থায় সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম।

কিন্তু, আশ্চর্য দামিনীর ব্যবহার। সে একটুও কুণ্ঠিত হইল না; বলিল, কোথায় যান শ্রীবিলাসবাবু?

আমি মাথা চুলকাইয়া বলিলাম, একবার—

দামিনী বলিল, উহাদের গান এতক্ষণে শেষ হইয়া গেছে। আপনি বসুন-না।

শচীশের সামনে দামিনীর এইপ্রকার অনুরোধে আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল।

দামিনী কহিল, বেজিটাকে লইয়া মুশকিল হইয়াছে—কাল রাত্রে পাড়ার মুসলমানদের বাড়ি

হইতে ও একটা মুরগি চুরি করিয়া খাইয়াছে। উহাকে ছাড়া রাখিলে চলিবে না। শ্রীবিলাসবাবুকে বলিয়াছি একটা বড়ো দেখিয়া ঝুড়ি কিনিয়া আনিতে, উহাকে চাপা দিয়া রাখিতে হইবে।

বেজিকে দুধ খাওয়ানো, বেজির ঝুড়ি কিনিয়া আনা প্রভৃতি উপলক্ষে শ্রীবিলাসবাবুর আনুগত্যটা শচীশের কাছে দামিনী যেন একটু উৎসাহ করিয়াই প্রচার করিল। যেদিন গুরুজি আমার সামনে শচীশকে তামাক সাজিতে বলিয়াছিলেন সেই দিনের কথাটা মনে পড়িল। জিনিসটা একই।

শচীশ কোনো কথা না বলিয়া কিছু দ্রুত চলিয়া গেল। দামিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখি, শচীশ যে দিকে চলিয়া গেল সেই দিকে তাকাইয়া তার চোখ দিয়া বিদ্যুৎ ঠিকরিয়া পড়িল— সে মনে মনে কঠিন হাসি হাসিল।

কী যে সে বুঝিল তা সেই জানে কিন্তু ফল হইল এই, নিতান্ত সামান্য ছুতো করিয়া দামিনী আমাকে তলব করিতে লাগিল। আবার, এক-একদিন নিজের হাতে কোনো-একটা মিষ্টান্ন তৈরি করিয়া বিশেষ করিয়া আমাকেই সে খাওয়াইতে বসিল। আমি বলিলাম, শচীশদাকে—

দামিনী বলিল, তাঁকে খাইতে ডাকিলে বিরক্ত করা হইবে।

শচীশ মাঝে মাঝে দেখিয়া গেল আমি খাইতে বসিয়াছি।

তিনজনের মধ্যে আমার দশাটাই সব চেয়ে মন্দ। এই নাট্যের মুখ্য পাত্র যে দুটি তাদের অভিনয়ের আগাগোড়াই আত্মগত— আমি আছি প্রকাশ্যে, তার একমাত্র কারণ, আমি নিতান্তই গৌণ। তাহাতে এক-একবার নিজের ভাগ্যের উপরে রাগও হয়, অথচ উপলক্ষ সাজিয়া যেটুকু নগদ বিদায় জোটে সেটুকুর লোভও সামলাইতে পারি না। এমন মুশকিলেও পড়িয়াছি!

৩

কিছুদিন শচীশ পূর্বের চেয়ে আরও অনেক বেশি জোরের সঙ্গে করতাল বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করিয়া বেড়াইল। তার পরে একদিন সে আসিয়া আমাকে বলিল, দামিনীকে আমাদের মধ্যে রাখা চলিবে না।

আমি বলিলাম, কেন?

সে বলিল, প্রকৃতির সংসর্গ আমাদের একেবারে ছাড়িতে হইবে।

আমি বলিলাম, তা যদি হয় তবে বুঝিব আমাদের সাধনার মধ্যে মস্ত একটা ভুল আছে।

শচীশ আমার মুখের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, তুমি যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছ সেটা তো একটা প্রকৃত জিনিস; তুমি তাকে বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে তো বাদ পড়ে না। অতএব, সে যেন নাই এমন ভাবে যদি সাধনা করিতে থাক তবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হইবে; একদিন সে ফাঁকি এমন ধরা পড়িবে তখন পালাইবার পথ পাইবে না।

শচীশ কহিল, ন্যায়ের তর্ক রাখো। আমি বলিতেছি কাজের কথা। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে মেয়েরা প্রকৃতির চর, প্রকৃতির হুকুম তামিল করিবার জন্যই নানা সাজে সাজিয়া তারা মনকে ভোলাইতে চেষ্টা করিতেছে। চৈতন্যকে আবিষ্ট করিতে না পারিলে তারা মনিবের কাজ হাসিল করিতে পারে না। সেই জন্য চৈতন্যকে খোলসা রাখিতে হইলে প্রকৃতির এই-সমস্ত দূতীগুলিকে যেমন করিয়া পারি এড়াইয়া চলা চাই।

আমি কী-একটা বলিতে যাইতেছিলাম, আমাকে বাধা দিয়া শচীশ বলিল, ভাই বিশ্রী, প্রকৃতির মায়া দেখিতে পাইতেছ না, কেননা সেই মায়ার ফাঁদে আপনাকে জড়াইয়াছ। যে সুন্দর রূপ দেখাইয়া আজ তোমাকে সে ভুলাইয়াছে, প্রয়োজনের দিন ফুরাইয়া গেলেই সেই রূপের মুখোশ সে খসাইয়া

ফেলিবে; যে তৃষ্ণার চশমায় ঐ রূপকে তুমি বিশ্বের সমস্তের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছ সময় গেলেই তৃষ্ণাকে সুদ্ধ একেবারে লোপ করিয়া দিবে। যেখানে মিথ্যার ফাঁদ এমন স্পষ্ট করিয়া পাতা, দরকার কী সেখানে বাহাদুরি করিতে যাওয়া?

আমি বলিলাম, তোমার কথা সবই মানিতেছি ভাই, কিন্তু আমি এই বলি, প্রকৃতির বিশ্বজোড়া ফাঁদ আমি নিজের হাতে পাতি নাই এবং সেটাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া চলি এমন জায়গা আমি জানি না। ইহাকে বেকবুল করা যখন আমাদের হাতে নাই তখন সাধনা তাহাকেই বলি যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়। যাই বল ভাই, আমরা সে রাস্তায় চলিতেছি না, তাই সত্যকে আধখানা ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য এত বেশি ছটফট করিয়া মরি।

শচীশ বলিল, তুমি কী রকম সাধনা চালাইতে চাও আর-একটু স্পষ্ট করিয়া বলো শুনি।

আমি বলিলাম, প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব; সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে। সেই জন্যই হালের দরকার।

শচীশ বলিল, তোমরা গুরু মান না বলিয়াই জান না যে, গুরুই আমাদের সেই হাল। সাধনাকে নিজের খেয়ালমত গড়িতে চাও? শেষকালে মরিবে।

এই কথা বলিয়া শচীশ গুরুর ঘরে গেল এবং তাঁর পায়ের কাছে বসিয়া পা টিপিতে শুরু করিয়া দিল। সেইদিন শচীশ গুরুর জন্য তামাক সাজিয়া দিয়া তাঁর কাছে প্রকৃতির নামে নালিশ রুজু করিল।

একদিনের তামাকে কথাটা শেষ হইল না। অনেকদিন ধরিয়া গুরু অনেক চিন্তা করিলেন। দামিনীকে লইয়া তিনি বিস্তর ভুগিয়াছেন। এখন দেখিতেছেন, এই একটিমাত্র মেয়ে তাঁর ভক্তদের একটানা ভক্তিস্রোতের মাঝখানে বেশ একটি ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু, শিবতোষ বাড়ি-ঘর-সম্পত্তি-সমেত দামিনীকে তাঁর হাতে এমন করিয়া সঁপিয়া গেছে যে, তাকে কোথায় সরাইবেন তা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। তার চেয়ে কঠিন এই যে, গুরু দামিনীকে ভয় করেন।

এ দিকে শচীশ উৎসাহের মাত্রা দ্বিগুণ চৌগুণ চড়াইয়া এবং ঘন ঘন গুরুর পা টিপিয়া, তামাক সাজিয়া, কিছুতেই এ কথা ভুলিতে পারিল না যে, প্রকৃতি তার সাধনার রাস্তায় দিব্য করিয়া আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছে।

একদিন পাড়ায় গোবিন্দজির মন্দিরে একদল নামজাদা বিদেশী কীর্তনওয়ালার কীর্তন চলিতেছিল। পালা শেষ হইতে অনেক রাত হইবে। আমি গোড়ার দিকেই ফস করিয়া উঠিয়া আসিলাম; আমি যে নাই তা সেই ভিড়ের মধ্যে কারও কাছে ধরা পড়িবে মনে করি নাই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় দামিনীর মন খুলিয়া গিয়াছিল। যে-সব কথা ইচ্ছা করিলেও বলিয়া ওঠা যায় না, বাধিয়া যায়, তাও সেদিন বড়ো সহজে এবং সুন্দর করিয়া তার মুখ দিয়া বাহির হইল। বলিতে বলিতে সে যেন নিজের মনের অনেক অজানা অন্ধকার কুঠরি দেখিতে পাইল। সেদিন নিজের সঙ্গে মুখামুখি করিয়া দাঁড়াইবার একটা সুযোগ দৈবাৎ তার জুটিয়াছিল।

এমন সময়ে কখন যে শচীশ পিছন দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল, আমরা জানিতেও পাই নাই। তখন দামিনীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। অথচ, কথাটা বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু সেদিন তার সকল কথাই একটা চোখের জলের গভীরতার ভিতর দিয়া বহিয়া আসিতেছিল।

শচীশ যখন আসিল তখনো নিশ্চয়ই কীর্তনের পালা শেষ হইতে অনেক দেরি ছিল। বুঝিলাম, ভিতরে এতক্ষণ তাকে কেবলই ঠেলা দিয়াছে। দামিনী শচীশকে হঠাৎ সামনে দেখিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া পাশের ঘরের দিকে চলিল। শচীশ কাঁপা গলায় কহিল, শোনো দামিনী, একটা কথা আছে।

দামিনী আস্তে আস্তে আবার বসিল। আমি চলিয়া যাইবার জন্য উসখুস করিতেই সে এমন করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল যে, আমি আর নড়িতে পারিলাম না।

শচীশ কহিল, আমরা যে প্রয়োজনে গুরুজির কাছে আসিয়াছি তুমি তো সে প্রয়োজনে আস নাই।

দামিনী কহিল, না।

শচীশ কহিল, তবে কেন তুমি এই ভক্তদের মধ্যে আছ?

দামিনীর দুই চোখ যেন দপ্‌ করিয়া জ্বলিল; সে কহিল, কেন আছি! আমি কি সাধ করিয়া আছি! তোমাদের ভক্তরা যে এই ভক্তিহীনাকে ভক্তির গারদে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে। তোমরা কি আমার আর-কোনো রাস্তা রাখিয়াছ?

শচীশ বলিল, আমরা ঠিক করিয়াছি, তুমি যদি কোনো আত্মীয়ার কাছে গিয়া থাক তবে আমরা খরচপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

তোমরা ঠিক করিয়াছ?

হাঁ।

আমি ঠিক করি নাই।

কেন, ইহাতে তোমার অসুবিধাটা কী?

তোমাদের কোনো ভক্ত বা এক মতলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত বা আর-এক মতলবে আর-এক বন্দোবস্ত করিবেন—মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি?

শচীশ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

দামিনী কহিল, আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি আসি নাই। আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।

বলিতে বলিতে মুখের উপর দুই হাত দিয়া তার আঁচল চাপিয়া সে কাঁদিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সেদিন শচীশ আর কীর্তন শুনিতে গেল না। সেই ছাদে মাটির উপরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেদিন দক্ষিণ হাওয়ায় দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল। আমি বাহির হইয়া গিয়া অন্ধকারে গ্রামের নির্জন রাস্তার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

৪

গুরুজি আমাদের দুজনকে যে রসের স্বর্গলোকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেন, আজ মাটির পৃথিবী তাহাকে ভাঙিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিল। এতদিন তিনি রূপকের পাত্রে ভাবের মদ কেবলই আমাদিগকে ভরিয়া ভরিয়া পান করাইয়াছেন, এখন রূপের সঙ্গে রূপকের ঠোকাঠুকি হইয়া পাত্রটা মাটির উপরে কাত হইয়া পড়িবার জো হইয়াছে। আসন্ন বিপদের লক্ষণ তাঁর অগোচর রহিল না।

শচীশ আজকাল কেমন-এক-রকম হইয়া গেছে। যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে তারই মতো, এখনো হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া, আর দেরি নাই। জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোখ দেখিলে বোঝা যায় ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে।

আর, দামিনী আমার সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ করিবার রাস্তা রাখে নাই। সে যতই বুঝিল গুরুজি মনে মনে ভয় এবং শচীশ মনে মনে ব্যথা পাইতেছে ততই সে আমাকে লইয়া আরও বেশি টানাটানি করিতে লাগিল। এমন হইল যে, হয়তো আমি শচীশ এবং গুরুজি বসিয়া কথা চলিতেছে,

এমন সময় দরজার কাছে আসিয়া দামিনী ডাক দিয়া গেল, শ্রীবিলাসবাবু, একবার আসুন তো। শ্রীবিলাসবাবুকে কী যে তার দরকার তাও বলে না। গুরুজি আমার মুখের দিকে চান, শচীশ আমার মুখের দিকে চায়, আমি উঠি কি না উঠি করিতে করিতে দরজার দিকে তাকাইয়া ধাঁ করিয়া উঠিয়া বাহির হইয়া যাই। আমি চলিয়া গেলেও খানিকক্ষণ কথাটা চালাইবার একটু চেষ্টা চলে, কিন্তু চেষ্টাটা কথাটার চেয়ে বেশি হইয়া উঠে, তার পরে কথাটা বন্ধ হইয়া যায়। এমনি করিয়া ভারি একটা ভাঙাচোরা এলোমেলো কান্ড হইতে লাগিল, কিছুতেই কিছু আর আঁট বাঁধিতে চাহিল না।

আমরা দুজনেই গুরুজির দলের দুই প্রধান বাহন, ঐরাবত এবং উচ্চৈঃশ্রবা বলিলেই হয়— কাজেই আমাদের আশা তিনি সহজে ছাড়িতে পারেন না। তিনি আসিয়া দামিনীকে বলিলেন, মা দামিনী, এবার কিছু দূর ও দুর্গম জায়গায় যাইব। এখান হইতেই তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কোথায় যাইব?

তোমার মাসির ওখানে।

সে আমি পারিব না।

কেন?

প্রথম, তিনি আমার আপন মাসি নন; তার পরে, তাঁর কিসের দায় যে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে রাখিবেন?

যাতে তোমার খরচ তাঁর না লাগে আমরা তার—

দায় কি কেবল খরচের? তিনি যে আমার দেখাশোনা খবরদারি করিবেন সে ভার তাঁর উপরে নাই।

আমি কি চিরদিনই সমস্তক্ষণ তোমাকে আমার সঙ্গে রাখিব?

সে জবাব কি আমার দিবার?

যদি আমি মরি তুমি কোথায় যাইবে?

সে কথা ভাবিবার ভার আমার উপর কেহ দেয় নাই। আমি ইহাই খুব করিয়া বুঝিয়াছি, আমার মাসি নাই, বাপ নাই, ভাই নাই; আমার বাড়ি নাই, কড়ি নাই, কিছুই নাই। সেইজন্যই আমার ভার বড়ো বেশি; সে ভার আপনি সাধ করিয়াই লইয়াছেন; এ আপনি অন্যের ঘাড়ে নামাইতে পারিবেন না।

এই বলিয়া দামিনী সেখান হইতে চলিয়া গেল। গুরুজি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, মধুসূদন!

একদিন আমার প্রতি দামিনীর হুকুম হইল, তার জন্য ভালো বাংলা বই কিছু আনাইয়া দিতে। বলা বাহুল্য, ভালো বই বলিতে দামিনী ভক্তিরত্নাকর বুঝিত না, এবং আমার 'পরে তার কোনোরকম দাবি করিতে কিছুমাত্র বাধিত না। সে একরকম করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল যে দাবি করাই আমার প্রতি সব চেয়ে অনুগ্রহ করা। কোনো কোনো গাছ আছে যাদের ডালপালা ছাঁটিয়া দিলেই থাকে ভালো—দামিনীর সম্বন্ধে আমি সেই জাতের মানুষ।

আমি যে লেখকের বই আনাইয়া দিলাম সে লোকটা একেবারে নির্জলা আধুনিক। তার লেখায় মনুর চেয়ে মানবের প্রভাব অনেক বেশি প্রবল। বইয়ের প্যাকেটটা গুরুজির হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি ভুরু তুলিয়া বলিলেন, কী হে শ্রীবিলাস, এ-সব বই কিসের জন্য?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি দুইচারিটি পাতা উলটাইয়া বলিলেন, এর মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ তো বড়ো পাই না। লেখকটিকে তিনি মোটেই পছন্দ করেন না।

আমি ফস করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, একটু যদি মনোযোগ করিয়া দেখেন তো সত্যের গন্ধ পাইবেন।

আসল কথা, ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহ জমিতেছিল। ভাবের নেশার অবসাদে আমি একেবারে জর্জরিত। মানুষকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শুদ্ধমাত্র মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলাকে লইয়া দিনরাত্রি এমন করিয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিতে আমার যতদূর অরুচি হইবার তা হইয়াছে।

গুরুজি আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, আচ্ছা তবে একবার মনোযোগ করিয়া দেখা যাক। বলিয়া বইগুলা তাঁর বালিশের নীচে রাখিলেন। বুঝিলাম, এ তিনি ফিরাইয়া দিতে চান না।

নিশ্চয় দামিনী আড়াল হইতে ব্যাপারখানার আভাস পাইয়াছিল। দরজার কাছে আসিয়া সে আমাকে বলিল, আপনাকে যে বইগুলা আনাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম সে কি এখনো আসে নাই?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

গুরুজি বলিলেন, মা, সে বইগুলি তো তোমার পড়িবার যোগ্য নয়।

দামিনী কহিল, আপনি বুঝিবেন কী করিয়া?

গুরুজি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, তুমিই বা বুঝিবে কী করিয়া?

আমি পূর্বেই পড়িয়াছি, আপনি বোধ হয় পড়েন নাই।

তবে আর প্রয়োজন কী?

আপনার কোনো প্রয়োজনে তো কোথাও বাধে না, আমারই কিছুতে বুঝি প্রয়োজন নাই?

আমি সন্ন্যাসী, তা তুমি জান।

আমি সন্ন্যাসিনী নই তা আপনি জানেন, আমার ও বইগুলি পড়িতে ভালো লাগে। আপনি দিন।

গুরুজি বালিশের নীচে হইতে বইগুলি বাহির করিয়া আমার হাতের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন, আমি দামিনীকে দিলাম।

ব্যাপারটি যে ঘটিল তার ফল হইল, দামিনী যে-সব বই আপনার ঘরে বসিয়া একলা পড়িত তাহা আমাকে ডাকিয়া পড়িয়া শুনাইতে বলে। বারান্দায় বসিয়া আমাদের পড়া হয়, আলোচনা চলে। শচীশ সমুখ দিয়া বার বার আসে আর যায়, মনে করে বসিয়া পড়ি, অনাহূত বসিতে পারে না।

একদিন বইয়ের মধ্যে ভারি একটা মজার কথা ছিল, শুনিয়া দামিনী খিল খিল করিয়া হাসিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমরা জানিতাম সেদিন মন্দিরে মেলা, শচীশ সেইখানে গিয়াছে। হঠাৎ দেখি পিছনের ঘরের দরজা খুলিয়া শচীশ বাহির হইয়া আসিল এবং আমাদের সঙ্গেই বসিয়া গেল।

সেই মুহূর্তেই দামিনীর হাসি একেবারে বন্ধ, আমিও থতমত খাইয়া গেলাম। ভাবিলাম, শচীশের সঙ্গে যা হয় একটা কিছু কথা বলি, কিন্তু কোনো কথাই ভাবিয়া পাইলাম না, বইয়ের পাতা কেবলই নিঃশব্দে উলটাইতে লাগিলাম। শচীশ যেমন হঠাৎ আসিয়া বসিয়াছিল তেমনি হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল। তার পরে সেদিন আমাদের আর পড়া হইল না। শচীশ বোধ করি বুঝিল না যে, দামিনী ও আমার মাঝখানে যে আড়ালটা নাই বলিয়া সে আমাকে ঈর্ষা করিতেছে সেই আড়ালটা আছে বলিয়াই আমি তাকে ঈর্ষা করি।

সেইদিনই শচীশ গুরুজিকে গিয়া বলিল, প্রভু, কিছুদিনের জন্য একলা সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আসিতে চাই। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফিরিয়া আসিব।

গুরুজি উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, খুব ভালো কথা, তুমি যাও।

শচীশ চলিয়া গেল। দামিনী আমাকে আর পড়িতেও ডাকিল না, আমাকে তার অন্য কোনো প্রয়োজনও হইল না। তাকে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করিতে যাইতেও দেখি না। ঘরেই থাকে, সে ঘরের দরজা বন্ধ।

কিছুদিন যায়। একদিন গুরুজি দুপুরবেলা ঘুমাইতেছেন, আমি ছাদের বারান্দায় বসিয়া চিঠি লিখিতেছি, এমন সময়ে শচীশ হঠাৎ আসিয়া আমার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দামিনীর বন্ধ দরজায় ঘা মারিয়া বলিল, দামিনী! দামিনী!

দামিনী তখনি দরজা খুলিয়া বাহির হইল। শচীশের এ কী চেহারা! প্রচণ্ড ঝড়ের-ঝাপ্‌টা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা; চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কখুস্ক, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।

শচীশ বলিল, দামিনী, তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম—আমার ভুল হইয়াছিল, আমাকে মাপ করো।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, ও কী কথা আপনি বলিতেছেন?

না, আমাকে মাপ করো। আমাদেরই সাধনার সুবিধার জন্য তোমাকে ইচ্ছামত ছাড়িতে বা রাখিতে পারি এতবড়ো অপরাধের কথা আমি কখনো আর মনেও আনিব না। কিন্তু তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, সে তোমাকে রাখিতেই হইবে।

দামিনী তখনি নত হইয়া শচীশের দুই পা ছুঁইয়া বলিল, আমাকে হুকুম করো তুমি।

শচীশ বলিল, আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাত হইয়া থাকিয়ো না।

দামিনী কহিল, তাই যোগ দিব, আমি কোনো অপরাধ করিব না। এই বলিয়া সে আবার নত হইয়া পা ছুঁইয়া শচীশকে প্রণাম করিল, এবং আবার বলিল, আমি কোনো অপরাধ করিব না।

৫

পাথর আবার গলিল। দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। পূজায় অর্চনায় সেবায় মাধুর্যের ফুল ফুটিয়া উঠিল। যখন কীর্তনের আসর জমিত, গুরুজি আমাদের লইয়া যখন আলোচনায় বসিতেন, যখন তিনি গীতা বা ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, দামিনী কখনো একদিনের জন্য অনুপস্থিত থাকিত না। তার সাজসজ্জারও বদল হইয়া গেল। আবার সে তার তসরের কাপড়খানি পরিল; দিনের মধ্যে যখনি তাকে দেখা গেল মনে হইল সে যেন এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে।

গুরুজির সঙ্গে ব্যবহারেই তার সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা। সেখানে সে যখন নত হইত তখন তার চোখের কোণে আমি একটা রুদ্র তেজের ঝলক দেখিতে পাইতাম। আমি বেশ জানি, গুরুজির কোনো হুকুম সে মনের মধ্যে একটুও সহিতে পারে না, কিন্তু তাঁর সব কথা সে এতদূর একান্ত করিয়া মানিয়া লইল যে একদিন তিনি তাকে বাংলার সেই বিষম আধুনিক লেখকের দুর্বিষহ রচনার বিরুদ্ধে সাহস করিয়া আপত্তি জানাইতে পারিলেন। পরের দিন দেখিলেন, তাঁর দিনে বিশ্রাম করিবার বিছানার কাছে কতকগুলা ফুল রহিয়াছে, ফুলগুলি সেই লোকটার বইয়ের ছেঁড়া পাতার উপরে সাজানো।

অনেকবার দেখিয়াছি গুরুজি শচীশকে যখন নিজের সেবায় ডাকিতেন সেইটেই দামিনীর কাছে সব চেয়ে অসহ্য ঠেকিত। সে কোনোমতে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া শচীশের কাজ নিজে করিয়া দিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সব সময়ে তাহা সম্ভব হইত না। তাই শচীশ যখন গুরুজির কলিকায় ফুঁ দিতে থাকিত তখন দামিনী প্রাণপণে মনে মনে জপিত, অপরাধ করিব না, অপরাধ করিব না।

কিন্তু শচীশ যাহা ভাবিয়াছিল তার কিছুই হইল না। আর-এক বার দামিনী যখন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল তখন শচীশ তার মধ্যে কেবল মাধুর্যকেই দেখিয়াছিল, মধুরকে দেখে নাই। এবারে স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমনি সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়, কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া চলে না। শচীশ তাকে এতই স্পষ্ট দেখিতে পায় যে তার ভাবের ঘোর ভাঙিয়া যায়। এখন সে তাকে কোনোমতেই একটা ভাবরসের রূপকমাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না। এখন দামিনী গানগুলিকে সাজায় না, গানগুলিই দামিনীকে সাজাইয়া তোলে।

এখানে এই সামান্য কথাটুকু বলিয়া রাখি, এখন আমাকে দামিনীর আর কোনো প্রয়োজন নাই। আমার 'পরে তার সমস্ত ফরমাশ হঠাৎ একেবারে বন্ধ। আমার যে কয়েকটি সহযোগী ছিল তার মধ্যে চিলটা মরিয়াছে, বেজিটা পালাইয়াছে, কুকুরছানাটার অনাচারে গুরুজি বিরক্ত বলিয়া সেটাকে দামিনী বিলাইয়া দিয়াছে। এইরূপে আমি বেকার ও সঙ্গহীন হইয়া পড়াতে পুনশ্চ গুরুজির দরবারে পূর্বের মতো ভর্তি হইলাম, যদিচ সেখানকার সমস্ত কথাবার্তা গানবাজনা আমার কাছে একেবারে বিশ্রী রকমের বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল।

৬

একদিন শচীশ কল্পনার খোলা-ভাঁটিতে পূর্ব ও পশ্চিমের, অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত দর্শন ও বিজ্ঞান, রস ও তত্ত্ব একত্র চোলাইয়া একটা অপূর্ব আরক বানাইতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ দামিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিল, ওগো, তোমরা একবার শীঘ্র এসো।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলাম, কী হইয়াছে?

দামিনী কহিল, নবীনের স্ত্রী বোধ হয় বিষ খাইয়াছে।

নবীন আমাদের গুরুজির একজন চেলার আত্মীয়— আমাদের প্রতিবেশী, সে আমাদের কীর্তনের দলের একজন গায়ক। গিয়া দেখিলাম, তার স্ত্রী তখন মরিয়া গেছে। খবর লইয়া জানিলাম, নবীনের স্ত্রী তার মাতৃহীনা বোনকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছিল। ইহারা কুলীন, উপযুক্ত পাত্র পাওয়া দায়। মেয়েটিকে দেখিতে ভালো। নবীনের ছোটো ভাই তাকে বিবাহ করিবে বলিয়া পছন্দ করিয়াছে। সে কলিকাতায় কালেজে পড়ে, আর কয়েক মাস পরে পরীক্ষা দিয়া আগামী আষাঢ় মাসে সে বিবাহ করিবে এইরকম কথা। এমন সময়ে নবীনের স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িল যে তার স্বামীর ও তার বোনের পরস্পর আসক্তি জন্মিয়াছে। তখন তার বোনকে বিবাহ করিবার জন্য সে স্বামীকে অনুরোধ করিল। খুব বেশি পীড়াপীড়ি করিতে হইল না। বিবাহ চুকিয়া গেলে পর নবীনের প্রথমা স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

তখন আর কিছু করিবার ছিল না। আমরা ফিরিয়া আসিলাম। গুরুজির কাছে অনেক শিষ্য জুটিল, তারা তাঁকে কীর্তন শুনাইতে লাগিল— তিনি কীর্তনে যোগ দিয়া নাচিতে লাগিলেন।

প্রথম রাত্রে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। ছাদের যে কোণটার দিকে একটা চালতা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে সেইখানটার ছায়া-আলোর সংগমে দামিনী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শচীশ তার পিছন দিকের ঢাকা বারান্দার উপরে আস্তে আস্তে পায়চারি করিতেছে। আমার ডায়ারি লেখা রোগ, ঘরের মধ্যে একলা বসিয়া লিখিতেছি।

সেদিন কোকিলের আর ঘুম ছিল না। দক্ষিনে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো যেন কথা বলিয়া উঠিতে চায়, আর তার উপরে চাঁদের আলো ঝিলমিল করিয়া উঠে। হঠাৎ এক সময়ে শচীশের কী মনে হইল, সে দামিনীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। দামিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় দিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। শচীশ ডাকিল, দামিনী!

দামিনী থমকিয়া দাঁড়াইল। জোড়হাত করিয়া কহিল, প্রভু, আমার একটা কথা শোনো।

শচীশ চুপ করিয়া তার মুখের দিকে চাহিল। দামিনী কহিল, আমাকে বুঝাইয়া দাও তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন? তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে?

আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দামিনী কহিল, তোমরা দিনরাত রস রস করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা

নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?

আমি থাকিতে পারিলাম না; বলিয়া উঠিলাম, আমরা স্ত্রীলোককে আমাদের চতুঃসীমানা হইতে দূরে খেদাইয়া রাখিয়া নিরাপদে রসের চর্চা করিবার ফন্দি করিয়াছি।

আমার কথায় একেবারেই কান না দিয়া দামিনী শচীশকে কহিল, আমি তোমার গুরুর কাছ হইতে কিছুই পাই নাই। তিনি আমার উতলা মনকে এক মুহূর্ত শান্ত করিতে পারেন নাই। আগুন দিয়া আগুন নেবানো যায় না। তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ঐ যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কী তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে? প্রভু, জোড়হাত করিয়া বলি, ঐ রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি।

ক্ষণকালের জন্য আমরা তিনজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। চারি দিক এমনি স্তব্ধ হইয়া উঠিল যে আমার মনে হইল, যেন ঝিল্লির শব্দে পাণ্ডুবর্ণ আকাশটার সমস্ত গা ঝিম ঝিম করিয়া আসিতেছে।

শচীশ বলিল, বলো আমি তোমার কী করিতে পারি?

দামিনী বলিল, তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন-কিছু মন্ত্র দাও যা এ-সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস—যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না।

শচীশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাই হইবে।

দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুন গুন করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু! আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও!

পরিশিষ্ট

আবার একদিন কানাকানি এবং কাগজে কাগজে গালাগালি চলিল যে, ফের শচীশের মতের বদল হইয়াছে। একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে না মানিত জাত, না মানিত ধর্ম; তার পরে আর-একদিন অতি উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁয়া স্নান-তর্পণ যোগযাগ দেবদেবী কিছুই মানিতে বাকি রাখিল না; তার পরে আর-একদিন এই-সমস্তই মানিয়া-লওয়ার ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া দিয়া সে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল—কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না। কেবল ইহাই দেখা গেল আগেকার মতো আবার সে কাজে লাগিয়া গেছে, কিন্তু তার মধ্যে ঝগড়াবিবাদের ঝাঁজ কিছুই নাই।

আর-একটা কথা লইয়া কাগজে বিস্তর বিদ্রূপ ও কটূক্তি হইয়া গেছে। আমার সঙ্গে দামিনীর বিবাহ হইয়াছে। এই বিবাহের রহস্য কী তা সকলে বুঝিবে না, বোঝার প্রয়োজনও নাই।

এখানে এক সময়ে নীলকুঠি ছিল। তার সমস্ত ভাঙিয়া চুরিয়া গেছে, কেবল গুটিকতক ঘর বাকি। দামিনীর মৃতদেহ দাহ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় এই জায়গাটা আমার পছন্দ হইল, তাই কিছুদিনের জন্য এখানে রহিয়া গেলাম।

নদী হইতে কুঠি পর্যন্ত যে রাস্তা ছিল তার দুই ধারে সিসুগাছের সারি। বাগানে ঢুকিবার ভাঙা গেটের দুটা থাম আর পাঁচিলের একদিকের খানিকটা আছে, কিন্তু বাগান নাই। থাকিবার মধ্যে এক কোণে কুঠির কোন্-এক মুসলমান গোমস্তার গোর; তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের এবং আকন্দের গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে-ভরা—বাসরঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিনা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে। দিঘির পাড় ভাঙিয়া জল শুকাইয়া গেছে; তার তলায় ধোনের সঙ্গে মিলাইয়া চাষিরা ছোলার চাষ করিয়াছে; আমি যখন সকালবেলায় শ্যাওলা-পড়া ইঁটের ঢিবিটার উপরে সিসুর ছায়ায় বসিয়া থাকি তখন ধোনেফুলের গন্ধে আমার মগজ ভরিয়া যায়।

বসিয়া বসিয়া ভাবি, এই নীলকুঠি, যেটা আজ গো-ভাগাড়ে গোরুর হাড়-কখানার মতো পড়িয়া আছে সে যে একদিন সজীব ছিল। সে আপনার চারি দিকে সুখদুঃখের যে ঢেউ তুলিয়াছিল মনে হইয়াছিল সে তুফান কোনোকালে শান্ত হইবে না। যে প্রচণ্ড সাহেবটা এইখানে বসিয়া হাজার হাজার গরিব চাষার রক্তকে নীল করিয়া তুলিয়াছিল, তার কাছে আমি সামান্য বাঙালির ছেলে কে-ই বা! কিন্তু পৃথিবী কোমরে আপন সবুজ আঁচলখানি আঁটিয়া বাঁধিয়া অনায়াসে তাকে-সুদ্ধ তার নীলকুঠি-সুদ্ধ সমস্ত বেশ করিয়া মাটি দিয়া নিছিয়া পুঁছিয়া নিকাইয়া দিয়াছে—যা একটু-আধটু সাবেক দাগ দেখা যায় আরো এক পোঁচ লেপ পড়িলেই একেবারে সাফ হইয়া যাইবে।

কথাটা পুরানো, আমি তার পুনরুক্তি করিতে বসি নাই। আমার মন বলিতেছে, না গো, প্রভাতের পর প্রভাতে এ কেবলমাত্র কালের উঠান-নিকানো নয়। সেই নীলকুঠির সাহেবটা আর তার নীলকুঠির বিভীষিকা একটুখানি ধুলার চিহ্নের মতো মুছিয়া গেছে বটে—কিন্তু আমার দামিনী !

আমি জানি, আমার কথা কেহ মানিবে না। শংকরাচার্যের মোহমুদ্গর কাহাকেও রেহাই করে না। মায়াময়মিদমখিলং ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু শংকরাচার্য ছিলেন সন্ন্যাসী—কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ—এ-সব কথা তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু এর মানে বুঝেন নাই। আমি সন্ন্যাসী নই, তাই আমি বেশ করিয়া জানি, দামিনী পদ্মের পাতায় শিশিরের ফোঁটা নয়।

কিন্তু শুনিতে পাই—গৃহীরাও এমন বৈরাগ্যের কথা বলে। তা হইবে। তারা কেবলমাত্র গৃহী, তারা হারায় তাদের গৃহিণীকে। তাদের গৃহও মায়া বটে, তাদের গৃহিণীও তাই। ও-সব যে হাতে-গড়া জিনিস, ঝাঁট পড়িলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।

আমি তো গৃহী হইবার সময় পাইলাম না; আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিণী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে?

দামিনীকে যদি আমি কেবলমাত্র ঘরের গৃহিণী করিয়াই জানিতাম তবে অনেক কথা লিখিতাম না। তাকে আমি সেই সম্বন্ধের চেয়ে বড়ো করিয়া এবং সত্য করিয়া জানিয়াছি বলিয়াই সব কথা খোলসা করিয়া লিখিতে পারিলাম, লোকে যা বলে বলুক।

মায়ার সংসারে মানুষ যেমন করিয়া দিন কাটায় তেমনি করিয়া দামিনীকে লইয়া যদি আমি পুরামাত্রায় ঘরকন্না করিতে পারিতাম তবে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে পান চিবাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম, তবে দামিনীর মৃত্যুর পরে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিতাম, 'সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ', এবং সংসারের বৈচিত্র্য আবার একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কোনো একজন পিসি বা মাসির

অনুরোধ শিরোধার্য করিয়া লইতাম। কিন্তু পুরাতন জুতাজোড়াটার মধ্যে পা যেমন ঢোকে তেমন অতি সহজে আমি আমার সংসারের মধ্যে প্রবেশ করি নাই। গোড়া হইতেই সুখের প্রত্যাশা ছাড়িয়াছিলাম। না, সে কথা ঠিক নয়—সুখের প্রত্যাশা ছাড়িব এতবড়ো অমানুষ আমি নই। সুখ নিশ্চয়ই আশা করিতাম, কিন্তু সুখ দাবি করিবার অধিকার আমি রাখি নাই।

কেন রাখি নাই? তার কারণ, আমিই দামিনীকে বিবাহ করিতে রাজি করাইয়াছিলাম। কোনো রাঙা চেলির ঘোমটার নীচে সাহানা রাগিণীর তানে তো আমাদের শুভদৃষ্টি হয় নাই! দিনের আলোতে সব দেখিয়া-শুনিয়া জানিয়া-বুঝিয়াই এ কাজ করিয়াছি।

লীলানন্দ স্বামীকে ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিলাম তখন চালচুলার কথা ভাবিবার সময় আসিল। এতদিন যেখানে যাই খুব ঠাসিয়া গুরুর প্রসাদ খাইলাম, ক্ষুধার চেয়ে অজীর্ণের পীড়াতেই বেশি ভোগাইল। পৃথিবীতে মানুষকে ঘর তৈরি করিতে, ঘর রক্ষা করিতে, অন্তত ঘর ভাড়া করিতে হয়, সে কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছিলাম; আমরা কেবল জানিতাম যে, ঘরে বাস করিতে হয়। গৃহস্থ যে কোন্‌খানে হাত পা গুটাইয়া একটুখানি জায়গা করিয়া লইবে সে কথা আমরা ভাবি নাই, কিন্তু আমরা যে কোথায় দিব্য হাত পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া থাকিব গৃহস্থেরই মাথায় মাথায় সেই ভাবনা ছিল।

তখন মনে পড়িল জ্যাঠামশায় শচীশকে তাঁর বাড়ি উইলে লিখিয়া দিয়াছেন। উইলটা যদি শচীশের হাতে থাকিত তবে এতদিনে ভাবের স্রোতে রসের ঢেউয়ে কাগজের নৌকাখানার মতো সেটা ডুবিয়া যাইত। সেটা ছিল আমার কাছে, আমিই ছিলাম এক্‌জিক্যুটর। উইলে কতকগুলি শর্ত ছিল, সেগুলা যাহাতে চলে সেটার ভার আমার উপরে। তার মধ্যে প্রধান তিনটা এই, কোনোদিন এ বাড়িতে পূজা-অর্চনা হইতে পারিবে না, নীচের তলায় পাড়ার মুসলমান চামার ছেলেদের জন্য নাইটস্কুল বসিবে, আর শচীশের মৃত্যুর পর সমস্ত বাড়িটাই ইহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য দান করিতে হইবে। পৃথিবীতে পুণ্যের উপরে জ্যাঠামশায়ের সব চেয়ে রাগ ছিল; তিনি বৈষয়িকতার চেয়ে এটাকে অনেক বেশি নোংরা বলিয়া ভাবিতেন, পাশের বাড়ির ঘোরতর পুণ্যের হাওয়াটাকে কাটাইয়া দিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংরাজিতে তিনি ইহাকে বলিতেন স্যানিটারি প্রিকশন্‌স্‌।

শচীশকে বলিলাম, চলো এবার সেই কলিকাতার বাড়িতে।

শচীশ বলিল, এখনো তার জন্য ভালো করিয়া তৈরি হইতে পারি নাই।

তার কথা বুঝিতে পারিলাম না। সে বলিল, একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর-একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি শহরে ফিরিতে সাহস করি না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কী করিতে হইবে বলো।

শচীশ বলিল, তোমরা দুজনে যাও, আমি কিছুদিন একলা ফিরিব। একটা যেন কিনারার মতো দেখিতেছি, এখন যদি তার দিশা হারাই তবে আর খুঁজিয়া পাইব না।

আড়ালে আসিয়া দামিনী আমাকে বলিল, সে হয় না। একলা ফিরিবেন, উঁহার দেখাশুনা করিবে কে? সেই যে একবার একলা বাহির হইয়াছিলেন, কী চেহারা লইয়া ফিরিয়াছিলেন সে কথা মনে করিলে আমার ভয় হয়।

সত্য কথা বলিব? দামিনীর এই উদ্‌বেগে আমার মনে যেন একটা রাগের ভিমরুল হুল ফুটাইয়া দিল, জ্বালা করিতে লাগিল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশ তো প্রায় দু বছর একলা ফিরিয়াছিল, মারা তো পড়ে নাই। মনের ভাব চাপা রহিল না, একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিয়া ফেলিলাম।

দামিনী বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, মানুষের মরিতে অনেক সময় লাগে সে আমি জানি। কিন্তু একটুও দুঃখ পাইতে দিব কেন, আমরা যখন আছি।

আমরা! বহুবচনের অন্তত আধখানা অংশ এই হতভাগা শ্রীবিলাস। পৃথিবীতে এক দলের লোককে দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য আর-এক দলকে দুঃখ পাইতে হইবে। এই দুই জাতের মানুষ লইয়া সংসার। আমি যে কোন্ জাতের দামিনী তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। যাক, দলে টানিল এই আমার সুখ।

শচীশকে গিয়া বলিলাম, বেশ তো, শহরে এখনি নাই গেলাম। নদীর ধারে ঐ যে পোড়ো বাড়ি আছে ওখানে কিছুদিন কাটানো যাক। বাড়িটাতে ভূতের উৎপাত আছে বলিয়া গুজব, অতএব মানুষের উৎপাত ঘটিবে না।

শচীশ বলিল, আর তোমরা?

আমি বলিলাম, আমরা ভূতের মতোই যতটা পারি গা-ঢাকা দিয়া থাকিব।

শচীশ দামিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। সে চাহনিতে হয়তো একটু ভয় ছিল।

দামিনী হাত জোড় করিয়া বলিল, তুমি আমার গুরু। আমি যত পাপিষ্ঠা হই আমাকে সেবা করিবার অধিকার দিয়ো।

২

যাই বল আমি শচীশের এই সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারি না। একদিন তো এ জিনিসটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, এখন আর যাই হোক হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। আলেয়ার আলো নয়, এ যে আগুন। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চেলাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন্ ভূতের বিশ্বাসে ইহার আদি এবং কোন্ অদ্ভুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ত তাহা লইয়া হার্বার্ট স্পেন্সরের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কী হইবে— স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর-এক দিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।

এতদিন সে নাচিয়া গাহিয়া কাঁদিয়া গুরুর সেবা করিয়া দিনরাত অস্থির ছিল, সে একরকম ছিল ভালো। মনের সমস্ত চেষ্টা প্রত্যেক মুহূর্তে ফুঁকিয়া দিয়া একেবারে সে নিজেকে দেউলে করিয়া দিত। এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাব-সম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।

আমি একদিন আর থাকিতে পারিলাম না; বলিলাম, দেখো শচীশ, আমার বোধ হয় তোমার একজন কোনো গুরুর দরকার যার উপরে ভর করিয়া তোমার সাধনা সহজ হইবে।

শচীশ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, চুপ করো বিশ্রী, চুপ করো— সহজকে কিসের দরকার? ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।

আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, সত্যকে পাইবার জন্যই তো পথ দেখাইবার—

শচীশ অধীর হইয়া বলিল, ওগো, এ তোমার ভূগোলবিবরণের সত্য নয়, আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন— গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

এই এক-শচীশের মুখ দিয়া কতবার যে কত উলটা কথাই শোনা গেল। আমি শ্রীবিলাস, জ্যাঠা-মশায়ের চেলা বটে, কিন্তু তাঁকে গুরু বলিলে তিনি আমাকে চেলাকাঠ লইয়া মারিতে আসিতেন। সেই আমাকে দিয়া শচীশ গুরুর পা টিপাইয়া লইল, আবার দু দিন না যাইতেই সেই-আমাকেই এই বক্তৃতা! আমার হাসিতে সাহস হইল না, গম্ভীর হইয়া রহিলাম।

শচীশ বলিল, আজ আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ কথাটার অর্থ কী। আর সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয়

তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন; যদি তাঁকে পাই তো আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।

তর্ক করা আমার স্বভাব, আমি সহজে ছাড়িবার পাত্র নই; আমি বলিলাম, যে কবি সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়।

শচীশ অম্লান মুখে বলিল, আমি কবি।

বাস্‌—চুকিয়া গেল, চলিয়া আসিলাম।

শচীশের খাওয়া নাই, শোয়া নাই, কখন কোথায় থাকে হুঁশ থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি-শান-দেওয়া ছুরির মতো সূক্ষ্ম হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হইত আর সহিবে না। তবু আমি তাকে ঘাঁটাইতে সাহস করিতাম না। কিন্তু দামিনী সহিতে পারিত না। ভগবানের উপরে সে বিষম রাগ করিত—যে তাঁকে ভক্তি করে না তার কাছে তিনি জব্দ, আর ভক্তের উপর দিয়াই এমন করিয়া তার শোধ তুলিতে হয় গা? লীলানন্দ স্বামীর উপর রাগ করিয়া দামিনী মাঝে মাঝে সেটা বেশ শক্ত করিয়া জানান দিত, কিন্তু ভগবানের নাগাল পাইবার উপায় ছিল না।

তবু শচীশকে সময়মত নাওয়ানো-খাওয়ানোর চেষ্টা করিতে সে ছাড়িত না। এই খাপছাড়া মানুষটাকে নিয়মে বাঁধিবার জন্য সে যে কতরকম ফিকিরফন্দি করিত তার আর সংখ্যা ছিল না।

অনেক দিন শচীশ ইহার স্পষ্ট কোনো প্রতিবাদ করে নাই। একদিন সকালেই নদীপার হইয়া ওপারে বালুচরে সে চলিয়া গেল। সূর্য মাঝ আকাশে উঠিল, তার পরে সূর্য পশ্চিমের দিকে হেলিল, শচীশের দেখা নাই। দামিনী অভুক্ত থাকিয়া অপেক্ষা করিল, শেষে আর থাকিতে পারিল না। খাবারের থালা লইয়া হাঁটুজল ভাঙিয়া সে ওপারে গিয়া উপস্থিত।

চারি দিকে ধু ধু করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলোও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে।

যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই, এমন একটা সীমানা-হারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পেঁীছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'। তার না আছে শব্দ, না আছে গতি; তাহাতে না আছে রক্তের লাল, না আছে গাছ-পালার সবুজ, না আছে আকাশের নীল, না আছে মাটির গেরুয়া। যেন একটা মড়ার মাথার প্রকাণ্ড ওষ্ঠহীন হাসি; যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।

কোন্‌ দিকে যাইবে ভাবিতেছে এমন সময় হঠাৎ বালির উপরে পায়ের দাগ চোখে পড়িল। সেই দাগ ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া সে পেঁীছিল সেখানে একটা জলা। তার ধারে ধারে ভিজা মাটির উপরে অসংখ্য পাখির পদচিহ্ন। সেইখানে বালির পাড়ির ছায়ায় শচীশ বসিয়া। সামনের জলটি একেবারে নীলে নীল, ধারে ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচা লেজ নাচাইয়া সাদা-কালো ডানার ঝলক দিতেছে। কিছু দূরে চখা-চখীর দল ভারি গোলমাল করিতে করিতে কিছুতেই পিঠের পালক পুরাপুরি মনের মতো সাফ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দামিনী পাড়ির উপর দাঁড়াইতেই তারা ডাকিতে ডাকিতে ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

দামিনীকে দেখিয়া শচীশ বলিয়া উঠিল, এখানে কেন?

দামিনী বলিল, খাবার আনিয়াছি।

শচীশ বলিল, খাইব না।

দামিনী বলিল, অনেক বেলা হইয়া গেছে।

শচীশ কেবল বলিল, না।

দামিনী বলিল, আমি নাহয় একটু বসি, তুমি আর-একটু পরে—

শচীশ বলিয়া উঠিল, আহা কেন আমাকে তুমি—

হঠাৎ দামিনীর মুখ দেখিয়া সে থামিয়া গেল। দামিনী আর কিছু বলিল না, থালা হাতে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। চারি দিকে শূন্য বালি রাত্রিবেলাকার বাঘের চোখের মতো ঝকঝক করিতে লাগিল।

দামিনীর চোখে আগুন যত সহজে জ্বলে, জল তত সহজে পড়ে না। কিন্তু সেদিন যখন তাকে দেখিলাম, দেখি সে মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া; চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া তার কান্না যেন বাঁধ ভাঙিয়া ছুটিয়া পড়িল। আমার বুকের ভিতরটা কেমন করিতে লাগিল। অমি একপাশে বসিলাম।

একটু সে সুস্থ হইলে আমি তাকে বলিলাম, শচীশের শরীরের জন্য তুমি এত ভাব কেন?

দামিনী বলিল, আর কিসের জন্য আমি ভাবিতে পারি বলো। আর-সব ভাবনা তো উনি আপনিই ভাবিতেছেন। আমি কি তার কিছু বুঝি, না আমি তার কিছু করিতে পারি?

আমি বলিলাম, দেখো, মানুষের মন যখন অত্যন্ত জোরে কিছু একটাতে গিয়া ঠেকে তখন আপনিই তার শরীরের সমস্ত প্রয়োজন কমিয়া যায়। সেইজন্যেই বড়ো দুঃখে কিংবা বড়ো আনন্দে মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে না। এখন শচীশের যেরকম মনের অবস্থা তাতে ওর শরীরের দিকে যদি মন না দাও ওর ক্ষতি হইবে না।

দামিনী বলিল, আমি যে স্ত্রীজাত—ঐ শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম। ও যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্তি। তাই যখন দেখি শরীরটা কষ্ট পাইতেছে তখন এত সহজে আমাদের মন কাঁদিয়া উঠে।

আমি বলিলাম, তাই যারা কেবল মন লইয়া থাকে শরীরের অভিভাবক তোমাদের তারা চোখেই দেখিতে পায় না।

দামিনী দৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, পায় না বৈকি! তারা আবার এমন করিয়া দেখে যে সে একটা অনাসৃষ্টি।

মনে মনে বলিলাম, সেই অনাসৃষ্টিটার 'পরে তোমাদের লোভের সীমা নাই। ওরে ও শ্রীবিলাস, জন্মান্তরে যেন সৃষ্টিছাড়ার দলে জন্ম নিতে পারিস এমন পুণ্য কর্।

৩

সেদিন নদীর চরে শচীশ দামিনীকে অমন একটা শক্ত ঘা দিয়া তার ফল হইল, দামিনীর সেই কাতর দৃষ্টি শচীশ মন হইতে সরাইতে পারিল না। তার পর কিছুদিন সে দামিনীর 'পরে একটু বিশেষ যত্ন দেখাইয়া অনুতাপের ব্রত যাপন করিতে লাগিল। অনেক দিন সে তো আমাদের সঙ্গে ভালো করিয়া কথাই কয় নাই, এখন সে দামিনীকে কাছে ডাকিয়া তার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। যে-সব তার অনেক ধ্যানের অনেক চিন্তার কথা সেই ছিল তার আলাপের বিষয়।

দামিনী শচীশের ঔদাসীন্যকে ভয় করিত না, কিন্তু এই যত্নকে তার বড়ো ভয়। সে জানিত এতটা সহিবে না, কেননা এর দাম বড়ো বেশি। একদিন হিসাবের দিকে যেই শচীশের নজর পড়িবে, দেখিবে খরচ বড়ো বেশি পড়িতেছে, সেইদিনই বিপদ। শচীশ অত্যন্ত ভালো ছেলের মতো বেশ নিয়মমত স্নানাহার করে, ইহাতে দামিনীর বুক দুরদুর করে, কেমন তার লজ্জা বোধ হয়। শচীশ অবাধ্য হইলে সে যেন বাঁচে। সে মনে মনে বলে, সেদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়াছিলে ভালোই করিয়াছ। আমাকে যত্ন এ যে তোমার আপনাকে শাস্তি দেওয়া। এ আমি সহিব কী করিয়া? দামিনী ভাবিল, দূর হোক গে ছাই, এখানেও দেখিতেছি মেয়েদের সঙ্গে সই পাতাইয়া আবার আমাকে পাড়া ঘুরিতে হইবে।

একদিন রাত্রে হঠাৎ ডাক পড়িল, বিশ্রী! দামিনী! তখন রাত্রি একটাই হইবে কি দুটাই হইবে শচীশের সে খেয়ালই নাই। রাত্রে শচীশ কী কাণ্ড করে তা জানি না— কিন্তু এটা নিশ্চয়, তার উৎপাতে এই ভূতুড়ে বাড়িতে ভূতগুলা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

আমরা ঘুম হইতে ধড়ফড় করিয়া জাগিয়া বাহির হইয়া দেখি শচীশ বাড়ির সামনে বাঁধানো চাতালটার উপর অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আছে। সে বলিয়া উঠিল, আমি বেশ করিয়া বুঝিয়াছি। মনে একটুও সন্দেহ নাই।

দামিনী আস্তে আস্তে চাতালটার উপরে বসিল, শচীশও তার অনুকরণ করিয়া অন্যমনে বসিয়া পড়িল। আমিও বসিলাম।

শচীশ বলিল, যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উলটা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে।

আমি চুপ করিয়া তার জ্বলজ্বল-করা চোখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে যা বলিল রেখাগণিত-হিসাবে সে কথাটা ঠিক, কিন্তু ব্যাপারটা কী?

শচীশ বলিয়া চলিল, তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবলই রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বদ্ধ, সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।

তারাগুলা যেমন নিস্তব্ধ আমরা তেমনি নিস্তব্ধ হইয়াই রহিলাম। শচীশ বলিল, দামিনী, বুঝিতে পারিতেছ না? গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর-একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে, তবে তো দুই পক্ষের মিল হয়। তিনি যে গাহিয়াছেন আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

দামিনী শচীশের কথা বুঝিতে পারিল কি না জানি না, কিন্তু শচীশকে বুঝিতে পারিল। কোলের উপর হাত জোড় করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শচীশ বলিল, এতক্ষণ আমি অন্ধকারের এক কোণটিতে চুপ করিয়া বসিয়া সেই ওস্তাদের গান শুনিতেছিলাম, শুনিতে শুনিতে হঠাৎ সমস্ত বুঝিলাম। আর থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমাদের ডাকিয়াছি। এতদিন আমি তাঁকে আপনার মতো করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব— চিরকাল ধরিয়া! বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্ত কালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।

'অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার' এই বলিতে বলিতে শচীশ উঠিয়া অন্ধকারে নদীর পাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

৪

সেই রাত্রির পর আবার শচীশ সাবেক চাল ধরিল, তার নাওয়া-খাওয়ার ঠিকঠিকানা রহিল না। কখন যে তার মনের ঢেউ আলোর দিকে উঠে, কখন যে তাহা অন্ধকারের দিকে নামিয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাই না। এমন মানুষকে ভদ্রলোকের ছেলেটির মতো বেশ খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তার সহায় হোন!

সেদিন সমস্ত দিন গুমট করিয়া হঠাৎ রাত্রে ভারি একটা ঝড় আসিল। আমরা তিনজনে তিনটা ঘরে শুই, তার সামনের বারান্দায় কেরোসিনের একটা ডিবা জ্বলে। সেটা নিবিয়া গেছে। নদী তোলপাড় করিয়া উঠিয়াছে, আকাশ ভাঙিয়া মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। সেই নদীর ঢেউয়ের ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝরঝর শব্দে উপরে নীচে মিলিয়া প্রলয়ের আসরে ঝমাঝম করতাল বাজাইতে লাগিল। জমাট অন্ধকারের গর্ভের মধ্যে কী যে নড়াচড়া চলিতেছে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অথচ তার নানা রকমের আওয়াজে সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, আমবাগানের মধ্যে ডালপালাগুলার ঝপাঝপ শব্দ, দূরে মাঝে মাঝে নদীর পাড়ি ভাঙিয়া হুড়মুড় দুড়দুড় করিয়া উঠিতেছে, আর আমাদের জীর্ণ বাড়িটার পাঁজরগুলার ফাঁকের ভিতর দিয়া বার বার বাতাসের তীক্ষ্ণ ছুরি বিঁধিয়া সে কেবলই একটা জন্তুর মতো হু হু করিয়া চীৎকার করিতেছে।

এইরকম রাতে আমাদের মনের জানলা-দরজার ছিটকিনিগুলা নড়িয়া যায়, ভিতরে ঝড় ঢুকিয়া পড়ে, ভদ্র আসবাবগুলাকে উলটপালট করিয়া দেয়, পর্দাগুলা ফরফর করিয়া কে কোন্ দিকে যে অদ্ভুত রকম করিয়া উড়িতে থাকে তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। আমার ঘুম হইতেছিল না। বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কী-সব কথা ভাবিতেছিলাম তাহা এখানে লিখিয়া কী হইবে। এই ইতিহাসে সেগুলো জরুরি কথা নয়।

এমন সময়ে শচীশ একবার তার ঘরের অন্ধকারের মধ্যে বলিয়া উঠিল, কে ও!

উত্তর শুনিল, আমি দামিনী। তোমার জানলা খোলা, ঘরে বৃষ্টির ছাট আসিতেছে। বন্ধ করিয়া দিই।

বন্ধ করিতে করিতে দেখিল, শচীশ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্তকালের জন্য যেন দ্বিধা করিয়া তার পরে বেগে ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল। বিদ্যুৎ চমক দিতে লাগিল এবং একটা চাপা বজ্র গরগর করিয়া উঠিল।

দামিনী অনেকক্ষণ নিজের ঘরের চৌকাঠের 'পরে বসিয়া রহিল। কেহই ফিরিয়া আসিল না। দমকা হাওয়ার অধৈর্য ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

দামিনী আর থাকিতে পারিল না, বাহির হইয়া পড়িল। বাতাসে দাঁড়ানো দায়। মনে হইল, দেবতার পেয়দাগুলা তাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ঠেলা দিয়া লইয়া চলিয়াছে। অন্ধকার আজ সচল হইয়া উঠিল। বৃষ্টির জল আকাশের সমস্ত ফাঁক ভরাট করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়াছে। এমনি করিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ডুবাইয়া কাঁদিতে পারিলে দামিনী বাঁচিত।

হঠাৎ একটা বিদ্যুৎ অন্ধকারটাকে আকাশের এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যন্ত পড়পড় শব্দ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সেই ক্ষণিক আলোকে দামিনী দেখিতে পাইল, শচীশ নদীর ধারে দাঁড়াইয়া। দামিনী প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া পড়িয়া এক দৌড়ে একেবারে তার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল; বাতাসের চীৎকারশব্দকে হার মানাইয়া বলিয়া উঠিল, এই তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি, তোমার কাছে অপরাধ করি নাই, কেন তবে আমাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছ?

শচীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দামিনী বলিল, আমাকে লাথি মারিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও তো ফেলিয়া দাও, কিন্তু তুমি ঘরে চলো।

শচীশ বাড়িতে ফিরিয়া আসিল। ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল, যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার— আর-কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।

দামিনী একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরে বলিল, তাই আমি যাইব।

৫

পরে আমি দামিনীর কাছে আগাগোড়া সকল কথাই শুনিয়াছি, কিন্তু সেদিন কিছুই জানিতাম না। তাই বিছানা হইতে যখন দেখিলাম এরা দুজনে সামনের বারান্দা দিয়া আপন আপন ঘরের দিকে গেল তখন মনে হইল, আমার দুর্ভাগ্য বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিতেছে। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম, সে রাত্রে আমার ঘুম হইল না।

পরের দিন সকালে দামিনীর সে কী চেহারা! কাল রাত্রে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য পৃথিবীর মধ্যে কেবল যেন এই মেয়েটির উপরেই আপনার সমস্ত পদচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেছে। ইতিহাসটা কিছুই না জানিয়াও শচীশের উপর আমার ভারি রাগ হইতে লাগিল।

দামিনী আমাকে বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, তুমি আমাকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবে চলো।

এটা যে দামিনীর পক্ষে কতবড়ো কঠিন কথা সে আমি বেশ জানি, কিন্তু আমি তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভারি একটা বেদনার মধ্যেও আমি আরাম পাইলাম। দামিনীর এখান হইতে যাওয়াই ভালো। পাহাড়টার উপর ঠেকিতে ঠেকিতে নৌকাটি যে চুরমার হইয়া গেল।

বিদায় লইবার সময় দামিনী শচীশকে প্রণাম করিয়া বলিল, শ্রীচরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো।

শচীশ মাটির দিকে চোখ নামাইয়া বলিল, আমিও অনেক অপরাধ করিয়াছি, সমস্ত মাজিয়া ফেলিয়া ক্ষমা লইব।

দামিনীর মধ্যে একটা প্রলয়ের আগুন জ্বলিতেছে, কলিকাতার পথে আসিতে আসিতে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। তারই তাপ লাগিয়া আমারও মনটা যেদিন বড়ো বেশি তাতিয়া উঠিয়াছিল সেদিন আমি শচীশকে উদ্দেশ করিয়া কিছু কড়া কথা বলিয়াছিলাম। দামিনী রাগিয়া বলিল, দেখো, তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সামনে অমন কথা বলিয়ো না। তিনি আমাকে কী-বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কী জান? তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও, আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভালো হইয়াছে— বলিয়া দামিনী বুকে দমদম করিয়া কিল মারিতে লাগিল। আমি তার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

কলিকাতায় সন্ধ্যার সময় আসিয়া তখনি দামিনীকে তার মাসির বাড়ি দিয়া আমি আমার এক পরিচিত মেসে উঠিলাম। আমার জানা লোকে যে আমাকে দেখিল চমকিয়া উঠিল; বলিল, এ কী! তোমার অসুখ করিয়াছে না কি?

পরদিন প্রথম ডাকেই দামিনীর চিঠি পাইলাম, আমাকে লইয়া যাও, এখানে আমার স্থান নাই।

মাসি দামিনীকে ঘরে রাখিবে না। আমাদের নিন্দায় নাকি শহরে ঢিঢি পড়িয়া গেছে। আমরা দল ছাড়ার অল্পকাল পরে সাপ্তাহিক কাগজগুলির পূজার সংখ্যা বাহির হইয়াছে; সুতরাং আমাদের হাড়কাঠ তৈরি ছিল, রক্তপাতের ত্রুটি হয় নাই। শাস্ত্রে স্ত্রীপশু বলি নিষেধ, কিন্তু মানুষের বেলায় ঐটেতেই সব চেয়ে উল্লাস। কাগজে দামিনীর স্পষ্ট করিয়া নাম ছিল না, কিন্তু বদনামটা কিছুমাত্র অস্পষ্ট যাতে না হয় সে কৌশল ছিল। কাজেই দূর সম্পর্কের মাসির বাড়ি দামিনীর পক্ষে ভয়ংকর আঁট হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে দামিনীর বাপ মা মারা গেছে, কিন্তু ভাইরা কেহ-কেহ আছে বলিয়াই জানি। দামিনীকে তাদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঘাড় নাড়িল; বলিল, তারা বড়ো গরিব।

আসল কথা, দামিনী তাদের মুশকিলে ফেলিতে চায় না। ভয় ছিল, ভাইরাও পাছে জবাব দেয়, এখানে জায়গা নাই। সে আঘাত যে সহিবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, তা হইলে কোথায় যাইবে?

দামিনী বলিল, লীলানন্দ স্বামীর কাছে।

লীলানন্দ স্বামী! খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অদৃষ্টের এ কী নিদারুণ লীলা!

বলিলাম, স্বামীজি কি তোমাকে লইবেন?

দামিনী বলিল, খুশি হইয়া লইবেন।

দামিনী মানুষ চেনে। যারা দলচরের জাত মানুষকে পাইলে সত্যকে পাওয়ার চেয়ে তারা বেশি খুশি হয়। লীলানন্দ স্বামীর ওখানে দামিনীর জায়গার টানাটানি হইবে না এটা ঠিক— কিন্তু—

ঠিক এমন সংকটের সময় বলিলাম, দামিনী, একটি পথ আছে, যদি অভয় দাও তো বলি।

দামিনী বলিল, বলো, শুনি।

আমি বলিলাম, যদি আমার মতো মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে—

দামিনী আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, ও কী কথা বলিতেছ শ্রীবিলাসবাবু? তুমি কি পাগল হইয়াছ?

আমি বলিলাম, মনে করো-না পাগলই হইয়াছি। পাগল হইলে অনেক কঠিন কথা অতি সহজে মীমাংসা করিবার শক্তি জন্মায়। পাগলামি আরব্য উপন্যাসের সেই জুতা যা পায়ে দিলে সংসারের হাজার হাজার বাজে কথাগুলো একেবারে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়।

বাজে কথা? কাকে তুমি বল বাজে কথা?

এই যেমন, লোকে কী বলিবে, ভবিষ্যতে কী ঘটিবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

দামিনী বলিল, আর, আসল কথা?

আমি বলিলাম, কাকে বল তুমি আসল কথা?

এই যেমন আমাকে বিবাহ করিলে তোমার কী দশা হইবে।

এইটেই যদি আসল কথা হয় তবে আমি নিশ্চিত। কেননা আমার দশা এখন যা আছে তার চেয়ে খারাপ হইবে না। দশাটাকে সম্পূর্ণ ঠাঁই-বদল করাইতে পারিলেই বাঁচিতাম, অন্ততপক্ষে পাশ ফিরাইতে পারিলেও একটুখানি আরাম পাওয়া যায়।

আমার মনের ভাব সম্বন্ধে দামিনী কোনোরকম তারে-খবর পায় নাই সে কথা বিশ্বাস করি না। কিন্তু এতদিন সে খবরটা তার কাছে দরকারি খবর ছিল না; অন্তত তার কোনোরকম জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ছিল। এত দিন পরে একটা জবাবের দাবি উঠিল।

দামিনী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। আমি বলিলাম, দামিনী, আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন— এমন-কি, আমি তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা না করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।

দামিনীর চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সে বলিল, তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।

আরো খানিকক্ষণ ভাবিয়া দামিনী আমাকে বলিল, তুমি তো আমাকে জান?

আমি বলিলাম, তুমিও তো আমাকে জান।

এমনি করিয়াই কথাটা পাড়া হইল। যে-সব কথা মুখে বলা হয় নাই তারই পরিমাণ বেশি।

পূর্বেই বলিয়াছি, একদিন আমার ইংরেজি বক্তৃতায় অনেক মন বশ করিয়াছি। এতদিন ফাঁক পাইয়া তাদের অনেকেরই নেশা ছুটিয়াছে। কিন্তু, নরেন এখনো আমাকে বর্তমান যুগের একটা দৈবলব্ধ জিনিস বলিয়াই জানিত। তার একটা বাড়িতে ভাড়াটে আসিতে মাস-দেড়েক দেরি ছিল। আপাতত সেইখানে আমরা আশ্রয় লইলাম।

প্রথম দিনে আমার প্রস্তাবটা চাকা ভাঙিয়া যে মৌনের গর্তটার মধ্যে পড়িল, মনে হইয়াছিল এইখানেই বুঝি হাঁ এবং না দুইয়েরই বাহিরে পড়িয়া সেটা আটক খাইয়া গেল— অন্তত অনেক মেরামত এবং অনেক হেঁইহুঁই করিয়া যদি ইহাকে টানিয়া তোলা যায়। কিন্তু, অভাবনীয় পরিহাসে

মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যই মনের সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তার সেই আনন্দের উচ্চহাস্য এবারকার ফাল্গুনে এই ভাড়াটে বাড়ির দেয়াল-ক'টার মধ্যে বার বার ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল।

আমি যে একটা-কিছু, দামিনী এতদিন সে কথা লক্ষ করিবার সময় পায় নাই; বোধ করি আর-কোনো দিক হইতে তার চোখে বেশি একটা আলো পড়িয়াছিল। এবারে তার সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা। কাজেই আমাকে সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমার ভাগ্য ভালো, তাই ঠিক এই সময়টাতেই দামিনী আমাকে যেন প্রথম দেখিল।

অনেক নদীপর্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আগুন লাগিয়াছে। 'তোমার চরণে আমার পরানে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দা পুড়িয়া যায় নাই।

কিন্তু, কলিকাতার এই গলিতে এ কী হইল! ঘেঁষাঘেঁষি ঐ বাড়িগুলো চারি দিকে যেন পারিজাতের ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিল। বিধাতা তাঁর বাহাদুরি দেখাইলেন বটে! এই ইঁটকাঠ-গুলোকে তিনি তাঁর গানের সুর করিয়া তুলিলেন। আর, আমার মতো সামান্য মানুষের উপর তিনি কী পরশমণি ছোঁয়াইয়া দিলেন আমি এক মুহূর্তে অসামান্য হইয়া উঠিলাম।

যখন আড়াল থাকে তখন অনন্তকালের ব্যবধান, যখন আড়াল ভাঙে তখন সে এক নিমেষের পাল্লা। আর দেরি হইল না। দামিনী বলিল, আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম, কেবল এই একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই-তুমি আর এই-তুমির মাঝখানে ওটা কেবল একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বার বার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।

আমি দামিনীকে বলিলাম, দামিনী, তুমি অত করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়ো না। বিধাতার এই সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য নয় সে তুমি পূর্বে একদিন যখন আবিষ্কার করিয়াছিলে তখন সহিয়াছিলাম, কিন্তু এখন সহ্য করা ভারি শক্ত হইবে।

দামিনী কহিল, বিধাতার ঐ সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য, আমি সেইটেই আবিষ্কার করিতেছি।

আমি কহিলাম, ইতিহাসে তোমার নাম থাকিবে। উত্তরমেরুর মাঝখানটাতে যে দুঃসাহসিক আপনার নিশান গাড়িবে তার কীর্তিও এর কাছে তুচ্ছ। এ তো দুঃসাধ্য সাধন নয়, এ যে অসাধ্য সাধন।

ফাল্গুন মাসটা এমন অত্যন্ত ছোটো তাহা ইহার পূর্বে কখনো এমন নিঃসংশয়ে বুঝি নাই। কেবলমাত্র ত্রিশটা দিন, দিনগুলাও চব্বিশ ঘণ্টার এক মিনিট বেশি নয়। বিধাতার হাতে কাল অনন্ত, তবু এমনতরো বিশ্রী রকমের কৃপণতা কেন আমি তো বুঝিতে পারি না।

দামিনী বলিল, তুমি যে এই পাগলামি করিতে বসিলে তোমার ঘরের লোক—

আমি বলিলাম, তারা আমার সুহৃদ্‌। এবার তারা আমাকে ঘর থেকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে।

তার পর?

তার পরে তোমায় আমায় মিলিয়া একেবারে বুনিয়াদ হইতে আগাগোড়া নূতন করিয়া ঘর বানাইব, সে কেবল আমাদের দুজনের সৃষ্টি।

দামিনী কহিল, আর, সেই ঘরের গৃহিণীকে একেবারে গোড়া হইতে বানাইয়া লইতে হইবে। সেও তোমারই হাতের সৃষ্টি হোক, পুরানো কালের ভাঙাচোরা তার কোথাও কিছু না থাক্‌।

চৈত্রমাসে দিন ফেলিয়া একটা বিবাহের বন্দোবস্ত করা গেল। দামিনী আবদার করিল, শচীশকে আনাইতে হইবে।

আমি বলিলাম, কেন।

তিনি সম্প্রদান করিবেন।

সে পাগলা যে কোথায় ফিরিতেছে তার সন্ধান নাই। চিঠির পর চিঠি লিখি, জবাবই পাই না। নিশ্চয়ই এখনো সেই ভুতুড়ে বাড়িতেই আছে, নহিলে চিঠি ফেরত আসিত। কিন্তু সে কারো চিঠি খুলিয়া পড়ে কি না সন্দেহ।

আমি বলিলাম, দামিনী, তোমাকে নিজে গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে হইবে, 'পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ—ত্রুটি মার্জনা' এখানে চলিবে না। একলাই যাইতে পারিতাম, কিন্তু আমি ভিতু মানুষ। সে হয়তো এতক্ষণে নদীর ওপারে গিয়া চক্রবাকদের পিঠের পালক সাফ করা তদারক করিতেছে, সেখানে তুমি ছাড়া যাইতে পারে এমন বুকের পাটা আর কারো নাই।

দামিনী হাসিয়া কহিল, সেখানে আর কখনো যাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

আমি বলিলাম, আহার লইয়া যাইবে না এই প্রতিজ্ঞা; আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া যাইবে না কেন।

এবারে কোনোরকম দুর্ঘটনা ঘটিল না। দুইজনে দুই হাত ধরিয়া শচীশকে কলিকাতায় গ্রেফতার করিয়া আনিলাম। ছোটো ছেলে খেলার জিনিস পাইলে যেমন খুশি হয় শচীশ আমাদের বিবাহের ব্যাপার লইয়া তেমনি খুশি হইয়া উঠিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম চুপচাপ করিয়া সারিব, শচীশ কিছুতেই তা হইতে দিল না। বিশেষত জ্যাঠামশায়ের সেই মুসলমানপাড়ার দল যখন খবর পাইল তখন তারা এমনি হাল্লা করিতে লাগিল যে, পাড়ার লোকে ভাবিল কাবুলের আমির আসিয়াছে বা অন্তত হাইদ্রাবাদের নিজাম।

আরও ধুম হইল কাগজে। পর-বারের পূজার সংখ্যায় জোড়া বলি হইল। আমরা অভিশাপ দিব না। জগদম্বা সম্পাদকদের তহবিল বৃদ্ধি করুন এবং পাঠকদের নররক্তের নেশায় অন্তত এবারকার মতো কোনো বিঘ্ন না ঘটুক।

শচীশ বলিল, বিশ্রী, তোমরা আমার বাড়িটা ভোগ করো সে।

আমি বলিলাম, তুমিও আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দাও, আবার আমরা কাজে লাগিয়া যাই।

শচীশ বলিল, না, আমার কাজ অন্যত্র।

দামিনী বলিল, আমাদের বউভাতের নিমন্ত্রণ না সারিয়া যাইতে পারিবে না।

বউভাতের নিমন্ত্রণে আহূতদের সংখ্যা অসম্ভব রকম অধিক ছিল না। ছিল ঐ শচীশ।

শচীশ তো বলিল আমাদের বাড়িটা আসিয়া ভোগ করো, কিন্তু ভোগটা যে কী সে আমরাই জানি। হরিমোহন সে বাড়ি দখল করিয়া ভাড়াটে বসাইয়া দিয়াছেন। নিজেই ব্যবহার করিতেন, কিন্তু পারলৌকিক লাভ-লোকসান সম্বন্ধে যারা তাঁর মন্ত্রী তারা ভালো বুঝিল না—ওখানে প্লেগে মুসলমান মরিয়াছে। যে ভাড়াটে আসিবে তারও তো একটা—কিন্তু কথাটা তার কাছে চাপিয়া গেলেই হইবে।

বাড়িটা কেমন করিয়া হরিমোহনের হাত হইতে উদ্ধার করা গেল সে অনেক কথা। আমার প্রধান সহায় ছিল পাড়ার মুসলমানরা। আর কিছু নয়, জগমোহনের উইলখানা একবার তাদের দেখাইয়াছিলাম। আমাকে আর উকিলবাড়ি হাঁটাহাঁটি করিতে হয় নাই।

এ পর্যন্ত বাড়ি হইতে বরাবর কিছু সাহায্য পাইয়াছি, সেটা বন্ধ হইয়াছে। আমরা দুইজনে মিলিয়া বিনা সহায়ে ঘর করিতে লাগিলাম, সেই কষ্টেই আমাদের আনন্দ। আমার ছিল রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের মার্কা—প্রোফেসারি সহজেই জুটিল। তার উপরে এক্‌জামিন-পাশের পেটেন্ট্‌ ঔষধ বাহির করিলাম—পাঠ্যপুস্তকের মোটা মোটা নোট। আমাদের অভাব অল্পই, এত করিবার দরকার ছিল না। কিন্তু, দামিনী বলিল, শচীশকে যেন তার জীবিকার জন্য ভাবিতে না হয় এটা আমাদের দেখা চাই। আর-একটা কথা দামিনী আমাকে বলিল না, আমিও তাকে বলিলাম না—চুপিচুপি কাজটা সারিতে হইল। দামিনীর ভাইঝি দুটির সৎপাত্রে যাহাতে বিবাহ হয় এবং ভাইপো কয়টা পড়াশুনা করিয়া মানুষ হয়, সেটা দেখিবার শক্তি দামিনীর ভাইদের ছিল না। তারা আমাদের ঘরে

ঢুকিতে দেয় না, কিন্তু অর্থসাহায্য জিনিসটার জাতিকুল নাই, বিশেষত সেটাকে যখন গ্রহণমাত্র করাই দরকার—স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

কাজেই আমার অন্য কাজের উপর একটা ইংরেজি কাগজের সাব-এডিটারি লইতে হইল। আমি দামিনীকে না বলিয়া একটা উড়ে বামুন, বেহারা এবং একটা চাকরের বন্দোবস্ত করিলাম। দামিনীও আমাকে না বলিয়া পরদিনেই সব-ক'টাকে বিদায় করিয়া দিল। আমি আপত্তি করিতেই সে বলিল, তোমরা কেবলই উলটা বুঝিয়া দয়া কর। তুমি খাটিয়া হয়রান হইতেছ, আর আমি যদি না খাটিতে পাই তবে আমার সে দুঃখ আর সে লজ্জা বহিবে কে।

বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ, এই দুইয়ে যেন গঙ্গাযমুনার স্রোত মিলিয়া গেল। ইহার উপরে দামিনী পাড়ার ছোটো ছোটো মুসলমান মেয়েদের সেলাই শেখাইতে লাগিয়া গেল। কিছুতেই সে আমার কাছে হার মানিবে না, এই তার পণ।

কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।

আরো একটা ফাল্গুন কাটিল। তার পর আর কাটিল না।

সেবারে গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল, সেই ব্যথার কথা সে কাহাকেও বলে নাই। যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য?

ডাক্তারেরা এ ব্যামোর একোজনা একোরকমের নামকরণ করিতে লাগিল। তাদের কারও প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের সঙ্গে কারও মিল হইল না। শেষকালে ভিজিট ও দাওয়াইখানার দেনার আগুনে আমার সঞ্চিত স্বর্ণটুকু ছাই করিয়া তারা লঙ্কাকাণ্ড সমাধা করিল এবং উত্তরকাণ্ডে মন্ত্রণা দিল, হাওয়া বদল করিতে হইবে। তখন হাওয়া ছাড়া আমার আর বস্তু কিছুই বাকি ছিল না।

দামিনী বলিল, যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও—সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।

যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।

পরিশিষ্ট

শচীশ॥ পৃষ্ঠা ১৪৯ ছত্র ২৭-এর পর

'আমার মনের মধ্যে বিষম একটা খট্‌কা বাধিল। গোলদিঘির ঘাটে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলাম, শচীশ আজ তার হৃদয়াবেগকে বিশ্বে ছড়াইয়া ফেলিয়া তার তলায় আর সমস্তই চাপা দিয়াছে, এখন তাকে তার এই রসের প্রলয়মোহ হইতে বাঁচাই কেমন করিয়া?

রস জিনিসটা যে আছে সেই কথাটা আমাদের জীবন হইতে এতদিন একেবারে বাদ পড়িয়াছিল। বুঝিবা তার অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকিবে। আজ তাই সে ভূত হইয়া আপন দেহহীন দৌরাত্ম্যে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া দিল। বিশ্ব আজ আপন বিচিত্র সত্যরূপ ছাড়িয়া আমাদের যৌবনের মানসলীলার এক কল্পনিকুঞ্জ হইয়া উঠিল।'

—সবুজপত্র, পৌষ ১৩২১, পৃ. ৬২৯

শচীশ॥ পৃষ্ঠা ১৫২ ছত্র ৫-এর পর

'যে বিশ্বরসে সে নিজে ভোর, দামিনীর মধ্যে তারই রূপ দেখিল, কিন্তু একটি ব্যক্তিরস যা বিশ্বের নয়, যা বিশেষভাবে দামিনীরই সে তার চোখেই পড়িল না।

কীর্তনের রসমাধুর্যে শচীশের সমস্ত স্নায়ুর তার যখন কাঁপিতেছে তখন এক একবার হঠাৎ সে দেখিতে পাইত দামিনী সভার এক দূর-কোণে বসিয়া বিহ্বল হইয়া তারই দিকে চাহিয়া আছে। সেই চাহনিটুকু কীর্তনেরই একটি মূর্তিমান আখরের মতো শচীশের মনের মধ্যে বাজিতে থাকিত। সে তার মধ্যে দেখিতে পাইত চিরন্তনী বিশ্বনারীর অব্যক্ত ব্যাকুলতা, যে নারী তারার আলোয় অন্ধকারের বাতায়নে বসিয়া অপারের দিকে চিররাত্রি তাকাইয়া থাকে।

আমার পোড়া বুদ্ধি সমস্ত জিনিসকে যে স্পষ্ট করিয়া না দেখিয়া থাকিতে পারে না। আমি নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতে লাগিলাম, যে ফুল ভ্রমরের জন্যই গন্ধে এবং রঙে আপনাকে ভরিয়া তুলিয়া বসিয়া আছে দক্ষিণের পাগলা হাওয়া কেন এমন করিয়া তার পাপড়িগুলাকে একেবারে আকাশময় ছড়াছড়ি করিয়া দিল—তার খ্যাপামির বেগে ফুলকে কেন সে ফুল বলিয়া দেখিল না?

একদিন দামিনীর জীবনের স্রোত বর্ষার নদী ছিল, আজ তার ঘোলা জলের ধারা যতই স্বচ্ছ শরতের নদীর তন্বী তাপসীর রূপ ধরিল এবং বেদনার দীপ্তিতে ঝলমল করিতে লাগিল ততই শচীশ তাকে মনে মনে ভক্তি করিতে লাগিল। সে যদি সুযোগ পাইত তবে তাকে প্রণাম করিত। শচীশের আহারে, তার বাসের ব্যবস্থায়, তার বসিবার ও শুইবার ঘরের সজ্জায়, গূঢ়ভাবে নানা ছোটোখাটো আরামে সৌন্দর্যে পারিপাট্যে একটি নারীর চিত্ত ব্যাপ্ত হইতেছিল; শচীশ যে তাহা অনুভব করিত না তাহা নহে কিন্তু শচীশ তার মধ্যে আপন ধ্যানের দেবতাকে বাহিরে দেখিত।

দেখিলাম শচীশের এই দেবতার উপরে দামিনীর ঈর্ষা অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। দেবতা দিনরাত কেন এতবড়ো একটা আড়াল হইয়া উঠিবে? মানুষের যাহাতে এত বেশি দরকার, যা তার ক্ষুধা-তৃষ্ণার অন্নজল, দেবতা কেন তা এমন করিয়া নিঃশেষে লুটিয়া লইতে থাকিবে? দামিনীর ভিতর-কার ক্ষুব্ধ নারী আবার জ্বলিয়া উঠিয়া আপনাকে ও অন্যকে জ্বালাইতে চাহিতেছে। তার হাতে যদি শক্তি থাকিত তবে কোনো একটা নিষ্ঠুর আঘাতে শচীশের ভাবের নেশা ভাঙিয়া দিতে সে চেষ্টা করিত।'

—সবুজপত্র, পৌষ ১৩২১, পৃ. ৬৩৫-৩৭

দামিনী॥ পৃষ্ঠা ১৫৫ ছত্র ২-এর পর

'হঠাৎ দক্ষিনে হাওয়া আসিয়া শীতের ঘন পর্দাটাকে উড়াইয়া দিয়াছে। বসন্তলক্ষ্মী নেপথ্যে

বসিয়া তাঁর সাজসজ্জা শুরু করিয়াছেন তাহা অসময়েই প্রকাশ হইয়া পড়িল। আমাদের মনে হইল সমস্ত পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে যেন একটা ব্যথার টান টনটন করিয়া উঠিয়াছে; আকাশের আলোর মধ্যে সেই ব্যথা, সেই ব্যথা ক্ষণে ক্ষণে খাপছাড়া হাওয়ার মধ্যে, গাছপালার কাঁপুনি ও ঝরঝরানিতে, আর আমাদের বুকের ভিতরে, যেখানে দীর্ঘনিশ্বাসগুলো মাঝে মাঝে বিনা কারণে খ্যাপামি করিতে থাকে।

দামিনী এতদিন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো ছিল। আমাদের মধ্যে যখন রসালোচনার ঢেউ উঠিত তখন শচীশের মুখে-চোখে ঠিক যেন বীণার তারের 'পরে ওস্তাদের পাঁচ আঙুল নাচিতে থাকিত। যে সব কথা আমরা শুনিতাম দামিনী তাহা শুনিত কিনা জানি না, দামিনী তাহা দেখিত।'

—সবুজপত্র, মাঘ ১৩২১, পৃ. ৬৬৫

দামিনী॥ পৃষ্ঠা ১৫৫ ছত্র ১৫ ও ১৬-এ 'হেমন্তের ছোটো...উপচিয়া পড়িল' বাক্যটির পরিবর্তে

'অকাল বসন্তের আতপ্ত দিনগুলো গানের মদে ফেনাইয়া যেন উপচিয়া পড়িল। সম্পূর্ণ পরিমাণ জল শুষিয়া লইয়া স্পঞ্জের যে দশা হয় আমাদের মগজটা সুরের রসে সমস্ত ফাঁকে ফাঁকে তেমনিতরো ভর্তি হইয়া গেল। জগৎ আমাদের কাছে আপন রূপ ছাড়িয়া দিয়া একটা রূপক হইয়া উঠিল—মনের ভাবনা যেন বেদনায় গলিয়া হেমন্তসন্ধ্যার রাঙা কুয়াশার মতো মনকে দিগন্ত হইতে দিগন্তে ছাইয়া ফেলিল।'

—সবুজপত্র, মাঘ ১৩২১, পৃ. ৬৬৬

দামিনী॥ পৃষ্ঠা ১৫৫ ছত্র ২৫-এর পর

'শচীশ নিজেকে এতদিন ভুলিয়া রসের সমুদ্রে ডুব সাঁতার কাটিতেছিল। কিছু দেখা নয়, শোনা নয়, কাজ নয়, কর্ম নয়, কেবল একটা কুলহীন তলহীন বেদনাকে, সমস্ত মন দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে অদৃশ্য হইয়া যাওয়া। এমন সময় দামিনীতে আসিয়া একটা শক্ত জায়গায় যেন ধাঁ করিয়া তার মন ঠেকিয়া গেছে।'

—সবুজপত্র, মাঘ ১৩২১, পৃ. ৬৬৭

দামিনী॥ পৃষ্ঠা ১৫৯ ছত্র ৩-এর পর

এই অংশটি প্রথম সংস্করণে ছিল। পরবর্তী সংস্করণে অনবধানবশত পরিত্যক্ত। বর্তমানে যথাস্থানে পুনঃসংযোজিত।

'আমি বলিলাম, তোমার কথা সবই মানিতেছি ভাই কিন্তু আমি এই বলি, প্রকৃতির বিশ্বজোড়া ফাঁদ আমি নিজের হাতে পাতি নাই, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া চলি এমন জায়গা আমি জানি না। ইহাকে বেকবুল করা যখন আমাদের হাত নাই তখন সাধনা তাহাকেই বলি যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়। যাই বলো ভাই আমরা সে রাস্তায় চলিতেছি না তাই সত্যকে আধখানা ছাঁটিয়া ফেলিবার জন্য এত বেশি ছটফট করিয়া মরি।

শচীশ বলিল, তুমি কী রকম সাধনা চালাইতে চাও আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলো শুনি।

আমি বলিলাম, প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব, সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে। সেই জন্যই হালের দরকার।'

—সবুজপত্র, মাঘ ১৩২১, পৃ. ৬৭৫-৭৬

দামিনী॥ পৃষ্ঠা ১৬৩ ছত্র ৩২-এর পর

'তখন শচীশ দামিনীকে বাদ দিয়া দামিনীর প্রণতিটুকু আপনার রসসাধনার মসলার মতো ব্যবহার করিয়াছিল।'

—সবুজপত্র, মাঘ ১৩২১, পৃ. ৬৮৬

দামিনী॥ পৃষ্ঠা ১৬৩-র শেষে

'দামিনী একটা কী তফাৎ বুঝিল। আগেও তো কীর্তন হইতে শচীশের চোখ মাঝে মাঝে তার মুখের উপর আসিয়া পড়িত— কিন্তু সেই চোখের সামনে বরাবর একটা ভাবের ঘোরের পর্দা ছিল তাই দামিনীকে কখনো চোখ নামাইতে হয় নাই। শচীশ সর্বদা নিজের মধ্যে এত দূরেই ছিল যে দামিনী তার অত্যন্ত কাছে যাইতেও কোনোদিন সংকোচ বোধ করে নাই। তখন দামিনী মনে করিত তাকে ছুঁইলেও যেন ছোঁয়া যায় না।

কিন্তু আজ শচীশ তফাতে থাকিলেও যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এমনি মনে হইল। সকলকে পরিবেষণ করিবার সময় শচীশের পাতে কিছু দিতে তার যেন বাধিত। কতবার সে ভাবিয়াছে আমি পালাইয়া যাই, আড়ালে থাকি, কিন্তু সে যে হুকুম পাইয়াছে, তফাতে থাকিয়ো না, সেই হুকুম সে কিছুতেই ঠেলিবে না। তাই মনে মনে সে দিনরাত জপ করে, অপরাধ করিব না, অপরাধ করিব না।'

—সবুজপত্র, মাঘ ১৩২১, পৃ. ৬৮৭

পরিশিষ্ট॥ পৃষ্ঠা ১৬৬-র শেষে

'বিবাহের মাসখানেক পূর্বে আমি দামিনীর কাছে শচীশের সঙ্গে তার সম্বন্ধের ঘটকালি করিতে গিয়াছিলাম। দামিনী আমাকে বলিল, সে কী কথা? তিনি যে আমার গুরু, আমি যে তাঁর কাছে দীক্ষা লইয়াছি।

কবে দীক্ষা লইয়াছ?

সে কথা কেহ জানে না। আমার গুরুও স্পষ্ট জানেন না। সেই কঠিন দীক্ষার চিহ্ন আমার বুকে এখনো আঁকা আছে।

আমরা যখন লীলানন্দ স্বামীকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম, তখন দামিনী শচীশের কাছে আসিয়া কহিল, আমাকে কার হাতে রাখিয়া যাইবে?

শচীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

দামিনী বলিল, এখানে আমার জায়গা নাই, আমাকে তোমার সঙ্গ লইতেই হইবে।

শচীশ তখনো চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল।

দামিনী আমাকে ডাকিল, শ্রীবিলাসবাবু, এসো, জিনিসপত্রগুলো গুছাইয়া লই।

অনেকদিন পরে আমাকে এই আবার দামিনীর প্রয়োজন হইল। সেই প্রয়োজন এখনো চলিতেছে। দুইজনে সমস্ত গুছাইয়া লইতেছি।'

—সবুজপত্র, মাঘ ১৩২১, পৃ. ৬৯২-৯৩

যোগাযোগ

প্রকাশ : ১৯২৯

'যোগাযোগ' বিচিত্রা পত্রে ধারাবাহিক প্রকাশকালে (আশ্বিন ১৩৩৪—চৈত্র ১৩৩৫) প্রথম দুই সংখ্যায় 'তিনপুরুষ' নামে প্রকাশিত। তৃতীয় সংখ্যায় 'নামান্তর' নামে কৈফিয়ত-সহ 'যোগাযোগ' নামকরণ করেন।

আজ ৭ই আষাঢ়। অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন। বয়স তার হল বত্রিশ। ভোর থেকে আসছে অভিনন্দনের টেলিগ্রাম, আর ফুলের তোড়া।

গল্পটার এইখানে আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো।

এই কাহিনীর পৌরাণিক যুগ সন্ধান করলে দেখা যায়, ঘোষালরা এক সময়ে ছিল সুন্দরবনের দিকে, তার পরে হুগলি জেলায় নূরনগরে। সেটা বাহির থেকে পর্টুগীজদের তাড়ায়, না ভিতর থেকে সমাজের ঠেলায়, ঠিক জানা নেই। মরিয়া হয়ে যারা পুরানো ঘর ছাড়তে পারে, তেজের সঙ্গে নূতন ঘর বাঁধবার শক্তিও তাদের। তাই ঘোষালদের ঐতিহাসিক যুগের শুরুতেই দেখি, প্রচুর ওদের জমিজমা, গোরুবাছুর, জনমজুর, পালপার্বণ, আদায়বিদায়। আজও তাদের সাবেক গ্রাম শেয়াকুলিতে অন্তত বিঘে দশেক আয়তনের ঘোষাল-দিঘি পানা-অবগুণ্ঠনের ভিতর থেকে পঙ্করুদ্ধ-কণ্ঠে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে। আজ সে দিঘিতে শুধু নামটাই ওদের, জলটা চাটুজ্যে জমিদারের। কী করে একদিন ওদের পৈতৃক মহিমা জলাঞ্জলি দিতে হয়েছিল সেটা জানা দরকার।

এদের ইতিহাসের মধ্যম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, খিটিমিটি বেধেছে চাটুজ্যে জমিদারের সঙ্গে। এবার বিষয় নিয়ে নয়, দেবতার পুজো নিয়ে। ঘোষালরা স্পর্ধা করে চাটুজ্যেদের চেয়ে দু-হাত উঁচু প্রতিমা গড়িয়েছিল। চাটুজ্যেরা তার জবাব দিলে। রাতারাতি বিসর্জনের রাস্তার মাঝে মাঝে এমন মাপে তোরণ বসালে যাতে করে ঘোষালদের প্রতিমার মাথা যায় ঠেকে। উঁচু-প্রতিমার দল তোরণ ভাঙতে বেরোয়, নিচু-প্রতিমার দল তাদের মাথা ভাঙতে ছোটে। ফলে, দেবী সে বার বাঁধা বরাদ্দের চেয়ে অনেক বেশি রক্ত আদায় করেছিলেন। খুন-জখম থেকে মামলা উঠল। সে মামলা থামল ঘোষালদের সর্বনাশের কিনারায় এসে।

আগুন নিবল, কাঠও বাকি রইল না, সবই হল ছাই। চাটুজ্যেদেরও বাস্তুলক্ষ্মীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দায়ে পড়ে সন্ধি হতে পারে, কিন্তু তাতে শান্তি হয় না। যে ব্যক্তি খাড়া আছে, আর যে ব্যক্তি কাত হয়ে পড়েছে, দুই পক্ষেরই ভিতরটা তখনো গর গর করছে। চাটুজ্যেরা ঘোষালদের উপর শেষ কোপটা দিলে সমাজের খাঁড়ায়। রটিয়ে দিলে এককালে ওরা ছিল ভঙ্গজ ব্রাহ্মণ, এখানে এসে সেটা চাপা দিয়েছে, কেঁচো সেজেছে কেউটে। যারা খোঁটা দিলে, টাকার জোরে তাদের গলার জোর। তাই স্মৃতিরত্নপাড়াতেও তাদের এই অপকীর্তনের অনুস্বার-বিসর্গওয়ালা ঢাকি জুটল। কলঙ্কভঞ্জনের উপযুক্ত প্রমাণ বা দক্ষিণা ঘোষালদের শক্তিতে তখন ছিল না, অগত্যা চণ্ডীমণ্ডপ-বিহারী সমাজের উৎপাতে এরা দ্বিতীয়বার ছাড়ল ভিটে। রজবপুরে অতি সামান্যভাবে বাসা বাঁধলে।

যারা মারে তারা ভোলে, যারা মার খায় তারা সহজে ভুলতে পারে না। লাঠি তাদের হাত থেকে খসে পড়ে বলেই লাঠি তারা মনে-মনে খেলতে থাকে। বহু দীর্ঘকাল হাতটা অসাড় থাকাতেই মানসিক লাঠিটা ওদের বংশ বেয়ে চলে আসছে। মাঝে মাঝে চাটুজ্যেদের কেমন করে ওরা জব্দ করেছিল সত্য মিথ্যে মিশিয়ে সে-সব গল্প ওদের ঘরে এখনো অনেক জমা হয়ে আছে। খোড়ো চালের ঘরে আষাঢ়-সন্ধ্যাবেলায় ছেলেরা সেগুলো হাঁ করে শোনে। চাটুজ্যেদের বিখ্যাত দাশু সর্দার রাত্রে যখন ঘুমোচ্ছিল তখন বিশ-পঁচিশ জন লাঠিয়াল তাকে ধরে এনে ঘোষালদের কাছারিতে কেমন করে বেমালুম বিলুপ্ত করে দিলে সে গল্প আজ একশো বছর ধরে ঘোষালদের ঘরে চলে আসছে। পুলিস যখন খানাতল্লাসি করতে এল নায়েব ভুবন বিশ্বাস অনায়াসে বললে, হাঁ, সে কাছারিতে এসেছিল তার নিজের কাজে, হাতে পেয়ে বেটাকে কিছু অপমানও করেছি, শুনলেম নাকি সেই ক্ষোভে বিবাগি হয়ে চলে গেছে। হাকিমের সন্দেহ গেল না। ভুবন বললে, হুজুর, এই বছরের মধ্যে যদি তার ঠিকানা বের করে দিতে না পারি তবে আমার নাম ভুবন বিশ্বাস নয়। কোথা থেকে দাশুর মাপের এক গুণ্ডা খুঁজে বার করলে—একেবারে তাকে পাঠালে ঢাকায়। সে করলে

ঘটি চুরি, পুলিসে নাম দিলে দাশরথি মণ্ডল। হল এক মাসের জেল। যে তারিখে ছাড়া পেয়েছে ভুবন সেইদিন ম্যাজেস্টেরিতে খবর দিলে দাশু সর্দার ঢাকার জেলখানায়। তদন্তে বেরোল, দাশু জেলখানায় ছিল বটে, তার গায়ের দোলাইখানা জেলের বাইরের মাঠে ফেলে চলে গেছে। প্রমাণ হল সে দোলাই সর্দারেরই। তার পর সে কোথায় গেল সে খবর দেওয়ার দায় ভুবনের নয়।

এই গল্পগুলো দেউলে-হওয়া বর্তমানের সাবেক কালের চেক। গৌরবের দিন গেছে; তাই গৌরবের পুরাতত্ত্বটা সম্পূর্ণ ফাঁকা বলে এত বেশি আওয়াজ করে।

যা হোক, যেমন তেল ফুরোয়, যেমন দীপ নেবে, তেমনি এক সময়ে রাতও পোহায়। ঘোষাল-পরিবারের সূর্যোদয় দেখা দিল অবিনাশের বাপ মধুসূদনের জোর কপালে।

২

মধুসূদনের বাপ আনন্দ ঘোষাল রজবপুরের আড়তদারদের মুহুরি। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সংসার চলে। গৃহিণীদের হাতে শাঁখা-খাড়ু, পুরুষদের গলায় রক্ষামন্ত্রের পিতলের মাদুলি আর বেলের আটা দিয়ে মাজা খুব মোটা পইতে। ব্রাহ্মণ-মর্যাদার প্রমাণ ক্ষীণ হওয়াতে পইতেটা হয়েছিল প্রমাণসই।

মফস্বল ইস্কুলে মধুসূদনের প্রথম শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষা ছিল নদীর ধারে, আড়তের প্রাঙ্গণে, পাটের গাঁটের উপর চড়ে বসে। যাচনদার, খরিদদার, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের ভিড়ের মধ্যেই তার ছুটি— যেখানে বাজারে টিনের চালাঘরে সাজানো থাকে সারবাঁধা গুড়ের কলসী, আঁটিবাঁধা তামাকের পাতা, গাঁটবাঁধা বিলিতি র‍্যাপার, কেরোসিনের টিন, সরষের ঢিবি, কলাইয়ের বস্তা, বড়ো বড়ো তৌল-দাঁড়ি আর বাটখারা, সেইখানে ঘুরে তার যেন বাগানে বেড়ানোর আনন্দ।

বাপ ঠাওরালে ছেলেটার কিছু হবে। ঠেলেঠুলে গোটা দুত্তিন পাস করাতে পারলেই ইস্কুল-মাস্টারি থেকে মোক্তারি ওকালতি পর্যন্ত ভদ্রলোকদের যে-কয়টা মোক্ষতীর্থ তার কোনো-না-কোনোটাতে মধু ভিড়তে পারবে। অন্য তিনটে ছেলের ভাগ্যসীমারেখা গোমস্তাগিরি পর্যন্তই পিলপে-গাড়ি হয়ে রইল। তারা কেউ-বা আড়তদারের, কেউ-বা তালুকদারের দফতরে কানে কলম গুঁজে শিক্ষানবিশিতে বসে গেল। আনন্দ ঘোষালের ক্ষীণ সর্বস্বের উপর ভর করে মধুসূদন বাসা নিল কলকাতার মেসে।

অধ্যাপকেরা আশা করেছিল পরীক্ষায় এ ছেলে কলেজের নাম রাখবে। এমন সময় বাপ গেল মারা। পড়বার বই, মায় নোটবই সমেত, বিক্রি করে মধু পণ করে বসল এবার সে রোজগার করবে। ছাত্রমহলে সেকেন্ড-হ্যান্ড বই বিক্রি করে ব্যাবসা হল শুরু। মা কেঁদে মরে— বড়ো তার আশা ছিল, পরীক্ষা-পাসের রাস্তা দিয়ে ছেলে ঢুকবে 'ভদ্দোর' শ্রেণীর ব্যূহের মধ্যে। তার পরে ঘোষাল-বংশদণ্ডের আগায় উড়বে কেরানিবৃত্তির জয়পতাকা।

ছেলেবেলা থেকে মধুসূদন যেমন মাল বাছাই করতে পাকা, তেমনি তার বন্ধু বাছাই করবারও ক্ষমতা। কখনো ঠকে নি। তার প্রধান ছাত্রবন্ধু ছিল কানাই গুপ্ত। এর পূর্বপুরুষেরা বড়ো বড়ো সওদাগরের মুচ্ছুদ্দিগিরি করে এসেছে। বাপ নামজাদা কেরোসিন কোম্পানির আপিসে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।

ভাগ্যক্রমে এঁরই মেয়ের বিবাহ। মধুসূদন কোমরে চাদর বেঁধে কাজে লেগে গেল। চাল বাঁধা, ফুলপাতায় সভা সাজানো, ছাপাখানায় দাঁড়িয়ে থেকে সোনার কালিতে চিঠি ছাপানো, চৌকি কার্পেট ভাড়া করে আনা, গেটে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা, গলা ভাঙিয়ে পরিবেশন, কিছুই বাদ দিলে না। এই সুযোগে এমন বিষয়বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিলে যে, রজনীবাবু ভারি খুশি। তিনি

কেজো মানুষ চেনেন, বুঝলেন এ ছেলের উন্নতি হবে। নিজের থেকে টাকা ডিপজিট দিয়ে মধুকে রজবপুরে কেরোসিনের এজেন্সিতে বসিয়ে দিলেন।

সৌভাগ্যের দৌড় শুরু হল; সেই যাত্রাপথে কেরোসিনের ডিপো কোন্ প্রান্তে বিন্দু-আকারে পিছিয়ে পড়ল। জমার ঘরের মোটা মোটা অঙ্কের উপর পা ফেলতে ফেলতে ব্যাবসা হু-হু করে এগোল গলি থেকে সদর রাস্তায়, খুচরো থেকে পাইকিরিতে, দোকান থেকে আপিসে, উদ্‌যোগপর্ব থেকে স্বর্গারোহণে। সবাই বললে, 'একেই বলে কপাল!' অর্থাৎ পূর্বজন্মের ইস্‌টিমেতেই এ জন্মের গাড়ি চলছে। মধুসূদন নিজে জানত যে, তাকে ঠকাবার জন্যে অদৃষ্টের ত্রুটি ছিল না, কেবল হিসেবে ভুল করে নি বলেই জীবনের অঙ্ক-ফলে পরীক্ষকের কাটা দাগ পড়ে নি। যারা হিসেবের দোষে ফেল করতে মজবুত, পরীক্ষকের পক্ষপাতের 'পরে তারাই কটাক্ষপাত করে থাকে।

মধুসূদনের রাশ ভারী। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে কথাবার্তা কয় না। তবে কিনা আন্দাজে বেশ বোঝা যায়, মরা গাঙে বান এসেছে। গৃহপালিত বাংলাদেশে এমন অবস্থায় সহজ মানুষে বিবাহের চিন্তা করে, জীবিতকালবর্তী সম্পত্তিভোগটাকে বংশাবলীর পথ বেয়ে মৃত্যুর পরবর্তী ভবিষ্যতে প্রসারিত করবার ইচ্ছা তাদের প্রবল হয়। কন্যাদায়িকেরা মধুকে উৎসাহ দিতে ত্রুটি করে না, মধুসূদন বলে, 'প্রথমে একটা পেট সম্পূর্ণ ভরলে তার পরে অন্য পেটের দায় নেওয়া চলে।' এর থেকে বোঝা যায়, মধুসূদনের হৃদয়টা যাই হোক, পেটটা ছোটো নয়।

এই সময়ে মধুসূদনের সতর্কতায় রজবপুরের পাটের নাম দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ মধুসূদন সব-প্রথমেই নদীর ধারের পোড়ো জমি বেবাক কিনে ফেললে, তখন দর সস্তা। ইঁটের পাঁজা পোড়ালে বিস্তর, নেপাল থেকে এল বড়ো বড়ো শালকাঠ, সিলেট থেকে চুন, কলকাতা থেকে মালগাড়ি-বোঝাই করোগেটেড লোহা। বাজারের লোক অবাক! ভাবলে, 'এই রে! হাতে কিছু জমেছিল, সেটা সইবে কেন! এবার বদহজমের পালা, কারবার মরণদশায় ঠেকল বলে!'

এবারও মধুসূদনের হিসেবে ভুল হল না। দেখতে দেখতে রজবপুরে ব্যাবসার একটা আওড় লাগল। তার ঘূর্ণিটানে দালালরা এসে জুটল, এল মাড়োয়ারির দল, কুলির আমদানি হল, কল বসল, চিমনি থেকে কুণ্ডলায়িত ধূমকেতু আকাশে আকাশে কালিমা বিস্তার করলে।

হিসেবের খাতার গবেষণা না করেও মধুসূদনের মহিমা এখন দূর থেকে খালি-চোখেই ধরা পড়ে। একা সমস্ত গঞ্জের মালিক, পাঁচিল-ঘেরা দোতলা ইমারত, গেটে শিলাফলকে লেখা 'মধুচক্র'। এ-নাম তার কলেজের পূর্বতন সংস্কৃত অধ্যাপকের দেওয়া। মধুসূদনকে তিনি পূর্বের চেয়ে অকস্মাৎ এখন অনেক বেশি স্নেহ করেন।

এইবার বিধবা মা ভয়ে ভয়ে এসে বললে, 'বাবা, কবে মরে যাব, বউ দেখে যেতে পারব না কি?'

মধু গম্ভীরমুখে সংক্ষেপে উত্তর করলে, 'বিবাহ করতেও সময় নষ্ট, বিবাহ করেও তাই। আমার ফুরসত কোথায়?'

পীড়াপীড়ি করে এমন সাহস ওর মায়েরও নেই, কেননা সময়ের বাজার-দর আছে। সবাই জানে মধুসূদনের এক কথা।

আরো কিছুকাল যায়। উন্নতির জোয়ার বেয়ে কারবারের আপিস মফস্বল থেকে কলকাতায় উঠল। নাতিনাতনীর দর্শনসুখ সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়ে মা ইহলোক ত্যাগ করলে। ঘোষাল-কোম্পানির নাম আজ দেশবিদেশে, ওদের ব্যাবসা বনেদি বিলিতি কোম্পানির গা ঘেঁষে চলে, বিভাগে বিভাগে ইংরেজ ম্যানেজার।

মধুসূদন এবার স্বয়ং বললে, বিবাহের ফুরসত হল। কন্যার বাজারে ক্রেডিট তার সর্বোচ্চে। অতিবড়ো অভিমানী ঘরেরও মানভঞ্জন করবার মতো তার শক্তি। চার দিক থেকে অনেক কুলবতী রূপবতী গুণবতী ধনবতী বিদ্যাবতী কুমারীদের খবর এসে পৌঁছোয়। মধুসূদন চোখ পাকিয়ে বলে, ওই চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়ে চাই।

ঘা-খাওয়া বংশ ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো, বড়ো ভয়ংকর।

৩

এইবার কন্যাপক্ষের কথা।

নূরনগরের চাটুজ্যেদের অবস্থা এখন ভালো নয়। ঐশ্বর্যের বাঁধ ভাঙছে। ছয়-আনি শরিকরা বিষয় ভাগ করে বেরিয়ে গেল, এখন তারা বাইরে থেকে লাঠি হাতে দশ-আনির সীমানা খাবলে বেড়াচ্ছে। তা ছাড়া রাধাকান্ত জীউর সেবায়তি অধিকারে দশে-ছয়ে যতই সূক্ষ্মভাবে ভাগ করবার চেষ্টা চলছে, ততই তার শস্য-অংশ স্থূলভাবে উকিল-মোক্তারের আঙিনায় নয়-ছয় হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, আমলারাও বঞ্চিত হল না। নূরনগরের সে প্রতাপ নেই— আয় নেই, ব্যয় বেড়েছে চতুর্গুণ। শতকরা ন-টাকা হারে সুদের ন-পা-ওয়ালা মাকড়সা জমিদারির চার দিকে জাল জড়িয়ে চলেছে।

পরিবারে দুই ভাই, পাঁচ বোন। কন্যাধিক্য-অপরাধের জরিমানা এখনো শোধ হয় নি। কর্তা থাকতেই চার বোনের বিয়ে হয়ে গেল কুলীনের ঘরে। এদের ধনের বহরটুকু হাল আমলের, খ্যাতিটা সাবেক আমলের। জামাইদের পণ দিতে হল কৌলীন্যের মোটা দামে ও ফাঁকা খ্যাতির লম্বা মাপে। এই বাবদেই ন-পার্সেন্টের সূত্রে গাঁথা দেনার ফাঁসে বারো-পার্সেন্টের গ্রন্থি পড়ল। ছোটো ভাই মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসি, রোজগার না করলে চলবে না। সে গেল বিলেতে, বড়ো ভাই বিপ্রদাসের ঘাড়ে পড়ল সংসারের ভার।

এই সময়টাতে পূর্বোক্ত ঘোষাল ও চাটুজ্যেদের ভাগ্যের ঘুড়িতে পরস্পরের লখে লখে আর-একবার বেধে গেল। ইতিহাসটা বলি।

বড়োবাজারের তনসুকদাস হালওয়াইদের কাছে এদের একটা মোটা অঙ্কের দেনা। নিয়মিত সুদ দিয়ে আসছে, কোনো কথা ওঠে নি। এমন সময়ে পুজোর ছুটি পেয়ে বিপ্রদাসের সহপাঠী অমূল্যধন এল আত্মীয়তা দেখাতে। সে হল বড়ো অ্যাটর্নি-আপিসের আর্টিকেল্‌ড্‌ হেডক্লার্ক। এই চশমা-পরা যুবকটি নূরনগরের অবস্থাটা আড়চোখে দেখে নিলে। সেও কলকাতায় ফিরল আর তনসুকদাসও টাকা ফেরত চেয়ে বসল; বললে, নতুন চিনির কারবার খুলেছে, টাকার জরুরি দরকার।

বিপ্রদাস মাথায় হাত দিয়ে পড়ল।

সেই সংকটকালেই চাটুজ্যে ও ঘোষাল এই দুই নামে দ্বিতীয়বার ঘটল দ্বন্দ্ব সমাস। তার পূর্বেই সরকারবাহাদুরের কাছ থেকে মধুসূদন রাজখেতাব পেয়েছে। পূর্বোক্ত ছাত্রবন্ধু এসে বললে, নতুন রাজা খোশমেজাজে আছে, এই সময়ে ওর কাছ থেকে সুবিধেমত ধার পাওয়া যেতে পারে। তাই পাওয়া গেল— চাটুজ্যেদের সমস্ত খুচরো দেনা একঠাঁই করে এগারো লাখ টাকা সাত পার্সেন্ট সুদে। বিপ্রদাস হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কুমুদিনী ওদের শেষ অবশিষ্ট বোন বটে, তেমনি আজ ওদের সম্বলেরও শেষ অবশিষ্ট দশা। পণ জোটানোর, পাত্র জোটানোর কথা কল্পনা করতে গেলে আতঙ্ক হয়। দেখতে সে সুন্দরী, লম্বা ছিপছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ বড়ো না হোক, একেবারে নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রঙ শাঁখের মতো চিকন গৌর; নিটোল দুখানি হাত; সে হাতের সেবা কমলার বরদান, কৃতজ্ঞ হয়ে গ্রহণ করতে হয়। সমস্ত মুখে একটি বেদনায় সকরুণ ধৈর্যের ভাব।

কুমুদিনী নিজের জন্যে নিজে সংকুচিত। তার বিশ্বাস সে অপয়া। সে জানে পুরুষরা সংসার চালায় নিজের শক্তি দিয়ে, মেয়েরা লক্ষ্মীকে ঘরে আনে নিজের ভাগ্যের জোরে। ওর দ্বারা তা হল না। যখন থেকে ওর বোঝবার বয়স হয়েছে তখন থেকে চার দিকে দেখছে দুর্ভাগ্যের পাপদৃষ্টি। আর সংসারের উপর চেপে আছে ওর নিজের আইবুড়ো-দশা, জগদ্দল পাথর, তার যত বড়ো দুঃখ, তত বড়ো অপমান। কিছু করবার নেই, কপালে করাঘাত ছাড়া। উপায় করবার পথ বিধাতা মেয়েদের দিলেন না, দিলেন কেবল ব্যথা পাবার শক্তি। অসম্ভব একটা-কিছু ঘটে না কি? কোনো দেবতার

বর, কোনো যক্ষের ধন, পূর্বজন্মের কোনো-একটা বাকিপড়া পাওনার এক মুহূর্তে পরিশোধ? এক-একদিন রাতে বিছানা থেকে উঠে বাগানের মর্মরিত ঝাউগাছগুলোর মাথার উপরে চেয়ে থাকে, মনে মনে বলে, 'কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় তোমার সাতরাজার-ধন মানিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়ে থাকব।'

বংশের দুর্গতির জন্য নিজেকে যতই অপরাধী করে, ততই হৃদয়ের সুধাপাত্র উপুড় করে ভাইদের ওর ভালোবাসা দেয়—কঠিন দুঃখে নেঙড়ানো ওর ভালোবাসা। কুমুর 'পরে তাদের কর্তব্য করতে পারছে না বলে ওর ভাইরাও বড়ো ব্যথার সঙ্গে কুমুকে তাদের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছে। এই পিতৃমাতৃহীনাকে উপরওয়ালা যে স্নেহের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছেন, ভাইরা তা ভরিয়ে দেবার জন্যে সর্বদা উৎসুক। ও যে চাঁদের আলোর টুকরো, দৈন্যের অন্ধকারকে একা মধুর করে রেখেছে। যখন মাঝে মাঝে দুর্ভাগ্যের বাহন বলে নিজেকে সে ধিক্‌কার দেয়, দাদা বিপ্রদাস হেসে বলে, 'কুমু, তুই নিজেই তো আমাদের সৌভাগ্য—তোকে না পেলে বাড়িতে শ্রী থাকত কোথায়?'

কুমুদিনী ঘরে পড়াশুনো করেছে। বাইরের পরিচয় নেই বললেই হয়। পুরোনো নতুন দুই কালের আলো-আঁধারে তার বাস। তার জগৎটা আবছায়া—সেখানে রাজত্ব করে সিদ্ধেশ্বরী, গন্ধেশ্বরী, ঘেঁটু, ষষ্ঠী; সেখানে বিশেষ দিনে চন্দ্র দেখতে নেই; শাঁখ বাজিয়ে গ্রহণের কুদৃষ্টিকে তাড়াতে হয়, অম্বুবাচীতে সেখানে দুধ খেলে সাপের ভয় ঘোচে; মন্ত্র প'ড়ে, পাঁঠা মানত ক'রে, সুপুরি আলো-চাল ও পাঁচ পয়সার সিন্নি মেনে, তাগাতাবিজ প'রে, সে জগতের শুভ-অশুভের সঙ্গে কারবার; স্বস্ত্যয়নের জোরে ভাগ্য-সংশোধনের আশা—সে আশা হাজারবার ব্যর্থ হয়। প্রত্যক্ষ দেখা যায়, অনেক সময়েই শুভলগ্নের শাখায় শুভফল ফলে না, তবু বাস্তবের শক্তি নেই প্রমাণের দ্বারা স্বপ্নের মোহ কাটাতে পারে। স্বপ্নের জগতে বিচার চলে না, একমাত্র চলে মেনে চলা। এ জগতে দৈবের ক্ষেত্রে যুক্তির সুসংগতি, বুদ্ধির কর্তৃত্ব, ভালো-মন্দর নিত্যতত্ত্ব নেই বলেই কুমুদিনীর মুখে এমন একটা করুণা। ও জানে, বিনা অপরাধেই ও লাঞ্ছিত। আট বছর হল সেই লাঞ্ছনাকে একান্ত সে নিজের বলেই গ্রহণ করেছিল—সে তার পিতার মৃত্যু নিয়ে।

৪

পুরানো ধনী-ঘরে পুরাতন কাল যে দুর্গে বাস করে তার পাকা গাঁথুনি। অনেক দেউড়ি পার হয়ে তবে নতুন কালকে সেখানে ঢুকতে হয়। সেখানে যারা থাকে নতুন যুগে এসে পেঁৗছোতে তাদের বিস্তর লেট হয়ে যায়। বিপ্রদাসের বাপ মুকুন্দলালও ধাবমান নতুন যুগকে ধরতে পারেন নি।

দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি-কাটা চুল, বড়ো বড়ো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বের দৃষ্টি। ভারী গলায় যখন হাঁক পাড়েন, অনুচর-পরিচরদের বুক থর থর করে কেঁপে ওঠে। যদিও পালোয়ান রেখে নিয়মিত কুস্তি করা তাঁর অভ্যাস, গায়ে শক্তিও কম নয়, তবু সুকুমার শরীরে শ্রমের চিহ্ন নেই। পরনে চুনট-করা ফুরফুরে মসলিনের জামা, ফরাসডাঙা বা ঢাকাই ধুতির বহুযত্নবিন্যস্ত কোঁচা ভুলুণ্ঠিত, কর্তার আসন্ন আগমনের বাতাস ইস্তাম্বুল আতরের সুগন্ধবার্তা বহন করে। পানের সোনার বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদ্‌বর্তী, দ্বারের কাছে সর্বদা হাজির তকমা-পরা আরদালি। সদর-দরজায় বৃদ্ধ চন্দ্রভান জমাদার তামাক মাখা ও সিদ্ধি কোটার অবকাশে বেঞ্চে বসে লম্বা দাড়ি দুই ভাগ করে বার বার আঁচড়িয়ে দুই কানের উপর বাঁধে, নিম্নতন দারোয়ানরা তলোয়ার হাতে পাহারা দেয়। দেউড়ির দেওয়ালে ঝোলে নানা রকমের ঢাল, বাঁকা তলোয়ার, বহু-কালের পুরানো বন্দুক বল্লম বর্শা।

বৈঠকখানায় মুকুন্দলাল বসেন গদির উপর, পিঠের কাছে তাকিয়া। পারিষদেরা বসে নীচে, সামনে বাঁয়ে দুই ভাগে। হুঁকাবরদারের জানা আছে, এদের কার সম্মান কোন্ রকম হুঁকোয় রক্ষা

হয়—বাঁধানো, আবাঁধানো, না গুড়গুড়ি। কর্তামহারাজের জন্যে বৃহৎ আলবোলা, গোলাপজলের গন্ধে সুগন্ধি।

বাড়ির আর-এক মহলে বিলিতি বৈঠকখানা, সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি আসবাব। সামনেই কালোদাগ-ধরা মস্ত এক আয়না, তার গিল্‌টি-করা ফ্রেমের দুই গায়ে ডানাওয়ালা পরী-মূর্তির হাতে-ধরা বাতিদান। তলায় টেবিলে সোনার জলে চিত্রিত কালো পাথরের ঘড়ি, আর কতক-গুলো বিলিতি কাঁচের পুতুল। খাড়াপিঠওয়ালা চৌকি, সোফা, কড়িতে দোদুল্যমান ঝাড়লণ্ঠন, সমস্তই হল্যান্ড-কাপড়ে মোড়া। দেয়ালে পূর্বপুরুষদের অয়েলপেন্টিং, আর তার সঙ্গে বংশের মুরুব্বি দু-একজন রাজপুরুষের ছবি। ঘরজোড়া বিলিতি কার্পেট, তাতে মোটা মোটা ফুল টকটকে কড়া রঙে আঁকা। বিশেষ ক্রিয়াকর্মে জিলার সাহেবসুবাদের নিমন্ত্রণোপলক্ষে এই ঘরের অবগুণ্ঠন মোচন হয়। বাড়িতে এই একটা মাত্র আধুনিক ঘর, কিন্তু মনে হয় এইটেই সবচেয়ে প্রাচীন ভূতে-পাওয়া কামরা, অব্যবহারের রুদ্ধ ঘনগন্ধে দম-আটকানো দৈনিক জীবনযাত্রার সম্পর্ক-বঞ্চিত বোবা।

মুকুন্দলালের যে শৌখিনতা সেটা তখনকার আদবকায়দার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। তার মধ্যে যে নির্ভীক ব্যয়বাহুল্য, সেইটেতেই ধনের মর্যাদা। অর্থাৎ ধন বোঝা হয়ে মাথায় চড়ে নি, পাদপীঠ হয়ে আছে পায়ের তলায়। এঁদের শৌখিনতার আমদরবারে দানদাক্ষিণ্য, খাসদরবারে ভোগবিলাস—দুইই খুব টানা মাপের। এক দিকে আশ্রিতবাৎসল্যে যেমন অকৃপণতা, আর-এক দিকে ঔদ্ধত্যদমনে তেমনি অবাধ অধৈর্য। একজন হঠাৎ-ধনী প্রতিবেশী গুরুতর অপরাধে কর্তার বাগানের মালীর ছেলের কান মলে দিয়েছিল মাত্র; এই ধনীর শিক্ষাবিধান-বাবদ যত খরচ হয়েছে, নিজের ছেলেকে কলেজ পার করতেও এখনকার দিনে এত খরচ করে না। অথচ মালীর ছেলেটাকেও অগ্রাহ্য করেন নি। চাবকিয়ে তাকে শয্যাগত করেছিলেন। রাগের চোটে চাবুকের মাত্রা বেশি হয়েছিল বলে ছেলেটার উন্নতি হল। সরকারি খরচে পড়াশুনা করে সে আজ মোক্তারি করে।

পুরাতন কালের ধনবানদের প্রথামত মুকুন্দলালের জীবন দুই-মহলা। এক মহলে গার্হস্থ্য, আর-এক মহলে ইয়ারকি। অর্থাৎ এক মহলে দশকর্ম, আর-এক মহলে একাদশ অকর্ম। ঘরে আছেন ইষ্টদেবতা আর ঘরের গৃহিণী। সেখানে পূজা-অর্চনা, অতিথিসেবা, পালপার্বণ, ব্রত-উপবাস, কাঙালিবিদায়, ব্রাহ্মণভোজন, পাড়াপড়শি, গুরুপুরোহিত। ইয়ারমহল গৃহসীমার বাইরেই, সেখানে নবাবি আমল, মজলিসি সমারোহে সরগরম। এইখানে আনাগোনা চলত গৃহের প্রত্যন্তপুরবাসিনী-দের। তাদের সংসর্গকে তখনকার ধনীরা সহবত শিক্ষার উপায় বলে গণ্য করত। দুই বিরুদ্ধ হাওয়ার দুই কক্ষবর্তী গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে গৃহিণীদের বিস্তর সহ্য করতে হয়।

মুকুন্দলালের স্ত্রী নন্দরানী অভিমানিনী, সহ্য করাটা তাঁর সম্পূর্ণ অভ্যাস হল না। তার কারণ ছিল। তিনি নিশ্চিত জানেন, বাইরের দিকে তাঁর স্বামীর তানের দৌড় যতদূরই থাক্, তিনিই হচ্ছেন ধুয়ো, ভিতরের শক্ত টান তাঁরই দিকে। সেইজন্যেই স্বামী যখন নিজের ভালোবাসার 'পরে নিজে অন্যায় করেন, তিনি সেটা সইতে পারেন না। এবারে তাই ঘটল।

৫

রাসের সময় খুব ধুম। কতক কলকাতা, কতক ঢাকা থেকে আমোদের সরঞ্জাম এল। বাড়ির উঠোনে কৃষ্ণযাত্রা, কোনোদিন বা কীর্তন। এইখানে মেয়েদের ও সাধারণ পাড়াপড়শির ভিড়। অন্যবারে তামসিক আয়োজনটা হত বৈঠকখানা ঘরে; অন্তঃপুরিকারা, রাতে ঘুম নেই, বুকে ব্যথা বিঁধছে, দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু-কিছু আভাস নিয়ে যেতে পারতেন। এবারে খেয়াল গেল বাইনাচের ব্যবস্থা হবে বজরায় নদীর উপর।

কী হচ্ছে দেখবার জো নেই বলে নন্দরানীর মন রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে আছড়ে আছড়ে কাঁদতে লাগল। ঘরে কাজকর্ম, লোককে খাওয়ানো-দাওয়ানো, দেখাশুনো হাসিমুখেই করতে হয়। বুকের মধ্যে কাঁটাটা নড়তে চড়তে কেবলই বেঁধে, প্রাণটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, কেউ জানতে পারে না। ও দিকে থেকে-থেকে তৃপ্ত কণ্ঠের রব ওঠে, জয় হোক রানীমার।

অবশেষে উৎসবের মেয়াদ ফুরোল, বাড়ি হয়ে গেল খালি। কেবল ছেঁড়া কলাপাতা ও সরা-খুরি-ভাঁড়ের ভগ্নাবশেষের উপর কাক-কুকুরের কলরবমুখর উত্তরকাণ্ড চলছে। ফরাশেরা সিঁড়ি খাটিয়ে লণ্ঠন খুলে নিল, চাঁদোয়া নামাল, ঝাড়ের টুকরো বাতি ও শোলার ফুলের ঝালরগুলো নিয়ে পাড়ার ছেলেরা কাড়াকাড়ি বাধিয়ে দিল। সেই ভিড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে চড়ের আওয়াজ ও চীৎকার কান্না যেন তারস্বরের হাউইয়ের মতো আকাশ ফুঁড়ে উঠছে। অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ থেকে উচ্ছিষ্ট ভাত তরকারির গন্ধে বাতাস অম্লগন্ধী; সেখানে সর্বত্র ক্লান্তি, অবসাদ ও মলিনতা। এই শূন্যতা অসহ্য হয়ে উঠল যখন মুকুন্দলাল আজও ফিরলেন না। নাগাল পাবার উপায় নেই বলেই নন্দরানীর ধৈর্যের বাঁধ হঠাৎ ফেটে খান খান হয়ে গেল।

দেওয়ানজিকে ডাকিয়ে পরদার আড়াল থেকে বললেন, 'কর্তাকে বলবেন, বৃন্দাবনে মার কাছে আমাকে এখনই যেতে হচ্ছে। তাঁর শরীর ভালো নেই।'

দেওয়ানজি কিছুক্ষণ টাকে হাত বুলিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'কর্তাকে জানিয়ে গেলেই ভালো হত মাঠাকরুন। আজকালের মধ্যে বাড়ি ফিরবেন খবর পেয়েছি।'

'না, দেরি করতে পারব না।'

নন্দরানীও খবর পেয়েছেন আজকালের মধ্যেই ফেরবার কথা। সেইজন্যেই যাবার এত তাড়া। নিশ্চয় জানেন, অল্প একটু কান্নাকাটি-সাধ্যসাধনাতেই সব শোধ হয়ে যাবে। প্রতিবারই এমনি হয়েছে। উপযুক্ত শাস্তি অসমাপ্তই থাকে। এবারে তা কিছুতেই চলবে না। তাই দণ্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েই দণ্ডদাতাকে পালাতে হচ্ছে। বিদায়ের ঠিক পূর্বমুহূর্তে পা সরতে চায় না—শোবার খাটের উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কান্না। কিন্তু যাওয়া বন্ধ হল না।

তখন কার্তিক মাসের বেলা দুটো। রৌদ্রে বাতাস আতপ্ত। রাস্তার ধারের সিসুতরুশ্রেণীর মর্মরের সঙ্গে মিশে ক্বচিৎ গলাভাঙা কোকিলের ডাক আসছে। যে রাস্তা দিয়ে পালকি চলেছে সেখান থেকে কাঁচা ধানের খেতের পরপ্রান্তে নদী দেখা যায়। নন্দরানী থাকতে পারলেন না, পালকির দরজা ফাঁক করে সে দিকে চেয়ে দেখলেন। ও পারের চরে বজরা বাঁধা আছে, চোখে পড়ল। মাস্তুলের উপর নিশেন উড়ছে। দূর থেকে মনে হল, বজরার ছাতের উপর চিরপরিচিত গুপি হরকরা বসে; তার পাগড়ির তকমার উপর সূর্যের আলো ঝকমক করছে। সবলে পালকির দরজা বন্ধ করে দিলেন, বুকের ভিতরটা পাথর হয়ে গেল।

৬

মুকুন্দলাল, যেন মাস্তুল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, টোল-খাওয়া, তুফানে আছাড়-লাগা জাহাজ, সসংকোচে বন্দরে এসে ভিড়লেন। অপরাধের বোঝায় বুক ভারী। প্রমোদের স্মৃতিটা যেন অতিভোজনের পরের উচ্ছিষ্টের মতো মনটাকে বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছে। যারা ছিল তাঁর এই আমোদের উৎসাহদাতা উদ্‌যোগকর্তা, তারা যদি সামনে থাকত তা হলে তাদের ধরে চাবুক কষিয়ে দিতে পারতেন। মনে-মনে পণ করছেন আর কখনো এমন হতে দেবেন না। তাঁর আলুথালু চুল, রক্তবর্ণ চোখ আর মুখের অতিশুষ্ক ভাব দেখে প্রথমটা কেউ সাহস করে কর্ত্রীঠাকরুনের খবরটা দিতে পারলে না, মুকুন্দলাল ভয়ে ভয়ে অন্তঃপুরে গেলেন। 'বড়োবউ মাপ করো—অপরাধ করেছি, আর কখনো এমন হবে না' এই কথা মনে মনে বলতে বলতে শোবার ঘরের দরজার কাছে একটুখানি থমকে দাঁড়িয়ে আস্তে

আস্তে ভিতরে ঢুকলেন। মনে মনে নিশ্চয় স্থির করেছিলেন যে, অভিমানিনী বিছানায় পড়ে আছেন। একেবারে পায়ের কাছে গিয়ে পড়বেন এই ভেবে ঘরে ঢুকেই দেখলেন ঘর শূন্য। বুকের ভিতরটা দমে গেল। শোবার ঘরে বিছানায় নন্দরানীকে যদি দেখতেন তবে বুঝতেন যে, অপরাধ ক্ষমা করবার জন্যে মানিনী অর্ধেক রাস্তা এগিয়ে আছেন। কিন্তু বড়োবউ যখন শোবার ঘরে নেই তখন মুকুন্দলাল বুঝলেন, তাঁর প্রায়শ্চিত্তটা হবে দীর্ঘ এবং কঠিন। হয়তো আজ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কিংবা হবে আরো দেরি। কিন্তু এতক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সম্পূর্ণ শাস্তি এখনই মাথা পেতে নিয়ে ক্ষমা আদায় করবেন, নইলে জলগ্রহণ করবেন না। বেলা হয়েছে, এখনো স্নানাহার হয় নি, এ দেখে কি সাধ্বী থাকতে পারবেন? শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, প্যারী দাসী বারান্দার এক কোণে মাথায় ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর বড়োবউমা কোথায়?'

সে বললে, 'তিনি তাঁর মাকে দেখতে পরশুদিন বৃন্দাবনে গেছেন।'

ভালো যেন বুঝতে পারলেন না, রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গেছেন?'

'বৃন্দাবনে। মায়ের অসুখ।'

মুকুন্দলাল একবার বারান্দার রেলিং চেপে ধরে দাঁড়ালেন। তার পরে দ্রুতপদে বাইরের বৈঠকখানায় গিয়ে একা বসে রইলেন। একটি কথা কইলেন না। কাছে আসতে কারও সাহস হয় না।

দেওয়ানজি এসে ভয়ে ভয়ে বললেন, 'মাঠাকরুনকে আনতে লোক পাঠিয়ে দিই?'

কোনো কথা না বলে কেবল আঙুল নেড়ে নিষেধ করলেন। দেওয়ানজি চলে গেলে রাধু খানসামাকে ডেকে বললেন, 'ব্রান্ডি লে আও।'

বাড়িসুদ্ধ লোক হতবুদ্ধি। ভূমিকম্প যখন পৃথিবীর গভীর গর্ত থেকে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে তখন যেমন তাকে চাপা দেবার চেষ্টা করা মিছে, নিরুপায়ভাবে তার ভাঙাচোরা সহ্য করতেই হয়— এও তেমনি।

দিনরাত চলছে নির্জল ব্রান্ডি। খাওয়াদাওয়া প্রায় নেই। একে শরীর পূর্ব থেকেই ছিল অবসন্ন, তার পরে এই প্রচণ্ড অনিয়মে বিকারের সঙ্গে রক্তবমন দেখা দিল।

কলকাতা থেকে ডাক্তার এল— দিনরাত মাথায় বরফ চাপিয়ে রাখলে।

মুকুন্দলাল যাকে দেখেন খেপে ওঠেন, তাঁর বিশ্বাস তাঁর বিরুদ্ধে বাড়িসুদ্ধ লোকের চক্রান্ত। ভিতরে ভিতরে একটা নালিশ গুমরে উঠছিল— এরা যেতে দিলে কেন।

একমাত্র মানুষ যে তাঁর কাছে আসতে পারত সে কুমুদিনী। সে এসে পাশে বসে; ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে মুকুন্দলাল চেয়ে দেখেন— যেন মার সঙ্গে ওর চোখে কিংবা কোথাও একটা মিল দেখতে পান। কখনো কখনো বুকের উপরে তার মুখ টেনে নিয়ে চুপ করে চোখ বুজে থাকেন, চোখের কোণ দিয়ে জল পড়তে থাকে, কিন্তু কখনো ভুলে একবার আর মার কথা জিজ্ঞাসা করেন না। এ দিকে বৃন্দাবনে টেলিগ্রাম গেছে। কর্ত্রীঠাকরুনের কালই ফেরবার কথা। কিন্তু শোনা গেল, কোথায় এক জায়গায় রেলের লাইন গেছে ভেঙে।

সেদিন তৃতীয়া; সন্ধ্যাবেলায় ঝড় উঠল। বাগানে মড় মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। থেকে থেকে বৃষ্টির ঝাপটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠছে ক্রুদ্ধ অধৈর্যের মতো। লোকজন খাওয়াবার জন্যে যে চালাঘর তোলা হয়েছিল তার করোগেটেড লোহার চাল উড়ে দিঘিতে গিয়ে পড়ল। বাতাস বাণবিদ্ধ বাঘের মতো গোঁ গোঁ করে গোঙরাতে গোঙরাতে আকাশে আকাশে লেজ ঝাপটা দিয়ে পাক খেয়ে বেড়ায়। হঠাৎ বাতাসের এক দমকে জানলাদরজাগুলো খড় খড় করে কেঁপে উঠল। কুমুদিনীর

হাত চেপে ধরে মুকুন্দলাল বললেন, 'মা কুমু, ভয় নেই, তুই তো কোনো দোষ করিস নি। ওই শোন্ দাঁতকড়মড়ানি, ওরা আমাকে মারতে আসছে।'

বাবার মাথায় বরফের পুঁটুলি বুলোতে বুলোতে কুমুদিনী বলে, 'মারবে কেন বাবা? ঝড় হচ্ছে; এখনই থেমে যাবে।'

'বৃন্দাবন? বৃন্দাবন...চন্দ্র...চক্রবর্তী! বাবার আমলের পুরুত— সে তো মরে গেছে— ভূত হয়ে গেছে বৃন্দাবনে। কে বললে সে আসবে?'

'কথা কোয়ো না বাবা, একটু ঘুমোও।'

'ওই যে, কাকে বলছে, খবরদার, খবরদার!'

'কিছু না, বাতাসে বাতাসে গাছগুলোকে ঝাঁকানি দিচ্ছে।'

'কেন, ওর রাগ কিসের? এতই কী দোষ করেছি, তুই বল্ মা।'

'কোনো দোষ কর নি বাবা। একটু ঘুমোও।'

'বিন্দে দূতী? সেই যে মধু অধিকারী সাজত।

মিছে কর কেন নিন্দে,
ওগো বিন্দে শ্রীগোবিন্দে--'

চোখ বুজে গুন গুন করে গাইতে লাগলেন।

'কার বাঁশি ওই বাজে বৃন্দাবনে।
সই লো সই,
ঘরে আমি রইব কেমনে!

রাধু, ব্রান্ডি লে আও।'

কুমুদিনী বাবার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'বাবা, ও কী বলছ?' মুকুন্দলাল চোখ চেয়ে তাকিয়েই জিভ কেটে চুপ করেন। বুদ্ধি যখন অত্যন্ত বেঠিক তখনো এ কথা ভোলেন নি যে, কুমুদিনীর সামনে মদ চলতে পারে না।

একটু পরে আবার গান ধরলেন,

'শ্যামের বাঁশি কাড়তে হবে,
নইলে আমায় এ বৃন্দাবন ছাড়তে হবে।'

এই এলোমেলো গানের টুকরোগুলো শুনে কুমুর বুক ফেটে যায়— মায়ের উপর রাগ করে, বাবার পায়ের তলায় মাথা রাখে যেন মায়ের হয়ে মাপ-চাওয়া।

মুকুন্দ হঠাৎ ডেকে উঠলেন, 'দেওয়ানজি!'

দেওয়ানজি আসতে তাকে বললেন, 'ঐ যেন ঠক ঠক শুনতে পাচ্ছি।'

দেওয়ানজি বললেন, 'বাতাসে দরজা নাড়া দিচ্ছে।'

'বুড়ো এসেছে, সেই বৃন্দাবনচন্দ্র— টাক মাথায়, লাঠি হাতে, চেলির চাদর কাঁধে। দেখে এসো তো। কেবলই ঠক ঠক ঠক ঠক করছে। লাঠি, না খড়ম?'

রক্তবমন কিছুক্ষণ শান্ত ছিল। তিনটে রাত্রে আবার আরম্ভ হল। মুকুন্দলাল বিছানার চারি দিকে হাত বুলিয়ে জড়িতস্বরে বললেন, 'বড়োবউ, ঘর যে অন্ধকার! এখনো আলো জ্বালবে না?'

বজরা থেকে ফিরে আসবার পর মুকুন্দলাল এই প্রথম স্ত্রীকে সম্ভাষণ করলেন— আর এই শেষ।

বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে নন্দরানী বাড়ির দরজার কাছে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁকে ধরাধরি করে বিছানায় এনে শোয়াল। সংসারে কিছুই তাঁর আর রুচল না। চোখের জল একেবারে শুকিয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের মধ্যেও সান্ত্বনা নেই। গুরু এসে শাস্ত্রের শ্লোক আওড়ালেন, মুখ ফিরিয়ে রইলেন। হাতের লোহা খুললেন না— বললেন, 'আমার হাত দেখে বলেছিল আমার এয়োত ক্ষয় হবে না। সে কি মিথ্যে হতে পারে?'

দূরসম্পর্কের ক্ষেমা-ঠাকুরঝি আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, 'যা হবার তা তো হয়েছে, এখন ঘরের দিকে তাকাও। কর্তা যে যাবার সময় বলে গেছেন, বড়োবউ ঘরে কি আলো জ্বালবে না?'

নন্দরানী বিছানা থেকে উঠে বসে দূরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাব, আলো জ্বালতে যাব। এবার আর দেরি হবে না।' বলে তাঁর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন হাতে প্রদীপ নিয়ে এখনি যাত্রা করে চলেছেন।

সূর্য গেছেন উত্তরায়ণে; মাঘ মাস এল, শুক্ল চতুর্দশী। নন্দরানী কপালে মোটা করে সিঁদুর পরলেন, গায়ে জড়িয়ে নিলেন লাল বেনারসি শাড়ি। সংসারের দিকে না তাকিয়ে মুখে হাসি নিয়ে চলে গেলেন।

৮

বাবার মৃত্যুর পর বিপ্রদাস দেখলে, যে গাছে তাদের আশ্রয় তার শিকড় খেয়ে দিয়েছে পোকায়। বিষয়সম্পত্তি ঋণের চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে— অল্প করে ডুবছে। ক্রিয়াকর্ম সংক্ষেপ ও চালচলন খাটো না করলে উপায় নেই। কুমুর বিয়ে নিয়েও কেবলই প্রশ্ন আসে, তার উত্তর দিতে মুখে বাধে। শেষকালে নূরনগর থেকে বাসা তুলতে হল। কলকাতায় বাগবাজারের দিকে একটা বাড়িতে এসে উঠল।

পুরোনো বাড়িতে কুমুদিনীর একটা প্রাণময় পরিমণ্ডল ছিল। চারি দিকে ফুলফল, গোয়ালঘর, পুজোবাড়ি, শস্যখেত, মানুষজন। অন্তঃপুরের বাগানে ফুল তুলেছে, সাজি ভরেছে, নুন-লঙ্কা ধনেপাতার সঙ্গে কাঁচা কুল মিশিয়ে অপথ্য করেছে; চালতা পেড়েছে, বোশেখ-জষ্টির ঝড়ে আম-বাগানে আম কুড়িয়েছে। বাগানের পূর্বপ্রান্তে ঢেঁকিশাল, সেখানে লাড়ুকোটা প্রভৃতি উপলক্ষে মেয়েদের কলকোলাহলে তারও অল্প কিছু অংশ ছিল। শ্যাওলায়-সবুজ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খিড়কির পুকুর ঘন ছায়ায় স্নিগ্ধ, কোকিল-ঘুঘু-দোয়েল-শ্যামার ডাকে মুখরিত। এইখানে প্রতিদিন সে জলে কেটেছে সাঁতার, নালফুল তুলেছে, ঘাটে বসে দেখেছে খেয়াল, আনমনে একা বসে করেছে পশম সেলাই। ঋতুতে ঋতুতে মাসে মাসে প্রকৃতির উৎসবের সঙ্গে মানুষের এক-একটি পরব বাঁধা। অক্ষয়তৃতীয়া থেকে দোলযাত্রা বাসন্তীপুজো পর্যন্ত কত কী। মানুষে প্রকৃতিতে হাত মিলিয়ে সমস্ত বছরটিকে যেন নানা কারুশিল্পে বুনে তুলছে। সবই যে সুন্দর, সবই যে সুখের তা নয়। মাছের ভাগ, পুজোর পার্বণী, কর্ত্রীর পক্ষপাত, ছেলেদের কলহে স্ব-স্ব ছেলের পক্ষসমর্থন প্রভৃতি নিয়ে নীরবে ঈর্ষা বা তারস্বরে অভিযোগ, কানে কানে পরচর্চা বা মুক্তকণ্ঠে অপবাদঘোষণা, এ-সমস্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে— সবচেয়ে আছে নিত্যনৈমিত্তিক কাজের ব্যস্ততার ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা উদ্‌বেগ— কর্তা কখন কী করে বসেন, তাঁর বৈঠকে কখন কী দুর্যোগ আরম্ভ হয়। যদি আরম্ভ হল তবে দিনের পরে দিন শান্তি নেই। কুমুদিনীর বুক দুর দুর করে, ঘরে লুকিয়ে মা কাঁদেন, ছেলেদের মুখ শুকনো। এই-সমস্ত শুভে অশুভে সুখে দুঃখে সর্বদা আন্দোলিত প্রকাণ্ড সংসারযাত্রা।

এরই মধ্যে থেকে কুমুদিনী এল কলকাতায়। এ যেন মস্ত একটা সমুদ্র কিন্তু কোথায় একফোঁটা পিপাসার জল? দেশে আকাশের বাতাসেরও একটা চেনা চেহারা ছিল। গ্রামের দিগন্তে কোথাও-বা ঘন বন, কোথাও-বা বালির চর, নদীর জলরেখা, মন্দিরের চুড়ো, শূন্য বিস্তৃত মাঠ, বুনো ঝাউয়ের ঝোপ, গুণটানা পথ— এরা নানা রেখায় নানা রঙে বিচিত্র ঘের দিয়ে আকাশকে একটি বিশেষ আকাশ করে তুলেছিল— কুমুদিনীর আপন আকাশ। সূর্যের আলোও ছিল তেমনি বিশেষ আলো। দিঘিতে, শস্যখেতে, বেতের ঝাড়ে, জেলে-নৌকোর খয়েরি রঙের পালে, বাঁশঝাড়ের কচি ডালের চিকন পাতায়, কাঁঠালগাছের মসৃণ-ঘন সবুজে, ও পারের বালুতটের ফ্যাকাশে হলদেয়— সমস্তর সঙ্গে নানা ভাবে

মিশিয়ে সেই আলো একটি চিরপরিচিত রূপ পেয়েছিল। কলকাতার এই-সব অপরিচিত বাড়ির ছাদে দেয়ালে কঠিন অনম্র রেখার আঘাতে নানাখানা হয়ে সেই চিরদিনের আকাশ আলো তাকে বেগানা লোকের মতো কড়া চোখে দেখে। এখানকার দেবতাও তাকে একঘরে করেছে।

বিপ্রদাস তাকে কেদারার কাছে টেনে নিয়ে বলে, 'কী কুমু, মন কেমন করছে?'

কুমুদিনী হেসে বলে, 'না দাদা, একটুও না।'

'যাবি বোন, ম্যুজিয়ম দেখতে?'

'হ্যাঁ যাব।'

এত বেশি উৎসাহের সঙ্গে বলে যে, বিপ্রদাস যদি পুরুষমানুষ না হত তবে বুঝতে পারত যে এটা স্বাভাবিক নয়। ম্যুজিয়মে না যেতে হলেই সে বাঁচে। বাইরের লোকের ভিড়ের মধ্যে বেরোনো অভ্যেস নেই বলে জনসমাগমে যেতে তার সংকোচের অন্ত নেই। হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, চোখ চেয়ে ভালো করে দেখতেই পারে না।

বিপ্রদাস তাকে দাবাখেলা শেখালে। নিজে অসামান্য খেলোয়াড়, কুমুর কাঁচা খেলা নিয়ে তার আমোদ লাগে। শেষকালে নিয়মিত খেলতে খেলতে কুমুর এতটা হাত পাকল যে বিপ্রদাসকে সাবধানে খেলতে হয়। কলকাতায় কুমুর সমবয়সী মেয়ে-সঙ্গিনী না থাকাতে এই দুই ভাইবোন যেন দুই ভাইয়ের মতো হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিপ্রদাসের বড়ো অনুরাগ; কুমু একমনে তার কাছ থেকে ব্যাকরণ শিখেছে। যখন কুমারসম্ভব পড়লে তখন থেকে শিবপুজোয় সে শিবকে দেখতে পেলে, সেই মহাতপস্বী যিনি তপস্বিনী উমার পরম তপস্যার ধন। কুমারীর ধ্যানে তার ভাবী পতি পবিত্রতার দৈবজ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে দেখা দিলে।

বিপ্রদাসের ফোটোগ্রাফ তোলার শখ, কুমুও তাই শিখে নিলে। ওরা কেউ-বা নেয় ছবি, কেউ-বা সেটাকে ফুটিয়ে তোলে। বন্দুকে বিপ্রদাসের হাত পাকা। পার্বণ উপলক্ষে দেশে যখন যায়, খিড়কির পুকুরে ডাব, বেলের খোলা, আখরোট প্রভৃতি ভাসিয়ে দিয়ে পিস্তল অভ্যাস করে; কুমুকে ডাকে, 'আয়-না কুমু, দেখ্‌-না চেষ্টা করে।'

যে-কোনো বিষয়েই তার দাদার রুচি সে সমস্তকেই বহু যত্নে কুমু আপনার করে নিয়েছে। দাদার কাছে এসরাজ শিখে শেষে ওর হাত এমন হল যে দাদা বলে, আমি হার মানলুম।

এমনি করে শিশুকাল থেকে যে দাদাকে ও সবচেয়ে বেশি ভক্তি করে, কলকাতায় এসে তাকেই সে সবচেয়ে কাছে পেলে। কলকাতায় আসা সার্থক হল। কুমু স্বভাবতই মনের মধ্যে একলা। পর্বত-বাসিনী উমার মতোই ও যেন এক কল্প-তপোবনে বাস করে, মানস-সরোবরের কূলে। এইরকম জন্ম-একলা মানুষদের জন্যে দরকার মুক্ত আকাশ, বিস্তৃত নির্জনতা, এবং তারই মধ্যে এমন একজন কেউ, যাকে নিজের সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারে। নিকটের সংসার থেকে এই দূরবর্তিতা মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ নয় বলে মেয়েরা এটা একেবারেই পছন্দ করে না। তারা এটাকে হয় অহংকার, নয় হৃদয়হীনতা বলে মনে করে। তাই দেশে থাকতেও সঙ্গিনীদের মহলে কুমুদিনীর বন্ধুত্ব জমে ওঠে নি।

পিতা-বর্তমানেই বিপ্রদাসের বিবাহ প্রায় ঠিক, এমন সময় গায়ে হলুদের দুদিন আগেই কনেটি জ্বরবিকারে মারা গেল। তখন ভাটপাড়ায় বিপ্রদাসের কুষ্ঠিগণনায় বেরোল, বিবাহস্থানীয় দুর্গ্রহের ভোগক্ষয় হতে দেরি আছে। বিবাহ চাপা পড়ল। ইতিমধ্যে ঘটল পিতার মৃত্যু। তার পর থেকে ঘটকালি প্রশ্রয় পাবার মতো অনুকূল সময় বিপ্রদাসের ঘরে এল না। ঘটক একদা মস্ত একটা মোটা পণের আশা দেখালে। তাতে হল উলটো ফল। কম্পিত হস্তে হুঁকোটি দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে সেদিন অত্যন্ত দ্রুতপদেই ঘটককে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল।

৯

সুবোধের চিঠি বিলেত থেকে আসত নিয়মমত। এখন মাঝে মাঝে ফাঁক পড়ে। কুমু ডাকের জন্যে ব্যগ্র হয়ে চেয়ে থাকে। বেহারা এবার চিঠি তারই হাতে দিল। বিপ্রদাস আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছে, কুমু ছুটে গিয়ে বললে, 'দাদা, ছোড়দাদার চিঠি।'

দাড়ি-কামানো সেরে কেদারায় বসে বিপ্রদাস একটু যেন ভয়ে ভয়েই চিঠি খুললে। পড়া হয়ে গেলে চিঠিখানা এমন করে হাতে চাপলে যেন সে একটা তীব্র ব্যথা।

কুমুদিনী ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ছোড়দাদার অসুখ করে নি তো?'

'না, সে ভালোই আছে।'

'চিঠিতে কী লিখেছেন বলো-না দাদা।'

'পড়াশুনোর কথা।'

কিছুদিন থেকে বিপ্রদাস কুমুকে সুবোধের চিঠি পড়তে দেয় না। একটু-আধটু পড়ে শোনায়। এবার তাও নয়। চিঠিখানা চেয়ে নিতে কুমুর সাহস হল না, মনটা ছটফট করতে লাগল।

সুবোধ প্রথম-প্রথম হিসেব করেই খরচ চালাত। বাড়ির দুঃখের কথা তখনো মনে তাজা ছিল। এখন সেটা যতই ছায়ার মতো হয়ে এসেছে, খরচও ততই চলেছে বেড়ে। বলছে, বড়োরকম চালে চলতে না পারলে এখানকার সামাজিক উচ্চশিখরের আবহাওয়ায় পৌঁছনো যায় না। আর তা না গেলে বিলেতে আসাই ব্যর্থ হয়।

দায়ে পড়ে দুই-একবার বিপ্রদাসকে তার-যোগে অতিরিক্ত টাকা পাঠাতে হয়েছে। এবার দাবি এসেছে হাজার পাউন্ডের—জরুরি দরকার।

বিপ্রদাস মাথায় হাত দিয়ে বললে, পাব কোথায়? গায়ের রক্ত জল করে কুমুর বিবাহের জন্যে টাকা জমাচ্ছি, শেষে কি সেই টাকায় টান পড়বে? কী হবে সুবোধের ব্যারিস্টার হয়ে, কুমুর ভবিষ্যৎ ফতুর করে যদি তার দাম দিতে হয়?

সে রাত্রে বিপ্রদাস বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। জানে না, কুমুদিনীর চোখেও ঘুম নেই। এক সময়ে যখন বড়ো অসহ্য হল কুমু ছুটে এসে বিপ্রদাসের হাত ধরে বললে, 'সত্যি করে বলো দাদা, ছোড়দাদার কী হয়েছে? পায়ে পড়ি, আমার কাছে লুকিয়ো না।'

বিপ্রদাস বুঝলে গোপন করতে গেলে কুমুদিনীর আশঙ্কা আরো বেড়ে উঠবে। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'সুবোধ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে, অত টাকা দেবার শক্তি আমার নেই।'

কুমু বিপ্রদাসের হাত ধরে বললে, 'দাদা, একটা কথা বলি, রাগ করবে না বলো।'

'রাগ করবার মতো কথা হলে রাগ না করে বাঁচব কী করে?'

'না দাদা, ঠাট্টা নয়, শোনো আমার কথা—মায়ের গয়না তো আমার জন্যে আছে, তাই নিয়ে—'

'চুপ, চুপ, তোর গয়নায় কি আমরা হাত দিতে পারি!'

'আমি তো পারি।'

'না, তুইও পারিস নে। থাক্ সে সব কথা, এখন ঘুমোতে যা।'

কলকাতা শহরের সকাল, কাকের ডাক ও স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ির খড়্‌খড়ানিতে রাত পোয়াল। দূরে কখনো স্টীমারের, কখনো তেলের কলের বাঁশি বাজে। বাসার সামনের রাস্তা দিয়ে একজন লোক মই কাঁধে জ্বরারি-বটিকার বিজ্ঞাপন খাটিয়ে চলেছে; খালি-গাড়ির দুটো গোরু গাড়োয়ানের দুই হাতের প্রবল তাড়ার উত্তেজনায় গাড়ি নিয়ে দ্রুতবেগে ধাবমান; কল থেকে জল নেবার প্রতিযোগিতায় এক হিন্দুস্থানি মেয়ের সঙ্গে উড়িয়া ব্রাহ্মণের ঠেলাঠেলি বকাবকি জমেছে। বিপ্রদাস বারান্দায় বসে; গুড়গুড়ির নলটা হাতে; মেজেতে পড়ে আছে না-পড়া খবরের কাগজ।

কুমু এসে বললে, 'দাদা, 'না' বোলো না।'

'আমার মতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবি তুই? তোর শাসনে রাতকে দিন, না-কে হাঁ করতে হবে?'

'না, শোনো বলি—আমার গয়না নিয়ে তোমার ভাবনা ঘুচুক।'

'সাধে তোকে বলি বুড়ি? তোর গয়না নিয়ে আমার ভাবনা ঘুচবে এমন কথা ভাবতে পারলি কোন্ বুদ্ধিতে?'

'সে জানি নে, কিন্তু তোমার এই ভাবনা আমার সয় না।'

'ভেবেই ভাবনা শেষ করতে হয় রে, তাকে ফাঁকি দিয়ে থামাতে গেলে বিপরীত ঘটে। একটু ধৈর্য ধর্, একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

বিপ্রদাস সে মেলে চিঠিতে লিখলে, টাকা পাঠাতে হলে কুমুর পণের সম্বলে হাত দিতে হয়; সে অসম্ভব।

যথাসময়ে উত্তর এল। সুবোধ লিখেছে, কুমুর পণের টাকা সে চায় না। সম্পত্তিতে তার নিজের অর্ধ অংশ বিক্রি করে যেন টাকা পাঠানো হয়। সংগে সংগেই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি পাঠিয়েছে।

এ চিঠি বিপ্রদাসের বুকে বাণের মতো বিঁধল। এতবড়ো নিষ্ঠুর চিঠি সুবোধ লিখল কী করে! তখনই বুড়ো দেওয়ানজিকে ডেকে পাঠালে। জিজ্ঞাসা করলে, 'ভূষণ রায়েরা করিমহাটি তালুক পত্তনি নিতে চেয়েছিল না? কত পণ দেবে?'

দেওয়ান বললে, 'বিশ হাজার পর্যন্ত উঠতে পারে।'

'ভূষণ রায়কে তলব দিয়ে পাঠাও। কথাবার্তা কইতে চাই।'

বিপ্রদাস বংশের বড়ো ছেলে। তার জন্মকালে তার পিতামহ এই তালুক স্বতন্ত্র ভাবে তাকেই দান করেছেন। ভূষণ রায় মস্ত মহাজন, বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার তেজারতি। জন্মস্থান করিমহাটিতে। এইজন্যে অনেক দিন থেকে নিজের গ্রাম পত্তনি নেবার চেষ্টা। অর্থসংকটে মাঝে মাঝে বিপ্রদাস রাজি হয় আর-কি, কিন্তু প্রজারা কেঁদে পড়ে। বলে, ওকে আমরা কিছুতেই জমিদার বলে মানতে পারব না। তাই প্রস্তাবটা বারে বারে যায় ফেঁসে। এবার বিপ্রদাস মন কঠিন করে বসল। ও নিশ্চয় জানে, সুবোধের টাকার দাবি এইখানেই শেষ হবে না। মনে মনে বললে, আমার তালুকের এই সেলামির টাকা রইল সুবোধের জন্যে, তার পর দেখা যাবে।

দেওয়ান বিপ্রদাসের মুখের উপর জবাব দিতে সাহস করলে না। গোপনে কুমুকে গিয়ে বললে, 'দিদি, তোমার কথা বড়োবাবু শোনেন। বারণ করো তাঁকে, এটা অন্যায় হচ্ছে।'

বিপ্রদাসকে বাড়ির সকলেই ভালোবাসে। কারো জন্যে বড়োবাবু যে নিজের স্বত্ব নষ্ট করবে, এ ওদের গায়ে সয় না।

বেলা হয়ে যায়। বিপ্রদাস ঐ তালুকের কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটছে। এখনো স্নানাহার হয় নি। কুমু বারে বারে তাকে ডেকে পাঠাচ্ছে। শুকনো মুখ করে এক সময়ে অন্দরে এল। যেন বাজে-ছোঁয়া, পাতা-ঝলসানো গাছের মতো। কুমুর বুকে শেল বিঁধল।

স্নানাহার হয়ে গেলে পর বিপ্রদাস আলবোলার নল-হাতে খাটের বিছানায় পা ছড়িয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসল যখন, কুমু তার শিয়রের কাছে বসে ধীরে ধীরে তার চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'দাদা, তোমার তালুক তুমি পত্তনি দিতে পারবে না।'

'তোকে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভূতে পেয়েছে নাকি? সব কথাতেই জুলুম?'

'না দাদা, কথা চাপা দিয়ো না।'

তখন বিপ্রদাস আর থাকতে পারলে না, সোজা হয়ে উঠে বসে কুমুকে শিয়রের কাছ থেকে সরিয়ে সামনে বসালে। রুদ্ধ স্বরটাকে পরিষ্কার করবার জন্যে একটুখানি কেশে নিয়ে বললে, 'সুবোধ কী লিখেছে জানিস? এই দেখ্।'

এই বলে জামার পকেট থেকে তার চিঠি বের করে কুমুর হাতে দিলে। কুমু সমস্তটা পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে বললে, 'মাগো, ছোড়দাদা এমন চিঠিও লিখতে পারলে?'

বিপ্রদাস বললে, 'ওর নিজের সম্পত্তি আর আমার সম্পত্তিতে ও যখন আজ ভেদ করে দেখতে পেরেছে তখন আমার তালুক আমি কি আর আলাদা রাখতে পারি? আজ ওর বাপ নেই, বিপদের সময়ে আমি ওকে দেব না তো কে দেবে?'

এর উপর কুমু আর কথা কইতে পারলে না, নীরবে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বিপ্রদাস তাকিয়ায় আবার ঠেস দিয়ে চোখ বুজে রইল।

অনেকক্ষণ দাদার পায়ে হাত বুলিয়ে অবশেষে কুমু বললে, 'দাদা, মায়ের ধন তো এখন মায়েরই আছে, তাঁর সেই গয়না থাকতে তুমি কেন—'

বিপ্রদাস আবার চমকে উঠে বসে বললে, 'কুমু, এটা তুই কিছুতে বুঝলি নে, তোর গয়না নিয়ে সুবোধ আজ যদি বিলেতে থিয়েটার-কনসার্ট দেখে বেড়াতে পারে তা হলে আমি কি তাকে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব—না সে কোনোদিন মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে? তাকে এত শাস্তি কেন দিবি?'

কুমু চুপ করে রইল, কোনো উপায় সে খুঁজে পেল না। তখন, অনেকবার যেমন ভেবেছে তেমনি করেই ভাবতে লাগল—অসম্ভব কিছু ঘটে না কি? আকাশের কোনো গ্রহ, কোনো নক্ষত্র এক মুহূর্তে সমস্ত বাধা সরিয়ে দিতে পারে না? কিন্তু শুভলক্ষণ দেখা দিয়েছে যে, কিছুদিন থেকে বার বার তার বাঁ চোখ নাচছে। এর পূর্বে জীবনে আরো অনেকবার বাঁ চোখ নেচেছে, তা নিয়ে কিছু ভাববার দরকার হয় নি। এবারে লক্ষণটাকে মনে মনে ধরে পড়ল। যেন তার প্রতিশ্রুতি তাকে রাখতেই হবে—শুভলক্ষণের সত্যভঙ্গ যেন না হয়।

১০

বাদলা করেছে। বিপ্রদাসের শরীরটা ভালো নেই। বালাপোশ মুড়ি দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় খবরের কাগজ পড়ছে। কুমুর আদরের বিড়ালটা বালাপোশের একটা ফালতো অংশ দখল করে গোলাকার হয়ে নিদ্রামগ্ন। বিপ্রদাসের টেরিয়র কুকুরটা অগত্যা ওর স্পর্ধা সহ্য করে মনিবের পায়ের কাছে শুয়ে স্বপ্নে এক-একবার গোঁ গোঁ করে উঠছে।

এমন সময়ে এল আর-এক ঘটক।

'নমস্কার।'

'কে তুমি?'

'আজ্ঞে, কর্তারা আমাকে খুবই চিনতেন, (মিথ্যে কথা) আপনারা তখন শিশু। আমার নাম নীলমণি ঘটক, গঙ্গামণি ঘটকের পুত্র।'

'কী প্রয়োজন?'

'ভালো পাত্রের সন্ধান আছে। আপনাদেরই ঘরের উপযুক্ত।'

বিপ্রদাস একটু উঠে বসল। ঘটক রাজাবাহাদুর মধুসূদন ঘোষালের নাম করলে।

বিপ্রদাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ছেলে আছে নাকি?'

ঘটক জিভ কেটে বললে, 'না, তিনি বিবাহ করেন নি। প্রচুর ঐশ্বর্য। নিজে কাজ দেখা ছেড়ে দিয়েছেন, এখন সংসার করতে মন দিয়েছেন।'

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ বসে গুড়গুড়িতে টান দিতে লাগল। তার পরে হঠাৎ এক সময়ে একটু যেন জোর করে বলে উঠল, 'বয়সের মিল আছে এমন মেয়ে আমাদের ঘরে নেই।'

ঘটক ছাড়তে চায় না, বরের ঐশ্বর্যের যে পরিমাণ কত, আর গবর্নরের দরবারে তাঁর আনাগোনার পথ যে কত প্রশস্ত, ইনিয়ে-বিনিয়ে তারই ব্যাখ্যা করতে লাগল।

বিপ্রদাস আবার স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। আবার অনাবশ্যক বেগের সঙ্গে বলে উঠল, 'বয়সে মিলবে না।'

ঘটক বললে, 'ভেবে দেখবেন, দু-চারদিন বাদে আর-একবার আসব।'

বিপ্রদাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়ল।

দাদার জন্যে গরম চা নিয়ে কুমু ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল। দরজার বাইরে গামছাসুদ্ধ একটা ভিজে জীর্ণ ছাতি ও কাদামাখা তালতলার চটি দেখে থেমে গেল। ওদের কথাবার্তা অনেকখানি কানে পৌঁছল। ঘটক তখন বলছে, 'রাজাবাহাদুর এবার বছর না যেতে মহারাজা হবেন এটা একেবারে লাটসাহেবের নিজ মুখের কথা। তাই এতদিন পরে তাঁর ভাবনা ধরেছে, মহারানীর পদ এখন আর খালি রাখা চলবে না। আপনাদের গ্রহাচার্য কিনু ভট্‌চাজ দূরসম্পর্কে আমার সম্বন্ধী, তার কাছে কন্যার কুষ্ঠি দেখা গেল— লক্ষণ ঠিকটি মিলেছে। এই নিয়ে শহরের মেয়ের কুষ্ঠি ঘাঁটতে বাকি রাখি নি—এমন কুষ্ঠি আর-একটিও হাতে পড়ল না। এই দেখে নেবেন, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এ সম্বন্ধ হয়েই গেছে, এ প্রজাপতির নির্বন্ধ।'

ঠিক এই সময়ে কুমুর আবার বাঁ চোখ নাচল। শুভলক্ষণের কী অপূর্ব রহস্য! কিনু আচার্যি কতবার তার হাত দেখে বলেছে, রাজরানী হবে সে। করকোষ্ঠীর সেই পরিণত ফলটা আপনি যেচে আজ তার কাছে উপস্থিত। ওদের গ্রহাচার্য এই কদিন হল বার্ষিক আদায় করতে কলকাতায় এসেছিল; সে বলে গেছে, এবার আষাঢ় মাস থেকে বৃষরাশির রাজসম্মান, স্ত্রীলোকঘটিত অর্থলাভ, শত্রুনাশ; মন্দের মধ্যে পত্নীপীড়া, এমন-কি হয়তো পত্নীবিয়োগ। বিপ্রদাসের বৃষরাশি। মাঝে মাঝে দৈহিক পীড়ার কথা আছে। তারও প্রমাণ হাতে হাতে, কাল রাত থেকে স্পষ্টই সর্দির লক্ষণ। আষাঢ় মাসও পড়ল—পত্নীর পীড়া ও মৃত্যুর কথাটা ভাববার আশু প্রয়োজন নেই, অতএব এবার সময় ভালো।

কুমু দাদার পাশে বসে বললে, 'দাদা, মাথা ধরেছে কি?'

দাদা বললে, 'না।'

'চা তো ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি? তোমার ঘরে লোক দেখে ঢুকতে পারলুম না।'

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। ভাগ্যের নিষ্ঠুরতা সবচেয়ে অসহ্য যখন সে সোনার রথ আনে যার চাকা অচল। দাদার মুখভাবে এই দ্বিধার বেদনা কুমুকে ব্যথা দিলে। দৈবের দানকে কেন দাদা এমন করে সন্দেহ করছেন? বিবাহ-ব্যাপারে নিজের পছন্দ বলে যে একটা উপসর্গ আছে এ চিন্তা কখনো কুমুদিনীর মাথায় আসে নি। শিশুকাল থেকে পরে পরে সে তার চার দিদির বিয়ে দেখেছে। কুলীনের ঘরে বিয়ে—কুল ছাড়া আর বিশেষ কিছু পছন্দর বিষয় ছিল তাও নয়। ছেলেপুলে নিয়ে তবু তারা সংসার করছে, দিন কেটে যাচ্ছে। যখন দুঃখ পায় বিদ্রোহ করে না; মনে ভাবতেও পারে না যে কিছুতেই এটা ছাড়া আর কিছুই হতে পারত। মা কি ছেলে বেছে নেয়? ছেলেকে মেনে নেয়। কুপুত্রও হয় সুপুত্রও হয়। স্বামীও তেমনি। বিধাতা তো দোকান খোলেন নি। ভাগ্যের উপর বিচার চলবে কার?

এতদিন পরে কুমুর মন্দভাগ্যের তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে এল রাজপুত্র ছদ্মবেশে। রথচক্রের শব্দ কুমু তার হৃৎস্পন্দনের মধ্যে ঐ-যে শুনতে পাচ্ছে। বাইরের ছদ্মবেশটা সে যাচাই করে দেখতেই চায় না।

তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়েই সে পাঁজি খুলে দেখলে, আজ মনোরথ-দ্বিতীয়া। বাড়িতে কর্মচারীদের মধ্যে যে-কয়জন ব্রাহ্মণ আছে সন্ধ্যাবেলা ডাকিয়ে তাদের ফলার করালে, দক্ষিণাও যথাসাধ্য কিছু দিলে। সবাই আশীর্বাদ করলে, রাজরানী হয়ে থাকো, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক।

দ্বিতীয়বার বিপ্রদাসের বৈঠকখানায় ঘটকের আগমন। তুড়ি দিয়ে 'শিব শিব' বলে বৃদ্ধ উচ্চস্বরে হাই তুললে। এবারে অসম্মতি দিয়ে কথাটাকে শেষ করে দিতে বিপ্রদাসের সাহস হল না। ভাবলে এতবড়ো দায়িত্ব নিই কী করে? কেমন করে নিশ্চয় জানব কুমুর পক্ষে এ সম্বন্ধ সব চেয়ে ভালো নয়? পরশুদিন শেষ কথা দেবে বলে ঘটককে বিদায় করে দিলে।

১১

সন্ধ্যার অন্ধকার মেঘের ছায়ায় বৃষ্টির জলে নিবিড়। কুমুর আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই। এক পাশে ছোটো খাট, আলনায় গুটি দুয়েক পাকানো শাড়ি আর চাঁপা-রঙের গামছা। কোণে কাঁঠাল-কাঠের সিন্দুক, তার মধ্যে ওর ব্যবহারের কাপড়। খাটের নীচে সবুজ রঙ-করা টিনের বাক্সে পান সাজবার সরঞ্জাম, আর একটা বাক্সে চুল বাঁধবার সামগ্রী। দেয়ালের খাঁজের মধ্যে কাঠের থাকে কিছু বই, দোয়াতকলম, চিঠির কাগজ, মায়ের হাতের পশমে-বোনা বাবার সর্বদা ব্যবহারের চটিজুতো-জোড়া; শোবার খাটের শিয়রে রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের পট। দেয়ালের কোণে ঠেসানো একটা এসরাজ।

ঘরে কুমু আলো জ্বালায় নি। কাঠের সিন্দুকের উপর বসে জানলার বাইরে চেয়ে আছে। সামনে ইঁটের কলেবরওয়ালা কলিকাতা আদিম কালের বর্মকঠিন একটা অতিকায় জন্তুর মতো, জলধারার মধ্য দিয়ে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে তার গায়ে গায়ে আলোকশিখার বিন্দু। কুমুর মন তখন ছিল অদৃষ্টনিরূপিত তার ভাবীলোকের মধ্যে। সেখানকার ঘরবাড়ি-লোকজন সবই তার আপন আদর্শে গড়া। তারই মাঝখানে নিজের সতীলক্ষ্মী-রূপের প্রতিষ্ঠা— কত ভক্তি, কত পুজা, কত সেবা! তার নিজের মায়ের পুণ্যচরিতে এক জায়গায় একটা গভীর ক্ষত রয়ে গেছে। তিনি স্বামীর অপরাধে কিছুকালের জন্যেও ধৈর্য হারিয়েছিলেন। কুমু কখনো সে ভুল করবে না।

বিপ্রদাসের পায়ের শব্দ শুনে কুমু চমকে উঠল। দাদাকে দেখে বললে, 'আলো জ্বেলে দেব কি?'

'না কুমু, দরকার নেই' বলে বিপ্রদাস সিন্দুকে তার পাশে এসে বসল। কুমু তাড়াতাড়ি মেজের উপর নেমে বসে আস্তে আস্তে তার পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

বিপ্রদাস স্নিগ্ধস্বরে বললে, 'বৈঠকখানায় লোক এসেছিল তাই তোকে ডেকে পাঠাই নি। এতক্ষণ একলা বসে ছিলি?'

কুমু লজ্জিত হয়ে বললে, 'না, ক্ষেমাপিসি অনেকক্ষণ ছিলেন।' কথাটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে বললে, 'বৈঠকখানায় কে এসেছিল, দাদা?'

'সেই কথাই তোকে বলতে এসেছি। এ বছর জষ্টি মাসে তুই আঠারো পেরিয়ে উনিশে পড়লি, তাই না?'

'হাঁ দাদা, তাতে দোষ হয়েছে কী?'

'দোষের কথা না। আজ নীলমণি ঘটক এসেছিল। লক্ষ্মী বোন, লজ্জা করিস নে। বাবা যখন ছিলেন, তোর বয়স দশ— বিয়ে প্রায় ঠিক হয়েছিল। হয়ে গেলে তোর মতের অপেক্ষা কেউ করত না। আজ তো আমি তা পারি নে। রাজা মধুসূদন ঘোষালের নাম নিশ্চয়ই শুনেছিস। বংশমর্যাদায় ওঁরা খাটো নন। কিন্তু বয়সে তোর সঙ্গে অনেক তফাত। আমি রাজি হতে পারি নি। এখন, তোর মুখের একটা কথা শুনলেই চুকিয়ে দিতে পারি। লজ্জা করিস নে কুমু।'

'না, লজ্জা করব না।' বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। 'যাঁর কথা বলছ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হয়েই গেছে।' এটা সেই ঘটকের কথার প্রতিধ্বনি— কখন কথাটা এর মনের গভীরতায় আটকা পড়ে গেছে।

বিপ্রদাস আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কেমন করে ঠিক হল?'

কুমু চুপ করে রইল।

বিপ্রদাস তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, 'ছেলেমানুষি করিস নে, কুমু।'

কুমুদিনী বললে, 'তুমি বুঝবে না দাদা, একটুও ছেলেমানুষি করছি নে।'

দাদার উপর তার অসীম ভক্তি। কিন্তু দাদা তো দৈববাণী মানে না, কুমুদিনী জানে এইখানেই দাদার দৃষ্টির ক্ষীণতা।

বিপ্রদাস বললে, 'তুই তো তাঁকে দেখিস নি।'

'তা হোক, আমি যে ঠিক জেনেছি।'

বিপ্রদাস ভালো করেই জানে, এই জায়গাতেই ভাইবোনের মধ্যে অসীম প্রভেদ। কুমুর চিত্তের এই অন্ধকার মহলে ওর উপর দাদার একটুও দখল নেই। তবু বিপ্রদাস আর একবার বললে, 'দেখ্‌ কুমু, চিরজীবনের কথা, ফস্‌ করে একটা খেয়ালের মাথায় পণ করে বসিস নে।'

কুমু ব্যাকুল হয়ে বললে, 'খেয়াল নয় দাদা, খেয়াল নয়। আমি তোমার এই পা ছুঁয়ে বলছি আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।'

বিপ্রদাস চমকে উঠল। যেখানে কার্যকারণের যোগাযোগ নেই সেখানে তর্ক করবে কী নিয়ে? অমাবস্যার সঙ্গে কুস্তি করা চলে না। বিপ্রদাস বুঝেছে, কী একটা দৈব-সংকেত কুমু মনের মধ্যে বানিয়ে বসেছে। কথাটা সত্য। আজই সকালে ঠাকুরকে উদ্দেশ করে মনে মনে বলেছিল, এই বেজোড় সংখ্যার ফুলে জোড় মিলিয়ে সব-শেষে যেটি বাকি থাকে তার রঙ যদি ঠাকুরের মতো নীল হয় তবে বুঝব তাঁর ইচ্ছা। সব-শেষের ফুলটি হল নীল অপরাজিতা।

অদূরে মল্লিকদের বাড়িতে সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা বেজে উঠল। কুমু জোড়হাত করে প্রণাম করলে। বিপ্রদাস অনেকক্ষণ রইল বসে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; বৃষ্টিধারার বিরাম নেই।

১২

বিপ্রদাস আরো কয়েকবার কুমুদিনীকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলে। কুমু কথার জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে আঁচল খুঁটতে লাগল।

বিয়ের প্রস্তাব পাকা, কেবল একটা বিষয় নিয়ে দুই পক্ষে কিছু কথা-চালাচালি হল। বিয়েটা হবে কোথায়? বিপ্রদাসের ইচ্ছে কলকাতার বাড়িতে। মধুসূদনের একান্ত জেদ নুরনগরে। বরপক্ষের ইচ্ছেই বাহাল রইল।

আয়োজনের জন্য কিছু আগে থাকতেই নুরনগরে আসতে হল। বৈশেখ-জষ্টির খরার পরে আষাঢ়ের বৃষ্টি নামলে মাটি যেমন দেখতে দেখতে সবুজ হয়ে আসে, কুমুদিনীর অন্তরে-বাহিরে তেমনি একটা নূতন প্রাণের রঙ লাগল। আপন মনগড়া মানুষের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ওকে অহরহ পুলকিত করে রাখে। শরৎকালের সোনার আলো ওর সঙ্গে চোখে চোখে কথা কইছে, কোন্‌ এক অনাদিকালের মনের কথা। শোবার ঘরের সামনের বারান্দায় কুমু মুড়ি ছড়িয়ে দেয়, পাখিরা এসে খায়; রুটির টুকরো রাখে, কাঠবিড়ালি চঞ্চল চোখে চারি দিকে চেয়ে দ্রুত ছুটে এসে লেজের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায়; সামনের দুই পায়ে রুটি তুলে ধরে কুটুর কুটুর করে খেতে থাকে। কুমুদিনী আড়াল থেকে আনন্দিত হয়ে বসে দেখে। বিশ্বের প্রতি ওর অন্তর আজ দাক্ষিণ্যে ভরা। বিকেলে গা ধোবার সময় খিড়কির পুকুরে গলা ডুবিয়ে চুপ করে বসে থাকে, জল যেন ওর সর্বাঙ্গে আলাপ করে। বিকেলের বাঁকা আলো পুকুরের পশ্চিম-ধারের বাতাবিলেবু গাছের শাখার উপর দিয়ে এসে ঘন কালো জলের উপরে নিকষে সোনার রেখার মতো ঝিকিমিকি করতে থাকে; ও চেয়ে চেয়ে দেখে, সেই আলোয় ছায়ায় ওর সমস্ত শরীরের উপর দিয়ে অনির্বচনীয় পুলকের কাঁপন বয়ে যায়। মধ্যাহ্নে বাড়ির ছাদের চিলেকোঠায় একলা গিয়ে বসে থাকে, পাশের জামগাছ থেকে ঘুঘুর ডাক কানে আসে। ওর যৌবন-মন্দিরে আজ যে দেবতার বরণ হচ্ছে ভাবঘন রসের রূপটি তার, কৃষ্ণ-রাধিকার যুগলরূপের মাধুর্য তার সঙ্গে মিশেছে। বাড়ির ছাদের উপরে এসরাজটি নিয়ে ধীরে ধীরে বাজায়, ওর দাদার সেই ভূপালী সুরের গানটি :

আজু মোর ঘরে আইল পিয়রওয়া
রোমে রোমে হরখীলা।

রাত্রে বিছানায় বসে প্রণাম করে, সকালে উঠে বিছানায় বসে আবার প্রণাম করে। কাকে করে সেটা স্পষ্ট নয়—একটি নিরবলম্ব ভক্তির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।

কিন্তু মনগড়া প্রতিমার মন্দিরদ্বার চিরদিন তো রুদ্ধ থাকতে পারে না। কানাকানির নিশ্বাসের তাপে ও বেগে সে মূর্তির সুষমা যখন ঘা খেতে আরম্ভ করে তখন দেবতার রূপ টিঁকবে কী করে? তখন ভক্তের বড়ো দুঃখের দিন।

একদিন তেলেনিপাড়ার বুড়ি তিনকড়ি এসে কুমুদিনীর মুখের সামনেই বলে বসল, 'হ্যাঁ গা, আমাদের কুমুর কপালে কেমন রাজা জুটল? ঐ-যে বেদেনীদের গান আছে—

> এক-যে ছিল কুকুর-চাটা শেয়ালকাঁটার বন,
> কেটে করলে সিংহাসন।

এ'ও সেই শেয়ালকাঁটা-বনের রাজা। ঐ তো রজবপুরের আন্দো মুহুরির ছেলে মেধো। দেশে যেবার আকাল, মগের মুলুক থেকে চাল আনিয়ে বেচে ওর টাকা। তবু বুড়ি মাকে শেষদিন পর্যন্ত রাঁধিয়ে রাঁধিয়ে হাড় কালি করিয়েছে।'

মেয়েরা উৎসুক হয়ে তিনকড়িকে ধরে বসে; বলে, 'বরকে জানতে নাকি?'

'জানতুম না? ওর মা যে আমাদের পাড়ার মেয়ে, পুরুত চক্রবর্তীদের ঘরের। (গলা নিচু করে) সত্যি কথা বলি বাছা, ভালো বামুনের ঘরে ওদের বিয়ে চলে না। তা হোক গে, লক্ষ্মী তো জাত-বিচার করেন না।'

পূর্বেই বলেছি কুমুদিনীর মন এ কালের ছাঁচে নয়। জাতকুলের পবিত্রতা তার কাছে খুব একটা বাস্তব জিনিস। মনটা তাই যতই সংকুচিত হয়ে ওঠে ততই যারা নিন্দে করে তাদের উপর রাগ করে; ঘর থেকে হঠাৎ কেঁদে উঠে ছুটে বাইরে চলে যায়। সবাই গা-টেপাটেপি করে বলে, 'ইস্, এখনই এত দরদ! এ যে দেখি দক্ষযজ্ঞের সতীকেও ছাড়িয়ে গেল।'

বিপ্রদাসের মনের গতি হাল-আমলের, তবু জাতকুলের হীনতায় তাকে কাবু করে। তাই গুজবটা চাপা দেবার অনেক চেষ্টা করলে। কিন্তু ছেঁড়া বালিশে চাপ দিলে তার তুলো যেমন আরো বেশি বেরিয়ে পড়ে, তেমনি হল।

এ দিকে বুড়ো প্রজা দামোদর বিশ্বাসের কাছে খবর পাওয়া গেল যে, বহুপূর্বে ঘোষালেরা নুরনগরের পাশের গ্রাম শেয়াকুলির মালেক ছিল। এখন সেটা চাটুজ্যেদের দখলে। ঠাকুর-বিসর্জনের মামলায় কী করে সবসুদ্ধ ঘোষালদেরও বিসর্জন ঘটেছিল, কী কৌশলে কর্তাবাবুরা, শুধু দেশছাড়া নয়, তাদের সমাজছাড়া করেছিলেন, তার বিবরণ বলতে বলতে দামোদরের মুখ ভক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ঘোষালেরা এককালে ধনে মানে কুলে চাটুজ্যেদের সমকক্ষ ছিলেন এটা সুখবর, কিন্তু বিপ্রদাসের মনে ভয় লাগল যে, এই বিয়েটাও সেই পুরাতন মামলার একটা জের নাকি?

১৩

অঘ্রান মাসে বিয়ে। পঁচিশে আশ্বিন লক্ষ্মীপুজো হয়ে গেল। হঠাৎ সাতাশে আশ্বিনে তাঁবু ও নানাপ্রকার সাজসরঞ্জাম নিয়ে ঘোষাল-কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ওভারসিয়র এসে উপস্থিত, সঙ্গে একদল পশ্চিমি মজুর। ব্যাপারখানা কী? শেয়াকুলিতে ঘোষালদিঘির ধারে তাঁবু গেড়ে বর ও বরযাত্রীরা কিছুদিন আগে থাকতেই সেখানে এসে উঠবেন।

এ কিরকম কথা? বিপ্রদাস বললে, 'তাঁরা যতজন খুশি আসুন, যতদিন খুশি থাকুন, আমরাই বন্দোবস্ত করে দেব। তাঁবুর দরকার কী? আমাদের স্বতন্ত্র বাড়ি আছে, সেটা খালি করে দিচ্ছি।'

ওভারসিয়র বললে, 'রাজাবাহাদুরের হুকুম। দিঘির চারি ধারের বনজঙ্গলও সাফ করে দিতে বলেছেন— আপনি জমিদার, অনুমতি চাই।'

বিপ্রদাস মুখ লাল করে বললে, 'এটা কি উচিত হচ্ছে? জঙ্গল তো আমরাই সাফ করে দিতে পারি।'

ওভারসিয়র বিনীতভাবে উত্তর করলে, ঐখানেই রাজাবাহাদুরের পূর্বপুরুষের ভিটেবাড়ি, তাই শখ হয়েছে নিজেই ওটা পরিষ্কার করে নেবেন।'

কথাটা নিতান্ত অসংগত নয়, কিন্তু আত্মীয়স্বজনেরা খুঁত খুঁত করতে লাগল। প্রজারা বলে, এটা আমাদের কর্তাবাবুদের উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা। হঠাৎ তবিল ফেঁপে উঠেছে, সেটা ঢাকা দিতে পারছে না; সেটাকে জয়ঢাক করে তোলবার জন্যেই না এই কাণ্ড? সাবেক আমল হলে বরসুদ্ধ বরসজ্জা বৈতরণী পার করতে দেরি হত না। ছোটোবাবু থাকলে তিনিও সইতেন না, দেখা যেত ঐ বাবুগুলো আর তাঁবুগুলো থাকত কোথায়।

প্রজারা এসে বিপ্রদাসকে বললে, 'হুজুর, ওদের কাছে হটতে পারব না। যা খরচ লাগে আমরাই দেব।'

ছয়-আনার কর্তা নবগোপাল এসে বললে, 'বংশের অমর্যাদা সওয়া যায় না। একদিন আমাদের কর্তারা ঐ ঘোষালদের হাড়ে হাড়ে ঠকাঠকি লাগিয়েছেন, আজ তারা আমাদেরই এলাকার উপর চড়াও হয়ে টাকার ঝলক মারতে এসেছে। ভয় নেই দাদা, খরচ যা লাগে আমরাও আছি। বিষয় ভাগ হোক, বংশের মান তো ভাগ হয়ে যায় নি।'

এই বলে নবগোপালই ঠেলেঠুলে কর্মকর্তা হয়ে বসল।

বিপ্রদাস কয়দিন কুমুর কাছে যেতে পারে নি। তার মুখের দিকে তাকাবে কী করে? কুমুর কাছে বরপক্ষের স্পর্ধার কথা কেউ যে গলা খাটো করে বলবে সমাজে সে দয়া বা ভদ্রতা নেই। তারই কাছে সবাই বাড়িয়ে-বাড়িয়ে বলে। মেয়েদের রাগ তারই 'পরে। ওরই জন্যে পূর্বপুরুষের মাথা যে হেঁট হল। রাজরানী হতে চলেছেন! কী যে রাজার ছিরি!

জাতকুলের কথাটাকে কুমু তার ভক্তি দিয়ে চাপা দিয়েছিল। কিন্তু ধনের বড়াই করে শ্বশুর-কুলকে খাটো করার নীচতা দেখে তার মন বিষাদে ভরে উঠল। কেবলই লোকের কাছ থেকে সে পালিয়ে বেড়ায়। ঘোষালদের লজ্জায় আজ যে ওরই লজ্জা। দাদার মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্যে মনটা ছটফট করছে। কিন্তু দাদার দেখা নেই, অন্দরমহলে খেতেও আসে না।

একদিন বিপ্রদাস অন্তঃপুরের বাগানে ভিয়েনঘরের জন্যে চালা বাঁধবার জায়গা ঠিক করতে গিয়ে হঠাৎ খিড়কির পুকুরের ঘাটে দেখে কুমু নীচের পৈঠের উপর বসে মাথা হেঁট করে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। দাদাকে দেখে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এল। এসেই রুদ্ধস্বরে বললে, 'দাদা, কিছুই বুঝতে পারছি নে।' বলেই মুখে কাপড় দিয়ে কেঁদে উঠল।

দাদা ধীরে ধীরে পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, 'লোকের কথায় কান দিস নে বোন।'

'কিন্তু ওঁরা এ-সব কী করছেন? এতে কি তোমাদের মান থাকবে?'

'ওদের দিকটাও ভেবে দেখিস। পূর্বপুরুষদের জন্মস্থানে আসছে, ধুমধাম করবে না? বিয়ের ব্যাপার থেকে এটাকে স্বতন্ত্র করে দেখিস।'

কুমু চুপ করে রইল। বিপ্রদাস থাকতে পারলে না, মরিয়া হয়ে বললে, 'তোর মনে যদি একটুও খটকা থাকে বিয়ে এখনো ভেঙে দিতে পারি।'

কুমুদিনী সবেগে মাথা নেড়ে বললে, 'ছি ছি, সে কি হয়?'

অন্তর্যামীর সামনে সত্যগ্রন্থিতে তো গাঁঠ পড়ে গেছে। বাকি যেটুকু সে তো বাইরের।

বিপ্রদাসের একেলে মন এতটা নিষ্ঠায় অধৈর্য হয়ে ওঠে। সে বললে, 'দুই পক্ষের সততায় তবেই বিবাহবন্ধন সত্য। সুরে-বাঁধা এসরাজের কোনো মানেই থাকে না যদি বাজাবার হাতটা হয় বেসুরো। পুরাণে দেখ্-না, যেমন সীতা তেমনি রাম, যেমন মহাদেব তেমনি সতী, অরুন্ধতী যেমন

বশিষ্ঠও তেমনি। হাল-আমলের বাবুদের নিজেদের মধ্যে নেই পুণ্য, তাই একতরফা সতীত্ব প্রচার করেন। তাঁদের তরফে তেল জোটে না, সলতেকে বলেন জ্বলতে— শুকনো প্রাণে জ্বলতে জ্বলতেই ওরা গেল ছাই হয়ে।'

কুমুকে বলা মিথ্যে। এখন থেকে ও মনে মনে জোরের সঙ্গে জপতে লাগল, তিনি ভালোই হন, মন্দই হন, তিনি আমার পরম গতি।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ
বীতরাগভয়ক্রোধঃ—

শুধু যতিধর্মের নয়, সতীধর্মেরও এই লক্ষণ। সে ধর্ম সুখদুঃখের অতীত— তাতে ক্রোধ নেই, ভয় নেই। আর অনুরাগ? তারই বা অত্যাবশ্যকতা কিসের? অনুরাগে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থাকে, ভক্তি তারও বড়ো। তাতে আবেদন নেই, নিবেদন আছে। সতীধর্ম নৈর্ব্যক্তিক, যাকে ইংরেজিতে বলে ইম্পার্সোনাল। মধুসূদন-ব্যক্তিটিতে দোষ থাকতে পারে, কিন্তু স্বামী-নামক ভাব-পদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।

১৪

ঘোষালদিঘির ধারে জঙ্গল সাফ হয়ে গেল— চেনা যায় না। জমি নিখুঁতভাবে সমতল, মাঝে মাঝে সুরকি দিয়ে রাঙানো রাস্তা, রাস্তার ধারে ধারে আলো দেবার থাম। দিঘির পানা সব তোলা হয়েছে। ঘাটের কাছে তকতকে নতুন বিলিতি পাল-খেলাবার দুটি নৌকো, তাদের একটির গায়ে লেখা 'মধুমতী', আর-একটির গায়ে 'মধুকরী'। যে তাঁবুতে রাজাবাহাদুর স্বয়ং থাকবেন তার সামনে ফ্রেমে হলদে বনাতের উপর লাল রেশমে বোনা 'মধুচক্র'। একটা তাঁবু অন্তঃপুরের, সেখান থেকে জল পর্যন্ত চাটাই দিয়ে ঘেরা ঘাট। ঘাটের উপরেই মস্ত নিমগাছের গায়ে কাঠের ফলকে লেখা, 'মধুসাগর'। খানিকটা জমিতে নানা আকারের চানকায় সূর্যমুখী, রজনীগন্ধা, গাঁদা, দোপাটি, ক্যানা ও পাতাবাহার, কাঠের চৌকো বাক্সে নানা রঙের বিলিতি ফুল। মাঝে একটি ছোটো বাঁধানো জলাশয়, তারই মধ্যে লোহার ঢালাই-করা নগ্ন স্ত্রীমূর্তি, মুখে শাঁখ তুলে ধরেছে, তার থেকে ফোয়ারার জল বেরোবে। এই জায়গাটার নাম দেওয়া হয়েছে 'মধুকুঞ্জ'। প্রবেশপথে কারুকাজকরা লোহার গেট, উপরে নিশান উড়ছে— নিশানে লেখা 'মধুপুরী'। চারি দিকেই 'মধু' নামের ছাপ। নানা রঙের কাপড়ে কানাতে চাঁদোয়ায় নিশানে রঙিন ফুলে চীনালণ্ঠনে হঠাৎ-তৈরি এই মায়াপুরী দেখবার জন্যে দূর থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল। এ দিকে ঝক্‌ঝকে চাপরাস-ঝোলানো, হলদের উপর লাল পাড় দেওয়া পাগড়ি-বাঁধা, জরির ফিতে-দেওয়া লাল বনাতের উর্দিপরা চাপরাসির দল বিলিতি জুতো মস্‌মসিয়ে বেড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করে, দিনরাত প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজায়, তাদের কারো কারো চামড়ার কোমরবন্ধে ঝোলানো বিলিতি তলোয়ারটা জমিদারের মাটিকে পায়ে পায়ে খোঁচা দিতে থাকে। চাটুজ্যেদের সাবেক কালের জীর্ণসাজপরা বরকন্দাজেরা লজ্জায় ঘর হতে বার হতে চায় না। কাণ্ড দেখে চাটুজ্যে-পরিবারের গায়ে জ্বালা ধরল। নূরনগরের পাঁজরটার মধ্যে বিঁধিয়ে দিয়ে শেলদণ্ডের উপর আজ ঘোষালদের জয়পতাকা উড়েছে।

শুভপরিণয়ের এই সূচনা।

১৫

বিপ্রদাস নবগোপালকে ডেকে বললে, 'নবু, আড়ম্বরে পাল্লা দেবার চেষ্টা—ওটা ইতরের কাজ।'

নবগোপাল বললে, 'চতুর্মুখ তাঁর পা ঝাড়া দিয়েই বেশি মানুষ গড়েছেন; চারটে মুখ কেবল বড়ো বড়ো কথা বলবার জন্যেই। সাড়ে পনেরো আনা লোক যে ইতর, তাদের কাছে সম্মান রাখতে হলে ইতরের রাস্তাই ধরতে হয়।'

বিপ্রদাস বললে, 'তাতেও তুমি পেরে উঠবে না। তার চেয়ে সাত্ত্বিকভাবে কাজ করি, সে দেখাবে ভালো। উপযুক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিত আনিয়ে আমাদের সামবেদের মতে বিশুদ্ধভাবে অনুষ্ঠান পালন করব। ওরা রাজা হয়েছে, করুক আড়ম্বর; আমরা ব্রাহ্মণ, পুণ্যকর্ম আমাদের।'

নবগোপাল বললে, 'দাদা, পাঁজি ভুলেছ, এটা সত্যযুগ নয়। জলের নৌকো চালাতে চাও পাঁকের উপর দিয়ে! তোমার প্রজারা আছে—তিনু সরকার আছে তোমার তালুকদার—ভাদু পরামানিক, কমরদ্দি বিশেবস, পাঁচু মণ্ডল—এরা কি তোমার ঐ কাঁচকলাভাতে হবিষ্যি-করা বামনাইয়ের এক অক্ষর মানে বুঝবে? এরা কি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রপৌত্র? এদের যে বুক ফেটে যাবে। তুমি চুপ করে থাকো, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

নবগোপাল প্রজাদের সঙ্গে মিলে উঠে-পড়ে লাগল। সবাই বুক ঠুকে বললে, টাকার জন্যে ভাবনা কী? আমলা ফয়লা পাইক বরকন্দাজ সবারই গায়ে চড়ল নতুন লাল বনাতের চাদর, রঙিন ধুতি। সালুতে-মোড়া ঝালর-ঝোলানো নিশেন-ওড়ানো এক নহবতখানা উঠল, সাত ক্রোশ তফাত থেকে তার চুড়ো দেখা যায়। দুই শরিকে মিলে তাদের চার-চার হাতি বের করলে, সাজ চড়ল তাদের পিঠে, যখন-তখন বিনা কারণে ঘোষালদিঘির সামনের রাস্তায় শুঁড় দুলিয়ে দুলিয়ে তারা টহলিয়ে বেড়ায়, গলায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে। আর যাই হোক, পাটের বস্তা থেকে হাতি বের হয় না, এই বলে সকলেই দুই পা চাপড়ে হো হো করে হেসে নিলে।

অঘ্রানের সাতাশে পড়েছে বিয়ের দিন; এখনো দিনদশেক বাকি। এমন সময় লোকমুখে জানা গেল, রাজা আসছে দলবল নিয়ে। ভাবনা পড়ে গেল, কর্তব্য কী। মধুসূদন এদের কাছে কোনো খবর দেয় নি। বুঝি মনে করেছে ভদ্রতা সাধারণ লোকের, অভদ্রতাই রাজোচিত। এমন অবস্থায় নিজেরা গায়ে পড়ে স্টেশন থেকে ওদের এগিয়ে আনতে যাওয়া কি সংগত হবে? খবর না-দেওয়ার উচিত জবাব হচ্ছে খবর না-নেওয়া।

সবই সত্য, কিন্তু যুক্তির দ্বারা সংসারে দুঃখ ঠেকানো যায় না। কুমুর প্রতি বিপ্রদাসের গভীর স্নেহ; পাছে তাকে কিছুতে আঘাত করে এ কথাটা সকল তর্ক ছাড়িয়ে যায়। মেয়েদের পীড়ন করা এতই সহজ; তাদের মর্মস্থান চার দিকেই অনাবৃত। জবরদস্তের হাতেই সমাজ চাবুক জুগিয়েছে; আর যারা বর্মহীন তাদের স্পর্শকাতর পিঠের দিকে কোনো বিধিবিধান নজর করে না। এমন অবস্থায় স্নেহের ধনকে রোষ-বিদ্বেষ-ঈর্ষার তুফানে ভাসিয়ে দিয়ে নিজের অভিমান বাঁচাবার চেষ্টা করা কাপুরুষতা, বিপ্রদাসের মনের এই ভাব।

বিপ্রদাস কাউকে না জানিয়ে ঘোড়ায় চড়ে গেল স্টেশনে। গাড়ি এসে পৌঁছোল, তখন বেলা পাঁচটা। সেলুন-গাড়ি থেকে রাজা নামল দলবল নিয়ে। বিপ্রদাসকে দেখে শুষ্ক সংক্ষিপ্ত নমস্কার করে বললে, 'এ কী, আপনি কেন কষ্ট করে?'

বিপ্রদাস। বিলক্ষণ! এই প্রথম আসা আমার দেশে, অভ্যর্থনা করে নেব না?

রাজা। ভুল করছেন। আপনার দেশে এখনো আসি নি। সে হবে বিয়ের দিনে।

বিপ্রদাস কথাটার মানে বুঝতে পারলে না। স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে তর্ক করবার জায়গা নয়—তাই কেবল বললে, 'ঘাটে বজরা তৈরি।'

রাজা বললে, 'দরকার হবে না, আমাদের স্টীমলঞ্চ এসেছে।'

বিপ্রদাস বুঝলে সুবিধে নয়। তবু আর-একবার বললে, 'খাওয়া-দাওয়ার জিনিসপত্র, রসুইয়ের নৌকো সমস্তই প্রস্তুত।'

'কেন এত উৎপাত করলেন! কিছুই দরকার হবে না। দেখুন, একটা কথা মনে রাখবেন, এসেছি আমার পূর্বপুরুষদের জন্মভূমিতে— আপনাদের দেশে না। বিয়ের দিনে সেখানে যাবার কথা।'

বিপ্রদাস বুঝলে কিছুতেই নরম হবার আশা নেই। বুকের ভিতরটা দমে গেল। স্টেশনের বসবার ঘরে কেদারায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। শীতের সন্ধ্যা, অন্ধকার হয়ে এসেছে। উত্তর থেকে গাড়ি আসবার জন্যে ঘণ্টা পড়ল, স্টেশনে আলো জ্বলল— লাগাম ছেড়ে ঘোড়াকে নিজের মরজিমত চলতে দিয়ে বিপ্রদাস যখন বাড়ি ফিরলে তখন যথেষ্ট রাত। কোথায় গিয়েছিল, কী ঘটেছিল, কাউকে কিছুই বললে না।

সেইদিন রাত্রে ওর ঠাণ্ডা লেগে কাশি আরম্ভ হল। ক্রমেই চলল বেড়ে। উপেক্ষা করতে গিয়ে ব্যামোটাকে আরও উস্‌কে তুললে। শেষকালে কুমু ওকে অনেক ধরে কয়ে এনে বিছানায় শোয়ায়। অনুষ্ঠানের সমস্ত ভারই পড়ল নবগোপালের উপর।

১৬

দু-দিন পরেই নবগোপাল এসে বললে, 'কী করি একটা পরামর্শ দাও।'

বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন? কী হয়েছে?'

'সঙ্গে গোটাকতক সাহেব— দালাল হবে, কিংবা মদের দোকানের বিলিতি শুঁড়ি— কাল পীরপুরের চরের থেকে কিছু না হবে তো দু শো কাদাখোঁচা পাখি মেরে নিয়ে উপস্থিত। আজ চলেছে চন্দনদহের বিলে। এই শীতের সময় সেখানে হাঁসের মরসুম— রাক্ষুসে ওজনের জীবহত্যা হবে— অহিরাবণ মহীরাবণ হিড়িম্বা ঘটোৎকচ ইস্তিক কুম্ভকর্ণের পর্যন্ত পিণ্ডি দেবার উপযুক্ত, প্রেতলোকে দশমুণ্ড রাবণের চোয়াল ধরে যাবার মতো।'

বিপ্রদাস স্তম্ভিত হয়ে রইল, কিছু বললে না।

নবগোপাল বললে, 'তোমারই হুকুম ঐ বিলে কেউ শিকার করতে পাবে না। সেবার জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে পর্যন্ত ঠেকিয়েছিলে— আমরা তো ভয় করেছিলুম তোমাকেও পাছে সে রাজহাঁস ভুল করে গুলি করে বসে। লোকটা ছিল ভদ্র, চলে গেল। কিন্তু এরা গো-মৃগ-দ্বিজ কাউকে মানবার মতো মানুষ নয়। তবু যদি বল তো একবার না হয়—'

বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে বললে, 'না না, কিছু বোলো না।'

বিপ্রদাস বাঘ-শিকারে জেলার মধ্যে সব-সেরা। কোনো একবার পাখি মেরে তার এমন ধিক্‌কার হয়েছিল যে, সেই অবধি নিজের এলাকায় পাখি মারা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে।

শিয়রের কাছে কুমু বসে বিপ্রদাসের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। নবগোপাল চলে গেলে সে মুখ শক্ত করে বললে, 'দাদা, বারণ করে পাঠাও।'

'কী বারণ করব?'

'পাখি মারতে।'

'ওরা ভুল বুঝবে কুমু, সইবে না।'

'তা বুঝুক ভুল। মান-অপমান শুধু ওদের একলার নয়।'

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে হাসলে। সে জানে কঠিন নিষ্ঠার সঙ্গে কুমু মনে মনে সতীধর্ম অনুশীলন করছে। ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা। সামান্য পাখির প্রাণ নিয়ে কায়ার সঙ্গে ছায়ার পথভেদ ঘটবে না কি?

বিপ্রদাস স্নেহের স্বরে বললে, 'রাগ করিস নে কুমু, আমিও একদিন পাখি মেরেছি। তখন অন্যায় বলে বুঝতেই পারি নি। এদেরও সেই দশা।'

অক্লান্ত উৎসাহের সঙ্গে চলল শিকার, পিকনিক, এবং সন্ধেবেলায় ব্যান্ডের সংগীত-সহযোগে ইংরেজ অভ্যাগতদের নাচ। বিকালে টেনিস; তা ছাড়া দিঘির নৌকোর 'পরে তিন-চার পর্দা তুলে দিয়ে বাজি রেখে পালের খেলা; তাই দেখতে গ্রামের লোকেরা দিঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে যায়। রাত্রে ডিনারের পরে চীৎকার চলে, 'ফর হী ইজ এ জলি গুড ফেলো।' এই-সব বিলাসের প্রধান নায়ক-নায়িকা সাহেব-মেম, তাতেই গাঁয়ের লোকের চমক লাগে। এরা যে সোলার টুপি মাথায় ছিপ ফেলে মাছ ধরে সেও বড়ো অপরূপ দৃশ্য। অন্য পক্ষে লাঠিখেলা কুস্তি নৌকো-বাচ যাত্রা শখের থিয়েটার এবং চারটে হাতির সমাবেশ এর কাছে লাগে কোথায়?

বিবাহের দুদিন আগে গায়ে-হলুদ। দামি গহনা থেকে আরম্ভ করে খেলার পুতুল পর্যন্ত সওগাত যা বরের বাসা থেকে এল তার ঘটা দেখে সকলে অবাক। তার বাহনই বা কত! চাটুজ্যেরা খুব দরাজ হাতেই তাদের বিদায় করলে।

অবশেষে জনসাধারণকে খাওয়ানো নিয়ে বৈবাহিক কুরুক্ষেত্রের দ্রোণপর্ব শুরু হল।

সেদিন ঢোল পিটিয়ে সর্বসাধারণের নিমন্ত্রণ মধুসাগরের তীরে মধুপুরীতে। রবাহূত অনাহূত কারো বাদ নেই। নবগোপাল রেগে আগুন। এ কী আস্পর্ধা! আমরা হলুম জমিদার, এর মধ্যে উনি ওঁর মধুপুরী খাড়া করেন কোথা থেকে?

এ দিকে ভোজের আয়োজনটা খুব ব্যাপকরূপেই সকলের কাছে প্রকাশমান হয়ে উঠল। সামান্য ফলার নয়। মাছ দই ক্ষীর সন্দেশ ঘি ময়দা চিনি খুব শোরগোল করে আমদানি। গাছতলায় মস্ত মস্ত উনন পাতা; রান্নার জন্যে নানা আয়তনের হাঁড়ি হাঁড়া মালসা কলসী জালা; সারবন্দি গোরুর গাড়িতে এল আলু বেগুন কাঁচকলা শাকসব্জি। আহারটা হবে সন্ধের সময় বাঁধা রোশনাইয়ের আলোয়।

এ দিকে চাটুজ্যেদের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন। দলে দলে প্রজারা মিলে নিজেরাই আয়োজন করেছে। হিন্দুদের মুসলমানদের স্বতন্ত্র জায়গা। মুসলমান প্রজার সংখ্যাই বেশি—রাত না পোয়াতেই তারা নিজেরাই রান্না চড়িয়েছে। আহারের উপকরণ যত না হোক, ঘন ঘন চাটুজ্যেদের জয়ধ্বনি উঠছে তার চতুর্গুণ। স্বয়ং নবগোপালবাবু বেলা প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় বসে থেকে সকলকে খাওয়ালেন। তার পরে হল কাঙালিবিদায়। মাতব্বর প্রজারা নিজেরাই দানবিতরণের ব্যবস্থা করলে। কলধ্বনিতে জয়ধ্বনিতে বাতাসে চলল সমুদ্রমন্থন।

মধুপুরীতে সমস্তদিন রান্না বসেছে। গন্ধে বহুদূর পর্যন্ত আমোদিত। খুরি ভাঁড় কলাপাতা হয়েছে পর্বতপ্রমাণ। তরকারি ও মাছ কোটার আবর্জনা নিয়ে কাকেদের কলরবের বিরাম নেই—রাজ্যের কুকুরগুলোও পরস্পর কামড়াকামড়ি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিয়েছে। সময় হয়ে এল, রোশনাই জ্বলছে, মেটিয়াবুরুজের রোশনচৌকি ইমনকল্যাণ থেকে কেদারা পর্যন্ত বাজিয়ে চলল। অনুচর-পরিচরেরা থেকে থেকে উদ্‌বিগ্নমুখে রাজাবাহাদুরের কানের কাছে ফিস ফিস করে জানাচ্ছে এখনো খাবার লোক যথেষ্ট এল না। আজ হাটের দিন, ভিন্ন এলেকা থেকে যারা হাট করতে এসেছে তাদের কেউ কেউ পাত-পাড়া দেখে বসে গেছে। কাঙাল-ভিক্ষুকও সামান্য কয়েকজন আছে।

মধুসূদন নির্জন তাঁবুর ভিতর ঢুকে মুখ অন্ধকার করে একটা চাপা হুংকার দিলে—'হুঁ।'

ছোটো ভাই রাধু এসে বললে, 'দাদা, আর কেন? চলো।'

'কোথায়?'

'ফিরে যাই কলকাতায়। এরা সব বদমাইশি করছে। এদের চেয়ে বড়ো বড়ো ঘরের পাত্রী তোমার কড়ে আঙুল নাড়ার অপেক্ষায় বসে। একবার তু করলেই হয়।'

মধুদূদন গর্জন করে উঠে বললে, 'যা চলে।'

এক শো বছর পূর্বে যেমন ঘটেছিল আজও তাই। এবারেও এক পক্ষের আড়ম্বরের চুড়োটা

অন্য পক্ষের চেয়ে অনেক উঁচু করেই গড়া হয়েছিল, অন্যপক্ষ তা রাস্তা পার হতে দিল না। কিন্তু আসল হারজিত বাইরে থেকে দেখা যায় না। তার ক্ষেত্রটা লোকচক্ষুর অগোচরে।

চাটুজ্যেদের প্রজারা খুব হেসে নিলে। বিপ্রদাস রোগশয্যায়; তার কানে কিছুই পেঁছোল না।

১৭

বিয়ের দিনে রাজার হুকুম, কনের বাড়ি যাবার পথে ধুমধাম একেবারেই বন্ধ। আলো জ্বলল না, বাজনা বাজল না, সঙ্গে কেবল নিজেদের পুরোহিত, আর দুইজন ভাট। পালকিতে করে নিঃশব্দে বিয়েবাড়িতে বর এল, লোকে হঠাৎ বুঝতেই পারলে না। ও দিকে মধুপুরীর তাঁবুতে আলো জ্বালিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে বিপরীত হৈ হৈ শব্দে বরযাত্রীর দল আহারে আমোদে প্রবৃত্ত। নবগোপাল বুঝলে এটা হল পালটা জবাব। এমন স্থলে কন্যাপক্ষ হাতে পায়ে ধরে বরপক্ষের সাধ্যসাধনা করে; নবগোপাল তার কিছুই করলে না। একবার জিজ্ঞাসাও করলে না, বরযাত্রীদের হল কী।

কুমুদিনী সাজসজ্জা করে বিবাহ-আসরে যাবার আগে দাদাকে প্রণাম করতে এল; তার সর্ব-শরীর কাঁপছে। বিপ্রদাসের তখন এক শো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর, বুকে পিঠে রাইসরষের পলস্তারা; কুমুদিনী তার পায়ের উপর মাথা ঠেকিয়ে আর থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ক্ষেমাপিসি মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, 'ছি ছি, অমন করে কাঁদতে নেই।'

বিপ্রদাস একটু উঠে বসে ওকে হাত ধরে পাশে বসিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল— দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ক্ষেমাপিসি বললে, 'সময় হল যে।'

বিপ্রদাস কুমুর মাথায় হাত দিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'সর্বশুভদাতা কল্যাণ করুন।' বলেই ধপ্ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বিবাহের সমস্তক্ষণ কুমুর দু চোখ দিয়ে কেবল জল পড়েছে। বরের হাতে যখন হাত দিলে সে হাত ঠান্ডা হিম, আর থরথর করে কাঁপছে। শুভদৃষ্টির সময় সে কি স্বামীর মুখ দেখেছে? হয়তো দেখে নি। এদের ব্যবহারে সবসুদ্ধ জড়িয়ে স্বামীর উপর ওর ভয় ধরে গেছে। পাখির মনে হচ্ছে তার জন্যে বাসা নেই, আছে ফাঁস।

মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয় কিন্তু বড়ো কঠিন। কালো মুখের মধ্যে যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সে হচ্ছে পাখির চঞ্চুর মতো মস্ত বড়ো বাঁকা নাক, ঠোঁটের সামনে পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে যেন পাহারা দিচ্ছে। প্রশস্ত গড়ানে কপাল ঘন ভ্রূর উপর বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মতো স্ফীত। সেই ভ্রূর ছায়াতলে সংকীর্ণ তির্যক্ চক্ষুর দৃষ্টি তীব্র। গোঁফদাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারী। কড়া চুল কাফ্রিদের মতো কোঁকড়া, মাথার তেলো ঘেঁষে ছাঁটা। খুব আঁটসাঁট শরীর; যত বয়েস তার চেয়ে কম বোধ হয়, কেবল দুই রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে। বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান। হাত দুটো রোমশ ও দেহের তুলনায় খাটো। সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট; মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কী একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে। যেন ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে একাগ্রভাবে চলেছে একটা একগুঁয়ে গোলা। দেখলেই বোঝা যায়, বাজে কথা বাজে বিষয় বাজে মানুষের প্রতি মন দেবার ওর একটুও অবকাশ নেই।

বিবাহটা এমন ভাবে হল যে, সকলেরই মনে খারাপ লাগল। বরপক্ষ-কন্যাপক্ষের প্রথম সংস্পর্শ-মাত্রই এমন একটা বেসুর ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল যে, তার মধ্যে উৎসবের সংগীত কোথায় গেল তলিয়ে। থেকে থেকে কুমুর মনের একটা প্রশ্ন অভিমানে বুক ঠেলে ঠেলে উঠছে, 'ঠাকুর কি তবে আমাকে ভোলালেন?' সংশয়কে প্রাণপণে চাপা দেয়, রুদ্ধঘরের মধ্যে একলা বসে বার বার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে; বলে, মন যেন দুর্বল না হয়। সবচেয়ে কঠিন হয়েছে দাদার কাছে সংশয় লুকোনো।

মায়ের মৃত্যুর পর থেকে কুমুদিনীর সেবার 'পরেই বিপ্রদাসের একান্ত নির্ভর। কাপড়চোপড়, দিনখরচের টাকাকড়ি, বইয়ের আলমারি, ঘোড়ার দানা, বন্দুকের সম্মার্জন, কুকুরের সেবা, ক্যামেরার রক্ষণ, সংগীতযন্ত্রের পর্যবেক্ষণ, শোবার বসবার ঘরের পারিপাট্যসাধন—সমস্ত কুমুর হাতে। এত বেশি অভ্যাস হয়ে এসেছে যে প্রাত্যহিক ব্যবহারে কুমুর হাত কোথাও না থাকলে তার রোচে না। সেই দাদার রোগশয্যায় বিদায়ের আগে শেষ কয়দিন যে সেবা করতে হয়েছে তার মধ্যে নিজের ভাবনার কোনো ছায়া না পড়ে এই তার দুঃসাধ্য চেষ্টা। কুমুর এসরাজের হাত নিয়ে বিপ্রদাসের ভারি গর্ব। লাজুক কুমু সহজে বাজাতে চায় না। এই দুদিন সে আপনি যেচে দাদাকে কানাড়া-মালকোষের আলাপ শুনিয়েছে। সেই আলাপের মধ্যেই ছিল তার দেবতার স্তব, তার প্রার্থনা, তার আশঙ্কা, তার আত্মনিবেদন। বিপ্রদাস চোখ বুজে চুপ করে শোনে আর মাঝে মাঝে ফরমাশ করে—সিন্ধু, বেহাগ, ভৈরবী—যে-সব সুরে বিচ্ছেদ-বেদনার কান্না বাজে। সেই সুরের মধ্যে ভাইবোন দুজনেরই ব্যথা এক হয়ে মিশে যায়। মুখের কথায় দুজনে কিছুই বললে না; না দিলে পরস্পরকে সান্ত্বনা, না জানালে দুঃখ।

বিপ্রদাসের জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা সারল না—বরং বেড়ে উঠছে। ডাক্তার বলছে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, হয়তো নুমোনিয়ায় গিয়ে পৌঁছোতে পারে, খুব সাবধান হওয়া চাই। কুমুর মনে উদ্‌বেগের সীমা নেই। কথা ছিল বাসি-বিয়ের কালরাত্রিটা এখানেই কাটিয়ে দিয়ে পরদিন কলকাতায় ফিরবে। কিন্তু শোনা গেল মধুসূদন হঠাৎ পণ করেছে, বিবাহের পরদিনে ওকে নিয়ে চলে যাবে। বুঝলে, এটা প্রথার জন্যে নয়, প্রয়োজনের জন্যে নয়, প্রেমের জন্যে নয়, শাসনের জন্যে। এমন অবস্থায় অনুগ্রহ দাবি করতে অভিমানিনীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়। তবু কুমু মাথা হেঁট করে লজ্জা কাটিয়ে কম্পিতকণ্ঠে বিবাহের রাতে স্বামীর কাছে এইমাত্র প্রার্থনা করেছিল যে, আর দুটো দিন যেন তাকে বাপের বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়, দাদাকে একটু ভালো দেখে যেন সে যেতে পারে। মধুসূদন সংক্ষেপে বললে, 'সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে।' এমন বজ্রে-বাঁধা একপক্ষের ঠিকঠাক, তার মধ্যে কুমুর মর্মান্তিক বেদনারও এক তিল স্থান নেই। তার পর মধুসূদন ওকে রাত্রে কথা কওয়াতে চেষ্টা করেছে, ও একটিও জবাব দিল না—বিছানার প্রান্তে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল।

তখনো অন্ধকার, প্রথম পাখির দ্বিধাজড়িত কাকলি শোনবামাত্র ও বিছানা ছেড়ে চলে গেল।

বিপ্রদাস সমস্ত রাত ছটফট করেছে। সন্ধ্যার সময় জ্বর-গায়েই বিবাহসভায় যাবার জন্যে ওর ঝোঁক হল। ডাক্তার অনেক চেষ্টায় চেপে রেখে দিলে। ঘন ঘন লোক পাঠিয়ে সে খবর নিয়েছে। খবরগুলো যুদ্ধের সময়কার খবরের মতো, অধিকাংশই বানানো। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, 'কখন বর এল? বাজনাবাদ্যির আওয়াজ তো পাওয়া গেল না।'

সংবাদদাতা শিবু বললে, 'আমাদের জামাই বড়ো বিবেচক—বাড়িতে অসুখ শুনেই সব থামিয়ে দিয়েছে—বরযাত্রদের পায়ের শব্দ শোনা যায় না, এমনি ঠাণ্ডা।'

'ওরে শিবু, খাবার জিনিস তো কুলিয়েছিল? আমার ঐ এক ভাবনা ছিল, এ তো কলকাতা নয়!'

'কুলোয় নি? বলেন কী হুজুর! কত ফেলা গেল। আরো অতগুলো লোককে খাওয়াবার মতো জিনিস বাকি আছে।'

'ওরা খুশি হয়েছে তো?'

'একটি নালিশ কারও মুখে শোনা যায় নি। একেবারে টুঁ শব্দটি না। আরো তো এত এত বিয়ে দেখেছি, বরযাত্রের দাপাদাপিতে কন্যাকর্তার ভির্মি লাগে। এরা এমনি চুপ, আছে কি না-আছে বোঝাই যায় না।'

বিপ্রদাস বললে, 'ওরা কলকাতার লোক কিনা, তাই ভদ্র ব্যবহার জানা আছে। ওরা বোঝে যে, যে বাড়ি থেকে মেয়ে নেবে তাদের অপমানে নিজেদেরই অপমান।'

'আহা, হুজুর যা বললেন, এই কথাটি ওদের লোকজনদের আমি শুনিয়ে দেব। শুনলে ওরা খুশি হবে।'

কুমু কাল সন্ধের সময়েই বুঝেছিল অসুখ বাড়বার মুখে। অথচ সে যে দাদার সেবা করতে পারবে না এই দুঃখ সর্বক্ষণ তার বুকের মধ্যে ফাঁদে-পড়া পাখির মতো ছটফট করতে লাগল। তার হাতের সেবা যে তার দাদার কাছে ওষুধের চেয়ে বেশি।

স্নান করে ঠাকুরকে ফুল দিয়ে কুমু যখন দাদার ঘরে এল তখনো সূর্য ওঠে নি। কঠিন রোগের সঙ্গে অনেকক্ষণ লড়াই করে ক্ষণকাল ছুটি পাবার সময় যে অবসাদের বৈরাগ্য আসে সেই বৈরাগ্যে বিপ্রদাসের মন তখন শিথিল। জীবনের আসক্তি, সংসারের ভাবনা সব তার কাছে শস্যশূন্য মাঠের মতো ধূসরবর্ণ। সমস্ত রাত দরজা বন্ধ ছিল, ডাক্তার ভোরের বেলায় পুব দিকে জানলাটা খুলে দিয়েছে। অশথগাছের শিশির-ভেজা পাতার আড়ালে অরুণবর্ণ আকাশের আভা ধীরে ধীরে শুভ্র হয়ে আসছে— অদূরবর্তী নদীতে মহাজনি নৌকোর বৃহৎ তালি-দেওয়া পালগুলি সেই আরক্তিম আকাশের গায়ে স্ফীত হয়ে উঠল। নহবতে করুণ সুরে রামকেলি বাজছে।

পাশে বসে কুমু নিজের দুই ঠাণ্ডা হাতের মধ্যে দাদার শুকনো গরম হাত তুলে নিলে। বিপ্রদাসের টেরিয়র কুকুর খাটের নীচে বিমর্ষ মনে চুপ করে শুয়ে ছিল। কুমু খাটে এসে বসতেই সে দাঁড়িয়ে উঠে দু পা তার কোলের উপর রেখে লেজ নাড়তে নাড়তে করুণ চোখে ক্ষীণ আর্তস্বরে কী যেন প্রশ্ন করলে।

বিপ্রদাসের মনে ভিতরে ভিতরে কী একটা চিন্তার ধারা চলছিল, তাই হঠাৎ এক সময়ে অসংলগ্নভাবে বলে উঠল, 'দিদি, আসলে কিছুই নয়— কে বড়ো কে ছোটো কে উপরে কে নীচে, এ সমস্তই বানানো কথা। ফেনার মধ্যে বুদ্‌বুদ্‌গুলোর কোন্‌টার কোথায় স্থান তাতে কী আসে যায়? আপনার ভিতরে আপনি সহজ হয়ে থাকিস, কিছুতেই তোকে মারবে না।'

'আমাকে আশীর্বাদ করো দাদা, আমাকে আশীর্বাদ করো,' বলে কুমু দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্না চাপা দিলে।

বিপ্রদাস বালিশে ঠেস দিয়ে একটু উঠে বসে কুমুর মুখ নামিয়ে ধরে তার মাথায় চুমো খেলে।

ডাক্তার ঘরে ঢুকে বললে, 'আর নয় কুমুদিদি, এখন ওঁর একটু শান্ত থাকা দরকার।'

কুমু রোগীর বালিশ একটু চেপে-চুপে ঠিক করে গায়ের উপর গরম কাপড়টা টেনে দিয়ে, পাশের টিপাইটার উপরকার বিশৃঙ্খলতা একটু সেরে নিয়ে দাদার কানের কাছে মৃদুস্বরে বললে, 'সেরে গেলেই কলকাতায় যেয়ো দাদা, সেখানে তোমাকে দেখতে পাব।'

বিপ্রদাস বড়ো বড়ো দুই স্নিগ্ধ চোখ কুমুর মুখের উপর স্থির রেখে বললে, 'কুমু, পশ্চিমের মেঘ যায় পুবে, পুবের মেঘ যায় পশ্চিমে, এ-সব হাওয়ায় হয়। সংসারে সেই হাওয়া বইছে। মেঘের মতোই অমনি সহজে এটাকে মেনে নিস দিদি। এখন থেকে আমাদের কথা বেশি ভাবিস নে। যেখানে যাচ্ছিস সেখানে লক্ষ্মীর আসন তুই জুড়ে থাকিস— এই আমার সকল মনের আশীর্বাদ। তোর কাছে আমরা আর কিছুই চাই নে।'

দাদার পায়ের কাছে কুমু মাথা রেখে পড়ে রইল। 'আজ থেকে আমার কাছে আর কিছুই চাবার নেই। এখানকার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় আমার কোনো হাতই থাকবে না'— এক মুহূর্তে এতবড়ো বিচ্ছেদের কথা মেনে নেওয়া যায় না। ঝড়ে যখন নৌকাকে ডাঙা থেকে টেনে নিয়ে যায় তখন নোঙর যেমন করে মাটি আঁকড়ে থাকতে চায়, দাদার পায়ের কাছে কুমুর তেমনি এই শেষ ব্যগ্রতার বন্ধন। ডাক্তার আবার এসে ধীরে ধীরে বললে, 'আর নয় দিদি।' বলে নিজের অশ্রুসিক্ত চোখ মুছে ফেললে। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজার বাইরে যে চৌকিটা ছিল তার উপর বসে পড়ে মুখে আঁচল দিয়ে কুমু নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। হঠাৎ এক সময়ে মনে পড়ে গেল দাদার 'বোস' ঘোড়াকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়ে যাবে বলে কাল রাত্রে সে গুড়মাখা আটার রুটি তৈরি করে রেখেছিল। সইস আজ ভোরবেলায় তাকে খিড়কির বাগানে রেখে এসেছে। কুমু সেখানে

গিয়ে দেখলে ঘোড়া আমড়াগাছতলায় ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে কুমুর পায়ের শব্দ শুনেই কান খাড়া করলে এবং তাকে দেখেই চিঁহিঁহিঁহিঁ করে ডেকে উঠল। বাঁ হাত তার কাঁধের উপর রেখে ডান হাতে কুমু তার মুখের কাছে রুটি ধরে তাকে খাওয়াতে লাগল। সে খেতে খেতে তার বড়ো বড়ো কালো স্নিগ্ধ চোখে কুমুর মুখের দিকে কটাক্ষে চাইতে লাগল। খাওয়া হয়ে গেলে বেসির দুই চোখের মাঝখানকার প্রশস্ত কপালের উপর চুমো খেয়ে কুমু দৌড়ে চলে গেল।

১৮

বিপ্রদাস নিশ্চয় মনে করেছিল মধুসূদন এই কয়দিনের মধ্যে একবার এসে দেখা করে যাবে। তা যখন করলে না তখন ওর বুঝতে বাকি রইল না যে, দুই পরিবারের এই বিবাহের সম্বন্ধটাই এল পরস্পরের বিচ্ছেদের খড়্গ হয়ে। রোগের নিরতিশয় ক্লান্তিতে এ কথাটাকেও সহজভাবে সে মেনে নিলে। ডাক্তারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'একটু এসরাজ বাজাতে পারি কি?'

ডাক্তার বললে, 'না, আজ থাক্।'

'তা হলে কুমুকে ডাকো, সে একটু বাজাক। আবার কবে তার বাজনা শুনতে পাব, কে জানে।'

ডাক্তার বললে, 'আজ সকালে ন-টার গাড়িতে ওঁদের ছাড়তে হবে, নইলে সূর্যাস্তের আগে কলকাতায় পৌঁছোতে পারবেন না। কুমুর তো আর সময় নেই।'

বিপ্রদাস নিশ্বাস ফেলে বললে, 'না, এখানে ওর সময় ফুরোল। উনিশ বছর কাটতে পেরেছে, এখন এক ঘণ্টাও আর কাটবে না।'

বিদায়ের সময় স্বামীস্ত্রী জোড়ে প্রণাম করতে এল। মধুসূদন ভদ্রতা করে বললে, 'তাই তো, আপনার শরীর তো ভালো দেখছি নে।'

বিপ্রদাস তার কোনো উত্তর না করে বললে, 'ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।'

'দাদা, নিজের শরীরের একটু যত্ন কোরো' বলে আর-একবার বিপ্রদাসের পায়ের কাছে পড়ে কুমু কাঁদতে লাগল।

হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি ঢাক-কাঁসর-নহবতে একটা আওয়াজের সাইক্লোন ঝড় উঠল। ওরা গেল চলে।

পরস্পরের আঁচলে চাদরে বাঁধা ওরা যখন চলে যাচ্ছে সেই দৃশ্যটা আজ, কেন কী জানি, বিপ্রদাসের কাছে বীভৎস লাগল। প্রাচীন ইতিহাসে তৈমুর জঙ্গিস অসংখ্য মানুষের কঙ্কালস্তম্ভ রচনা করেছিল। কিন্তু ঐ-যে চাদরে-আঁচলের গ্রন্থি, ওর সৃষ্ট জীবন-মৃত্যুর জয়তোরণ যদি মাপা যায় তবে তার চূড়া কোন্ নরকে গিয়ে ঠেকবে! কিন্তু এ কেমনতরো ভাবনা আজ ওর মনে!

পূজার্চনায় বিপ্রদাসের কোনোদিন উৎসাহ ছিল না। তবু আজ হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল।

এক সময়ে চমকে উঠে বললে, 'ডাক্তার, ডাকো তো দেওয়ানজিকে।'

বিপ্রদাসের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বিয়ে দিতে আসবার কিছুদিন আগে যখন সুবোধকে টাকা পাঠানো নিয়ে মন অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন, হিসাবের খাতাপত্র ঘেঁটে ক্লান্ত, বেলা এগারোটা— এমন সময়ে অত্যন্ত বে-মেরামত গোছের একটা মানুষ, কিছুকালের না-কামানো কণ্টকিত জীর্ণ মুখ, হাড়-বের-করা শির-বের-করা হাত, ময়লা একখানা চাদর, খাটো একখানা ধুতি, ছেঁড়া একজোড়া চটি-পরা এসে উপস্থিত। নমস্কার করে বললে, 'বড়োবাবু, মনে পড়ে কি?'

বিপ্রদাস একটু লক্ষ্য করে বললে, 'কী, বৈকুণ্ঠ নাকি?'

বিপ্রদাস বালককালে যে ইস্কুলে পড়ত সেই ইস্কুলেরই সংলগ্ন একটা ঘরে বৈকুণ্ঠ ইস্কুলের বই খাতা কলম ছুরি ব্যাটবল লাঠিম আর তারই সঙ্গে মোড়কে-করা চীনাবাদাম বিক্রি করত। তার

ঘরে বড়ো ছেলেদের আড্ডা ছিল—যতরকম অদ্ভুত অসম্ভব খোশগল্প করতে এর জুড়ি কেউ ছিল না।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার এমন দশা কেন?'

কয়েক বৎসর হল সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থের ঘরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। তাদের পণের বিশেষ কোনো আবশ্যক ছিল না বলেই বরের পণও ছিল বেশি। বারো শো টাকায় রফা হয়, তা ছাড়া আশি ভরি সোনার গয়না। একমাত্র আদরের মেয়ে বলেই মরিয়া হয়ে সে রাজি হয়েছিল। একসঙ্গে সব টাকা সংগ্রহ করতে পারে নি, তাই মেয়েকে যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে ওরা বাপের রক্ত শুষেছে। সম্বল সবই ফুরোল তবু এখনো আড়াই শো টাকা বাকি। এবারে মেয়েটির অপমানের শেষ নেই। অত্যন্ত অসহ্য হওয়াতেই বাপের বাড়ি পালিয়ে এসেছিল। তাতে করে জেলের কয়েদির জেলের নিয়ম ভঙ্গ করা হল, অপরাধ বেড়েই গেল। এখন ঐ আড়াই শো টাকা ফেলে দিয়ে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলে বাপ মরবার কথাটা ভাববার সময় পায়।

বিপ্রদাস ম্লান হাসি হাসলে। যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবার কথা সেদিন ভাববারও জো ছিল না। ক্ষণকালের জন্যে ইতস্তত করলে, তার পরে উঠে গিয়ে বাক্স থেকে থলি ঝেড়ে দশটি টাকার নোট এনে তার হাতে দিল। বললে, 'আরো দু-চার জায়গা থেকে চেষ্টা দেখো, আমার আর সাধ্য নেই।'

বৈকুণ্ঠ সে কথা একটুও বিশ্বাস করলে না। পা টেনে টেনে চলে গেল, চটিজুতোয় অত্যন্ত অপ্রসন্ন শব্দ।

সেদিনকার এই ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিল, আজ হঠাৎ বিপ্রদাসের মনে পড়ল। দেওয়ানজিকে ডেকে হুকুম হল—বৈকুণ্ঠকে আজই আড়াই শো টাকা পাঠানো চাই। দেওয়ানজি চুপ করে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোয়। জেদাজেদির মুখে খরচ করে বিবাহ তো চুকেছে, কিন্তু অনেকদিন ধরে তার হিসাব শোধ করতে হবে—এখন দিনের গতিকে আড়াই শো টাকা যে মস্তবড়ো অঙ্ক।

দেওয়ানজির মুখের ভাব দেখে বিপ্রদাস আঙুল থেকে হীরের আংটি খুলে বললে, 'ছোটোবাবুর নামে যে টাকা ব্যাঙ্কে জমা রেখেছি, তার থেকে ঐ আড়াই শো টাকা নাও, তার বদলে আমার আংটি বন্ধক রইল। বৈকুণ্ঠকে টাকাটা যেন কুমুর নামে পাঠানো হয়।'

১৯

বিবাহের লঙ্কাকাণ্ডের সব-শেষ অধ্যায়টা এখনো বাকি।

সকালবেলায় কুশণ্ডিকা সেরে তবে বরকনে যাত্রা করবে এই ছিল কথা। নবগোপাল তারই সমস্ত উদ্‌যোগ ঠিক করে রেখেছে। এমন সময় বিপ্রদাসের ঘর থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে রাজা-বাহাদুর বলে বসল—কুশণ্ডিকা হবে বরের ওখানে, মধুপুরীতে।

প্রস্তাবের ঔদ্ধত্যটা নবগোপালের কাছে অসহ্য লাগল। আর কেউ হলে আজ একটা ফৌজদারি বাধত। তবু ভাষার প্রাবল্যে নবগোপালের আপত্তি প্রায় লাঠিয়ালির কাছ পর্যন্ত এসে তবে থেমেছিল।

অন্তঃপুরে অপমানটা খুব বাজল। বহুদূর থেকে আত্মীয়-কুটুম সব এসেছে, তাদের মধ্যে ঘরশত্রুর অভাব নেই। সবার সামনে এই অত্যাচার। ক্ষেমাপিসি মুখ গোঁ করে বসে রইলেন। বরকনে যখন বিদায় নিতে এল তাঁর মুখ দিয়ে যেন আশীর্বাদ বেরোতে চাইল না। সবাই বললে, এ কাজটা কলকাতায় সেরে নিলে তো কারো কিছু বলবার কথা থাকত না। বাপের বাড়ির অপমানে কুমু একান্তই সংকুচিত হয়ে গেল—মনে হতে লাগল সে-ই যেন অপরাধিনী তার সমস্ত পূর্বপুরুষদের কাছে। মনে মনে তার ঠাকুরের প্রতি অভিমান করে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, 'আমি তোমার

কাছে কী দোষ করেছি যে জন্যে আমার এত শাস্তি! আমি তো তোমাকেই বিশ্বাস করে সমস্ত স্বীকার করে নিয়েছি।'

বরকনে গাড়িতে উঠল। কলকাতা থেকে মধুসূদন যে ব্যান্ড এনেছিল তাই উচ্চৈঃস্বরে নাচের সুর লাগিয়ে দিলে। মস্ত একটা শামিয়ানার নীচে হোমের আয়োজন। ইংরেজ মেয়েপুরুষ অভ্যাগত কেউ-বা গদিওয়ালা চৌকিতে বসে, কেউ-বা কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল। এরই মধ্যে তাদের জন্যে চা-বিস্কুটও এল। একটা টিপায়ের উপর মস্তবড়ো একটা ওয়েডিং কেকও সাজানো আছে। অনুষ্ঠান সারা হয়ে গেলে এরা এসে যখন কন্‌গ্র্যাচুলেট করতে লাগল, কুমু মুখ লাল করে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। একজন মোটাগোছের প্রৌঢ়া ইংরেজ মেয়ে ওর বেনারসি শাড়ির আঁচল তুলে ধরে পর্যবেক্ষণ করে দেখল; ওর হাতে খুব মোটা সোনার বাজুবন্ধ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেও তার বিশেষ কৌতূহল বোধ হল। ইংরেজি ভাষায় প্রশংসাও করলে। অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মধুসূদনকে একদল বললে, 'how interesting', আর একদল বললে, 'isn't it?'

এই মধুসূদনকে কুমু তার দাদা আর অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার করতে দেখেছে— আজ তাকেই দেখলে ইংরেজ বন্ধুমহলে। ভদ্রতায় অতি গদ্‌গদভাবে অবনম্র, আর হাসির আপ্যায়নে মুখ নিয়তই বিকশিত। চাঁদের যেমন এক পিঠে আলো আর-এক পিঠে চির-অন্ধকার, মধুসূদনের চরিত্রেও তাই। ইংরেজের অভিমুখে তার মাধুর্য পূর্ণচাঁদের আলোর মতোই যেমন উজ্জ্বল তেমনি স্নিগ্ধ। অন্য দিকটা দুর্গম, দুর্দৃশ্য এবং জমাট বরফের নিশ্চলতায় দুর্ভেদ্য।

সেলুন-গাড়িতে ইংরেজ বন্ধুদের নিয়ে মধুসূদন; অন্য রিজার্ভ-করা গাড়িতে মেয়েদের দলে কুমু। তারা কেউ-বা ওর হাত তুলে টিপে দেখে, কেউ-বা চিবুক তুলে মুখশ্রী বিশ্লেষণ করে; কেউ-বা বলে ঢ্যাঙা, কেউ-বা বলে রোগা। কেউ-বা অতি ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করে, 'হাঁ গা, গায়ে কী রঙ মাখ, বিলেত থেকে তোমার ভাই বুঝি কিছু পাঠিয়েছে?' সকলেই মীমাংসা করলে, চোখ বড়ো নয়, পায়ের মাপটা মেয়েমানুষের পক্ষে অধিক বড়ো। গায়ের প্রত্যেক গয়নাটি নেড়েচেড়ে বিচার করতে বসল— সেকেলে গয়না, ওজনে ভারী, সোনা খাঁটি— কিন্তু কী ফ্যাশান, মরে যাই!

ওদের গাড়িতে স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের উলটো দিকের জানলা খোলা ছিল, সেই দিকে কুমু চেয়ে রইল, চেষ্টা করতে লাগল এদের কথা যাতে কানে না যায়। দেখতে পেলে একটা এক-পা-কাটা কুকুর তিন পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছে। আহা, কিছু খাবার যদি হাতের কাছে থাকত! কিছুই ছিল না। কুমু মনে মনে ভাবতে লাগল, যে-একটি পা গিয়েছে তারই অভাবে ওর যা-কিছু সহজ ছিল তার সমস্তই হয়ে গেল কঠিন। এমন সময় কুমুর কানে গেল সেলুন-গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক বলছে, 'দেখুন, এই চাষির মেয়েকে আড়কাটি আসাম চা-বাগানে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, পালিয়ে এসেছে; গোয়ালন্দ পর্যন্ত টিকিটের টাকা আছে, ওর বাড়ি দুমরাঁও, যদি সাহায্য করেন তো এই মেয়েটি বেঁচে যায়।' সেলুন-গাড়ি থেকে একটা মস্ত তাড়ার আওয়াজ কুমু শুনতে পেলে। সে আর থাকতে পারলে না, তখনই ডান দিকের জানলা খুলে তার পুঁতিগাঁথা থলে উজাড় করে দশ টাকা মেয়েটির হাতে দিয়েই জানলা বন্ধ করে দিলে। দেখে একজন মেয়ে বলে উঠল, 'আমাদের বউয়ের দরাজ হাত দেখি!' আর-একজন বললে, 'দরাজ নয় তো দরজা, লক্ষ্মীকে বিদায় করবার।' আর-একজন বললে, 'টাকা ওড়াতে শিখেছে, রাখতে শিখলে কাজে লাগত।' এটাকে ওরা দেমাক বলে ঠিক করলে— বাবুরা যাকে এক পয়সা দিলে না, ইনি তাকে অমনি ঝনাৎ করে টাকা ফেলে দেন, এত কিসের গুমর! ওদের মনে হল এও বুঝি সেই চাটুজ্যে-ঘোষালদের চিরকেলে রেষারেষির অঙ্গ।

এমন সময়ে ওদের মধ্যে একটি মোটাসোটা কালোকোলো মেয়ে, মস্ত ডাগর চোখ, স্নেহরসে ভরা মুখের ভাব, কুমুর সমবয়সী হবে, ওর কাছে এসে বসল। চুপি চুপি বললে, 'মন কেমন করছে ভাই? এদের কথায় কান দিয়ো না, দু-দিন এইরকম টেপাটেপি বলাবলি করবে, তার পরে কণ্ঠ

থেকে বিষ নেমে গেলেই থেমে যাবে।' এই মেয়েটি কুমুর মেজো জা, নবীনের স্ত্রী। ওর নাম নিস্তারিণী, ওকে সবাই মোতির মা বলে ডাকে।

মোতির মা কথা তুললে, 'যেদিন নূরনগরে এলুম, ইস্টিশনে তোমার দাদাকে দেখলুম যে।'

কুমু চমকে উঠল। ওর দাদা যে স্টেশনে অভ্যর্থনা করতে গিয়েছিল সে খবর এই প্রথম শুনলে। 'আহা, কী সুপুরুষ! এমন কখনো চক্ষে দেখি নি। ঐ-যে গান শুনেছিলেম কীর্তনে—

গোরার রূপে লাগল রসের বান—
ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীয়ার পুরনারীর প্রাণ

আমার তাই মনে পড়ল।'

মুহূর্তে কুমুর মন গলে গেল। মুখ আড় করে জানলার দিকে রইল চেয়ে—বাইরের মাঠ বন আকাশ অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা হয়ে গেল।

মোতির মার বুঝতে বাকি ছিল না কোন্‌ জায়গায় কুমুর দরদ, তাই নানারকম করে ওর দাদার কথাই আলোচনা করলে। জিজ্ঞাসা করলে, বিয়ে হয়েছে কি না।

কুমু বললে, 'না।'

মোতির মা বলে উঠল, 'মরে যাই! অমন দেবতার মতো রূপ, এখনো ঘর খালি! কোন্‌ ভাগ্য-বতীর কপালে আছে ঐ বর!'

কুমু তখন ভাবছে—দাদা গিয়েছিলেন সমস্ত অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে, কেবল আমারই জন্যে! তার পরে এঁরা একবার দেখতেও এলেন না! কেবলমাত্র টাকার জোরে এমন মানুষকেও অবজ্ঞা করতে সাহস করলেন! তাঁর শরীর এইজন্যেই বুঝি-বা ভেঙে পড়ল।

বৃথা আক্ষেপের সঙ্গে বার বার মনে মনে বলতে লাগল—দাদা কেন গেল ইস্টেশনে? কেন নিজেকে খাটো করলে? আমার জন্যে? আমার মরণ হল না কেন?

যে কাজটা হয়ে গেছে, আর ফেরানো যাবে না, তারই উপর ওর মনটা মাথা ঠুকতে লাগল। কেবলই মনে পড়তে লাগল, সেই রোগে ক্লান্ত শান্ত মুখ, সেই আশীর্বাদে-ভরা স্নিগ্ধ-গম্ভীর দুটি চোখ।

২০

রেলগাড়ি হাওড়ায় পৌঁছোল, বেলা তখন চারটে হবে। ওড়নায়-চাদরে গ্রন্থিবন্ধ হয়ে বরকনে গিয়ে বসল ব্রুহাম গাড়িতে। কলকাতার দিবালোকের অসংখ্য চক্ষু, তার সামনে কুমুর দেহমন সংকুচিত হয়ে রইল। যে একটি অতিশয় শুচিতাবোধ এই উনিশ বছরের কুমারীজীবনে ওর অঙ্গে অঙ্গে গভীর করে ব্যাপ্ত, সেটা যে কর্ণের সহজ কবচের মতো, কেমন করে ও হঠাৎ ছিন্ন করে ফেলবে? এমন মন্ত্র আছে যে মন্ত্রে এই কবচ এক নিমেষে আপনি খসে যায়। কিন্তু সে মন্ত্র হৃদয়ের মধ্যে এখনো বেজে ওঠে নি। পাশে যে মানুষটি বসে আছে, মনের ভিতরে সে তো আজও বাইরের লোক। আপন লোক হবার পক্ষে তার দিক থেকে কেবল তো বাধাই এসেছে। তার ভাবে ব্যবহারে যে একটা রূঢ়তা সে যে কুমুকে এখনো পর্যন্ত কেবলই ঠেলে ঠেলে দূরে ঠেকিয়ে রাখল।

এ দিকে মধুসূদনের পক্ষে কুমু একটি নূতন আবিষ্কার। স্ত্রীজাতির পরিচয় পায় এ পর্যন্ত এমন অবকাশ এই কেজো মানুষের অল্পই ছিল। ওর পণ্যজগতের ভিড়ের মধ্যে পণ্য-নারীর ছোঁয়াও ওকে কখনো লাগে নি। কোনো স্ত্রী ওর মনকে কখনো বিচলিত করে নি এ কথা সত্য নয়, কিন্তু ভূমিকম্প পর্যন্তই ঘটেছে—ইমারত জখম হয় নি। মধুসূদন মেয়েদের অতি সংক্ষেপে দেখেছে ঘরের বউঝিদের মধ্যে। তারা ঘরকন্নার কাজ করে, কোঁদল করে, কানাকানি করে, অতি তুচ্ছ কারণে কান্নাকাটিও করে থাকে। মধুসূদনের জীবনে এদের সংস্রব নিতান্তই যৎসামান্য।

ওর স্ত্রীও যে জগতের সেই অকিঞ্চিৎকর বিভাগে স্থান পাবে, এবং দৈনিক গার্হস্থ্যের তুচ্ছতায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে প্রাচীরের আড়ালে কর্তাদের কটাক্ষচালিত মেয়েলি জীবনযাত্রা অতিবাহিত করবে এর বেশি সে কিছুই ভাবে নি। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করবারও যে একটা কলানৈপুণ্য আছে, তার মধ্যেও যে পাওয়ার বা হারাবার একটা কঠিন সমস্যা থাকতে পারে, এ কথা তার হিসাবদক্ষ সতর্ক মস্তিষ্কের এক কোণেও স্থান পায় নি; বনস্পতির নিজের পক্ষে প্রজাপতি যেমন বাহুল্য, অথচ প্রজাপতির সংসর্গ যেমন তাকে মেনে নিতে হয়, ভাবী স্ত্রীকেও মধুসূদন তেমনি করেই ভেবেছিল।

এমন সময় বিবাহের পরে সে কুমুকে প্রথম দেখলে। একরকমের সৌন্দর্য আছে তাকে মনে হয় যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশি—প্রতিক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য সেই শ্রেণীর। ও যেন ভোরের শুকতারার মতো, রাত্রের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, প্রভাতের জগতের ও পারে। মধুসূদন তার অবচেতন মনে নিজের অগোচরে কুমুকে একরকম অস্পষ্টভাবে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বোধ করলে—অন্তত একটা ভাবনা উঠল এর সঙ্গে কী রকম ভাবে ব্যবহার করা চাই, কোন্ কথা কেমন করে বললে সংগত হবে।

কী বলে আলাপ আরম্ভ করবে ভাবতে ভাবতে মধুসূদন হঠাৎ এক সময়ে কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ দিক থেকে রোদ্দুর আসছে, না?'

কুমু কিছুই জবাব করলে না। মধুসূদন ডান দিকের পর্দাটা টেনে দিলে।

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ কাটল। আবার খামকা বলে উঠল, 'শীত করছে না তো?' বলেই উত্তরের প্রতীক্ষা না করে সামনের আসন থেকে বিলিতি কম্বলটা টেনে নিয়ে কুমুর ও নিজের পায়ের উপর বিছিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে এক-আবরণের সহযোগিতা স্থাপন করলে। শরীর-মন পুলকিত হয়ে উঠল। চমকে উঠে কুমুদিনী কম্বলটাকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, শেষে নিজেকে সংবরণ করে আসনের প্রান্তে গিয়ে সংলগ্ন হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ এইভাবে যায় এমন সময় হঠাৎ কুমুর হাতের দিকে মধুসূদনের চোখ পড়ল।

'দেখি দেখি' বলে হঠাৎ তার বাঁ হাতটা চোখের কাছে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার আঙুলে এ কিসের আংটি? এ যে নীলা দেখছি।'

কুমু চুপ করে রইল।

'দেখো, নীলা আমার সয় না, ওটা তোমাকে ছাড়তে হবে।'

কোনো-এক সময়ে মধুসূদন নীলা কিনেছিল, সেই বছর ওর গাধাবোট-বোঝাই পাট হাওড়ার ব্রিজে ঠেকে তলিয়ে যায়। সেই অবধি নীলা-পাথরকে ও ক্ষমা করে না।

কুমুদিনী আস্তে আস্তে হাতটাকে মুক্ত করতে চেষ্টা করলে। মধুসূদন ছাড়লে না; বললে, 'এটা আমি খুলে নিই।'

কুমু চমকে উঠল; বললে, 'না, থাক্।'

একবার দাবাখেলায় ওর জিত হয়; সেইবার দাদা ওকে তার নিজের হাতের আংটি পারিতোষিক দিয়েছিল।

মধুসূদন মনে মনে হাসলে। আংটির উপর বিলক্ষণ লোভ দেখছি। এইখানে নিজের সঙ্গে কুমুর সাধর্ম্যের পরিচয় পেয়ে একটু যেন আরাম লাগল। বুঝলে, সময়ে অসময়ে সিঁথি কণ্ঠহার বালা বাজুর যোগে অভিমানিনীর সঙ্গে ব্যবহারের সোজা পথ পাওয়া যাবে—এই পথে মধুসূদনের প্রভাব না মেনে উপায় নেই, বয়স না-হয় কিছু বেশিই হল।

নিজের হাত থেকে মস্তবড়ো কমলহীরের একটা আংটি খুলে নিয়ে মধুসূদন হেসে বললে, 'ভয় নেই, এর বদলে আর-একটা আংটি তোমাকে পরিয়ে দিচ্ছি।'

কুমু আর থাকতে পারলে না, একটু চেষ্টা করেই হাত ছাড়িয়ে নিলে। এইবার মধুসূদনের মনটা ঝেঁকে উঠল। কর্তৃত্বের খর্বতা তাকে সইবে না, শুষ্ক গলায় জোর করেই বললে, 'দেখো, এ আংটি তোমাকে খুলতেই হবে।'

কুমুদিনী মাথা হেঁট করে চুপ করে রইল, তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

মধুসূদন আবার বললে, 'শুনছ? আমি বলছি ওটা খুলে ফেলা ভালো। দাও আমাকে।' বলে হাতটা টেনে নিতে উদ্যত হল।

কুমু হাত ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'আমি খুলছি।'

খুলে ফেললে।

'দাও, ওটা আমাকে দাও।'

কুমুদিনী বললে, 'ওটা আমিই রেখে দেব।'

মধুসূদন বিরক্ত হয়ে হেঁকে উঠল, 'রেখে লাভ কী? মনে ভাবছ, এটা ভারি একটা দামি জিনিস! এ কিছুতেই তোমার পরা চলবে না, বলে দিচ্ছি।'

কুমুদিনী বললে, 'আমি পরব না।' বলে সেই পুঁতির কাজ-করা থলেটির মধ্যে আংটি রেখে দিলে।

'কেন, এই সামান্য জিনিসটার উপরে এত দরদ কেন? তোমার তো জেদ কম নয়!'

মধুসূদনের আওয়াজটা খরখরে; কানে বাজে, যেন বেলে-কাগজের ঘর্ষণ। কুমুদিনীর সমস্ত শরীরটা রী রী করে উঠল।

'এ আংটি তোমাকে দিলে কে?'

কুমুদিনী চুপ করে রইল।

'তোমার মা নাকি?'

নিতান্তই জবাব দিতে হবে বলেই অর্ধস্ফুটস্বরে বললে, 'দাদা।'

দাদা! সে তো বোঝাই যাচ্ছে। দাদার দশা যে কী, মধুসূদন তা ভালোই জানে। সেই দাদার আংটি শনির সিঁধকাঠি—এ ঘরে আনা চলবে না। কিন্তু তার চেয়েও ওকে এইটেই খোঁচা দিচ্ছে যে, এখনো কুমুদিনীর কাছে ওর দাদাই সবচেয়ে বেশি। সেটা স্বাভাবিক বলেই যে সেটা সহ্য হয় তা নয়। পুরোনো জমিদারের জমিদারি নতুন ধনী মহাজন নিলেমে কেনার পর ভক্ত প্রজারা যখন সাবেক আমলের কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে থাকে তখন আধুনিক অধিকারীর গায়ের জ্বালা ধরে, এও তেমনি। আজ থেকে আমিই যে ওর একমাত্র, এই কথাটা যত শীঘ্র হোক ওকে জানান দেওয়া চাই। তা ছাড়া গায়ে-হলুদের খাওয়ানো নিয়ে বরের যা অপমান হয়েছে তাতে বিপ্রদাস নেই এ কথা মধুসূদন বিশ্বাস করতেই পারে না। যদিও নবগোপাল বিবাহের পরদিনে ওকে বলেছিল, 'ভায়া, বিয়েবাড়িতে তোমাদের হাটখোলার আড়ত থেকে যে-চালচলনের আমদানি করেছিলে, সে কথাটা ইঙ্গিতেও দাদাকে জানিয়ো না; উনি এর কিছুই জানেন না, ওঁর শরীরও বড়ো খারাপ।'

আংটির কথাটা আপাতত স্থগিত রাখলে, কিন্তু মনে রইল।

এ দিকে রূপ ছাড়া আরো একটা কারণে হঠাৎ কুমুদিনীর দর বেড়ে গিয়েছে। নুরনগরে থাকতেই ঠিক বিবাহের দিনে মধুসূদন টেলিগ্রাফ পেয়েছে যে, এবার তিসি চালানের কাজে লাভ হয়েছে প্রায় বিশ লাখ টাকা। সন্দেহ রইল না, এটা নতুন বধূর পয়ে। স্ত্রীভাগ্যে ধন, তার প্রমাণ হাতে-হাতে। তাই কুমুকে পাশে নিয়ে গাড়িতে বসে ভিতরে ভিতরে এই পরম পরিতৃপ্তি তার ছিল যে, ভাবী মুনফার একটা জীবন্ত বিধিদত্ত দলিল নিয়ে বাড়ি চলেছে। এ নইলে আজকের এই ব্রুহাম-রথযাত্রার পালাটায় অপঘাত ঘটতে পারত।

২১

রাজা উপাধি পাওয়ার পর থেকে কলকাতায় ঘোষালবাড়ির দ্বারে নাম খোদা হয়েছে 'মধুপ্রাসাদ'। সেই প্রাসাদের লোহার গেটের এক পাশে আজ নহবত বসেছে, আর বাগানে একটা তাঁবুতে বাজছে ব্যান্ড। গেটের মাথায় অর্ধচন্দ্রাকারে গ্যাসের টাইপে লেখা 'প্রজাপতয়ে নমঃ'। সন্ধ্যাবেলায় আলোক-শিখায় এই লিখনটি সমুজ্জ্বল হবে। গেট থেকে কাঁকর-দেওয়া যে-পথ বাড়ি পর্যন্ত গেছে তার দুই ধারে দেবদারুপাতা ও গাঁদার মালায় শোভাসজ্জা; বাড়ির প্রথম তলার উঁচু মেজেতে ওঠবার সিঁড়ির ধাপে লাল সালু পাতা। আত্মীয়বন্ধুর জনতার ভিতর দিয়ে বরকনের গাড়ি গাড়িবারান্দায় এসে থামল। শাঁখ উলুধ্বনি ঢাক ঢোল কাঁসর নহবত ব্যান্ড সব একসঙ্গে উঠল বেজে—যেন দশ-পনেরোটা আওয়াজের মালগাড়ির এক জায়গাতে পুরো বেগে ঠোকাঠুকি ঘটল। মধুসূদনের কোন্-এক সম্পর্কের দিদিমা, পরিপক্ক বুড়ি, সিঁথিতে যত মোটা ফাঁক তত মোটা সিঁদুর, চওড়া-লাল-পেড়ে শাড়ি, মোটা হাতে মোটা মোটা সোনার বালা এবং শাঁখার চুড়ি, একটা রুপোর ঘটিতে জল নিয়ে বউয়ের পায়ে ছিটিয়ে দিয়ে আঁচলে মুছে নিলেন, হাতে নোয়া পরিয়ে দিলেন, বউয়ের মুখে একটু মধু দিয়ে বললেন, 'আহা, এতদিন পরে আমাদের নীল গগনে উঠল পূর্ণ চাঁদ, নীল সরোবরে ফুটল সোনার পদ্ম।' বরকনে গাড়ি থেকে নাবল। যুবক-অভ্যাগতদের দৃষ্টি ঈর্ষান্বিত। একজন বললে, 'দৈত্য স্বর্গ লুঠ করে এনেছে রে, অপ্সরী সোনার শিকলে বাঁধা।' আর-একজন বললে, 'সাবেক কালে এমন মেয়ের জন্যে রাজায় রাজায় লড়াই বেধে যেত, আজ তিসি-চালানির টাকাতেই কাজ সিদ্ধি। কলিযুগে দেবতাগুলো বেরসিক। ভাগ্যচক্রের সব গ্রহনক্ষত্রই বৈশ্যবর্ণ।'

তার পরে বরণ, স্ত্রী-আচার প্রভৃতির পালা শেষ হতে হতে যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে তখন কাল-রাত্রির মুখে ক্রিয়াকর্ম সাঙ্গ হল।

একটিমাত্র বড়ো বোনের বিবাহ কুমুর স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু তাদের নিজেদের বাড়িতে কোনো নতুন বউ আসতে সে দেখে নি। যৌবনারম্ভের পূর্বে থেকেই সে আছে কলকাতায়, দাদার নির্মল স্নেহের আবেষ্টনে। বালিকার মনের কল্পজগৎ সাধারণ সংসারের মোটা ছাঁচে গড়া হতে পায় নি। বাল্যকালে পতিকামনায় যখন সে শিবের পূজা করেছে তখন পতির ধ্যানের মধ্যে সেই মহা-তপস্বী রজতগিরিনিভ শিবকেই দেখেছে। সাধ্বী নারীর আদর্শরূপে সে আপন মাকেই জানত। কী স্নিগ্ধ শান্ত কমনীয়তা, কত ধৈর্য, কত দুঃখ, কত দেবপূজা, মঙ্গলাচরণ, অক্লান্ত সেবা। অপর পক্ষে তাঁর স্বামীর দিকে ব্যবহারের ত্রুটি চরিত্রের স্খলন ছিল; তৎসত্ত্বেও সে চরিত্র ঔদার্যে বৃহৎ, পৌরুষে দৃঢ়, তার মধ্যে হীনতা কপটতা লেশমাত্র ছিল না, যে একটা মর্যাদাবোধ ছিল সে যেন দূরকালের পৌরাণিক আদর্শের। তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিদিন এইটেই প্রমাণ হয়েছে যে, প্রাণের চেয়ে মান বড়ো, অর্থের চেয়ে ঐশ্বর্য। তিনি ও তাঁর সমপর্যায়ের লোকেরা বড়ো বহরের মানুষ। তাঁদের ছিল নিজেদের ক্ষতি করেও অক্ষত সম্মানের গৌরব রক্ষা, অক্ষত সঞ্চয়ের অহংকার প্রচার নয়।

কুমুর যেদিন বাঁ চোখ নাচল সেদিন সে তার সব ভক্তি নিয়ে, আত্মোৎসর্গের পূর্ণ সংকল্প নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কোথাও কোনো বাধা বা খর্বতা ঘটতে পারে এ কথা তার কল্পনাতেই আসে নি। দময়ন্তী কী করে আগে থাকতে জেনেছিলেন যে, বিদর্ভরাজ নলকেই বরণ করে নিতে হবে! তাঁর মনের ভিতরে নিশ্চিত বার্তা এসে পৌঁচেছিল—তেমনি নিশ্চিত বার্তা কি কুমু পায় নি? বরণের আয়োজন সবই প্রস্তুত ছিল, রাজাও এলেন, কিন্তু মনে যাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল, বাইরে তাকে দেখলে কই? রূপেতেও বাধত না, বয়সেও বাধত না। কিন্তু রাজা? সেই সত্যকার রাজা কোথায়?

তার পরে আজ, যে অনুষ্ঠানের দ্বার দিয়ে কুমুকে তার নতুন সংসারে আহ্বান করলে তাতে এমন কোনো বজ্রগম্ভীর মঙ্গলধ্বনি বাজল না কেন যার ভিতর দিয়ে এই নববধূ আকাশের

সপ্তর্ষিদের আশীর্বাদমন্ত্র শুনতে পেত! সমস্ত অনুষ্ঠানকে পরিপূর্ণ করে এমন বন্দনাগান উদাত্ত স্বরে কেন জাগল না—

জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ

সেই 'জগতঃ পিতরৌ' যাঁর মধ্যে চিরপুরুষ ও চিরনারী বাক্য ও অর্থের মতো একত্র মিলিত হয়ে আছে?

২২

মধুসূদন যখন কলকাতায় বাস করতে এল, তখন প্রথমে সে একটি পুরানো বাড়ি কিনেছিল, সেই চকমেলানো বাড়িটাই আজ তার অন্তঃপুর-মহল। তার পরে তারই সামনে এখনকার ফ্যাশানে একটা মস্ত নতুন মহল এরই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে, সেইটে ওর বৈঠকখানা-বাড়ি। এই দুই মহল যদিও সংলগ্ন তবুও এরা সম্পূর্ণ আলাদা দুই জাত। বাইরের মহলে সর্বত্রই মার্বলের মেজে, তার উপরে বিলিতি কার্পেট, দেয়ালে চিত্রিত কাগজ মারা এবং তাতে ঝুলছে নানারকমের ছবি— কোনোটা এনগ্রেভিং, কোনোটা ওলিয়োগ্রাফ, কোনোটা অয়েলপেন্টিং—তার বিষয় হচ্ছে, হরিণকে তাড়া করেছে শিকারী কুকুর, কিংবা ডার্বির ঘোড়দৌড় জিতেছে এমন সব বিখ্যাত ঘোড়া, বিদেশী ল্যান্ড্স্কেপ, কিংবা স্নানরত নগ্নদেহ নারী। তা ছাড়া দেয়ালে কোথাও বা চীনে বাসন, মোরাদাবাদী পিতলের থালা, জাপানি পাখা, তিব্বতি চামর ইত্যাদি যতপ্রকার অসংগত পদার্থের অস্থানে অযথা সমাবেশ। এই সমস্ত গৃহসজ্জা পছন্দ করা, কেনা এবং সাজানোর ভার মধুসূদনের ইংরেজ অ্যাসিস্টান্টের উপর। এ ছাড়া মকমলে বা রেশমে মোড়া চৌকি-সোফার অরণ্য। কাঁচের আলমারিতে জমকালো বাঁধানো ইংরেজি বই, ঝাড়ন-হস্ত বেহারা ছাড়া কোনো মানুষ তার উপর হস্তক্ষেপ করে না—টিপাইয়ে আছে অ্যালবাম, তার কোনোটাতে ঘরের লোকের ছবি, কোনোটাতে বিদেশিনী অ্যাক্ট্রেসদের।

অন্তঃপুরে একতলার ঘরগুলো অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, ধোঁয়ায় ঝুলে কালো। উঠোনে আবর্জনা —সেখানে জলের কল, বাসন মাজা কাপড় কাচা চলছেই, যখন ব্যবহার নেই তখনো কল প্রায় খোলাই থাকে। উপরের বারান্দা থেকে মেয়েদের ভিজে কাপড় ঝুলছে, আর দাঁড়ের কাকাতুয়ার উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে উঠোনে। বারান্দার দেয়ালের যেখানে-সেখানে পানের পিকের দাগ ও নানা-প্রকার মলিনতার অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন। উঠোনের পশ্চিম দিকের রোয়াকের পশ্চাতে রান্নাঘর, সেখান থেকে রান্নার গন্ধ ও কয়লার ধোঁয়া উপরের ঘরে সর্বত্রই প্রসার লাভ করে। রান্নাঘরের বাইরে প্রাচীরবদ্ধ অল্প একটু জমি আছে, তারই এক কোণে পোড়া কয়লা, চুলোর ছাই, ভাঙা গামলা, ছিন্ন ধামা, জীর্ণ ঝাঁঝরি রাশীকৃত; অপর প্রান্তে গুটি-দুয়েক গাই ও বাছুর বাঁধা, তাদের খড় ও গোবর জমছে, এবং সমস্ত প্রাচীর ঘুঁটের চক্রে আচ্ছন্ন। এক ধারে একটিমাত্র নিমগাছ, তার গুঁড়িতে গোরু বেঁধে বেঁধে বাকল গেছে উঠে, আর ক্রমাগত ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে তার পাতা কেড়ে নিয়ে গাছটাকে জেরবার করে দিয়েছে। অন্তঃপুরে এই একটুমাত্র জমি, বাকি সমস্ত জমি বাইরের দিকে। সেটা লতামণ্ডপে, বিচিত্র ফুলের কেয়ারিতে, ছাঁটা ঘাসের মাঠে, খোয়া ও সুরকি দেওয়া রাস্তায়, পাথরের মূর্তি ও লোহার বেঞ্চিতে সুসজ্জিত।

অন্দরমহলে তেতলায় কুমুদিনীর শোবার ঘর। মস্ত বড়ো খাট মেহগনি কাঠের; ফ্রেমে নেটের মশারি, তাতে সিল্কের ঝালর। বিছানার পায়ের দিকে পুরো বহরের একটা নিরাবরণ মেয়ের ছবি, বুকের উপর দুই হাত চেপে লজ্জার ভান করছে। শিয়রের দিকে মধুসূদনের নিজের অয়েলপেন্টিং, তাতে তার কাশ্মিরি শালের কারুকার্যটাই সবচেয়ে প্রকাশমান। এক দিকে দেয়ালের গায়ে কাপড় রাখবার দেরাজ, তার উপরে আয়না; আয়নার দুদিকে দুটো চীনেমাটির শামাদান, সামনে চীনে-

মাটির থালির উপর পাউডারের কৌটো, রুপো-বাঁধানো চিরুনি, তিন-চার রকমের এসেন্স, এসেন্স ছিটোবার পিচকারি এবং আরও নানা রকমের প্রসাধনের সামগ্রী, বিলিতি অ্যাসিস্টান্টের কেনা। নানাশাখাযুক্ত গোলাপি কাঁচের ফুলদানিতে ফুলের তোড়া। আর-এক দিকে লেখবার টেবিল, তাতে দামি পাথরের দোয়াতদান, কলম ও কাগজকাটা। ইতস্তত মোটা গদিওয়ালা সোফা ও কেদারা— কোথাও-বা টিপাই, তাতে চা খাওয়া যায়, তাসখেলা যেতেও পারে। নতুন মহারানীর উপযুক্ত শয়ন-ঘর কী রকম হওয়া বিধিসংগত এ কথা মধুসূদনকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়েছে। এমন হয়ে উঠল, যেন অন্দরমহলের সর্বোচ্চ তলার এই ঘরটি ময়লা কাঁথা-গায়ে-দেওয়া ভিখিরির মাথায় জরিজহরাত-দেওয়া পাগড়ি।

অবশেষে একসময়ে গোলমাল-ধুমধামের বানডাকা দিন পার হয়ে রাত্রিবেলা কুমু এই ঘরে এসে পৌঁছোল। তাকে নিয়ে এল সেই মোতির মা। সে ওর সঙ্গে আজ রাত্রে শোবে ঠিক হয়েছে। আরো একদল মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসছিল। তাদের কৌতূহল ও আমোদের নেশা মিটতে চায় না— মোতির মা তাদের বিদায় করে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে এসেই এক হাতে সে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমি কিছুখনের জন্যে যাই ঐ পাশের ঘরে— তুমি একটু কেঁদে নাও ভাই, চোখের জল যে বুক ভরে জমে উঠেছে।' বলে সে চলে গেল।

কুমু চৌকির উপর বসে পড়ল। কান্না পরে হবে, এখন ওর বড়ো দরকার হয়েছে নিজেকে ঠিক করা। ভিতরে ভিতরে সকলের চেয়ে যে-ব্যথাটা ওকে বাজছিল সে হচ্ছে নিজের কাছে নিজের অপমান। এতকাল ধরে ও যা-কিছু সংকল্প করে এসেছে ওর বিদ্রোহী মন সম্পূর্ণ তার উলটো দিকে চলে গেছে। সেই মনটাকে শাসন করবার একটুও সময় পাচ্ছিল না। ঠাকুর, বল দাও, বল দাও, আমার জীবন কালি করে দিয়ো না। আমি তোমার দাসী, আমাকে জয়ী করো, সে জয় তোমারই।

পরিণতবয়সী আঁটসাঁট গড়নের শ্যামবর্ণ একটি সুন্দরী বিধবা ঘরে ঢুকেই বললে, 'মোতির মা তোমাকে একটু ছুটি দিয়েছে সেই ফাঁকে এসেছি; কাউকে তো কাছে ঘেঁষতে দেবে না, বেড়ে রাখবে তোমাকে— যেন সিঁধকাটি নিয়ে বেড়াচ্ছি, ওর বেড়া কেটে তোমাকে চুরি করে নিয়ে যাব। আমি তোমার জা, শ্যামাসুন্দরী; তোমার স্বামী আমার দেওর। আমরা তো ভেবেছিলুম শেষ পর্যন্ত জমাখরচের খাতাই হবে ওর বউ। তা ঐ খাতার মধ্যে জাদু আছে ভাই, এত বয়সে এমন সুন্দরী ঐ খাতার জোরেই জুটল। এখন হজম করতে পারলে হয়। ঐখানে খাতার মন্তর খাটে না। সত্যি করে বলো ভাই, আমাদের বুড়ো দেওরটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?'

কুমু অবাক হয়ে রইল, কী জবাব দেবে ভেবেই পেলে না। শ্যামা বলে উঠল, 'বুঝেছি, তা পছন্দ না হলেই বা কী, সাত পাক যখন ঘুরেছ তখন একুশ পাক উলটো ঘুরলেও ফাঁস খুলবে না।'

কুমু বললে, 'এ কী কথা বলছ দিদি!'

শ্যামা জবাব দিলে, 'খোলসা করে কথা বললেই কি দোষ হয় বোন? মুখ দেখে কি বুঝতে পারি নে? তা দোষ দেব না তোমাকে। ও আমাদের আপন বলেই কি চোখের মাথা খেয়ে বসেছি? বড়ো শক্ত হাতে পড়েছ বউ, বুঝে সুঝে চোলো।'

এমন সময় মোতির মাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বলে উঠল, 'ভয় নেই, ভয় নেই, বকুলফুল, যাচ্ছি আমি। ভাবলুম তুমি নেই এই ফাঁকে আমাদের নতুন বউকে একবার দেখে আসি গে। তা সত্যি বটে, এ কৃপণের ধন, সাবধানে রাখতে হবে। সইকে বলছিলুম আমাদের দেওরের এ যেন হল আধ-কপালে মাথাধরা; বউকে ধরেছে ওর বাঁ দিকের পাওয়ার-কপালে, এখন ডান দিকের রাখার-কপালে যদি ধরতে পারে তবেই পুরোপুরি হবে।'

এই বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুহূর্ত পরে ঘরে ঢুকে কুমুর সামনে পানের ডিবে খুলে ধরে বললে, 'একটা পান নেও। দোক্তা খাওয়া অভ্যেস আছে?'

কুমু বললে, 'না।' তখন এক টিপ দোক্তা নিয়ে নিজের মুখে পুরে দিয়ে শ্যামা মন্দগমনে বিদায় নিলে।

'এখনই বাম্দিমাসিকে খাইয়ে বিদায় করে আসছি, দেরি হবে না' বলে মোতির মা চলে গেল।

শ্যামাসুন্দরী কুমুর মনের মধ্যে ভারি একটা বিস্বাদ জাগিয়ে দিলে। আজকে কুমুর সবচেয়ে দরকার ছিল মায়ার আবরণ, সেইটেই সে আপন মনে গড়তে বসেছিল, আর যে-সৃষ্টিকর্তা দ্যুলোকে ভূলোকে নানা রঙ নিয়ে রূপের লীলা করেন, তাঁকেও সহায় করবার চেষ্টা করছিল, এমন সময় শ্যামা এসে ওর স্বপ্ন-বোনা জালে ঘা মারলে। কুমু চোখ বুজে খুব জোর করে নিজেকে বলতে লাগল, 'স্বামীর বয়স বেশি বলে তাঁকে ভালোবাসি নে এ-কথা কখনোই সত্য নয়— লজ্জা, লজ্জা! এ যে ইতর মেয়েদের মতো কথা!' শিবের সঙ্গে সতীর বিয়ের কথা কি ওর মনে নেই? শিবনিন্দুকরা তাঁর বয়স নিয়ে খোঁটা দিয়েছিল, কিন্তু সে কথা সতী কানে নেন নি।

স্বামীর বয়স বা রূপ নিয়ে এ পর্যন্ত কুমু কোনো চিন্তাই করে নি। সাধারণত যে-ভালোবাসা নিয়ে স্ত্রীপুরুষের বিবাহ সত্য হয়, যার মধ্যে রূপগুণ দেহমন সমস্তই মিলে আছে, তার যে প্রয়োজন আছে এ কথা কুমু ভাবেও নি। পছন্দ করে নেওয়ার কথাটাকেই রঙ মাখিয়ে চাপা দিতে চায়।

এমন সময় ফুলকাটা জামা ও জরির পাড়ওয়ালা ধুতি-পরা ছেলে, বয়স হবে বছর সাতেক, ঘরে ঢুকেই গা ঘেঁষে কুমুর কাছে এসে দাঁড়াল। বড়ো বড়ো স্নিগ্ধ চোখ ওর মুখের দিকে তুলে ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে মিষ্টি সুরে বললে, 'জ্যাঠাইমা।' কুমু তাকে কোলের উপর টেনে নিয়ে বললে, 'কী বাবা, তোমার নাম?' ছেলেটি খুব ঘটা করে বললে, শ্রীটুকু বাদ দিলে না, 'শ্রীমোতিলাল ঘোষাল।' সকলের কাছে পরিচয় ওর হাবলু বলে। সেইজন্যেই উপযুক্ত দেশকালপাত্রে নিজের সম্মান রাখবার জন্যে পিতৃদত্ত নামটাকে এত সুসম্পূর্ণ করে বলতে হয়। তখন কুমুর বুকের ভিতরটা টনটন করছিল— এই ছেলেকে বুকে চেপে ধরে যেন বাঁচল। হঠাৎ কেমন মনে হল কতদিন ঠাকুর-ঘরে যে-গোপালকে ফুল দিয়ে এসেছে, এই ছেলেটির মধ্যে সে-ই ওর কোলে এসে বসল। ঠিক যে-সময়ে ডাকছিল সেই দুঃখের সময়েই এসে ওকে বললে, 'এই যে আমি আছি তোমার সান্ত্বনা।' মোতির গোল গোল গাল টিপে ধরে কুমু বললে, 'গোপাল, ফুল নেবে?'

কুমুর মুখ দিয়ে গোপাল ছাড়া আর কোনো নাম বেরোল না। হঠাৎ নিজের নামান্তরে হাবলুর কিছু বিস্ময় বোধ হল— কিন্তু এমন সুর ওর কানে পৌঁচেছে যে, কিছু আপত্তি ওর মনে আসতে পারে না।

এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে মোতির মা ছেলের গলা শুনতে পেয়ে ছুটে এসে বললে, 'ঐ রে, বাঁদর-ছেলেটা এসেছে বুঝি।' শ্রীমোতিলাল ঘোষাল-এর সম্মান আর থাকে না। নালিশে-ভরা চোখ তুলে নিঃশব্দে মায়ের মুখের দিকে সে চেয়ে রইল, ডান হাতে জ্যাঠাইমার আঁচল চেপে। কুমু হাবলুকে তার বাঁ হাত দিয়ে বেড়ে নিয়ে বললে, 'আহা, থাক্-না।'

'না ভাই, অনেক রাত হয়ে গেছে। এখন শুতে যাক— এ বাড়িতে ওকে খুব সহজেই মিলবে, ওর মতো সস্তা ছেলে আর কেউ নেই।' বলে মোতির মা অনিচ্ছুক ছেলেকে শোয়াবার জন্যে নিয়ে গেল। এই এতটুকুতেই কুমুর মনের ভার গেল হালকা হয়ে। ওর মনে হল প্রার্থনার জবাব পেলুম, জীবনের সমস্যা সহজ হয়ে দেখা দেবে এই ছোটো ছেলেটির মতোই।

২৩

অনেক রাত্তিরে মোতির মা এক সময়ে জেগে উঠে দেখলে কুমু বিছানায় উঠে বসে আছে। তার কোলের উপর দুই হাত জোড়া, ধ্যানাবিষ্ট চোখ দুটি যেন সামনে কাকে দেখতে পাচ্ছে। মধুসূদনকে যতই সে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে বাধা পায়, ততই তার দেবতাকে দিয়ে সে তার স্বামীকে আবৃত করতে চায়। স্বামীকে উপলক্ষ করে আপনাকে সে দান করছে তার দেবতাকে। দেবতা তাঁর পূজাকে

বড়ো কঠিন করেছেন, এ প্রতিমা স্বচ্ছ নয়, কিন্তু এই তো ভক্তির পরীক্ষা। শালগ্রামশিলা তো কিছুই দেখায় না, ভক্তি সেই রূপহীনতার মধ্যে বৈকুণ্ঠনাথের রূপকে প্রকাশ করে কেবল আপন জোরে। যেখানে দেখা যাচ্ছে না সেইখানেই দেখব এই হোক আমার সাধনা, যেখানে ঠাকুর লুকিয়ে থাকেন সেইখানে গিয়েই তাঁর চরণে আপনাকে দান করব, তিনি আমাকে এড়াতে পারবেন না।

'মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি'— দাদার কাছে শেখা মীরাবাই-এর এই গানটা বারবার মনে-মনে আওড়াতে লাগল।

মধুসূদনের অত্যন্ত রূঢ় যে পরিচয় সে পেয়েছে তাকে কিছুই নয় বলে জলের উপরকার বুদ্‌বুদ বলে উড়িয়ে দিতে চায়— চিরকালের যিনি সত্য, সমস্ত আবৃত করে তিনিই আছেন, 'ঔর নাহি কোহি, ঔর নাহি কোহি।' এ ছাড়া আর-একটা পীড়ন আছে তাকেও মায়া বলতে চায়— সে হচ্ছে জীবনে শূন্যতা। আজ পর্যন্ত যাদের নিয়ে ওর সমস্ত কিছু গড়ে উঠেছে, যাদের বাদ দিতে গেলে জীবনের অর্থ থাকে না, তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ— সে নিজেকে বলছে এই শূন্যও পূর্ণ—

'বাপে ছাড়ে, মায়ে ছাড়ে, ছাড়ে সখা সহী,
মীরা প্রভু লগন লগী যো ন হোয়ে হোয়ী।'

ছেড়েছেন তো বাপ, ছেড়েছেন তো মা, কিন্তু তাঁদের ভিতরেই যিনি চিরকালকার তিনি তো ছাড়েন নি। ঠাকুর আরো যা-কিছু ছাড়ান-না কেন, শূন্য ভরাবেন বলেই ছাড়িয়েছেন। আমি লেগে রইলুম, যা হয় তা হোক। মনের গান কখন তার গলায় ফুটে উঠল তা টেরই পেলে না— দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

মোতির মা কথাটি বললে না, চুপ করে দেখলে, আর শুনলে। তার পরে কুমু যখন অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়ল তখন মোতির মার মনে একটা চিন্তা দেখা দিল যা পূর্বে আর কখনো ভাবে নি।

ও ভাবতে লাগল, আমাদের যখন বিয়ে হয়েছিল তখন আমরা তো কচি খুকি ছিলুম, মন বলে একটা বালাই ছিল না। ছোটোছেলে কাঁচা ফলটাকে যেমন টপ করে বিনা আয়োজনে মুখে পুরে দেয়, স্বামীর সংসার তেমনি করেই বিনা বিচারে আমাদের গিলেছে, কোথাও কিছু বাধে নি। সাধন করে আমাদের নিতে হয় নি, আমাদের জন্যে দিন-গোনা ছিল অনাবশ্যক। যেদিন বললে ফুলশয্যে সেইদিনই হল ফুলশয্যে, কেননা ফুলশয্যের কোনো মানে ছিল না, সে ছিল একটা খেলা। এই তো কালই হবে ফুলশয্যে, কিন্তু এ মেয়ের পক্ষে সে কতবড়ো বিড়ম্বনা! বড়োঠাকুর এখনও পর; আপন হতে অনেক সময় লাগে। একে ছোঁবে কী করে? এ মেয়ের সেই অপমান সইবে কেন? ধন পেতে বড়োঠাকুরের কত কাল লাগল আর মন পেতে দু-দিন সবুর সইবে না? সেই লক্ষ্মীর দ্বারে হাঁটাহাঁটি করে মরতে হয়েছে, এ লক্ষ্মীর দ্বারে একবার হাত পাততে হবে না?

এত কথা মোতির মার মনে আসত না। এসেছে তার কারণ, কুমুকে দেখবামাত্রই ও তাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছে। এই ভালোবাসার পূর্বভূমিকা হয়েছিল স্টেশনে যখন সে দেখেছিল বিপ্রদাসকে। যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেমে এলেন। বীরের মতো তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মতো শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা। মোতির মার মনে হয়েছিল কেউ যদি কিছু না বলে তবে একবার ওর পা দুটো ছুঁয়ে আসি। সেই রূপ আজও সে ভুলতে পারে নি। তার পরে যখন কুমুকে দেখলে, মনে মনে বললে, দাদারই বোন বটে!

একরকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের, সে জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে যেমন মর্মান্তিক করে মারে পুরুষকে এমন নয়। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল বলে মোতির মা এই রহস্য নিজের মধ্যে বোঝবার সময় পায় নি— কিন্তু কুমুর ভিতর দিয়ে এই কথাটা সে নিশ্চিত করে অনুভব করলে। তার গা কেমন করতে লাগল। ও যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে— যেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে

ডাকছে। মোতির মা রেগে উঠে মনে মনে বললে, 'দেবতার মুখে ছাই! যে-দেবতা ওর বিপদ ঘটিয়েছে সেই নাকি ওকে উদ্ধার করবে! হায় রে!'

২৪

পরের দিন সকালেই কুমু দাদার কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে, 'ভগবান তোমাকে আশীর্বাদ করুন।' সেই টেলিগ্রামের কাগজখানি জামার মধ্যে বুকের কাছে রেখে দিলে। এই টেলিগ্রামে যেন দাদার দক্ষিণ হাতের স্পর্শ। কিন্তু দাদা নিজের শরীরের কথা কেন কিছুই লিখলে না? তবে কি অসুখ বেড়েছে? দাদার সব খবরই মুহূর্তে মুহূর্তে যার প্রত্যক্ষগোচর ছিল, আজ তার কাছে সবই অবরুদ্ধ।

আজ ফুলশয্যে, বাড়িতে লোকে লোকারণ্য। আত্মীয় মেয়েরা সমস্তদিন কুমুকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। কিছুতে তাকে একলা থাকতে দিলে না। আজ একলা থাকবার বড়ো দরকার ছিল।

শোবার ঘরের পাশেই ওর নাবার ঘর; সেখানে জলের কল পাতা এবং ধারাস্নানের ঝাঁঝরি বসানো। কোনো অবকাশে বাক্স থেকে যুগল-রূপের ফ্রেমে-বাঁধানো পটখানি বের করে স্নানের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। সাদা পাথরের জলচৌকির উপর পট রেখে সামনে মাটিতে বসে নিজের মনে বারবার করে বললে, 'আমি তোমারই, আজ তুমিই আমাকে নাও। সে আর কেউ নয়, সে তুমিই, সে তুমিই, সে তুমিই। তোমারই যুগল-রূপ প্রকাশ হোক আমার জীবনে।'

ডাক্তাররা বলছে বিপ্রদাসের ইনফ্লুয়েঞ্জা ন্যুমোনিয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। নবগোপাল একলা কলকাতায় এল ফুলশয্যার সওগাত পাঠাবার ব্যবস্থা করতে। খুব ঘটা করেই সওগাত পাঠানো হল। বিপ্রদাস নিজে থাকলে এত আড়ম্বর করত না।

কুমুর বিবাহ উপলক্ষে ওর বড়ো বোন চারজনকেই আনতে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু খবর রটে গেছে—ঘোষালরা সদ্‌ব্রাহ্মণ নয়। বাড়ির লোক এ-বিয়েতে কিছুতে তাদের পাঠাতে রাজি হল না। কুমুর তৃতীয় বোন যদি বা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে বিয়ের পরদিন কলকাতায় এসে পৌঁছোল, নবগোপাল বললে, 'ও বাড়িতে তুমি গেলে আমাদের মান থাকবে না।' বিবাহরাত্রির কথা আজও সে ভুলতে পারে নি। তাই প্রায়-অসম্পর্কীয় গুটিকয়েক ছোটো ছোটো মেয়ে এক বুড়ি দাসীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে নিমন্ত্রণ রাখতে। কুমু বুঝলে, সন্ধি এখনো হল না, হয়তো কোনো কালে হবে না।

কুমুর সাজসজ্জা হল। ঠাট্টার সম্পর্কীয়দের ঠাট্টার পালা শেষ হয়েছে—নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো শুরু হবে। মধুসূদন আগে থাকতেই বলে রেখেছিল, বেশি রাত করলে চলবে না, কাল ওর কাজ আছে। ন-টা বাজবামাত্রই হুকুমমতো নীচের উঠোন থেকে সশব্দে ঘণ্টা বেজে উঠল। আর এক মুহূর্ত না। সময় অতিক্রম করবার সাধ্য কারও নেই। সভা ভঙ্গ হল। আকাশ থেকে বাজপাখির ছায়া দেখতে পেয়ে কপোতীর যেমন করে, কুমুর বুকটা তেমনি কাঁপতে লাগল। তার ঠাণ্ডা হাত ঘামছে, তার মুখ বিবর্ণ। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই মোতির মার হাত ধরে বললে, 'আমাকে একটু-খানির জন্যে কোথাও নিয়ে যাও আড়ালে। দশ মিনিটের জন্যে একলা থাকতে দাও।' মোতির মা তাড়াতাড়ি নিজের শোবার ঘরে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে। বাইরে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে, 'এমন কপালও করেছিলি।'

দশ মিনিট যায়, পনেরো মিনিট যায়। লোক এল—বর শোবার ঘরে গেছে, বউ কোথায়? মোতির মা বললে, 'অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন? বউ গায়ের জামা-গয়নাগুলো খুলবে না?' মোতির মা যতক্ষণ পারে ওকে সময় দিতে চায়। অবশেষে যখন বুঝলে আর চলবে না তখন দরজা খুলে দেখে, বউ মূর্ছিত হয়ে মেজের উপর পড়ে আছে।

গোলমাল পড়ে গেল। ধরাধরি করে বিছানার উপর তুলে দিয়ে কেউ জলের ছিটে দেয়, কেউ বাতাস করে। কিছুক্ষণ পরে যখন চেতনা হল, কুমু বুঝতে পারলে না কোথায় সে আছে—ডেকে উঠল, 'দাদা।' মোতির মা তাড়াতাড়ি তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বললে, 'ভয় নেই দিদি, এই যে আমি আছি।' বলে ওর মুখটা বুকের উপর তুলে নিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। সবাইকে বললে, 'তোমরা ভিড় কোরো না, আমি এখনই ওকে নিয়ে যাচ্ছি।' কানে কানে বলতে লাগল, 'ভয় করিস নে ভাই, ভয় করিস নে।' কুমু ধীরে ধীরে উঠল। মনে মনে ঠাকুরের নাম করে প্রণাম করলে। ঘরের অন্য পাশে একটা তক্তাপোশের উপর হাবলু গভীর ঘুমে মগ্ন—তার পাশে গিয়ে তার কপালে চুমো খেলে। মোতির মা তাকে শোবার ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এখনো ভয় করছে দিদি?'

কুমু হাতের মুঠো শক্ত করে একটু হেসে বললে, 'না, আমার কিছু ভয় করছে না।' মনে মনে বলছে, 'এই আমার অভিসার, বাইরে অন্ধকার ভিতরে আলো।'

মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি।

২৫

ইতিমধ্যে শ্যামাসুন্দরী হাঁপাতে হাঁপাতে মধুকে এসে জানালে, 'বউ মূর্ছো গেছে।' মধুসূদনের মনটা দপ করে জ্বলে উঠল; বললে, 'কেন, তাঁর হয়েছে কী?'

'তা তো বলতে পারি নে, দাদা দাদা করেই বউ হেদিয়ে গেল। তা একবার কি দেখতে যাবে?'

'কী হবে! আমি তো ওর দাদা নই।'

'মিছে রাগ করছ ঠাকুরপো, ওরা বড়োঘরের মেয়ে, পোষ মানতে সময় লাগবে।'

'রোজ রোজ উনি মূর্ছো যাবেন আর আমি ওঁর মাথায় কবিরাজি তেল মালিশ করব এইজন্যেই কি ওঁকে বিয়ে করেছিলুম?'

'ঠাকুরপো, তোমার কথা শুনে হাসি পায়। তা দোষ হয়েছে কী, আমাদের কালে কথায় কথায় মানিনীর মান ভাঙাতে হত, এখন না হয় মূর্ছো ভাঙাতে হবে।'

মধুসূদন গোঁ হয়ে বসে রইল। শ্যামাসুন্দরী বিগলিত করুণায় কাছে এসে হাত ধরে বললে, 'ঠাকুরপো, অমন মন খারাপ কোরো না, দেখে সইতে পারি নে।'

মধুসূদনের এত কাছে গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দেয় ইতিপূর্বে এমন সাহস শ্যামার ছিল না। প্রগল্‌ভা শ্যামা ওর কাছে ভারি চুপ করে থাকত; জানত মধুসূদন বেশি কথা সইতে পারে না। মেয়েদের সহজ বুদ্ধি থেকে শ্যামা বুঝেছে মধুসূদন আজ সে-মধুসূদন নেই। আজ ও দুর্বল, নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে সতর্কতা ওর নেই। মধুর হাতে হাত দিয়ে বুঝল এটা ওর খারাপ লাগে নি। নববধূ ওর অভিমানে যে ঘা দিয়েছে, কোনো একটা জায়গা থেকে চিকিৎসা পেয়ে ভিতরে ভিতরে একটু আরাম বোধ হয়েছে। শ্যামা অন্তত ওকে অনাদর করে না, এটা তো নিতান্ত তুচ্ছ কথা নয়। শ্যামা কি কুমুর চেয়ে কম সুন্দরী, না হয় ওর রঙ একটু কালো—কিন্তু ওর চোখ, ওর চুল, ওর রসালো ঠোঁট!

শ্যামা বলে উঠল, ঐ আসছে বউ, আমি যাই ভাই। কিন্তু দেখো ওর সঙ্গে রাগারাগি কোরো না, আহা ও ছেলেমানুষ!'

কুমু ঘরে ঢুকতেই মধুসূদন আর থাকতে পারলে না, বলে উঠল, 'বাপের বাড়ি থেকে মূর্ছো অভ্যেস করে এসেছ বুঝি? কিন্তু আমাদের এখানে ওটা চলতি নেই। তোমাদের ঐ নূরনগরি চাল ছাড়তে হবে।'

কুমু নির্নিমেষ চোখ মেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, একটি কথাও বললে না।

মধুসূদন ওর মৌন দেখে আরো রেগে গেল। মনের গভীর তলায় এই মেয়েটির মন পাবার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে বলেই ওর এই তীব্র নিষ্ফল রাগ। বলে উঠল, 'আমি কাজের লোক, সময় কম, হিস্‌টিরিয়া-ওয়ালী মেয়ের খেদ্‌মদ্‌গারি করবার ফুরসত আমার নেই, এই স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।'

কুমু ধীরে ধীরে বললে, 'তুমি আমাকে অপমান করতে চাও? হার মানতে হবে। তোমার অপমান মনের মধ্যে নেব না।'

কুমু কাকে এ-সব কথা বলছে? ওর বিস্ফারিত চোখের সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে? মধুসূদন অবাক হয়ে গেল, ভাবলে এ মেয়ে ঝগড়া করে না কেন? এর ভাবখানা কী?

মধুসূদন বক্রোক্তি করে বললে, 'তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর-এক হাটে বেচতে পারি।'

ও যে কুমুর দাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ কথা কুমুর মনে দেগে দেবার জন্যে মূঢ় আর কোনো কথা খুঁজে পেলে না।

কুমু বললে, 'দেখো, নিষ্ঠুর হও তো হোয়ো, কিন্তু ছোটো হোয়ো না।' বলে সোফার উপর বসে পড়ল।

কর্কশস্বরে মধুসূদন বলে উঠল, 'কী! আমি ছোটো! আর তোমার দাদা আমার চেয়ে বড়ো?'

কুমু বললে, 'তোমাকে বড়ো জেনেই তোমার ঘরে এসেছি।'

মধুসূদন ব্যঙ্গ করে বললে, 'বড়ো জেনেই এসেছ, না, টাকার লোভে?'

তখন কুমু সোফা থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে খোলা ছাদে মেজের উপর গিয়ে বসল।

কলকাতার শীতকালের কৃপণ রাত্রি, ধোঁয়ায় কুয়াশায় ঘোলা, আকাশ অপ্রসন্ন, তারার আলো যেন ভাঙা গলার কথার মতো। কুমুর মন তখন অসাড়, কোনো ভাবনা নেই, কোনো বেদনা নেই। একটা ঘন কুয়াশার মধ্যে সে যেন লুপ্ত হয়ে গেছে।

কুমু যে এমন করে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাবে মধুসূদন এ একেবারে ভাবতেই পারে নি। নিজের এই পরাভবের জন্যে সকলের চেয়ে রাগ হচ্ছে কুমুর দাদার উপর। শোবার ঘরে চৌকির উপরে বসে পড়ে শূন্য আকাশের দিকে সে একটা ঘুষি নিক্ষেপ করলে। খানিকক্ষণ বসে থেকে ধৈর্য আর রাখতে পারলে না। ধড়ফড় করে উঠে ছাদে বেরিয়ে ওর পিছনে গিয়ে ডাকলে, 'বড়োবউ!'

কুমু চমকে উঠে পিছন ফিরে দাঁড়ালে।

'ঠাণ্ডায় হিমে বাইরে এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ? চলো ঘরে।'

কুমু অসংকোচে মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে রইল। মধুসূদনের মধ্যে যেটুকু প্রভুত্বের জোর ছিল তা গেল উড়ে। কুমুর বাঁ হাত ধরে আস্তে আস্তে বললে, 'এসো ঘরে।'

কুমুর ডান হাতে তার দাদার আশীর্বাদের সেই টেলিগ্রাম ছিল, সেটা সে বুকে চেপে ধরল। স্বামীর হাত থেকে হাত টেনে নিলে না, নীরবে ধীরে ধীরে শোবার ঘরে ফিরে গেল।

২৬

পরদিন ভোরে যখন কুমু বিছানায় উঠে বসেছে তখন ওর স্বামী ঘুমোচ্ছে। কুমু তার মুখের দিকে চাইলে না, পাছে মন বিগড়ে যায়। অতি সাবধানে উঠে পায়ের কাছে প্রণাম করলে, তার পরে স্নান করবার ঘরে গেল। স্নান সারা হলে পর পিছন দিকের দরজা খুলে গিয়ে বসল ছাদে, তখন কুয়াশার ভিতর দিয়ে পূর্ব-আকাশে একটা মলিন সোনার রেখা দেখা দিয়েছে।

বেলা হল, রোদ্দুর উঠল যখন, কুমু আস্তে আস্তে শোবার ঘরে ফিরে এসে দেখলে তার স্বামী তখন চলে গেছে। আয়নার দেরাজের উপর তার পুঁতির কাজ-করা থলিটি ছিল। তার মধ্যে দাদার টেলিগ্রামের কাগজটি রাখবার জন্যে সেটা খুলেই দেখতে পেলে সেই নীলার আংটি নেই।

সকালবেলাকার মানসপূজার পর তার মুখে যে একটি শান্তির ভাব এসেছিল সেটা মিলিয়ে গিয়ে চোখে আগুন জ্বলে উঠল। কিছু মিষ্টি ও দুধ খাওয়াবে বলে ডাকতে এল মোতির মা। কুমুর মুখে জবাব নেই, যেন কঠিন পাথরের মূর্তি!

মোতির মা ভয় পেয়ে পাশে এসে বসল— জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে, ভাই?' কুমুর মুখে কথা বেরোল না, ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

'বলো দিদি, আমাকে বলো, কোথায় তোমার বেজেছে?'

কুমু রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললে, 'নিয়ে গেছে চুরি করে!'

'কী নিয়ে গেছে দিদি?'

'আমার আংটি— আমার দাদার আশীর্বাদী আংটি।'

'কে নিয়ে গেছে?'

কুমু উঠে দাঁড়িয়ে কারো নাম না করে বাইরের অভিমুখে ইঙ্গিত করলে।

'শান্ত হও ভাই, ঠাট্টা করেছে তোমার সঙ্গে, আবার ফিরিয়ে দেবে।'

'নেব না ফিরিয়ে— দেখব কত অত্যাচার করতে পারে ও!'

'আচ্ছা, সে হবে পরে, এখন মুখে কিছু দেবে এসো।'

'না, পারব না; এখানকার খাবার গলা দিয়ে নাববে না।'

'লক্ষ্মীটি ভাই, আমার খাতিরে খাও।'

'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ থেকে আমার নিজের বলে কিছুই রইল না?'

'না, রইল না। যা-কিছু রইল তা স্বামীর মর্জির উপরে। জান না, চিঠিতে দাসী বলে দস্তখত করতে হবে?'

দাসী। মনে পড়ল, রঘুবংশের ইন্দুমতীর কথা—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ—

ফর্দের মধ্যে দাসী তো কোথাও নেই। সত্যবানের সাবিত্রী কি দাসী? কিংবা উত্তররামচরিতের সীতা?

কুমু বললে, 'স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন্ জাতের লোক?'

'ও মানুষকে এখনো চেন নি। ও যে কেবল অন্যকে গোলামি করায় তা নয়, নিজের গোলামি নিজে করে। যেদিন আপিসে যেতে পারে না, নিজের বরাদ্দ থেকে সেদিনকার টাকা কাটা পড়ে। একবার ব্যামো হয়ে একমাসের বরাদ্দ বন্ধ ছিল, তার পরের দু-তিন মাস খাইখরচ পর্যন্ত কমিয়ে লোকসান পুষিয়ে নিয়েছে। এতদিন আমি ঘরকন্নার কাজ চালিয়ে আসছি সেই অনুসারে আমারও মাসহারা বরাদ্দ। আত্মীয় বলে ও কাউকে মানে না। এ বাড়িতে কর্তা থেকে চাকর-চাকরানী পর্যন্ত সবাই গোলাম।'

কুমু একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আমি সেই গোলামিই করব। আমার রোজকার খোরপোশ হিসেবমত রোজ রোজ শোধ করব। আমি এ বাড়িতে বিনা মাইনের স্ত্রী-বাঁদী হয়ে থাকব না। চলো আমাকে কাজে ভরতি করে নেবে। ঘরকন্নার ভার তোমার উপরেই তো— আমাকে তুমি তোমার অধীনে খাটিয়ে নিয়ো, আমাকে রানী বলে কেউ যেন ঠাট্টা না করে।'

মোতির মা হেসে কুমুর চিবুক ধরে বললে, 'তা হলে তো আমার কথা মানতে হবে। আমি হুকুম করছি, চলো এখন খেতে।'

মধুসূদন তেমনি তাড়াতাড়ি পালাল। ভয় হল পাছে কুমু ওর পরাভব দেখতে পায়, পাছে মনে মনে হাসে।

বাতির ঘর থেকে মধুসূদন বেরিয়ে এসে বারান্দা বেয়ে খানিকটা যেতেই সামনে দেখে শ্যামা। তার হাতে একটি প্রদীপ।

'একি ঠাকুরপো, এখানে কোথা থেকে এলে?'

মধুসূদন তার কোনো উত্তর না করে বললে, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ বউ?'

'কাল যে আমার ব্রত, ব্রাহ্মণভোজন করাতে হবে তারই জোগাড়ে চলেছি— তোমারও নেমন্তন্ন রইল। কিন্তু তোমাকে দক্ষিনে দেবার মতো শক্তি নেই ভাই।'

মধুসূদনের মুখে একটা জবাব আসছিল, সেটা চেপে গেল।

সেই শেষরাত্রের অন্ধকারে প্রদীপের আলোয় শ্যামাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। শ্যামা একটু হেসে বললে, 'আজ ঘুম থেকে উঠেই তোমার মতো ভাগ্যবান পুরুষের মুখ দেখলুম, আমার দিন ভালোই যাবে। ব্রত সফল হবে।'

ভাগ্যবান শব্দটার উপর একটু জোর দিলে— মধুসূদনের কানে কথাটা বিড়ম্বনার মতো শোনাল। কুমুর সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করতে শ্যামার সাহস হল না। 'কাল কিন্তু আমার ঘরে খেতে এসো, মাথা খাও,' বলে সে চলে গেল।

ঘরে এসে মধুসূদন বিছানায় শুয়ে পড়ল। বাইরে লণ্ঠনটা রাখলে, যদি কুমু আসে। কুমুদিনীর সেই সুপ্ত মুখ কিছুতে মন থেকে নড়তে চায় না; আর কেবলই মনে পড়ে কুমুর অতুলনীয় সেই হাতখানি শালের বাইরে এলিয়ে। বিবাহকালে এই হাত যখন নিজের হাতে নিয়েছিল তখন একে সম্পূর্ণ দেখতে পায় নি— আজ দেখে দেখে চোখের আর আশ মিটতে চায় না। এই হাতের অধিকারটি সে কবে পাবে? বিছানায় আর টি‍ঁকতে পারে না; উঠে পড়ল। আলো জ্বালিয়ে কুমুর ডেস্কের দেরাজ খুললে। দেখলে সেই পুঁতি-গাঁথা থলিটি। প্রথমেই বেরোল বিপ্রদাসের টেলিগ্রামখানি— 'ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন'— তার পরে একখানি ফোটোগ্রাফ, ওর দুই দাদার ছবি— আর একখানি কাগজের টুকরো, বিপ্রদাসের হাতে-লেখা গীতার এই শ্লোক—

> যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ,
> যৎ তপস্যসি, কৌন্তেয়, তৎ কুরুষ মদর্পণম্।

ঈর্ষায় মধুসূদনের মন ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। দাঁতে দাঁতে লাগিয়ে বিপ্রদাসকে মনে মনে লোপ করে দিলে। সেই লুপ্তির দিন একদা আসবে ও নিশ্চয় জানে— অল্প অল্প করে স্ক্রু আঁটতে হবে; কিন্তু কুমুদিনীর যে-উনিশটা বছর মধুসূদনের আয়ত্তের বাইরে, সেইটে বিপ্রদাসের হাত থেকে এই মুহূর্তেই ছিনিয়ে নিতে পারলে তবেই ও মনে শান্তি পায়। আর কোনো রাস্তা জানে না জবরদস্তি ছাড়া। পুঁতির থলিটি আজ সাহস করে ফেলে দিতে পারলে না— যেদিন আংটি হরণ করে নিয়েছিল সেদিন ওর সাহস আরো বেশি ছিল; তখনো জানত কুমুদিনী সাধারণ মেয়েরই মতো সহজেই শাসনের অধীন, এমন-কি, শাসনই পছন্দ করে। আজ বুঝেছে কুমুদিনী যে কী করতে পারে এবং পারে না কিছুই বলবার জো নেই।

কুমুদিনীকে নিজের জীবনের সঙ্গে শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটি মাত্র রাস্তা আছে, সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা। সেই কল্পনাতেই ওর সান্ত্বনা।

এমনি করে ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। কিন্তু শীতরাত্রির অন্ধকার তখনো যায় নি। আর কিছুক্ষণ পরেই আলো উঠবে, আজকের রাত হবে ব্যর্থ। মধুসূদন তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে চলল— ফরাশখানার সামনে পায়ের শব্দটা বেশ একটু স্পষ্টই ধ্বনিত করলে— দরজাটা শব্দ করেই খুললে— দেখলে ভিতরে কুমু নেই। কোথায় সে?

উঠোনের কলে জল-পড়ার শব্দ কানে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলে, যত রাজ্যের পুরানো

অব্যবহার্য মরচে-পড়া পিলসুজগুলো নিয়ে কুমু তেঁতুল দিয়ে মাজছে। এ কেবল ইচ্ছে করে কাজের ভার বাড়াবার চেষ্টা, শীতের ভোরবেলার নিদ্রাহীন দুঃখকে বিস্তারিত করে তোলা।

মধুসূদন উপরের বারান্দা থেকে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। অবলার বলকে কী করে পরাস্ত করতে হয় এই তার ভাবনা। সকালে উঠে বাড়ির লোকে যখন দেখবে কুমু পিলসুজ মাজছে কী ভাববে! যে চাকরের উপরে মাজাঘষার ভার, সেই বা কী মনে করবে? বিশ্বসুদ্ধ লোকের কাছে তাকে হাস্যাস্পদ করবার এমন তো উপায় আর নেই।

একবার মধুসূদনের মনে হল কলতলায় গিয়ে কুমুর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেয়। কিন্তু সকাল-বেলায় সেই উঠানের মাঝখানে দুজনে বচসা করবে আর বাড়িসুদ্ধ লোকে তামাশা দেখতে বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসবে এই প্রহসনটা কল্পনা করে পিছিয়ে গেল। মেজো ভাই নবীনকে ডাকিয়ে বললে, 'বাড়িতে কী সব ব্যাপার হচ্ছে চোখ রাখ কি?'

নবীন ছিল বাড়ির ম্যানেজার। সে ভয় পেয়ে বললে, 'কেন দাদা, কী হয়েছে?'

নবীন জানে, দাদার যখন রাগ করবার একটা কারণ ঘটে তখন শাসন করবার একটা মানুষ চাই। দোষী যদি ফসকে যায় তো নির্দোষী হলেও চলে—নইলে ডিসিপ্লিন থাকে না, নইলে সংসারে ওর রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রেস্‌টিজ চলে যায়।

মধুসূদন বললে, 'বড়োবউ যে পাগলের মতো কাণ্ডটা করতে বসেছে, তার কারণটা কী সে কি আমি জানি নে মনে কর?'

বড়োবউ কী পাগলামি করছে সে প্রশ্ন করতে নবীন সাহস করলে না পাছে খবর না-জানাটাই একটা অপরাধ বলে গণ্য হয়।

মধুসূদন বললে, 'মেজোবউ ওর মাথা বিগড়োতে বসেছেন সন্দেহ নেই।'

বহু সংকোচে নবীন বলতে চেষ্টা করলে, 'না, মেজোবউ তো—'

মধুসূদন বললে, 'আমি স্বচক্ষে দেখেছি।'

এর উপরে আর কথা খাটে না। স্বচক্ষে দেখার মধ্যে সেই কাগজচাপার ইতিহাসটা নিহিত ছিল।

২৮

মোতির মা যখনই কুমুকে অকৃত্রিম ভালোবাসার সঙ্গে আদরযত্ন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখনই নবীন বুঝেছিল এটা সইবে না; বাড়ির মেয়েরা এই নিয়ে লাগালাগি করবে। নবীন ভাবলে সেই রকমের একটা কিছু ঘটেছে। কিন্তু মধুসূদনের আন্দাজি অভিযোগ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই; তাতে জেদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

ব্যাপারটা কী হয়েছে মধুসূদন তা স্পষ্ট করে বললে না—বোধ করি বলতে লজ্জা করছিল; কী করতে হবে তাও রইল অস্পষ্ট, কেবল ওর মধ্যে যেটুকু স্পষ্ট সে হচ্ছে এই যে, সমস্ত দায়িত্বটা মেজোবউয়েরই সুতরাং দাম্পত্যের আপেক্ষিক মর্যাদা অনুসারে জবাবদিহির ল্যাজামুড়োর মধ্যে মুড়োর দিকটাই নবীনের ভাগ্যে।

নবীন গিয়ে মোতির মাকে বললে, 'একটা ফ্যাসাদ বেধেছে।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'সে জানেন অন্তর্যামী, আর দাদা, আর সম্ভবত তুমি; কিন্তু তাড়া আরম্ভ হয়েছে আমার উপরেই।'

'কেন বলো দেখি?'

'যাতে আমার দ্বারা তোমার সংশোধন হয়, আর তোমার দ্বারা সংশোধন হয় ওঁর নতুন ব্যবসায়ের নতুন আমদানির।'

'তা আমার উপরে তোমার সংশোধনের কাজটা শুরু করো— দেখি দাদার চেয়ে তোমার হাতযশ আছে কি না।'

নবীন কাতর হয়ে বললে, 'দাদার উড়ে চাকরটা ওঁর দামি ডিনার-সেটের একটা পিরিচ ভেঙেছিল, তার জরিমানার প্রধান অংশ আমাকেই দিতে হয়েছে, জান তো— কেননা জিনিসগুলো আমারই জিম্মে। কিন্তু এবারে যে-জিনিসটা ঘরে এল সেও কি আমারই জিম্মে? তবু জরিমানাটা তোমাতে-আমাতেই বাটোয়ারা করে দিতে হবে। অতএব যা করতে হয় করো, আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না মেজোবউ।'

'জরিমানা বলতে কী বোঝায় শুনি।'

রজবপুরে চালান করে দেবেন। মাঝে মাঝে তো সেইরকম ভয় দেখান।'

'ভয় পাও বলেই ভয় দেখান। একবার তো পাঠিয়েছিলেন, আবার রেলভাড়া দিয়ে ফিরিয়ে আনতে হয় নি? তোমার দাদা রেগেও হিসেবে ভুল করেন না। জানেন আমাকে ঘরকন্না থেকে বরখাস্ত করলে সেটা একটুও সস্তা হবে না। আর যদি কোথাও এক পয়সাও লোকসান হয় সে-ঠকা ওঁর সইবে না।'

'বুঝলুম, এখন কী করতে হবে বলো-না।'

'তোমার দাদাকে বোলো, যতবড়ো রাজাই হন-না, মাইনে করে লোক রেখে রানীর মান ভাঙাতে পারবেন না— মানের বোঝা নিজেকেই মাথায় করে নামাতে হবে। বাসরঘরের ব্যাপারে মুটে ডাকতে বারণ কোরো।'

'মেজোবউ, উপদেশ তাঁকে দেবার জন্যে আমার দরকার হবে না, দুদিন বাদে নিজেরই হুঁশ হবে। ইতিমধ্যে দূতীগিরির কাজটা করো, ফল হোক বা না-হোক। দেখাতে পারব নিমক খেয়ে সেটা চুপচাপ হজম করছি নে।'

মোতির মা কুমুকে গেল খুঁজতে। জানত সকালবেলা তাকে পাওয়া যাবে ছাদের উপরে। উঁচু প্রাচীর-দেওয়া ছাদ, তার মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি। এলোমেলো গোটাকতক টব, তাতে গাছ নেই। এক কোণে লোহার জাল-দেওয়া একটা বড়ো ভাঙা চৌকো খাঁচা; তার কাঠের তলাটা প্রায় সবটা জীর্ণ। কোনো এক সময় খরগোশ কিংবা পায়রা এতে রাখা হত, এখন আচার-আমসত্ত্ব প্রভৃতিকে কাকের চৌর্যবৃত্তি থেকে বাঁচিয়ে রোদ্দুরে দেবার কাজে লাগে। এই ছাদ থেকে মাথার উপরকার আকাশ দেখতে পাওয়া যায়, দিগন্ত দেখা যায় না। পশ্চিম-আকাশে একটা লোহার কারখানার চিমনি। যে দুদিন কুমু এই ছাদে বসেছে ঐ চিমনি থেকে উৎসারিত ধূমকুণ্ডলটাই তার একমাত্র দেখবার জিনিস ছিল— সমস্ত আকাশের মধ্যে ঐ কেবল একটি যেন সজীব পদার্থ, কোন্ একটা আবেগে ফুলে ফুলে পাক দিয়ে দিয়ে উঠছে।

পিলসুজ প্রভৃতি মাজা সেরে অন্ধকার থাকতেই স্নান করে পুবদিকে মুখ করে কুমু ছাদে এসে বসেছে। ভিজে চুল পিঠের উপর এলিয়ে দেওয়া— সাজসজ্জার কোনো আভাসমাত্র নেই। একখানি মোটা সুতোর সাদা শাড়ি, সরু কালো পাড়, আর শীতনিবারণের জন্য একটা মোটা এণ্ডি-রেশমের ওড়না।

কিছুদিন থেকে প্রত্যাশিত প্রিয়তমের কাল্পনিক আদর্শকে অন্তরের মাঝখানে রেখে এই যুবতী আপন হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাতে বসেছিল। তার যত পুজো, যত ব্রত, যত পুরাণকাহিনী, সমস্তই এই কল্পমূর্তিকে সজীব করে রেখেছিল। সে ছিল অভিসারিণী তার মানস-বৃন্দাবনে— ভোরে উঠে সে গান গেয়েছে রামকেলী রাগিণীতে—

হমারে তুমারে সম্প্রীতি লগী হৈ
শুন মনমোহন প্যারে—

যে অনাগত মানুষটির উদ্দেশে উঠছে তার আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য, সমুখে এসে পেঁাছবার

আগেই সে যেন ওর কাছে প্রতিদিন তার পেয়ালা পাঠিয়ে দিয়েছে। বর্ষার রাত্রে খিড়কির বাগানের গাছগুলি অবিশ্রাম ধারাপতনের আঘাতে আপন পল্লবগুলিকে যখন উতরোল করেছে তখন কানাড়ার সুরে মনে পড়েছে তার ঐ গান—

বাজে ঝনননন মেরে পায়েরিয়া
কৈসে করো যাউঁ ঘরোয়ারে।

আপন উদাস মনটার পায়ে পায়ে নূপুর বাজছে ঝনননন— উদ্দেশহারা পথে বেরিয়ে পড়েছে, কোনোকালে ফিরবে কেমন করে ঘরে! যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন থেকে তাকে সুরে দেখতে পাচ্ছিল। নিগূঢ় আনন্দ-বেদনার পরিপূর্ণতার দিনে যদি মনের মতো কাউকে দৈবাৎ সে কাছে পেত তা হলে অন্তরের সমস্ত গুঞ্জরিত গানগুলি তখনই প্রাণ পেত রূপে। কোনো পথিক ওর দ্বারে এসে দাঁড়াল না। কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জগৃহে ও একেবারেই ছিল একলা। এমন-কি, ওর সমবয়সী সঙ্গিনীও বিশেষ কেউ ছিল না। তাই এতদিন শ্যামসুন্দরের পায়ের কাছে ওর নিরুদ্ধ ভালোবাসা পূজার ফুল-আকারে আপন নিরুদ্দিষ্ট দয়িতের উদ্দেশ খুঁজেছে। সেইজন্যেই ঘটক যখন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এল কুমু তখন তার ঠাকুরেরই হুকুম চাইলে— জিজ্ঞাসা করলে, 'এইবার তোমাকেই তো পাব?' অপরাজিতার ফুল বললে, 'এই তো পেয়েইছ।'

অন্তরের এতদিনের এত আয়োজন ব্যর্থ হল— একেবারে ঠন্ করে উঠল পাথরটা, ভরাডুবি হল এক মুহূর্তেই। ব্যথিত যৌবন আজ আবার খুঁজতে বেরিয়েছে, কোথায় দেবে তার ফুল! থালিতে যা ছিল তার অর্ঘ্য, সে যে আজ বিষম বোঝা হয়ে উঠল! তাই আজ এমন করে প্রাণপণে গাইছে, 'মেরে গিরিধর গোপাল, ঔর নাহি কোহি।'

কিন্তু আজ এ গান শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পৌঁছল না কোথাও। এই শূন্যতায় কুমুর মন ভয়ে ভরে উঠল। আজ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনের গভীর আকাঙ্ক্ষা কি ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতোই কেবল সঙ্গীহীন নিঃশ্বসিত হয়ে উঠবে?

মোতির মা দূরে পিছনে বসে রইল। সকালের নির্মল আলোয় নির্জন ছাদে এই অসজ্জিতা সুন্দরীর মহিমা ওকে বিস্মিত করে দিয়েছে। ভাবছে, এ বাড়িতে ওকে কেমন করে মানাবে? এখানে যে-সব মেয়ে আছে এর তুলনায় তারা কোন্ জাতের? তারা আপনি ওর থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে, ওর উপরে রাগ করছে কিন্তু ওর সঙ্গে ভাব করতে সাহস করছে না।

বসে থাকতে থাকতে মোতির মা হঠাৎ দেখলে কুমু দুই হাতে তার ওড়নার আঁচল মুখে চেপে ধরে কেঁদে উঠেছে। ও আর থাকতে পারলে না, কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, 'দিদি আমার, লক্ষ্মী আমার, কী হয়েছে বলো আমাকে।'

কুমু অনেকক্ষণ কথা কইতে পারলে না। একটু সামলে নিয়ে বললে, 'আজও দাদার চিঠি পেলুম না, কী হয়েছে তাঁর বুঝতে পারছি নে।'

'চিঠি পাবার কি সময় হয়েছে ভাই?'

'নিশ্চয় হয়েছে। আমি তাঁর অসুখ দেখে এসেছি। তিনি জানেন, খবর পাবার জন্যে আমার মনটা কী রকম করছে।'

মোতির মা বললে, 'তুমি ভেবো না, খবর নেবার আমি একটা-কিছু উপায় করব।'

কুমু টেলিগ্রাফ করবার কথা অনেকবার ভেবেছে, কিন্তু কাকে দিয়ে করাবে। যেদিন মধুসূদন নিজেকে ওর দাদার মহাজন বলে বড়াই করেছিল সেইদিন থেকে মধুসূদনের কাছে ওর দাদার উল্লেখ-মাত্র করতে ওর মুখে বেধে যায়। আজ মোতির মাকে বললে, 'তুমি যদি দাদাকে আমার নামে টেলিগ্রাফ করতে পার তো আমি বাঁচি।'

মোতির মা বললে, 'তাই করব, ভয় কী?'

কুমু বললে, 'তুমি জান, আমার কাছে একটিও টাকা নেই।'

'কী বল দিদি, তার ঠিক নেই। সংসারখরচের যে-টাকা আমার কাছে থাকে, সে তো তোমারই টাকা। আজ থেকে আমি যে তোমারই নিমক খাচ্ছি।'

কুমু জোর করে বলে উঠল, 'না না না, এ বাড়ির কিছুই আমার নয়, সিকি পয়সাও না।'

'আচ্ছা ভাই, তোমার জন্যে না-হয় আমার নিজের টাকা থেকে কিছু খরচ করব। চুপ করে রইলে কেন? তাতে দোষ কী? টাকাটা আমি যদি অহংকার করে দিতুম, তুমি অহংকার করে না নিতে পারতে। ভালোবেসে যদি দিই, তা হলে ভালোবেসেই নেবে না কেন?'

কুমু বললে, 'নেব।'

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, 'দিদি, তোমার শোবার ঘর কি আজও শূন্য থাকবে?'

কুমু বললে, 'ওখানে আমার জায়গা নেই।'

মোতির মা পীড়াপীড়ি করলে না। তার মনের ভাবখানা এই যে, পীড়াপীড়ি করবার ভার আমার নয়; যার কাজ সে করুক। কেবল আস্তে আস্তে সে বললে, 'একটু দুধ এনে দেব তোমার জন্যে?'

কুমু বললে, 'এখন না, আর একটু পরে।' তার ঠাকুরের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এখনো বাকি আছে। এখনো মনের মধ্যে কোনো জবাব পাচ্ছে না।

মোতির মা আপন ঘরে গিয়ে নবীনকে ডেকে বললে, 'শোনো একটি কথা। বড়োঠাকুরের বাইরের ঘরে তাঁর ডেস্কের উপর খোঁজ করে এসো গে, দিদির কোনো চিঠি এসেছে কি না— দেরাজ খুলেও দেখো।'

নবীন বললে, 'সর্বনাশ!'

'তুমি যদি না যাও তো আমি যাব।'

'এ যে ঝোপের ভিতর থেকে ভালুকের ছানা ধরতে পাঠানো!'

'কর্তা গেছেন আপিসে, তাঁর কাজ সেরে আসতে বেলা একটা হবে— এর মধ্যে—'

'দেখো মেজোবউ, দিনের বেলায় এ কাজ কিছুতেই আমার দ্বারা হবে না, এখন চারি দিকে লোকজন। আজ রাত্রে তোমাকে খবর দিতে পারব।'

মোতির মা বললে, 'আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু নুরনগরে এখনই তার করে জানতে হবে বিপ্রদাস-বাবু কেমন আছেন।'

'বেশ কথা, তা দাদাকে জানিয়ে করতে হবে তো?'

'না।'

'মেজোবউ, তুমি যে দেখি মরিয়া হয়ে উঠেছ? এ বাড়িতে টিকটিকি মাছি ধরতে পারে না কর্তার হুকুম ছাড়া, আর আমি—'

'দিদির নামে তার যাবে তোমার তাতে কী?'

'আমার হাত দিয়ে তো যাবে।'

'বড়োঠাকুরের আপিসে ঢের তার তো রোজ দরোয়ানকে দিয়ে পাঠানো হয়, তার সঙ্গে এটা চালান দিয়ো। এই নাও টাকা, দিদি দিয়েছেন।'

কুমুর সম্বন্ধে নবীনের মনও যদি করুণায় ব্যথিত না থাকত তা হলে এতবড়ো দুঃসাহসিক কাজের ভার সে কিছুতেই নিতে পারত না।

২৯

যথানিয়মে মধুসূদন বেলা একটার পরে অন্তঃপুরে খেতে এল। যথানিয়মে আত্মীয়-স্ত্রীলোকেরা তাকে ঘিরে বসে কেউ-বা পাখা দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে, কেউ-বা পরিবেশন করছে। পূর্বেই বলেছি, মধুসূদনের অন্তঃপুরের ব্যবস্থায় ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ছিল না। তার আহারের আয়োজন পুরানো

অভ্যাসমতই। মোটা চালের ভাত না হলে না মুখে রোচে, না পেট ভরে। কিন্তু পাত্রগুলি দামি। রুপোর থালা, রুপোর বাটি, রুপোর গ্লাস। সাধারণত কলাইয়ের ডাল, মাছের ঝোল, তেঁতুলের অম্বল, কাঁটাচচ্চড়ি হচ্ছে খাদ্যসামগ্রী; তার পরে সব-শেষে বড়ো একবাটি দুধ চিনি দিয়ে শেষ বিন্দু পর্যন্ত সমাধা করে পানের বোঁটায় মোটা এক ফোঁটা চুন সহযোগে একটা পান মুখে ও দুটো পান ডিবেয় ভরে পনেরো মিনিট কাল তামাক টানতে টানতে বিশ্রাম করে তৎক্ষণাৎ আপিসে প্রস্থান। অপেক্ষাকৃত দৈন্যদশা থেকে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল এর আর ব্যতিক্রম হয় নি। আহারে মধুসূদনের ক্ষুধা আছে, লোভ নেই।

শ্যামাসুন্দরী দুধের বাটিতে চিনি ঘেঁটে দিচ্ছিল। অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা বললে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ একটু যেন ঘোষণা করছে। একখানি সাদা শাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয়, সর্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নের মতো, বেলা যায়-যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়ে নি। ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ম কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তার টসটসে ঠোঁটদুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয় নি, তবু সে ভরা। সে নিজেকে দামি বলেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তার মহার্ঘ্যতা ব্যবহারে লাগল না বলে নিজের আশপাশের উপর তার একটা অহংকৃত অশ্রদ্ধা। মধুসূদনের ঐশ্বর্যের জোয়ারের মুখেই শ্যামা এ সংসারে প্রবেশ করেছে। যৌবনের জাদুমন্ত্রে এই সংসারের চূড়ায় সে স্থান করে নেবে এমনও সংকল্প ছিল। মধুসূদনের মন যে কোনোদিন টলে নি তাও বলা যায় না। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই হার মানল না; তার কারণ, মধুসূদনের বিষয়বুদ্ধি কেবলমাত্র যে বুদ্ধি তা নয়, সে হচ্ছে প্রতিভা। এই প্রতিভার জোরে সম্পদ সে সৃষ্টি করেছে, আর সেই সৃষ্টির পরমানন্দে গভীর করে সে মগ্ন। এই প্রতিভার জোরেই সে নিশ্চয় জানত ধনসৃষ্টির যে তপস্যায় সে নিযুক্ত ইন্দ্রদেব সেটা ভাঙবার জন্যে প্রবল বিঘ্ন পাঠিয়েছেন— ক্ষণে ক্ষণে তপোভঙ্গের ধাক্কা লেগেছে, বারবারই সে সামলে নিয়েছে। সুবিধা ছিল এই যে, ব্যবসায়ের ভরা মধ্যাহ্নে তার অবকাশমাত্র ছিল না। এই কঠিন পরিশ্রমের মাঝখানে চোখের দেখায় কানের শোনায় শ্যামার যে সঙ্গটুকু নিঃসঙ্গভাবে পেত তাতে যেন মধুসূদনের ক্লান্তি দূর করত। ক্রিয়াকর্মের পার্বণী উপলক্ষে শ্যামাসুন্দরীর দিকে তার পক্ষপাতের ভারটা একটু যেন বেশি করে ঝুঁকত বলে বোঝা যায়। কিন্তু কোনোদিন শ্যামাকে সে এতটুকু প্রশ্রয় দেয় নি অন্তঃপুরে যাতে তার স্পর্ধা বাড়ে। শ্যামা মধুসূদনের মনের ঝোঁকটা ঠিক ধরেছে, তবুও ওর সম্বন্ধে তার ভয় ঘুচল না।

মধুসূদনের আহারের সময় শ্যামাসুন্দরী রোজই উপস্থিত থাকে; আজও ছিল। সদ্য স্নান করে এসেছে— তার অসামান্য কালো ঘন লম্বা চুল পিঠের উপর মেলে-দেওয়া— তার উপর দিয়ে অমলশুভ্র শাড়িটি মাথার উপর টেনে দেওয়া— ভিজে চুল থেকে মাথাঘষা মসলার মৃদু গন্ধ আসছে।

দুধের বাটি থেকে মুখ না তুলে এক সময় আস্তে আস্তে বললে, 'ঠাকুরপো, বউকে কি ডেকে দেব?'

মধুসূদন কোনো কথা না বলে তার ভাজের মুখের দিকে গম্ভীরভাবে চাইলে। তার ভাজ শ্যামাসুন্দরী ভয়ে থতমত খেয়ে প্রশ্নটাকে ব্যাখ্যা করে বললে, 'তোমার খাবার সময় কাছে বসলে হয় ভালো, তোমাকে একটু সেবা করতে—'

মধুসূদনের মুখের ভাবের কোনো অর্থ বুঝতে না পেরে শ্যামাসুন্দরী বাক্য শেষ না করেই চুপ করে গেল। মধুসূদন আবার মাথা হেঁট করে আহারে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে থালা থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলে, 'বড়োবউ এখন কোথায়?'

শ্যামাসুন্দরী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'আমি দেখে আসছি।'

মধুসূদন ভ্রূকুঞ্চিত করে আঙুল নেড়ে নিষেধ করলে। প্রশ্নের যে উত্তর পাবার আশা আছে

নবীনকে নীরব দেখে মধুসূদন আপনিই জিজ্ঞাসা করলে, 'মেজোবউ বুঝি?' মুখ হেঁট করে নিরুত্তর থাকাতেই তার উত্তর স্পষ্ট হল। ঝাঁ করে মাথায় রক্ত গেল চড়ে, মুখ হল লাল টকটকে— এত রাগ হল যে কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোল না। সবেগে হাত নেড়ে নবীনকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করে ঘরের এক ধার থেকে আর-এক ধার পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল।

৩০

নবীন ঘরে গিয়ে মুখ শুকনো করে মোতির মাকে বললে, 'মেজোবউ, আর কেন?'

'হয়েছে কী?'

'এবার জিনিসপত্রগুলো বাক্সয় তোলো।'

'তোমার বুদ্ধিতে যদি তুলি, তা হলে আবার কালই বের করতে হবে। কেন? তোমার দাদার মেজাজ ভালো নেই বুঝি?'

'আমি তো চিনি ওঁকে। এবার বোধ হচ্ছে এখানকার বাসায় হাত পড়বে।'

'তা চলোই-না। অত ভাবছ কেন? সেখানে তো জলে পড়বে না?'

'আমাকে চলতে বলছ কিসের জন্যে? এবারে হুকুম হবে মেজোবউকে দেশে পাঠিয়ে দাও।'

'সে হুকুম তুমি মানতে পারবে না জানি।'

'কেমন করে জানলে?'

'আমি কেবল একাই জানি মনে কর, তা নয়—বাড়িসুদ্ধ সবাই তোমাকে স্ত্রৈণ বলে জানে। পুরুষমানুষ যে কী করে স্ত্রৈণ হতে পারে এতদিন তোমার দাদা সে কথা বুঝতেই পারত না। এইবার নিজের বোঝবার পালা এসেছে।'

'বল কী?'

'আমি তো দেখছি তোমাদের বংশে ও রোগটা আছে। এতদিন বড়োভাইয়ের ধাতটা ধরা পড়ে নি। অনেক কাল জমা হয়ে ছিল বলে তার ঝাঁজটা খুব বেশি হবে, দেখে নিয়ো এই আমি বলে দিলাম। যে জোরের সঙ্গে জগৎ-সংসার ভুলে টাকার থলে আঁকড়ে বসেছিল, ঠিক সেই জোরটাই পড়বে বউয়ের উপর।'

'তাই পড়ুক। বড়ো স্ত্রৈণটি আসর জমান, কিন্তু মেজো স্ত্রৈণটি বাঁচবে কাকে নিয়ে?'

'সে ভাবনার ভার আমার উপরে। এখন আমি তোমাকে যা বলি তাই করো। ওঁর দেরাজ তোমাকে সন্ধান করতে হবে।'

নবীন হাত জোড় করে বললে, 'দোহাই তোমার মেজোবউ—সাপের গর্তে হাত দিতে যদি বলতে আমি দিতুম, কিন্তু দেরাজে না।'

'সাপের গর্তে যদি হাত দিতে হত তবে নিজে দিতুম, কিন্তু দেরাজটা সন্ধান তোমাকেই করতে হবে। তুমি তো জান এ বাড়ির সব চিঠিই প্রথমে ওঁকে না দেখিয়ে কাউকে দেবার হুকুম নেই। আমার মন বলছে ওঁর হাতে চিঠি এসেছে।'

'আমারও মন তাই বলছে, কিন্তু সেইসঙ্গে এও বলছে ও চিঠিতে যদি আমি হাত ঠেকাই তা হলে দাদা উপযুক্ত দণ্ড খুঁজেই পাবে না। বোধ হয় সাত বছর সশ্রম ফাঁসির হুকুম হবে।'

'কিছু তোমাকে করতে হবে না, চিঠিতে হাত দিয়ো না, কেবল একবার দেখে এসো দিদির নামে চিঠি আছে কি না।'

মেজোবউয়ের প্রতি নবীনের ভক্তি সুগভীর, এমন-কি, নিজেকে তার স্ত্রীর অযোগ্য বলেই মনে করে। সেইজন্যেই তার জন্যে কোনো-একটা দুরূহ কাজ করবার উপলক্ষ জুটলে যতই ভয় করুক সেইসঙ্গে খুশিও হয়।

সেই রাত্রেই নবীনের কাছে মেজোবউ খবর পেল যে, কুমুর নামে একটা চিঠি ও একটা টেলিগ্রাম দেরাজে আছে।

যে উত্তেজনার প্রথম ধাক্কায় কুমু তার শোবার ঘর ছেড়ে দাস্যবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয়েছিল, তার বেগ থেমেছে। অপমানের বিরক্তি কমে এসে বিষাদের ম্লানতায় এখন তার মন ছায়াচ্ছন্ন। বুঝতে পারছে চিরদিনের ব্যবস্থা এ নয়। অথচ সেরকম একটা ব্যবস্থা না হলে কুমু বাঁচবে কী করে? সংসারে আমৃত্যুকাল দিনরাত্রি জোর করে এরকম অসংলগ্নভাবে থাকা তো সম্ভবপর নয়।

এই কথাই সে ভাবছিল তার ঘরের দরজা বন্ধ করে। ঘরটা বারান্দার এক কোণে, কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। প্রবেশের দ্বার ছাড়া বাকি সমস্ত কুঠরি অবরুদ্ধ। দেয়ালের গায়ে উপর পর্যন্ত কাঠের থাক বসানো। সেই থাকে আলো জ্বালাবার বিচিত্র সরঞ্জাম। তৈলাক্ত মলিনতায় ঘরটা আগাগোড়া ক্লিন্ন। দেয়ালের যে অংশে দরজা সেই দিকে বাতির মোড়ক থেকে কাটা ছবিগুলো এঁটে দিয়ে কোনো এক ভৃত্য সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তিসাধন করেছিল। এক কোণে টিনের বাক্সে আছে গুঁড়োকরা খড়ি, তার পাশে ঝুড়িতে শুকনো তেঁতুল, এবং কতকগুলো ময়লা ঝাড়ন; আর সারি সারি কেরোসিনের টিন, অধিকাংশই খালি, গুটি দুই-তিন ভরা।

অনিপুণ হস্তে আজ সকাল থেকে কুমু তার কাজে লেগেছিল। ভাঁড়ারের কর্তব্য শেষ করে মোতির মা উঁকি মেরে একবার কুমুর কর্মতপস্যার দুঃসাধ্য সংকটটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। বুঝতে পারলে দুই-একটা ক্ষণভঙ্গুর জিনিসের অপঘাত আসন্ন। এ বাড়িতে জিনিসপত্রের সামান্য ক্ষুন্নতাও দৃষ্টি অথবা হিসাব এড়ায় না।

মোতির মা আর থাকতে পারলে না; বললে, 'কাজ নেই হাতে, তাই এলুম। ভাবলুম দিদির কাজটাতে একটু হাত লাগাই, পুণ্যি হবে।' এই বলেই কাঁচের গ্লোব ও চিমনির ঝুড়ি নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে মাজা-মোছায় লেগে গেল।

আপত্তি করতে কুমুর আর তেজ নেই, কেননা ইতিমধ্যে আপন অক্ষমতা সম্বন্ধে আত্ম-আবিষ্কার প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। মোতির মার সহায়তা পেয়ে বেঁচে গেল। কিন্তু মোতির মারও অশিক্ষিতপটুত্বের সীমা আছে। কেরোসিন ল্যাম্পে হিসাব করে ফিতে যোজনা তার পক্ষে অসাধ্য। কাজটা হয় তারই তত্ত্বাবধানে, বরাদ্দ অনুসারে তেল প্রভৃতির মাপ তারই স্বহস্তে, কিন্তু হাতে-কলমে সলতে কাটা আজ পর্যন্ত তার দ্বারা হয় নি। তাই অগত্যা বুড়ো বঙ্কু ফরাশকে সহযোগিতার জন্যে ডাকবার প্রস্তাব তুললে।

হার মানতে হল। বঙ্কু ফরাশ এল, এবং দ্রুতহস্তে অল্পকালের মধ্যেই কাজ সমাধা করে দিলে। সন্ধ্যার পূর্বেই দীপগুলো ঘরে ঘরে ভাগ করে দিয়ে আসতে হয়। সেই কাজের জন্যে পূর্বনিয়মমত তাকে যথাসময়ে আসতে হবে কি না বঙ্কু জিজ্ঞাসা করলে। লোকটা সরল প্রকৃতির বটে কিন্তু তবু প্রশ্নের মধ্যে একটু শ্লেষ ছিল-বা। কুমুর কানের ডগা লাল হয়ে উঠল।

সে কোনো জবাব করবার আগেই মোতির মা বললে, 'আসবি না তো কী?' কুমুর বুঝতে একটুও বাকি রইল না যে, কাজ করতে গিয়ে কেবল সে কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে।

৩১

দুপুরবেলা আহারের পর দরজা বন্ধ করে কুমু বসে বসে পণ করতে লাগল, মনের মধ্যে কিছুতে সে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠতে দেবে না। কুমু বললে, 'আজকের দিনটা লাগবে মনকে স্থির করে নিতে; ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে কাল সকাল থেকে সংসারধর্মের সত্যপথে প্রবৃত্ত হব।' মধ্যাহ্নে আহারের পর তার কাঠের ঘরে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে চলল নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া। এই কাজে সবচেয়ে সহায় ছিল তার দাদার স্মৃতি। সে যে দেখেছে তার দাদার ধৈর্যের আশ্চর্য গভীরতা;

তাঁর মুখে সেই বিষাদ, যেটি তাঁর অন্তরের মহত্ত্বের ছায়া—তার সেই দাদা, তখনকার কালে শিক্ষিত-সমাজে প্রচলিত পাজিটিভিজ্‌ম্‌ যাঁর ধর্ম ছিল, দেবতাকে বাইরে থেকে প্রণাম করা যাঁর অভ্যাস ছিল না, অথচ দেবতা আপনিই যাঁর জীবন পূর্ণ করে আবির্ভূত।

অপরাহ্ণে বঙ্কু ফরাশ যখন দরজায় আঘাত করলে, ঘর খুলে কুমু বেরিয়ে গেল। মোতির মাকে বললে, আজ রাত্রে সে খাবে না। মনকে বিশুদ্ধ করে নেবার জন্যেই তার এই উপবাস। মোতির মা কুমুর মুখ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে মুখে আজ চিত্তজ্বালার রক্তচ্ছটা ছিল না। ললাটে চক্ষুতে ছিল প্রশান্ত স্নিগ্ধ দীপ্তি। এখনই যেন সে পূজা সেরে তীর্থস্নান করে এল। অন্তর্যামী দেবতা যেন তার সব অভিমান হরণ করে নিলেন; হৃদয়ের মাঝখানে যেন সে এনেছে নির্মাল্যের ফুল বহন করে, তারই সুগন্ধ রয়েছে তাকে ঘিরে। তাই কুমু যখন উপবাসী থাকতে চাইলে তখন মোতির মা বুঝলে, এ অভিমানের আত্মপীড়ন নয়। তাই সে আপত্তিমাত্র করলে না।

কুমু তার ঠাকুরের মূর্তিকে অন্তরের মধ্যে বসিয়ে ছাদের এক কোণে গিয়ে আসন নিল। আজ সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, দুঃখ যদি তাকে এমন করে ধাক্কা না দিত তা হলে সে আপন দেবতার এত কাছে কখনোই আসতে পারত না। অস্তসূর্যের আভার দিকে তাকিয়ে কুমু হাত জোড় করে বললে, 'ঠাকুর, আর কখনো যেন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ না ঘটে; তুমি আমাকে কাঁদিয়ে তোমার আপন করে রাখো।'

শীতের দিন দেখতে দেখতে ম্লান হয়ে এল। ধূলি কুয়াশা ও কলের ধোঁয়াতে মিশ্রিত একটা বিবর্ণ আবরণে সন্ধ্যার স্বচ্ছ তিমির-গম্ভীর মহিমা আচ্ছন্ন। ঐ আকাশটা যেমন একটা পরিব্যাপ্ত মলিনতার বোঝা নিয়ে মাটির দিকে নেমে পড়েছে, তেমনি দাদার জন্যে একটা দুশ্চিন্তার দুঃসহ ভার কুমুর মনটাকে যেন নীচের দিকে নামিয়ে ধরে রেখে দিলে।

এমনি করে এক দিকে কুমু অভিমানের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মুক্তির আনন্দ, আর-এক দিকে দাদার জন্যে ভাবনায় পীড়িত হৃদয়ের ভার, দুইই একসঙ্গে নিয়ে আবার তার সেই কোটরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। বড়ো ইচ্ছা, এই নিরুপায় ভাবনার বোঝাটাকেও একান্ত বিশ্বাসে ভগবানের উপর সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দেয়। কিন্তু নিজেকে বারবার ধিক্‌কার দিয়েও কিছুতেই সেই নির্ভর পায় না। টেলিগ্রাফ তো করা হয়েছে, তার উত্তর আসে না কেন, এই প্রশ্ন অনবরত মনে লেগেই রইল।

নারীহৃদয়ের আত্মসমর্পণের সূক্ষ্ম বাধায় মধুসূদন কোথাও হাত লাগাতে পারছে না। যে বিবাহিত স্ত্রীর দেহমনের উপর তার সম্পূর্ণ দাবি সেও তার পক্ষে নিরতিশয় দুর্গম। ভাগ্যের এমন অভাবনীয় চক্রান্তকে সে কোন্‌ দিক থেকে কেমন করে আক্রমণ করবে ভেবে পায় না। কখনো কোনো কারণেই মধুসূদন নিজের ব্যাবসার প্রতি লেশমাত্র অমনোযোগী হয় নি, এখন সেই দুর্লক্ষণও দেখা দিল। নিজের মার পীড়া ও মৃত্যুতেও মধুসূদনের কর্মে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নি এ কথা সকলেই জানে। তখন তার অবিচলিত দৃঢ়চিত্ততায় অনেকে তাকে ভক্তি করেছে। মধুসূদন আজ হঠাৎ নিজের একটা নূতন পরিচয় পেয়ে নিজে স্তম্ভিত হয়ে গেছে, বাঁধা-পথের বাইরে যে শক্তি তাকে এমন করে টানছে সে যে তাকে কোন্‌ দিকে নিয়ে যাবে ভেবে পাচ্ছে না।

রাত্রের আহার সেরে মধুসূদন ঘরে শুতে এল; যদিও বিশ্বাস করে নি, তবু আশা করেছিল আজ হয়তো কুমুকে শোবার ঘরে দেখতে পাবে। সেইজন্যেই নিয়মিত সময় অতিক্রম করেই মধুসূদন এল। সুস্থ শরীরে চিরাভ্যাসমত একেবারে ঘড়িধরা সময়ে মধুসূদন ঘুমিয়ে পড়ে, এক মুহূর্ত দেরি হয় না। পাছে আজ তেমনি ঘুমিয়ে পড়ার পর কুমু ঘরে আসে তার পরে চলে যায়, এই ভয়ে বিছানায় শুতে গেল না। সোফায় খানিকটা বসে রইল, ছাদে খানিকটা পায়চারি করতে লাগল। মধুসূদনের ঘুমোবার সময় ন-টা—আজ এক সময়ে চমকে উঠে শুনলে তার দেউড়ির ঘন্টায় এগারোটা বাজছে। লজ্জা বোধ হল। কিন্তু বিছানার সামনে দু-তিনবার এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কিছুতেই শুতে যেতে প্রবৃত্তি হয় না। তখন স্থির করলে বাইরের ঘরে গিয়ে সেই রাত্রেই নবীনের সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া করে নেবে।

বাইরের ঘরের সামনের বারান্দায় পৌঁছিয়ে দেখে ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। সেও ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময়ে দেখে নবীন লণ্ঠন হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। দিনের বেলা হলে দেখতে পেত এক মুহূর্তে নবীনের মুখ কী রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, 'এত রাত্রে তুমি যে এখানে?'

নবীনের মাথায় বুদ্ধি জোগাল, সে বললে, 'শুতে যাবার আগেই তো আমি ঘড়িতে দম দিয়ে যাই, আর তারিখের কার্ড ঠিক করে দিই।'

'আচ্ছা, ঘরে এসে শোনো।'

নবীন ত্রস্ত হয়ে কাঠগড়ার আসামীর মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মধুসূদন বললে, 'বড়োবউয়ের কানে মন্ত্র ফোসলাবার কেউ থাকে এটা আমি পছন্দ করি নে। আমার ঘরের বউ আমার ইচ্ছেমত চলবে, আর-কারও পরামর্শমত চলবে না— এইটে হল নিয়ম।'

নবীন গম্ভীরভাবে বললে, 'সে তো ঠিক কথা।'

'তাই আমি বলছি, মেজোবউকে দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে।'

নবীন খুব যেন নিশ্চিন্ত হল এমনি ভাবে বললে, 'ভালো হল দাদা, আমি আরো ভাবছিলুম পাছে তোমার মত না হয়।'

মধুসূদন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তার মানে?'

নবীন বললে, 'ক-দিন ধরে দেশে যাবার জন্যে মেজোবউ অস্থির করে তুলেছে, জিনিসপত্র সব গোছানোই আছে, একটা ভালো দিন দেখলেই বেরিয়ে পড়বে।'

বলা বাহুল্য, কথাটা সম্পূর্ণ বানানো। তার বাড়িতে মধুসূদন যাকে ইচ্ছে বিদায় করে দেবে, তাই বলে কেউ নিজের ইচ্ছায় বিদায় হতে চাইবে এটা সম্পূর্ণ বেদস্তুর। বিরক্তির স্বরে বললে, 'কেন, যাবার জন্যে তার এত তাড়া কিসের?'

নবীন বললে, 'বাড়ির গিন্নি এ বাড়িতে এসেছেন, এখন এ বাড়ির সমস্ত ভার তো তাঁকেই নিতে হবে। মেজোবউ বললে, আমি মাঝে থাকলে কী জানি কখন কী কথা ওঠে।'

মধুসূদন বললে, 'এ-সব কথার বিচারভার কি তারই উপরে?'

নবীন ভালোমানুষের মতো বললে, 'কী করব বলো, মেয়েমানুষের জেদ। কী জানি, তার মনে হয়েছে, কোন্ কথা নিয়ে তুমি হয়তো একদিন হঠাৎ তাকে সরিয়ে দেবে, সে অপমান তার সইবে না— তাই সে একেবারে পণ করে বসেছে সে যাবেই। আসছে ত্রয়োদশী তিথিতে দিন পড়েছে— এর মধ্যে কাজকর্ম সব গুছিয়ে দিয়ে হিসাবপত্র চুকিয়ে সে চলে যেতে চায়।'

মধুসূদন বললে, 'দেখো নবীন, মেজোবউকে আদর দিয়ে তুমিই বিগড়ে দিয়েছ। তাকে একটু কড়া করেই বোলো, সে কিছুতেই যেতে পারবে না। তুমি পুরুষমানুষ, ঘরে তোমার নিজের শাসন চলবে না, এ আমি দেখতে পারি নে।'

নবীন মাথা চুলকিয়ে বললে, 'চেষ্টা করে দেখব দাদা, কিন্তু—'

'আচ্ছা, আমার নাম করে বোলো, এখন তার যাওয়া চলবে না। যখন সময় বুঝব তখন যাবার দিন আমিই ঠিক করে দেব।'

নবীন বললে, 'তুমি বললে কিনা মেজোবউকে দেশে পাঠাতে হবে, তাই ভাবছি—'

মধুসূদন উত্তেজিত হয়ে বললে, 'আমি কি বলেছি, এই মুহূর্তেই পাঠিয়ে দিতে হবে?'

নবীন ধীরে ধীরে চলে গেল। মধুসূদন একটা গ্যাসের শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে লম্বা কেদারায় ঠেসান দিয়ে বসে রইল। বাড়ির চৌকিদার রাত্রে এক-একবার বাড়ির ঘরগুলোর সামনে দিয়ে টহলিয়ে আসে। মধুসূদনের অল্প একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল, এমন সময় হঠাৎ চমকিয়ে উঠে দেখে চৌকিদার ঘরে ঢুকে লণ্ঠন তুলে ধরে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। হয়তো সে ভাবছিল, মহারাজ মূর্ছাই গেছে, না মারাই গেছে। মধুসূদন লজ্জিত হয়ে ধড়ফড় করে চৌকি থেকে উঠে পড়ল। বাইরের আপিসঘরে বসে সদ্যোবিবাহিত রাজাবাহাদুরের রাত্রিযাপনের শোকাবহ দৃশ্যটা চৌকিদারের

কাছে যে অসম্মানকর এ কথাটা মুহূর্তেই তাকে যেন মারলে। উঠেই কিছু রাগের স্বরে চৌকিদারকে বললে, 'ঘর বন্ধ করো।' যেন ঘর বন্ধ না থাকাটাতে তারই অপরাধ ছিল। দেউড়ির ঘন্টাতে বাজল দুটো।

মধুসূদন ঘর ছেড়ে যাবার আগে একবার তার দেরাজ খুললে। ইতস্তত করতে করতে কুমুর নামের টেলিগ্রামটা পকেটে পুরে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেল। তেতালায় ওঠবার সিঁড়ির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

গভীর রাত্রে প্রথম ঘুম থেকে জেগে মানুষ আপনার সমস্ত শক্তিকে সম্পূর্ণ পায় না। তাই তার দিনের চরিত্রের সঙ্গে রাতের চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ। এই রাত্রি দুটোর সময় চারি দিকে লোকের দৃষ্টি বলে যখন কিছুই নেই, সে যখন বিশ্বসংসারে একমাত্র নিজের কাছে ছাড়া আর কারও কাছেই দায়ী নয়, তখন কুমুর কাছে মনে মনে হার-মানা তার পক্ষে অসম্ভব হল না।

৩২

সিঁড়ির তলা থেকে মধুসূদন ফিরল, বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করতে লাগল। একটা কোন্ রুদ্ধ ঘরের সামনে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছিল। সেইটে তুলে নিয়ে চুপি চুপি তেলবাতির কুঠরির বাইরে এসে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে দরজা ঠেলতে গিয়ে দেখলে দরজা ভেজানো; দরজা খুলে গেল। সেই মাদুরের উপর গায়ে একখানা চাদর দিয়ে কুমু গভীর ঘুমে মগ্ন— বাঁ হাতখানি বুকের উপর তোলা। দেয়ালের কোণে লণ্ঠন রেখে মধুসূদন কুমুর মুখের দিকে মুখ করে বাঁ পাশে এসে বসল। এই মুখটি যে মনকে এমন প্রবল শক্তিতে টানে তার কারণ, মুখের মধ্যে তার একটি অনির্বচনীয় সম্পূর্ণতা। কুমুর আপনার মধ্যে আপনার কোনোদিন বিরোধ ঘটে নি। দাদার সংসারে অভাবের দুঃখে সে পীড়িত হয়েছে কিন্তু সেটা বাহ্য অবস্থাঘটিত ব্যাপারে, সেটাতে তার প্রকৃতিকে আঘাত করে নি। যে সংসারে সে ছিল সে সংসার তার স্বভাবের পক্ষে সব দিকেই অনুকূল। এইজন্যেই তার মুখভাবে এমন একটি অনবচ্ছিন্ন সরলতা, তার চলাফেরায় তার ব্যবহারে এমন একটা অক্ষুণ্ণ মর্যাদা। যে মধুসূদনকে জীবনের সাধনায় কেবল প্রাণপণ লড়াই করতে হয়েছে, প্রতিদিন উদ্যত সংশয় নিয়ে নিরন্তর যাকে সতর্ক থাকতে হয়, তার কাছে কুমুর এই সর্বাঙ্গীণ সুপরিণতির অপূর্ব গাম্ভীর্য পরম বিস্ময়ের বিষয়। সে নিজে একটুও সহজ নয়, আর কুমু যেন একেবারে দেবতার মতো সহজ। তার সঙ্গে কুমুর এই বৈপরীত্যই তাকে এমন প্রবল বেগে টানছে। বিয়ের পরে বধূ শ্বশুরবাড়িতে প্রথম আসবামাত্রই যে কাণ্ডটি ঘটল তার সমস্ত ছবিটি যখন সে মনের মধ্যে দেখে তখন দেখতে পায় তার নিজের দিকে ব্যর্থ প্রভুত্বের ক্রুদ্ধ অক্ষমতা, অন্য দিকে বধূর মনের মধ্যে অনমনীয় আত্মমর্যাদার সহজ প্রকাশ। সাধারণ মেয়েদের মতো তার ব্যবহারে কোথাও কিছুমাত্র অশোভন প্রগল্‌ভতা দেখা গেল না। এ যদি না হত তা হলে তাকে অপমান করবার যে-স্বামিত্ব তার আছে সেই অধিকার খাটাতে মধুসূদন লেশমাত্র দ্বিধা করত না। কিন্তু কী যে হল তা সে নিজে বুঝতেই পারে না; কী একটা অদ্ভুত কারণে কুমুকে সে আপনার ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেলে না।

মধুসূদন মনে স্থির করলে, কুমুকে না জাগিয়ে সমস্ত রাত্রি ওর পাশে এমনি করে জেগে বসে থাকবে। কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে আর কিছুতেই থাকতে পারলে না— আস্তে আস্তে কুমুর বুকের উপর থেকে তার হাতটি নিজের হাতের উপর তুলে নিলে। কুমু ঘুমের ঘোরে উসখুস করে হাতটা টেনে নিয়ে মধুসূদনের উলটো দিকে পাশ ফিরে শুল।

মধুসূদন আর থাকতে পারলে না, কুমুর কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললে, 'বড়োবউ, তোমার দাদার টেলিগ্রাম এসেছে।'

অমনি ঘুম ভেঙে কুমু দ্রুত উঠে বসল, বিস্মিত চোখ মেলে মধুসূদনের মুখের দিকে অবাক

হয়ে রইল চেয়ে। মধুসূদন টেলিগ্রামটা সামনে ধরে বললে, 'তোমার দাদার কাছ থেকে এসেছে।' ব'লে ঘরের কোণ থেকে লণ্ঠনটা কাছে নিয়ে এল।

কুমু টেলিগ্রামটা পড়ে দেখলে, তাতে ইংরেজিতে লেখা আছে, 'আমার জন্যে উদ্‌বিগ্ন হোয়ো না; ক্রমশই সেরে উঠছি; তোমাকে আমার আশীর্বাদ।' কঠিন উদ্‌বেগের নিরতিশয় পীড়নের মধ্যে এই সান্ত্বনার কথা পড়ে এক মুহূর্তে কুমুর চোখ ছল ছল করে উঠল। চোখ মুছে টেলিগ্রামখানি যত্ন করে আঁচলের প্রান্তে বাঁধলে। সেইটেতে মধুসূদনের হৃৎপিণ্ডে যেন মোচড় লাগল। তার পরে কী যে বলবে কিছুই ভেবে পায় না। কুমুই বলে উঠল, 'দাদার কি চিঠি আসে নি?'

এর পরে কিছুতেই মধুসূদন বলতে পারলে না যে চিঠি এসেছে। ধাঁ করে বলে ফেললে, 'না, চিঠি তো নেই।'

এই ঘরটার মধ্যে রাত্রে দুজনে এমন করে বসে থাকতে কুমুর সংকোচ বোধ হল। সে যখন উঠব-উঠব করছে, মধুসূদন হঠাৎ বলে উঠল, 'বড়োবউ, আমার উপর রাগ কোরো না।'

এ তো প্রভুর উপরোধ নয়, এ যে প্রণয়ীর মিনতি, আর তার মধ্যে যেন আছে অপরাধীর আত্মগ্লানি। কুমু বিস্মিত হয়ে গেল, তার মনে হল এ দৈবেরই লীলা। কেননা, সে যে দিনের বেলা বার বার নিজেকে বলেছে, 'তুই রাগ করিস নে।' সেই কথাটাই আজ অর্ধরাত্রে অপ্রত্যাশিতভাবে কে মধুসূদনকে দিয়ে বলিয়ে নিলে।

মধুসূদন আবার তাকে বললে, 'তুমি কি এখনো আমার উপর রাগ করে আছ?'

কুমু বললে, 'না, আমার রাগ নেই, একটুও না।'

মধুসূদন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। ও যেন মনে মনে কথা কইছে; অনুদ্দিষ্ট কারও সঙ্গে যেন ওর কথা।

মধুসূদন বললে, 'তা হলে এ ঘর থেকে এসো তোমার আপন ঘরে।'

কুমু আজ রাত্রে প্রস্তুত ছিল না। ঘুমের থেকে জেগে উঠেই হঠাৎ মনকে বেঁধে তোলা কঠিন। কাল সকালে স্নান করে দেবতার কাছে তার প্রতিদিনের প্রার্থনা-মন্ত্র পড়ে তবে কাল থেকে সংসারে তার সাধনা আরম্ভ হবে এই সংকল্প সে করেছিল। তখন ওর মনে হল, 'ঠাকুর আমাকে সময় দিলেন না, আজ এই গভীর রাত্রেই ডাক দিলেন। তাঁকে কেমন করে বলব যে, "না"।' মনের ভিতরে যে একটা প্রকাণ্ড অনিচ্ছা হচ্ছিল তাকে অপরাধ বলে কুমু ভয় পেলে। এই অনিচ্ছার বাধা তাকে টেনে রাখছিল বলেই কুমু জোরের সঙ্গে উঠে দাঁড়ালে, বললে, 'চলো।'

উপরে উঠে তার শোবার ঘরের সামনে একটু থমকে দাঁড়িয়ে সে বললে, 'আমি এখনই আসছি, দেরি করব না।'

বলে ছাদের কোণে গিয়ে বসে পড়ল। কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড চাঁদ তখন মধ্য-আকাশে।

নিজের মনে মনে কুমু বার বার করে বলতে লাগল, 'প্রভু, তুমি ডেকেছ আমাকে, তুমি ডেকেছ। আমাকে ভোল নি বলেই ডেকেছ। আমাকে কাঁটাপথের উপর দিয়েই নিয়ে যাবে—সে তুমিই, সে তুমিই, সে আর কেউ নয়।'

আর-সমস্তকেই কুমু লুপ্ত করে দিতে চায়। আর সমস্তই মায়া, আর-সমস্তই যদি কাঁটাও হয় তবু সে পথেরই কাঁটা, আর সে তাঁরই পথের কাঁটা। সঙ্গে পাথেয় আছে, তার দাদার আশীর্বাদ। সেই আশীর্বাদ সে যে আঁচলে বেঁধে নিয়েছে। সেই আঁচলে বাঁধা আশীর্বাদ বার বার মাথায় ঠেকালে। তার পরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলে। এমন সময় হঠাৎ চমকে উঠল, পিছন থেকে মধুসূদন বলে উঠল, 'বড়োবউ, ঠাণ্ডা লাগবে, ঘরে এসো।' অন্তরের মধ্যে কুমু যে বাণী শুনতে চায় তার সঙ্গে এ কণ্ঠের সুর তো মেলে না! এই তো তার পরীক্ষা, ঠাকুর আজ তাকে বাঁশি দিয়েও ডাকবেন না। তিনি রইবেন আজ ছদ্মবেশে।

৩৩

যেখানে কুমু ব্যক্তিগত মানুষ সেখানে যতই তার মন ধিক্‌কারে ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় ভরে উঠছে, যতই তার সংসার সেখানে আপন গায়ের জোরের রূঢ় অধিকারে তাকে অপমানিত করছে ততই সে আপনার চারি দিকে একটা আবরণ তৈরি করছে। এমন একটা আবরণ যাতে করে নিজের কাছে তার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সত্যতাকে লুপ্ত করে, অর্থাৎ নিজের সম্বন্ধে নিজের চৈতন্যকে কমিয়ে দেয়। এ হচ্ছে ক্লোরোফর্মের বিধান। কিন্তু এ তো দু-তিন ঘণ্টার ব্যবস্থা নয়, সমস্ত দিনরাত্রি বেদনাবোধকে বিতৃষ্ণাবোধকে তাড়িয়ে রাখতে হবে। এই অবস্থায় মেয়েরা যদি কোনোমতে একজন গুরুকে পায় তবে তার আত্মবিস্মৃতির চিকিৎসা সহজ হয়; সে তো সম্ভব হল না। তাই মনে মনে পূজার মন্ত্রকে নিয়তই বাজিয়ে রাখতে চেষ্টা করলে। তার এই দিনরাত্রির মন্ত্রটি ছিল—

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বাম্ অহমীশমীড্যং
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।

হে আমার পূজনীয়, তোমার কাছে আমার সমস্ত শরীর প্রণত করে এই প্রসাদটি চাই যে, পিতা যেমন করে পুত্রকে, সখা যেমন করে সখাকে, প্রিয় যেমন করে প্রিয়াকে সহ্য করতে পারেন, হে দেব, তুমিও যেন আমাকে তেমনি করে সইতে পার। তুমি যে তোমার ভালোবাসায় আমাকে সহ্য করতে পার তার প্রমাণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, তোমার ভালোবাসায় আমিও সমস্ত ক্ষমা করতে পারি। কুমু চোখ বুজে মনে মনে তাঁকে ডেকে বলে, 'তুমি তো বলেছ, যে মানুষ আমাকে সব জায়গায় দেখে, আমার মধ্যে সমস্তকে দেখে, সেও আমাকে ত্যাগ করে না, আমিও তাকে ত্যাগ করি নে। এই সাধনায় আমার যেন একটুও শৈথিল্য না হয়।'

আজ সকালে স্নান করে চন্দন-গোলা জল দিয়ে তার শরীরকে অনেকক্ষণ ধরে অভিষিক্ত করে নিলে। দেহকে নির্মল করে সুগন্ধি করে সে তাঁকে উৎসর্গ করে দিলে—মনে মনে একাগ্রতার সঙ্গে ধ্যান করতে লাগল যে, নিমেষে নিমেষে তার হাতে তাঁর হাত আছে, তার সমস্ত শরীরে তাঁর সর্বব্যাপী স্পর্শ অবিরাম বিরাজমান। এ দেহকে সত্যরূপে সম্পূর্ণরূপে তিনিই পেয়েছেন, তাঁর পাওয়ার বাইরে যে শরীরটা সে তো মিথ্যা, সে তো মায়া, সে তো মাটি, দেখতে দেখতে মাটিতে মিশিয়ে যাবে। যতক্ষণ তাঁর স্পর্শকে অনুভব করি ততক্ষণ এ দেহ কিছুতেই অপবিত্র হতে পারে না। এই কথা মনে করতে করতে আনন্দে তার চোখের পাতা ভিজে এল—তার দেহটা যেন মুক্তি পেলে মাংসের স্থূল বন্ধন থেকে। পুণ্যসম্মিলনের নিত্যক্ষেত্র বলে আপন দেহের উপর তার যেন ভক্তি এল। যদি কুন্দফুলের মালা হাতের কাছে পেত তা হলে এখনই আজ সে পরত গলায়, বাঁধত কবরীতে। স্নান করে পরল সে একটি শুভ্র শাড়ি, খুব মোটা লাল পাড় দেওয়া। ছাদে যখন বসল তখন মনে হল সূর্যের আলো হয়ে আকাশপূর্ণ একটি পরম স্পর্শ তার দেহকে অভিনন্দিত করলে।

মোতির মার কাছে এসে কুমু বললে, 'আমাকে তোমার কাজে লাগিয়ে দাও।'

মোতির মা হেসে বললে, 'এসো তবে তরকারি কুটবে।'

মস্ত মস্ত বারকোশ, বড়ো বড়ো পিতলের থোরা, ঝুড়ি ঝুড়ি শাকসব্‌জি, দশ-পনেরোটা বঁটি পাতা—আত্মীয়া-আশ্রিতারা গল্প করতে করতে দ্রুত হাত চালিয়ে যাচ্ছে, ক্ষতবিক্ষত খণ্ডবিখণ্ডিত তরকারিগুলো স্তূপাকার হয়ে উঠছে। তারই মধ্যে কুমু এক জায়গায় বসে গেল। সামনে গরাদের ভিতর দিয়ে দেখা যায় পাশের বস্তির এক বৃদ্ধ তেঁতুল গাছ তার চিরচঞ্চল পাতাগুলো দিয়ে সূর্যের আলো চূর্ণ চূর্ণ করে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

মোতির মা মাঝে মাঝে কুমুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে আর ভাবে, ও কি কাজ করছে, না, ওর

আঙুলের গতি আশ্রয় করে ওর মন চলে যাচ্ছে কোন্ এক তীর্থের পথে? ওকে দেখে মনে হয় যেন পালের নৌকো, আকাশে-তোলা পালটাতে হাওয়া এসে লাগছে, নৌকোটা যেন সেই স্পর্শেই ভোর, আর তার খোলের দু ধারে যে জল কেটে কেটে পড়ছে সেটা যেন খেয়ালের মধ্যেই নেই। ঘরে অন্য যারা কাজ করছে তারা যে কুমুর সঙ্গে গল্পগুজব করবে এমন যেন একটা সহজ রাস্তা পাচ্ছে না। শ্যামাসুন্দরী একবার বললে, 'বউ, সকালেই যদি স্নান কর, গরম জল বলে দাও না কেন? ঠাণ্ডা লাগবে না তো?'

কুমু বললে, 'আমার অভ্যেস আছে।'

আলাপ আর এগোল না। কুমুর মনের মধ্যে তখন একটা নীরব জপের ধারা চলছে—

পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।

তরকারি-কোটা ভাঁড়ার-দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেল, মেয়েরা স্নানের জন্যে অন্দরের উঠোনে কলতলায় গিয়ে কলরব তুললে।

মোতির মাকে একলা পেয়ে কুমু বললে, 'দাদার কাছ থেকে টেলিগ্রাফের জবাব পেয়েছি।'

মোতির মা কিছু আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কখন পেলে?'

কুমু বললে, 'কাল রাত্তিরে।'

'রাত্তিরে!'

'হাঁ, অনেক রাত। তখন উনি নিজে এসে আমার হাতে দিলেন।'

মোতির মা বললে, 'তা হলে চিঠিখানাও নিশ্চয় পেয়েছ।'

'কোন্ চিঠি?'

'তোমার দাদার চিঠি?'

ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'না, আমি তো পাই নি! দাদার চিঠি এসেছে নাকি?'

মোতির মা চুপ করে রইল।

কুমু তার হাত চেপে ধরে উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে, 'কোথায় দাদার চিঠি, আমাকে এনে দাও-না।'

মোতির মা চুপি চুপি বললে, 'সে চিঠি আনতে পারব না, সে বড়োঠাকুরের বাইরের ঘরের দেরাজে আছে।'

'আমার চিঠি কেন আমাকে এনে দিতে পারবে না?'

"তাঁর দেরাজ খুলেছি জানতে পারলে প্রলয় কাণ্ড হবে।'

কুমু অস্থির হয়ে বললে, 'দাদার চিঠি তা হলে আমি পড়তে পার না?'

'বড়োঠাকুর যখন আপিসে যাবেন তখন সে চিঠি পড়ে আবার দেরাজে রেখে দিয়ো।'

রাগ তো ঠেকিয়ে রাখা যায় না। মনটা গরম হয়ে উঠল। বললে, 'নিজের চিঠিও কি চুরি করে পড়তে হবে?'

'কোন্‌টা নিজের কোন্‌টা নিজের নয়, সে বিচার এ বাড়ির কর্তা করে দেন।'

কুমু তার পণ ভুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ মনের ভিতরটা তর্জনী তুলে বলে উঠল, 'রাগ কোরো না।' ক্ষণকালের জন্যে কুমু চোখ বুজলে। নিঃশব্দ বাক্যে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল, 'প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।'

কুমু বললে, 'আমার চিঠি কেউ যদি চুরি করেন করুন, আমি তাই বলে চুরি করে চুরির শোধ দিতে চাই নে।'

বলেই কুমুর তখনই মনে হল কথাটা কঠিন হয়েছে। বুঝতে পারলে ভিতরে যে রাগ আছে নিজের অগোচরে সে আপনাকে প্রকাশ করে। তাকে উন্মূলিত করতে হবে। তার সঙ্গে লড়াই

করতে চাইলে সব সময় তো তার নাগাল পাওয়া যায় না। গুহার মধ্যে সে দুর্গ করে থাকে, বাইরে থেকে সেখানে প্রবেশের পথ কই? তাই এমন একটি প্রেমের বন্যা নামিয়ে আনা চাই যাতে রুদ্ধকে মুক্ত করে, বদ্ধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মনকে ভুলিয়ে দেবার ওর একটি উপায় হাতে ছিল, সে হচ্ছে সংগীত। কিন্তু এ বাড়িতে এসরাজ বাজাতে ওর লজ্জা করে। সঙ্গে এসরাজ আনেও নি। কুমু গান গাইতে পারে, কিন্তু কুমুর গলায় তেমন জোর নেই। গানের ধারায় আকাশ ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা করল, অভিমানের গান। যে গানে ও বলতে পারে, 'আমি তো তোমারই ডাকে এসেছি, তবে তুমি কেন লুকোলে? আমি তো নিমেষের জন্যে দ্বিধা করি নি, তবে আজ আমাকে কেন এমন সংশয়ের মধ্যে ফেললে?' এই-সব কথা খুব গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওর বলতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, তা হলেই যেন সুরে এর উত্তর পাবে।

৩৪

কুমুর পালাবার একটিমাত্র জায়গা আছে, এ বাড়ির ছাদ। সেইখানে চলে গেল। বেলা হয়েছে, প্রখর রৌদ্রে ছাদ ভরে গেছে, কেবল প্রাচীরের গায়ে এক জায়গায় একটুখানি ছায়া। সেইখানে গিয়ে বসল। একটি গান মনে পড়ল, তার সুরটি আশাবরী। সে গানের আরম্ভটি হচ্ছে, 'বাঁশরী হমারি রে'— কিন্তু বাকিটুকু ওস্তাদের মুখে মুখে বিকৃত বাণী— তার মানে বুঝতে পারা যায় না। কুমু ঐ অসম্পূর্ণ অংশ আপন ইচ্ছামত নূতন নূতন তান দিয়ে ভরিয়ে পালটে পালটে গাইতে লাগল। ঐ একটুখানি কথা অর্থে ভরে উঠল। ঐ বাক্যটি যেন বলছে, 'ও আমার বাঁশি, তোমাতে সুর ভরে উঠছে না কেন? অন্ধকার পেরিয়ে পেঁীচচ্ছে না কেন যেখানে দুয়ার রুদ্ধ, যেখানে ঘুম ভাঙল না? বাঁশরী হমারি রে, বাঁশরী হমারি রে।'

মোতির মা যখন এসে বললে, 'চলো ভাই, খেতে যাবে' তখন সেই ছাদের কোণের একটুখানি ছায়া গেছে লুপ্ত হয়ে, কিন্তু তখন ওর মন সুরে ভরপুর, সংসারে কে ওর 'পরে কী অন্যায় করেছে সে সমস্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে। ওর চিঠি নিয়ে মধুসূদনের যে ক্ষুদ্রতা, যে ক্ষুদ্রতায় ওর মনে তীব্র অবজ্ঞা উদ্যত হয়ে উঠেছিল, সে যেন এই রোদ-ভরা আকাশে একটা পতঙ্গের মতো কোথায় বিলীন হয়ে গেল, তার ক্রুদ্ধ গুঞ্জন মিলিয়ে গেল অসীম আকাশে। কিন্তু চিঠির মধ্যে দাদার যে স্নেহবাক্য আছে সেটুকু পাবার জন্যে তার মনের আগ্রহ তো যায় না।

ঐ ব্যগ্রতাটা তার মনে লেগে রইল। খাওয়া হয়ে গেলে আর সে থাকতে পারলে না। মোতির মাকে বললে, 'আমি যাই বাইরের ঘরে, চিঠি পড়ে আসি।'

মোতির মা বললে, 'আর একটু দেরি হোক, চাকররা সবাই যখন ছুটি নিয়ে খেতে যাবে, তখন যেয়ো।'

কুমু বললে, 'না, না, সে বড়ো চুরি করে যাওয়ার মতো হবে। আমি সকলের সামনে দিয়ে যেতে চাই, তাতে যে যা মনে করে করুক।'

মোতির মা বললে, 'তা হলে আমিও সঙ্গে যাই।'

কুমু বলে উঠল, 'না, সে কিছুতেই হবে না। তুমি কেবল বলে দাও কোন্ দিক দিয়ে যেতে হবে।'

মোতির মা অন্তঃপুরের ঝরকা-দেওয়া বারান্দা দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে দিলে। কুমু বেরিয়ে এল। ভৃত্যেরা সচকিত হয়ে উঠে তাকে প্রণাম করলে। কুমু ঘরে ঢুকে ডেস্কের দেরাজ খুলে দেখলে তার চিঠি। তুলে নিয়ে দেখলে লেফাফা খোলা। বুকের ভিতরটা ফুলে উঠতে লাগল, একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল। যে বাড়িতে কুমু মানুষ হয়েছে সেখানে এরকম অবমাননা কোনোমতেই কল্পনা পর্যন্ত করা যেত না। নিজের আবেগের এই তীব্র প্রবলতাতেই তাকে ধাক্কা মেরে সচেতন করে তুলল। সে বলে

উঠল, 'প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্'— তবু তুফান থামে না— তাই বার বার বললে। বাইরে যে আরদালি ছিল, আপিসঘরে তাদের বউরানীর এই আপন-মনে মন্ত্র-আবৃত্তি শুনে সে অবাক হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বলতে বলতে কুমুর মন শান্ত হয়ে এল। তখন চিঠিখানি সামনে রেখে চৌকিতে বসে হাত জোড় করে স্থির হয়ে রইল। চিঠি সে চুরি করে পড়বে না এই তার পণ।

এমন সময়ে মধুসূদন ঘরে ঢুকেই চমকে উঠে দাঁড়াল— কুমু তার দিকে চাইলেও না। কাছে এসে দেখলে, ডেস্কের উপর সেই চিঠি। জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি এখানে যে!'

কুমু নীরবে শান্ত দৃষ্টিতে মধুসূদনের মুখের দিকে চাইলে। তার মধ্যে নালিশ ছিল না। মধুসূদন আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'এ ঘরে তুমি কেন?'

এই বাহুল্যপ্রশ্নে কুমু অধৈর্যের স্বরেই বললে, 'আমার নামে দাদার চিঠি এসেছে কি না তাই দেখতে এসেছিলেম।'

সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন, এমনতরো প্রশ্নের রাস্তা কাল রাত্তিরে মধুসূদন আপনি বন্ধ করে দিয়েছে। তাই বললে, 'এ চিঠি আমিই তোমার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলুম, সেজন্যে তোমার এখানে আসবার তো দরকার ছিল না।'

কুমু একটুখানি চুপ করে রইল, মনকে শান্ত করে তার পরে বললে, 'এ চিঠি তুমি আমাকে পড়তে দিতে ইচ্ছে কর নি, সেইজন্যে এ চিঠি আমি পড়ব না। এই আমি ছিঁড়ে ফেললুম। কিন্তু এমন কষ্ট আমাকে আর কখনো দিয়ো না। এর চেয়ে কষ্ট আমার আর কিছু হতে পারে না।'

এই বলে সে মুখে কাপড় দিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে গেল।

ইতিপূর্বে আজ মধ্যাহ্নে আহারের পর মধুসূদনের মনটা আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। আন্দোলন কিছুতে থামাতে পারছিল না। কুমুর খাওয়া হলেই তাকে ডাকিয়ে পাঠাবে বলে ঠিক করে রেখেছে। আজ সে মাথার চুল আঁচড়ানো সম্বন্ধে একটু বিশেষ যত্ন নিলে। আজ সকালেই একটি ইংরেজ নাপিতের দোকান থেকে স্পিরিট-মেশানো সুগন্ধি কেশতৈল ও দামি এসেন্স কিনিয়ে আনিয়েছিল। জীবনে এই প্রথম সেগুলি সে ব্যবহার করেছে। সুগন্ধি ও সুসজ্জিত হয়ে সে প্রস্তুত ছিল। আপিসের সময় আজ অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেতেই মধুসূদন চমকে উঠে বসল। হাতের কাছে আর-কিছু না পেয়ে একখানা পুরোনো খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পাতাটা নিয়ে এমনভাবে সেটাকে দেখতে লাগল যেন তার আপিসেরই কাজের অঙ্গ। এমন-কি পকেট থেকে একটা মোটা নীল পেন্সিল বের করে দুটো-একটা দাগও টেনে দিলে।

এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করলে শ্যামাসুন্দরী। ভ্রূকুঞ্চিত করে মধুসূদন তার মুখের দিকে চাইলে। শ্যামাসুন্দরী বললে, 'তুমি এখানে বসে আছ; বউ যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

'খুঁজে বেড়াচ্ছে! কোথায়?'

'এই যে দেখলুম, বাইরে তোমার আপিসঘরে গিয়ে ঢুকল। তা এতে এত আশ্চর্য হচ্ছ কেন ঠাকুরপো— সে ভেবেছে তুমি বুঝি—'

তাড়াতাড়ি মধুসূদন বাইরে চলে গেল। তার পরেই সেই চিঠির ব্যাপার।

পালের নৌকায় হঠাৎ পাল ফেটে গেলে তার যে দশা মধুসূদনের তাই হল। তখন আর দেরি করবার লেশমাত্র অবকাশ ছিল না। আপিসে চলে গেল। কিন্তু সকল কাজের ভিতরে ভিতরে তার অসম্পূর্ণ ভাঙা চিন্তার তীক্ষ্ন ধারগুলো কেবলই যেন ঠেলে ঠেলে বিঁধে বিঁধে উঠছে। এই মানসিক ভূমিকম্পের মধ্যে মনোযোগ দিয়ে কাজ করা সেদিন তার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আপিসে জানিয়ে দিলে উৎকট মাথা ধরেছে, কার্যশেষের অনেক আগেই বাড়ি ফিরে এল।

৩৫

এ দিকে নবীন ও মোতির মা বুঝেছে এবারে ভিত গেল ভেঙে, পালিয়ে বাঁচবার আশ্রয় তাদের আর কোথাও রইল না। মোতির মা বললে, 'এখানে যেরকম খেটে খাচ্ছি সেরকম খেটে খাবার জায়গা সংসারে আমার মিলবে। আমার দুঃখ এই যে, আমি গেলে এ বাড়িতে দিদিকে দেখবার লোক আর কেউ থাকবে না।'

নবীন বললে, 'দেখো মেজোবউ, এ সংসারে অনেক লাঞ্ছনা পেয়েছি, এ বাড়ির অন্নজলে অনেক-বার আমার অরুচি হয়েছে। কিন্তু এইবার অসহ্য হচ্ছে যে, এমন বউ ঘরে পেয়েও কী করে তাকে নিতে হয়, রাখতে হয়, তা দাদা বুঝলে না—সমস্ত নষ্ট করে দিলে। ভালো জিনিসের ভাঙা টুকরো দিয়েই অলক্ষ্মী বাসা বাঁধে।'

মোতির মা বললে, 'সে কথা তোমার দাদার বুঝতে দেরি হবে না। কিন্তু তখন ভাঙা আর জোড়া লাগবে না।'

নবীন বললে, 'লক্ষ্মণ দেওর হবার ভাগ্য আমার ঘটল না, এইটেই আমার মনে বাজছে। যা হোক, তুমি জিনিসপত্তর এখনি গুছিয়ে ফেলো, এ বাড়িতে যখন সময় আসে তখন আর তর সয় না।'

মোতির মা চলে গেল। নবীন আর থাকতে পারলে না, আস্তে আস্তে তার বউদিদির ঘরের বাইরে এসে দেখলে কুমু তার শোবার ঘরের মেজের বিছানার উপর পড়ে আছে। যে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলেছে তার বেদনা কিছুতেই মন থেকে যাচ্ছে না।

নবীনকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। নবীন বললে, 'বউদিদি, প্রণাম করতে এসেছি, একটু পায়ের ধুলো দাও।'

বউদিদির সঙ্গে নবীনের এই প্রথম কথাবার্তা।

কুমু বললে, 'এসো, বোসো।'

নবীন মাটিতে বসে বললে, 'তোমাকে সেবা করতে পারব এই খুশিতে বুক ভরে উঠেছিল। কিন্তু নবীনের কপালে এতটা সৌভাগ্য সইবে কেন? কটা দিন মাত্র তোমাকে পেয়েছি, কিছুই করতে পারি নি এই আপসোস মনে রয়ে গেল।'

কুমু জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় যাচ্ছ তোমরা?'

নবীন বললে, 'দাদা আমাদের দেশেই পাঠাবে। এর পরে তোমার সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবার সুবিধা হবে না, তাই প্রণাম করে বিদায় নিতে এসেছি।' বলে যেই সে প্রণাম করলে মোতির মা ছুটে এসে বললে, 'শীঘ্র চলে এসো। কর্তা তোমার খোঁজ করছেন।'

নবীন তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেল। মোতির মাও গেল তার সঙ্গে।

সেই বাইরের ঘরে দাদা তার ডেস্কের কাছে বসে; নবীন এসে দাঁড়াল। অন্যদিনে এমন অবস্থায় তার মুখে যেরকম আশঙ্কার ভাব থাকত আজ তা কিছুই নেই।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, 'ডেস্কের চিঠির কথা বড়োবউকে কে বললে?'

নবীন বললে, 'আমিই বলেছি।'

'হঠাৎ তোমার এত সাহস বেড়ে উঠল কোথা থেকে?'

'বড়োবউরানী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর দাদার চিঠি এসেছে কি না। এ বাড়ির চিঠি তো তোমার কাছে এসে প্রথমটা ঐ ডেস্কেই জমা হয়, তাই আমি দেখতে এসেছিলুম।'

'আমাকে জিজ্ঞাসা করতে সবুর সয় নি?'

'তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তাই—'

'তাই আমার হুকুম উড়িয়ে দিতে হবে?'

'তিনি তো এ বাড়ির কর্ত্রী, কেমন করে জানব তাঁর হুকুম এখানে চলবে না? তিনি যা বলবেন

আমি তা মানব না এতবড়ো আস্পর্ধা আমার নেই। এই আমি তোমার কাছে বলছি, তিনি তো শুধু আমার মনিব নন তিনি আমার গুরুজন, তাঁকে যে মানব সে নিমক খেয়ে নয়, সে আমার ভক্তি থেকে।'

'নবীন, তোমাকে তো এতটুকু বেলা থেকে দেখছি, এ-সব বুদ্ধি তোমার নয়। জানি তোমার বুদ্ধি কে জোগায়। যাই হোক, আজ আর সময় নেই, কাল সকালের ট্রেনে তোমাদের দেশে যেতে হবে।'

'যে আজ্ঞে' বলেই নবীন দ্বিরুক্তি না করেই দ্রুত চলে গেল।

এত সংক্ষেপে 'যে আজ্ঞে' মধুসূদনের একটুও ভালো লাগল না। নবীনের কান্নাকাটি করা উচিত ছিল; যদিও তাতে মধুসূদনের সংকল্পের ব্যত্যয় হত না। নবীনকে আবার ফিরে ডেকে বললে, 'মাইনে চুকিয়ে নিয়ে যাও, কিন্তু এখন থেকে তোমাদের খরচপত্র জোগাতে পারব না।'

নবীন বললে, 'তা জানি, দেশে আমার অংশে যে জমি আছে তাই আমি চাষ করে খাব।'

বলেই অন্য কোনো কথার অপেক্ষা না করেই সে চলে গেল।

মানুষের প্রকৃতি নানা বিরুদ্ধ ধাতু মিশোল করে তৈরি, তার একটা প্রমাণ এই যে, মধুসূদন নবীনকে গভীরভাবে স্নেহ করে। তার অন্য দুই ভাই রজবপুরে বিষয়সম্পত্তির কাজ নিয়ে পাড়া-গাঁয়ে পড়ে আছে, মধুসূদন তাদের বড়ো একটা খোঁজ রাখে না। পিতার মৃত্যুর পর নবীনকে মধুসূদন কলকাতায় আনিয়ে পড়াশুনো করিয়েছে এবং তাকে বরাবর রেখেছে নিজের কাছে। সংসারের কাজে নবীনের স্বাভাবিক পটুতা। তার কারণ সে খুব খাঁটি। আর একটা হচ্ছে, তার কথাবার্তায় ব্যবহারে সকলেই তাকে ভালোবাসে। এ বাড়িতে যখন কোনো ঝগড়াঝাঁটি বাধে তখন নবীন সেটাকে সহজে মিটিয়ে দিতে পারে। নবীন সব কথায় হাসতে জানে, আর লোকদের শুধু কেবল সুবিচার করে না, এমন ব্যবহার করে যাতে প্রত্যেকেই মনে করে তারই 'পরে বুঝি ওর বিশেষ পক্ষপাত।

নবীনকে মধুসূদন যে মনের সঙ্গে স্নেহ করে তার একটা প্রমাণ, মোতির মাকে মধুসূদন দেখতে পারে না। যার প্রতি ওর মমতা তার প্রতি ওর একাধিপত্য চাই। সেই কারণে মধুসূদন কেবল কল্পনা করে মোতির মা যেন নবীনের মন ভাঙাতেই আছে। ছোটো ভাইয়ের প্রতি ওর যে পৈতৃক অধিকার, বাইরে থেকে এক মেয়ে এসে সেটাতে কেবলই বাধা ঘটায়। নবীনকে মধুসূদন যদি বিশেষ ভালো না বাসত তা হলে অনেক দিন আগেই মোতির মার নির্বাসনদণ্ড পাকা হত।

মধুসূদন ভেবেছিল এইটুকু কাজ সেরেই আবার একবার আপিসে চলে যাবে। কিন্তু কোনো-মতেই মনের মধ্যে জোর পেলে না। কুমু সেই যে চিঠিখানা ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল সেই ছবিটি তার মনে গভীর করে আঁকা হয়ে গেছে। সে এক আশ্চর্য ছবি, এমনতরো কিছু সে কখনো মনে করতে পারত না। একবার তার চিরকালের সন্দেহ-করা স্বভাববশত মধুসূদন ভেবেছিল নিশ্চয়ই কুমু চিঠিখানা আগেই পড়ে নিয়েছে, কিন্তু কুমুর মুখে এমন একটি নির্মল সত্যের দীপ্তি আছে যে, বেশিক্ষণ তাকে অবিশ্বাস করা মধুসূদনের পক্ষেও অসম্ভব।

কুমুকে কঠিনভাবে শাসন করবার শক্তি মধুসূদন দেখতে দেখতে হারিয়ে ফেলেছে, এখন তার নিজের তরফে যে-সব অপূর্ণতা তাই তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করেছে। তার বয়স বেশি এ কথা আজ সে ভুলতে পারছে না। এমন-কি তার যে চুলে পাক ধরেছে সেটা সে কোনোমতে গোপন করতে পারলে বাঁচে। তার রঙটা কালো, বিধাতার সেই অবিচার এতকাল পরে তাকে তীব্র করে বাজছে। কুমুর মনটা কেবলই তার মুষ্টি থেকে ফসকে যাচ্ছে, তার কারণ মধুসূদনের রূপ ও যৌবনের অভাব, এতে তার সন্দেহ নেই। এইখানেই সে নিরস্ত্র, সে দুর্বল। চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে যে এমন মেয়ে পাবে বিধাতা আগে থাকতেই যার কাছে তার হার মানিয়ে রেখে দিয়েছেন, এ সে মনেও করে নি অথচ এ কথা বলবারও জোর মনে নেই যে তার ভাগ্যে একজন সাধারণ মেয়ে হলেই ভালো হত, যার উপরে তার শাসন খাটত।

মধুসূদন কেবল একটা বিষয়ে টেক্কা দিতে পারে। সে তার ধনে। তাই আজ সকালেই ঘরে জহরি এসেছিল। তার কাছ থেকে তিনটে আংটি নিয়ে রেখেছে, দেখতে চায় কোন্‌টাতে কুমুর পছন্দ। সেই আংটির কৌটা তিনটি পকেটে নিয়ে সে তার শোবার ঘরে গেল। একটা চুনি, একটা পান্না, একটা হীরের আংটি। মধুসূদন মনে মনে একটি দৃশ্য কল্পনা-যোগে দেখতে পাচ্ছে। প্রথমে সে যেন চুনির আংটির কৌটা অতি ধীরে ধীরে খুললে, কুমুর লুব্ধ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার পরে বেরোল পান্না, তাতে চক্ষু আরো প্রসারিত। তার পর হীরে, তার বহুমূল্য উজ্জ্বলতায় রমণীর বিস্ময়ের সীমা নেই। মধুসূদন রাজকীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললে, 'তোমার যেটা ইচ্ছে পছন্দ করে নাও।' হীরেটাই কুমু যখন পছন্দ করলে তখন তার লুব্ধতার ক্ষীণ সাহস দেখে ঈষৎ হাস্য করে মধুসূদন তিনটে আংটিই কুমুর তিন আঙুলে পরিয়ে দিলে। তার পরেই রাত্রে শয়ন-মঞ্চের যবনিকা উঠল।

মধুসূদনের অভিপ্রায় ছিল এই ব্যাপারটা আজ রাত্রের আহারের পরে হবে। কিন্তু দুপুর-বেলাকার দুর্যোগের পর মধুসূদন আর সবুর করতে পারলে না। রাত্রের ভূমিকাটা আজ অপরাহ্ণে সেরে নেবার জন্যে অন্তঃপুরে গেল।

গিয়ে দেখে কুমু একটা টিনের তোরঙ্গ খুলে শোবার ঘরের মেজেতে বসে গোছাচ্ছে। পাশে জিনিসপত্র কাপড়চোপড় ছড়ানো।

'এ কী কাণ্ড! কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

'হাঁ।'

'কোথায়?'

'রজবপুরে।'

'তার মানে কী হল?'

'তোমার দেরাজ খোলা নিয়ে ঠাকুরপোদের শাস্তি দিয়েছ। সে শাস্তি আমারই পাওনা।'

'যেয়ো না' বলে অনুরোধ করতে বসা একেবারেই মধুসূদনের স্বভাববিরুদ্ধ। তার মনটা প্রথমেই বলে উঠল—যাক-না দেখি কতদিন থাকতে পারে। এক মুহূর্ত দেরি না করে হন হন করে ফিরে চলে গেল।

৩৬

মধুসূদন বাইরে গিয়ে নবীনকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, 'বড়োবউকে তোরা খেপিয়েছিস।'

'দাদা, কালই তো আমরা যাচ্ছি, তোমার কাছে ভয়ে ভয়ে ঢোঁক গিলে কথা কব না। আমি আজ এই স্পষ্ট বলে যাচ্ছি, বড়োবউরানীকে খেপাবার জন্যে সংসারে আর কারও দরকার হবে না—তুমি একাই পারবে। আমরা থাকলে তবু যদি-বা কিছু ঠাণ্ডা রাখতে পারতুম, কিন্তু সে তোমার সইল না।'

মধুসূদন গর্জন করে উঠে বললে, 'জ্যাঠামি করিস নে। রজবপুরে যাবার কথা তোরাই ওকে শিখিয়েছিস।'

'এ কথা ভাবতেই পারি নে তো শেখাব কি?'

'দেখ্, এই নিয়ে যদি ওকে নাচাস তোদের ভালো হবে না স্পষ্টই বলে দিচ্ছি।'

'দাদা, এ-সব কথা বলছ কাকে? যেখানে বললে কাজে লাগে বলো গে।'

'তোরা কিছু বলিস নি?'

'এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, কল্পনাও করি নি।'

'বড়োবউ যদি জেদ ধরে বসে তা হলে কী করবি তোরা?'

'তোমাকে ডেকে আনব। তোমার পাইক বরকন্দাজ পেয়াদা আছে, তুমি ঠেকাতে পার। তার পরে তোমার শত্রুপক্ষেরা এই যুদ্ধের সংবাদ যদি কাগজে রটায় তা হলে মেজোবউকে সন্দেহ করে বোসো না।'

মধুসূদন আবার তাকে ধমক দিয়ে বললে, 'চুপ কর্! বড়োবউ যদি রজবপুরে যেতে চায় তো যাক, আমি ঠেকাব না।'

'আমরা তাঁকে খাওয়াব কী করে?'

'তোমার স্ত্রীর গহনা বিক্রি করে। যা, যা বলছি! বেরো বলছি ঘর থেকে।'

নবীন বেরিয়ে গেল। মধুসূদন ওডিকলোন-ভিজনো পটি কপালে জড়িয়ে আবার একবার আপিসে যাবার সংকল্প মনে দৃঢ় করতে লাগল।

নবীনের কাছে মোতির মা সব কথা শুনে দৌড়ে গেল কুমুর শোবার ঘরে। দেখলে তখনো সে কাপড় চোপড় পাট করছে তোলবার জন্যে। বললে, 'এ কী করছ, বউরানী?'

'তোমাদের সঙ্গে যাব।'

'তোমাকে নিয়ে যাবার সাধ্য কী আমার!'

'কেন?'

'বড়োঠাকুর তা হলে আমাদের মুখ দেখবেন না।'

'তা হলে আমারও দেখবেন না।'

'তা সে যেন হল, আমরা যে বড়ো গরিব।'

'আমিও কম গরিব না, আমারও চলে যাবে।'

'লোকে যে বড়োঠাকুরকে নিয়ে হাসবে।'

'তা বলে আমার জন্যে তোমরা শাস্তি পাবে এ আমি সইব না।'

'কিন্তু দিদি, তোমার জন্যে তো শাস্তি নয়, এ আমাদের নিজের পাপের জন্যেই।'

'কিসের পাপ তোমাদের?'

'আমরাই তো খবর দিয়েছি তোমাকে।'

'আমি যদি খবর জানতে চাই তা হলে খবর দেওয়াটা অপরাধ?'

'কর্তাকে না জানিয়ে দেওয়াটা অপরাধ।'

'তাই ভালো, অপরাধ তোমরাও করেছ আমিও করেছি। একসঙ্গেই ফল ভোগ করব।'

'আচ্ছা বেশ, তা হলে বলে দেব তোমার জন্যে পাল্কি। বড়োঠাকুরের হুকুম হয়েছে তোমাকে বাধা দেওয়া হবে না। এখন তবে তোমার জিনিসগুলি গুছিয়ে দিই। ওগুলো নিয়ে যে ঘেমে উঠলে!'

দুজনে গোছাতে লেগে গেল।

এমন সময় কানে এল বাইরে জুতোর মচমচ ধ্বনি। মোতির মা দিল দৌড়।

মধুসূদন ঘরে ঢুকেই বললে, 'বড়োবউ, তুমি যেতে পারবে না।'

'কেন যেতে পারব না?'

'আমি হুকুম করছি বলে।'

'আচ্ছা, তা হলে যাব না। তার পরে আর কী হুকুম বলো।'

'বন্ধ করো তোমার জিনিস প্যাক করা।'

'এই বন্ধ করলুম।' বলে কুমু উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মধুসূদন বললে, 'শোনো, শোনো।'

তখনি কুমু ফিরে এসে বললে, 'কী বলো।'

বিশেষ কিছুই বলবার ছিল না। তবু একটু ভেবে বললে, 'তোমার জন্যে আংটি এনেছি।'

'আমার যে-আংটির দরকার ছিল সে তুমি পরতে বারণ করেছ, আর আমার আংটির দরকার নেই।'

'একবার দেখোই-না চেয়ে।'

মধুসূদন একে একে কৌটো খুলে দেখালে। কুমু একটি কথাও বললে না।

'এর যেটা তোমার পছন্দ সেইটেই তুমি পরতে পারো।'

'তুমি যেটা হুকুম করবে সেইটেই পরব।'

'আমি তো মনে করি তিনটেই তিন আঙুলে মানাবে।'

'হুকুম কর তিনটেই পরব।'

'আমি পরিয়ে দিই।'

'দাও পরিয়ে।'

মধুসূদন পরিয়ে দিলে। কুমু বললে, 'আর-কিছু হুকুম আছে?'

'বড়োবউ, রাগ করছ কেন?'

'আমি একটুও রাগ করছি নে।' বলে কুমু আবার ঘর থেকে চলে গেল।

মধুসূদন অস্থির হয়ে বলে উঠল, 'আহা, যাও কোথায়? শোনো, শোনো।'

কুমু তখনই ফিরে এসে বললে, 'কী বলো।'

ভেবে পেলে না কী বলবে। মধুসূদনের মুখ লাল হয়ে উঠল। ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল, 'আচ্ছা যাও।' রেগে বললে, 'দাও আংটিগুলো ফিরিয়ে দাও।'

তখনই কুমু তিনটে আংটি খুলে টিপায়ের উপর রাখলে।

মধুসূদন ধমক দিয়ে বললে, 'যাও চলে!'

কুমু তখনই চলে গেল।

এইবার মধুসূদন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে যে, সে আপিসে যাবেই। তখন কাজের সময় প্রায় উত্তীর্ণ। ইংরেজ কর্মচারীরা সকলেই চলে গেছে টেনিস খেলায়। উচ্চতন বড়োবাবুদের দল উঠি-উঠি করছে। এমন সময় মধুসূদন আপিসে উপস্থিত হয়ে একেবারে খুব কষে কাজে লেগে গেল। ছটা বাজল, সাতটা বাজল, আটটা বাজে, তখন খাতাপত্র বন্ধ করে উঠে পড়ল।

৩৭

এতদিন মধুসূদনের জীবনযাত্রায় কখনো কোনো খেই ছিঁড়ে যেত না। প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তই নিশ্চিত নিয়মে বাঁধা ছিল। আজ হঠাৎ একটা অনিশ্চিত এসে সব গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে। এই-যে আজ আপিস থেকে বাড়ির দিকে চলেছে, রাত্তিরটা যে ঠিক কী ভাবে প্রকাশ পাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মধুসূদন ভয়ে ভয়ে বাড়িতে এল, আস্তে আস্তে আহার করলে। আহার করে তখনি সাহস হল না শোবার ঘরে যেতে। প্রথমে কিছুক্ষণ বাইরের দক্ষিণের বারান্দায় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। শোবার সময় ন-টা যখন বাজল তখন গেল অন্তঃপুরে। আজ ছিল দৃঢ় পণ—যথাসময়ে বিছানায় শোবে, কিছুতেই অন্যথা হবে না। শূন্য শোবার ঘরে ঢুকেই মশারি খুলেই একেবারে ঝপ্ করে বিছানার উপরে পড়ল। ঘুম আসতে চায় না। রাত্রি যতই নিবিড় হয় ততই ভিতরকার উপবাসী জীবটা অন্ধকারে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। তখন তাকে তাড়া করবার কেউ নেই, পাহারাওয়ালারা সকলেই ক্লান্ত।

ঘড়িতে একটা বাজল, চোখে একটুও ঘুম নেই; আর থাকতে পারল না, বিছানা থেকে উঠে ভাবতে লাগল কুমু কোথায়? বঙ্কু ফরাশের উপর কড়া হুকুম, ফরাশখানা তালাচাবি দিয়ে বন্ধ। ছাদ ঘুরে এল, কেউ নেই। পায়ের জুতো খুলে ফেলে নীচের তলায় বারান্দা বেয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগল। মোতির মার ঘরের সামনে এসে মনে হল যেন কথাবার্তার শব্দ। হতে পারে, কাল চলে যাবে, আজ স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ চলছে। বাইরে চুপ করে দরজায় কান পেতে রইল। দুজনে

গুন গুন করে আলাপ চলছে। কথা শোনা যায় না, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল দুটি মেয়ের গলা। তবে তো বিচ্ছেদের পূর্বরাত্রে মোতির মায়ের সঙ্গে কুমুরই মনের কথা হচ্ছে। রাগে ক্ষোভে ইচ্ছে করতে লাগল লাথি মেরে দরজা খুলে ফেলে একটা কাণ্ড করে। কিন্তু নবীনটা তা হলে কোথায়? নিশ্চয় বাইরে।

অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার ঝিলমিল-দেওয়া রাস্তাটাতে লণ্ঠনে একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে. সেইখানে এসেই মধুসূদন দেখলে একখানা লাল শাল গায়ে জড়িয়ে শ্যামা দাঁড়িয়ে। তার কাছে লজ্জিত হয়ে মধুসূদন রেগে উঠল। বললে, 'কী করছ এত রাত্রে এখানে?'

শ্যামা উত্তর করলে, 'শুয়ে ছিলুম। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে ভয় হল, ভাবলুম বুঝি—'

মধুসূদন তর্জন করে বলে উঠল, 'আস্পর্ধা বাড়ছে দেখছি। আমার সঙ্গে চালাকি করতে চেয়ো না, সাবধান করে দিচ্ছি। যাও শুতে।'

শ্যামাসুন্দরী কয়দিন থেকে একটু একটু করে তার সাহসের ক্ষেত্র বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলছিল। আজ বুঝলে, অসময়ে অজায়গায় পা পড়েছে। অত্যন্ত করুণ মুখ করে একবার সে মধুসূদনের দিকে চাইলে, তার পরে মুখ ফিরিয়ে আঁচলটা টেনে চোখ মুছলে। চলে যাবার উপক্রম করে আবার সে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'চালাকি করব না ঠাকুরপো। যা দেখতে পাচ্ছি তাতে চোখে ঘুম আসে না। আমরা তো আজ আসি নি, কতকালের সম্বন্ধ, আমরা সইব কী করে?' বলে শ্যামা দ্রুতপদে চলে গেল।

মধুসূদন একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার পরে চলল বাইরের ঘরে। ঠিক একেবারে পড়ল চৌকিদারের সামনে, সে তখন টহল দিতে বেরিয়েছে। এমনি নিয়মের কঠিন জাল যে, নিজের বাড়িতে যে চুপি চুপি সঞ্চরণ করবে তার জো নেই। চারি দিকেই সতর্ক দৃষ্টির ব্যূহ। রাজাবাহাদুর এই রাত্রে বিছানা ছেড়ে খালি-পায়ে অন্ধকারে বাইরের বারান্দায় ভূতের মতো বেরিয়েছে এ যে একেবারে অভূতপূর্ব! প্রথমে দূর থেকে যখন চিনতে পারে নি, চৌকিদার বলে উঠেছিল, 'কোন্ হ্যায়?' কাছে এসে জিভ কেটে মস্ত প্রণাম করলে, বললে, 'রাজাবাহাদুর, কিছু হুকুম আছে?'

মধুসূদন বললে, 'দেখতে এলুম ঠিকমত চলছে কি না।' কথাটা মধুসূদনের পক্ষে অসংগত নয়।

তার পরে মধুসূদন বৈঠকখানাঘরে গিয়ে দেখে যা ভেবেছিল তাই, নবীন বসবার ঘরে গদির উপর তাকিয়া আঁকড়ে নিদ্রা দিচ্ছে। মধুসূদন ঘরে একটা গ্যাসের আলো জ্বেলে দিলে, তাতেও নবীনের ঘুম ভাঙল না। তাকে ঠেলা দিতেই ধড়ফড় করে জেগে সে উঠে বসল। মধুসূদন তার কোনোরকম কৈফিয়ত তলব না করেই বললে, 'এখনই যা, বড়োবউকে বল্ গে আমি তাকে শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছি।' বলে তখনই সে অন্তঃপুরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই কুমু শোবার ঘরে এসে প্রবেশ করলে। মধুসূদন তার মুখের দিকে চাইলে। সাদাসিধে একখানি লালপেড়ে শাড়ি পরা। শাড়ির প্রান্তটি মাথার উপরে টানা। এই নির্জন ঘরের অল্প আলোয় এ কী অপরূপ আবির্ভাব! কুমু ঘরের প্রান্তরে সোফাটির উপরে বসল।

মধুসূদন তখনই এসে বসল মেজের উপরে তার পায়ের কাছে। কুমু সংকুচিত হয়ে তাড়াতাড়ি ওঠবার চেষ্টা করবা মাত্র মধুসূদন হাতে ধরে তাকে টেনে বসালে; বললে, 'উঠো না, শোনো আমার কথা। আমাকে মাপ করো, আমি দোষ করেছি।'

মধুসূদনের এই অপ্রত্যাশিত বিনতি দেখে কুমু অবাক হয়ে রইল। মধুসূদন আবার বললে, 'নবীনকে মেজোবউকে রজবপুরে যেতে আমি বারণ করে দেব। তারা তোমার সেবাতেই থাকবে।'

কুমু কী যে বলবে কিছুই ভেবে পেলে না। মধুসূদন ভাবলে, নিজের মান খর্ব করে আমি বড়োবউয়ের মান ভাঙব। হাত ধরে মিনতি করে বললে, 'আমি এখনই আসছি। বলো তুমি চলে যাবে না।'

কুমু বললে, 'না, যাব না।'

মধুসূদন নীচে চলে গেল। মধুসূদন যখন ক্ষুদ্র হয়, কঠোর হয়, তখন সেটা কুমুদিনীর পক্ষে তেমন কঠিন নয়। কিন্তু আজ তার এই নম্রতা, এই তার নিজেকে খর্ব করা, এর সম্বন্ধে কুমুর যে কী উত্তর তা সে ভেবে পায় না। হৃদয়ের যে দান নিয়ে সে এসেছিল সে তো সব স্খলিত হয়ে পড়ে গেছে, আর তো তা ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে কাজ চলবে না। আবার সে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল, 'প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।'

খানিক বাদে মধুসূদন নবীন ও মোতির মাকে সঙ্গে নিয়ে কুমুর সামনে উপস্থিত করলে। তাদের সম্বোধন করে বললে, 'কাল তোমাদের রজবপুরে যেতে বলেছিলাম, কিন্তু তার দরকার নেই। কাল থেকে বড়োবউয়ের সেবায় আমি তোমাদের নিযুক্ত করে দিচ্ছি।'

শুনে ওরা দুজনে অবাক হয়ে গেল। একে তো এমন হুকুম প্রত্যাশা করে নি, তার পরে এত রাত্তিরে ওদের ডেকে এনে এ কথা বলবার জরুরি দরকার কী ছিল।

মধুসূদনের ধৈর্য সবুর মানছিল না। আজ রাত্তিরেই কুমুর মনকে ফেরাবার জন্যে উপায় প্রয়োগ করতে কার্পণ্য বা সংকোচ করতে পারলে না। এমন করে নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ সে জীবনে কখনো করে নি। সে যা চেয়েছিল তা পাবার জন্যে তার পক্ষে সবচেয়ে দুঃসাধ্য মূল্য সে দিলে। তার ভাষায় সে কুমুকে বুঝিয়ে দিলে, তোমার কাছে আমি অসংকোচে হার মানছি।

এইবার কুমুর মনে বড়ো একটা সংকোচ এল, সে ভাবতে লাগল এই জিনিসটাকে কেমন করে সে গ্রহণ করবে? এর বদলে কী আছে তার দেবার? বাইরে থেকে জীবনে যখন বাধা আসে তখন লড়াই করবার জোর পাওয়া যায়, তখন স্বয়ং দেবতাই হন সহায়। হঠাৎ সেই বাইরের বিরুদ্ধতা একেবারে নিরস্ত হলে যুদ্ধ থামে কিন্তু সন্ধি হতে চায় না। তখন বেরিয়ে পড়ে নিজের ভিতরের প্রতিকূলতা। কুমু হঠাৎ দেখতে পেলে মধুসূদন যখন উদ্ধত ছিল তখন তার সঙ্গে ব্যবহার অপ্রিয় হোক তবুও তা সহজ ছিল; কিন্তু মধুসূদন যখন নম্র হয়েছে তখন তার সঙ্গে ব্যবহার কুমুর পক্ষে বড়ো শক্ত হয়ে উঠল। এখন তার ক্ষুব্ধ অভিমানের আড়াল থাকে না, তার সেই ফরাশখানার আশ্রয় চলে যায়, এখন দেবতার কাছে হাত জোড় করবার কোনো মানে নেই।

মোতির মাকে কোনো ছুতোয় কুমু যদি রাখতে পারত তা হলে সে বেঁচে যেত। কিন্তু নবীন গেল চলে, হতবুদ্ধি মোতির মাও আস্তে আস্তে চলল তার পিছনে; দরজার কাছে এসে একবার মুখ আড় করে উদ্‌বিগ্নভাবে কুমুদিনীর মুখের দিকে চেয়ে গেল। স্বামীর প্রসন্নতার হাত থেকে এই মেয়েটিকে এখন কে বাঁচাবে?

মধুসূদন বললে, 'বড়োবউ, কাপড় ছেড়ে শুতে আসবে-না?'

কুমু ধীরে ধীরে উঠে পাশের নাবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলে—মুক্তির মেয়াদ যতটুকু পারে বাড়িয়ে নিতে চায়। সে ঘরে দেওয়ালের কাছে একটা চৌকি ছিল সেইটেতে বসে রইল। তার মনটা যেন নিজের মধ্যে নিজের অন্তরাল খুঁজছে। মধুসূদন মাঝে মাঝে দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকায় আর হিসেব করতে থাকে কাপড় ছাড়বার জন্যে কতটা সময় দরকার। ইতিমধ্যে আয়নাতে নিজের মুখটা দেখলে, মাথার তেলোর যে জায়গাটাতে কড়া চুলগুলো বেমানান রকম খাড়া হয়ে থাকে বৃথা তার উপরে কয়েকবার বুরুশের চাপ লাগালে, আর গায়ের কাপড়ে অনেকখানি দিলে ল্যাভেন্ডার ঢেলে।

পনেরো মিনিট গেল, বেশ-বদলের পক্ষে সে সময়টা যথেষ্ট। মধুসূদন চুপি চুপি একবার নাবার ঘরের দরজার কাছে কান দিয়ে দাঁড়াল, ভিতরে নড়াচড়ার কোনো শব্দ নেই—মনে ভাবলে কুমু হয়তো চুলটার বাহার করছে, খোঁপাটা নিয়ে ব্যস্ত। মেয়েরা সাজ করতে ভালোবাসে মধুসূদনের এ আন্দাজটা ছিল, অতএব সবুর করতেই হবে। আধঘণ্টা হল—মধুসূদন আর-একবার দরজার উপর কান লাগালে, এখনো কোনো শব্দ নেই। ফিরে এসে কেদারায় বসে পড়ে সামনের দেয়ালে বিলিতি যে ছবিটা টাঙানো ছিল তার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ এক সময় ধড়ফড় করে উঠে স্নানঘরের কাছে দাঁড়িয়ে ডাক দিলে, 'বড়োবউ, এখনো হয় নি?'

একটু পরেই আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। কুমুদিনী বেরিয়ে এল, যেন সে স্বপ্নে-পাওয়া। যে কাপড় পরা ছিল তাই আছে; এ তো রাত্রে শোবার সাজ নয়। গায়ে একখানা প্রায় পুরো হাতা-ওয়ালা ব্রাউন রঙের সার্জের জামা, একটা লালপেড়ে বাদামি রঙের আলোয়ানের আঁচল মাথার উপর টেনে-দেওয়া। দরজার একটা পাল্লায় বাঁ হাত রেখে যেন কী দ্বিধার ভাবে দাঁড়িয়ে রইল—একখানি অপরূপ ছবি! নিটোল গৌরবর্ণ হাতে মকরমুখো প্লেন সোনার বালা—সেকেলে ছাঁদের—বোধ হয় এককালে তার মায়ের ছিল। এই মোটা ভারী বালা তার সুকুমার হাতকে যে-ঐশ্বর্যের মর্যাদা দিয়েছে সেটি ওর পক্ষে এত সহজ যে, ঐ অলংকারটা ওর শরীরে একটুমাত্র আড়ম্বরের সুর দেয় নি। মধুসূদন ওকে আবার যেন নতুন করে দেখলে। ওর মহিমায় আবার সে বিস্মিত হল। মধুসূদনের চিরার্জিত সমস্ত সম্পদ এতদিন পরে শ্রীলাভ করেছে এ কথা না মনে করে সে থাকতে পারলে না। সংসারে যে-সব লোকের সঙ্গে মধুসূদনের সর্বদা দেখাসাক্ষাৎ তাদের অধিকাংশের চেয়ে নিজেকে ধনগৌরবে অনেক বড়ো মনে করা তার অভ্যাস। আজ গ্যাসের আলোতে শোবার ঘরের দরজার পাশে ঐ যে মেয়েটি স্তব্ধ দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে মধুসূদনের মনে হল, আমার যথেষ্ট ধন নেই—মনে হল, যদি রাজচক্রবর্তী সম্রাট হতুম তা হলেই ওকে এ ঘরে মানাত। যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলে এর স্বভাবটি জন্মাবধি লালিত একটি বিশুদ্ধ বংশমর্যাদার মধ্যে—অর্থাৎ এ যেন এর জন্মের পূর্ববর্তী বহু দীর্ঘকালকে অধিকার করে দাঁড়িয়ে। সেখানে বাইরে থেকে যে-সে প্রবেশ করতেই পারে না—সেখানেই আপন স্বাভাবিক স্বত্ব নিয়ে বিরাজ করছে বিপ্রদাস—তাকেও ঐ কুমুর মতোই একটি আত্মবিস্মৃত সহজ গৌরব সর্বদা ঘিরে রয়েছে।

মধুসূদন এই কথাটাই কিছুতে সহ্য করতে পারে না। বিপ্রদাসের মধ্যে ঔদ্ধত্য একটুও নেই, আছে একটা দূরত্ব। অতিবড়ো আত্মীয়ও যে হঠাৎ এসে তার পিঠ চাপড়িয়ে বলতে পারে 'কী হে, কেমন?' এ যেন অসম্ভব। বিপ্রদাসের কাছে মধুসূদন মনে মনে কী রকম খাটো হয়ে থাকে সেইটেতে তার রাগ ধরে। সেই একই সূক্ষ্ম কারণে কুমুর উপরে মধুসূদন জোর করতে পারছে না—আপন সংসারে যেখানে সব চেয়ে তার কর্তৃত্ব করবার অধিকার সেইখানেই সে যেন সব চেয়ে হটে গিয়েছে। কিন্তু এখানে তার রাগ হয় না—কুমুর প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ কুমুকে দেখে মধুসূদন স্পষ্টই বুঝলে কুমু তৈরি হয়ে আসে নি—একটা অদৃশ্য আড়ালের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কী সুন্দর! কী একটা দীপ্যমান শুচিতা, শুভ্রতা! যেন নির্জন তুষার-শিখরের উপরে নির্মল উষা দেখা দিয়েছে।

মধুসূদন একটু কাছে এগিয়ে এসে ধীর স্বরে বললে, 'শুতে আসবে না বড়োবউ?'

কুমু আশ্চর্য হয়ে গেল। সে নিশ্চয় মনে করেছিল মধুসূদন রাগ করবে, তাকে অপমানের কথা বলবে। হঠাৎ একটা চিরপরিচিত সুর তার মনে পড়ে গেল—তার বাবা স্নিগ্ধ গলায় কেমন করে তার মাকে বড়োবউ বলে ডাকতেন। সেইসঙ্গেই মনে পড়ল—মা তার বাবাকে কাছে আসতে বাধা দিয়ে কেমন করে চলে গিয়েছিলেন। এক মুহূর্তে তার চোখ ছলছলিয়ে এল—মাটিতে মধুসূদনের পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে উঠল, 'আমাকে মাপ করো।'

মধুসূদন তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে তুলে চৌকির উপরে বসিয়ে বললে, 'কী দোষ করেছ যে তোমাকে মাপ করব?'

কুমু বললে, 'এখনো আমার মন তৈরি হয় নি। আমাকে একটুখানি সময় দাও।'

মধুসূদনের মনটা শক্ত হয়ে উঠল; বললে, 'কিসের জন্যে সময় দিতে হবে বুঝিয়ে বলো।'

'ঠিক বলতে পারছি নে, কাউকে বুঝিয়ে বলা শক্ত—'

মধুসূদনের কণ্ঠে আর রস রইল না। সে বললে, 'কিছুই শক্ত না। তুমি বলতে চাও, আমাকে তোমার ভালো লাগছে না।'

কুমুর পক্ষে মুশকিল হল। কথাটা সত্যি অথচ সত্যি নয়। হৃদয় ভরে নৈবেদ্য দেবার জন্যেই সে পণ করে আছে, কিন্তু সে নৈবেদ্য এখনো এসে পৌঁছল না। মন বলছে, একটু সবুর করলেই,

পথে বাধা না দিলে, এসে পেঁছবে; দেরি যে আছে তাও না। তবুও এখনো ডালা যে শূন্য সে কথা মানতেই হবে।

কুমু বললে, 'তোমাকে ফাঁকি দিতে চাই নে বলেই বলছি, একটু আমাকে সময় দাও।'

মধুসূদন ক্রমেই অসহিষ্ণু হতে লাগল—কড়া করেই বললে, 'সময় দিলে কী সুবিধে হবে! তোমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীর ঘর করতে চাও!'

মধুসূদনের তাই বিশ্বাস। সে ভেবেছে বিপ্রদাসের অপেক্ষাতেই কুমুর সমস্ত ঠেকে আছে। দাদা যেমনটি চালাবে, ও তেমনি চলবে। বিদ্রূপের সুরে বললে, 'তোমার দাদা তোমার গুরু!'

কুমুদিনী তখনই মাটি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আমার দাদা আমার গুরু।'

'তাঁর হুকুম না হলে আজ কাপড় ছাড়বে না, বিছানায় শুতে আসবে না! তাই নাকি?'

কুমুদিনী হাতের মুঠো শক্ত করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'তা হলে টেলিগ্রাফ করে হুকুম আনাই—রাত অনেক হল।'

কুমু কোনো জবাব না দিয়ে ছাতে যাবার দরজার দিকে চলল।

মধুসূদন গর্জন করে ধমকে উঠে বললে, 'যেয়ো না বলছি।'

কুমু তখনই ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'কী চাও, বলো।'

'এখনই কাপড় ছেড়ে এসো।' ঘড়ি খুলে বললে, 'পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।'

কুমু তখনই নাবার ঘরে গিয়ে কাপড় ছেড়ে শাড়ির উপর একখানা মোটা চাদর জড়িয়ে চলে এল। এখন দ্বিতীয় হুকুমের জন্যে তার অপেক্ষা। মধুসূদন দেখে বেশ বুঝলে এও রণসাজ। রাগ বেড়ে উঠল, কিন্তু কী করতে হবে ভেবে পায় না। প্রবল ক্রোধের মুখেও মধুসূদনের মনে ব্যবস্থাবুদ্ধি থাকে; তাই সে থমকে গেল। বললে, 'এখন কী করতে চাও আমাকে বলো।'

'তুমি যা বলবে তাই করব।'

মধুসূদন হতাশ হয়ে বসে পড়ল চৌকিতে। ঐ চাদরে-জড়ানো মেয়েটিকে দেখে মনে হল, এ যেন বিধবার মূর্তি—ওর স্বামী আর ওর মাঝখানে যেন একটা নিস্তব্ধ মৃত্যুর সমুদ্র। তর্জন করে এ সমুদ্র পার হওয়া যায় না। পালে কোন্ হাওয়া লাগলে তরী ভাসবে? কোনোদিন কি ভাসবে?

চুপ করে বসে রইল। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ ছাড়া ঘরে একটুও শব্দ নেই। কুমুদিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না—আবার ফিরে বাইরে ছাতের অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তার মোড় থেকে একটা মাতালের গদ্‌গদ কণ্ঠের গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, আর প্রতিবেশীর আস্তাবলে একটা কুকুরের বাচ্ছাকে বেঁধে রেখেছে—রাত্রির শান্তি ঘুলিয়ে দিয়ে উঠছে তারই অশ্রান্ত আর্তনাদ।

সময় একটা অতলস্পর্শ গর্তের মতো শূন্য হয়ে যেন হাঁ করে আছে। মধুসূদনের সংসারের কলের সমস্ত চাকাই যেন বন্ধ। কাল তার আপিসের অনেক কাজ, ডাইরেক্‌টারদের মিটিং—কতক-গুলো কঠিন প্রস্তাব অনেকের বাধা সত্ত্বেও কৌশলে পাস করিয়ে নিতে হবে। সে-সমস্ত জরুরি ব্যাপার আজ তার কাছে একেবারে ছায়ার মতো। আগে হলে কালকের দিনের কার্যপ্রণালী আজ রাত্রে নোটবইয়ে টুকে রাখত। সব চিন্তা দূর হয়ে গেল, জগতে যে কঠিন সত্য সুনিশ্চিত সে হচ্ছে চাদর দিয়ে ঢাকা ঐ মেয়ে, ঘরের থেকে বেরিয়ে যাবার পথে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে। খানিক বাদে মধুসূদন একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, ঘরটা যেন ধ্যান ভেঙে চমকে উঠল। দ্রুত চৌকি থেকে উঠে কুমুর কাছে গিয়ে বললে, 'বড়োবউ, তোমার মন কি পাথরে গড়া?'

ঐ বড়োবউ শব্দটা কুমুর মনে মন্ত্রের মতো কাজ করে। নিজের মধ্যে তার মায়ের জীবনের অনুবৃত্তি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই ডাকে তার মা কতদিন কত সহজে সাড়া দিয়েছিলেন, তারই অভ্যাসটা যেন কুমুরও রক্তের মধ্যে। তাই চকিতে সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। মধুসূদন গভীর কাতরতার সঙ্গে বললে, 'আমি তোমার অযোগ্য, কিন্তু আমাকে কি দয়া করবে না?'

কুমুদিনী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'ছি ছি অমন করে বোলো না।' মাটিতে পড়ে মধুসূদনের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'আমি তোমার দাসী, আমাকে তুমি আদেশ করো।'

মধুসূদন তাকে হাত ধরে তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, বললে, 'না, তোমাকে আদেশ করব না, তুমি আপন ইচ্ছাতে আমার কাছে এসো।'

কুমুদিনী মধুসূদনের বাহুবন্ধনে হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করলে না। মধুসূদন রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললে, 'না, তোমাকে আদেশ করব না, তবু তুমি আমার কাছে এসো।' এই বলে কুমুদিনীকে ছেড়ে দিলে।

কুমুদিনীর গৌরবর্ণ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। সে চোখ নিচু করে বললে, 'তুমি আদেশ করলে আমার কর্তব্য সহজ হয়। আমি নিজে ভেবে কিছু করতে পারি নে।'

'আচ্ছা, তুমি তোমার ঐ গায়ের চাদরখানা খুলে ফেলো— ওটাকে আমি দেখতে পারছি নে।'

সসংকোচে কুমুদিনী চাদরখানা খুলে ফেললে। গায়ে ছিল একখানি ডুরে শাড়ি, সরু পাড়ের। কালো ডোরার ধারাগুলি কুমুদিনীর তনুদেহটিকে ঘিরে, যেন তারা রেখার ঝরনা— থেমে আছে মনে হয় না, কেবলই যেন চলছে— যেন কোনো একটি কালো দৃষ্টি আপন অশ্রান্ত গতির চিহ্ন রেখে রেখে ওর অঙ্গকে ঘিরে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে, কিছুতে শেষ করতে পারছে না। মুগ্ধ হয়ে গেল মধুসূদন, অথচ সেই মুহূর্তে একটু লক্ষ না করে থাকতে পারলে না যে, ঐ শাড়িটি এখানকার দেওয়া নয়। কুমুদিনীকে যতই মানাক-না কেন, এর দাম তুচ্ছ এবং এটা ওর বাপের বাড়ির। ঐ নাবার ঘরের সংলগ্ন কাপড় ছাড়বার ঘরে আছে দেরাজওয়ালা মেহগিনি কাঠের মস্ত আলমারি, তার আয়না-দেওয়া পাল্লা— বিবাহের পূর্ব হতেই নানা রকমের দামি কাপড়ে ঠাসা। সেগুলির উপরে লোভ নেই— মেয়ের এত গর্ব! মনে পড়ে গেল সেই তিনটে আংটির কথা, অসহ্য ঔদাসীন্যে তাকে কুমু গ্রহণ করে নি, অথচ একটা লক্ষ্মীছাড়া নীলার আংটির জন্যে কত আগ্রহ! বিপ্রদাস আর মধুসূদনের মধ্যে কুমুর মমতার কত মূল্যভেদ! চাদর খোলবা মাত্র এই সমস্ত কথা দমকা ঝড়ের মতো মধুসূদনকে প্রকাণ্ড ধাক্কা দিলে। কিন্তু হায় রে, কী সুন্দর, কী আশ্চর্য সুন্দর! আর এই দৃপ্ত অবজ্ঞা, সেও যেন ওর অলংকার। এই মেয়েই তো পারে ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করতে। সহজ সম্পদে মহীয়সী হয়ে জন্মেছে— ওকে ধনের দাম কষতে হয় না, হিসেব রাখতে হয় না— মধুসূদন ওকে কী দিয়ে লোভ দেখাতে পারে!

মধুসূদন বললে, 'যাও, তুমি শুতে যাও।'

কুমু ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল— নীরব প্রশ্ন এই যে, 'তুমি আগে বিছানায় যাবে না?'

মধুসূদন দৃঢ়স্বরে পুনরায় বললে, 'যাও, আর দেরি কোরো না।' কুমু বিছানায় যখন প্রবেশ করলে মধুসূদন সোফার উপরে বসে বললে, 'এইখানেই বসে রইলুম, যদি আমাকে ডাক তবেই যাব। বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করতে রাজি আছি।'

কুমুর সমস্ত গা এল ঝিম্ ঝিম্ করে— এ কী পরীক্ষা তার! কার দরজায় সে আজ মাথা কুটবে? দেবতা তো তাকে সাড়া দিলেন না। যে পথ দিয়ে সে এখানে এল সে তো একেবারেই ভুল পথ। বিছানায় বসে বসে মনে মনে সে বললে, 'ঠাকুর, তুমি আমাকে কখনো ভোলাতে পার না, এখনো তোমাকে বিশ্বাস করব। ধ্রুবকে তুমিই বনে এনেছিলে, বনের মধ্যে তাকে দেখা দেবে বলে।'

সেই নিস্তব্ধ ঘরে আর শব্দ নেই; রাস্তার মোড়ে সেই মাতালটার গলা শোনা যায় না; কেবল সেই বন্দী কুকুরটা যদিও শ্রান্ত তবু মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে উঠছে।

অল্প সময়কেও অনেক সময় বলে মনে হল, স্তব্ধতার ভারগ্রস্ত প্রহর যেন নড়তে পারছে না। এই কি তার দাম্পত্যের অনন্তকালের ছবি? দু পারে দুজনে নীরবে বসে— রাত্রির শেষ নেই— মাঝখানে একটা অলঙ্ঘনীয় নিস্তব্ধতা! অবশেষে এক সময়ে কুমু তার সমস্ত শক্তিকে সংহত করে নিয়ে বিছানা থেকে বেরিয়ে এসে বললে, 'আমাকে অপরাধিনী কোরো না।'

মধুসূদন গম্ভীরকণ্ঠে বললে, 'কী চাও বলো, কী করতে হবে?' শেষ কথাটুকু পর্যন্ত একেবারে নিংড়ে বের করে নিতে চায়।

কুমু বললে, 'শুতে এসো।'

কিন্তু একেই কি বলে জিত?

৩৮

পরের দিন সকালে মোতির মা যখন কুমুর জন্যে এক বাটি দুধ নিয়ে এল, দেখলে কুমুর দুই চোখ লাল, ফুলে আছে, মুখের রঙ হয়েছে পাঁশের মতো। সকালে ছাদের যে কোণে আসন পেতে পুব দিকে মুখ করে সে মানসিক পূজায় বসে, ভেবেছিল সেইখানে কুমুকে দেখতে পাবে। কিন্তু আজ সেখানে নেই, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই যে একটুখানি ঢাকা ছাদ, সেইখানেই দেয়ালের গায়ে অবসন্নভাবে ঠেসান দিয়ে সে মাটিতে বসে। আজ বুঝি ঠাকুরের উপরে রাগ করেছে। নিরপরাধ ছেলেকে নিষ্ঠুর বাপ যখন অকারণ মারে তখন সে যেমন কিছুই বুঝতে পারে না, অভিমান করে আঘাত গায়ে পেতে নেয়, প্রতিবাদ করবারও চেষ্টা করতে মুখে বাধে, ঠাকুরের 'পরে কুমুর আজ সেইরকম ভাব। যে আহ্বানকে সে দৈব বলে মেনেছিল, সে কি এই অশুচিতার মধ্যে, এই আন্তরিক অসতীত্বে? ঠাকুর নারীবলি চান বলেই শিকার ভুলিয়ে এনেছেন নাকি; যে শরীরটার মধ্যে মন নেই সেই মাংসপিণ্ডকে করবেন তাঁর নৈবেদ্য? আজ কিছুতে ভক্তি জাগল না। এতদিন কুমু বার বার করে বলেছে, আমাকে তুমি সহ্য করো—আজ বিদ্রোহিণীর মন বলছে, তোমাকে আমি সহ্য করব কী করে? কোন্ লজ্জায় আনব তোমার পূজা? তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রি করে দিলে কোন্ দাসীর হাটে—যে হাটে মাছমাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়, যেখানে নির্মাল্য নেবার জন্যে কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজার অপেক্ষা করে না, ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।

মোতির মা যখন দুধ খাবার জন্যে অনুরোধ করলে, কুমু বললে, 'থাক্।'

মোতির মা বললে, 'কেন, থাকবে কেন? আমার দুধের বাটির অপরাধ কী?'

কুমু বললে, 'এখনো স্নান করি নি, পূজা করি নি।'

মোতির মা বললে, 'যাও তুমি স্নান করতে, আমি অপেক্ষা করে থাকব।'

কুমু স্নান সেরে এল। মোতির মা ভাবলে এইবার সে খোলা ছাদের কোণটাতে গিয়ে বসবে। কুমু মুহূর্তের জন্যে অভ্যাসের টানে ছাদের দিকে যেতে পা বাড়িয়েছিল, গেল না, ফিরে আবার সেই মাটিতে এসে বসল। তার মন তৈরি ছিল না।

মোতির মাকে কুমু জিজ্ঞাসা করলে, 'দাদার চিঠি কি আসে নি?'

চিঠি খুব সম্ভব এসেছে মনে করেই আজ খুব ভোরে মোতির মা নিজে লুকিয়ে আপিসঘরে গিয়ে চিঠির দেরাজটা টানতে গিয়ে দেখলে সেটা চাবি দিয়ে বন্ধ। অতএব এখন থেকে চুরির উপর বাটপাড়ি করবার রাস্তা আটক রইল।

মোতির মা বললে, 'ঠিক বলতে তো পারি নে, খবর নিয়ে দেখব।'

এমন সময় হঠাৎ শ্যামা এসে উপস্থিত; বললে, 'বউ, তোমাকে এমন শুকনো দেখি যে, অসুখ করে নি তো?'

কুমু বললে, 'না।'

'বাড়ির জন্যে মনটা কেমন করছে। আহা, তা তো হতেই পারে। তা, তোমার দাদা তো আসছেন, দেখা হবে।'

কুমু চমকে উঠে শ্যামার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলে।

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, 'এ খবর তুমি কোথায় পেলে বকুলফুল?'

'ঐ শোনো! এ তো সবাই জানে। আমাদের রান্নাঘরের পার্বতী যে বললে, ওঁর বাপের বাড়ির সরকার এসেছিল রাজাবাহাদুরের কাছে বউয়ের খবর নিতে। তার কাছে শুনেছে, চিকিৎসার জন্যে বউয়ের দাদা আজকালের মধ্যেই কলকাতায় আসছেন।'

কুমু উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তাঁর ব্যামো কি বেড়েছে?'

'তা বলতে পারি নে। তবে এমন-কিছু ভাবনার কথা নেই, তা হলে শুনতুম।'

শ্যামা বুঝেছিল ওর দাদার খবর মধুসূদন কুমুকে দেয় নি, যে বউয়ের মন পায় নি পাছে সে বাড়িমুখো হয়ে আরও অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কুমুর মনটাকে উসকিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার দাদার মতো মানুষ হয় না এই কথা সবার কাছেই শুনি। বকুলফুল, চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে, ভাঁড়ার দিতে হবে। আপিসের রান্না চড়াতে দেরি হলে মুশকিল বাধবে।'

মোতির মা দুধের বাটিটা আর-একবার কুমুর কাছে এগিয়ে নিয়ে বললে, 'দিদি, দুধ ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে ফেলো লক্ষ্মীটি।'

এবার কুমু দুধ খেতে আপত্তি করলে না।

মোতির মা কানে কানে জিজ্ঞাসা করলে, 'ভাঁড়ারঘরে যাবে আজ?'

কুমু বললে, 'আজ থাক্‌—গোপালকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও।'

একটা কালো কঠোর ক্ষুধিত জরা বাহির থেকে কুমুকে গ্রাস করছে রাহুর মতো। যে পরিণত বয়স শান্ত স্নিগ্ধ শুভ্র সুগম্ভীর, এ তো তা নয়; যা লালায়িত, যার সংযমের শক্তি শিথিল, যার প্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয়, তারই স্বেদাক্ত স্পর্শে কুমুর এত বিতৃষ্ণা। ওর স্বামীর বয়স বেশি বলে কুমুর কোনো আক্ষেপ ছিল না, কিন্তু সেই বয়স নিজের মর্যাদা ভুলেছে বলে তার এত পীড়া। সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন একটা ফলের মতো, আলোহাওয়ায় মুক্তির মধ্যে সে পাকে, কাঁচা ফলকে জাঁতায় পিষলেই তো পাকে না। সময় পেল না বলেই আজ ওদের সম্বন্ধ কুমুকে এমন করে মারছে, এত অপমান করছে। কোথায় পালাবে! মোতির মাকে ঐ যে বললে, গোপালকে ডেকে দাও, সে এই পালাবার পথ খোঁজা—বৃদ্ধ অশুচিতার কাছ থেকে নবীন নির্মলতার মধ্যে, দূষিত নিশ্বাসবাষ্প থেকে ফুলের বাগানের হাওয়ায়।

একটা পাতলা তুলো-ভরা ছিটের জামা গায়ে দিয়ে হাবলু সিঁড়ির দরজার কাছে এসে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল। ওর মায়ের মতোই বড়ো বড়ো কালো চোখ, তেমনিই জলভরা মেঘের মতো সরস শামলা রঙ, গাল দুটো ফুলো ফুলো, প্রায় ন্যাড়া করে চুল ছাঁটা।

কুমু উঠে গিয়ে সংকুচিত হাবলুকে টেনে এনে বুকে চেপে ধরলে; বললে, 'দুষ্টু ছেলে, এ দুদিন আস নি কেন?'

হাবলু কুমুর গলা জড়িয়ে ধরে কানে কানে বললে, 'জ্যাঠাইমা, তোমার জন্যে কী এনেছি বলো দেখি?'

কুমু তার গালে চুমো খেয়ে বললে, 'মানিক এনেছ গোপাল।'

'আমার পকেটে আছে।'

'আচ্ছা, তবে বের করো।'

'তুমি বলতে পারলে না।'

'আমার বুদ্ধি নেই, যা চোখে দেখি তাও বুঝতে পারি নে, যা না দেখি তা আরও ভুল বুঝি।'

তখন হাবলু খুব আস্তে আস্তে পকেট থেকে ব্রাউন কাগজের একটা পুঁটুলি বের করে কুমুর কোলের উপর রেখে দৌড়ে পালাবার উপক্রম করলে।

'না, তোমাকে পালাতে দেব না।'

পুঁটুলিটা হাত দিয়ে চাপা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে হাবলু বললে, 'তা হলে এখন দেখো না।'

'না, ভয় নেই, তুমি চলে গেলে তখন খুলব।'

'আচ্ছা জ্যাঠাইমা, তুমি জটাইবুড়িকে দেখেছ?'

'কী জানি, হয়তো দেখে থাকব, কিন্তু চিনতে সময় লাগে।'

'একতলায় উঠোনের পাশে কয়লার ঘরে সন্ধের সময় চামচিকের পিঠে চড়ে সে আসে।'

'চামচিকের পিঠে চড়ে সে আসে!'

'ইচ্ছে করলেই সে খুব ছোট্টো হতে পারে, চোখে প্রায় দেখাই যায় না।'

'সেই মন্তরটা তার কাছে শিখে নিতে হবে তো।'

'কেন জ্যাঠাইমা?'

'আমি যদি পালাবার জন্যে কয়লার ঘরে ঢুকি তবুও যে আমাকে দেখতে পাওয়া যায়।'

হাবলু এ কথাটার কোনো মানে বুঝতে পারলে না। বললে, 'কয়লার মধ্যে সিঁদুরের কৌটো লুকিয়ে রেখেছে। সেই সিঁদুর কোথা থেকে এনেছে জান?'

'বোধ হয় জানি।'

'আচ্ছা, বলো দেখি।'

'ভোরবেলাকার মেঘের ভিতর থেকে।'

হাবলু থমকে গেল। তাকে ভাবিয়ে দিলে। বিশেষ-সংবাদদাতা তাকে সাগরপারের দৈত্যপুরীর কথা বলেছিল। কিন্তু জ্যাঠাইমার কথাটা মনে হল বিশ্বাসযোগ্য, তাই কোনো বিরুদ্ধ তর্ক না তুলে বললে, 'যে মেয়ে সেই কৌটো খুঁজে বের করে সিঁদুরটিপ কপালে পরবে সে হবে রাজরানী।'

'সর্বনাশ! কোনো হতভাগিনী খবর পেয়েছে নাকি?'

'সেজোপিসিমার মেয়ে খুদি জানে। ঝুড়ি নিয়ে ছন্নু যখন সকালে কয়লা বের করতে যায় রোজ খুদি সেইসঙ্গে যায়—ও একটুও ভয় করে না।'

'ও যে ছেলেমানুষ, তাই রাজরানী হতেও ভয় নেই।'

বাইরে ঠান্ডা উত্তরে হাওয়া দিচ্ছিল তাই মোতিকে নিয়ে কুমু ঘরে গেল; সেখানে সোফায় বসে ওকে কোলে তুলে নিলে। পাশের তেপাইয়ে ছোটো রুপোর থালিতে ছিল শীতকালের ফুল—গাঁদা, কুন্দ, দোপাটি, জবা। প্রতিদিনের জোগানমত এই ফুলই মালীর তোলা। কুমু ছাদের কোণে বসে সূর্যোদয়ের দিকে মুখ করে দেবতাকে উৎসর্গ করে দেবে বলে এরা অপেক্ষা করে আছে। আজ তার সেই অনিবেদিত ফুল থালাসুদ্ধ নিয়ে সে হাবলুর কাছে ধরল; বললে, 'নেবে ফুল?'

'হাঁ, নেব।'

'কী করবে বলো তো?'

'পুজো-পুজো খেলব।'

কুমুর কোমরে একটা সিল্কের রুমাল গোঁজা ছিল, সেইটেতে ফুলগুলি বেঁধে দিয়ে ওকে চুমো খেয়ে বললে, 'এই নাও।' মনে মনে ভাবলে, 'আমারও পুজো-পুজো খেলা হল।' বললে, 'গোপাল, এর মধ্যে কোন্ ফুল তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে, বলো তো?'

হাবলু বললে, 'জবা।'

'কেন জবা ভালো লাগে বলব?'

'বলো দেখি।'

'ও যে ভোর না হতেই জটাইবুড়ির সিঁদুরের কৌটো থেকে রঙ চুরি করেছে।'

হাবলু খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে ভাবলে। হঠাৎ বলে উঠল, 'জ্যাঠাইমা, জবাফুলের রঙ ঠিক তোমার শাড়ির এই লাল পাড়ের মতো।' এইটুকুতে ওর মনের সব কথা বলা হয়ে গেল।

এমন সময় হঠাৎ পিছনে দেখে মধুসূদন। পায়ের শব্দ পাওয়া যায় নি। এখন অন্তঃপুরে আসবার সময় নয়। এই সময়টাতে বাইরের আপিসঘরে ব্যাবসাঘটিত কর্মের যত উচ্ছিষ্ট পরিশিষ্ট এসে জোটে; এই সময় দালাল আসে, উমেদার আসে, যত রকম খুচরো খবর ও কাগজপত্র নিয়ে সেক্রেটারি আসে। আসল কাজের চেয়ে এই সব উপরি-কাজের ভিড় কম নয়।

৩৯

যে ভিক্ষুকের ঝুলিতে কেবল তুষ জমেছে চাল জোটে নি, তারই মতো মন নিয়ে আজ সকালে মধুসূদন খুব রুক্ষভাবেই বাইরে চলে গিয়েছিল। কিন্তু অতৃপ্তির আকর্ষণ বড়ো প্রচণ্ড। বাধাতেই বাধার উপর টেনে আনে।

ওকে দেখেই হাবলুর মুখ শুকিয়ে গেল, বুক উঠল কেঁপে, পালাবার উপক্রম করলে। কুমু জোর করে চেপে ধরলে, উঠতে দিলে না।

সেটা মধুসূদন বুঝতে পারলে। হাবলুকে খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, 'এখানে কী করছিস? পড়তে যাবি নে?'

গুরুমশায়ের আসবার সময় হয় নি এ কথা বলবার সাহস হাবলুর ছিল না— ধমকটাকে নিঃশব্দে স্বীকার করে নিয়ে মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে উঠে চলল।

তাকে বাধা দেবার জন্যে উদ্যত হয়েই কুমু থেমে গেল। বললে, 'তোমার ফুল ফেলে গেলে যে, নেবে না?' বলে সেই রুমালের পুঁটুলিটা ওর সামনে তুলে ধরলে। হাবলু না নিয়ে ভয়ে ভয়ে তার জ্যাঠামশায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মধুসূদন ফস্ করে পুঁটুলিটা কুমুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ রুমালটা কার?'

মুহূর্তের মধ্যে কুমুর মুখ লাল হয়ে উঠল; বললে, 'আমার।'

এ রুমালটা যে সম্পূর্ণই কুমুর, তাতে সন্দেহ নেই— অর্থাৎ বিবাহের পূর্বের সম্পত্তি। এতে রেশমের কাজ করা যে পাড়টা সেও কুমুর নিজের রচনা।

ফুলগুলো বের করে মাটিতে ফেলে মধুসূদন রুমালটা পকেটে পুরলে; বললে, 'এটা আমিই নিলুম— ছেলেমানুষ এ নিয়ে কী করবে? যা তুই।'

মধুসূদনের এই রূঢ়তায় কুমু একেবারে স্তম্ভিত। ব্যথিতমুখে হাবলু চলে গেল, কুমু কিছুই বললে না।

তার মুখের ভাব দেখে মধুসূদন বললে, 'তুমি তো দানসত্র খুলে বসেছ, ফাঁকি কি আমারই বেলায়? এ রুমাল রইল আমারই; মনে থাকবে কিছু পেয়েছি তোমার কাছ থেকে।'

মধুসূদন যা চায় তা পাবার বিরুদ্ধে ওর স্বভাবের মধ্যেই বাধা।

কুমু চোখ নিচু করে সোফার প্রান্তে নীরবে বসে রইল। শাড়ির লাল পাড় তার মাথা ঘিরে মুখটিকে বেষ্টন করে নেমে এসেছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে নেমেছে তার ভিজে এলো চুল। কণ্ঠের নিটোল কোমলতাকে বেষ্টন করে আছে এক গাছি সোনার হার। এই হারটি ওর মায়ের, তাই সর্বদা পরে থাকে। তখনো জামা পরে নি, ভিতরে কেবল একটি শেমিজ, হাত দুখানি খোলা, কোলের উপরে স্তব্ধ। অতি সুকুমার শুভ্র হাত, সমস্ত দেহের বাণী ঐখানে যেন উদ্‌বেল। মধুসূদন নতনেত্রে অভিমানিনীকে চেয়ে চেয়ে দেখল, আর চোখ ফেরাতে পারলে না মোটা সোনার কাঁকন-পরা ঐ দুখানি হাতের থেকে। সোফায় ওর পাশে বসে একখানি হাত টেনে নিতে চেষ্টা করলে— অনুভব করলে বিশেষ একটা বাধা। কুমু হাত সরাতে চায় না— ওর হাত দিয়ে চাপা আছে একটা কাগজের মোড়ক।

মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, 'ঐ কাগজে কী মোড়া আছে?'

'জানি নে।'

'জান না, তার মানে কী?'

'তার মানে আমি জানি নে।'

মধুসূদন কথাটা বিশ্বাস করলে না; বললে, 'আমাকে দাও, আমি দেখি।'

কুমু বললে, 'ও আমার গোপন জিনিস, দেখাতে পারব না।'

তীরের মতো তীক্ষ্ন একটা রাগ এক মুহূর্তে মধুসূদনের মাথায় চড়ে উঠল। বললে, 'কী! আস্পর্ধা তো কম নয়।' বলে জোর করে সেই কাগজের মোড়ক কেড়ে নিয়ে খুলে ফেললে—দেখে যে কিছুই নয়, কতকগুলি এলাচদানা। মাতার সস্তা ব্যবস্থায় হাবলুর জন্যে যে জলখাবার বরাদ্দ তার মধ্যে এইটেই বোধ করি সবচেয়ে হাবলুর পক্ষে লোভনীয়—তাই সে যত্ন করে মুড়ে এনেছিল।

মধুসূদন অবাক! ব্যাপারখানা কী! ভাবলে বাপের বাড়িতে এইরকম জলখাবারই কুমুর অভ্যস্ত—তাই লুকিয়ে আনিয়ে নিয়েছে, লজ্জায় প্রকাশ করতে চায় না। মনে মনে হাসলে; ভাবলে, লক্ষ্মীর দান গ্রহণ করতে সময় লাগে। ধাঁ করে একটা প্ল্যান মাথায় এল। দ্রুত উঠে বাইরে গেল চলে।

কুমু তখন দেরাজ খুলে বের করলে তার একটি ছোটো চৌকো চন্দনকাঠের বাক্স, তার মধ্যে এলাচদানাগুলি রেখে তার দাদাকে চিঠি লিখতে বসল। দু-চার লাইন লেখা হতেই মধুসূদন ঘরে এসে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি চিঠি চাপা দিয়ে কুমু শক্ত হয়ে বসল। মধুসূদনের হাতে রুপোয় সোনায় মিনের কাজ-করা হাতল-দেওয়া একটি ফলদানি, তার উপরে ফুলকাটা সুগন্ধি একটি রেশমের রুমাল। হাসিমুখে ডেস্কে সেটি কুমুর সামনে রাখলে। বললে, 'খুলে দেখো তো।'

কুমু রুমালটা তুলে নিয়ে দেখে সেই দামি ফলদানিতে কানায়-কানায় ভরা এলাচদানা। যদি একলা থাকত হেসে উঠত। কোনো কথা না বলে কুমু গম্ভীর হয়ে চুপ করে রইল। এর চেয়ে হাসা ভালো ছিল।

মধুসূদন বললে, 'এলাচদানা লুকিয়ে খাবার কী দরকার? এতে লজ্জা কী বলো! রোজ আনিয়ে দেব—কত চাও? আমাকে আগে বললে না কেন?'

কুমু বললে, 'তুমি পারবে না আনিয়ে দিতে।'

'পারব না! অবাক করলে তুমি।'

'না, পারবে না।'

'অসম্ভব দাম নাকি এর!'

'হাঁ, টাকায় মেলে না।'

শুনেই মধুর মাথায় চট করে একটা সন্দেহ জাগল—বললে, 'তোমার দাদা পার্সেল করে পাঠিয়েছেন বুঝি?'

এ প্রশ্নের জবাব দিতে কুমুর ইচ্ছে হল না। ফলদানিটা ঠেলে দিয়ে চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। মধুসূদন হাত ধরে আবার জোর করে তাকে বসিয়ে দিলে।

মধুসূদনকে কোনো কথা বলতে না দিয়েই কুমু তাকে প্রশ্ন করলে, 'দাদার বাড়ি থেকে তোমার কাছে লোক এসেছিল তাঁর খবর নিয়ে?'

এ কথাটা কুমু আগেই শুনে ফেলেছে জেনে মধুর মন ভারি বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে, 'সেই খবর দেবার জন্যেই তো আজ সকালে তোমার কাছে এসেছি।' বলা বাহুল্য এটা মিথ্যে কথা।

'দাদা কবে আসবেন?'

'হপ্তাখানেকের মধ্যে।'

মধু নিশ্চিত জানত কালই বিপ্রদাস আসবে, 'হপ্তাখানেক' কথাটা ব্যবহার করে খবরটাকে অনির্দিষ্ট করে রেখে দিলে।

'দাদার শরীর কি আরো খারাপ হয়েছে?'

'না, তেমন কিছু তো শুনলুম না।'

এ কথাটার মধ্যেও একটুখানি পাশ-কাটানো ছিল। বিপ্রদাস চিকিৎসার জন্যই কলকাতায় আসছে—তার অর্থ, শরীর অন্তত ভালো নেই।

'দাদার চিঠি কি এসেছে?'

'চিঠির বাক্স তো এখনো খুলি নি, যদি থাকে তোমাকে পাঠিয়ে দেব।'

কুমু মধুসূদনের কথা অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করে নি, সুতরাং এ কথাটাও মেনে নিলে।

'দাদার চিঠি এসেছে কি না একবার খোঁজ করবে কি?'

'যদি এসে থাকে, খাওয়ার পরে দুপুরবেলা নিজেই নিয়ে আসব।'

কুমু অধৈর্য দমন করে নীরবে সম্মত হল। তখন আর-একবার মধুসূদন কুমুর হাতখানা টেনে নেবার উপক্রম করছে এমন সময় শ্যামা হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকেই বলে উঠল, 'ওমা, ঠাকুরপো যে!' বলেই বেরিয়ে যেতে উদ্যত।

মধুসূদন বললে, 'কেন, কী চাই তোমার?'

'বউকে ভাঁড়ারে ডাকতে এসেছি। রাজরানী হলেও ঘরের লক্ষ্মী তো বটে; তা আজ না-হয় থাক্।' মধুসূদন সোফা থেকে উঠে কোনো কথা না বলে দ্রুত বাইরে চলে গেল।

আহারের পর যথারীতি শোবার ঘরের খাটে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে মধুসূদন কুমুকে ডেকে পাঠালে। তাড়াতাড়ি কুমু চলে এল। সে জানে আজ দাদার চিঠি পাবে। শোবার ঘরে ঢুকে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

মধুসূদন গুড়গুড়ির নলটা রেখে পাশে দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'বোসো।'

কুমু বসল। মধুসূদন তাকে যে চিঠি দিলে তাতে কেবল এই কয়টি কথা আছে—

প্রাণপ্রতিমাসু

শুভাশীর্বাদরাশয়ঃ সন্তু

চিকিৎসার জন্য শীঘ্রই কলিকাতায় যাইতেছি। সুস্থ হইলে তোমাকে দেখিতে যাইব। গৃহকর্মের অবকাশমত মাঝে মাঝে কুশলসংবাদ দিলে নিরুদ্বিগ্ন হই।

এই ছোটো চিঠিটুকু মাত্র পেয়ে কুমুর মনে প্রথমে একটা ধাক্কা লাগল। মনে মনে বললে, 'পর হয়ে গেছি।' অভিমানটা প্রবল হতে না হতেই মনে এল, 'দাদার হয়তো শরীর ভালো নেই, আমার কী ছোটো মন! নিজের কথাটাই সব-আগে মনে পড়ে।'

মধুসূদন বুঝতে পারলে কুমু উঠি-উঠি করছে; বললে, 'যাচ্ছ কোথায়, একটু বোসো।'

কুমুকে তো বসতে বললে, কিন্তু কী কথা বলবে মাথায় আসে না। অবিলম্বে কিছু বলতেই হবে, তাই সকাল থেকে যে কথাটা নিয়ে ওর মনে খটকা রয়েছে সেইটেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বললে, 'সেই এলাচদানার ব্যাপারটা নিয়ে এত হাঙ্গামা করলে কেন? ওতে লজ্জার কথা কী ছিল?'

'ও আমার গোপন কথা।'

'গোপন কথা! আমার কাছেও বলা চলে না?'

'না।'

মধুসূদনের গলা কড়া হয়ে এল; বললে, 'এ তোমাদের নূরনগরি চাল, দাদার ইস্কুলে শেখা।'

কুমু কোনো জবাব করলে না। মধুসূদন তাকিয়া ছেড়ে উঠে বসল, ঐ চাল তোমার না যদি ছাড়াতে পারি তা হলে আমার নাম মধুসূদন না।'

'কী তোমার হুকুম, বলো।'

'সেই মোড়ক কে তোমাকে দিয়েছিল বলো।'

'হাবলু।'

'হাবলু! তা নিয়ে এত ঢাকাঢাকি কেন?'

'ঠিক বলতে পারি নে।'

'আর কেউ তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে?

'না।'

'তবে?'

'ঐ পর্যন্তই; আর কোনো কথা নেই।'

'তবে এত লুকোচুরি কেন?'

'তুমি বুঝতে পারবে না।'

কুমুর হাত চেপে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে মধু বললে, 'অসহ্য তোমার বাড়াবাড়ি।'

কুমুর মুখ লাল হয়ে উঠল, শান্ত স্বরে বললে, 'কী চাও তুমি, বুঝিয়ে বলো। তোমাদের চাল আমার অভ্যেস নেই সে কথা মানি।'

মধুসূদনের কপালের শিরদুটো ফুলে উঠল। কোনো জবাব ভেবে না পেয়ে ইচ্ছে হল ওকে মারে। এমন সময় বাইরে থেকে গলা-খাঁকারি শোনা গেল, সেই সঙ্গে আওয়াজ এল, 'আপিসের সায়েব এসে বসে আছে।' মনে পড়ল আজ ডাইরেক্‌টরদের মীটিং। লজ্জিত হল যে সে এজন্যে প্রস্তুত হয় নি—সকালটা প্রায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ গেছে। এতবড়ো শৈথিল্য এতই ওর স্বভাব ও অভ্যাস-বিরুদ্ধ যে, এটা সম্ভব হল দেখে ও নিজে স্তম্ভিত।

৪০

মধুসূদন চলে যেতেই কুমু খাট থেকে নেমে মেজের উপর বসে পড়ল। চিরজীবন ধরে এমন সমুদ্রে কি তাকে সাঁতার কাটতে হবে যার কূল কোথাও নেই? মধুসূদন ঠিকই বলেছে ওদের সঙ্গে তার চাল তফাত। আর সকল রকম তফাতের চেয়ে এইটেই দুঃসহ। কী উপায় আছে এর?

একসময়ে হঠাৎ কী মনে পড়ল, কুমু চলল নীচের তলায় মোতির মার ঘরের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দেখে শ্যামাসুন্দরী উপরে উঠে আসছে।

'কী বউ, চলেছ কোথায়? আমি যাচ্ছিলুম তোমার ঘরেই।'

'কোনো কথা আছে?'

'এমন কিছু নয়। দেখলুম ঠাকুরপোর মেজাজ কিছু চড়া, ভাবলুম তোমাকে একবার জিজ্ঞাসা করে জানি, নতুন প্রণয়ে খটকা বাধল কোন্‌খানটাতে। মনে রেখো বউ, ওর সঙ্গে কী রকম করে বনিয়ে চলতে হয় সে পরামর্শ আমরাই দিতে পারি। বকুলফুলের ঘরে চলেছ বুঝি? তা যাও, মনটা খোলসা করে এসো গে।'

আজ হঠাৎ কুমুর মনে হল শ্যামাসুন্দরী আর মধুসূদন একই মাটিতে গড়া এক কুমোরের চাকে। কেন এ কথা মাথায় এল বলা শক্ত। চরিত্র বিশ্লেষণ করে কিছু বুঝেছে তা নয়, আকারে-প্রকারে বিশেষ যে মিল তাও নয়, তবু দুজনের ভাবগতিকের একটা অনুপ্রাস আছে, যেন শ্যামাসুন্দরীর জগতে আর মধুসূদনের জগতে একই হাওয়া। শ্যামাসুন্দরী যখন বন্ধুত্ব করতে আসে তাও কুমুকে উলটো দিকে ঠেলা দেয়, গা কেমন করে ওঠে।

মোতির মার শোবার ঘরে ঢুকেই কুমু দেখলে নবীনে তাতে মিলে কী একটা নিয়ে হাত-কাড়াকাড়ি চলছে। ফিরে যাবে যাবে মনে করছে, এমন সময় নবীন বলে উঠল, 'বউদিদি, যেয়ো না, যেয়ো না। তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম, নালিশ আছে।'

'কিসের নালিশ?'

'একটু বোসো, দুঃখের কথা বলি।'

তক্তপোশের উপর কুমু বসল।

নবীন বললে, 'বড়ো অত্যাচার! এই ভদ্রমহিলা আমার বই রেখেছেন লুকিয়ে।'

'এমন শাসন কেন?'

'ঈর্ষা—যেহেতু নিজে ইংরেজি পড়তে পারেন না। আমি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে, কিন্তু উনি স্বামী-জাতির এডুকেশনের বিরোধী। আমার বুদ্ধির যতই উন্নতি হচ্ছে, ওঁর বুদ্ধির সঙ্গে ততই গরমিল হওয়াতে ওঁর আক্রোশ। অনেক করে বোঝালেম যে, এতবড়ো যে সীতা তিনিও রামচন্দ্রের পিছনে

পিছনেই চলতেন; বিদ্যেবুদ্ধিতে আমি যে তোমার চেয়ে অনেক দূরে এগিয়ে এগিয়ে চলছি এতে বাধা দিয়ো না।'

'তোমার বিদ্যের কথা মা সরস্বতী জানেন, কিন্তু বুদ্ধির বড়াই করতে এসো না বলছি।'

নবীনের মহা বিপদের ভান করা মুখভঙ্গি দেখে কুমু খিল খিল করে হেসে উঠল। এ বাড়িতে এসে অবধি এমন মন খুলে হাসি এই ওর প্রথম। এই হাসি নবীনের বড়ো মিষ্টি লাগল। সে মনে মনে বললে, 'এই আমার কাজ হল, আমি বউরানীকে হাসাব।'

কুমু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন ভাই, ঠাকুরপোর বই লুকিয়ে রেখেছ?'

'দেখো তো দিদি, শোবার ঘরে কি ওঁর পাঠশালার গুরুমশায় বসে আছেন? খেটেখুটে রাত্তিরে ঘরে এসে দেখি একটা পিদ্দিম জ্বলছে, তার সঙ্গে আর-একটা বাতির শেজ, মহাপণ্ডিত পড়তে বসে গেছেন। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাগিদের পর তাগিদ, হুঁশ নেই।'

'সত্যি ঠাকুরপো?'

'বউরানী, খাবার ভালোবাসি নে এতবড়ো তপস্বী নই, কিন্তু তার চেয়ে ভালোবাসি ওঁর মুখের মিষ্টি তাগিদ। সেইজন্যেই ইচ্ছে করে খেতে দেরি হয়ে যায়, বই পড়াটা একটা অছিলে।'

'ওঁর সঙ্গে কথায় হার মানি।'

'আর আমি হার মানি যখন উনি কথা বন্ধ করেন।'

'তাও কখনো ঘটে নাকি ঠাকুরপো?'

'দুটো একটা খুব তাজা দৃষ্টান্ত দিই তা হলে। অশ্রুজলের উজ্জ্বল অক্ষরে মনে লেখা রয়েছে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, তোমার আর দৃষ্টান্ত দিতে হবে না। এখন আমার চাবি কোথায় বলো। দেখো তো দিদি, আমার চাবি লুকিয়ে রেখেছেন।'

'ঘরের লোকের নামে তো পুলিস-কেস করতে পারি নে, তাই চোরকে চুরি দিয়ে শাসন করতে হয়। আগে দাও আমার বই।'

'তোমাকে দেব না, দিদিকে দিচ্ছি।' ঘরের কোণে একটা ঝুড়িতে রেশম-পশম, টুকরা কাপড়, ছেঁড়া মোজা জমে ছিল; তারই তলা থেকে একখানা ইংরেজি সংক্ষিপ্ত এন্‌সাইক্লোপীডিয়ার দ্বিতীয় খণ্ড বের করে মোতির মা কুমুর কোলের উপর রেখে বললে, 'তোমার ঘরে নিয়ে যাও দিদি, ওঁকে দিয়ো না; দেখি তোমার সঙ্গে কী রকম রাগারাগি করেন।'

নবীন মশারির চালের উপর থেকে চাবি তুলে নিয়ে কুমুর হাতে দিয়ে বললে, 'আর কাউকে দিয়ো না বউদিদি, দেখব আর কেউ তোমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করেন।'

কুমু বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললে, 'এই বইয়ে বুঝি ঠাকুরপোর শখ?'

'ওঁর শখ নেই এমন বই নেই। সেদিন দেখি কোথা থেকে একখানা গো-পালন জুটিয়ে নিয়ে পড়তে বসে গেছেন।'

'নিজের দেহরক্ষার জন্যে ওটা পড়ি নে, অতএব এতে লজ্জার কারণ কিছু নেই।'

'দিদি, তোমার কী একটা কথা বলবার আছে। চাও তো, এই বাচালটিকে এখনই বিদায় করে দিই।'

'না, তার দরকার নেই। আমার দাদা দুই-একদিনের মধ্যে আসবেন শুনেছি।'

নবীন বললে, 'হাঁ, তিনি কালই আসবেন।'

'কাল!' বিস্মিত হয়ে কুমু খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। নিশ্বাস ফেলে বললে, 'কী করে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে?'

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি বড়োঠাকুরকে কিছু বল নি?'

কুমু মাথা নেড়ে জানালে যে, না।

নবীন বললে, 'একবার বলে দেখবে-না?'

কুমু চুপ করে রইল। মধুসূদনের কাছে দাদার কথা বলা বড়ো কঠিন। দাদার প্রতি অপমান ওর ঘরের মধ্যে উদ্যত; তাকে একটুও নাড়া দিতে ওর অসহ্য সংকোচ।

কুমুর মুখের ভাব দেখে নবীনের মন ব্যথিত হয়ে উঠল। বললে, 'ভাবনা কোরো না বউদিদি, আমরা সব ঠিক করে দেব, তোমাকে কিছু বলতে কইতে হবে না।'

দাদার কাছে নবীনের শিশুকাল থেকে অত্যন্ত একটা ভীরুতা আছে। বউদিদি এসে আজ সেই ভয়টা ওর মন থেকে ভাঙালে বুঝি!

কুমু চলে গেলে মোতির মা নবীনকে বললে, 'কী উপায় করবে বলো দেখি? সেদিন রাত্রে তোমার দাদা যখন আমাদের ডেকে নিয়ে এসে বউয়ের কাছে নিজেকে খাটো করলেন তখনই বুঝে-ছিলুম সুবিধে হল না। তার পর থেকে তোমাকে দেখলেই তো মুখ ফিরিয়ে চলে যান।'

'দাদা বুঝেছেন যে, ঠকা হল; ঝোঁকের মাথায় থলি উজাড় করে আগাম দাম দেওয়া হয়ে গেছে, এদিকে ওজনমত জিনিস মিলল না। আমরা ওঁর বোকামির সাক্ষী ছিলুম, তাই আমাদের সইতে পারছেন না।'

মোতির মা বললে, 'তা হোক, কিন্তু বিপ্রদাসবাবুর উপরে রাগটা ওঁকে যেন পাগলামির মতো পেয়ে বসেছে, দিনে দিনে বেড়েই চলল। এ কী অনাছিষ্টি বলো দিকি!'

নবীন বললে, 'ও মানুষের ভক্তির প্রকাশ ঐ রকমই। এই জাতের লোকেরাই ভিতরে ভিতরে যাকে শ্রেষ্ঠ বলে জানে বাইরে তাকে মারে। কেউ কেউ বলে রামের প্রতি রাবণের অসাধারণ ভক্তি ছিল, তাই বিশ হাত দিয়ে নৈবেদ্য চালাত। আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি দাদার সঙ্গে বউরানীর দেখা-সাক্ষাৎ সহজে হবে না।'

'তা বললে চলবে না, কিছু উপায় করতেই হবে।'

'উপায় মাথায় এসেছে।'

'কী বলো দেখি।'

'বলতে পারব না।'

'কেন বলো তো?'

'লজ্জা বোধ করছি।'

'আমাকেও লজ্জা?'

'তোমাকেই লজ্জা।'

'কারণটা শুনি?'

'দাদাকে ঠকাতে হবে। সে তোমার শুনে কাজ নেই।'

'যাকে ভালোবাসি তার জন্যে ঠকাতে একটুও সংকোচ করি নে।'

'ঠকানো বিদ্যেয় আমার উপর দিয়েই হাত পাকিয়েছ বুঝি?'

'ও বিদ্যে সহজে খাটাবার উপযুক্ত এমন মানুষ পাব কোথায়?'

'ঠাকরুন, রাজিনামা লিখে-পড়ে দিচ্ছি, যখন খুশি ঠকিয়ো।'

'এত ফুর্তি কেন শুনি?'

'বলব? বিধাতা তোমাদের হাতে ঠকাবার যে-সব উপায় দিয়েছেন তাতে মধু দিয়েছেন ঢেলে। সেই মধুময় ঠকানোকেই বলে মায়া।'

'সেটা তো কাটানোই ভালো।'

'সর্বনাশ! মায়া গেলে সংসারে রইল কী? মূর্তির রঙ খসিয়ে ফেললে বাকি থাকে খড়মাটি। দেবী, অবোধকে ভোলাও, ঠকাও, চোখে ঘোর লাগাও, মনে নেশা জাগাও, যা খুশি করো।'

এর পরে যা কথাবার্তা চলল সে একেবারেই কাজের কথা নয়, এ গল্পের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।

৪১

মীটিঙে এইবার মধুসূদনের প্রথম হার। এ পর্যন্ত ওর কোনো প্রস্তাব কোনো ব্যবস্থা কেউ কখনো টলায় নি। নিজের 'পরে ওর বিশ্বাস যেমন, ওর প্রতি সহযোগীদেরও তেমনি বিশ্বাস। এই ভরসাতেই মীটিঙে কোনো জরুরি প্রস্তাব পাকা করে নেবার আগেই কাজ অনেক দূর এগিয়ে রাখে। এবারে পুরোনো নীলকুঠিওয়ালা একটা পত্তনি তালুক ওদের নীলের কারবারের শামিল কিনে নেবার বন্দোবস্ত করছিল। এ নিয়ে খরচপত্রও হয়ে গেছে। প্রায় সমস্তই ঠিকঠাক; দলিল স্ট্যাম্পে চড়িয়ে রেজেস্টারি করে দাম চুকিয়ে দেবার অপেক্ষা; যে-সব লোক নিযুক্ত করা আবশ্যক তাদের আশা দিয়ে রাখা হয়েছে; এমন সময় এই বাধা। সম্প্রতি ওদের কোনো ট্রেজারারের পদ খালি হওয়াতে সম্পর্কীয় একটি জামাতার জন্য উমেদারি চলেছিল, অযোগ্য-উদ্ধারণে উৎসাহ না থাকাতে মধুসূদন কান দেয় নি। সেই ব্যাপারটা বীজের মতো মাটি চাপা থেকে হঠাৎ বিরুদ্ধতার আকারে অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। একটু ছিদ্রও ছিল। তালুকের মালেক মধুসূদনের দূরসম্পর্কীয় পিসির ভাশুরপো। পিসি যখন হাতে পায়ে এসে ধরে তখন ও হিসেব করে দেখলে নেহাত সস্তায় পাওয়া যাবে, মুনফাও আছে, তার উপরে আত্মীয়দের কাছে মুরুব্বিয়ানা করবার গৌরব। যাঁর অযোগ্য জামাই ট্রেজারার-পদ থেকে বঞ্চিত, তিনিই মধুসূদনের স্বজনবাৎসল্যের প্রমাণ বহু সন্ধানে আবিষ্কার ও যথাস্থানে প্রচার করেছেন। তা ছাড়া কোম্পানির সকল রকম কেনাবেচায় মধুসূদন যে গোপনে কমিশন নিয়ে থাকেন, এই মিথ্যা সন্দেহ কানে কানে সঞ্চারিত করবার ভারও তিনিই নিয়েছিলেন। এ-সকল নিন্দার প্রমাণ অধিকাংশ লোক দাবি করে না, কারণ তাদের নিজের ভিতরে যে লোভ আছে সেই হচ্ছে অন্তরতম ও প্রবলতম সাক্ষী। লোকের মনকে বিগড়িয়ে দেওয়া একটা কারণে সহজ ছিল, সে কারণ হচ্ছে মধুসূদনের অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি, এবং তার খাঁটি চরিত্রের অসহ্য সুখ্যাতি। মধুসূদনও ডুবে ডুবে জল খায় এই অপবাদে সেই লোলুপরা পরম শান্তি পেল, গভীর জলে ডুব দেবার আকাঙ্ক্ষায় যাদের মনটা পানকৌড়ি-বিশেষ, অথচ হাতের কাছে যাদের জলাশয় নেই।

মালেককে মধুসূদন পাকা কথা দিয়েছিল। ক্ষতির আশঙ্কায় কথা খেলাপ করবার লোক সে নয়। তাই নিজে কিনবে ঠিক করেছে, আর পণ করেছে কোম্পানিকে দেখিয়ে দেবে, না কিনে তারা ঠকল।

মধুসূদন বিলম্বে বাড়ি ফিরে এল। নিজের ভাগ্যের প্রতি মধুসূদনের অন্ধ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল, আজ তার ভয় লাগল যে, জীবনযাত্রার গাড়িটাকে অদৃষ্ট এক পর্যায়ের লাইন থেকে আর-এক পর্যায়ের লাইনে চালান করে দিচ্ছে-বা। প্রথম ঝাঁকানিতেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। মীটিং থেকে ফিরে এসে আপিসঘরে কেদারা হেলান দিয়ে গুড়গুড়ির ধূমকুণ্ডলের সঙ্গে নিজের কালো রঙের চিন্তাকে কুণ্ডলায়িত করতে লাগল।

নবীন এসে খবর দিলে বিপ্রদাসের বাড়ি থেকে লোক এসেছে দেখা করতে। মধুসূদন ঝেঁকে উঠে বললে, 'যেতে বলে দাও, আমার এখন সময় নেই।'

নবীন মধুসূদনের ভাবগতিক দেখে বুঝলে মীটিঙে একটা অপঘাত ঘটেছে। বুঝলে দাদার মন এখন দুর্বল। দৌর্বল্য স্বভাবত অনুদার, দুর্বলের আত্মগরিমা ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতার রূপ ধরে। দাদার আহত মন বউরানীকে কঠিনভাবে আঘাত করতে চাইবে এতে নবীনের সন্দেহমাত্র ছিল না। এ আঘাত যে করেই হোক ঠেকাতেই হবে। এর পূর্ব পর্যন্ত ওর মনে দ্বিধা ছিল, সে দ্বিধা সম্পূর্ণ গেল কেটে। কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে আবার ঘরে এসে দেখলে ওর দাদা ঠিকানাওয়ালা নামের ফর্দর খাতা নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে। নবীন এসে দাঁড়াতেই মধুসূদন মুখ তুলে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, 'আবার কিসের দরকার? তোমাদের বিপ্রদাসবাবুর মোক্তারি করতে এসেছ বুঝি?'

নবীন বললে, 'না দাদা, সে ভয় নেই। ওদের লোকটা এমন তাড়া খেয়ে গেছে যে তুমি নিজেও যদি ডেকে পাঠাও তবু সে এ বাড়িমুখো হবে না।'

এ কথাটাও মধুসূদনের সহ্য হল না। বলে উঠল, ‘কড়ে আঙুলটা নাড়লেই পায়ের কাছে এসে পড়তে হবে। লোকটা এসেছিল কী করতে?’

‘তোমাকে খবর দিতে যে বিপ্রদাসবাবুর কলকাতা আসা দুদিন পিছিয়ে গেল। শরীর আর-একটু সেরে তবে আসবেন।’

‘আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্যে আমার তাড়া নেই।’

নবীন বললে, ‘দাদা, কাল সকালে ঘণ্টা দুয়ের জন্যে ছুটি চাই।’

‘কেন?’

‘শুনলে তুমি রাগ করবে।’

‘না শুনলে আরো রাগ করব।’

‘কুম্ভকোনাম থেকে এক জ্যোতিষী এসেছেন, তাঁকে দিয়ে একবার ভাগ্যপরীক্ষা করাতে চাই।’

মধুসূদনের বুকটা ধড়াস্ করে উঠল, ইচ্ছে করল এখনই ছুটে তার কাছে যায়। মুখে তর্জন করে বললে, ‘তুমি বিশ্বাস কর?’

‘সহজ অবস্থায় করি নে, ভয় লাগলেই করি।’

‘ভয়টা কিসের শুনি?’

নবীন কোনো জবাব না করে মাথা চুলকোতে লাগল।

‘ভয়টা কাকে বলোই-না।’

‘এ সংসারে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করি নে। কিছুদিন থেকে তোমার ভাবগতিক দেখে মন সুস্থির হচ্ছে না।’

সংসারের লোক মধুসূদনকে বাঘের মতো ভয় করে এইটেতে তার ভারি তৃপ্তি। নবীনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে গম্ভীরভাবে সে গুড়গুড়ি টানতে টানতে নিজের মাহাত্ম্য অনুভব করতে লাগল।

নবীন বললে, ‘তাই একবার স্পষ্ট করে জানতে চাই গ্রহ কী করতে চান আমাকে নিয়ে। আর তিনি ছুটিই-বা দেবেন কোন্ নাগাত।’

‘তোমার মতো নাস্তিক, তুমি কিছু বিশ্বাস কর না, শেষকালে—’

‘দেবতার ’পরে বিশ্বাস থাকলে গ্রহকে বিশ্বাস করতুম না দাদা। ডাক্তারকে যে মানে না হাতুড়েকে মানতে তার বাধে না।’

নিজের গ্রহকে যাচাই করে নেবার জন্যে মধুসূদনের যে পরিমাণ আগ্রহ হল, সেই পরিমাণ ঝাঁজের সঙ্গে বললে, ‘লেখাপড়া শিখে বাঁদর, তোমার এই বিদ্যে? যে যা বলে তাই বিশ্বাস কর?’

‘লোকটার কাছে যে ভৃগুসংহিতা রয়েছে—যেখানে যে-কেউ যে-কোনো কালে জন্মেছে, জন্মাবে, সকলের কুষ্ঠি একেবারে তৈরি, সংস্কৃত ভাষায় লেখা, এর উপর তো আর কথা চলে না। হাতে হাতে পরীক্ষা করে দেখে নাও।’

‘বোকা ভুলিয়ে যারা খায়, বিধাতা তাদের পেট ভরাবার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে তোমাদের মতো বোকাও সৃষ্টি করে রাখেন।’

‘আবার সেই বোকাদের বাঁচাবার জন্যে তোমাদের মতো বুদ্ধিমানও সৃষ্টি করেন। যে মারে তার উপরে তাঁর যেমন দয়া, যাকে মারে তার উপরেও তেমনি। ভৃগুসংহিতার উপরে তোমার তীক্ষ্ম বুদ্ধি চালিয়ে দেখোই-না।’

‘আচ্ছা, বেশ, কাল সকালেই আমাকে নিয়ে যেয়ো, দেখব তোমার কুম্ভকোনামের চালাকি।’

‘তোমার যে রকম জোর অবিশ্বাস দাদা, ওতে গণনায় গোল হয়ে যেতে পারে। সংসারে দেখা যায় মানুষকে বিশ্বাস করলে মানুষ বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। গ্রহদেরও ঠিক সেই দশা, দেখো-না কেন সাহেব-গুলো গ্রহ মানে না বলে গ্রহের ফল ওদের উপর খাটে না। সেদিন তেরোস্পর্শে বেরিয়ে তোমাদের ছোটোসাহেব ঘোড়দৌড়ে বাজি জিতে এল—আমি হলে বাজি জেতা দূরস্তাং ঘোড়াটা ছিটকে এসে

আমার পেটে লাথি মেরে যেত। দাদা, এই সব গ্রহনক্ষত্রের হিসেবের উপর তোমাদের বুদ্ধি খাটাতে যেয়ো না, একটু বিশ্বাস মনে রেখো।'

মধুসূদন খুশি হয়ে স্মিতহাস্যে গুড়গুড়িতে মনোযোগ দিলে।

পরদিন সকাল সাতটার মধ্যে মধুসূদন নবীনের সঙ্গে এক সরু গলির আবর্জনার ভিতর দিয়ে বেঙ্কট শাস্ত্রীর বাসায় গিয়ে উপস্থিত। অন্ধকার একতলার ভাপসা ঘর; লোনাধরা দেয়াল ক্ষত-বিক্ষত, যেন সাংঘাতিক চর্মরোগে আক্রান্ত, তক্তপোশের উপর ছিন্ন মলিন একখানা শতরঞ্চ, এক প্রান্তে কতকগুলো পুঁথি এলোমেলো জড়ো করা, দেয়ালের গায়ে শিব-পার্বতীর এক পট। নবীন হাঁক দিলে, 'শাস্ত্রীজি'। ময়লা ছিটের বালাপোশ গায়ে, সামনের মাথা কামানো, ঝুঁটিওয়ালা, কালো বেঁটে রোগা এক ব্যক্তি ঘরে এসে ঢুকল; নবীন তাকে ঘটা করে প্রণাম করলে। চেহারা দেখে মধুসূদনের একটুও ভক্তি হয় নি— কিন্তু দৈবের সঙ্গে দৈবজ্ঞের কোনোরকম ঘনিষ্ঠতা আছে জেনে ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা আধাআধি রকম অভিবাদন সেরে নিলে। নবীন মধুসূদনের একটি ঠিকুজি জ্যোতিষীর সামনে ধরতেই সেটা অগ্রাহ্য করে শাস্ত্রী মধুসূদনের হাত দেখতে চাইলে। কাঠের বাক্স থেকে কাগজ-কলম বের করে নিয়ে নিজে একটা চক্র তৈরি করে নিলে। মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'পঞ্চম বর্গ।' মধুসূদন কিছুই বুঝলে না। জ্যোতিষী আঙুলের পর্ব গুনতে গুনতে আউড়ে গেল, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ। এতেও মধুসূদনের বুদ্ধি খোলসা হল না। জ্যোতিষী বললে, 'পঞ্চম বর্ণ।' মধুসূদন ধৈর্য ধরে চুপ করে রইল। জ্যোতিষী আওড়াল. প, ফ, ব, ভ, ম। মধুসূদন এর থেকে এইটুকু বুঝলে যে, ভৃগুমুনি ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায় থেকেই তার সংহিতা শুরু করেছেন। এমন সময় বেঙ্কট শাস্ত্রী বলে উঠল, 'পঞ্চাক্ষরকং।'

নবীন চকিত হয়ে মধুসূদনের কাছে চুপি চুপি বললে, 'বুঝেছি দাদা।'

'কী বুঝলে?'

'পঞ্চম বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম, তার পরে পঞ্চ অক্ষর ম-ধু-সূ-দ-ন। জন্ম-গ্রহের অদ্ভুত কৃপায় তিনটে পাঁচ এক জায়গায় মিলেছে।'

মধুসূদন স্তম্ভিত। বাপ মায়ে নাম রাখবার কত হাজার বছর আগেই নামকরণ ভৃগুমুনির খাতায়! নক্ষত্রদের এ কী কাণ্ড! তার পরে হতবুদ্ধি হয়ে শুনে গেল ওর জীবনের সংক্ষিপ্ত অতীত ইতিহাস সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ভাষা যত কম বুঝলে, ভক্তি ততই বেড়ে উঠল। জীবনটা আগাগোড়া ঋষিবাক্য মূর্তিমান। নিজের বুকের উপর হাত বুলিয়ে দেখলে, দেহটা অনুস্বার-বিসর্গ-তদ্ধিত-প্রত্যয়ের মসলা দিয়ে তৈরি কোন্ তপোবনে লেখা একটা পুঁথির মতো। তার পর দৈবজ্ঞের শেষ কথাটা এই যে, মধুসূদনের ঘরে একদা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে বলে পূর্ব হতেই ঘরে অভাবনীয় সৌভাগ্যের সূচনা। অল্পদিন হল তিনি এসেছেন নববধূকে আশ্রয় করে। এখন থেকে সাবধান। কেননা ইনি যদি মনঃপীড়া পান, ভাগ্য কুপিত হবে।

বেঙ্কট শাস্ত্রী বললে, কোপের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। জাতক যদি এখনো সতর্ক না হয় বিপদ বেড়ে চলবে। মধুসূদন স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল। মনে পড়ে গেল বিবাহের দিনেই প্রকাণ্ড সেই মুনফার খবর; আর তার কয়দিনের মধ্যেই এই পরাভব। লক্ষ্মী স্বয়ং আসেন সেটা সৌভাগ্য, কিন্তু তার দায়িত্বটা কম ভয়ংকর নয়।

ফেরবার সময় মধুসূদন গাড়িতে স্তব্ধ হয়েই বসে রইল। এক সময় নবীন বলে উঠল, 'ঐ বেঙ্কট শাস্ত্রীর কথা একটুও বিশ্বাস করি নে; নিশ্চয় ও কারো কাছ থেকে তোমার সমস্ত খবর পেয়েছে।'

'ভারি বুদ্ধি তোমার! যেখানে যত মানুষ আছে আগেভাগে তার খবর নিয়ে রেখে দিচ্ছে; সোজা কথা কিনা!'

'মানুষ জন্মাবার আগেই তার কোটি কোটি কুষ্ঠি লেখার চেয়ে এটা অনেক সোজা! ভৃগুমুনি এত কাগজ পাবেন কোথায়, আর বেঙ্কট স্বামীর ঐ ঘরে এত জায়গা হবে কেমন করে?'

'এক আঁচড়ে হাজারটা কথা লিখতে জানতেন তাঁরা।'

'অসম্ভব।'

'যা তোমার বুদ্ধিতে কুলোয় না তাই অসম্ভব। ভারি তোমার সায়ান্স! এখন তর্ক রেখে দাও, সেদিন ওদের বাড়ি থেকে যে সরকার এসেছিল, তাকে তুমি নিজে গিয়ে ডেকে এনো। আজই, দেরি কোরো না।'

দাদাকে ঠকিয়ে নবীনের মনের ভিতরটাতে অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ হতে লাগল। ফন্দিটা এত সহজ, এর সফলতাটা দাদার পক্ষে এত হাস্যকর যে, তারই অমর্যাদায় ওকে লজ্জা ও কষ্ট দিলে। দাদাকে উপস্থিতমত ছোটো অনেক ফাঁকি অনেকবার দিতে হয়েছে, কিছু মনে হয় নি; কিন্তু এত করে সাজিয়ে এতবড়ো ফাঁকি গড়ে তোলার গ্লানি ওর চিত্তকে অশুচি করে রেখে দিলে।

৪২

মধুসূদনের মন থেকে মস্ত একটা ভার গেল নেমে, আত্মগৌরবের ভার—যে কঠোর গৌরব-বোধ ওর বিকাশোন্মুখ অনুরক্তিকে কেবলই পাথর-চাপা দিয়েছে। কুমুর প্রতি ওর মন যখন মুগ্ধ তখনো সেই বিহ্বলতার বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে চলেছিল লড়াই। যতই অনন্যগতি হয়ে কুমুর কাছে ধরা দিয়েছে, ততই নিজের অগোচরে কুমুর 'পরে ওর ক্রোধ জমেছে। এমন সময় স্বয়ং নক্ষত্রদের কাছ থেকে যখন আদেশ এল যে, লক্ষ্মী এসেছেন ঘরে, তাঁকে খুশি করতে হবে, সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে ওর দেহমন যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল; বারবার আপন মনে আবৃত্তি করতে লাগল লক্ষ্মী, আমারই ঘরে লক্ষ্মী, আমার ভাগ্যের পরম দান। ইচ্ছে করতে লাগল—এখনই সমস্ত সংকোচ ভাসিয়ে দিয়ে কুমুর কাছে স্তুতি জানিয়ে আসে, বলে আসে, 'যদি কোনো ভুল করে থাকি, অপরাধ নিয়ো না।' কিন্তু আজ আর সময় নেই, ব্যবসায়ের ভাঙন সারবার কাজে এখনই আপিসে ছুটতে হবে, বাড়িতে খেয়ে যাবার অবকাশ পর্যন্ত জুটল না।

এদিকে সমস্তদিন কুমুর মনের মধ্যে তোলপাড় চলেছে। সে জানে কাল দাদা আসবেন, শরীর তাঁর অসুস্থ। তাঁর সঙ্গে দেখাটা সহজ হবে কি না নিশ্চিত জানবার জন্যে মন উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছে। নবীন কোথায় কাজে গেছে, এখনো এল না। সে নিঃসন্দেহ জানত আজ স্বয়ং মধুসূদন এসে বউরানীকে সকল রকমে প্রসন্ন করবে; আগেভাগে কোনো আভাস দিয়ে রসভঙ্গ করতে চায় না।

আজ ছাতে বসবার সুবিধা ছিল না। কাল সন্ধ্যা থেকে মেঘ করে আছে, আজ দুপুর থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। শীতকালের বাদলা, অনিচ্ছিত অতিথির মতো। মেঘে রঙ নেই, বৃষ্টিতে ধ্বনি নেই, ভিজে বাতাসটা যেন মনমরা, সূর্যালোকহীন আকাশের দৈন্যে পৃথিবী সংকুচিত। সিঁড়ি থেকে উঠেই শোবার ঘরে ঢোকবার পথে যে ঢাকা ছাত আছে সেইখানে কুমু মাটিতে বসে। থেকে থেকে গায়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। আজ এই ছায়াম্লান আর্দ্র একঘেয়ে দিনে কুমুর মনে হল, তার নিজের জীবনটা তাকে যেন অজগরের মতো গিলে ফেলেছে, তারই ক্লেদাক্ত জঠরের রুদ্ধতার মধ্যে কোথাও একটুমাত্র ফাঁক নেই। যে দেবতা ওকে ভুলিয়ে আজ এই নিরুপায় নৈরাশ্যের মধ্যে এনে ফেললে তার উপরে যে অভিমান ওর মনে ধোঁয়াচ্ছিল আজ সেটা ক্রোধের আগুনে জ্বলে উঠল। হঠাৎ দ্রুত উঠে পড়ল। ডেস্ক খুলে বের করলে সেই যুগল রূপের পট। রঙিন রেশমের ছিট দিয়ে সেটা মোড়া। সেই পট আজ নষ্ট করে ফেলতে চায়। যেন চীৎকার করে বলতে চায়, তোমাকে আমি একটুও বিশ্বাস করি নে। হাত কাঁপছে, তাই গ্রন্থি খুলতে পারছে না; টানাটানিতে সেটা আরো আঁট হয়ে উঠল, অধীর হয়ে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেললে। অমনি চিরপরিচিত

সেই মূর্তি অনাবৃত হতেই আর সে থাকতে পারলে না; তাকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে উঠল। কাঠের ফ্রেম বুকে যত বাজে ততই আরো বেশি চেপে ধরে।

এমন সময়ে শোবার ঘরে এল মুরলী বেহারা বিছানা করতে। শীতে কাঁপছে তার হাত। গায়ে একখানা জীর্ণ ময়লা র‍্যাপার। মাথায় টাক, রগ টেপা, গাল বসা, কিছুকালের না-কামানো কাঁচা-পাকা দাড়ি খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। অনতিকাল পূর্বেই সে ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিল, শরীরে রক্ত নেই বললেই হয়, ডাক্তার বলেছিল কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে যেতে, কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি।

কুমু বললে, 'শীত করছে মুরলী?'

'হাঁ মা, বাদল করে ঠান্ডা পড়েছে।'

'গরম কাপড় নেই তোমার?'

'খেতাব পাবার দিনে মহারাজা দিয়েছিলেন, নাতির খাঁসির বেমারি হতেই ডাক্তারের কথায় তাকে দিয়েছি মা।'

কুমু একটি পুরোনো ছাই রঙের আলোয়ান পাশের ঘরের আলমারি থেকে বের করে এনে বললে, 'আমার এই কাপড়টি তোমাকে দিলুম।'

মুরলী গড় হয়ে বললে, 'মাপ করো মা, মহারাজা রাগ করবেন।'

কুমুর মনে পড়ে গেল, এ বাড়িতে দয়া করবার পথ সংকীর্ণ। কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে নিজের জন্যেও যে ওর দয়া চাই, পুণ্যকর্ম তারই পথ। কুমু ক্ষোভের সঙ্গে আলোয়ানটা মাটিতে ফেলে দিলে।

মুরলী হাত জোড় করে বললে, 'রানীমা, তুমি মা লক্ষ্মী, রাগ কোরো না। গরম কাপড়ে আমার দরকার হয় না। আমি থাকি হুঁকাবরদারের ঘরে, সেখানে গামলায় গুলের আগুন, আমি বেশ গরম থাকি।'

কুমু বললে, 'মুরলী, নবীন ঠাকুরপো যদি বাড়ি এসে থাকেন তাঁকে ডেকে দাও।'

নবীন ঘরে ঢুকতেই কুমু বললে, 'ঠাকুরপো, তোমাকে একটি কাজ করতেই হবে। বলো, করবে?'

'নিজের অনিষ্ট যদি হয় এখনই করব, কিন্তু তোমার অনিষ্ট হলে কিছুতেই করব না।'

'আমার আর কত অনিষ্ট হবে? আমি ভয় করি নে।' বলে নিজের হাত থেকে মোটা সোনার বালাজোড়া খুলে বললে, 'আমার এই বালা বেচে দাদার জন্যে স্বস্ত্যয়ন করাতে হবে।'

'কিছু দরকার হবে না বউরানী, তুমি তাঁকে যে ভক্তি করো তারই পুণ্যে প্রতিমুহূর্তে তাঁর জন্যে স্বস্ত্যয়ন হচ্ছে।'

'ঠাকুরপো, দাদার জন্যে আর কিছুই করতে পারব না। কেবল যদি পারি দেবতার দ্বারে তাঁর জন্যে সেবা পৌঁছিয়ে দেব।'

'তোমাকে কিছু করতে হবে না, বউরানী। আমরা সেবক আছি কী করতে?'

'তোমরা কী করতে পার বলো?'

'আমরা পাপিষ্ঠ, পাপ করতে পারি। তাই করেও যদি তোমার কোনো কাজে লাগি তা হলে ধন্য হব।'

'ঠাকুরপো, এ কথা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না।'

'একটুও ঠাট্টা নয়। পুণ্য করার চেয়ে পাপ করা অনেক শক্ত কাজ, দেবতা যদি তা বুঝতে পারেন তা হলে পুরস্কার দেবেন।'

নবীনের কথার ভাবে দেবতার প্রতি উপেক্ষা কল্পনা করে কুমুর মনে স্বভাবত আঘাত লাগতে পারত, কিন্তু তার দাদাও যে মনে মনে দেবতাকে শ্রদ্ধা করে না, এই অভক্তির 'পরে সে রাগ করতে পারে না যে। ছোটো ছেলের দুষ্টুমির 'পরেও মায়ের যেমন সকৌতুক স্নেহ, এই রকম অপরাধের 'পরে ওরও সেই ভাব।

কুমু একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, 'ঠাকুরপো, সংসারে তোমরা নিজের জোরে কাজ করতে পার; আমাদের যে সেই নিজের জোর খাটাবার জো নেই। যাদের ভালোবাসি অথচ নাগাল মেলে না, তাদের কাজ করব কী করে? দিন যে কাটে না, কোথাও যে রাস্তা খুঁজে পাই নে। আমাদের কি দয়া করবার কোথাও কেউ নেই?'

নবীনের চোখ জলে ভেসে উঠল।

'দাদাকে উদ্দেশ করে আমাকে কিছু করতেই হবে ঠাকুরপো, কিছু দিতেই হবে। এই বালা আমার মায়ের, সেই আমার মায়ের হয়েই এ বালা আমার দেবতাকে আমি দেব।'

'দেবতাকে হাতে করে দিতে হয় না বউরানী, তিনি এমনি নিয়েছেন। দুদিন অপেক্ষা করো, যদি দেখ তিনি প্রসন্ন হন নি, তা হলে যা বলবে তাই করব। যে দেবতা তোমাকে দয়া করেন না তাঁকেও ভোগ দিয়ে আসব।'

রাত্রি অন্ধকার হয়ে এল— বাইরে সিঁড়িতে ঐ সেই পরিচিত জুতোর শব্দ। নবীন চমকে উঠল, বুঝলে দাদা আসছে। পালিয়ে গেল না, সাহস করে দাদার জন্যে অপেক্ষা করেই রইল। এদিকে কুমুর মন এক মুহূর্তে নিরতিশয় সংকুচিত হয়ে উঠল। এই অদৃশ্য বিরোধের ধাক্কাটা এমন প্রবল বেগে যখন তার প্রত্যেক নাড়িকে চমকিয়ে তুললে, বড়ো ভয় হল। এ পাপ কেন তাকে এত দুর্জয় বলে পেয়ে বসেছে?

হঠাৎ কুমু নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুরপো, কাউকে জান যিনি আমাকে গুরুর মতো উপদেশ দিতে পারেন?'

'কী হবে বউরানী?'

'নিজের মনকে নিয়ে যে পেরে উঠছি নে।'

'সে তোমার মনের দোষ নয়।'

'বিপদটা বাইরের, দোষটা মনের, দাদার কাছে এই কথা বারবার শুনেছি।'

'তোমার দাদাই তোমাকে উপদেশ দেবেন— ভয় কোরো না।'

'সেদিন আমার আর আসবে না।'

মধুসূদনের বিষয়বুদ্ধির সঙ্গে তার ভালোবাসার আপস হয়ে যেতেই সেই ভালোবাসা মধুসূদনের সমস্ত কাজকর্মের উপর দিয়েই যেন উপছে বয়ে যেতে লাগল। কুমুর সুন্দর মুখে তার ভাগ্যের বরাভয়-দান। পরাভবটি কেটে যাবে আজই পেল তার আভাস। কাল যারা বিরুদ্ধে মত দিয়েছিল আজ তাদেরই মধ্যে কেউ কেউ সুর ফিরিয়ে ওকে চিঠি লিখেছে। মধুসূদন যেই তালুকটা নিজের নামে কিনে নেবার প্রস্তাব করলে অমনি কারো কারো মনে হল, 'ঠকলুম বুঝি'। কেউ কেউ এমনও ভাব প্রকাশ করলে যে, কথাটা আর-একবার বিচার করা উচিত।

গরহাজির অপরাধে আপিসের দরোয়ানের অর্ধেক মাসের মাইনে কাটা গিয়েছিল, আজ টিফিনের সময় মধুসূদনের পা জড়িয়ে ধরবামাত্র মধুসূদন তাকে মাপ করে দিলে। মাপ করবার মানে নিজের পকেট থেকে দরোয়ানের ক্ষতিপূরণ; যদিচ খাতায় জরিমানা রয়ে গেল। নিয়মের ব্যত্যয় হবার জো নেই।

আজকের দিনটা মধুর পক্ষে বড়ো আশ্চর্যের দিন। বাইরে আকাশটা মেঘে ঘোলা, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু এতে করে ওর ভিতরের আনন্দ আরো বাড়িয়ে দিলে। আপিস থেকে ফিরে এসে রাত্রে আহারের সময়ের পূর্বে পর্যন্ত মধুসূদন বাইরের ঘরে কাটাত। বিয়ের পরে কয়দিন অসময়ে নিয়মের বিরুদ্ধে অন্তঃপুরে যাবার বেলায় লোকের দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করেছে। আজ সশব্দ পদক্ষেপে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে যেন জানিয়ে দিতে চাইল যে, সে চলেছে কুমুর সঙ্গে দেখা করতে। আজ বুঝেছে পৃথিবীর লোকে ওকে ঈর্ষা করতে পারে এতবড়ো ওর সৌভাগ্য।

খানিকক্ষণের জন্যে বৃষ্টি ধরে গেছে। তখনো সব ঘরে আলো জ্বলে নি। আন্দিবুড়ি ধুনুচি হাতে ধুনো দিয়ে বেড়াচ্ছে; একটা চামচিকে উঠোনের উপরের আকাশ থেকে লণ্ঠনজ্বালা

অন্তঃপুরের পথ পর্যন্ত কেবলই চক্রপথে ঘুরছে। বারান্দায় পা মেলে দিয়ে দাসীরা উরুর উপরে প্রদীপের সলতে পাকাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি উঠে ঘোমটা টেনে দৌড় দিলে। পায়ের শব্দ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল শ্যামাসুন্দরী, হাতে বাটাতে ছিল পান। মধুসূদন আপিস থেকে এলে নিয়মমত এই পান সে বাইরে পাঠিয়ে দিত। সবাই জানে, ঠিক মধুসূদনের রুচির মতো পান শ্যামাসুন্দরীই সাজতে পারে; এইটে জানার মধ্যে আরো কিছু-একটু জানার ইশারা ছিল। সেই জোরে পথের মধ্যে শ্যামা মধুর সামনে বাটা খুলে ধরে বললে, 'ঠাকুরপো, তোমার পান সাজা আছে, নিয়ে যাও।' আগে হলে এই উপলক্ষে দুটো-একটা কথা হত, আর সেই কথায় অল্প একটু মধুর রসের আমেজও লাগত। আজ কী হল কে জানে, পাছে দূর থেকেও শ্যামার ছোঁয়াচ লাগে সেইটে এড়িয়ে পান না নিয়ে মধুসূদন দ্রুত চলে গেল। শ্যামার বড়ো বড়ো চোখদুটো অভিমানে জ্বলে উঠল, তার পরে ভেসে গেল অশ্রুজলের মোটা মোটা ফোঁটায়। অন্তর্যামী জানেন, শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনকে ভালোবাসে।

মধুসূদন ঘরে ঢুকতেই নবীন কুমুর পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'গুরুর কথা মনে রইল, খোঁজ করে দেখব।' দাদাকে বললে, 'বউরানী গুরুর কাছ থেকে শাস্ত্র-উপদেশ শুনতে চান। আমাদের গুরুঠাকুর আছেন, কিন্তু—'

মধুসূদন উত্তেজনার স্বরে বলে উঠল, 'শাস্ত্র-উপদেশ! আচ্ছা সে দেখব এখন, তোমাকে কিছু করতে হবে না।'

নবীন চলে গেল।

মধুসূদন আজ সমস্ত পথ মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে এসেছিল, 'বড়োবউ, তুমি এসেছ আমার ঘর আলো হয়েছে।' এ রকম ভাবের কথা বলবার অভ্যাস ওর একেবারেই নেই। তাই ঠিক করেছিল, ঘরে ঢুকেই দ্বিধা না করে প্রথম ঝোঁকেই সে বলবে। কিন্তু নবীনকে দেখেই কথাটা গেল ঠেকে। তার উপরে এল শাস্ত্র-উপদেশের প্রসঙ্গ, ওর মুখ দিলে একেবারে বন্ধ করে। অন্তরে যে আয়োজনটা চলছিল, এই একটুখানি বাধাতেই নিরস্ত হয়ে গেল। তার পরে কুমুর মুখে দেখলে একটা ভয়ের ভাব, দেহমনের একটা সংকোচ। অন্যদিন হলে এটা চোখে পড়ত না। আজ ওর মনে যে একটা আলো জ্বলেছে তাতে দেখবার শক্তি হয়েছে প্রবল, কুমু সম্বন্ধে চিত্তের স্পর্শবোধ হয়েছে সূক্ষ্ম। আজকের দিনেও কুমুর মনে এই বিমুখতা, এটা ওর কাছে নিষ্ঠুর অবিচার বলে ঠেকল। তবু মনে মনে পণ করলে বিচলিত হবে না, কিন্তু যা সহজে হতে পারত সে আর সহজ রইল না।

একটু চুপ করে থেকে মধুসূদন বললে, 'বড়োবউ, চলে যেতে ইচ্ছে করছ? একটুক্ষণ থাকবে-না?'

মধুসূদনের কথা আর তার গলার স্বর শুনে কুমু বিস্মিত। বললে, 'না, যাব কেন?'

'তোমার জন্যে একটি জিনিস এনেছি খুলে দেখো।' বলে তার হাতে ছোটো একটি সোনার কৌটো দিলে।

কৌটো খুলে কুমু দেখলে দাদার দেওয়া সেই নীলার আংটি। বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, কী করবে ভেবে পেল না।

'এই আংটি তোমায় পরিয়ে দিতে দেবে?'

কুমু হাত বাড়িয়ে দিলে। মধুসূদন কুমুর হাত কোলের উপর ধরে খুব আস্তে আস্তে আংটি পরাতে লাগল। ইচ্ছে করেই সময় নিলে একটু বেশি। তার পরে হাতটি তুলে ধরে চুমো খেলে, বললে, 'ভুল করেছিলুম তোমার হাতের আংটি খুলে নিয়ে। তোমার হাতে কোনো জহরতে কোনো দোষ নেই।'

কুমুকে মারলে এর চেয়ে কম বিস্মিত হত। ছেলেমানুষের মতো কুমুর এই বিস্ময়ের ভাব দেখে মধুসূদনের লাগল ভালো। দানটা যে সামান্য নয় কুমুর মুখভাবে তা সুস্পষ্ট। কিন্তু

মধুসূদন আরো কিছু হাতে রেখেছে, সেইটে প্রকাশ করলে; বললে, 'তোমাদের বাড়ির কালু মুখুজ্যে এসেছে, তাকে দেখতে চাও?'

কুমুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, 'কালুদা!'

'তাকে ডেকে দিই। তোমরা কথাবার্তা কও, ততক্ষণ আমি খেয়ে আসি গে।'

কৃতজ্ঞতায় কুমুর চোখ ছল ছল করে এল।

৪৩

চাটুজ্যে জমিদারদের সঙ্গে কালুর পুরুষানুক্রমিক সম্বন্ধ। সমস্ত বিশ্বাসের কাজ এর হাত দিয়েই সম্পন্ন হয়। এর কোনো এক পূর্বপুরুষ চাটুজ্যেদের জন্যে জেল খেটেছে। কালু আজ বিপ্রদাসের হয়ে এক কিস্তি সুদ দিয়ে রসিদ নিতে মধুসূদনের আপিসে এসেছিল। বেঁটে, গৌরবর্ণ, পরিপুষ্ট চেহারা, ঈষৎ কটা, ড্যাবাড্যাবা চোখ, তার উপরে ঝুঁকে-পড়া রোমশ কাঁচাপাকা মোটা ভুরু, মস্ত ঘন পাকা গোঁফ অথচ মাথার চুল প্রায় কাঁচা, সযত্নে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি পরা এবং প্রভু-পরিবারের মর্যাদা রক্ষার উপযুক্ত পুরানো দামি জামিয়ার গায়ে। আঙুলে একটা আংটি—তার পাথরটা নেহাত কম দামি নয়।

কালু ঘরে প্রবেশ করতে কুমু তাকে প্রণাম করলে। দুজনে বসল কার্পেটের উপর। কালু বললে, 'ছোটো খুকি, এই তো সেদিন চলে এলে দিদি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কত বৎসর দেখি নি।'

'দাদা কেমন আছেন আগে বলো।'

'বড়োবাবুর জন্যে বড়ো ভাবনায় কেটেছে। তুমি যেদিন চলে এলে তার পরের দিনে খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল। কিন্তু অসম্ভব জোরালো শরীর কিনা, দেখতে দেখতে সামলে নিলেন। ডাক্তাররা আশ্চর্য হয়ে গেছে।'

'দাদা কাল আসছেন?'

'তাই কথা ছিল। কিন্তু আরো দুটো দিন দেরি হবে। পূর্ণিমা পড়েছে, সকলে তাঁকে বারণ করলে, কী জানি যদি আবার জ্বর আসে। সে যেন হল, কিন্তু তুমি কেমন আছ দিদি?'

'আমি বেশ ভালোই আছি।'

কালু কিছু বলতে ইচ্ছে করল না, কিন্তু কুমুর মুখের সে লাবণ্য গেল কোথায়? চোখের নীচে কালি কেন? অমন চিকন রঙ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল কী জন্যে? কুমুর মনে একটা প্রশ্ন জাগছে, সেটা সে মুখ ফুটে বলতে পারছে না, 'দাদা আমাকে মনে করে কি কিছু বলে পাঠান নি?' তার সেই অব্যক্ত প্রশ্নের উত্তরের মতোই যেন কালু বললে, 'বড়োবাবু আমার হাত দিয়ে তোমাকে একটি জিনিস পাঠিয়েছেন।'

কুমু ব্যগ্র হয়ে বললে, 'কী পাঠিয়েছেন, কই সে?'

'সেটা বাইরে রেখে এসেছি।'

'আনলে না কেন?'

'ব্যস্ত হোয়ো না দিদি। মহারাজা বললেন, তিনি নিজে নিয়ে আসবেন।'

'কী জিনিস বলো আমাকে।'

'ইনি যে আমাকে বলতে বারণ করলেন।' ঘরের চারি দিকে তাকিয়ে কালু বললে, 'বেশ আদর-যত্নে তোমাকে রেখেছে—বড়োবাবুকে গিয়ে বলব, কত খুশি হবেন। প্রথম দুদিন তোমার খবর পেতে দেরি হয়ে তিনি বড়ো ছটফট করেছেন। ডাকের গোলমাল হয়েছিল, শেষকালে তিনটে চিঠি একসঙ্গে পেলেন।'

ডাকের গোলমাল হবার কারণটা যে কোন্‌খানে কুমু তা আন্দাজ করতে পারলে।

কালুদাকে কুমু খেতে বলতে চায়, সাহস করতে পারছে না। একটু সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, 'কালুদা, এখনো তোমার খাওয়া হয় নি?'

'দেখেছি, কলকাতায় সন্ধের পর খেলে আমার সহ্য হয় না দিদি, তাই আমাদের রামদাস কবিরাজের কাছ থেকে মকরধ্বজ আনিয়ে খাচ্ছি। বিশেষ কিছু তো ফল হল না।'

কালু বুঝেছিল, বাড়ির নতুন বউ, এখনো কর্তৃত্ব হাতে আসে নি, মুখ ফুটে খাওয়াবার কথা বলতে পারবে না, কেবল কষ্ট পাবে।

এমন সময় মোতির মা দরজার আড়াল থেকে হাতছানি দিয়ে কুমুকে ডেকে নিয়ে বললে, 'তোমাদের ওখান থেকে মুখুজ্যেমশায় এসেছেন, তাঁর জন্যে খাবার তৈরি। নীচের ঘরে তাঁকে নিয়ে এসো, খাইয়ে দেবে।'

কুমু ফিরে এসেই বললে, 'কালুদা, তোমার কবিরাজের কথা রেখে দাও, তোমাকে খেয়ে যেতেই হবে।'

'কী বিভ্রাট! এ যে অত্যাচার! আজ থাক্, না-হয় আর-একদিন হবে।'

'না, সে হবে না—চলো।'

শেষকালে আবিষ্কার করা গেল, মকরধ্বজের বিশেষ ফল হয়েছে, ক্ষুধার লেশমাত্র অভাব প্রকাশ পেল না।

কালুদাদাকে খাওয়ানো শেষ হতেই কুমু শোবার ঘরে চলে এল। আজ মনটা বাপের বাড়ির স্মৃতিতে ভরা। এতদিনে নুরনগরে খিড়কির বাগানে আমের বোল ধরেছে। কুসুমিত জামরুল গাছের তলায় পুকুর-ধারের চাতালে কত নিভৃত মধ্যাহ্নে কুমু হাতের উপর মাথা রেখে এলোচুল ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে কাটিয়েছে—মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত, ছায়ায় আলোয় খচিত সেই দুপুরবেলা। বুকের মধ্যে একটা অকারণ ব্যথা লাগত, জানত না তার অর্থ কী। সেই ব্যথায় সন্ধেবেলাকার ব্রজের পথের গোখুরধূলিতে ওর স্বপ্ন রাঙা হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারে নি যে, ওর যৌবনের অপ্রাপ্ত দোসর জলে স্থলে দিয়েছে মায়া মেলে, ওর যুগল রূপের উপাসনায় সেই করেছে লুকোচুরি, তাকেই টেনে এনেছে ওর চিত্তের অলক্ষ্যপুরে এসরাজের মুলতানের মিড়ে মূর্ছনায়। ওর প্রথম-যৌবনের সেই না-পাওয়া মনের মানুষের কত আভাস ছিল ওদের সেখানকার বাড়ির কত জায়গায়, সেখানকার চিলেকোঠায়, যেখান থেকে দেখা যেত গ্রামের বাঁকা রাস্তার ধারে ফুলের-আগুন-লাগা সরষেখেত, খিড়কির পাঁচিলের ধারের সেই ঢিবিটা, সেখানে বসে পাঁচিলের ছ্যাতলা-পড়া সবুজে কালোয় মেশা নানা রেখায় যেন কোন্ পুরাতন বিস্মৃত কাহিনীর অস্পষ্ট ছবি—দোতালায় ওর শোবার ঘরের জানালায় সকালে ঘুম থেকে উঠেই দূরের রাঙা আকাশের দিকে সাদা পালগুলো দেখতে পেত দিগন্তের গায়ে গায়ে চলেছে যেন মনের নিরুদ্দেশ-কামনার মতো। প্রথম-যৌবনের সেই মরীচিকাই সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কলকাতায় ওর পুজার মধ্যে, ওর গানের মধ্যে। সেই তো দৈবের বাণীর ভান করে ওকে অন্ধভাবে এই বিবাহের ফাঁসের মধ্যে টেনে আনলে। অথচ প্রখর রৌদ্রে নিজে গেল মিলিয়ে।

ইতিমধ্যে মধুসূদন কখন পিছনে এসে দেয়ালে-ঝোলানো আয়নায় কুমুর মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারলে কুমুর মন যেখানে হারিয়ে গেছে সেই অদৃশ্য অজানার সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিছুতেই চলবে না। অন্য দিন হলে কুমুর এই আনমনা ভাব দেখলে রাগ হত। আজ শান্ত বিষাদের সঙ্গে কুমুর পাশে এসে বসল; বললে, 'কী ভাবছ বড়োবউ?'

কুমু চমকে উঠল। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মধুসূদন ওর হাত চেপে ধরে নাড়া দিয়ে বললে, 'তুমি কি কিছুতেই আমার কাছে ধরা দেবে না?'

একথার উত্তর কুমু ভেবে পেল না। কেন ধরা দিতে পারছে না সে প্রশ্ন ও যে নিজেকেও করে। মধুসূদন যখন কঠিন ব্যবহার করছিল তখন উত্তর সহজ ছিল, ও যখন নতি স্বীকার করে তখন

নিজেকে নিন্দে করা ছাড়া কোনো জবাব পায় না। স্বামীকে মনপ্রাণ সমর্পণ করতে না পারাটা মহাপাপ, এ সম্বন্ধে কুমুর সন্দেহ নেই, তবু ওর এমন দশা কেন হল? মেয়েদের একটিমাত্র লক্ষ্য সতী সাবিত্রী হয়ে ওঠা। সেই লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট হওয়ার পরম দুর্গতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়— তাই আজ ব্যাকুল হয়ে কুমু মধুসূদনকে বললে, 'তুমি আমাকে দয়া করো।'

'কিসের জন্যে দয়া করতে হবে?'

'আমাকে তোমার করে নাও—হুকুম করো, শাস্তি দাও। আমার মনে হয় আমি তোমার যোগ্য নই।'

শুনে বড়ো দুঃখে মধুসূদনের হাসি পেল। কুমু সতীর কর্তব্য করতে চায়। কুমু যদি সাধারণ গৃহিণী মাত্র হত, তা হলে এইটুকুই যথেষ্ট হত, কিন্তু কুমু যে ওর কাছে মন্ত্র-পড়া স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি, সেই বেশিটুকুকে পাবার জন্যে ও যতই মূল্য হাঁকছে সবই ব্যর্থ হচ্ছে। ধরা পড়ছে নিজের খর্বতা। কুমুর সঙ্গে নিজের দুর্লঙ্ঘ অসাম্য কেবলই ব্যাকুলতা বাড়িয়ে তুলছে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মধুসূদন বললে, 'একটি জিনিস যদি দিই তো কী দেবে বলো।'

কুমু বুঝতে পারলে দাদার দেওয়া সেই জিনিস, ব্যগ্রতার সঙ্গে মধুসূদনের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

'যেমন জিনিসটি তারই উপযুক্ত দাম নেব কিন্তু,' বলে খাটের নীচে থেকে রেশমের খোল দিয়ে মোড়া একটি এসরাজ বের করে তার মোড়কটি খুলে ফেললে। কুমুর সেই চিরপরিচিত এসরাজ, হাতির দাঁতে খচিত। বাড়ি থেকে চলে আসবার সময় এইটি ফেলে এসেছিল।

মধুসূদন বললে, 'খুশি হয়েছ তো? এইবার দাম দাও।'

মধুসূদন কী দাম চায় কুমু বুঝতে পারলে না, চেয়ে রইল। মধুসূদন বললে, 'বাজিয়ে শোনাও আমাকে।'

এটা বেশি কিছু নয়, তবু বড়ো শক্ত দাবি। কুমু এইটুকু আন্দাজ করতে পেরেছে যে, মধুসূদনের মনে সংগীতের রস নেই। এর সামনে বাজানোর সংকোচ কাটিয়ে তোলা কঠিন। কুমু মুখ নিচু করে এসরাজের ছড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। মধুসূদন বললে, 'বাজাও-না বড়োবউ, আমার সামনে লজ্জা কোরো না।'

কুমু বললে, 'সুর বাঁধা নেই।'

'তোমার নিজের মনেরই সুর বাঁধা নেই, তাই বলো-না কেন?'

কথাটার সত্যতায় কুমুর মনে তখনই ঘা লাগল; 'যন্ত্রটা ঠিক করে রাখি, তোমাকে আর-এক দিন শোনাব।'

'কবে শোনাবে ঠিক করে বলো। কাল?'

'আচ্ছা, কাল।'

'সন্ধেবেলায় আপিস থেকে ফিরে এলে?'

'হাঁ, তাই হবে।'

'এসরাজটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছ?'

'খুব খুশি হয়েছি।'

শালের ভিতর থেকে একটা চামড়ার কেস বের করে মধুসূদন বললে, 'তোমার জন্যে যে মুক্তার মালা কিনে এনেছি, এটা পেয়ে ততখানিই খুশি হবে না?'

এমনতরো মুশকিলের প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসা করা? কুমু চুপ করে এসরাজের ছড়িটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

'বুঝেছি, দরখাস্ত নামঞ্জুর।'

কুমু কথাটা ঠিক বুঝলে না।

মধুসূদন বললে, 'তোমার বুকের কাছে আমার অন্তরের এই দরখাস্তটি লটকিয়ে দেব ইচ্ছে ছিল—কিন্তু তার আগেই ডিস্‌মিস্।'

কুমুর সামনে মেজের উপর গয়নাটা রইল খোলা। দুজনে কেউ একটিও কথা বললে না। থেকে থেকে কুমু যেরকম স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে যায়, তেমনি হয়ে রইল। একটু পরে যেন সচেতন হয়ে মালাটা তুলে নিয়ে গলায় পরলে, আর মধুসূদনকে প্রণাম করলে। বললে, 'তুমি আমার বাজনা শুনবে?'

মধুসূদন বললে, 'হাঁ শুনব।'

'এখনই শোনাব' বলে এসরাজের সুর বাঁধলে। কেদারায় আলাপ আরম্ভ করলে; ভুলে গেল ঘরে কেউ আছে, কেদারা থেকে পৌঁছল ছায়ানটে। যে গানটি সে ভালোবাসে সেইটি ধরল 'ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।' সুরের আকাশে রঙিন ছায়া ফেলে এল সেই অপরূপ আবির্ভাব, যাকে কুমু গানে পেয়েছে, প্রাণে পেয়েছে, কেবল চোখে পাবার তৃষ্ণা নিয়ে যার জন্যে মিনতি চিরদিন রয়ে গেল—'ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে'।

মধুসূদন সংগীতের রস বোঝে না, কিন্তু কুমুর বিশ্ববিস্মৃত মুখের উপর যে সুর খেলছিল, এসরাজের পর্দায় পর্দায় কুমুর আঙুল-ছোঁয়ার যে ছন্দ নেচে উঠছিল তাই তার বুকে দোল দিলে—মনে হতে লাগল ওকে যেন কে বরদান করছে। আনমনে বাজাতে বাজাতে কুমু হঠাৎ এক সময়ে দেখতে পেলে মধুসূদন তার মুখের উপর একদৃষ্টে চেয়ে, অমনি হাত গেল থেমে, লজ্জা এল, বাজনা বন্ধ করে দিলে।

মধুসূদনের মন দাক্ষিণ্যে উদ্‌বেল হয়ে উঠল, বললে, 'বড়োবউ, তুমি কী চাও বলো।' কুমু যদি বলত, কিছুদিন দাদার সেবা করতে চাই, মধুসূদন তাতেও রাজি হতে পারত; কেননা আজ কুমুর গীতমুগ্ধ মুখের দিকে কেবলই চেয়ে চেয়ে সে নিজেকে বলছিল, 'এই তো আমার ঘরে এসেছে, এ কী আশ্চর্য সত্য!'

কুমু এসরাজ মাটিতে রেখে, ছড়ি ফেলে চুপ করে রইল।

মধুসূদন আর-একবার অনুনয় করে বললে, 'বড়োবউ, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। যা চাও তাই পাবে।'

কুমু বললে, 'মুরলী বেয়ারাকে একখানা শীতের কাপড় দিতে চাই।'

কুমু যদি বলত কিছু চাই নে, সেও ছিল ভালো, কিন্তু মুরলী বেহারার জন্যে গায়ের কম্বল! যে দিতে পারে মাথার মুকুট, তার কাছে চাওয়া জুতোর ফিতে!

মধুসূদন অবাক। রাগ হল বেহারাটার উপর। বললে, 'লক্ষ্মীছাড়া মুরলী বুঝি তোমাকে বিরক্ত করছে?'

'না, আমি আপনিই ওকে একটা আলোয়ান দিতে গেলুম, ও নিল না। তুমি যদি হুকুম কর তবে সাহস করে নেবে।'

মধুসূদন স্তব্ধ হয়ে রইল। খানিক পরে বললে, 'ভিক্ষে দিতে চাও! আচ্ছা দেখি, কই তোমার আলোয়ান?'

কুমু তার সেই অনেক দিনের পরা বাদামি রঙের আলোয়ান নিয়ে এল। মধুসূদন সেটা নিয়ে নিজের গায়ে জড়াল। টিপায়ের উপরকার ছোটো ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে একজন বুড়ি দাসী এল; তাকে বললে, 'মুরলী বেহারাকে ডেকে দাও।'

মুরলী এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল; শীতে ও ভয়ে তার জোড়া হাত কাঁপছে।

'তোমার মাজি তোমাকে বকশিশ দিয়েছেন', বলে মধুসূদন পকেট-কেস থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে তার ভাঁজ খুলে সেটা দিলে কুমুর হাতে। এ রকম অকারণে অযাচিত দান মধুসূদনের দ্বারা জীবনে কখনো ঘটে নি। অসম্ভব ব্যাপারে মুরলী বেহারার ভয় আরো বেড়ে উঠল, দ্বিধাকম্পিত স্বরে বললে, 'হুজুর—'

'হুজুর কী রে বেটা! বোকা, নে তোর মায়ের হাত থেকে। এই টাকা দিয়ে যত খুশি গরম কাপড় কিনে নিস।'

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হল—সেইসঙ্গে সেদিনকার আর সমস্তই যেন শেষ হয়ে গেল। যে স্রোতে কুমুর মন ভেসেছিল সে গেল হঠাৎ বন্ধ হয়ে, মধুসূদনের মনে আত্মত্যাগের যে ঢেউ চিত্ত-সংকীর্ণতার কূল ছাপিয়ে উঠেছিল তাও সামান্য বেহারার জন্য তুচ্ছ প্রার্থনায় ঠেকে গিয়ে আবার তলায় গেল নেমে। এর পর সহজে কথাবার্তা কওয়া দুই পক্ষেই অসাধ্য। আজ সন্ধের সময় সেই তালুক-কেনা ব্যাপার নিয়ে লোক এসে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে, এ কথাটা মধুসূদনের মনেই ছিল না। এতক্ষণ পরে চমকে উঠে ধিক্‌কার হল নিজের উপরে। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কাজ আছে, আসি।' দ্রুত চলে গেল।

পথের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর ঘরের সামনে এসে বেশ প্রকাশ্য কণ্ঠস্বরেই বললে, 'ঘরে আছ?'

শ্যামাসুন্দরী আজ খায় নি; একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে মেজেয় মাদুরের উপর অবসন্ন ভাবে শুয়ে ছিল। মধুসূদনের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী ঠাকুরপো?'

'পান দিলে না আমাকে?'

৪৪

বাইরে অন্ধকারে দরজার আড়ালে একটি মানুষ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল—হাবলু। কম সাহস না। মধুসূদনকে যমের মতো ভয় করে, তবু ছিল কাঠের পুতুলের মতো স্তব্ধ হয়ে। সেদিন মধুসূদনের কাছে তাড়া খাওয়ার পর থেকে জ্যাঠাইমার কাছে আসবার সুবিধে হয় নি, মনের ভিতর ছটফট করছে। আজ এই সন্ধ্যাবেলায় আসা নিরাপদ ছিল না। কিন্তু ওকে বিছানায় শুইয়ে রেখে মা যখন ঘরকন্নার কাজে চলে গেছে এমন সময় কানে এল এসরাজের সুর। কী বাজছে জানত না, কে বাজাচ্ছে বুঝতে পারে নি, জ্যাঠাইমার ঘর থেকে আসছে এটা নিশ্চিত; জ্যাঠামশায় সেখানে নেই এই তার বিশ্বাস, কেননা তাঁর সামনে কেউ বাজনা বাজাতে সাহস করবে এ কথা সে মনেই করতে পারে না। উপরের তলায় দরজার কাছে এসে জ্যাঠামশায়ের জুতোজোড়া দেখেই পালাবার উপক্রম করলে। কিন্তু যখন বাইরে থেকে চোখে পড়ল ওর জ্যাঠাইমা নিজে বাজাচ্ছেন, তখন কিছুতেই পালাতে পা সরল না। দরজার আড়ালে লুকিয়ে শুনতে লেগেছে। প্রথম থেকেই জ্যাঠাইমাকে ও জানে আশ্চর্য, আজ বিস্ময়ের অন্ত নেই। মধুসূদন চলে যেতেই মনের উচ্ছ্বাস আর ধরে রাখতে পারলে না—ঘরে ঢুকেই কুমুর কোলে গিয়ে বসে গলা জড়িয়ে ধরে কানের কাছে বললে, 'জ্যাঠাইমা।'

কুমু তাকে বুকে চেপে ধরে বললে, 'এ কী, তোমার হাত যে ঠাণ্ডা! বাদলার হাওয়া লাগিয়েছ বুঝি?'

হাবলু কোনো উত্তর করলে না, ভয় পেয়ে গেল। ভাবলে জ্যাঠাইমা এখনই বুঝি বিছানায় শুতে পাঠিয়ে দেবে। কুমু তাকে শালের মধ্যে ঢেকে নিয়ে নিজের দেহের তাপে গরম করে বললে, 'এখনো শুতে যাও নি গোপাল?'

'তোমার বাজনা শুনতে এসেছিলুম। কেমন করে বাজাতে পারলে জ্যাঠাইমা?'

'তুমি যখন শিখবে তুমিও পারবে।'

'আমাকে শিখিয়ে দেবে?'

এমন সময় মোতির মা ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকেই বলে উঠল, 'এই বুঝি দস্যি, এখানে লুকিয়ে বসে! আমি ওকে সাতরাজ্যি খুঁজে বেড়াচ্ছি। ঐদিকে সন্ধ্যাবেলায় ঘরের বাইরে দু পা চলতে গা ছম ছম করে, জ্যাঠাইমার কাছে আসবার সময় ভয়ডর থাকে না। চল্ শুতে চল্।'

হাবলু কুমুকে আঁকড়ে ধরে রইল।

কুমু বললে, 'আহা, থাক্‌-না আর-একটু।'

'এমন করে সাহস বেড়ে গেলে শেষকালে বিপদে পড়বে। ওকে শুইয়ে আমি এখনই আসছি।'

কুমুর বড়ো ইচ্ছে হল হাবলুকে কিছু দেয়, খাবার কিংবা খেলার জিনিস। কিন্তু দেবার মতো কিছু নেই, তাই ওকে চুমো খেয়ে বললে, 'আজ শুতে যাও, লক্ষ্মী ছেলে, কাল দুপুরবেলা তোমাকে বাজনা শোনাব।'

হাবলু করুণ মুখে উঠে মায়ের সঙ্গে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই মোতির মা ফিরে এল। নবীনের ষড়যন্ত্রের কী ফল হল তাই জানবার জন্যে মন অস্থির হয়ে আছে। কুমুর কাছে বসেই চোখে পড়ল, তার হাতে সেই নীলার আংটি। বুঝলে যে কাজ হয়েছে। কথাটা উত্থাপন করবার উপলক্ষ স্বরূপ বললে, 'দিদি, তোমার এই বাজনাটা পেলে কেমন করে?'

কুমু বললে, 'দাদা পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'বড়োঠাকুর তোমাকে এনে দিলেন বুঝি?'

কুমু সংক্ষেপে বললে, 'হাঁ।'

মোতির মা কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে উল্লাস বা বিস্ময়ের চিহ্ন খুঁজে পেলে না।

'তোমার দাদার কথা কিছু বললেন কি?'

'না।'

'পরশু তিনি তো আসবেন, তাঁর কাছে তোমার যাবার কথা উঠল না?'

'না, দাদার কোনো কথা হয় নি।'

'তুমি নিজেই চাইলে না কেন, দিদি?'

'আমি ওঁর কাছে আর যা-কিছু চাই নে কেন, এটা পারব না।'

'তোমার চাবার দরকার হবে না, তুমি অমনিই ওঁর কাছে চলে যেয়ো। বড়োঠাকুর কিছুই বলবেন না।'

মোতির মা এখনো একটা কথা সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি যে, মধুসূদনের অনুকূলতা কুমুর পক্ষে সংকট হয়ে উঠেছে; এর বদলে মধুসূদন যা চায় তা ইচ্ছে করলেও কুমু দিতে পারে না। ওর হৃদয় হয়ে গেছে দেউলে। এইজন্যেই মধুসূদনের কাছে দান গ্রহণ করে ঋণ বাড়াতে এত সংকোচ। কুমুর এমনও মনে হয়েছে যে, দাদা যদি আর কিছুদিন দেরি করে আসে তো সেও ভালো।

একটু অপেক্ষা করে থেকে মোতির মা বললে, 'আজ মনে হল বড়োঠাকুরের মন যেন প্রসন্ন।'

সংশয়ব্যাকুল চোখে কুমু মোতির মার মুখে তাকিয়ে বললে, 'এ প্রসন্নতা কেন ঠিক বুঝতে পারি নে, তাই আমার ভয় হয়; কী করতে হবে ভেবে পাই নে।'

কুমুর চিবুক ধরে মোতির মা বললে, 'কিছুই করতে হবে না; এটুকু বুঝতে পারছ না, এতদিন উনি কেবল কারবার করে এসেছেন, তোমার মতো মেয়েকে কোনোদিন দেখেন নি। একটু একটু করে যতই চিনছেন ততই তোমার আদর বাড়ছে।'

'বেশি দেখলে বেশি চিনবেন, এমন কিছুই আমার মধ্যে নেই ভাই। আমি নিজেই দেখতে পাচ্ছি আমার ভিতরটা শূন্য। সেই ফাঁকটাই দিনে দিনে ধরা পড়বে। সেইজন্যেই হঠাৎ যখন দেখি উনি খুশি হয়েছেন, আমার মনে হয় উনি বুঝি ঠকেছেন। যেই সেটা ফাঁস হবে সেই আরো রেগে উঠবেন। সেই রাগটাই যে সত্য, তাই তাকে আমি তেমন ভয় করি নে।'

'তোমার দাম তুমি কী জান দিদি! যেদিন এদের বাড়িতে এসেছ, সেইদিনই তোমার পক্ষ থেকে যা দেওয়া হল, এরা সবাই মিলে তা শুধতে পারবে না। আমার কর্তাটি তো একেবারে মরিয়া তোমার জন্যে সাগর লঙ্ঘন না করতে পারলে স্থির থাকতে পারছেন না। আমি যদি তোমাকে না ভালোবাসতুম তবে এই নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে যেত।'

কুমু হাসলে, বললে, 'কত ভাগ্যে এমন দেবর পেয়েছি।'

'আর তোমার এই জা-টি বুঝি ভাগ্যস্থানে রাহু না কেতু?'

'তোমাদের একজনের নাম করলে আর-একজনের নাম করবার দরকার হয় না।'

মোতির মা ডান হাত দিয়ে কুমুর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমার একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে।'

'কী বলো।'

'আমার সঙ্গে তুমি 'মনের কথা' পাতাও।'

'সে বেশ কথা, ভাই! প্রথম থেকে মনে মনে পাতানো হয়েই গেছে।'

'তা হলে আমার কাছে কিছু চেপে রেখো না। আজ তুমি অমন মুখটি করে কেন আছ কিছুই বুঝতে পারছি নে।'

খানিকক্ষণ মোতির মার মুখের দিকে চেয়ে থেকে কুমু বললে, 'ঠিক কথা বলব? নিজেকে আমার কেমন ভয় করছে।'

'সে কী কথা! নিজেকে কিসের ভয়?'

'আমি এতদিন নিজেকে যা মনে করতুম আজ হঠাৎ দেখছি তা নই। মনের মধ্যে সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই এসেছিলুম। দাদারা যখন দ্বিধা করেছেন, আমি জোর করেই নতুন পথে পা বাড়িয়েছি। কিন্তু যে মানুষটা ভরসা করে বেরোল তাকে আজ কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে।'

'তুমি ভালোবাসতে পারছ না! আচ্ছা, আমার কাছে লুকিয়ো না, সত্যি করে বলো, কাউকে কি ভালোবেসেছ? ভালোবাসা কাকে বলে তুমি কি জান?'

'যদি বলি জানি, তুমি হাসবে। সূর্য ওঠবার আগে যেমন আলো হয় আমার সমস্ত আকাশ ভরে ভালোবাসা তেমনি করেই জেগেছিল। কেবলই মনে হয়েছে সূর্য উঠল বলে। সেই সূর্যোদয়ের কল্পনা মাথায় করেই আমি বেরিয়েছি, তীর্থের জল নিয়ে—ফুলের সাজি সাজিয়ে। যে দেবতাকে এতদিন সমস্ত মন দিয়ে মেনে এসেছি, মনে হয়েছে তাঁর উৎসাহ পেলুম। যেমন করে অভিসারে বেরোয় তেমনি করেই বেরিয়েছি। অন্ধকার রাত্রিকে অন্ধকার বলে মনেই হয় নি, আজ আলোতে চোখ মেলে অন্তরেই বা কী দেখলুম, বাইরেই বা কী দেখছি। এখন বছরের পর বছর, মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটবে কী করে?'

'তুমি কি বড়োঠাকুরকে ভালোবাসতে পারবে না মনে কর?'

'পারতুম ভালোবাসতে। মনের মধ্যে এমন কিছু এনেছিলুম যাতে সবই পছন্দমত করে নেওয়া সহজ হত। গোড়াতেই সেইটেকে তোমার বড়োঠাকুর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। আজ সব জিনিস কড়া হয়ে আমাকে বাজছে। আমার শরীরের উপরকার নরম ছালটাকে কে যেন ঘষড়ে তুলে দিল, তাই চারি দিকে সবই আমাকে লাগছে, কেবলই লাগছে, যা-কিছু ছুঁই তাতেই চমকে উঠি; এর পরে কড়া পড়ে গেলে কোনো একদিন হয়তো সয়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনোদিন আর আনন্দ পাব না তো।'

'বলা যায় না ভাই।'

'খুব বলা যায়। আজ আমার মনে একটুমাত্র মোহ নেই। আমার জীবনটা একেবারে নির্লজ্জের মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে। নিজেকে একটু ভোলাবার মতো আড়াল কোথাও বাকি রইল না। মরণ ছাড়া মেয়েদের কি আর কোথাও নড়ে বসবার একটুও জায়গা নেই? তাদের সংসারটাকে নিষ্ঠুর বিধাতা এত আঁট করেই তৈরি করেছে।'

এতক্ষণ ধরে এমনতরো উত্তেজনার কথা কুমুর মুখে মোতির মা আর কোনোদিন শোনে নি; বিশেষ করে আজ যেদিন বড়োঠাকুরকে ওরা কুমুর প্রতি এতটা প্রসন্ন করে এনেছে, সেইদিনই কুমুর এই তীব্র অধৈর্য দেখে মোতির মা ভয় পেয়ে গেল। বুঝলে লতার একেবারে গোড়ায় ঘা লেগেছে, উপর থেকে অনুগ্রহের জল ঢেলে মালী আর একে তাজা করে তুলতে পারবে না।

একটু পরে কুমু বলে উঠল, 'জানি, স্বামীকে এই যে শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসমর্পণ করতে পারছি নে এ আমার মহাপাপ। কিন্তু সে পাপেও আমার তেমন ভয় হচ্ছে না যেমন হচ্ছে শ্রদ্ধাহীন আত্মসমর্পণের গ্লানির কথা মনে করে।'

মোতির মা কোনো উত্তর না ভেবে পেয়ে হতবুদ্ধির মতো বসে রইল। একটু চুপ করে থেকে কুমু বললে, 'তোমার কত ভাগ্যি ভাই, কত পুণ্যি করেছিলে, ঠাকুরপোকে এমন সমস্ত মনটা দিয়ে ভালোবাসতে পেরেছ। আগে মনে করতুম, ভালোবাসাই সহজ—সব স্ত্রী সব স্বামীকে আপনিই ভালোবাসে। আজ দেখতে পাচ্ছি ভালোবাসতে পারাটাই সব চেয়ে দুর্লভ, জন্মজন্মান্তরের সাধনায় ঘটে। আচ্ছা ভাই, সত্যি বলো সব স্ত্রীই কি স্বামীকে ভালোবাসে?'

মোতির মা একটু হেসে বললে, 'ভালো না বাসলেও ভালো স্ত্রী হওয়া যায়, নইলে সংসার চলবে কী করে?'

'সেই আশ্বাস দাও আমাকে। আর কিছু না হই ভালো স্ত্রী যেন হতে পারি। পুণ্য তাতেই বেশি, সেইটেই কঠিন সাধনা।'

'বাইরে থেকে তাতেও বাধা পড়ে।'

'অন্তর থেকে সে বাধা কাটিয়ে উঠতে পারা যায়। আমি পারব, আমি হার মানব না।'

'তুমি পারবে না তো কে পারবে?'

বৃষ্টি জোর করে চেপে এল। বাতাসে ল্যাম্পের আলো থেকে থেকে চকিত হয়ে ওঠে। দমকা হাওয়া যেন একটা ভিজে নিশাচর পাখির মতো পাখা ঝাপ্‌টে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কুমুর শরীরটা মনটা শির্‌ শির্‌ করে উঠল। সে বললে, 'আমার ঠাকুরের নামে আর জোর পাচ্ছি নে। মন্ত্র আবৃত্তি করে যাই, মনটা মুখ ফিরিয়ে থাকে, কিছুতে সাড়া দিতে চায় না। তাতেই সব চেয়ে ভয় হয়।'

বানানো কথায় মিথ্যে ভরসা দিতে মোতির মার ইচ্ছে হল না। কোনো উত্তর না করে সে কুমুকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরলে। এমন সময় বাইরে থেকে আওয়াজ পাওয়া গেল, 'মেজোবউ।'

কুমু খুশি হয়ে উঠে বললে, 'এসো, এসো ঠাকুরপো।'

'সন্ধ্যাবেলাকার ঘরের আলোটিকে ঘরে দেখতে পেলুম না, তাই খুঁজতে বেরিয়েছি।'

মোতির মা বললে, 'হায় হায়, মণিহারা ফণী যাকে বলে।'

'কে মণি আর কে ফণী তা চক্ষু নাড়া দেখলেই বোঝা যায়, কী বল বউরানী।'

'আমাকে সাক্ষী মেনো না ঠাকুরপো।'

'জানি, তা হলে আমি ঠকব।'

'তা তোমার হারাধনকে তুমি উদ্ধার করি নিয়ে যাও, আমি ধরে রাখব না।'

'হারাধনের জন্যে ওঁর কোনো উৎসাহ নেই দিদি, ছুতো করে বউরানীর চরণ দর্শন করতে এসেছেন।'

'ছুতোর কি কোনো দরকার আছে? চরণ আপনি ধরা দিয়েছে। সব চেয়ে যা অসাধ্য তার সাধনা করবে কে? সে যখন আসে সহজেই আসে। পৃথিবীতে হাজার হাজার মানুষ আছে আমার চেয়ে যোগ্য, তবু অমন সুন্দর পা দুখানি আমিই পারলুম ছুঁতে, তারা তো পারলে না। নবীনের জন্ম সার্থক হয়ে গেল বিনামূল্যে।'

'আঃ, কী বল ঠাকুরপো, তার ঠিক নেই। তোমার এনসাইক্লোপীডিয়া থেকে বুঝি—'

'অমন কথা বলতে পারবে না, বউরানী। চরণ বলতে কী বোঝায় তা ওরা জানবে কী করে? ছাগলের খুরের মতো সরু সরু ঠেকোওয়ালা জুতোর মধ্যে লক্ষ্মীদের পা কড়া জেনানার মধ্যে ওরা বন্দী করে রেখেছে। সাইক্লোপীডিয়াওয়ালার সাধ্য কী পায়ের মহিমা বোঝে। লক্ষ্মণ চোদ্দটা বৎসর কেবল সীতার পায়ের দিকে তাকিয়েই নির্বাসন কাটিয়ে দিলেন, তার মানে আমাদের দেশের

দেওয়রাই জানে। তা পায়ের উপরে শাড়ি টেনে দিচ্ছ তো দাও। ভয় নেই তোমার, পদ্ম সন্ধেবেলায় মুদে থাকে বলে তো বরাবর মুদেই থাকে না—আবার তো পাপড়ি খোলে।'

'ভাই মনের কথা, এমনিতরো স্তব করেই বুঝি ঠাকুরপো তোমার মন ভুলিয়েছেন?'

'একটুও না দিদি, মিষ্টি কথার বাজে খরচ করবার লোক নন উনি।'

'স্তুতির বুঝি দরকার হয় না?'

'বউরানী, স্তুতির ক্ষুধা দেবীদের কিছুতেই মেটে না, দরকার খুব আছে। কিন্তু শিবের মতো আমি তো পঞ্চানন নই, এই একটিমাত্র মুখের স্তুতি পুরোনো হয়ে গেছে, এতে উনি আর রস পাচ্ছেন না।'

এমন সময় মুরলী বেয়ারা এসে নবীনকে খবর দিলে, 'কর্তামহারাজা বাইরের আপিসঘরে ডাক দিয়েছেন।'

শুনে নবীনের মন খারাপ হয়ে গেল। সে ভেবেছিল মধুসূদন আজ আপিস থেকে ফিরেই একেবারে সোজা তার শোবার ঘরে এসে উপস্থিত হবে। নৌকো বুঝি আবার ঠেকে গেল চড়ায়।

নবীন চলে গেলে মোতির মা আস্তে আস্তে বললে, 'বড়োঠাকুর কিন্তু তোমাকে ভালোবাসেন সে কথা মনে রেখো।'

কুমু বললে, 'সেইটেই তো আমার আশ্চর্য ঠেকে।'

'বল কী, তোমাকে ভালোবাসা আশ্চর্য কেন? উনি কি পাথরের?'

'আমি ওঁর যোগ্য না।'

'তুমি যাঁর যোগ্য নও সে পুরুষ কোথায় আছে?'

'ওঁর কতবড়ো শক্তি, কত সম্মান, কত পাকা বুদ্ধি, উনি কত মস্ত মানুষ। আমার মধ্যে উনি কতটুকু পেতে পারেন? আমি যে কী অসম্ভব কাঁচা, তা এখানে এসে দুদিনে বুঝতে পেরেছি। সেইজন্যেই যখন উনি ভালোবাসেন তখনই আমার সব চেয়ে বেশি ভয় করে। আমি নিজের মধ্যে যে কিছুই খুঁজে পাই নে। এতবড়ো ফাঁকি নিয়ে আমি ওঁর সেবা করব কী করে? কাল রাত্তিরে বসে বসে মনে হল আমি যেন বেয়ারিং লেফাফা, আমাকে দাম দিয়ে নিতে হয়েছে, খুলে ফেললেই ধরা পড়বে যে ভিতরে চিঠিও নেই।'

'দিদি, হাসালে। বড়োঠাকুরের মস্তবড়ো কারবার, কারবারি বুদ্ধিতে ওঁর সমান কেউ নেই, সব জানি। কিন্তু তুমি কি ওঁর কারবারের ম্যানেজারি করতে এসেছ যে, যোগ্যতা নেই বলে ভয় পাবে? বড়োঠাকুর যদি মনের কথা খোলসা করে বলেন তবে নিশ্চয় বলবেন, তিনিও তোমার যোগ্য নন।'

'সে কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন।'

'বিশ্বাস হয় নি?'

'না। উলটে আমার ভয় হয়েছিল। মনে হয়েছিল আমার সম্বন্ধে ভুল করলেন, সে ভুল ধরা পড়বে।'

'কেন তোমার এমন মনে হল বলো দেখি।'

'বলব? এই যে আমার হঠাৎ বিয়ে হয়ে গেল, এ তো সমস্ত আমি নিজে ঘটিয়ে তুললুম—কিন্তু কী অদ্ভুত মোহে, কী ছেলেমানুষি করে! যা-কিছুতে আমাকে সেদিন ভুলিয়েছিল তার মধ্যে সমস্তই ছিল ফাঁকি। অথচ এমন দৃঢ় বিশ্বাস, এমন বিষম জেদ যে, সেদিন আমাকে কিছুতেই কেউ ঠেকাতে পারত না। দাদা তা নিশ্চিত জানতেন বলেই বৃথা বাধা দিলেন না; কিন্তু কত ভয় পেয়েছেন, কত উদ্‌বিগ্ন হয়েছেন, তা কি আমি বুঝতে পারি নি? বুঝতে পেরেও নিজের ঝোঁকটাকে একটুও সামলাই নি, এতবড়ো অবুঝ আমি। আজ থেকে চিরদিন আমি কেবলই কষ্ট পাব, কষ্ট দেব, আর প্রতিদিন মনে জানব এ সমস্তই আমার নিজের সৃষ্টি।'

মোতির মা কী যে বলবে কিছুই ভেবে পেলে না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা দিদি, তুমি যে বিয়ে করতে মন স্থির করলে, কী ভেবে?'

'তখন নিশ্চিত জানতুম, স্বামী ভালোমন্দ যাই হোক না কেন, স্ত্রীর সতীত্বগৌরব প্রমাণের একটা উপলক্ষমাত্র। মনে একটুও সন্দেহ ছিল না যে, প্রজাপতি যাকেই স্বামী বলে ঠিক করে দিয়েছেন তাকেই ভালোবাসবই। ছেলেবেলা থেকে কেবল মাকে দেখেছি, পুরাণ পড়েছি, কথকতা শুনেছি, মনে হয়েছে শাস্ত্রের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চলা খুব সহজ।'

'দিদি, উনিশ বছরের কুমারীর জন্যে শাস্ত্র লেখা হয় নি।'

'আজ বুঝতে পেরেছি সংসারে ভালোবাসাটা উপরি-পাওনা। ওটাকে বাদ দিয়েই ধর্মকে আঁকড়ে ধরে সংসারসমুদ্রে ভাসতে হবে। ধর্ম যদি সরস হয়ে ফুল না দেয়, ফল না দেয়, অন্তত শুকনো হয়ে যেন ভাসিয়ে রাখে।'

মোতির মা নিজে বিশেষ কিছু না বলে কুমুকে দিয়ে কথা বলিয়ে নিতে লাগল।

৪৫

মধুসূদন আপিসে গিয়েই দেখলে খবর ভালো নয়। মাদ্রাজের এক বড়ো ব্যাঙ্ক ফেল করেছে, তাদের সঙ্গে এদের কারবার। তার পরে কানে এল যে, কোনো ডাইরেক্‌টরের তরফ থেকে কোনো কোনো কর্মচারী মধুসূদনের অজানিতে খাতাপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে। এতদিন কেউ মধুসূদনকে সন্দেহ করতে সাহস করে নি, একজন যেই ধরিয়ে দিয়েছে অমনি যেন একটা মন্ত্রশক্তি ছুটে গেল। বড়ো কাজের ছোটো ত্রুটি ধরা সহজ, যারা মাতব্বর সেনাপতি তারা কত খুচরো হারের ভিতর দিয়ে মোটের উপর মস্ত করেই জেতে। মধুসূদন বরাবর তেমনি জিতেই এসেছে— তাই বেছে বেছে খুচরো হার কারও নজরেই পড়ে নি। কিন্তু বেছে বেছে তারই একটা ফর্দ বানিয়ে সেটা সাধারণ লোকের নজরে তুললে তারা নিজের বুদ্ধির তারিফ করে, বলে আমরা হলে এ ভুল করতুম না। কে তাদের বোঝাবে যে, ফুটো নৌকো নিয়েই মধুসূদন পাড়ি দিয়েছে, নইলে পাড়ি দেওয়াই হত না, আসল কথাটা এই যে কূলে পৌঁছোল। আজ নৌকোটা ডাঙায় তুলে ফুটোগুলোর বিচার করবার বেলায়, যারা নিরাপদে এসেছে ঘাটে, তাদের গা শিউরে উঠছে। এমনতরো টুকরো সমালোচনা নিয়ে আনাড়িদের ধাঁধা লাগানো সহজ। সাধারণত আনাড়িদের সুবিধে এই যে, তারা লাভ করতে চায়, বিচার করতে চায় না। কিন্তু যদি দৈবাৎ বিচার করতে বসে তবে মারাত্মক হয়ে ওঠে। এই সব বোকাদের উপর মধুসূদনের নিরতিশয় অবজ্ঞামিশ্রিত ক্রোধের উদয় হল। কিন্তু বোকাদের যেখানে প্রাধান্য সেখানে তাদের সঙ্গে রফা করা ছাড়া গতি নেই। জীর্ণ মই মচ্‌ মচ্‌ করে, দোলে, ভাঙার ভয় দেখায়, যে ব্যক্তি উপরে চড়ে তাকে এই পায়ের তলার অবলম্বনটাকে বাঁচিয়ে চলতেই হয়। রাগ করে লাথি মারতে ইচ্ছে করে, তাতে মুশকিল আরও বাড়বারই কথা।

শাবকের বিপদের সম্ভাবনা দেখলে সিংহিনী নিজের আহারের লোভ ভুলে যায়, ব্যাবসা সম্বন্ধে মধুসূদনের সেইরকম মনের অবস্থা। এ যে তার নিজের সৃষ্টি; এর প্রতি তার যে দরদ সে প্রধানত টাকার দরদ নয়। যার রচনাশক্তি আছে, আপন রচনার মধ্যে সে নিজেকেই নিবিড় করে পায়, সেই পাওয়াটা যখন বিপন্ন হয়ে ওঠে তখন জীবনের আর-সমস্ত সুখদুঃখকামনা তুচ্ছ হয়ে যায়। কুমু মধুসূদনকে কিছুদিন থেকে প্রবল টানে টেনেছিল, সেটা হঠাৎ আলগা হয়ে গেল। জীবনে ভালোবাসার প্রয়োজনটা মধুসূদন প্রৌঢ় বয়সে খুব জোরের সঙ্গে অনুভব করেছিল। এই উপসর্গ যখন অকালে দেখা দেয় তখন উন্দাম হয়েই ওঠে। মধুসূদনকে ধাক্কা কম লাগে নি, কিন্তু আজ তার বেদনা গেল কোথায়?

নবীন ঘরে আসতেই মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, 'আমার প্রাইভেট জমাখরচের খাতা বাইরের কোনো লোকের হাতে পড়েছে কি, জান?'

নবীন চমকে উঠল, বললে, 'সে কী কথা?'

'তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে খাতাঞ্জির ঘরে কেউ আনাগোনা করছে কি না।'

'রতিকান্ত বিশ্বাসী লোক, সে কি কখনো—'

'তার অজান্তে মুহুরিদের সঙ্গে কেউ কথা চালাচালি করছে বলে সন্দেহের কারণ ঘটেছে। খুব সাবধানে খবরটা জানা চাই কারা এর মধ্যে আছে।'

চাকর এসে খবর দিলে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। মধুসূদন সে কথায় মন না দিয়ে নবীনকে বললে, 'শীঘ্র আমার গাড়িটা তৈরি করে আনতে বলে দাও।'

নবীন বললে, 'খেয়ে বেরোবে না? রাত হয়ে আসছে।'

'বাইরেই খাব, কাজ আছে।'

নবীন মাথা হেঁট করে ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এল। সে যে কৌশল করেছিল ফেঁসে গেল বুঝি।

হঠাৎ মধুসূদন নবীনকে ফিরে ডেকে বললে, 'এই চিঠিখানা কুমুকে দিয়ে এসো।'

নবীন দেখলে বিপ্রদাসের চিঠি। বুঝলে এ চিঠি আজ সকালেই এসেছে, সন্ধেবেলায় নিজের হাতে কুমুকে দেবে বলে মধুসূদন রেখেছিল। এমনি করে প্রত্যেকবার মিলন উপলক্ষে একটা-কিছু অর্ঘ্য হাতে করে আনবার ইচ্ছে। আজ আপিসের কাজে হঠাৎ তুফান উঠে তার এই আদরের আয়োজনটুকু গেল ডুবে।

মাদ্রাজে যে ব্যাঙ্ক ফেল করেছে সেটার উপরে সাধারণের নিশ্চিত আস্থা ছিল। তার সঙ্গে ঘোষাল-কোম্পানির যে যোগ সে সম্বন্ধে অধ্যক্ষদের বা অংশীদারদের কারও মনে কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। যেই কল বিগড়ে গেল অমনি অনেকেই বলাবলি করতে আরম্ভ করলে যে, আমরা গোড়া থেকেই ঠাউরেছিলুম, ইত্যাদি।

সাংঘাতিক আঘাতের সময় ব্যাবসাকে যখন একজোট হয়ে রক্ষার চেষ্টা দরকার, সেই সময়েই পরাজয়ের সম্বন্ধে দোষারোপ প্রবল হয়ে ওঠে এবং যাদের প্রতি কারও ঈর্ষা আছে তাদেরকে অপদস্থ করবার চেষ্টায় টলমলে ব্যাবসাকে কাত করে ফেলা হয়। সেইরকম চেষ্টা চলবে মধুসূদন তা বুঝেছিল। মাদ্রাজ-ব্যাঙ্কের বিপর্যয়ে ঘোষাল-কোম্পানির লোকসানের পরিমাণ যে কতটা দাঁড়াবে এখনও তা নিশ্চিত জানবার সময় হয় নি, কিন্তু মধুসূদনের প্রতিপত্তি নষ্ট করবার আয়োজনে এও যে একটা মসলা জোগাবে তাতে সন্দেহ ছিল না। যাই হোক, সময় খারাপ, এখন অন্য সব কথা ভুলে এইটেতেই মধুসূদনকে কোমর বাঁধতে হবে।

রাত্রে মধুসূদনের সঙ্গে আলাপ হবার পর নবীন ফিরে এসে দেখলে কুমুর সঙ্গে মোতির মার তখনো কথা চলছে। নবীন বললে, 'বউরানী, তোমার দাদার চিঠি আছে।'

কুমু চমকে উঠে চিঠিখানা নিলে। খুলতে হাত কাঁপতে লাগল। ভয় হল হয়তো কিছু অপ্রিয় সংবাদ আছে। হয়তো এখন আসাই হবে না। খুব ধীরে ধীরে খাম খুলে পড়ে দেখলে। একটু চুপ করে রইল। মুখ দেখে মনে হল যেন কোথায় ব্যথা বেজেছে। নবীনকে বললে, 'দাদা আজ বিকেলে তিনটের সময় কলকাতায় এসেছেন।'

'আজই এসেছেন। তাঁর তো—'

'লিখেছেন দুই-একদিন পরে আসবার কথা ছিল কিন্তু বিশেষ কারণে আগেই আসতে হল।'

কুমু আর কিছু বললে না। চিঠির শেষ দিকে ছিল, একটু সেরে উঠলেই বিপ্রদাস কুমুকে দেখতে আসবে, সেজন্যে কুমু যেন ব্যস্ত বা উদ্‌বিগ্ন না হয়। এই কথাটাই আগেকার চিঠিতেও ছিল। কেন, কী হয়েছে? কুমু কী অপরাধ করেছে? এ যেন একরকম স্পষ্ট করেই বলা, তুমি

আমাদের বাড়িতে এসো না। ইচ্ছে করল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে খানিকটা কেঁদে নেয়। কান্না চেপে পাথরের মতো শক্ত হয়ে বসে রইল।

নবীন বুঝলে চিঠির মধ্যে একটা কী কঠিন মার আছে। কুমুর মুখ দেখে করুণায় ওর মন ব্যথিত হয়ে উঠল। বললে, 'বউরানী, তাঁর কাছে তো কালই তোমার যাওয়া চাই।'

'না, আমি যাব না।' যেমনি বলা অমনি আর থাকতে পারলে না, দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।

মোতির মা কোনো প্রশ্ন না করে কুমুকে বুকের কাছে টেনে নিলে, কুমু রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, 'দাদা আমাকে যেতে বারণ করেছেন।'

নবীন বললে, 'না না, বউরানী তুমি নিশ্চয় ভুল বুঝেছ।'

কুমু খুব জোরে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলে যে, সে একটুও ভুল বোঝে নি।

নবীন বললে, 'তুমি কোথায় ভুল বুঝেছ বলব? বিপ্রদাসবাবু মনে করেছেন আমার দাদা তোমাকে তাঁদের ওখানে যেতে দিতে চাইবেন না। চেষ্টা করতে গিয়ে পাছে তোমাকে অপমানিত হতে হয়, পাছে তুমি কষ্ট পাও সেইটে বাঁচাবার জন্যে তিনি নিজে থেকে তোমার রাস্তা সোজা করে দিয়েছেন।'

কুমু এক মুহূর্তে গভীর আরাম পেলে। তার ভিজে চোখের পল্লব নবীনের মুখের দিকে তুলে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চুপ করে চেয়ে রইল। নবীনের কথাটা যে সম্পূর্ণ সত্য তাতে একটুও সন্দেহ রইল না। দাদার স্নেহকে ক্ষণকালের জন্যেও ভুল বুঝতে পেরেছে বলে নিজের উপর ধিক্‌কার হল। মনে খুব একটা জোর পেলে। এখনি দাদার কাছে ছুটে না গিয়ে দাদার আসার জন্যে সে অপেক্ষা করতে পারবে। সেই ভালো।

মোতির মা চিবুক ধরে কুমুর মুখ তুলে ধরে বললে, 'বাস্‌ রে, দাদার কথার একটু আড় হাওয়া লাগলেই একেবারে অভিমানের সমুদ্র উথলে ওঠে।'

নবীন বললে, 'বউরানী, কাল তা 'হলে তোমার যাবার আয়োজন করি গে।'

'না, তার দরকার নেই।'

'দরকার নেই তো কী? তোমার দরকার না থাকে তো আমার দরকার আছে বৈকি।'

'তোমার আবার কিসের দরকার?'

'বা! আমার দাদাকে তোমার দাদা যা-কিছু ঠাওরাবেন সেটা বুঝি অমনি সয়ে যেতে হবে! আমার দাদার পক্ষ নিয়ে আমি লড়ব। তোমার কাছে হার মানতে পারব না। কাল তোমাকে ওঁর কাছে যেতেই হচ্ছে।'

কুমু হাসতে লাগল।

'বউরানী, এ ঠাট্টার কথা নয়। আমাদের বাড়ির অপবাদে তোমার অগৌরব। এখন চোখে মুখে একটু জল দিয়ে এসো, খেতে যাবে। ম্যানেজার-সাহেবের ওখানে দাদার আজ নিমন্ত্রণ। আমার বিশ্বাস তিনি আজ বাড়ির ভিতরে শুতে আসবেন না, দেখলুম বাইরের কামরায় তাঁর বিছানা তৈরি।'

এই খবরটা পেয়ে কুমু মনে মনে আরাম পেলে, তার পরক্ষণেই এতটা আরাম পেলে বলে লজ্জা বোধ হল।

রাত্রে শোবার ঘরে মোতির মার সঙ্গে নবীনের ঐ কথাটা নিয়ে পরামর্শ চলল। মোতির মা বললে, 'তুমি তো দিদিকে আশ্বাস দিলে। তার পরে?'

'তার পরে আবার কী? নবীনের যেমন কথা তেমনি কাজ। বউরানীকে যেতেই হবে, তার পরে যা হয় তা হবে।'

নতুন-গড়া রাজাদের পারিবারিক মর্যাদাবোধ খুবই উগ্র। এ'রা নিশ্চয় ঠিক করে আছেন যে, বিবাহ করে নববধূ তার পূর্ব-পদবীর চেয়ে অনেক উপরে উঠেছে; অতএব বাপের বাড়ি বলে

কোনো বালাই আছে এ কথা একেবারে ভুলতে দেওয়াই সংগত। এ অবস্থায় দুই দিক রক্ষা করা যদি অসম্ভব হয় তবে একটা দিক তো রাখতেই হবে। সেই দিকটা যে কোন্‌টা তা নবীন মনে মনে পাকা করে রাখলে। যেখানে দাদার অধিকার চরম, সেখানে ও কোনোদিন দাদার সঙ্গে লড়াই বাধাতে সাহস করতে পারবে এ কথা আর কিছুদিন আগে নবীন স্বপ্নেও ভাবতে পারত না।

স্বামীস্ত্রীতে পরামর্শ করে স্থির হল যে, কাল সকালে কুমু একবার মাত্র বিপ্রদাসের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্যে দেখা করে আসবে, এই প্রস্তাব মধুসূদনের কাছে করা হবে। যদি রাজি হয় এবং কুমুকে সেখানে পাঠানো যায় তা হলে তার পরে সেখান থেকে দু-চার দিনের মধ্যে তাকে না ফেরাবার সংগত কারণ বানানো শক্ত হবে না।

মধুসূদন বাড়ি ফিরল অনেক রাত্রে, সঙ্গে একরাশ কাগজপত্রের বোঝা। নবীন উঁকি মেরে দেখলে, মধুসূদন শুতে না গিয়ে চোখে চশমা এঁটে নীল পেনসিল হাতে আপিসঘরের ডেস্কে কোনো দলিলে বা দাগ দিচ্ছে, নোটবইয়ে বা নোট নিচ্ছে। নবীন সাহস করে ঘরে ঢুকেই বললে, 'দাদা, আমি কি তোমার কোনো কাজ করে দিতে পারি?' মধুসূদন সংক্ষেপে বললে, 'না।' ব্যাবসার এই সংকটের অবস্থাটাকে মধুসূদন সম্পূর্ণ নিজে আয়ত্ত করে নিতে চায়, সবটা তার একার চোখে প্রত্যক্ষ হওয়া দরকার; এ কাজে অন্যের দৃষ্টির সহায়তা নিতে গেলে নিজেকে দুর্বল করা হবে।

নবীন কোনো কথা বলবার ছিদ্র না পেয়ে বেরিয়ে গেল। শীঘ্র যে সুযোগ পাওয়া যাবে এমন তো ভাবে বোধ হল না। নবীনের পণ, কাল সকালেই বউরানীকে রওনা করে দেবে। আজ রাত্রেই সম্মতি আদায় করা চাই।

খানিকক্ষণ বাদে নবীন একটা ল্যাম্প হাতে করে দাদার টেবিলের উপরে রেখে বললে, 'তোমার আলো কম হচ্ছে।'

মধুসূদন অনুভব করলে, এই দ্বিতীয় ল্যাম্পে তার কাজের অনেকখানি সুবিধা হল। কিন্তু এই উপলক্ষেও কোনো কথার সূচনা হতে পারল না। আবার নবীনকে বেরিয়ে আসতে হল।

একটু পরেই মধুসূদনের অভ্যস্ত গুড়গুড়িতে তামাক সেজে তার চৌকির বাঁ পাশে বসিয়ে নলটা টেবিলের উপর আস্তে আস্তে তুলে রাখলে। মধুসূদন তখনি অনুভব করলে এটারও দরকার ছিল। ক্ষণকালের জন্যে পেনসিলটা রেখে তামাক টানতে লাগল।

এই অবকাশে নবীন কথা পাড়লে, 'দাদা, শুতে যাবে না? অনেক রাত হয়েছে। বউরানী তোমার জন্যে হয়তো জেগে বসে আছেন।'

'জেগে বসে আছেন' কথাটা এক মুহূর্তে মধুসূদনের মনের ভিতরে গিয়ে লাগল। ঢেউয়ের উপর দিয়ে জাহাজ যখন টলমল করতে করতে চলেছে, একটি ছোটো ডাঙার পাখি উড়ে এসে যেন মাস্তুলে বসল; ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভিতর ক্ষণকালের জন্যে মনে এনে দিলে শ্যামল দ্বীপের নিভৃত বনচ্ছায়ার ছবি। কিন্তু সে কথায় মন দেবার সময় নয়, জাহাজ চালাতে হবে।

মধুসূদন আপন মনের এইটুকু চাঞ্চল্যে ভীত হল। তখনি সেটা দমন করে বললে, 'বড়োবউকে শুতে যেতে বলো, আজ আমি বাইরে শোব।'

'তাঁকে নাহয় এখানে ডেকে দিই' বলে নবীন গুড়গুড়ির কলকেটাতে ফুঁ দিতে লাগল।

মধুসূদন হঠাৎ ঝেঁকে উঠে বলে উঠল, 'না না।'

নবীন তাতেও না দমে বললে, 'তিনি যে তোমার কাছে দরবার করবেন বলে বসে আছেন।'

রুক্ষস্বরে মধুসূদন বললে, 'এখন দরবারের সময় নেই।'

'তোমার তো সময় নেই দাদা, তাঁরও তো সময় কম।'

'কী, হয়েছে কী?'

'বিপ্রদাসবাবু আজ কলকাতায় এসেছেন খবর পাওয়া গেছে, তাই বউরানী কাল সকালে—'

'সকালে যেতে চান?'

'বেশিক্ষণের জন্যে না, একবার কেবল—'

মধুসূদন হাত ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বললে, 'তা যান-না, যান। বাস্, আর নয়, তুমি যাও।'

হুকুম আদায় করেই নবীন ঘর থেকে এক দৌড়। বাইরে আসতেই মধুসূদনের ডাক কানে এসে পৌঁছোল, 'নবীন।'

ভয় লাগল আবার বুঝি দাদা হুকুম ফিরিয়ে নেয়। ঘরে এসে দাঁড়াতেই মধুসূদন বললে, 'বড়োবউ এখন কিছুদিন তাঁর দাদার ওখানে গিয়েই থাকবেন, তুমি তার জোগাড় করে দিয়ো।'

নবীনের ভয় লাগল, দাদার এই প্রস্তাবে তার মুখে পাছে একটুও উৎসাহ প্রকাশ পায়। এমন-কি, সে একটু দ্বিধার ভাব দেখিয়ে মাথা চুলকোতে লাগল। বললে, 'বউরানী গেলে বাড়িটা বড়ো খালি-খালি ঠেকবে।'

মধুসূদন কোনো উত্তর না করে গুড়গুড়ির নলটা নামিয়ে রেখে কাজে লেগে গেল। বুঝতে পারলে প্রলোভনের রাস্তা এখনো খোলা আছে—ওদিকে একেবারেই না।

নবীন আনন্দিত হয়ে চলে গেল। মধুসূদনের কাজ চলতে লাগল। কিন্তু কখন এই কাজের ধারার পাশ দিয়ে আর-একটা উলটো মানস-ধারা খুলে গেছে তা সে অনেকক্ষণ নিজেই বুঝতে পারে নি। এক সময়ে নীল পেনসিল প্রয়োজন শেষ না হতেই ছুটি নিল, গুড়গুড়ির নলটা উঠল মুখে। দিনের বেলায় মধুসূদনের মনটা কুমুর ভাবনা সম্বন্ধে যখন সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি নিয়েছিল, তখন আগেকার দিনের মতো নিজের 'পরে নিজের একাধিপত্য ফিরে পেয়ে মধুসূদন খুব আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু যত রাত হচ্ছে ততই সন্দেহ হতে লাগল যে, শত্রু দুর্গ ছেড়ে পালায় নি। সুড়ঙ্গের ঘরে আছে গা ঢাকা দিয়ে।

বৃষ্টি থেমে গেছে, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ বাগানের কোণে এক প্রাচীন সিসু গাছের উপরে আকাশে উঠে আর্দ্র পৃথিবীকে বিহ্বল করে দিয়েছে। হাওয়াটা ঠান্ডা, মধুসূদনের দেহটা বিছানার ভিতরে একটা গরম কোমল স্পর্শের জন্য দাবি জানাতে আরম্ভ করেছে। নীল পেনসিলটা চেপে ধরে খাতাপত্রের উপর সে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু মনের গভীর আকাশে একটা কথা ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট আওয়াজে বাজছে, 'বউরানী হয়তো এতক্ষণ জেগে বসে আছেন।'

মধুসূদন পণ করেছিল, একটা বিশেষ কাজ আজ রাত্রের মধ্যেই শেষ করে রাখবে। সেটা কাল সকালের মধ্যে সারতে পারলে যে খুব বেশি অসুবিধা হত তা নয়। কিন্তু পণ রক্ষা করা ওর ব্যবসায়ের ধর্মনীতি। তার থেকে কোনো কারণে যদি ভ্রষ্ট হয় তবে নিজেকে ক্ষমা করতে পারে না। এতদিন ধর্মকে খুব কঠিনভাবেই রক্ষা করেছে। তার পুরস্কারও পেয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু ইদানীং দিনের মধুসূদনের সঙ্গে রাত্রের মধুসূদনের সুরের কিছু কিছু তফাত ঘটে আসছে—এক বীণায় দুই তারের মতো। যে দৃঢ় পণ করে ডেস্কের উপর ও ঝুঁকে পড়ে বসেছিল—রাত্রি যখন গভীর হয়ে এল, সেই পণের কোন্ একটা ফাঁকের ভিতর দিয়ে একটা উক্তি ভ্রমরের মতো ভন ভন করতে শুরু করলে, 'বউরানী হয়তো জেগে বসে আছেন।'

উঠে পড়ল। বাতি না নিভিয়ে খাতাপত্র যেমন ছিল তেমনি ভাবেই রেখে চলল শোবার ঘরের দিকে। অন্তঃপুরের আঙিনা-ঘেরা যে বারান্দা দিয়ে তেতালার ঘরে যেতে হয় সেই বারান্দায় রেলিঙের ধারে শ্যামাসুন্দরী মেজের উপর বসে। চাঁদ তখন মধ্য-আকাশে, তার আলো এসে তাকে ঘিরেছে। তাকে দেখাচ্ছে যেন কোন্ এক গল্পের বইয়ের ছবির মতো। অর্থাৎ সে যেন প্রতিদিনের মানুষ নয়, অতিনিকটের অতিপরিচয়ের কঠোর আবরণ থেকে যেন একটা দূরত্বের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে। সে জানত মধুসূদন এই পথ দিয়েই শোবার ঘরে যায়—সেই যাওয়ার দৃশ্যটা ওর কাছে অতি তীব্র বেদনার, সেইজন্যেই তার আকর্ষণটা এত প্রবল। কিন্তু শুধু হৃদয়টাকে ব্যর্থ বেদনায় বিদ্ধ করবার পাগলামিই যে এই প্রতীক্ষার মধ্যে আছে তা নয়, এর মধ্যে একটা প্রত্যাশাও আছে—যদি ক্ষণকালের মধ্যে একটা কিছু ঘটে যায়; অসম্ভব কখন সম্ভব হয়ে যাবে এই আশায় পথের ধারে জেগে থাকা।

মধুসূদন ওর দিকে একবার কটাক্ষ করে উপরে চলে গেল। শ্যামাসুন্দরী নিজের ভাগ্যের উপর রাগ করে রেলিং শক্ত করে ধরে তার উপরে মাথা ঠুকতে লাগল।

শোবার ঘরে গিয়ে মধুসূদন দেখে যে কুমু জেগে বসে নেই। ঘর অন্ধকার, নাবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে অল্প একটু আলো আসছে। মধুসূদন একবার ভাবল ফিরে চলে যাই, কিন্তু পারল না। গ্যাসের আলোটা জ্বালিয়ে দিলে। কুমু বিছানার মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে—আলো জ্বালাতেও ঘুম ভাঙল না। কুমুর এই আরামে ঘুমোনোর উপর ওর রাগ ধরল। অধৈর্যের সঙ্গে মশারি খুলে ধপ করে বিছানার উপর বসে পড়ল। খাটটা শব্দ করে কেঁপে উঠল।

কুমু চমকে উঠে বসল। আজ মধুসূদন আসবে না বলেই জানত। হঠাৎ তাকে দেখে মুখে এমন একটা ভাব এল যে, তাই দেখে মধুসূদনের বুকের ভিতর দিয়ে যেন একটা শেল বিঁধল। মাথায় রক্ত চড়ে গেল, বলে উঠল, 'আমাকে কোনোমতেই সইতে পারছ না, না?'

এমনতরো প্রশ্নের কী উত্তর দেবে কুমু তা ভেবেই পেলে না। সত্যিই হঠাৎ মধুসূদনকে দেখে ওর বুক কেঁপে উঠেছিল আতঙ্কে। তখন ওর মনটা সতর্ক ছিল না। যে ভাবটাকে ও নিজের কাছেও সর্বদা চেপে রাখতে চায়, যার প্রবলতা নিজেও কুমু সম্পূর্ণ জানে না সে তখন হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মধুসূদন চিবিয়ে চিবিয়ে বললে, 'দাদার কাছে যাবার জন্যে তোমার দরবার?'

কুমু এই মুহূর্তেই ওর পায়ে পড়তে প্রস্তুত হয়েছিল, কিন্তু ওর মুখে দাদার নাম শুনেই শক্ত হয়ে উঠল। বললে, 'না।'

'তুমি যেতে চাও না?'

'না, আমি চাই নে।'

'নবীনকে আমার কাছে দরবার করতে পাঠাও নি?'

'না, পাঠাই নি।'

'দাদার কাছে যাবার ইচ্ছে তাকে তুমি জানাও নি?'

'আমি তাঁকে বলেছিলুম, দাদাকে দেখতে আমি যাব না।'

'কেন?'

'তা আমি বলতে পারি নে।'

'বলতে পার না? আবার তোমার সেই নুরনগরি চাল?'

'আমি যে নুরনগরেরই মেয়ে।'

'যাও, তাদের কাছেই যাও। যোগ্য নও তুমি এখানকার। অনুগ্রহ করেছিলেম, মর্যাদা বুঝলে না। এখন অনুতাপ করতে হবে।'

কুমু কাঠ হয়ে বসে রইল, কোনো উত্তর করলে না। কুমুর হাত ধরে অসহ্য একটা ঝাঁকানি দিয়ে মধুসূদন বললে, 'মাপ চাইতেও জান না?'

'কিসের জন্যে?'

'তুমি যে আমার এ বিছানার উপরে শুতে পেরেছ তার জন্যে।'

কুমু তৎক্ষণাৎ বিছানা থেকে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল।

মধুসূদন বাইরের ঘরে যাবার পথে দেখলে শ্যামাসুন্দরী সেই বারান্দায় উপুড় হয়ে পড়ে। মধুসূদন পাশে এসে নিচু হয়ে তার হাত ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করে বললে, 'কী করছ শ্যামা?' অমনি শ্যামা উঠে বসে মধুসূদনের দুই পা বুকে জড়িয়ে ধরলে, গদ্‌গদ কণ্ঠে বললে, 'আমাকে মেরে ফেলো তুমি।'

মধুসূদন তাকে হাত ধরে তুলে দাঁড় করালে, বললে, 'ইস্, তোমার গা যে একেবারে ঠাণ্ডা হিম। চলো তোমাকে শুইয়ে দিয়ে আসি গে।' বলে তাকে নিজের শালের এক অংশে আবৃত করে

ডান হাত দিয়ে সবলে চেপে ধরে শোবার ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল। শ্যামা চুপি চুপি বললে, 'একটু বসবে না?'

মধুসূদন বললে, 'কাজ আছে।'

রাতের বেলা কোথা থেকে ভূত চেপে এতক্ষণ মধুসূদনের কাজ নষ্ট করে দেবার জোগাড় করেছে—আর নয়। কুমুর কাছ থেকে যে উপেক্ষা পেয়েছে তার ক্ষতিপূরণের ভাণ্ডার অন্য কোথাও জমা আছে এটুকু সে বুঝে নিলে। ভালোবাসার ভিতর দিয়ে মানুষ আপনার যে পরম মূল্য উপলব্ধি করে, আজ রাত্রে সেই অনুভব করবার প্রয়োজন মধুসূদনের ছিল। শ্যামাসুন্দরী সমস্ত জীবনমন দিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করে আছে, সেই আশ্বাসটুকু পেয়ে মধুসূদন আজ রাত্রে কাজের জোর পেলে, যে অমর্যাদার কাঁটা ওর মনের মধ্যে বিঁধে আছে তার বেদনা অনেকটা কমিয়ে দিলে।

এদিকে রাত্রে কুমু যে ধাক্কা পেলে তার মধ্যে ওর একটা সান্ত্বনা ছিল। যতবার মধুসূদন তাকে ভালোবাসা দেখিয়েছে, ততবারই কুমুর মনে একটা টানাটানি এসেছে; ভালোবাসার মূল্যেই এর পরিশোধ করা চাই এই কর্তব্যবোধে ওকে অত্যন্ত অস্থির করেছে। এ লড়াইয়ে কুমুর জেতবার কোনো আশা ছিল না। কিন্তু পরাভবটা কুশ্রী, সেটাকে কেবলই চাপা দেবার জন্যে এতদিন কুমু প্রাণপণে চেষ্টা করেছে। কাল রাত্রে সেই চাপা-দেওয়া পরাভবটা এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে গেল। কুমুর অসতর্ক অবস্থায় মধুসূদন স্পষ্ট করে দেখতে পেয়েছে যে কুমুর সমস্ত প্রকৃতি মধুসূদনের প্রকৃতির বিরুদ্ধ; এইটে নিশ্চিত জানা হয়ে গেল সে ভালো, তার পরে পরস্পরের যা কর্তব্য সেটা অকপটভাবে করা সম্ভব হবে। মধুসূদন ওকে কামনা করে, সেইখানেই সমস্যা; ক্ষোভের সঙ্গে ওকে যে বর্জন করতে চায় সেইখানেই সত্য। সত্যই মধুসূদনের বিছানায় শোবার অধিকার ওর নেই। শুয়ে ও কেবলই ফাঁকি দিচ্ছে। এ বাড়িতে ওর যে পদ সেটা বিড়ম্বনা।

আজ রাত্রে এই একটা প্রশ্ন বারবার কুমুর মনে উঠেছে—কুমুকে নিয়ে মধুসূদনের কেন এত নির্বন্ধ? ও তো কথায় কথায় নুরনগরি চালের প্রসঙ্গ তুলে কুমুকে খোঁটা দেয়, তার মানে কুমুর সঙ্গে ওদের একেবারে ধাতের তফাত, জাতের তফাত, কিন্তু মধুসূদন কেন তবে ওকে ভালোবাসা জানায়? একি কখনো সত্য ভালোবাসা হতে পারে? কুমুর নিশ্চয় বিশ্বাস, আজ মধুসূদন যাই মনে করুক না কেন, কুমুকে দিয়ে কখনোই ওর মন ভরতে পারে না। যত শীঘ্র মধুসূদন তা বোঝে ততই সকল পক্ষের মঙ্গল।

নবীন কাল রাত্রে দাদার কাছ থেকে সম্মতি নিয়ে যত আনন্দ করে শুতে গেল, আজ সকালে তার আর বড়ো-কিছু বাকি রইল না। কাল রাত্রি তখন আড়াইটা। মধুসূদন কাজ শেষ করে তখনি নবীনকে ডেকে পাঠিয়েছিল। হুকুম এই যে, কুমুদিনীকে বিপ্রদাসের ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, যতদিন মধুসূদন না আপনি ডেকে পাঠায় ততদিন ফিরে আসবার দরকার নেই। নবীন বুঝলে এটা নির্বাসনদণ্ড।

আঙিনা-ঘেরা চৌকো বারান্দার যে অংশে কাল রাত্রে মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার সাক্ষাৎ হয়েছিল, ঠিক তার বিপরীত দিকের বারান্দার সংলগ্ন নবীনের শোবার ঘর। তখন ওরা স্বামীস্ত্রী কুমুর সম্বন্ধেই আলোচনা করছিল। এমন সময় গলার শব্দ শুনে মোতির মা ঘরের দরজা খুলতেই জ্যোৎস্নার আলোতে মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার মিলনের ছবি দেখতে পেলে। বুঝতে পারলে কুমুর ভাগ্যের জালে এই রাত্রে নিঃশব্দে আর-একটা শক্ত গিঁঠ পড়ল।

নবীনকে মোতির মা বললে, 'ঠিক এই সংকটের সময় কি দিদির চলে যাওয়া ভালো হচ্ছে?'

নবীন বললে, 'এতদিন তো বউরানী ছিলেন না, কাণ্ডটা তো এতদূর কখনোই এগোয় নি। বউরানী আছেন বলেই এটা ঘটেছে।'

'কী বল তুমি।'

'বউরানী যে ঘুমন্ত ক্ষুধাকে জাগিয়েছেন তার অন্ন জোগাতে পারেন নি, তাই সে অনর্থপাত

করতে বসেছে। আমি তো বলি এই সময়টায় ওর দূরে থাকাই ভালো, তাতে আর-কিছু না হোক অন্তত উনি শান্তিতে থাকতে পারবেন।'

'তবে এটা কি এমনি ভাবেই চলবে?'

'যে আগুন নেবাবার কোনো উপায় নেই, সেটাকে আপনি জ্বলে ছাই হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে দেখতে হবে।'

পরদিন সকালে হাবলু সমস্তক্ষণ কুমুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরলে। গুরুমশায় যখন পড়ার জন্যে ওকে বাইরে ডেকে পাঠালে, ও কুমুর মুখের দিকে চাইলে। কুমু যদি যেতে বলত তো ও যেত, কিন্তু কুমু বেহারাকে বলে দিলে আজ হাবলুর ছুটি।

বধূ কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি যাচ্ছে সেই সুরটি আজ কুমুর যাত্রার সময় লাগল না। এ বাড়ি যেন ওকে আজ হারাতে বসেছে। যে পাখিকে খাঁচায় বন্দী করা হয়েছিল, আজ যেন দরজা একটু ফাঁক করতেই সে উড়ে পড়ল, আর যেন এ খাঁচায় সে ঢুকবে না।

নবীন বললে, 'বউরানী, ফিরে আসতে দেরি কোরো না এই কথাটা সব মন দিয়ে বলতে পারলে বেঁচে যেতুম, কিন্তু মুখ দিয়ে বেরোল না। যাদের কাছে তোমার যথার্থ সম্মান সেইখানেই তুমি থাকো গে। কোনো কালে নবীনকে যদি কোনো কারণে দরকার হয় স্মরণ কোরো।'

মোতির মা নিজের হাতে তৈরি আমসত্ত্ব আচার প্রভৃতি একটা হাঁড়িতে সাজিয়ে পালকিতে তুলে দিলে। বিশেষ কিছু বললে না। কিন্তু মনে তার বেশ একটু আপত্তি ছিল। যতদিন বাধা ছিল স্থূল, যতদিন মধুসূদন কুমুকে বাহির থেকে অপমান করেছে, মোতির মার সমস্ত মন ততদিন ছিল কুমুর পক্ষে; কিন্তু যে বাধা সূক্ষ্ম, যা মর্মগত, বিশ্লেষণ করে যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন, তারই শক্তি যে প্রবলতম, এ কথাটা মোতির মার কাছে সহজ নয়। স্বামী যে মুহূর্তে প্রসন্ন হবে সেই মুহূর্তে অবিলম্বে স্ত্রী সেটাকে সৌভাগ্য বলে গণ্য করবে, মোতির মা এইটেকেই স্বাভাবিক বলে জানে। এর ব্যতিক্রমকে সে বাড়াবাড়ি মনে করে। এমন-কি, এখনো যে বউরানী সম্বন্ধে নবীনের দরদ আছে, এটাতে তার রাগ হয়। কুমুর প্রকৃতিগত বিতৃষ্ণা যে একান্ত অকৃত্রিম, এটা যে অহংকার নয়, এমন-কি এইটে নিয়ে যে কুমুর নিজের সঙ্গে নিজের দুর্জয় বিরোধ, সাধারণত মেয়েদের পক্ষে এটা স্বীকার করে নেওয়া কঠিন। যে চীনে মেয়ে প্রথার অনুসরণে নিজের পা বিকৃত করতে আপত্তি করে নি, সে যদি শোনে জগতে এমন মেয়ে আছে যে আপনার এই পদসংকোচ-পীড়নকে স্বীকার করা অপমানজনক বলে মনে করে তবে নিশ্চয় সেই কুণ্ঠাকে সে হেসে উড়িয়ে দেয়, নিশ্চয় বলে ওটা ন্যাকামি। যেটা নিগূঢ়ভাবে স্বাভাবিক, সেইটেকেই সে জানে অস্বাভাবিক। মোতির মা একদিন কুমুর দুঃখে সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিল, বোধ করি সেই-জন্যই আজ তার মন এত কঠিন হতে আরম্ভ করেছে। প্রতিকূল ভাগ্য যখন বরদান করতে আসে, তখন তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে যে মেয়ে অবিলম্বে সে বর গ্রহণ করতে না পারে, তাকে মমতা করা মোতির মার পক্ষে অসম্ভব—এমন-কি মার্জনা করাও।

৪৬

বাড়ির সামনে আসতেই পালকির দরজা একটু ফাঁক করে কুমু উপরের দিকে চেয়ে দেখলে। রোজ এই সময়টা বিপ্রদাস রাস্তার ধারের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ত, আজ দেখলে সেখানে কেউ নেই। আজ যে কুমু এখানে আসবে সে খবর এ বাড়িতে পাঠানো হয় নি। পালকির সঙ্গে মহারাজার তকমা-পরা দরোয়ানকে দেখে এ বাড়ির দরোয়ান ব্যস্ত হয়ে উঠল, বুঝলে যে দিদি-ঠাকরুন এসেছে। বার-বাড়ির আঙিনা পার হয়ে অন্তঃপুরের দিকে পালকি চলেছিল। কুমু থামিয়ে দ্রুতপদে বাইরের সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে উঠে চলল। তার ইচ্ছে তাকে আর কেউ দেখবার

আগে সব প্রথমেই দাদার সঙ্গে তার দেখা হয়। নিশ্চয় সে জানত, বাইরের আরাম-কামরাতেই রোগীর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। ওখানে জানলা থেকে বাগানের কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন ও অশথ গাছের একটি কুঞ্জসভা দেখতে পাওয়া যায়। সকালের রোদ্দুর ডালপালার ভিতর দিয়ে এই ঘরেই প্রথম দেখা দেয়। এই ঘরটিই বিপ্রদাসের পছন্দ।

কুমু সিঁড়ির কাছে আসতেই সর্বাগ্রে টম কুকুর ছুটে এসে ওর গায়ের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেঁচিয়ে লেজ ঝাপটিয়ে অস্থির করে দিলে। কুমুর সঙ্গে সঙ্গেই লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে চেঁচাতে টম চলল। বিপ্রদাস একটা মুড়ে-তোলা কৌচের পিঠে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া অবস্থায়, পায়ের উপর একটা ছিটের বালাপোশ টানা; একখানা বই নিয়ে ডান হাতটা বিছানার উপর এলিয়ে আছে, যেন ক্লান্ত হয়ে একটু আগে পড়া বন্ধ করেছে। চায়ের পেয়ালা আর ভুক্তাবশিষ্ট রুটি সমেত একটা পিরিচ পাশে মেজের উপরে পড়ে। শিয়রের কাছে দেয়ালের গায়ের শেলফে বইগুলো উলটপালট এলোমেলো। রাত্রে যে ল্যাম্প জ্বলেছিল সেটা ধোঁয়ায় দাগি অবস্থায় ঘরের কোণে এখনো পড়ে আছে।

কুমু বিপ্রদাসের মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠল। ওর এমন বিবর্ণ রুগ্ণ মূর্তি কখনো দেখে নি। সেই বিপ্রদাসের সঙ্গে এই বিপ্রদাসের যেন কত যুগের তফাত। দাদার পায়ের তলায় মাথা রেখে কুমু কাঁদতে লাগল।

'কুমু যে, এসেছিস? আয় এইখানে আয়।' বলে বিপ্রদাস তাকে পাশে টেনে নিয়ে এল। যদিও চিঠিতে বিপ্রদাস তাকে আসতে একরকম বারণ করেছিল, তবু তার মনে আশা ছিল যে কুমু আসবে। আসতে পেরেছে দেখে ওর মনে হল, তবে হয়তো কোনো বাধা নেই—তবে কুমুর পক্ষে তার ঘরকন্না সহজ হয়ে গেছে। এদের পক্ষ থেকেই কুমুকে আনবার জন্যে প্রস্তাব, পালকি ও লোক পাঠানোই নিয়ম—কিন্তু তা না হওয়া সত্ত্বেও কুমু এল, এটাতে ওর যতটা স্বাধীনতা কল্পনা করে নিলে ততটা মধুসূদনের ঘরে বিপ্রদাস একেবারেই প্রত্যাশা করে নি।

কুমু তার দুই হাত দিয়ে বিপ্রদাসের আলুথালু চুল একটু পরিপাটি করতে করতে বললে, 'দাদা, তোমার এ কী চেহারা হয়েছে!'

'আমার চেহারা ভালো হবার মতো ইদানীং তো কোনো ঘটনা ঘটে নি—কিন্তু তোর এ কী রকম শ্রী! ফ্যাকাশে হয়ে গেছিস যে।'

ইতিমধ্যে খবর পেয়ে ক্ষেমা পিসি এসে উপস্থিত। সেইসঙ্গে দরজার কাছে একদল দাসী চাকর ভিড় করে জমা হল। ক্ষেমা পিসিকে প্রণাম করতেই পিসি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলে। দাসদাসীরা এসে প্রণাম করলে। সকলের সঙ্গে কুশলসম্ভাষণ হয়ে গেলে পর কুমু বললে, 'পিসি, দাদার চেহারা বড়ো খারাপ হয়ে গেছে।'

'সাধে হয়েছে! তোমার হাতের সেবা না পেলে ওর দেহ যে কিছুতেই ভালো হতে চায় না। কতদিনের অভ্যেস!'

বিপ্রদাস বললে, 'পিসি, কুমুকে খেতে বলবে না?'

'খাবে না তো কী! সেও কি বলতে হবে? ওদের পালকির বেহারা-দরোয়ান সবাইকে বসিয়ে এসেছি, তাদের খাইয়ে দিয়ে আসি গে। তোমরা দুজনে এখন গল্প করো, আমি চললুম।'

বিপ্রদাস ক্ষেমা পিসিকে ইশারা করে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু বলে দিলে। কুমু বুঝলে ওদের বাড়ির লোকদের কী ভাবে বিদায় করতে হবে তারই পরামর্শ। এই পরামর্শের মধ্যে কুমু আজ অপর পক্ষ হয়ে উঠেছে। ওর কোনো মত নেই। এটা ওর একটুও ভালো লাগল না। কুমুও তার শোধ তুলতে বসল। এ বাড়িতে তার চিরকালের স্থান ফিরে দখলের কাজ শুরু করে দিলে।

প্রথমত, দাদার খানসামা গোকুলকে ফিস ফিস করে কী একটা হুকুম করলে, তার পরে লাগল নিজের মনের মতো করে ঘর গোছাতে। বাইরের বারান্দায় সরিয়ে দিলে পিরিচ পেয়ালা, ল্যাম্প, খালি সোডা-ওয়াটারের বোতল, একখানা বেত-ছেঁড়া চৌকি, গোটাকতক ময়লা তোয়ালে এবং গেঞ্জি।

শেলফের উপর বইগুলো ঠিকমত সাজালে, দাদার হাতের কাছাকাছি একখানি টিপাই সরিয়ে এনে তার উপরে গুছিয়ে রাখলে পড়বার বই, কলমদান, ব্লটিংপ্যাড, খাবার জলের কাঁচের সোরাই আর গেলাস, ছোটো একটি আয়না এবং চিরুনি-ব্রুশ।

ইতিমধ্যে গোকুল একটা পিতলের জগে গরম জল, একটা পিতলের চিলেমচি, আর সাফ তোয়ালে বেতের মোড়ার উপর এনে রাখলে। কিছুমাত্র সম্মতির অপেক্ষা না রেখে কুমু গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে বিপ্রদাসের মুখ-হাত মুছিয়ে দিয়ে তার চুল আঁচড়িয়ে দিলে, বিপ্রদাস শিশুর মতো চুপ করে সহ্য করল। কখন কী ওষুধ খাওয়াতে হবে এবং পথ্যের নিয়ম কী সমস্ত জেনে নিয়ে এমনভাবে গুছিয়ে বসল যেন ওর জীবনে আর কোথাও কোনো দায়িত্ব নেই।

বিপ্রদাস মনে মনে ভাবতে লাগল এর অর্থটা কী? ভেবেছিল, দেখা করতে এসেছে আবার চলে যাবে, কিন্তু সেরকম ভাব তো নয়। শ্বশুরবাড়িতে কুমুর সম্বন্ধটা কী রকম দাঁড়িয়েছে সেটা বিপ্রদাস জানতে চায়, কিন্তু স্পষ্ট করে প্রশ্ন করতে সংকোচ বোধ করে। কুমুর নিজের মুখ থেকেই শুনবে এই আশা করে রইল। কেবল আস্তে আস্তে একবার জিজ্ঞাসা করলে, 'আজ তোকে কখন যেতে হবে?'

কুমু বললে, 'আজ যেতে হবে না।'

বিপ্রদাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এতে তোর শ্বশুরবাড়িতে কোনো আপত্তি নেই?'

'না, আমার স্বামীর সম্মতি আছে।'

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। কুমু ঘরের কোণের টেবিলটাতে একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে তার উপর ওষুধের শিশি বোতল প্রভৃতি গুছিয়ে রাখতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করলে, 'তোকে কি তবে কাল যেতে হবে?'

'না, এখন আমি কিছুদিন তোমার কাছে থাকব।'

টম কুকুরটা কৌচের নীচে শান্ত হয়ে নিদ্রার সাধনায় নিযুক্ত ছিল, কুমু তাকে আদর করে তার প্রীতি-উচ্ছ্বাসকে অসংযত করে তুললে। সে লাফিয়ে উঠে কুমুর কোলের উপরে দুই পা তুলে কলভাষায় উচ্চস্বরে আলাপ আরম্ভ করে দিলে। বিপ্রদাস বুঝতে পারলে কুমু হঠাৎ এই গোল-মালটা সৃষ্টি করে তার পিছনে একটু আড়াল করলে আপনাকে।

খানিক বাদে কুকুরের সঙ্গে খেলা বন্ধ করে কুমু মুখ তুলে বললে, 'দাদা, তোমার বার্লি খাবার সময় হয়েছে, এনে দিই।'

'না সময় হয় নি' বলে কুমুকে ইশারা করে বিছানার পাশের চৌকিতে বসালে। আপনার হাতে তার হাত তুলে নিয়ে বললে, 'কুমু, আমার কাছে খুলে বল্‌, কী রকম চলছে তোদের।'

তখনি কুমু কিছু বলতে পারলে না। মাথা নিচু করে বসে রইল, দেখতে দেখতে মুখ হল লাল, শিশুকালের মতো করে বিপ্রদাসের প্রশস্ত বুকের উপর মুখ রেখে কেঁদে উঠল; বললে, 'দাদা, আমি সবই ভুল বুঝেছি, আমি কিছুই জানতুম না।'

বিপ্রদাস আস্তে আস্তে কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। খানিক বাদে বললে, 'আমি তোকে ঠিকমত শিক্ষা দিতে পারি নি। মা থাকলে তোকে তোর শ্বশুরবাড়ির জন্যে প্রস্তুত করে দিতে পারতেন।'

কুমু বললে, 'আমি বরাবর কেবল তোমাদেরই জানি, এখান থেকে অন্য জায়গা যে এত বেশি তফাত তা আমি মনে করতে পারতুম না। ছেলেবেলা থেকে আমি যা-কিছু কল্পনা করেছি সব তোমাদেরই ছাঁচে। তাই মনে একটুও ভয় হয় নি। মাকে অনেক সময়ে বাবা কষ্ট দিয়েছেন জানি, কিন্তু সে ছিল দুরন্তপনা, তার আঘাত বাইরে, ভিতরে নয়। এখানে সমস্তটাই অন্তরে অন্তরে আমার যেন অপমান।'

বিপ্রদাস কোনো কথা না বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে বসে ভাবতে লাগল। মধুসূদন যে ওদের থেকে সম্পূর্ণ আর-এক জগতের মানুষ, তা সেই বিবাহ-অনুষ্ঠানের আরম্ভ থেকেই

বুঝতে পেরেছে। তারই বিষম উদ্‌বেগে ওর শরীর যেন কোনোমতেই সুস্থ হয়ে উঠছে না। এই দিঙ্‌নাগের স্থূলহস্তাবলেপ থেকে কুমুকে উদ্ধার করবার তো কোনো উপায় নেই। সকলের চেয়ে মুশকিল এই যে, এই মানুষের কাছে ঋণে ওর সমস্ত সম্পত্তি বাঁধা। এই অপমানিত সম্বন্ধের ধাক্কা যে কুমুকেও লাগছে। এতদিন রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে বিপ্রদাস কেবলই ভেবেছে মধুসূদনের এই ঋণের বন্ধন থেকে কেমন করে সে নিষ্কৃতি পাবে। ওর কলকাতায় আসবার ইচ্ছে ছিল না, পাছে কুমুর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে ওদের সহজ ব্যবহার অসম্ভব হয়। কুমুর উপর ওর যে স্বাভাবিক স্নেহের অধিকার আছে, পাছে তা পদে পদে লাঞ্ছিত হতে থাকে, তাই ঠিক করেছিল নুরনগরেই বাস করবে। কলকাতায় আসতে বাধ্য হয়েছে অন্য কোনো মহাজনের কাছ থেকে ধার নেবার ব্যবস্থা করবে বলে। জানে যে এটা অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তাই এর দুশ্চিন্তার বোঝা ওর বুকের উপর চেপে বসে আছে।

খানিক বাদে কুমু বিপ্রদাসের থেকে অন্যদিকে ঘাড় একটু বেঁকিয়ে বললে, 'আচ্ছা দাদা, স্বামীর 'পরে কোনোমতে মন প্রসন্ন করতে পারছি নে, এটা কি আমার পাপ?'

'কুমু, তুই তো জানিস, পাপপুণ্য সম্বন্ধে আমার মতামত শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না।'

অন্যমনস্কভাবে কুমু একটা ছবিওয়ালা ইংরেজি মাসিক পত্রের পাতা ওলটাতে লাগল। বিপ্রদাস বললে, 'ভিন্ন ভিন্ন মানুষের জীবন তার ঘটনায় ও অবস্থায় এতই ভিন্ন হতে পারে যে, ভালোমন্দর সাধারণ নিয়ম অত্যন্ত পাকা করে বেঁধে দিলে অনেক সময়ে সেটা নিয়মই হয়, ধর্ম হয় না।'

কুমু মাসিক পত্রটার দিকে চোখ নিচু করে বললে, 'যেমন মীরাবাইএর জীবন।'

নিজের মধ্যে কর্তব্য-অকর্তব্যের দ্বন্দ্ব যখনি কঠিন হয়ে উঠেছে, কুমু তখনি ভেবেছে মীরাবাইএর কথা। একান্ত মনে ইচ্ছা করেছে কেউ ওকে মীরাবাইএর আদর্শটা ভালো করে বুঝিয়ে দেয়।

কুমু একটু চেষ্টা করে সংকোচ কাটিয়ে বলতে লাগল, 'মীরাবাই আপনার যথার্থ স্বামীকে অন্তরের মধ্যে পেয়েছিলেন বলেই সমাজের স্বামীকে মন থেকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু সংসারকে ছাড়বার সেই বড়ো অধিকার কি আমার আছে?'

বিপ্রদাস বললে, 'কুমু, তোর ঠাকুরকে তুই তো সমস্ত মন দিয়েই পেয়েছিস।'

'এক সময়ে তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু যখন সংকটে পড়লুম তখন দেখি প্রাণ আমার কেমন শুকিয়ে গেছে, এত চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতে তাঁকে যেন আমার কাছে সত্য করে তুলতে পারছি নে! আমার সবচেয়ে দুঃখ সেই।'

'কুমু, মনের মধ্যে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। কিছু ভয় করিস নে, রাত্তির মাঝে মাঝে আসে, দিন তা বলে তো মরে না। যা পেয়েছিস তোর প্রাণের সঙ্গে তা এক হয়ে গেছে।'

'সেই আশীর্বাদ করো, তাঁকে যেন না হারাই। নির্দয় তিনি দুঃখ দেন, নিজেকে দেবেন বলেই। দাদা, আমার জন্যে ভাবিয়ে আমি তোমাকে ক্লান্ত করছি।'

'কুমু, তোর শিশুকাল থেকে তোর জন্যে ভাবা যে আমার অভ্যেস। আজ যদি তোর কথা জানা বন্ধ হয়ে যায়, তোর জন্যে ভাবতে না পাই, তা হলে শূন্য ঠেকে। সেই শূন্যতা হাতড়াতে গিয়েই তো মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

কুমু বিপ্রদাসের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, 'আমার জন্যে তুমি কিন্তু কিছু ভেবো না দাদা। আমাকে যিনি রক্ষা করবেন তিনি ভিতরেই আছেন, আমার বিপদ নেই।'

'আচ্ছা, থাক ও-সব কথা। তোকে যেমন গান শেখাতুম, ইচ্ছে করছে তেমনি করে আজ তোকে শেখাই।'

'ভাগ্যি শিখিয়েছিলে দাদা, ওতেই আমাকে বাঁচায়। কিন্তু আজ নয়, তুমি আগে একটু জোর পাও। আজ আমি বরঞ্চ তোমাকে একটা গান শোনাই।'

দাদার শিয়রের কাছে বসে কুমু আস্তে আস্তে গাইতে লাগল,

পিয়া ঘর আয়ে, সোহী পীতম পিয় প্যার রে।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
চরণকমল বলিহার রে।

বিপ্রদাস চোখ বুজে শুনতে লাগল। গাইতে গাইতে কুমুর দুই চক্ষু ভরে উঠল এক অপরূপ দর্শনে। ভিতরের আকাশ আলো হয়ে উঠল। প্রিয়তম ঘরে এসেছেন, চরণকমল বুকের মধ্যে ছুঁতে পাচ্ছে। অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠল অন্তরলোক, যেখানে মিলন ঘটে। গান গাইতে গাইতে ও সেইখানে পেঁচেছে। 'চরণকমল বলিহার রে'—সমস্ত জীবন ভরে দিলে সেই চরণকমল, অন্ত নেই তার—সংসারে দুঃখ-অপমানের জায়গা রইল কোথায়। 'পিয়া ঘর আয়ে' তার বেশি আর কী চাই। এই গান কোনোদিন যদি শেষ না হয় তা হলে তো চিরকালের মতো রক্ষা পেয়ে গেল কুমু।

কিছু রুটি-টোস্ট আর এক পেয়ালা বার্লি গোকুল টিপাইএর উপর রেখে দিয়ে গেল। কুমু গান থামিয়ে বললে, 'দাদা, কিছুদিন আগে মনে মনে গুরু খুঁজছিলুম, আমার দরকার কী? তুমি যে আমাকে গানের মন্ত্র দিয়েছ।'

'কুমু, আমাকে লজ্জা দিস নে। আমার মতো গুরু রাস্তায় ঘাটে মেলে, তারা অন্যকে যে মন্ত্র দেয় নিজে তার মানেই জানে না। কুমু, কতদিন এখানে থাকতে পারবি ঠিক করে বল্ দেখি?'

'যতদিন না ডাক পড়ে।'

'তুই এখানে আসতে চেয়েছিলি?'

'না, আমি চাই নি।'

'এর মানে কী?'

'মানের কথা ভেবে লাভ নেই দাদা। চেষ্টা করলেও বুঝতে পারব না। তোমার কাছে আসতে পেরেছি এই যথেষ্ট। যতদিন থাকতে পারি সেই ভালো। দাদা, তোমার খাওয়া হচ্ছে না, খেয়ে নাও।'

চাকর এসে খবর দিলে মুখুজ্যেমশায় এসেছেন। বিপ্রদাস একটু যেন ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, 'ডেকে দাও।'

৪৭

কালু ঘরে ঢুকতেই কুমু তাকে প্রণাম করলে।

কালু বললে, 'ছোটোখুকি, এসেছ? এইবার দাদার সেরে উঠতে দেরি হবে না।'

কুমুর চোখ ছলছল করে উঠল। অশ্রু সামলে নিয়ে বললে, 'দাদা, তোমার বার্লিতে নেবুর রস দেবে না?'

বিপ্রদাস উদাসীন ভাবে হাত ওলটালে, অর্থাৎ না হলেই বা ক্ষতি কী? কুমু জানে বিপ্রদাস বার্লি খেতে ভালোবাসে না, তাই ও যখনি দাদাকে বার্লি খাইয়েছে বার্লিতে নেবুর রস এবং অল্প একটু গোলাপজল মিশিয়ে বরফ দিয়ে শরবতের মতো বানিয়ে দিত। সে আয়োজন আজ নেই, তবু বিপ্রদাস আপন ইচ্ছে কাউকে জানায়ও নি, যা পেয়েছে তাই বিতৃষ্ণার সঙ্গে খেয়েছে।

বার্লি ঠিকমত তৈরি করে আনবার জন্যে কুমু চলে গেল।

বিপ্রদাস উদ্‌বিগ্নমুখে জিজ্ঞাসা করলে, 'কালুদা, খবর কী বলো।'

'তোমার একলার সইয়ে টাকা ধার দিতে কেউ রাজি হয় না, সুবোধের সই চায়। মাড়োয়ারি ধনীদের কেউ কেউ দিতে পারে, কিন্তু সেটা নিতান্ত বাজিখেলার মতো করে—অত্যন্ত বেশি সুদে চায়, সে আমাদের পোষাবে না।'

'কালুদা, সুবোধকে তার করতে হবে আসবার জন্যে। আর দেরি করলে তো চলবে না।'

'আমারও ভালো ঠেকছে না। সেবারে তোমার সেই আংটি-বেচা টাকা নিয়ে যখন মূল দেনার এক অংশ শোধ করতে গেলুম, মধুসূদন নিতে রাজিই হল না; তখনি বুঝলুম সুবিধে নয়। নিজের মর্জিমত একদিন হঠাৎ কখন ফাঁস এ'টে ধরবে।'

বিপ্রদাস চুপ করে ভাবতে লাগল।

কালু বললে, 'দাদা, ছোটোখুকি যে হঠাৎ আজ সকালে চলে এল, রাগারাগি করে আসে নি তো? মধুসূদনকে চটাবার মতো অবস্থা আমাদের নয়, এটা মনে রাখতে হবে।'

'কুমু বলছে ওর স্বামীর সম্মতি পেয়েছে।'

'সম্মতিটার চেহারা কী রকম না জানলে মন নিশ্চিন্ত হচ্ছে না। কত সাবধানে ওর সঙ্গে ব্যবহার করি সে আর তোমাকে কী বলব দাদা। রাগে সর্ব অঙ্গ যখন জ্বলছে তখনো ঠাণ্ডা হয়ে সব সয়েছি, গৌরীশংকরের পাহাড়টার মতো দুপুর-রোদ্দুরেও তার বরফ গলে না। একে মহাজন তাতে ভগ্নীপতি, একে সামলে চলা কি সোজা কথা।'

বিপ্রদাস কোনো জবাব না করে চুপ করে ভাবতে লাগল।

কুমু এল বার্লি নিয়ে। বিপ্রদাসের মুখের কাছে পেয়ালা ধরে বললে, 'দাদা, খেয়ে নাও।'

বিপ্রদাস তার ভাবনা থেকে হঠাৎ চমকে উঠল। কুমু বুঝতে পারলে, গভীর একটা উদ্‌বেগের মধ্যে দাদা এতক্ষণ ডুবে ছিল।

কালু যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কুমু তার পিছন পিছন গিয়ে বারান্দায় ওকে ধরে বললে, 'কালুদা, আমাকে সব কথা বলতে হবে।'

'কী কথা বলতে হবে দিদি?'

'তোমাদের কী একটা নিয়ে ভাবনা চলছে।'

'বিষয় আছে ভাবনা নেই, সংসারে এও কি কখনো সম্ভব হয় খুকি? ও যে কাঁটাগাছের ফল, খিদের চোটে পেড়ে খেতেও হয়, পাড়তে গিয়ে সর্বাঙ্গ ছড়েও যায়।'

'সে-সব কথা পরে হবে, আমাকে বলো কী হয়েছে।'

'বিষয়কর্মের কথা মেয়েদের বলতে নিষেধ।'

'আমি নিশ্চয় জানি তোমাদের কী নিয়ে কথা হচ্ছে। বলব?'

'আচ্ছা, বলো।'

'আমার স্বামীর কাছে দাদার ধার আছে, সেই নিয়ে।'

কোনো জবাব না দিয়ে কালু তার বড়ো বড়ো দুই চোখ সকৌতুক বিস্ময়হাস্যে বিস্ফারিত করে কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমাকে বলতেই হবে, ঠিক বলেছি কি না।'

'দাদারই বোন তো, কথা না বলতেই কথা বুঝে নেয়।'

বিয়ের পরে প্রথম যেদিন বিপ্রদাসের মহাজন বলে মধুসূদন আস্ফালন করে শাসিয়ে কথা বলেছিল, সেইদিন থেকেই কুমু বুঝেছিল দাদার সঙ্গে স্বামীর সম্বন্ধের অগৌরব। প্রতিদিনই একান্তমনে ইচ্ছে করেছিল এটা যেন ঘুচে যায়। বিপ্রদাসের মনে এর অসম্মান যে বিঁধে আছে তাতে কুমুর সন্দেহ ছিল না। সেদিন নবীন যেই বিপ্রদাসের চিঠির ব্যাখ্যা করলে, অমনি কুমুর মনে এল সমস্তর মূলে আছে এই দেনাপাওনার সম্বন্ধ। দাদার শরীর কেন যে এত ক্লান্ত, কোন্ কাজের বিশেষ তাগিদে দাদা কলকাতায় চলে এসেছে, কুমু সমস্তই স্পষ্ট বুঝতে পারলে।

'কালুদা, আমার কাছে লুকিয়ো না, দাদা টাকা ধার করতে এসেছে।'

'তা, ধার করেই তো ধার শুধতে হবে; টাকা তো আকাশ থেকে পড়ে না। কুটুম্বদের খাতক হয়ে থাকাটা তো ভালো নয়।'

'সে তো ঠিক কথা, তা টাকার জোগাড় করতে পেরেছ?'

'ঘুরে ঘেরে দেখছি, হয়ে যাবে, ভয় কী।'

'না, আমি জানি, সুবিধে করতে পার নি।'

'আচ্ছা ছোটোখুকি, সবই যদি জান, আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? ছেলেবেলায় একদিন আমার গোঁফ টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করেছিলে, গোঁফ হল কেমন করে? বলেছিলুম, সময় বুঝে গোঁফের বীজ বুনেছিলুম বলে। তাতেই প্রশ্নটার তখনি নিষ্পত্তি হয়ে গেল। এখন হলে জবাব দেবার জন্যে ডাক্তার ডাকতে হত। সব কথাই যে তোমাকে স্পষ্ট করে জানাতে হবে সংসারের এমন নিয়ম নয়।'

'আমি তোমাকে বলে রাখছি কালুদা, দাদার সম্বন্ধে সব কথাই আমাকে জানতে হবে।'

'কী করে দাদার গোঁফ উঠল, তাও?'

'দেখো, অমন করে কথা চাপা দিতে পারবে না। আমি দাদার মুখ দেখেই বুঝেছি টাকার সুবিধে করতে পার নি।'

'নাই যদি পেরে থাকি, সেটা জেনে তোমার লাভ হবে কী?'

'সে আমি বলতে পারি নে, কিন্তু আমাকে জানতেই হবে। টাকা ধার পাও নি তুমি?'

'না, পাই নি।'

'সহজে পাবে না?'

'পাব নিশ্চয়ই, কিন্তু সহজে নয়। তা দিদি, তোমার কথার জবাব দেওয়ার চেষ্টা ছেড়ে পাবার চেষ্টায় বেরোলে কাজ হয়তো কিছু এগোতে পারে। আমি চললুম।'

খানিকটা গিয়েই আবার ফিরে এসে কালু বললে, 'খুকি, এখানে যে তুমি আজ চলে এলে, তার মধ্যে তো কোনো কাঁটা খোঁচা নেই? ঠিক সত্যি করে বলো।'

'আছে কি না তা আমি খুব স্পষ্ট করে জানি নে।'

'স্বামীর সম্মতি পেয়েছ?'

'না চাইতেই তিনি সম্মতি দিয়েছেন।'

'রাগ করে?'

'তাও আমি ঠিক জানি নে; বলেছেন, ডেকে পাঠাবার আগে আমার যাবার দরকার নেই।'

'সে কোনো কাজের কথা নয়, তার আগেই যেয়ো, নিজে থেকেই যেয়ো।'

'গেলে হুকুম মানা হবে না।'

'আচ্ছা, সে আমি দেখব।'

দাদা আজ এই যে বিষম বিপদে পড়েছে, এর সমস্ত অপরাধ কুমুর, এ কথা না মনে করে কুমু থাকতে পারল না। নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে, খুব কঠিন মার। শুনেছে এমন সন্ন্যাসী আছে যারা কন্টকশয্যায় শুয়ে থাকে, ও সেইরকম করে শুতে রাজি, যদি তাতে কোনো ফল পায়। কোনো যোগী কোনো সিদ্ধপুরুষ যদি ওকে রাস্তা দেখিয়ে দেয় তা হলে চিরদিন তার কাছে বিকিয়ে থাকতে পারে। নিশ্চয়ই তেমন কেউ আছে, কিন্তু কোথায় তাকে পাওয়া যায়? যদি মেয়েমানুষ না হত তা হলে যা হয় একটা কিছু উপায় সে করতই। কিন্তু মেজদাদা কী করছেন? একলা দাদার ঘাড়ে সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কোন্ প্রাণে ইংলণ্ডে বসে আছেন।

কুমু ঘরে ঢুকে দেখে বিপ্রদাস কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বিছানায় পড়ে আছে। এমন করলে শরীর কি সারতে পারে! বিরুদ্ধ ভাগ্যের দুয়ারে মাথা কুটে মরতে ইচ্ছে করে।

দাদার শিয়রের কাছে বসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কুমু বললে, 'মেজদাদা কবে আসবেন?'

'তা তো বলতে পারি নে।'

'তাঁকে আসতে লেখো-না।'

'কেন বল্ দেখি!'

'সংসারের সমস্ত দায় একলা তোমারই ঘাড়ে, এ তুমি বইবে কী করে?'

'কারও-বা থাকে দাবি, কারও-বা থাকে দায়; এই দুই নিয়ে সংসার। দায়টাকেই আমি আমার করেছি, এ আমি অন্যকে দেব কেন?'

'আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম জোর করে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতুম।'

'তা হলেই তো বুঝতে পারছিস কুমু, দায় ঘাড়ে নেবার একটা লোভ আছে। তুই নিজে নিতে পারছিস নে বলেই তোর মেজদাদাকে দিয়ে সাধ মেটাতে চাস। কেন আমিই বা কী অপরাধ করেছি।'

'দাদা, তুমি টাকা ধার করতে এসেছ?'

'কিসের থেকে বুঝলি?'

'তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি। আচ্ছা, আমি কি কিছুই করতে পারি নে?'

'কী করে বলো?'

'এই মনে করো, কোনো দলিলে সই করে। আমার সইয়ের কি কোনো দামই নেই'

'খুবই দাম আছে; সে আমাদের কাছে, মহাজনের কাছে নয়।'

'তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বলো, আমি কী করতে পারি।'

'লক্ষ্মী হয়ে শান্ত হয়ে থাক্, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা কর্, মনে রাখিস সংসারে সেও একটা মস্ত কাজ। তুফানের মুখে নৌকো ঠিক রাখাও যেমন একটা কাজ, মাথা ঠিক রাখাও তেমনি। আমার এসরাজটা নিয়ে আয়, একটু বাজা।'

'দাদা, আমার বড়ো ইচ্ছে করছে একটা কিছু করি।'

'বাজানোটা বুঝি একটা কিছু নয়।'

'আমি চাই খুব একটা শক্ত কাজ।'

'দলিলে নাম সই করার চেয়ে এসরাজ বাজানো অনেক বেশি শক্ত। আন্ যন্ত্রটা।'

৪৮

একদিন মধুসূদনকে সকলেই যেমন ভয় করত, শ্যামাসুন্দরীরও ভয় ছিল তেমনি। ভিতরে ভিতরে মধুসূদন তার দিকে কখনো কখনো যেন টলেছে, শ্যামাসুন্দরী তা আন্দাজ করেছিল। কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে যে ওর কাছে যাওয়া যায় তা ঠাহর করতে পারত না। হাতড়ে হাতড়ে মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছে, প্রত্যেকবার ফিরেছে ধাক্কা খেয়ে। মধুসূদন একনিষ্ঠ হয়ে ব্যাবসা গড়ে তুলছিল, কাঞ্চনের সাধনায় কামিনীকে সে অত্যন্তই তুচ্ছ করেছে, মেয়েরা সেইজন্যে ওকে অত্যন্তই ভয় করত। কিন্তু এই ভয়েরও একটা আকর্ষণ আছে। দূরে দূরে বক্ষ এবং সংকুচিত ব্যবহার নিয়েই শ্যামাসুন্দরী ঈষৎ একটা আবরণের আড়ালে মুগ্ধমনে মধুসূদনের কাছে কাছে ফিরেছে। এক একবার যখন অসতর্ক অবস্থায় মধুসূদন ওকে অল্প একটু প্রশ্রয় দিয়েছে, সেই সময়েই যথার্থ ভয়ের কারণ ঘটেছে; তার অনতিপরেই কিছুদিন ধরে বিপরীত দিক থেকে মধুসূদন প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে ওর জীবনে মেয়েরা একেবারেই হেয়। তাই এতকাল শ্যামাসুন্দরী নিজেকে খুবই সংযত করে রেখেছিল।

মধুসূদনের বিয়ের পর থেকে সে আর থাকতে পারছিল না। কুমুকে মধুসূদন যদি অন্য সাধারণ মেয়ের মতোই অবজ্ঞা করত, তা হলে সেটা একরকম সহ্য হত। কিন্তু শ্যামা যখন দেখলে রাশ আলগা দিয়ে মধুসূদনও কোনো মেয়েকে নিয়ে অন্ধবেগে মেতে উঠতে পারে, তখন সংযম রক্ষা তার পক্ষে আর সহজ রইল না। এ কয়দিন সাহস করে যখন তখন একটু একটু এগিয়ে

আসছিল, দেখেছিল এগিয়ে আসা চলে। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প বাধা পেয়েছে কিন্তু সেও দেখলে কেটে যায়। মধুসূদনের দুর্বলতা ধরা পড়েছে, সেইজন্যেই শ্যামার নিজের মধ্যেও ধৈর্য বাঁধ মানতে আর পারে না। কুমু চলে আসবার আগের রাত্রে মধুসূদন শ্যামাকে যত কাছে টেনেছিল এমন তো আর কখনোই হয় নি। তার পরেই ওর ভয় হল পাছে উলটো ধাক্কাটা জোরে এসে লাগে। কিন্তু এটুকু শ্যামা বুঝে নিয়েছে যে, ভীরুতা যদি না করে তবে ভয়ের কারণ আপনি কেটে যাবে।

সকালেই মধুসূদন বেরিয়ে গিয়েছিল, বেলা একটা পেরিয়ে বাড়ি এসেছে। ইদানীং অনেক কাল ধরে ওর স্নানাহারের নিয়মের এমন ব্যতিক্রম ঘটে নি। আজ বড়োই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে বাড়িতে যেই এল, প্রথম কথাই মনে হল, কুমু তার দাদার ওখানে চলে গেছে এবং খুশি হয়েই চলে গেছে। এতকাল মধুসূদন আপনাতে আপনি খাড়া ছিল, কখন এক সময়ে ঢিল দিয়েছে, শরীরমনের আতুরতার সময় কোনো মেয়ের ভালোবাসাকে আশ্রয় করবার সুপ্ত ইচ্ছা ওর মনে উঠেছে জেগে, সেইজন্যেই অনায়াসে কুমুর চলে যাওয়াতে ওর এমন ধিক্‌কার লাগল। আজ ওর খাবার সময়ে শ্যামাসুন্দরী ইচ্ছা করেই কাছে এসে বসে নি; কী জানি কাল রাত্রে নিজেকে ধরা দেবার পরে মধুসূদন নিজের উপর পাছে বিরক্ত হয়ে থাকে। খাবার পর মধুসূদন শূন্য শোবার ঘরে এসে একটুখানি চুপ করে থাকল, তার পরে নিজেই শ্যামাকে ডেকে পাঠালে। শ্যামা লাল রঙের একটা বিলিতি শাল গায়ে দিয়ে যেন একটু সংকুচিতভাবে ঘরে ঢুকে একধারে নতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল। মধুসূদন ডাকলে, 'এসো, এইখানে এসো, বসো।'

শ্যামা শিয়রের কাছে বসে 'তোমাকে যে বড়ো রোগা দেখাচ্ছে আজ' বলে একটু ঝুঁকে পড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

মধুসূদন বললে, 'আঃ, তোমার হাত বেশ ঠাণ্ডা।'

রাত্রে মধুসূদন যখন শুতে এল শ্যামাসুন্দরী অনাহূত ঘরে ঢুকে বললে, 'আহা, তুমি একলা।'

শ্যামাসুন্দরী একটু যেন স্পর্ধার সঙ্গেই কোনো আর আবরণ রাখতে দিলে না। যেন অসংকোচে সবাইকে সাক্ষী রেখেই ও আপনার অধিকার পাকা করে তুলতে চায়। সময় বেশি নেই, কবে আবার কুমু এসে পড়বে, তার মধ্যে দখল সম্পূর্ণ হওয়া চাই। দখলটা প্রকাশ্য হলে তার জোর আছে, কোনোখানে লজ্জা রাখলে চলবে না। অবস্থাটা দেখতে দেখতে দাসীচাকরদের মধ্যেও জানাজানি হল। মধুসূদনের মনে বহুকালের প্রবৃত্তির আগুন যতবড়ো জোরে চাপা ছিল, ততবড়ো জোরেই তা অবারিত হল, কাউকে কেয়ার করলে না, মত্ততা খুব স্থূলভাবেই সংসারে প্রকাশ করে দিলে।

নবীন মোতির মা দুজনেই বুঝলে এ বান আর ঠেকানো যাবে না।

'দিদিকে কি ডেকে আনবে না? আর কি দেরি করা ভালো?'

'সেই কথাই তো ভাবছি। দাদার হুকুম নইলে তো উপায় নেই। দেখি চেষ্টা করে।'

যেদিন সকালে কৌশলে দাদার কাছে কথাটা পাড়বে বলে নবীন এল, দেখে যে দাদা বেরোবার জন্যে প্রস্তুত, দরজার কাছে গাড়ি তৈরি।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথাও বেরোচ্ছ নাকি?'

মধুসূদন একটু সংকোচ কাটিয়ে বললে, 'সেই গণৎকার বেঙ্কটস্বামীর কাছে।'

নবীনের কাছে দুর্বলতা চাপা রাখতেই চেয়েছিল। হঠাৎ মনে হল ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই সুবিধা হতে পারে। তাই বললে, 'চলো আমার সঙ্গে।'

নবীন ভাবলে, সর্বনাশ। বললে, 'দেখে আসি গে সে বাড়িতে আছে কি না। আমার তো বোধ হচ্ছে সে দেশে চলে গেছে, অন্তত সেইরকম তো কথা।'

মধুসূদন বললে, 'তা বেশ তো, দেখে আসা যাক-না।'

নবীন নিরুপায় হয়ে সঙ্গে চলল, কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গণলে।

গণৎকারের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই নবীন তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে একটু উঁকি মেরেই বললে, 'বোধ হচ্ছে কেউ যেন বাড়িতে নেই।'

যেমন বলা, সেই মুহূর্তেই স্বয়ং বেঙ্কটস্বামী দাঁতন চিবোতে চিবোতে দরজার কাছে বেরিয়ে এল। নবীন দ্রুত তার গা ঘেঁষে প্রণাম করে বললে, 'সাবধানে কথা কবেন।'

সেই এঁদো ঘরে তক্তপোশে সবাই বসল। নবীন বসল মধুসূদনের পিছনে। মধুসূদন কিছু বলার আগেই নবীন বলে বসল, 'মহারাজের সময় বড়ো খারাপ যাচ্ছে, কবে গ্রহশান্তি হবে বলে দাও শাস্ত্রীজি।'

মধুসূদন নবীনের এই ফাঁস-করে-দেওয়া প্রশ্নে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বুড়ো আঙুল দিয়ে তার উরুতে খুব একটা টিপনি দিলে।

বেঙ্কটস্বামী রাশিচক্র কেটে একেবারে স্পষ্টই দেখিয়ে দিলে মধুসূদনের ধনস্থানে শনির দৃষ্টি পড়েছে।

গ্রহের নাম জেনে মধুসূদনের কোনো লাভ নেই, তার সঙ্গে বোঝাপড়া করা শক্ত। যে যে মানুষ ওর সঙ্গে শত্রুতা করছে স্পষ্ট করে তাদেরই পরিচয় চাই, বর্ণমালার যে বর্গেই পড়ুক নাম বের করতে হবে। নবীনের মুশকিল এই যে, সে মধুসূদনের আপিসের ইতিবৃত্তান্ত কিছুই জানে না। ইশারাতেও সাহায্য খাটবে না। বেঙ্কটস্বামী মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়ায় আর মধুসূদনের মুখের দিকে আড়ে আড়ে চায়। আজকের দিনের নামের বেলায় ভৃগুমুনি সম্পূর্ণ নীরব। হঠাৎ শাস্ত্রী বলে বসল, শত্রুতা করছে একজন স্ত্রীলোক।

নবীন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সেই স্ত্রীলোকটি যে শ্যামাসুন্দরী এইটে কোনোমতে খাড়া করতে পারলে আর ভাবনা নেই। মধুসূদন নাম চায়। শাস্ত্রী তখন বর্ণমালার বর্গ শুরু করলে। 'ক'বর্গ শব্দটা বলে যেন অদৃশ্য ভৃগুমুনির দিকে কান পেতে রইল— কটাক্ষে দেখতে লাগল মধুসূদনের দিকে। 'ক'বর্গ শুনেই মধুসূদনের মুখে ঈষৎ একটু চমক দিলে। ওদিকে পিছন থেকে 'না' সংকেত করে নবীন ডাইনে বাঁয়ে লাগাল ঘাড়-নাড়া। নবীনের জানাই নেই যে মাদ্রাজে এ সংকেতের উলটো মানে। বেঙ্কটস্বামীর আর সন্দেহ রইল না— জোরগলায় বললে, 'ক'বর্গ। মধুসূদনের মুখ দেখে ঠিক বুঝেছিল 'ক'বর্গের প্রথম বর্ণটাই। তাই কথাটাকে আরো একটু ব্যাখ্যা করে শাস্ত্রী বললে, এই কয়ের মধ্যেই মধুসূদনের সমস্ত কু।

এর পরে পুরো নাম জানবার জন্যে পীড়াপীড়ি না করে ব্যগ্র হয়ে মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, 'এর প্রতিকার?'

বেঙ্কটস্বামী গম্ভীরভাবে বলে দিলে, 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং— অর্থাৎ উদ্ধার করবে অন্য একজন স্ত্রীলোক।'

মধুসূদন চকিত হয়ে উঠল। বেঙ্কটস্বামী মানবচরিত্রবিদ্যার চর্চা করেছে।

নবীন অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'স্বামীজি, ঘোড়দৌড়ে মহারাজার ঘোড়াটা কি জিতেছে?'

বেঙ্কটস্বামী জানে অধিকাংশ ঘোড়াই জেতে না, একটু হিসাবের ভান করে বলে দিলে, 'লোকসান দেখতে পাচ্ছি।'

কিছুকাল আগেই মধুসূদনের ঘোড়া মস্ত জিত জিতেছে। মধুসূদনকে কোনো কথা বলবার সময় না দিয়ে মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ করে নবীন জিজ্ঞাসা করলে, 'স্বামীজি, আমার কন্যাটার কী গতি হবে?' বলা বাহুল্য, নবীনের কন্যা নেই।

বেঙ্কটস্বামী নিশ্চয় ঠাওরালে পাত্র খুঁজছে। নবীনের চেহারা দেখেই বুঝলে, মেয়েটি অপ্সরা নয়। বলে দিলে, পাত্র শীঘ্র মিলবে না, অনেক টাকা ব্যয় করতে হবে।

মধুসূদনকে একটু অবসর না দিয়ে পরে পরে দশ-বারোটা অসংগত প্রশ্নের অদ্ভুত উত্তর বের করে নিয়ে নবীন বললে, 'দাদা, আর কেন? এখন চলো।'

গাড়িতে উঠেই নবীন বলে উঠল, 'দাদা, ওর সমস্ত চালাকি। ভণ্ড কোথাকার!'

'কিন্তু সেদিন যে—'

'সেদিন ও আগে থাকতে খবর নিয়েছিল।'

'কেমন করে জানলে যে আমি আসব?'

'আমারই বোকামি। ঘাট হয়েছে ওর কাছে তোমাকে এনেছিলুম।'

জ্যোতিষীর প্রতারণার প্রমাণ যতই পাক, 'ক'বর্গের কু মধুসূদনের মনে বিঁধে রইল। ভেবে দেখলে যে, নক্ষত্র অনাদর করে খুচরো প্রশ্নের যা তা জবাব দেয়, কিন্তু আদত প্রশ্নের জবাবে ভুল হয় না। মধুসূদন যার প্রত্যাশাই করে নি সেই দুঃসময় ওর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই এল। এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ কী হবে?

নবীন আস্তে আস্তে কথা পাড়ল, 'দাদা, দুই সপ্তাহ তো কেটে গেল, এইবার বউরানীকে আনিয়ে নিই।'

'কেন, তাড়া কিসের? দেখো নবীন, তোমাকে বলে রাখলুম আর কখনোই এ-সব কথা আমার কাছে তুলবে না। যেদিন আমার খুশি আমি আনিয়ে নেব।'

নবীন দাদাকে চেনে, বুঝলে এ কথাটা খতম হয়ে গেল।

তবু সাহস করে জিজ্ঞাসা করলে, 'মেজোবউ যদি বউরানীকে দেখতে যায় তা হলে কি দোষ আছে?'

মধুসূদন অবজ্ঞা করে সংক্ষেপে বললে, 'যাক-না।'

৪৯

ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটা কেদারা দেখিয়ে দিয়ে বিপ্রদাস বললে, 'আসুন নবীনবাবু, এইখানে বসুন।'

নবীন বললে, 'আমার পরিচয়টা পান নি বোধ হচ্ছে। মনে করেছেন আমি রাজবাড়ির কোন্ আদুরে ছেলে। যিনি আপনার ছোটো বোন, আমি তাঁর অধম সেবক, আমাকে সম্মান করে আমায় আশীর্বাদটা ফাঁকি দেবেন না। কিন্তু করেছেন কী? আপনার অমন শরীরের কেবল ছায়াটি বাকি রেখেছেন!'

'শরীরটা সত্য নয়, ছায়া, মাঝে মাঝে সে খবরটা পাওয়া ভালো। ওতে শেষের পাঠ এগিয়ে থাকে।'

কুমু ঘরে ঢুকেই বললে, 'ঠাকুরপো, চলো কিছু খাবে।'

'খাব, কিন্তু একটা শর্ত আছে। যতক্ষণ পূরণ না হবে, ব্রাহ্মণ অতিথি অভুক্ত তোমার দ্বারে পড়ে থাকবে।'

'শর্তটা কী শুনি।'

'আমাদের বাড়িতে থাকতেই দরবার জানিয়ে রেখেছিলুম কিন্তু সেখানে জোর পাই নি। ভক্তকে একখানি ছবি তোমায় দিতে হবে। সেদিন বলেছিলে নেই, আজ তা বলবার জো নেই, তোমার দাদার ঘরের দেয়ালে ঐ তো সামনেই ঝুলছে।'

ভালো ছবি দৈবাৎ হয়ে থাকে, কুমুর ঐ ছবিটি তেমনি যেন দৈবের রচনা। কপালে যে আলোটি পড়লে কুমুর মনের চেহারাটি মুখে প্রকাশ পায়, সেই আলোটিই পড়েছিল। ললাটে নির্মল বুদ্ধির দীপ্তি, চোখে গভীর সারল্যের সকরুণতা। দাঁড়ানো ছবি। কুমুর সুন্দর ডান হাতটি একটা শূন্য চৌকির হাতার উপরে। মনে হয় যেন সামনে ও আপনারই একটা দূরকালের ছায়া দেখতে পেয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে।

নিজের এই ছবিটি কুমুর চোখে পড়ে নি। কলকাতা থেকে ছবিওয়ালা আনিয়ে বিবাহের কয়দিন আগে ওর দাদা এটি তুলিয়েছিল। তার পরে নিজের ঘরে ছবিটি টাঙিয়েছে, এইটেতে কুমুর হৃদয় আর্দ্র হয়ে গেল। ফোটোগ্রাফের কপি আরো নিশ্চয় আছে, তাই দাদার মুখের দিকে চাইলে। নবীন বললে, 'বুঝতে পারছেন বিপ্রদাসবাবু, বউরানীর দয়া হয়েছে। দেখুন-না ওঁর চোখের দিকে চেয়ে। অযোগ্য বলেই আমার প্রতি ওঁর একটু বিশেষ করুণা।'

বিপ্রদাস হেসে বললে, 'কুমু, আমার ঐ চামড়ার বাক্সয় আরো খানকয়েক ছবি আছে, তোর ভক্তকে বরদান করতে চাস যদি তো অভাব হবে না।'

কুমু নবীনকে খাওয়াতে নিয়ে গেলে পর কালু এল ঘরে। বললে, 'আমি মেজোবাবুকে তার করেছি, শীঘ্র চলে আসবার জন্যে।'

'আমার নামে?'

'হ্যাঁ, তোমারই নামে দাদা। আমি জানি, তুমি শেষ পর্যন্ত হাঁ-না করবে, এ দিকে সময় বড়ো কঠিন হয়ে আসছে। ডাক্তারের কাছে যা শোনা গেল, তোমার উপর এত চাপ সইবে না।'

ডাক্তার বলেছে হৃদ্‌যন্ত্রের বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে, শরীরমন শান্ত রাখা চাই। একসময়ে বিপ্রদাসের যে অতিরিক্ত কুস্তির নেশা ছিল এটা তারই ফল, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে মনের উদ্‌বেগ।

সুবোধকে এরকম জোর-তলব করে ধরে আনা ভালো হবে কি না বিপ্রদাস বুঝতে পারলে না; চুপ করে ভাবতে লাগল। কালু বললে, 'বড়োবাবু, মিথ্যে ভাবছ, বিষয়কর্মের একটা শেষ ব্যবস্থা এখনি করা চাই, আর এতে তাঁকে না হলে চলবে না। বারো পার্সেন্ট সুদে মাড়োয়ারির হাতে মাথা বিকিয়ে দিতে পারব না। তারা আবার দু লাখ টাকা আগাম সুদ হিসেবে কেটে নেবে। তার উপর দালালি আছে।'

বিপ্রদাস বললে, 'আচ্ছা, আসুক সুবোধ। কিন্তু আসবে তো?'

'যতবড়ো সাহেব হোক-না, তোমার তার পেলে সে না এসে থাকতে পারবে না। সে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু দাদা, আর দেরি করা নয়, খুকিকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

বিপ্রদাস খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, বললে, 'মধুসূদন না ডেকে পাঠালে যাবার বাধা আছে।'

'কেন, খুকি কি মধুসূদনের পাটখাটা মজুর? নিজের ঘরে যাবে তার আবার হুকুম কিসের?'

আহার সেরে নবীন একলা এল বিপ্রদাসের ঘরে। বিপ্রদাস বললে, 'কুমু তোমাকে স্নেহ করে।'

নবীন বললে, 'তা করেন। বোধ করি আমি অযোগ্য বলেই ওঁর স্নেহ এত বেশি।'

'তাঁর সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলতে চাই, তুমি আমাকে কোনো কথা লুকিয়ো না।'

'কোনো কথা আমার নেই যা আপনাকে বলতে আমার বাধবে।'

'কুমু যে এখানে এসেছে আমার মনে হচ্ছে তার মধ্যে যেন বাঁকা কিছু আছে।'

'আপনি ঠিকই বুঝেছেন। যাঁর অনাদর কল্পনা করা যায় না সংসারে তাঁরও অনাদর ঘটে।'

'অনাদর ঘটেছে তবে?'

'সেই লজ্জায় এসেছি। আর তো কিছুই পারি নে, পায়ের ধুলো নিয়ে মনে মনে মাপ চাই।'

'কুমু যদি আজই স্বামীর ঘরে ফিরে যায় তাতে ক্ষতি আছে কি?'

'সত্যি কথা বলি, যেতে বলতে সাহস করি নে।'

ঠিক যে কী হয়েছে বিপ্রদাস সে কথা নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে না। মনে করলে, জিজ্ঞাসা করা অন্যায় হবে। কুমুকেও প্রশ্ন করে কোনো কথা বের করতে বিপ্রদাসের অভিরুচি নেই। মনের মধ্যে ছটফট করতে লাগল। কালুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি তো ওদের বাড়ি যাওয়া-আসা কর, মধুসূদনের সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় কিছু জান।'

'কিছু আভাস পেয়েছি, কিন্তু সম্পূর্ণ না জেনে তোমার কাছে কিছু বলতে চাই নে। আর দুটো দিন সবুর করো, খবর তোমাকে দিতে পারব।'

আশঙ্কায় বিপ্রদাসের মন ব্যথিত হয়ে উঠল। প্রতিকার করবার কোনো রাস্তা তার হাতে নেই বলে দুশ্চিন্তাটা ওর হৃৎপিণ্ডটাকে ক্ষণে ক্ষণে মোচড় দিতে লাগল।

৫০

কুমু অনেকদিন যেটা একান্ত ইচ্ছা করেছিল সে ওর পূর্ণ হল; সেই পরিচিত ঘরে, সেই ওর দাদার স্নেহের পরিবেষ্টনের মধ্যে এল ফিরে, কিন্তু দেখতে পেলে ওর সেই সহজ জায়গাটি নেই। এক-একবার অভিমানে ওর মনে হচ্ছে যাই ফিরে, কেননা ও স্পষ্ট বুঝতে পারছে সবারই মনে প্রতিদিন এই প্রশ্নটি রয়েছে, 'ও ফিরে যাচ্ছে না কেন, কী হয়েছে ওর?' দাদার গভীর স্নেহের মধ্যে ঐ একটা উৎকণ্ঠা, সেটা নিয়ে ওদের মধ্যে স্পষ্ট আলোচনা চলে না, তার বিষয় ও নিজে, অথচ ওর কাছে সেটা চাপা রইল।

বিকেল হয়ে আসছে, রোদ্দুর পড়ে এল। শোবার ঘরের জানালার কাছে কুমু বসে। কাকগুলো ডাকাডাকি করছে, বাইরের রাস্তায় গাড়ির শব্দ আর লোকালয়ের নানা কলরব। নতুন বসন্তের হাওয়া শহরের ইঁটকাঠের উপর রঙ ধরাতে পারলে না। সামনের বাড়িটাকে অনেকখানি আড়াল করে একটা পাতবাদামের গাছ, অস্থির হাওয়া তারই ঘনসবুজ পাতায় দোল লাগিয়ে অপরাহ্ণের আলোটাকে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিতে লাগল। এইরকম সময়েই পোষা হরিণী তার অজানা বনের দিকে ছুটে যেতে চায়, যেদিন হাওয়ার মধ্যে বসন্তের ছোঁয়া লাগে, মনে হয় পৃথিবী যেন উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে নীল আকাশের দূর পথের দিকে। যা-কিছু চার দিকে বেড়ে আছে সেইটেকেই মনে হয় মিথ্যে, আর যার ঠিকানা পাওয়া যায় নি, যার ছবি আঁকতে গেলে রঙ যায় আকাশে ছড়িয়ে, মূর্তি উঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় জলস্থলের নানা ইশারার মধ্যে, মন তাকেই বলে সব চেয়ে সত্য। কুমুর মন হাঁপিয়ে উঠে আজ পালাই-পালাই করছে সব-কিছু থেকে, আপনার কাছ থেকে। কিন্তু এ কী বেড়া! আজ এ বাড়িতেও মুক্তি নেই। কল্পনায় মৃত্যুকেও মধুর করে তুললে। মনে মনে বললে, কালো যমুনার পারে, সেই কালোবরন, চলেছি তারই অভিসারে, দিনের পর দিনে—কত দীর্ঘ পথ কত দুঃখের পথ। মনে পড়ে গেল, দাদার অসুখ বেড়েছে—সেবা করতে এসে আমিই অসুখ বাড়িয়েছি, এখন আমি যা করতে যাব তাতেই উলটো হবে। দুই হাতে মুখ চেপে ধরে কুমু খুব খানিকটা কেঁদে নিলে। কান্নার বেগ থামলে স্থির করলে বাড়ি ফিরে যাবে, তা যা হয় তাই হবে—সব সহ্য করবে—শেষকালে তো আছে মুক্তি, শীতল গভীর মধুর। সেই মৃত্যুর কল্পনা মনের মধ্যে যতই স্পষ্ট করে আঁকড়ে ধরল ততই ওর বোধ হল জীবনের ভার একেবারে দুর্বহ হবে না, গুন গুন করে গাইতে লাগল—

> পথপর রয়নি অঁধেরী,
> কুঞ্জপর দীপ উজিয়ারা।

দুপুরবেলা কুমু দাদাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে চলে এসেছিল, এতক্ষণে ওষুধ আর পথ্য খাওয়াবার সময় হয়েছে। ঘরে এসে দেখলে বিপ্রদাস উঠে বসে পোর্টফোলিয়ো কোলে নিয়ে সুবোধকে ইংরেজিতে এক লম্বা চিঠি লিখছে। ভর্ৎসনার সুরে কুমু তাকে বললে, 'দাদা, আজ তুমি ভালো করে ঘুমোও নি।'

বিপ্রদাস বললে, 'তুই ঠিক করে রেখেছিস ঘুমোলেই বিশ্রাম হয়! মন যখন চিঠি লেখার দরকার বোধ করে তখন চিঠি লিখলেই বিশ্রাম।'

কুমু বুঝলে, দরকারটা ওকে নিয়েই। সমুদ্রের এপারে এক ভাইকে ব্যাকুল করেছে, সমুদ্রের ওপারে আর-এক ভাইকে ছটফটিয়ে দেবে, কী ভাগ্য নিয়েই জন্মেছিল তাদের এই বোন! দাদাকে চা-খাওয়ানো হলে পর আস্তে আস্তে বললে, 'অনেকদিন তো হয়ে গেল, এবার বাড়ি যাওয়া ঠিক করেছি।'

বিপ্রদাস কুমুর মুখের দিকে চেয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে কথাটা কী ভাবের। এতদিন দুই ভাইবোনের মধ্যে যে স্পষ্ট বোঝাপড়া ছিল আজ আর তা নেই, এখন মনের কথার জন্যে হাতড়ে বেড়াতে হয়। বিপ্রদাস লেখা বন্ধ করলে। কুমুকে পাশে বসিয়ে কিছু না বলে তার হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কুমু তার ভাষা বুঝল। সংসারের গ্রন্থি কঠিন হয়েছে, কিন্তু ভালোবাসার একটুকুও অভাব হয় নি। চোখ দিয়ে জল পড়তে চাইল, জোর করে বন্ধ করে দিলে। কুমু মনে মনে বললে, এই ভালোবাসার উপর সে ভার চাপাবে না। তাই আবার বললে, 'দাদা, আমি যাওয়া ঠিক করেছি।'

বিপ্রদাস কী জবাব দেবে ভেবে পেলে না, কেননা কুমুর যাওয়াটাই হয়তো ভালো, অন্তত সেটাই তো কর্তব্য। চুপ করে রইল। এমন সময় কুকুরটা ঘুম থেকে জেগে কুমুর কোলের উপর দুই পা তুলে বিপ্রদাসের প্রসাদ রুটির টুকরোর জন্যে কাকুতি জানালে।

রামস্বরূপ বেহারা এসে খবর দিলে মুখুজ্যেমশায় এসেছেন। কুমু উদ্‌বিগ্ন হয়ে বললে, 'আজ দিনে তোমার ঘুম হয় নি, তার উপরে কালুদার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আমি বরঞ্চ যাই, কিছু যদি কথা থাকে শুনে নিই গে, তার পরে তোমাকে সময়মত এসে জানাব।'

'ভারি ডাক্তার হয়েছিস তুই! একজনের কথা যদি আর-একজন শুনে নেয় তাতে রোগীর মন খুব সুস্থির হয় ভেবেছিস?'

'আচ্ছা আমি শুনব না, কিন্তু আজ থাক্।'

'কুমু, ইংরেজ কবি বলেছে, শ্রুত সংগীত মধুর, অশ্রুত সংগীত মধুরতর। তেমনি শ্রুত সংবাদ ক্লান্তিকর হতে পারে, কিন্তু অশ্রুত সংবাদ আরও অনেক ক্লান্তিকর, অতএব অবিলম্বে শুনে নেওয়াই ভালো।'

'আমি কিন্তু পনেরো মিনিট পরেই আসব, আর তখনো যদি তোমাদের কথাবার্তা না থামে তবে আমি তার মধ্যেই এসরাজ বাজাব— ভীমপলশ্রী।'

'আচ্ছা, তাতেই রাজি।'

আধঘণ্টা পরে এসরাজ হাতে করেই কুমু ঘরে ঢুকল, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের ভাব দেখে তখনি এসরাজটা দেয়ালের কোণে ঠেকিয়ে রেখে দাদার পাশে বসে তার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে দাদা?'

কুমু এতদিন বিপ্রদাসের মধ্যে যে অস্থিরতা লক্ষ করেছিল তার মধ্যে একটা গভীর বিষাদ ছিল। বিপ্রদাসের জীবনে দুঃখতাপ অনেক গেছে, কেউ তাকে সহজে বিচলিত হতে দেখে নি। বই পড়া, গানবাজনা করা, দুরবীন নিয়ে তারা দেখা, ঘোড়ায় চড়া, নানা জায়গা থেকে অজানা গাছপালা নিয়ে বাগান করা প্রভৃতি নানা বিষয়েই তার ঔৎসুক্য থাকাতে সে নিজের সম্বন্ধীয় দুঃখকষ্টকে নিজের মধ্যে কখনো জমতে দেয় নি। এবার রোগের দুর্বলতায় তাকে নিজের ছোটো গণ্ডির মধ্যে বড়ো বেশি করে বন্ধ করেছে। এখন সে বাইরে থেকে সেবা ও সঙ্গ পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকে, চিঠিপত্র ঠিকমত না পেলে উদ্‌বিগ্ন হয়, ভাবনাগুলো দেখতে দেখতে কালো হয়ে ওঠে। তাই দাদার 'পরে কুমুর স্নেহ আজ যেন মাতৃস্নেহের মতো রূপ ধরেছে— তার অমন ধৈর্যগম্ভীর আত্ম-সমাহিত দাদার মধ্যে কোথা থেকে যেন বালকের ভাব এল, এত আবদার, এত চাঞ্চল্য, এত জেদ। আর সেইসঙ্গে এমন গভীর বিষাদ আর উৎকণ্ঠা।

কিন্তু কুমু এসে দেখলে তার দাদার সেই আবেশটা কেটে গিয়েছে। তার চোখে যে আগুন জ্বলেছে সে যেন মহাদেবের তৃতীয় নেত্রের আগুনের মতো, নিজের কোনো বেদনার জন্যে নয়— সে

তার দৃষ্টির সামনে বিশ্বের কোনো পাপকে দেখতে পাচ্ছে, তাকে দগ্ধ করা চাই। কুমুর কথায় কোনো উত্তর না দিয়ে সামনের দেয়ালে অনিমেষ দৃষ্টি রেখে বিপ্রদাস চুপ করে বসে রইল।

কুমু আর খানিক বাদে আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'দাদা, কী হয়েছে বলো।'

বিপ্রদাস যেন এক দূর লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, 'দুঃখ এড়াবার জন্যে চেষ্টা করলে দুঃখ পেয়ে বসে। ওকে জোরের সঙ্গে মানতে হবে।'

'তুমি উপদেশ দাও, আমি মানতে পারব দাদা।'

'আমি দেখতে পাচ্ছি, মেয়েদের যে অপমান, সে আছে সমস্ত সমাজের ভিতরে, সে কোনো একজন মেয়ের নয়।'

কুমু ভালো করে তার দাদার কথার মানে বুঝতে পারলে না।

বিপ্রদাস বললে, 'ব্যথাটাকে আমারই আপনার মনে করে এতদিন কষ্ট পাচ্ছিলুম, আজ বুঝতে পারছি, এর সঙ্গে লড়াই করতে হবে, সকলের হয়ে।'

বিপ্রদাসের ফ্যাকাশে গৌরবর্ণ মুখের উপর লাল আভা এল। ওর কোলের উপর রেশমের কাজ-করা একটা চৌকো বালিশ ছিল সেটাকে ঠেলে হঠাৎ সরিয়ে ফেলে দিলে। বিছানা থেকে উঠে পাশের হাতাওয়ালা চৌকির উপর বসতে যাচ্ছিল, কুমু ওর হাত চেপে ধরে বললে, 'শান্ত হও দাদা, উঠো না, তোমার অসুখ বাড়বে।' বলে একটু জোর করেই পিঠের দিকের উঁচু-করা বালিশের উপর বিপ্রদাসকে হেলিয়ে শুইয়ে দিলে।

বিপ্রদাস গায়ের কাপড়টাকে মুঠো দিয়ে চেপে ধরে বললে, 'সহ্য করা ছাড়া মেয়েদের অন্য কোনো রাস্তা একেবারেই নেই বলেই তাদের উপর কেবলই মার এসে পড়ছে। বলবার দিন এসেছে যে সহ্য করব না। কুমু, এখানেই তোর ঘর মনে করে থাকতে পারবি? ও বাড়িতে তোর যাওয়া চলবে না।'

কালুর কাছ থেকে বিপ্রদাস আজ অনেক কথা শুনেছে।

শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে মধুসূদনের যে সম্বন্ধ ঘটেছে তার মধ্যে অপ্রকাশ্যতা আর ছিল না। ওরা দুই পক্ষই অকুণ্ঠিত। লোকে ওদেরকে অপরাধী মনে করছে মনে করেই ওরা স্পর্ধিত হয়ে উঠেছে। এই সম্বন্ধটার মধ্যে সূক্ষ্ম কাজ কিছুই ছিল না বলেই পরস্পরকে এবং লোকমতকে বাঁচিয়ে চলা ওদের পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। শোনা গেছে শ্যামাসুন্দরীকে মধুসূদন কখনো কখনো মেরেওছে, শ্যামা যখন তারস্বরে কলহ করেছে তখন মধুসূদন তাকে সকলের সামনেই বলেছে, 'দূর হয়ে যা বজ্জাত, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।' কিন্তু এতেও কিছু আসে যায় নি। শ্যামার সম্বন্ধে মধুসূদন আপন কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখেছে, ইচ্ছে করে মধুসূদন নিজে তাকে যা দিয়েছে শ্যামা যখনি তার বেশি কিছুতে হাত দিতে গেছে অমনি খেয়েছে ধমক। শ্যামার ইচ্ছে ছিল সংসারের কাজে মোতির মার জায়গাটা সে-ই দখল করে, কিন্তু তাতেও বাধা পেলে; মধুসূদন মোতির মাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, শ্যামাসুন্দরীকে বিশ্বাস করে না। শ্যামার সম্বন্ধে ওর কল্পনায় রঙ লাগে নি, অথচ খুব মোটা রকমের একটা আসক্তি জন্মেছে। যেন শীতকালের বহুব্যবহৃত ময়লা রেজাইটার মতো, তাতে কারুকাজের সম্পূর্ণ অভাব, বিশেষ যত্ন করবার জিনিস নয়, খাট থেকে ধুলোয় পড়ে গেলেও আসে যায় না। কিন্তু ওতে আরাম আছে। শ্যামাকে সামলিয়ে চলবার একটুও দরকার নেই; তা ছাড়া শ্যামা সমস্ত মনপ্রাণের সঙ্গে ওকে যে বড়ো বলে মানে, ওর জন্যে সব সইতে সব করতে সে রাজি, এটা নিঃসংশয়ে জানার দরুন মধুসূদনের আত্মমর্যাদা সুস্থ আছে। কুমু থাকতে প্রতিদিন ওর এই আত্মমর্যাদা বড়ো বেশি নাড়া খেয়েছিল।

মধুসূদনের এই আধুনিক ইতিহাসটা জানবার জন্যে কালুকে খুব বেশি সন্ধান করতে হয় নি। ওদের বাড়িতে লোকজনের মধ্যে এই নিয়ে যথেষ্ট বলাবলি চলেছিল, অবশেষে নিতান্ত অভ্যস্ত হওয়াতে বলাবলির পালাও একরকম শেষ হয়ে এসেছে।

খবরটা শোনবামাত্র বিপ্রদাসকে যেন আগুনের তীর মারলে। মধুসূদন কিছু ঢাকবার চেষ্টামাত্র

করে নি, নিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্যে অপমান করা এতই সহজ— স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করতে বাহিরের বাধা এতই কম। স্ত্রীকে নিরুপায়ভাবে স্বামীর বাধ্য করতে সমাজে হাজার রকম যন্ত্র ও যন্ত্রণার সৃষ্টি করা হয়েছে, অথচ সেই শক্তিহীন স্ত্রীকে স্বামীর উপদ্রব থেকে বাঁচাবার জন্যে কোনো আবশ্যিক পন্থা রাখা হয় নি। এরই নিদারুণ দুঃখ ও অসম্মান ঘরে ঘরে যুগে যুগে কী রকম ব্যাপ্ত হয়ে আছে এক মুহূর্তে বিপ্রদাস তা যেন দেখতে পেলে। সতীত্বগরিমার ঘন প্রলেপ দিয়ে এই ব্যথা মারবার চেষ্টা, কিন্তু বেদনাকে অসম্ভব করবার একটুও চেষ্টা নেই। স্ত্রীলোক এত সস্তা, এত অকিঞ্চিৎকর!

বিপ্রদাস বললে, 'কুমু, অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমাকে তোমার নিজের সম্মান দাবি করতে হবে, এতে সমাজ তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক।'

কুমু বললে, 'দাদা, তুমি কোন্ অপমানের কথা বলছ ঠিক বুঝতে পারছি নে।'

বিপ্রদাস বললে, 'তুই কি তবে সব কথা জানিস নে?'

কুমু বললে, 'না।'

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। একটু পরে বললে, 'মেয়েদের অপমানের দুঃখ আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে রয়েছে। কেন তা জানিস?'

কুমু কিছু না বলে দাদার মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক পরে বললে, 'চিরজীবন মা যা দুঃখ পেয়েছিলেন আমি তা কোনোমতে ভুলতে পারি নে, আমাদের ধর্মবুদ্ধিহীন সমাজ সেজন্যে দায়ী।'

এইখানে ভাইবোনের মধ্যে প্রভেদ আছে। কুমু তার বাবাকে খুব বেশি ভালোবাসত, জানত তাঁর হৃদয় কত কোমল। সমস্ত অপরাধ কাটিয়েও তার বাবা ছিলেন খুব বড়ো এ কথা না মনে করে সে থাকতে পারত না, এমন-কি তার বাবার জীবনে যে শোচনীয় পরিণাম ঘটেছিল সেজন্যে সে তার মাকেই মনে মনে দোষ দিয়েছে।

বিপ্রদাসও তার বাবাকে বড়ো বলেই ভক্তি করেছে। কিন্তু বারে বারে স্খলনের দ্বারা তার মাকে তিনি সকলের কাছে অসম্মানিত করতে বাধা পান নি এটা সে কোনোমতে ক্ষমা করতে পারলে না। তার মাও ক্ষমা করেন নি বলে বিপ্রদাস মনের মধ্যে গৌরব বোধ করত।

বিপ্রদাস বললে, 'আমার মা যে অপমান পেয়েছিলেন তাতে সমস্ত স্ত্রীজাতির অসম্মান। কুমু, তুই ব্যক্তিগতভাবে নিজের কথা ভুলে সেই অসম্মানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবি, কিছুতে হার মানবি নে।'

কুমু মুখ নিচু করে আস্তে আস্তে বললে, 'বাবা কিন্তু মাকে খুব ভালোবাসতেন সে কথা ভুলো না দাদা। সেই ভালোবাসায় অনেক পাপের মার্জনা হয়।'

বিপ্রদাস বললে, 'তা মানি, কিন্তু এত ভালোবাসা সত্ত্বেও তিনি এত সহজে মায়ের সম্মানহানি করতে পারতেন, সে পাপ সমাজের। সমাজকে সেজন্য ক্ষমা করতে পারব না, সমাজের ভালোবাসা নেই, আছে কেবল বিধান।'

'দাদা, তুমি কি কিছু শুনেছ?'

'হাঁ শুনেছি, সে-সব কথা তোকে আস্তে আস্তে পরে বলব।'

'সেই ভালো। আমার ভয় হচ্ছে আজকেকার এই-সব কথাবার্তায় তোমার শরীর আরো দুর্বল হয়ে যাবে।'

'না কুমু, ঠিক তার উলটো। এতদিন দুঃখের অবসাদে শরীরটা যেন এলিয়ে পড়ছিল। আজ যখন মন বলছে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করতে হবে, আমার শরীরের ভিতর থেকে শক্তি আসছে।'

'কিসের লড়াই দাদা?'

'যে সমাজ নারীকে তার মূল্য দিতে এত বেশি ফাঁকি দিয়েছে তার সঙ্গে লড়াই।'

'তুমি তার কী করতে পার দাদা?'

'আমি তাকে না মানতে পারি। তা ছাড়া আরো আরো কী করতে পারি সে আমাকে ভাবতে হবে, আজ থেকেই শুরু হল কুমু। এই বাড়িতে তোর জায়গা আছে, সে সম্পূর্ণ তোর নিজের, আর-কারও সঙ্গে আপস করে নয়। এইখানেই তুই নিজের জোরে থাকবি।'

'আচ্ছা দাদা, সে হবে, কিন্তু আর তুমি কথা কোয়ো না।'

এমন সময় খবর এল, মোতির মা এসেছে।

৫১

শোবার ঘরে কুমু মোতির মাকে নিয়ে বসল। কথা কইতে কইতে অন্ধকার হয়ে এল, বেহারা এল আলো জ্বালতে, কুমু নিষেধ করে দিলে।

কুমু সব কথাই শুনলে; চুপ করে রইল।

মোতির মা বললে, 'বাড়িকে ভূতে পেয়েছে বউরানী, ওখানে টিঁকে থাকা দায়। তুমি কি যাবে না?'

'আমার কি ডাক পড়েছে?'

'না, ডাকবার কথা বোধ হয় মনেও নেই। কিন্তু তুমি না গেলে তো চলবেই না।'

'আমার কী করবার আছে? আমি তো তাঁকে তৃপ্ত করতে পারব না। ভেবে দেখতে গেলে আমার জন্যেই সমস্ত কিছু হয়েছে, অথচ কোনো উপায় ছিল না। আমি যা দিতে পারতুম সে তিনি নিতে পারলেন না। আজ আমি শূন্য হাতে গিয়ে কী করব?'

'বল কী বউরানী, সংসার যে তোমারই, সে তো তোমার হাতছাড়া হলে চলবে না।'

'সংসার বলতে কী বোঝ ভাই? ঘরদুয়োর, জিনিসপত্র, লোকজন? লজ্জা করে এ কথা বলতে যে, তাতে আমার অধিকার আছে। মহলে অধিকার খুইয়েছি, এখন কি ঐ-সব বাইরের জিনিস নিয়ে লোভ করা চলে?'

'কী বলছ ভাই বউরানী? ঘরে কি তুমি একেবারেই ফিরবে না?'

'সব কথা ভালো করে বুঝতে পারছি নে। আর কিছুদিন আগে হলে ঠাকুরের কাছে সংকেত চাইতুম, দৈবজ্ঞের কাছে শুধোতে যেতুম। কিন্তু আমার সে-সব ভরসা ধুয়েমুছে গেছে। আরম্ভে সব লক্ষণই তো ভালো ছিল। শেষে কোনোটাই তো একটুও খাটল না। আজ কতবার বসে বসে ভেবেছি দেবতার চেয়ে দাদার বিচারের উপর ভর করলে এত বিপদ ঘটত না। তবুও মনের মধ্যে যে দেবতাকে নিয়ে দ্বিধা উঠেছে, হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে এড়াতে পারি নে। ফিরে ফিরে সেইখানে এসে লুটিয়ে পড়ি।'

'তোমার কথা শুনে যে ভয় লাগে। ঘরে কি যাবেই না?'

'কোনো কালেই যাব না সে কথা ভাবা শক্ত, যাবই সে কথাও সহজ নয়।'

'আচ্ছা, তোমার দাদার কাছে একবার কথা বলে দেখব। দেখি তিনি কী বলেন। তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে তো?'

'চলো-না, এখনি নিয়ে যাচ্ছি।'

বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকেই তার চেহারা দেখে মোতির মা থমকে দাঁড়াল, মনে হল যেন ভূমিকম্পের পরেকার আলো-নেবা চুড়ো-ভাঙা মন্দির। ভিতরে একটা অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে মেজের উপর বসল।

বিপ্রদাস ব্যস্ত হয়ে বললে, 'এই যে চৌকি আছে।'

মোতির মা মাথা নেড়ে বললে, 'না, এখানে বেশ আছি।'

ঘোমটার ভিতর থেকে তার চোখ ছল ছল করতে লাগল। বুঝতে পারলে দাদার এই অবস্থায় কুমুকে ব্যথাই বাজছে।

কুমু প্রসঙ্গটা সহজ করে দেবার জন্যে বললে, 'দাদা, ইনি বিশেষ করে এসেছেন তোমার মত জিজ্ঞাসা করতে।'

মোতির মা বললে, 'না না, মত জিজ্ঞাসা পরের কথা, আমি এসেছি ওঁর চরণ দর্শন করতে।'

কুমু বললে, 'উনি জানতে চান, ওঁদের বাড়িতে আমাকে যেতে হবে কি না।'

বিপ্রদাস উঠে বসল; বললে, 'সে তো পরের বাড়ি, সেখানে কুমু গিয়ে থাকবে কী করে?' যদি ক্রোধের সুরে বলত তা হলে কথাটার ভিতরকার আগুন এমন করে জ্বলে উঠত না। শান্ত কণ্ঠস্বর, মুখের মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ নেই।

মোতির মা ফিস ফিস করে কী বললে। তার অভিপ্রায় ছিল পাশে বসে কুমু তার কথাগুলো বিপ্রদাসের কানে পৌঁছিয়ে দেবে। কুমু সম্মত হল না, বললে, 'তুমিই গলা ছেড়ে বলো।'

মোতির মা স্বর আর-একটু স্পষ্ট করে বললে, 'যা ওঁর আপনারই, কেউ তাকে পরের করে দিতে পারে না, তা সে যেই হোক-না।'

'সে কথা ঠিক নয়। উনি আশ্রিত মাত্র। ওঁর নিজের অধিকারের জোর নেই। ওঁকে ঘরছাড়া করলে হয়তো নিন্দা করবে, বাধা দেবে না। যত শাস্তি সমস্তই কেবল ওঁর জন্যে। তবু অনুগ্রহের আশ্রয়ও সহ্য করা যেত যদি তা মহদাশ্রয় হত।'

এমন কথার কী জবাব দেবে মোতির মা ভেবে পেলে না। স্বামীর আশ্রয়ে বিঘ্ন ঘটলে মেয়ের পক্ষের লোকেরাই তো পায়ে ধরাধরি করে, এ যে উলটো কাণ্ড।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'কিন্তু আপন সংসার না থাকলে মেয়েরা যে বাঁচে না; পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাই তো।'

'স্থিতি কোথায়? অসম্মানের মধ্যে? আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, কুমুকে যিনি গড়েছেন তিনি আগাগোড়া পরম শ্রদ্ধা করে গড়েছেন। কুমুকে অবজ্ঞা করে এমন যোগ্যতা কারও নেই, চক্রবর্তী-সম্রাটেরও না।'

কুমুকে মোতির মা খুবই ভালোবাসে, ভক্তি করে, কিন্তু তবু কোনো মেয়ের এত মূল্য থাকতে পারে যে তার গৌরব স্বামীকে ছাপিয়ে যাবে এ কথা মোতির মার কানে ঠিক লাগল না। সংসারে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি চলুক, স্ত্রীর ভাগ্যে অনাদর-অপমানও না হয় যথেষ্ট ঘটল, এমন-কি তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে স্ত্রী আফিম খেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরে সেও বোঝা যায়, কিন্তু তাই বলে স্বামীকে একেবারে বাদ দিয়ে স্ত্রী নিজের জোরে থাকবে এটাকে মোতির মা স্পর্ধা বলেই মনে করে। মেয়েজাতের এত গুমর কেন? মধুসূদন যত অযোগ্য হোক যত অন্যায় করুক, তবু সে তো পুরুষমানুষ; এক জায়গায় সে তার স্ত্রীর চেয়ে আপনিই বড়ো, সেখানে কোনো বিচার খাটে না। বিধাতার সঙ্গে মামলা করে জিতবে কে?

মোতির মা বললে, 'একদিন ওখানে যেতে তো হবেই, আর তো রাস্তা নেই।'

'যেতে হবেই এ কথা ক্রীতদাস ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষে খাটে না।'

'মন্ত্র পড়ে স্ত্রী যে কেনা হয়েই গেছে। সাত পাক যেদিন ঘোরা হল সেদিন সে যে দেহে মনে বাঁধা পড়ল, তার তো আর পালাবার জো রইল না। এ বাঁধন যে মরণের বাড়া। মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছি তখন এ জন্মের মতো মেয়ের ভাগ্য তো আর কিছুতে উজিয়ে ফেরানো যায় না।'

বিপ্রদাস বুঝতে পারলে মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সব চেয়ে কম। তারা জানেও না যে, এইজন্যে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এত সহজ। তারা আপনার আলো আপনি নিবিয়ে বসে আছে। তার পরে কেবলই মরছে ভয়ে, কেবলই মরছে ভাবনায়, অযোগ্য লোকের হাতে কেবলই খাচ্ছে মার, আর মনে করছে সেইটে নীরবে সহ্য করাতেই স্ত্রীজন্মের সর্বোচ্চ চরিতার্থতা।

না—মানুষের এত লাঞ্ছনাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সমাজ যাকে এতদূর নামিয়ে দিলে সমাজকেই সে প্রতিদিন নামিয়ে দিচ্ছে।

বিপ্রদাসের খাটের পাশেই মেজের উপর কুমু মুখ নিচু করে বসে ছিল। বিপ্রদাস মোতির মাকে কিছু না বলে কুমুর মাথায় হাত দিয়ে বললে, 'একটা কথা তোকে বলি কুমু, বোঝবার চেষ্টা করিস। ক্ষমতা জিনিসটা যেখানে পড়ে-পাওয়া জিনিস, যার কোনো যাচাই নেই, অধিকার বজায় রাখবার জন্যে যাকে যোগ্যতার কোনো প্রমাণ দিতে হয় না, সেখানে সংসারে সে কেবলই হীনতার সৃষ্টি করে। এ কথা তোকে অনেকবার বলেছি, তোর সংস্কার তুই কাটাতে পারিস নি, কষ্ট পেয়েছিস। তুই যখন বিশেষ করে ব্রাহ্মণভোজন করাতিস কোনোদিন বাধা দিই নি, কেবল বারবার বোঝাতে চেষ্টা করেছি, অবিচারে কোনো মানুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে নেওয়ার দ্বারা শুধু যে তারই অনিষ্ট তা নয়, তাতে করে সমাজে শ্রেষ্ঠতার আদর্শকেই খাটো করে। এরকম অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা নিজেরই মনুষ্যত্বকে অশ্রদ্ধা করি এ কথা কেউ ভাবে না কেন? তুই তো ইংরেজি সাহিত্য কিছু কিছু পড়েছিস, বুঝতে পারছিস নে, এইরকম যত দলগড়া শাস্ত্রগড়া নির্বিকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমস্ত জগতে আজ লড়াইয়ের হাওয়া উঠেছে। যত-সব ইচ্ছাকৃত অন্ধ দাসত্বকে বড়ো নাম দিয়ে মানুষ দীর্ঘকাল পোষণ করেছে, তারই বাসা ভাঙবার দিন এল।'

কুমু মাথা নিচু করেই বললে, 'দাদা, তুমি কি বল স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করবে?'

'অন্যায় অতিক্রম করা মাত্রকেই দোষ দিচ্ছি। স্বামীও স্ত্রীকে অতিক্রম করবে না—এই আমার মত।'

'যদি করে, স্ত্রী কি তাই বলে—'

কুমুর কথা শেষ না হতেই বিপ্রদাস বললে, 'স্ত্রী যদি সেই অন্যায় মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে করে অন্যায় করা হবে। এমনি করে প্রত্যেকের দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে। অত্যাচারের পথ পাকা হয়েছে।'

মোতির মা একটু অধৈর্যের স্বরেই বললে, 'আমাদের বউরানী সতীলক্ষ্মী, অপমান করলে সে অপমান ওঁকে স্পর্শ করতেও পারে না।'

বিপ্রদাসের কণ্ঠ এইবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'তোমরা সতীলক্ষ্মীর কথাই ভাবছ। আর যে কাপুরুষ তাকে অবাধে অপমান করবার অধিকার পেয়ে সেটাকে প্রতিদিন খাটাচ্ছে তার দুর্গতির কথা ভাবছ না কেন?'

কুমু তখনি উঠে দাঁড়িয়ে বিপ্রদাসের চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে বুলোতে বললে, 'দাদা, তুমি আর কথা কোয়ো না। তুমি যাকে মুক্তি বল, যা জ্ঞানের দ্বারা হয়, আমাদের রক্তের মধ্যে তার বাধা। আমরা মানুষকেও জড়িয়ে থাকি, বিশ্বাসকেও; কিছুতেই তার জট ছাড়াতে পারি নে। যতই ঘা খাই ঘুরে ফিরে আটকা পড়ি। তোমরা অনেক জান তাতেই তোমাদের মন ছাড়া পায়, আমরা অনেক মানি তাতেই আমাদের জীবনের শূন্য ভরে। তুমি যখন বুঝিয়ে দাও তখন বুঝতে পারি হয়তো আমার ভুল আছে। কিন্তু ভুল বুঝতে পারা, আর ভুল ছাড়তে পারা কি একই? লতার আঁকড়ির মতো আমাদের মমত্ব সব কিছুকেই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে, সেটা ভালোই হোক আর মন্দই হোক, তার পরে আর তাকে ছাড়তে পারি নে।'

বিপ্রদাস বললে, 'সেইজন্যেই তো সংসারে কাপুরুষের পুজার পুজারিনীর অভাব হয় না। তারা জানবার বেলা অপবিত্রকে অপবিত্র বলেই জানে, কিন্তু মানবার বেলায় তাকে পবিত্রের মতো করেই মানে।'

কুমু বললে, 'কী করব দাদা, সংসারকে দুই হাতে জড়িয়ে নিতে হবে বলেই আমাদের সৃষ্টি। তাই আমরা গাছকেও আঁকড়ে ধরি, শুকনো কুটোকেও। গুরুকেও মানতে আমাদের যতক্ষণ লাগে, ভণ্ডকে মানতেও ততক্ষণ। জাল যে আমাদের নিজের ভিতরেই। দুঃখ থেকে আমাদেরকে বাঁচাবে কে?

সেইজন্যেই ভাবি দুঃখ যদি পেতেই হয়, তাকে মেনে নিয়েও তাকে ছাড়িয়ে ওঠবার উপায় করতে হবে। তাই তো মেয়েরা এত করে ধর্মকে আশ্রয় করে থাকে।'

বিপ্রদাস কিছুই বললে না, চুপ করে বসে রইল।

সেই ওর চুপ করে বসে থাকাটাও কুমুকে কষ্ট দিলে। কুমু জানে কথা বলার চেয়েও এর ভার অনেক বেশি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মোতির মা কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী ঠিক করলে বউরানী?'

কুমু বললে, 'যেতে পারব না। তা ছাড়া, আমাকে তো ফিরে যাবার অনুমতি দেন নি।'

মোতির মা মনে মনে কিছু বিরক্তই হল। শ্বশুরবাড়ির প্রতি ওর শ্রদ্ধা যে বেশি তা নয়, তবু শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে দীর্ঘকালের মমত্ববোধ ওর হৃদয়কে অধিকার করে আছে। সেখানকার কোনো বউ যে তাকে লঙ্ঘন করবে এটা তার কিছুতেই ভালো লাগল না। কুমুকে যা বললে তার ভাবটা এই, পুরুষমানুষের প্রকৃতিতে দরদ কম আর তার অসংযম বেশি, গোড়া থেকেই এটা তো ধরা কথা। সৃষ্টি তো আমাদের হাতে নেই, যা পেয়েছি তাকে নিয়েই ব্যবহার করতে হবে। 'ওরা ঐ রকমই' বলে মনটাকে তৈরি করে নিয়ে যেমন করে হোক সংসারটাকে চালানোই চাই। কেননা সংসারটাই মেয়েদের। স্বামী ভালোই হোক মন্দই হোক, সংসারটাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। তা যদি একেবারে অসম্ভব হয় তা হলে মরণ ছাড়া আর গতিই নেই।

কুমু হেসে বললে, 'নাহয় তাই হল। মরণের অপরাধ কী?'

মোতির মা উদ্‌বিগ্ন হয়ে বলে উঠল, 'অমন কথা বোলো না।'

কুমু জানে না, অল্পদিন হল ওদেরই পাড়াতে একটি সতেরো বছরের বউ কার্বলিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তার এম. এ. পাস-করা স্বামী—গবর্মেন্ট আপিসে বড়ো চাকরি করে। স্ত্রী খোঁপায় গোঁজবার একটা রুপোর চিরুনি হারিয়ে ফেলেছে, মার কাছ থেকে এই নালিশ শুনে লোকটা তাকে লাথি মেরেছিল। মোতির মার সেই কথা মনে পড়ে গায়ে কাঁটা দিলে।

এমন সময় নবীনের প্রবেশ। কুমু খুশি হয়ে উঠল। বললে, 'জানতুম ঠাকুরপোর আসতে বেশি দেরি হবে না।'

নবীন হেসে বললে, 'ন্যায়শাস্ত্রে বউরানীর দখল আছে, আগে দেখেছেন শ্রীমতী ধোঁয়াকে, তার থেকে শ্রীমান আগুনের আবির্ভাব হিসেব করতে শক্ত ঠেকে নি।'

মোতির মা বললে, 'বউরানী, তুমিই ওকে নাই দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছ। ও বুঝে নিয়েছে ওকে দেখলে তুমি খুশি হও, সেই দেমাকে—'

'আমাকে দেখলেও খুশি হতে পারেন যিনি, তাঁর কি কম ক্ষমতা? যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিও নিজের হাতের কাজ দেখে অনুতাপ করেন, আর যিনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন তাঁর মনের ভাব দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!'

'ঠাকুরপো, তোমরা দুজনে মিলে কথা-কাটাকাটি করো, তৃতীয় ব্যক্তি ছন্দোভঙ্গ করতে চায় না, আমি এখন চললুম।'

মোতির মা বললে, 'সে কী কথা ভাই! এখানে তৃতীয় ব্যক্তিটা কে? তুমি না আমি? গাড়িভাড়া করে ও কি আমাকে দেখতে এসেছে ভেবেছ?'

'না, ওর জন্যে খাবার বলে দিই গে।' বলে কুমু চলে গেল।

৫২

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, 'কিছু খবর আছে বুঝি?'

'আছে। দেরি করতে পারলুম না, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে এলুম। তুমি তো চলে এলে, তার পরে দাদা হঠাৎ আমার ঘরে এসে উপস্থিত। মেজাজটা খুবই খারাপ। সামান্য দামের একটা গিল্টি-করা চুরোটের ছাইদান টেবিল থেকে অদৃশ্য হয়েছে। সম্প্রতি যার অধিকারে সেটা এসেছে তিনি নিশ্চয়ই সেটাকে সোনা বলেই ঠাউরেছেন, নইলে পরকাল খোয়াতে যাবেন কোন্ সাধে। জান তো তুচ্ছ একটা জিনিস নড়ে গেলে দাদার বিপুল সম্পত্তির ভিতটাতে যেন নাড়া লাগে, সে তিনি সইতে পারেন না। আজ সকালে আপিসে যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন শ্যামাকে দেশে পাঠাতে। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গেই সেই পবিত্র কাজে লেগেছিলুম। ঠিক করেছিলুম তিনি আপিস থেকে ফেরবার আগেই কাজ সেরে রাখব। এমন সময়ে বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ দাদা একদমে আমার ঘরে এসে ঢুকে পড়লেন। বললেন, এখনকার মতো থাক্। যেই ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছেন, আমার ডেস্কের উপর বউরানীর সেই ছবিটি চোখে পড়ল। থমকে গেলেন। বুঝলুম আড়-চাহনিটাকে সিধে করে নিয়ে ছবিটিকে দেখতে দাদার লজ্জা বোধ হচ্ছে। বললুম, 'দাদা, একটু বোসো, একটা ঢাকাই কাপড় তোমাকে দেখাতে চাই। মোতির মার ছোটো ভাজের সাধ, তাই তাকে দিতে হবে। কিন্তু গণেশরাম দামে আমাকে ঠকাচ্ছে বলে বোধ হচ্ছে। তোমাকে দিয়ে সেটা একবার দেখিয়ে নিতে চাই। আমার যতটা আন্দাজ তাতে মনে হয় না তো তেরো টাকা তার দাম হতে পারে। খুব বেশি হয় তো ন-টাকা সাড়ে ন-টাকার মধ্যেই হওয়া উচিত।'

মোতির মা অবাক হয়ে বললে, 'ও আবার তোমার মাথায় কোথা থেকে এল? আমার ছোটো ভাজের সাধ হবার কোনো উপায়ই নেই। তার কোলের ছেলেটির বয়স তো সবে দেড় মাস। বানিয়ে বলতে তোমার আজকাল দেখছি কিছুই বাধে না। এই তোমার নতুন বিদ্যে পেলে কোথায়?'

'যেখান থেকে কালিদাস তাঁর কবিত্ব পেয়েছেন, বাণী বীণাপাণির কাছ থেকে।'

'বীণাপাণি তোমাকে যতক্ষণ না ছাড়েন ততক্ষণ তোমাকে নিয়ে ঘর করা যে দায় হবে।'

'পণ করেছি, স্বর্গারোহণকালে নরকদর্শন করে যাব, বউরানীর চরণে এই আমার দান।'

'কিন্তু সাড়ে ন-টাকা দামের ঢাকাই কাপড় তখনি-তখনি তোমার জুটল কোথায়?'

'কোথাও না। কুড়ি মিনিট পরে ফিরে এসে বললুম, গণেশরাম সে কাপড় আমাকে না বলেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। দাদার মুখ দেখে বুঝলুম, ইতিমধ্যে ছবিটা তাঁর মগজের মধ্যে ঢুকে স্বপ্নের রূপ ধরেছে। কী জানি কেন, পৃথিবীতে আমারই কাছে দাদার একটু আছে চক্ষুলজ্জা, আর কারও হলে ছবিটা ধাঁ করে তুলে নিতে তাঁর বাধত না।'

'তুমিও তো লোভী কম নও। দাদাকে না হয় সেটা দিতেই।'

'তা দিয়েছি, কিন্তু সহজ মনে দিই নি। বললেম, দাদা, এই ছবিটা থেকে একটা অয়েলপেন্টিং করিয়ে নিয়ে তোমার শোবার ঘরে রেখে দিলে হয় না? দাদা যেন উদাসীনভাবে বললে, আচ্ছা দেখা যাবে। বলেই ছবিটা নিয়ে উপরের ঘরে চলে গেল। তার পরে কী হল ঠিক জানি নে। বোধ করি আপিসে যাওয়া হয় নি, আর ঐ ছবিটাও ফিরে পাবার আশা রাখি নে।'

'তোমার বউরানীর জন্যে স্বর্গটাই খোয়াতে যখন রাজি আছ, তখন নাহয় একখানা ছবিই বা খোয়ালে।'

'স্বর্গটা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে, ছবিটা সম্বন্ধে একটুও সন্দেহ ছিল না। এমন ছবি দৈবাৎ হয়। যে দুর্লভ লগ্নে ওঁর মুখটিতে লক্ষ্মীর প্রসাদ সম্পূর্ণ নেমেছিল ঠিক সেই শুভযোগটি ঐ ছবিতে ধরা পড়ে গেছে। এক-একদিন রাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে আলো জ্বালিয়ে ঐ ছবিটি দেখেছি। প্রদীপের আলোয় ওর ভিতরকার রূপটি যেন আরো বেশি করে দেখা যায়।'

'দেখো, আমার কাছে অত বাড়াবাড়ি করতে তোমার একটুও ভয় নেই?'

'ভয় যদি থাকত তা হলেই তোমার ভাবনার কথাও থাকত। ওঁকে দেখে আমার আশ্চর্য কিছুতে ভাঙে না। মনে করি আমাদের ভাগ্যে এটা সম্ভব হল কী করে? আমি যে ওঁকে বউরানী বলতে পারছি এ ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। আর উনি যে সামান্য নবীনের মতো মানুষকেও হাসিমুখে কাছে বসিয়ে খাওয়াতে পারেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এও এত সহজ হল কী করে? আমাদের পরিবারের মধ্যে সব চেয়ে হতভাগ্য আমার দাদা। যাকে সহজে পেলেন তাকে কঠিন করে বাঁধতে গিয়েই হারালেন।'

'বাস্ রে, বউরানীর কথায় তোমার মুখ যখন খুলে যায় তখন থামতে চায় না।'

'মেজোবউ, জানি তোমার মনে একটুখানি বাজে।'

'না, কক্খনো না।'

'হাঁ, অল্প একটু। কিন্তু এই উপলক্ষে একটা কথা মনে করিয়ে দেওয়া ভালো। নুরনগরে স্টেশনে প্রথম বউরানীর দাদাকে দেখে যে-সব কথা বলেছিলে চলতি ভাষায় তাকেও বাড়াবাড়ি বলা চলে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ও-সব তর্ক থাক্, এখন কী বলতে চাচ্ছিলে বলো।'

'আমার বিশ্বাস আজকালের মধ্যেই দাদা বউরানীকে ডেকে পাঠাবেন। বউরানী যে এত আগ্রহে বাপের বাড়ি চলে এলেন, আর তার পর থেকে এতদিন ফেরবার নাম নেই, এতে দাদার প্রচণ্ড অভিমান হয়েছে তা জানি। দাদা কিছুতেই বুঝতে পারেন না সোনার খাঁচাতে পাখির কেন লোভ নেই। নির্বোধ পাখি, অকৃতজ্ঞ পাখি!'

'তা ভালোই তো, বড়োঠাকুর ডেকেই পাঠান-না। সেই কথাই তো ছিল।'

'আমার মনে হয়, ডাকবার আগেই বউরানী যদি যান ভালো হয়, দাদার ঐটুকু অভিমানের না-হয় জিত রইল। তা ছাড়া বিপ্রদাসবাবু তো চান বউরানী তাঁর সংসারে ফিরে যান, আমিই নিষেধ করেছিলুম।'

বিপ্রদাসের সঙ্গে এই নিয়ে আজ কী কথা হয়েছে মোতির মা তার কোনো আভাস দিলে না। বললে, 'বিপ্রদাসবাবুর কাছে গিয়ে বলোই-না।'

'তাই যাই, তিনি শুনলে খুশি হবেন।'

এমন সময় কুমু দরজার বাইরে থেকে বললে, 'ঘরে ঢুকব কি?'

মোতির মা বললে, 'তোমার ঠাকুরপো পথ চেয়ে আছেন।'

'জন্ম জন্ম পথ চেয়ে ছিলুম, এইবার দর্শন পেলুম।'

'আঃ ঠাকুরপো! এত কথা তুমি বানিয়ে বলতে পার কী করে?'

'নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই, বুঝতে পারি নে।'

'আচ্ছা, চলো এখন খেতে যাবে।'

'খাবার আগে একবার তোমার দাদার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা কয়ে আসি গে।'

'না, সে হবে না।'

'কেন?'

'আজ দাদা অনেক কথা বলেছেন, আজ আর নয়।'

'ভালো খবর আছে।'

'তা হোক, কাল এসো বরঞ্চ। আজ কোনো কথা নয়।'

'কাল হয়তো ছুটি পাব না, হয়তো বাধা ঘটবে। দোহাই তোমার, আজ একবার কেবল পাঁচ মিনিটের জন্যে। তোমার দাদা খুশি হবেন, কোনো ক্ষতি হবে না তাঁর।'

'আচ্ছা, আগে তুমি খেয়ে নাও, তার পরে হবে।'

খাওয়া হয়ে গেলে পর কুমু নবীনকে বিপ্রদাসের ঘরে নিয়ে এল। দেখলে দাদা তখনো ঘুমোয় নি। ঘর প্রায় অন্ধকার, আলোর শিখা ম্লান। খোলা জানলা দিয়ে তারা দেখা যায়; থেকে থেকে হু হু

করে বইছে দক্ষিণের হাওয়া; ঘরের পর্দা, বিছানার ঝালর, আলনায় ঝোলানো বিপ্রদাসের কাপড় নানারকম ছায়া বিস্তার করে কেঁপে কেঁপে উঠছে; মেজের উপর খবরের কাগজের একটা পাতা যখন-তখন এলোমেলো উড়ে বেড়াচ্ছে। আধশোয়া অবস্থায় বিপ্রদাস স্থির হয়ে বসে। এগোতে নবীনের পা সরে না। প্রদোষের ছায়া আর রোগের শীর্ণতা বিপ্রদাসকে একটা আবরণ দিয়েছে, মনে হচ্ছে ও যেন সংসার থেকে অনেক দূর, যেন অন্য লোকে। মনে হল ওর মতো এমনতরো একলা মানুষ আর জগতে নেই।

নবীন এসে বিপ্রদাসের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'বিশ্রামে ব্যাঘাত করতে চাই নে। একটি কথা বলে যাব। সময় হয়েছে, এইবার বউরানী ঘরে ফিরে আসবেন বলে আমরা চেয়ে আছি।'

বিপ্রদাস কোনো উত্তর করলে না, স্থির হয়ে বসে রইল।

খানিক পরে নবীন বললে, 'আপনার অনুমতি পেলেই ওঁকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করি।'

ইতিমধ্যে কুমু ধীরে ধীরে দাদার পায়ের কাছে এসে বসেছে। বিপ্রদাস তার মুখের উপর দৃষ্টি রেখে বললে, 'মনে যদি করিস তোর যাবার সময় হয়েছে তা হলে যা কুমু।'

কুমু বললে, 'না দাদা, যাব না।' বলে বিপ্রদাসের হাঁটুর উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

ঘর স্তব্ধ, কেবল থেকে থেকে দমকা বাতাসে একটা শিথিল জানলা খড় খড় করছে, আর বাইরে বাগানে গাছের পাতাগুলো মর্মরিয়ে উঠছে।

কুমু একটু পরে বিছানা থেকে উঠেই নবীনকে বললে, 'চলো আর দেরি নয়। দাদা, তুমি ঘুমোও।'

মোতির মা বাড়িতে ফিরে এসে বললে, 'এতটা কিন্তু ভালো না।'

'অর্থাৎ চোখে খোঁচা দেওয়াটা যেমনি হোক-না, চোখটা রাঙা হয়ে ওঠা একেবারেই ভালো নয়।'

'না গো না, ওটা ওঁদের দেমাক। সংসারে ওঁদের যোগ্য কিছুই মেলে না, ওঁরা সবার উপরে।'

'মেজোবউ, এতবড়ো দেমাক সবাইকে সাজে না, কিন্তু ওঁদের কথা আলাদা।'

'তাই বলে কি আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করতে হবে!'

'আত্মীয়স্বজন বললেই আত্মীয়স্বজন হয় না। ওঁরা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আর-এক শ্রেণীর মানুষ। সম্পর্ক ধরে ওঁদের সঙ্গে ব্যবহার করতে আমার সংকোচ হয়।'

'যিনি যতবড়ো লোকই হোন-না কেন, তবু সম্পর্কের জোর আছে এটা মনে রেখো।'

নবীন বুঝতে পারলে এই আলোচনার মধ্যে কুমুর 'পরে মোতির মার একটুখানি ঈর্ষার ঝাঁজও আছে। তা ছাড়া এটাও সত্যি, পারিবারিক বাঁধনটার দাম মেয়েদের কাছে খুবই বেশি। তাই নবীন এ নিয়ে বৃথা তর্ক না করে বললে, 'আর কিছুদিন দেখাই যাক-না। দাদার আগ্রহটাও একটু বেড়ে উঠুক, তাতে ক্ষতি হবে না।'

৫৩

মধুসূদনের সংসারে তার স্থানটা পাকা হয়েছে বলেই শ্যামাসুন্দরী প্রত্যাশা করতে পারত, কিন্তু সে কথা অনুভব করতে পারছে না। বাড়ির চাকরবাকরদের 'পরে ওর কর্তৃত্বের দাবি জন্মেছে বলে প্রথমটা ও মনে করেছিল, কিন্তু পদে পদে বুঝতে পারছে যে তারা ওকে মনে মনে প্রভুপদে বসাতে রাজি নয়। ওকে সাহস করে প্রকাশ্যে অবজ্ঞা দেখাতে পারলে তারা যেন বাঁচে এমনি অবস্থা। সেই-জন্যেই শ্যামা তাদেরকে যখন তখন অনাবশ্যক ভর্ৎসনা ও অকারণে ফরমাশ করে কেবলই তাদের দোষত্রুটি ধরে। খিট খিট করে। বাপ মা তুলে গাল দেয়। কিছুদিন পূর্বে এই বাড়িতেই শ্যামা নগণ্য ছিল, সেই স্মৃতিটাকে সংসার থেকে মুছে ফেলবার জন্যে খুব কড়াভাবে মাজাঘষার কাজ করতে গিয়ে দেখে যে সেটা সয় না। বাড়ির একজন পুরোনো চাকর শ্যামার তর্জন না সইতে পেরে

কাজে ইস্তফা দিলে। তাই নিয়ে শ্যামাকে মাথা হেঁট করতে হল। তার কারণ, নিজের ধনভাগ্য সম্বন্ধে মধুসূদনের কতকগুলো অন্ধ সংস্কার আছে। যে-সব চাকর তার আর্থিক উন্নতির সমকালবর্তী, তাদের মৃত্যু বা পদত্যাগকে ও দুর্লক্ষণ মনে করে। অনুরূপ কারণেই সেই সময়কার একটা মসীচিহ্নিত অত্যন্ত পুরোনো ডেস্ক অসংগতভাবে আপিসঘরে হাল আমলের দামি আসবাবের মাঝখানেই অসংকোচে প্রতিষ্ঠিত আছে, তার উপরে সেই সেদিনকারই দস্তার দোয়াত আর একটা সস্তা বিলিতি কাঠের কলম, যে কলমে সে তার ব্যবসায়ের নবযুগে প্রথম বড়ো একটা দলিলে নাম সই করেছিল। সেই সময়কার উড়ে চাকর দধি যখন কাজে জবাব দিলে মধুসূদন সেটা গ্রাহ্যই করলে না, উলটে সে লোকটার ভাগ্যে বকশিশ জুটে গেল। শ্যামাসুন্দরী এই নিয়ে ঘোরতর অভিমান করতে গিয়ে দেখে হালে পানি পায় না। দধির হাসিমুখ তাকে দেখতে হল। শ্যামার মুশকিল এই মধুসূদনকে সে সত্যিই ভালোবাসে, তাই মধুসূদনের মেজাজের উপর বেশি চাপ দিতে ওর সাহস হয় না, সোহাগ কোন্ সীমায় স্পর্ধায় এসে পৌঁছোবে খুব ভয়ে ভয়ে তারই আন্দাজ করে চলে। মধুসূদনও নিশ্চিত জানে শ্যামার সম্বন্ধে সময় বা ভাবনা নষ্ট করবার দরকার নেই। আদর-আবদার-ঘটিত অপব্যয়ের পরিমাণ সংকোচ করলেও দুর্ঘটনার আশঙ্কা অল্প। অথচ শ্যামাকে নিয়ে ওর একটা স্থূল রকম মোহ আছে, কিন্তু সেই মোহকে ষোলো আনা ভোগে লাগিয়েও তাকে অনায়াসে সামলিয়ে চলতে পারে এই আনন্দে মধুসূদন উৎসাহ পায়— এর ব্যতিক্রম হলে বন্ধন ছিঁড়ে যেত। কর্মের চেয়ে মধুসূদনের কাছে বড়ো কিছু নেই। সেই কর্মের জন্যে ওর সবচেয়ে দরকার অবিচলিত আত্মকর্তৃত্ব। তারই সীমার মধ্যে শ্যামার কর্তৃত্ব প্রবেশ করতে সাহস পায় না, অল্প একটু পা বাড়াতে গিয়ে উঁচোট খেয়ে ফিরে আসে। শ্যামা তাই কেবলই আপনাকে দানই করে, দাবি করতে গিয়ে ঠকে। টাকাকড়ি-সাজসরঞ্জামে শ্যামা চিরদিন বঞ্চিত— তার 'পরে ওর লোভের অন্ত নেই। এতেও তাকে পরিমাণ রক্ষা করে চলতে হয়। এতবড়ো ধনীর কাছে যা অনায়াসে প্রত্যাশা করতে পারত তাও ওর পক্ষে দুরাশা। মধুসূদন মাঝে মাঝে এক-একদিন খুশি হয়ে ওকে কাপড়চোপড় গহনাপত্র কিছু কিছু এনে দেয়, তাতে ওর সংগ্রহের ক্ষুধা মেটে না। ছোটোখাটো লোভের সামগ্রী আত্মসাৎ করবার জন্যে কেবলই হাত চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেখানেও বাধা। এইরকমেরই একটা সামান্য উপলক্ষে কিছুদিন আগে ওর নির্বাসনের ব্যবস্থা হয়; কিন্তু শ্যামার সঙ্গ ও সেবা মধুসূদনের অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল— পানতামাকের অভ্যাসেরই মতো সস্তা অথচ প্রবল। সেটাতে ব্যাঘাত ঘটলে মধুসূদনের কাজেরই ব্যাঘাত ঘটবে আশঙ্কায় এবারকার মতো শ্যামার দণ্ড রদ হল। কিন্তু দণ্ডের ভয় মাথার উপর ঝুলতে লাগল।

নিজের এইরকম দুর্বল অধিকারের মধ্যে শ্যামাসুন্দরীর মনে একটা আশঙ্কা লেগেই ছিল কবে আবার কুমু আপন সিংহাসনে ফিরে আসে। এই ঈর্ষার পীড়নে তার মনে একটুও শান্তি নেই। জানে কুমুর সঙ্গে ওর প্রতিযোগিতা চলবেই না, ওরা এক ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নেই। কুমু মধুসূদনের আয়ত্তের অতীত, সেইখানেই তার অসীম জোর; আর শ্যামা তার এত বেশি আয়ত্তের মধ্যে যে, তার ব্যবহার আছে মূল্য নেই। এই নিয়ে শ্যামা অনেক কান্নাই কেঁদেছে, কতবার মনে করেছে আমার মরণ হলেই বাঁচি। কপাল চাপড়ে বলেছে এত বেশি সস্তা হলুম কেন? তার পরে ভেবেছে সস্তা বলেই জায়গা পেলুম, যার দর বেশি তার আদর বেশি, যে সস্তা সে হয়তো সস্তা বলেই জেতে।

মধুসূদন যখন শ্যামাকে গ্রহণ করে নি তখন শ্যামার এত অসহ্য দুঃখ ছিল না। সে আপন উপবাসী ভাগ্যকে একরকম করে মেনে নিয়েছিল। মাঝে মাঝে সামান্য খোরাককেই যথেষ্ট মনে হত। আজ অধিকার পাওয়া আর না-পাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য কিছুতেই ঘটছে না। হারাই হারাই ভয়ে মন আতঙ্কিত। ভাগ্যের রেল-লাইন এমন কাঁচা করে পাতা যে, ডিরেলের ভয় সর্বত্রই এবং প্রতি মুহূর্তেই। মোতির মার কাছে মন খোলাখুলি করে সান্ত্বনা পাবার জন্যে একবার চেষ্টা

করেছিল। সে এমনি একটা ঝাঁঝের সঙ্গে মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেছে যে, তার একটা কোনো সাংঘাতিক শোধ তুলতে পারলে এখনি তুলত, কিন্তু জানে সংসার-ব্যবস্থায় মধুসূদনের কাছে মোতির মার দাম আছে, সেখানে একটুও নাড়া সইবে না। সেই অবধি দুজনের কথা বন্ধ, পারতপক্ষে মুখ দেখাদেখি নেই। এমনি করে এ বাড়িতে শ্যামার স্থান পূর্বের চেয়ে আরো সংকীর্ণ হয়ে গেছে। কোথাও তার একটুও স্বচ্ছন্দতা নেই।

এমন সময় একদিন সন্ধেবেলায় শোবার ঘরে এসে দেখে টেবিলের উপর দেয়ালে হেলানো কুমুর ফোটোগ্রাফ। যে বজ্র মাথায় পড়বে তারই বিদ্যুৎশিখা ওর চোখে এসে পড়ল। যে মাছকে বঁড়শি বিঁধেছে তারই মতো করে ওর বুকের ভিতরটা ধড়ফড় ধড়ফড় করতে লাগল। ইচ্ছা করে ছবিটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, পারে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকল, মুখ বিবর্ণ, দুই চোখে একটা দাহ, মুঠো দৃঢ় করে বন্ধ। একটা কিছু ভাঙতে, একটা কিছু ছিঁড়ে ফেলতে চায়। এ ঘরে থাকলে এখনি কিছু একটা লোকসান করে ফেলবে এই ভয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। আপনার ঘরে গিয়ে বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে চাদরখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে।

রাত হয়ে এল। বাইরে থেকে বেহারা খবর দিলে মহারাজ শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছেন। বলবার শক্তি নেই যে যাব না। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে একটা বুটিদার ঢাকাই শাড়ি পরে গায়ে একটু গন্ধ মেখে গেল শোবার ঘরে। ছবিটা যাতে চোখে না পড়ে এই তার চেষ্টা। কিন্তু ঠিক সেই ছবিটার সামনেই বাতি—সমস্ত আলো যেন কারও দীপ্ত দৃষ্টির মতো ঐ ছবিকে উদ্‌ভাসিত করে আছে। সমস্ত ঘরের মধ্যে ঐ ছবিটিই সবচেয়ে দৃশ্যমান। শ্যামা নিয়মমত পানের বাটা নিয়ে মধুসূদনকে পান দিলে, তার পরে পায়ের কাছে বসে পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যে-কোনো কারণেই হোক আজ মধুসূদন প্রসন্ন ছিল। বিলাতি দোকানের থেকে একটা রুপোর ফোটোগ্রাফের ফ্রেম কিনে এনেছিল। গম্ভীরভাবে শ্যামাকে বললে, 'এই নাও।' শ্যামাকে সমাদর করবার উপলক্ষেও মধুসূদন মধুর রসের অবতারণায় যথেষ্ট কার্পণ্য করে। কেননা সে জানে ওকে অল্প একটু প্রশ্রয় দিলেই ও আর মর্যাদা রাখতে পারে না। ব্রাউন কাগজে জিনিসটা মোড়া ছিল। আস্তে আস্তে কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলে বললে, 'কী হবে এটা?'

মধুসূদন বললে, 'জান না, এতে ফোটোগ্রাফ রাখতে হয়।'

শ্যামার বুকের ভিতরটাতে কে যেন চাবুক চালিয়ে দিলে, বললে, 'কার ফোটোগ্রাফ রাখবে?'

'তোমার নিজের। সেদিন সেই যে ছবিটা তোলানো হয়েছে।'

'আমার এত সোহাগে কাজ নেই।' বলে সেই ফ্রেমটা ছুঁড়ে মেজের উপর ফেলে দিলে।

মধুসূদন আশ্চর্য হয়ে বললে, 'এর মানে কী হল?'

'এর মানে কিছুই নেই।' বলে মুখে হাত দিয়ে কেঁদে উঠল, তার পরে বিছানা থেকে মেজের উপর পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল। মধুসূদন ভাবল, শ্যামার কম দামের জিনিস পছন্দ হয় নি, ওর বোধ করি ইচ্ছে ছিল একটা দামি গয়না পায়। সমস্ত দিন আপিসের কাজ সেরে এসে এই উপদ্রবটা একটুও ভালো লাগল না। এ যে প্রায় হিস্‌টিরিয়া। হিস্‌টিরিয়ার 'পরে ওর বিষম অবজ্ঞা। খুব একটা ধমক দিয়ে বললে, 'ওঠো বলছি, এখনি ওঠো!'

শ্যামা উঠে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। মধুসূদন বললে, 'এ কিছুতেই চলবে না।'

মধুসূদন শ্যামাকে বিশেষ ভাবেই জানে। নিশ্চয় ঠাওরেছিল একটু পরেই ফিরে এসে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে মাপ চাইবে—সেই সময়ে খুব শক্ত করে দুটো কথা শুনিয়ে দিতে হবে।

দশটা বাজল শ্যামা এল না। আর-একবার শ্যামার ঘরের দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এল, 'মহারাজ বোলায়া।'

শ্যামা বললে, 'মহারাজকে বলো আমার অসুখ করেছে।'

মধুসূদন ভাবলে, আস্পর্ধা তো কম নয়, হুকুম করলে আসে না।

মনে ঠিক করে রেখেছিল আরো খানিক বাদে আসবে। তাও এল না। এগারোটা বাজতে মিনিট পনেরো বাকি। বিছানা ছেড়ে মধুসূদন দ্রুতপদে শ্যামার ঘরে গিয়ে ঢুকল। দেখলে ঘরে আলো নেই। অন্ধকারে বেশ দেখা গেল— শ্যামা মেজের উপর পড়ে আছে। মধুসূদন ভাবলে এ-সমস্ত কেবল আদর কাড়বার জন্যে।

গর্জন করে বললে, 'উঠে এসো বলছি, শীঘ্র উঠে এসো। ন্যাকামি কোরো না।'

শ্যামা কিছু না বলে উঠে এল।

৫৪

পরদিন আপিসে যাবার আগে খাবার পরে শোবার ঘরে বিশ্রাম করতে এসেই মধুসূদন দেখলে ছবিটি নেই। অন্যদিনের মতো আজ শ্যামা পান নিয়ে মধুসূদনের সেবার জন্যে আগে থাকতে প্রস্তুত ছিল না। আজ সে অনুপস্থিতও। তাকে ডেকে পাঠানো হল। বেশ বোঝা গেল একটু কুণ্ঠিতভাবেই সে এল। মধুসূদন জিজ্ঞাসা করলে, 'টেবিলের উপর ছবি ছিল, কী হল?'

শ্যামা অত্যন্ত বিস্ময়ের ভান করে বললে, 'ছবি! কার ছবি?'

ভানের পরিমাণটা কিছু বেশি হয়ে পড়ল। সাধারণত পুরুষদের বুদ্ধিবৃত্তির 'পরে মেয়েদের অশ্রদ্ধা আছে বলেই এতটা সম্ভব হয়েছিল।

মধুসূদন রুদ্ধস্বরে বললে, 'ছবিটা দেখ নি!'

শ্যামা নিতান্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললে, 'না, দেখি নি তো।'

মধুসূদন গর্জন করে বলে উঠল, 'মিথ্যে কথা বলছ।'

'মিথ্যে কথা কেন বলব, ছবি নিয়ে আমি করব কী?'

'কোথায় রেখেছ বের করে নিয়ে এসো বলছি। নইলে ভালো হবে না।'

'ওমা, কী আপদ! তোমার ছবি আমি কোথায় পাব যে বের করে আনব?'

বেহারাকে ডাক পড়ল। মধু তাকে বললে, 'মেজোবাবুকে ডেকে আনো।'

নবীন এল। মধুসূদন বললে, 'বড়োবউকে আনিয়ে নাও।'

শ্যামা মুখ বাঁকিয়ে কাঠের পুতুলের মতো চুপ করে বসে রইল।

নবীন খানিকক্ষণ পরে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, 'দাদা, ওখানে একবার কি তোমার নিজে যাওয়া উচিত হবে না? তুমি আপনি গিয়ে যদি বল তা হলে বউরানী খুশি হবেন।'

মধুসূদন গম্ভীরভাবে খানিকক্ষণ গুড়গুড়ি টেনে বললে, 'আচ্ছা, কাল রবিবার আছে, কাল যাব।'

নবীন মোতির মার কাছে এসে বললে, 'একটা কাজ করে ফেলেছি।'

'আমার পরামর্শ না নিয়েই?'

'পরামর্শ নেবার সময় ছিল না।'

'তা হলে তো দেখছি তোমাকে পস্তাতে হবে।'

'অসম্ভব নয়। কুষ্ঠিতে আমার বুদ্ধিস্থানে আর কোনো গ্রহ নেই, আছেন নিজের স্ত্রী। এইজন্যে সর্বদা তোমাকে হাতের কাছে রেখেই চলি। ব্যাপারটা হচ্ছে এই— দাদা আজ হুকুম করলেন বউরানীকে আনানো চাই। আমি ফস্ করে বলে বসলেম, তুমি নিজে গিয়ে যদি কথাটা তোল ভালো হয়। দাদা কী মেজাজে ছিলেন রাজি হয়ে গেলেন। তার পর থেকেই ভাবছি এর ফলটা কী হবে।'

'ভালো হবে না। বিপ্রদাসবাবুর যেরকম ভাবখানা দেখলুম কী বলতে কী বলবেন, শেষকালে কুরুক্ষেত্রের লড়াই বেধে যাবে। এমন কাজ করলে কেন?'

'প্রথম কারণ বুদ্ধির কোঠা ঠিক সেই সময়টাতেই শূন্য ছিল, তুমি ছিলে অন্যত্র। দ্বিতীয় হচ্ছে, সেদিন বউরানী যখন বললেন, 'আমি যাব না', তার ভিতরকার মানেটা বুঝেছিলুম। তাঁর দাদা রুগ্ন শরীর নিয়ে কলকাতায় এলেন তবু একদিনের জন্যে মহারাজ দেখতে গেলেন না, এই অনাদরটা তাঁর মনে সবচেয়ে বেজেছিল।'

শুনেই মোতির মা একটু চমকে উঠল, কথাটা কেন যে আগে তার মনে পড়ে নি এইটেই তার আশ্চর্য লাগল। আসলে নিজের অগোচরেও শ্বশুরবাড়ির মাহাত্ম্য নিয়ে ওর একটা অহংকার আছে। অন্য সাধারণ লোকের মতো মহারাজ মধুসূদনেরও কুটুম্বিতার দায়িত্ব আছে এ কথা তার মন বলে না।

সেদিনকার তর্কের অনুবৃত্তিস্বরূপে নবীন একটুখানি টিপ্পনী দিয়ে বললে, 'নিজের বুদ্ধিতে কথাটা আমার হয়তো মনে আসত না, তুমিই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলে।'

'কী রকম শুনি?'

'ঐ যে সেদিন বললে, কুটুম্বিতার দায়িত্ব আত্মমর্যাদার দায়িত্বের চেয়েও বড়ো। তাই মনে করতে সাহস হল যে মহারাজার মতো অতবড়ো লোকেরও বিপ্রদাসবাবুকে দেখতে যাওয়া উচিত।'

মোতির মা হার মানতে রাজি নয়, কথাটাকে উড়িয়ে দিলে, 'কাজের সময় এত বাজে কথাও বলতে পার! কী করা উচিত এখন সেই কথাটা ভাবো দেখি।'

'গোড়াতেই সকল কথার শেষ পর্যন্ত ভাবতে গেলে ঠকতে হয়। আশু ভাবা উচিত প্রথম কর্তব্যটা কী। সেটা হচ্ছে বিপ্রদাসবাবুকে দাদার দেখতে যাওয়া। দেখতে গিয়ে তার ফলে যা হতে পারে তার উপায় এখনি চিন্তা করতে বসলে তাতে চিন্তাশীলতার পরিচয় দেওয়া হবে, কিন্তু সেটা হবে অতিচিন্তাশীলতা।'

'কী জানি আমার বোধ হচ্ছে মুশকিল বাধবে।'

৫৫

সেদিন সকালে অনেকক্ষণ ধরে কুমু তার দাদার ঘরে বসে গানবাজনা করেছে। সকালবেলাকার সুরে নিজের ব্যক্তিগত বেদনা বিশ্বের জিনিস হয়ে অসীমরূপে দেখা দেয়। তার বন্ধনমুক্তি ঘটে। সাপগুলো যেন মহাদেবের জটায় প্রকাশ পায় ভূষণ হয়ে। ব্যথার নদীগুলি ব্যথার সমুদ্রে গিয়ে বৃহৎ বিরাম লাভ করে। তার রূপ বদলে যায়, চঞ্চলতা লুপ্ত হয় গভীরতায়। বিপ্রদাস নিশ্বাস ছেড়ে বললে, 'সংসারে ক্ষুদ্র কালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয় কুমু, চিরকালটা থাকে আড়ালে; গানে চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষুদ্র কালটা যায় তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়।'

এমন সময়ে খবর এল, 'মহারাজ মধুসূদন এসেছেন।'

এক মুহূর্তে কুমুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল; তাই দেখে বিপ্রদাসের মনে বড়ো বাজল, বললে, 'কুমু, তুই বাড়ির ভিতরে যা। তোকে হয়তো দরকার হবে না।'

কুমু দ্রুতপদে চলে গেল। মধুসূদন ইচ্ছে করেই খবর না দিয়েই এসেছে। এ পক্ষ আয়োজনের দৈন্য ঢাকা দেবার অবকাশ না পায় এটা তার সংকল্পের মধ্যে। বড়ো ঘরের লোক বলে বিপ্রদাসের মনের মধ্যে একটা বড়াই আছে বলে মধুসূদনের বিশ্বাস। সেই কল্পনাটা সে সইতে পারে না। তাই আজ সে এমনভাবে এল যেন দেখা করতে আসে নি, দেখা দিতে এসেছে।

মধুসূদনের সাজটা ছিল বিচিত্র, বাড়ির চাকরদাসীরা অভিভূত হবে এমনতরো বেশ। ডোরা-কাটা বিলিতি শার্টের উপর একটা রঙিন ফুলকাটা সিল্কের ওয়েস্টকোট, কাঁধের উপর পাট-করা চাদর, যত্নে কোঁচানো কালাপেড়ে শান্তিপুরে ধুতি, বার্নিশ-করা কালো দরবারি জুতো, বড়ো বড়ো হীরেপান্নাওয়ালা আংটিতে আঙুল ঝলমল করছে। প্রশস্ত উদরের পরিধি বেষ্টন করে মোটা

সোনার ঘড়ির শিকল, হাতে একটি শৌখিন লাঠি, তার সোনার হাতলটি হাতির মুণ্ডের আকারে নানা জহরতে খচিত। একটা অসমাপ্ত নমস্কারের দ্রুত আভাস দিয়ে খাটের পাশের একটা কেদারায় বসে বললে, 'কেমন আছেন বিপ্রদাসবাবু, শরীরটা তো তেমন ভালো দেখাচ্ছে না।'

বিপ্রদাস তার কোনো উত্তর না দিয়ে বললে, 'তোমার শরীর ভালোই আছে দেখছি।'

'বিশেষ ভালো যে তা বলতে পারি নে— সন্ধের দিকটা মাথা ধরে, আর খিদেও ভালো হয় না। খাওয়াদাওয়ার অল্প একটু অযত্ন হলেই সইতে পারি নে। আবার অনিদ্রাতেও মাঝে মাঝে ভুগি, ঐটেতে সবচেয়ে দুঃখ দেয়।'

শুশ্রূষার লোকের যে সর্বদা দরকার তারই ভূমিকা পাওয়া গেল।

বিপ্রদাস বললে, 'বোধ করি আপিসের কাজ নিয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হচ্ছে।'

'এমনিই কী! আপিসের কাজকর্ম আপনিই চলে যাচ্ছে, আমাকে বড়ো কিছু দেখতে হয় না। ম্যাক্‌নটন্‌ সাহেবের উপরেই বেশির ভাগ কাজের ভার, সার আর্থর পীবডিও আমাকে অনেকটা সাহায্য করেন।'

গুড়গুড়ি এল, পানের বাটায় পান ও মসলা নিয়ে চাকর এসে দাঁড়াল, তার থেকে একটি ছোটো এলাচ নিয়ে মুখে পুরল, আর কিছু নিলে না। গুড়গুড়ির নল নিয়ে দুই-একবার মৃদু মৃদু টান দিলে। তার পরে গুড়গুড়ির নলটা বাঁ হাতে কোলের উপরেই ধরা রইল। আর তার ব্যবহার হল না। অন্তঃপুর থেকে খবর এল জলখাবার প্রস্তুত। ব্যস্ত হয়ে বললে, 'ঐটি তো পারব না। আগেই তো বলেছি, খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে খুব ধরকাট করেই চলতে হয়।'

বিপ্রদাস দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলে না। চাকরকে বললে, 'পিসিমাকে বলো গে, ওঁর শরীর ভালো নেই, খেতে পারবেন না।'

বিপ্রদাস চুপ করে রইল। মধুসূদন আশা করেছিল, কুমুর কথা আপনিই উঠবে। এতদিন হয়ে গেল, এখন কুমুকে শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব বিপ্রদাস আপনিই উদ্‌বিগ্ন হয়ে করবে— কিন্তু কুমুর নামও করে না যে! ভিতরে ভিতরে একটু একটু করে রাগ জন্মাতে লাগল। ভাবলে এসে ভুল করেছি। সমস্ত নবীনের কাণ্ড। এখনি গিয়ে তাকে খুব একটা কড়া শাস্তি দেবার জন্যে মনটা ছটফট করতে লাগল।

এমন সময় সাদাসিধে সরু কালাপেড়ে একখানি শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা টেনে কুমু ঘরে প্রবেশ করলে। বিপ্রদাস এটা আশা করে নি। সে আশ্চর্য হয়ে গেল। প্রথমে স্বামীর, পরে দাদার পায়ের ধুলো নিয়ে কুমু মধুসূদনকে বললে, 'দাদার শরীর ক্লান্ত, ওঁকে বেশি কথা কওয়াতে ডাক্তারের মানা। তুমি এই পাশের ঘরে এসো।'

মধুসূদনের মুখ লাল হয়ে উঠল। দ্রুত চৌকি থেকে উঠে পড়ল। কোল থেকে গুড়গুড়ির নলটা মাটিতে পড়ে গেল। বিপ্রদাসের মুখের দিকে না চেয়েই বললে, 'আচ্ছা, তবে আসি।'

প্রথম ঝোঁকটা হল হন হন করে গাড়িতে উঠে বাড়িতে চলে যায়। কিন্তু মন পড়েছে বাঁধা। অনেক দিন পরে আজ কুমুকে দেখেছে। ওকে অত্যন্ত সাদাসিধে আটপৌরে কাপড়ে এই প্রথম দেখলে। ওকে এত সুন্দর আর কখনো দেখে নি। এমন সংযত এত সহজ। মধুসূদনের বাড়িতে ও ছিল পোশাকি মেয়ে, যেন বাইরের মেয়ে, এখানে সে একেবারে ঘরের মেয়ে। আজ যেন ওকে অত্যন্ত কাছের থেকে দেখা গেল। কী স্নিগ্ধ মূর্তি! মধুসূদনের ইচ্ছে করতে লাগল, একটু দেরি না করে এখনি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। ও আমার, ও আমারই, ও আমার ঘরের, আমার ঐশ্বর্যের, আমার সমস্ত দেহমনের, এই কথাটা উলটেপালটে বলতে ইচ্ছে করে।

পাশের ঘরে একটা সোফা দেখিয়ে কুমু যখন বসতে বললে, তখন ওকে বসতেই হল। নিতান্ত যদি বাইরের ঘর না হত তা হলে কুমুকে ধরে সোফায় আপনার পাশে বসাত। কুমু না বসে একটা চৌকির পিছনে তার পিঠের উপর হাত রেখে দাঁড়াল। বললে, 'আমাকে কিছু বলতে চাও?'

ঠিক এমন সুরে প্রশ্নটা মধুসূদনের ভালো লাগল না, বললে, 'যাবে না বাড়িতে?'

'না।'

মধুসূদন চমকে উঠল—বললে, 'সে কী কথা!'

'আমাকে তোমার তো দরকার নেই।'

মধুসূদন বুঝলে শ্যামাসুন্দরীর খবরটা কানে এসেছে, এটা অভিমান। অভিমানটা ভালোই লাগল। বললে, 'কী যে বল তার ঠিক নেই। দরকার নেই তো কী? শূন্য ঘর কি ভালো লাগে?'

এ নিয়ে কথা-কাটাকাটি করতে কুমুর প্রবৃত্তি হল না। সংক্ষেপে আর-একবার বললে, 'আমি যাব না।'

'মানে কী? বাড়ির বউ বাড়িতে যাবে না—?'

কুমু সংক্ষেপে বললে, 'না।'

মধুসূদন সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কী! যাবে না! যেতেই হবে।'

কুমু কোনো জবাব করলে না। মধুসূদন বললে, 'জান পুলিস ডেকে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ঘাড়ে ধরে! "না" বললেই হল!'

কুমু চুপ করে রইল। মধুসূদন গর্জন করে বললে, 'দাদার স্কুলে নুরনগরির কায়দা শিক্ষা আবার আরম্ভ হয়েছে?'

কুমু দাদার ঘরের দিকে একবার কটাক্ষপাত করে বললে, 'চুপ করো, অমন চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না।'

'কেন? তোমার দাদাকে সামলে কথা কইতে হবে নাকি? জান এই মুহূর্তেই ওকে পথে বার করতে পারি?'

পরক্ষণেই কুমু দেখে ওর দাদা ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দীর্ঘকায়, শীর্ণদেহ, পাণ্ডুবর্ণ মুখ, বড়ো বড়ো চোখ দুটো জ্বালাময়, একটা মোটা সাদা চাদর গা ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, কুমুকে ডেকে বললে, 'আয় কুমু, আয় আমার ঘরে।'

মধুসূদন চেঁচিয়ে উঠল, বললে, 'মনে থাকবে তোমার এই আস্পর্ধা। তোমার নুরনগরের নুর মুড়িয়ে দেব তবে আমার নাম মধুসূদন।'

ঘরে গিয়েই বিপ্রদাস বিছানায় শুয়ে পড়ল। চোখ বন্ধ করলে, কিন্তু ঘুমে নয়, ক্লান্তিতে ও চিন্তায়। কুমু শিয়রের কাছে বসে পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল। এমনি করে অনেকক্ষণ কাটলে পর ক্ষেমাপিসি এসে বললে, 'আজ কি খেতে হবে না কুমু? বেলা যে অনেক হল।'

বিপ্রদাস চোখ খুলে বললে, 'কুমু, যা খেতে যা। তোর কালুদাকে পাঠিয়ে দে।'

কুমু বললে, 'দাদা, তোমার পায়ে পড়ি এখন কালুদাকে না, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো।'

বিপ্রদাস কিছু না বলে সুগভীর বেদনার দৃষ্টিতে কুমুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। খানিক বাদে নিশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজলে। কুমু ধীরে ধীরে বেরিয়ে গিয়ে দরজা দিল ভেজিয়ে।

একটু পরেই কালু খবর পাঠাল যে আসতে চায়। বিপ্রদাস উঠে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসল। কালু বললে, 'জামাই এসে অল্পক্ষণ পরেই তো চলে গেল। কী হল বলো তো। কুমুকে ওদের ওখানে ফিরে নিয়ে যাবার কথা কিছু বললে কি?'

'হাঁ বলেছিল। কুমু তার জবাব দিয়েছে, সে যাবে না।'

কালু বিষম ভীত হয়ে বললে, 'বল কী দাদা! এ যে সর্বনেশে কথা!'

'সর্বনাশকে আমরা কোনোকালে ভয় করি নে, ভয় করি অসম্মানকে।'

'তা হলে তৈরি হও, আর দেরি নেই। রক্তে আছে, যাবে কোথায়? জানি তো, তোমার বাবা ম্যাজিস্ট্রেটকে তুচ্ছ করতে গিয়ে অন্তত দু লাখ টাকা লোকসান করেছিলেন। বুক ফুলিয়ে নিজের বিপদ ঘটানো ও তোমাদের পৈতৃক শখ। ওটা অন্তত আমার বংশে নেই, তাই তোমাদের সাংঘাতিক পাগলামিগুলো চুপ করে সইতে পারি নে। কিন্তু বাঁচব কী করে?'

বিপ্রদাস উঁচু বাঁ হাঁটুর উপর ডান পা তুলে দিয়ে তাকিয়ায় মাথা রেখে চোখ বুজে খানিকক্ষণ

ভাবলে। অবশেষে চোখ খুলে বললে, 'দলিলের শর্ত অনুসারে মধুসূদন ছ মাস নোটিস না দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা দাবি করতে পারে না। ইতিমধ্যে সুবোধ আষাঢ় মাসের মধ্যেই এসে পড়বে —তখন একটা উপায় হতে পারবে।'

কালু একটু বিরক্ত হয়েই বললে, 'উপায় হবে বৈকি। বাতিগুলো এক দমকায় নিবত, সেই-গুলো একে একে ভদ্ররকম করে নিববে।'

'বাতি তলার খোপটার মধ্যে এসে জ্বলছে, এখন যে-ফরাশ এসে তাকে যেরকম ফুঁ দিয়েই নেবাক-না—তাতে বেশি হা-হুতাশ করবার কিছু নেই। ঐ তলানির আলোটার তদ্‌বির করতে আর ভালো লাগে না, ওর চেয়ে পুরো অন্ধকারে সোয়াস্তি পাওয়া যায়।'

কালুর বুকে ব্যথা বাজল। সে বুঝলে এটা অসুস্থ মানুষের কথা, বিপ্রদাস তো এরকম হালছাড়া প্রকৃতির লোক নয়। পরিণামটাকে ঠেকাবার জন্যে বিপ্রদাস এতদিন নানারকম প্ল্যান করছিল। তার বিশ্বাস ছিল কাটিয়ে উঠবে। আজ ভাবতেও পারে না—বিশ্বাস করবারও জোর নেই।

কালু স্নিগ্ধদৃষ্টিতে বিপ্রদাসের মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না ভাই, যা করবার আমিই করব। যাই একবার দালাল-মহলে ঘুরে আসি গে।'

পরদিন বিপ্রদাসের কাছে এক ইংরেজি চিঠি এল—মধুসূদনের লেখা। ভাষাটা ওকালতি ছাঁদের—হয়তো বা অ্যাটর্নিকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে। নিশ্চিত করে জানতে চায় কুমু ওদের ওখানে ফিরে আসবে কি না, তার পরে যথাকর্তব্য করা হবে।

বিপ্রদাস কুমুকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কুমু, ভালো করে সব ভেবে দেখেছিস?'

কুমু বললে, 'ভাবনা সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়েছি, তাই আমার মন আজ খুব নিশ্চিন্ত। ঠিক মনে হচ্ছে যেমন এখানে ছিলুম তেমনি আছি—মাঝে যা-কিছু ঘটেছে সমস্ত স্বপ্ন।'

'যদি তোকে জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা হয়, তুই জোর করে সামলাতে পারবি?'

'তোমার উপর উৎপাত যদি না হয় তো খুব পারব।'

'এইজন্যে জিজ্ঞাসা করছি যে, যদি শেষকালে ফিরে যেতেই হয় তা হলে যত দেরি করে যাবি ততই সেটা বিশ্রী হয়ে উঠবে। ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ-সূত্র তোর মনকে কোথাও কিছুমাত্র জড়িয়েছে কি?'

'কিছুমাত্র না। কেবল আমি নবীনকে, মোতির মাকে, হাবলুকে ভালোবাসি। কিন্তু তারা ঠিক যেন অন্য বাড়ির লোক।'

'দেখ্‌ কুমু, ওরা উৎপাত করবে। সমাজের জোরে, আইনের জোরে উৎপাত করবার ক্ষমতা ওদের আছে। সেইজন্যেই সেটাকে অগ্রাহ্য করা চাই। করতে গেলেই লজ্জা সংকোচ ভয় সমস্ত বিসর্জন দিয়ে লোকসমাজের সামনে দাঁড়াতে হবে, ঘরে-বাইরে চারি দিকে নিন্দের তুফান উঠবে, তার মাঝখানে মাথা তুলে তোর ঠিক থাকা চাই।'

'দাদা, তাতে তোমার অনিষ্ট, তোমার অশান্তি হবে না?'

'অনিষ্ট অশান্তি কাকে তুই বলিস কুমু? তুই যদি অসম্মানের মধ্যে ডুবে থাকিস তার চেয়ে অনিষ্ট আমার আর কী হতে পারে? যদি জানি যে, যে ঘরে তুই আছিস সে তোর ঘর হয়ে উঠল না, তোর উপর যার একান্ত অধিকার সে তোর একান্ত পর, তবে আমার পক্ষে তার চেয়ে অশান্তি ভাবতে পারি নে। বাবা তোকে খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু তখনকার দিনে কর্তারা থাকতেন দূরে দূরে। তোর পক্ষে পড়াশুনোর দরকার আছে তা তিনি মনেই করতেন না। আমিই নিজে গোড়া থেকে তোকে শিখিয়েছি, তোকে মানুষ করে তুলেছি। তোর বাপ-মার চেয়ে আমি কোনো অংশে কম না। সেই মানুষ করে তোলার দায়িত্ব যে কী আজ তা বুঝতে পারছি। তুই যদি অন্য মেয়ের মতো হতিস তা হলে কোথাও তোর ঠেকত না। আজ যেখানে তোর স্বাতন্ত্র্যকে কেউ বুঝবে না, সম্মান করবে না, সেখানে যে তোর নরক। আমি কোন্‌ প্রাণে তোকে সেখানে নির্বাসিত করে

থাকব? যদি আমার ছোটো ভাই হতিস তা হলে যেমন করে থাকতিস তেমনি করেই চিরদিন থাক্-না আমার কাছে।'

দাদার বুকের কাছে খাটের প্রান্তে মাথা রেখে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কুমু বললে, 'কিন্তু আমি তোমাদের তো ভার হয়ে থাকব না? ঠিক বলছ?'

কুমুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বিপ্রদাস বললে, 'ভার কেন হবি বোন? তোকে খুব খাটিয়ে নেব। আমার সব কাজ দেব তোর হাতে। কোনো প্রাইভেট সেক্রেটারি এমন করে কাজ করতে পারবে না। আমাকে তোর বাজনা শোনাতে হবে, আমার ঘোড়া তোর জিম্মেয় থাকবে। তা ছাড়া জানিস আমি শেখাতে ভালোবাসি। তোর মতো ছাত্রী পাব কোথায় বল্? এক কাজ করা যাবে, অনেক দিন থেকে পারসি পড়বার শখ আমার আছে। একলা পড়তে ভালো লাগে না। তোকে নিয়ে পড়ব, তুই নিশ্চয় আমার চেয়ে এগিয়ে যাবি, আমি একটুও হিংসে করব না দেখিস।'

শুনতে শুনতে কুমুর মন পুলকিত হয়ে উঠল, এর চেয়ে জীবনে সুখ আর কিছু হতে পারে না।

খানিক পরে বিপ্রদাস আবার বললে, 'আরো একটা কথা তোকে বলে রাখি কুমু, খুব শীঘ্রই আমাদের কাল বদল হবে, আমাদের চালও বদলাবে। আমাদের থাকতে হবে গরিবের মতো। তখন তুই থাকবি আমাদের গরিবের ঐশ্বর্য হয়ে।'

কুমুর চোখে জল এল, বললে, 'আমার এমন ভাগ্য যদি হয় তো বেঁচে যাই।'

বিপ্রদাস মধুসূদনের চিঠি হাতে রাখলে, উত্তর দিলে না।

৫৬

দুদিন পরেই নবীন মোতির মা হাবলুকে নিয়ে এসে উপস্থিত। হাবলু জ্যাঠাইমার কোলে চড়ে তার বুকে মাথা রেখে কেঁদে নিলে। কান্নাটা কিসের জন্যে স্পষ্ট করে বলা শক্ত— অতীতের জন্যে অভিমান, না বর্তমানের জন্যে আবদার, না ভবিষ্যতের জন্যে ভাবনা?

কুমু হাবলুকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'কঠিন সংসার গোপাল, কান্নার অন্ত নেই। কী আছে আমার, কী দিতে পারি যাতে মানুষের ছেলের কান্না কমে! কান্না দিয়ে কান্না মেটাতে চাই, তার বেশি শক্তি নেই। যে ভালোবাসা আপনাকে দেয় তার অধিক আর কিছু দিতে পারে না, বাছারা, সেই ভালোবাসা তোরা পেয়েছিস; জ্যাঠাইমা চিরদিন থাকবে না, কিন্তু এই কথাটা মনে রাখিস, মনে রাখিস, মনে রাখিস।' বলে তার গালে চুমো খেলে।

নবীন বলল, 'বউরানী, এবার রজবপুরে পৈতৃক ঘরে চলেছি; এখানকার পালা সাঙ্গ হল।'

কুমু ব্যাকুল হয়ে বললে, 'আমি হতভাগিনী এসে তোমাদের এই বিপদ ঘটালুম।'

নবীন বললে, 'ঠিক তার উলটো। অনেক দিন থেকেই মনটা যাই-যাই করছিল। বেঁধে-সেধে তৈরি হয়ে ছিলুম, এমন সময় তুমি এলে আমাদের ঘরে। ঘরের আশ খুব করেই মিটেছিল, কিন্তু বিধাতার সইল না।'

সেদিন মধুসূদন ফিরে গিয়ে তুমুল একটা বিপ্লব বাধিয়েছিল তা বোঝা গেল।

নবীন যাই বলুক, কুমুই যে ওদের সংসারের সমস্ত ওলটপালট করে দিয়েছে মোতির মার তাতে সন্দেহ নেই, আর সেই অপরাধ সে সহজে ক্ষমা করতে চায় না। তার মত এই যে, এখনো কুমুর সেখানে যাওয়া উচিত মাথা হেঁট করে, তার পরে যত লাঞ্ছনাই হোক সেটা মেনে নেওয়া চাই। গলা বেশ একটু কঠিন করেই জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কি শ্বশুরবাড়ি একেবারেই যাবে না ঠিক করেছ?'

কুমু তার উত্তরে শক্ত করেই বললে, 'না, যাব না।'

মোতির মা জিজ্ঞাসা করলে, 'তা হলে তোমার গতি কোথায়?'

কুমু বললে, 'মস্ত এই পৃথিবী, এর মধ্যে কোনো এক জায়গায় আমারও একটুখানি ঠাঁই হতে পারবে। জীবনে অনেক যায় খসে, তবুও কিছু বাকি থাকে।'

কুমু বুঝতে পারছিল, মোতির মার মন ওর কাছ থেকে অনেকখানি সরে এসেছে। নবীনকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুরপো, তা হলে কী করবে এখন?'

'নদীর ধারে কিছু জমি আছে তার থেকে মোটা ভাতও জুটবে, কিছু হাওয়া খাওয়াও চলবে।'

মোতির মা উষ্মার সঙ্গেই বললে, 'ওগো মশায়, না, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। ঐ মির্জাপুরের অন্নজলে দাবি রাখি, সে কেউ কাড়তে পারবে না। আমরা তো এত বেশি সম্মানী লোক নই, বড়োঠাকুর তাড়া দিলেই অমনি বিবাগি হয়ে চলে যাব। তিনিই আবার আজ বাদে কাল ফিরিয়ে ডাকবেন, তখন ফিরেও আসব, ইতিমধ্যে সবুর সইবে, এই বলে রাখলুম।'

নবীন একটু ক্ষুণ্ন হয়ে বললে, 'সে কথা জানি মেজোবউ, কিন্তু তা নিয়ে বড়াই করি নে। পুনর্জন্ম যদি থাকে তবে সম্মানী হয়েই যেন জন্মাই, তাতে অন্নজলের যদি টানাটানি ঘটে সেও স্বীকার।'

বস্তুত নবীন অনেকবারই দাদার আশ্রয় ছেড়ে গ্রামে চাষবাসের সংকল্প করেছে। মোতির মা মুখে তর্জনগর্জন করেছে, কাজের বেলায় কিছুতেই সহজে নড়তে চায় নি, নবীনকে বারে বারে আটকে রেখেছে। সে জানে ভাশুরের উপর তার সম্পূর্ণ দাবি আছে। ভাশুর তো শ্বশুরের স্থানীয়। তার মতে ভাশুর অন্যায় করতে পারে কিন্তু তাকে অপমান বলা চলে না। কুমুর প্রতি কুমুর স্বামীর ব্যবহার যেমনই হোক তাই বলে কুমু স্বামীর ঘর অস্বীকার করতে পারে, এ কথা মোতির মার কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া।

খবর এল ডাক্তার এসেছে। কুমু বললে, 'একটু অপেক্ষা করো, শুনে আসি ডাক্তার কী বলে।'

ডাক্তার কুমুকে বলে গেল, নাড়ি আরো খারাপ, রাত্তিরে ঘুম কমেছে, বোধ হয় রোগী ঠিক বিশ্রাম পাচ্ছে না।

অতিথিদের কাছে কুমু ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় কালু এসে বললে, 'একটা কথা না বলে থাকতে পারছি নে, জাল বড়ো জটিল হয়ে এসেছে, তুমি যদি এই সময়ে শ্বশুরবাড়ি ফিরে না যাও, বিপদ আরো ঘনিয়ে ধরবে। আমি তো কোনো উপায় ভেবে পাচ্ছি নে।'

কুমু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কালু বললে, 'তোমার স্বামীর ওখান থেকে তাগিদ এসেছে, সেটা অগ্রাহ্য করবার শক্তি কি আমাদের আছে? আমরা যে একেবারে তার মুঠোর মধ্যে।'

কুমু বারান্দায় রেলিং চেপে ধরে বললে, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে, কালুদা। প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় মরণ ছাড়া কোনো রাস্তাই আমার খোলা নেই।' এই বলে কুমু দ্রুতপদে চলে গেল।

দাদার ঘরে যখন কুমু ছিল, সেই অবকাশে ক্ষেমা পিসির সঙ্গে মোতির মার কিছু কথাবার্তা হয়ে গেছে। নানারকম লক্ষণ মিলিয়ে দুজনেরই মনে সন্দেহ হয়েছে কুমু গর্ভিণী। মোতির মা খুশি হয়ে উঠল, মনে মনে বললে, মা কালী করুন তাই যেন হয়। এইবার জব্দ! মানিনী শ্বশুর-বাড়িকে অবজ্ঞা করতে চান, কিন্তু এ যে নাড়িতে গ্রন্থি লাগল, শুধু তো আঁচলে আঁচলে নয়, পালাবে কেমন করে!

কুমুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে মোতির মা তার সন্দেহের কথাটা বললে। কুমুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে হাত মুঠো করে বললে, 'না না, এ কখনোই হতে পারে না, কিছুতেই না।'

মোতির মা বিরক্ত হয়েই বললে, 'কেন হতে পারবে না ভাই? তুমি যতবড়ো ঘরেরই মেয়ে হও না কেন, তোমার বেলাতেই তো সংসারের নিয়ম উলটে যাবে না। তুমি ঘোষালদের ঘরের বউ তো, ঘোষাল-বংশের ইষ্টিদেবতা কি তোমাকে সহজে ছুটি দেবেন? পালাবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।'

স্বামীর সঙ্গে কুমুর অল্পকালের পরিচয় দিনে দিনে ভিতরে ভিতরে কী রকম যে বিকৃত মূর্তি ধরেছে গর্ভের আশঙ্কায় ওর মনে সেটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। মানুষে মানুষে যে ভেদটা সবচেয়ে দুরতিক্রমণীয়, তার উপাদানগুলো অনেক সময়ে খুব সূক্ষ্ম। ভাষায়, ভঙ্গিতে, ব্যবহারের ছোটো ছোটো ইশারায়, যখন কিছুই করছে না তখনকার অনভিব্যক্ত ইঙ্গিতে, গলার সুরে, রুচিতে, রীতিতে, জীবনযাত্রার আদর্শে, ভেদের লক্ষণগুলি আভাসে ছড়িয়ে থাকে। মধুসূদনের মধ্যে এমন কিছু আছে যা কুমুকে কেবল যে আঘাত করেছে তা নয়, ওকে গভীর লজ্জা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে সেটা যেন অশ্লীল। মধুসূদন তার জীবনের আরম্ভে একদিন দুঃসহভাবেই গরিব ছিল, সেইজন্যে 'পয়সা'র মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সে কথায় কথায় যে মত ব্যক্ত করত সেই গর্বোক্তির মধ্যে তার রক্তগত দারিদ্র্যের একটা হীনতা ছিল। এই পয়সা-পূজার কথা মধুসূদন বারবার তুলত কুমুর পিতৃকুলকে খোঁটা দেবার জন্যেই। ওর সেই স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে, সবসুদ্ধ মধুসূদনের দেহমনের, ওর সংসারের আন্তরিক অশোভনতায় প্রত্যহই কুমুর সমস্ত শরীরমনকে সংকুচিত করে তুলেছে। যতই এগুলোকে দৃষ্টি থেকে চিন্তা থেকে সরিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে, ততই এরা বিপুল আবর্জনার মতো চারি দিকে জমে উঠেছে। আপন মনের ঘৃণার ভাবের সঙ্গে কুমু আপনিই প্রাণপণে লড়াই করে এসেছে। স্বামীপূজার কর্তব্যতার সম্বন্ধে সংস্কারটাকে বিশুদ্ধ রাখবার জন্যে ওর চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু কতবড়ো হার হয়েছে তা এর আগে এমন করে বোঝে নি। মধুসূদনের সঙ্গে ওর রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার বীভৎসতা ওকে বিষম পীড়া দিলে। কুমু অত্যন্ত উদ্‌বিগ্নমুখে মোতির মাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী করে তুমি নিশ্চয় জানলে?'

মোতির মার ভারি রাগ হল, সামলে নিয়ে বললে, 'ছেলের মা আমি, আমি জানব না তো কে জানবে? তবু একেবারে নিশ্চয় করে বলবার সময় হয় নি। ভালো দাই কাউকে ডেকে পরীক্ষা করিয়ে দেখা ভালো।'

নবীন, মোতির মা, হাবলুর যাবার সময় হল। কিন্তু দৈবের এই চরম অন্যায়ের কথা ছাড়া কুমু আর কোনো কিছুতে আজ মন দিতে পারছিল না। তাই খুব সাধারণভাবেই শ্বশুরবাড়ির বন্ধুদের কাছ থেকে ওর বিদায় নেওয়া হল। নবীন যাবার সময় বললে, 'বউরানী, সংসারে সব জিনিসেরই অবসান আছে। কিন্তু তোমাকে সেবা করবার যে অধিকার হঠাৎ একদিনে পেয়েছি সে যে এমন খাপছাড়াভাবে হঠাৎ আর-একদিন শেষ হতে পারে, সে কথা ভাবতেও পারি নে। আবার দেখা হবে।' নবীন প্রণাম করলে, হাবলু নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল, মোতির মা মুখ শক্ত করে রইল, একটি কথাও কইলে না।

৫৭

খবরটা বিপ্রদাসের কানে গেল। দাই এল, সন্দেহ রইল না যে কুমুর গর্ভাবস্থা। মধুসূদনের কানেও সংবাদ পৌঁচেছে। মধুসূদন ধন চেয়েছিল, ধন পুরো পরিমাণেই জমেছে, ধনের উপযুক্ত খেতাবও মিলেছে, এখন নিজের মহিমাকে ভাবী বংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই এ সংসারে তার কর্তব্য চরম লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছোবে। মনটা যতই খুশি হল ততই অপরাধের সমস্ত দায়িত্ব কুমুর উপর থেকে সরিয়ে বোঝাই করলে বিপ্রদাসের উপর। দ্বিতীয় একখানা চিঠি তাকে লিখলে, শুরু করলে Whereas দিয়ে, শেষ করলে Your obedient servant মধুসূদন ঘোষাল সই করে। মাঝখানটাতে ছিল I shall have the painful necessity ইত্যাদি। এরকম ভয়-দেখানো চিঠিতে চাটুজ্যে বংশের উপর উলটো ফল ফলে, বিশেষত ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে। বিপ্রদাস চিঠিটা দেখালে কালুকে। তার মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বললে, 'এরকম চিঠিতে আমারই মতো সামান্য লোকের দেহে একেবারে বাদশাহি মাত্রায় রক্ত গরম হয়ে ওঠে। অদৃশ্য কোতোয়াল বেটাকে হাঁক দিয়ে ডেকে বলতে ইচ্ছে করে, শির লেও উসকো।'

দিনের বেলা নানাপ্রকার লেখাপড়ার কাজ ছিল, সে-সমস্ত শেষ করে সন্ধ্যাবেলা বিপ্রদাস কুমুকে ডেকে পাঠালে। কুমু আজ সারাদিন দাদার কাছে আসেই নি। নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিপ্রদাস বিছানা ছেড়ে চৌকিতে উঠে বসল। রোগীর মতো শুয়ে থাকলে মনটা দুর্বল থাকে। সামনের দিকে কুমুর জন্যে একটা ছোটো চৌকি ঠিক করে রেখেছে। আলোটা ঘরের কোণে একটু আড়াল করে রাখা। মাথার উপর বড়ো একটা টানা পাখা হুস হুস করে চলছে। বৈশাখ-শেষের আকাশে তখনো গরম জমে আছে, দক্ষিণে হাওয়া এক একবার অল্প একটু নিশ্বাস ছেড়েই ঘেমে যাচ্ছে, গাছের পাতাগুলো যেন একান্ত কান-পাতা মনোযোগের মতো নিস্তব্ধ। সমুদ্রের মোহানায় গঙ্গা যেখানে নীল জলকে ফিকে করে দিয়েছে, অন্ধকারটা যেন সেইরকম। দীর্ঘবিলম্বিত গোধূলির শেষ-আলোটা তখনো তার কালিমার ভিতরে ভিতরে মিশ্রিত। বাগানের পুকুরটা ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে থাকত, কিন্তু খুব একটা জ্বলজ্বলে তারার স্থির প্রতিবিম্ব আকাশের অঙ্গুলি সংকেতের মতো তাকে নির্দেশ করে দিচ্ছে। গাছতলার নীচে দিয়ে চাকররা ক্ষণে ক্ষণে লণ্ঠন হাতে করে যাতায়াত করছে, আর পেঁচা উঠছে ডেকে।

কুমু বোধ হয় একটু ইতস্তত করে একটু দেরি করেই এল। বিপ্রদাসের কাছে চৌকিতে বসেই বললে, 'দাদা, আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমার যেন কোথায় যেতে ইচ্ছে করছে।'

বিপ্রদাস বললে, 'ভুল বলছিস কুমু, তোর ভালোই লাগবে। আর কিছুদিন পরেই তোর মন উঠবে ভরে।'

'কিন্তু তা হলে—' বলে কুমু থেমে গেল।

'তা জানি—এখন তোর বন্ধন কাটাবে কে?'

'তবে কি যেতে হবে দাদা?'

তোকে নিষেধ করতে পারি এমন অধিকার আর আমার নেই। তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন্ স্পর্ধায়?'

কুমু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল, বিপ্রদাসও কিছু বললে না।

অবশেষে খুব মৃদুস্বরে কুমু জিজ্ঞাসা করলে, 'তা হলে কবে যেতে হবে?'

'কালই, আর দেরি সইবে না।'

'দাদা, একটা কথা বোধ হয় বুঝতে পারছ, এবার গেলে ওরা আমাকে আর কখনো তোমার কাছে আসতে দেবে না।'

'তা আমি খুবই জানি।'

'আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, কোনোদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পারবে না। জানি দাদা, তোমাকে দেখবার জন্যে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে, কিন্তু ওদের ওখানে যেন কখনো তোমাকে না দেখতে হয়। সে আমি সইতে পারব না।'

'না কুমু, সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'ওরা কিন্তু তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে।'

'ওরা যা করতে পারে তা করা শেষ হলেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে। তখনি আমি হব স্বাধীন। তাকে তুই বিপদ বলছিস কেন?'

'দাদা, সেইদিন তুমি আমাকেও স্বাধীন করে নিয়ো। ততদিন ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব। এমন কিছু আছে যা ছেলের জন্যেও খোওয়ানো যায় না।'

'আচ্ছা, আগে হোক ছেলে, তার পরে বলিস।'

'তুমি বিশ্বাস করছ না, কিন্তু মার কথা মনে আছে তো? তাঁর তো হয়েছিল ইচ্ছামৃত্যু। সেদিন সংসারে তিনি তাঁর জায়গাটি পাচ্ছিলেন না, তাই তাঁর ছেলেমেয়েদেরকে অনায়াসে ফেলে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মানুষ যখন মুক্তি চায়, তখন কিছুতেই তাকে ঠেকাতে পারে না। আমি তোমারই বোন,

দাদা, আমি মুক্তি চাই। একদিন যেদিন বাঁধন কাটব, মা সেদিন আমাকে আশীর্বাদ করবেন এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম।'

আবার অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে রইল। হঠাৎ হু হু করে বাতাস উঠল, টিপায়ের উপর বিপ্রদাসের পড়বার বইটার পাতাগুলো ফর ফর করে উলটে যেতে লাগল। বাগান থেকে বেলফুলের গন্ধে ঘর গেল ভরে।

কুমু বললে, 'আমাকে ওরা ইচ্ছে করে দুঃখ দিয়েছে তা মনে কোরো না। আমাকে সুখ ওরা দিতে পারে না আমি এমনি করেই তৈরি। আমিও তো ওদের পারব না সুখী করতে। যারা সহজে ওদের সুখী করতে পারে তাদের জায়গা জুড়ে কেবল একটা-না-একটা মুশকিল বাধবে। তা হলে কেন এ বিড়ম্বনা? সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব, ওদের গায়ে কোনো কলঙ্ক লাগবে না। কিন্তু একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব; চলে আসবই এ তুমি দেখে নিয়ো। মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না। আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই? দাদা, তুমি ঠাকুর বিশ্বাস কর না, আমি বিশ্বাস করি। তিন মাস আগে যেরকম করে করতুম, আজ তার চেয়ে বেশি করেই করি। আজ সমস্ত দিন ধরেই এই কথা ভাবছি যে, চারি দিকে এত এলোমেলো, এত উলটো-পালটা, তবু এই জঞ্জালে একেবারে ঢেকে ফেলে নি জগৎটাকে। এ সমস্তকে ছাড়িয়ে গিয়েও চন্দ্রসূর্যকে নিয়ে সংসারের কাজ চলছে, সেই যেখানে ছাড়িয়ে গেছে সেইখানে আছে বৈকুণ্ঠ, সেইখানে আছেন আমার ঠাকুর। তোমার কাছে এ-সব কথা বলতে লজ্জা করে— কিন্তু আর তো কখনো বলা হবে না, আজ বলে যাই। নইলে আমার জন্যে মিছিমিছি ভাববে। সমস্ত গিয়েও তবু বাকি থাকে এই কথাটা বুঝতে পেরেছি। সেই আমার অফুরান, সেই আমার ঠাকুর। এ যদি না বুঝতুম তা হলে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে গারদে ঢুকতুম না। দাদা, এ সংসারে তুমি আমার আছ বলেই তবে এ কথা বুঝতে পেরেছি।' এই বলেই কুমু চৌকি থেকে নেবে দাদার পায়ের উপর মাথা রেখে পড়ে রইল। রাত বেড়ে চলল, বিপ্রদাস জানালার বাইরে অনিমেষ দৃষ্টি মেলে ভাবতে লাগল।

৫৮

পরদিন ভোরে বিপ্রদাস কুমুকে ডেকে পাঠালে। কুমু এসে দেখে বিপ্রদাস বিছানায় বসে, একটি এসরাজ আছে কোলের উপর, আর একটি পাশে শোয়ানো। কুমুকে বললে, 'নে যন্ত্রটা, আমরা দুজনে মিলে বাজাই।' তখনো অল্প অল্প অন্ধকার, সমস্ত রাত্রির পরে বাতাস একটু ঠান্ডা হয়ে অশথপাতার মধ্যে ঝির ঝির করছে, কাকগুলো ডাকতে শুরু করেছে। দুজনে ভৈরোঁ রাগিণীতে আলাপ শুরু করলে, গম্ভীর শান্ত সকরুণ; সতীবিরহ যখন অচঞ্চল হয়ে এসেছে, মহাদেবের সেই-দিনকার প্রভাতের ধ্যানের মতো। বাজাতে বাজাতে পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার ডালের ভিতর দিয়ে অরুণ-আভা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, সূর্য দেখা দিল বাগানের পাঁচিলের উপরে। চাকররা দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে গেল। ঘর সাফ করা হল না। রোদ্দুর ঘরের মধ্যে এল, দরোয়ান আস্তে আস্তে এসে খবরের কাগজ টিপাইয়ের উপর রেখে দিয়ে নিঃশব্দপদে চলে গেল।

অবশেষে বাজনা বন্ধ করে বিপ্রদাস বললে, 'কুমু, তুই মনে করিস আমার কোনো ধর্ম নেই। আমার ধর্মকে কথায় বলতে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলি নে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর দুঃখ গভীর আনন্দ এক হয়ে মিলে গেছে; তাকে নাম দিতে পারি নে। তুই আজ চলে যাচ্ছিস কুমু, আর হয়তো দেখা হবে না, আজ সকালে তোকে সেই-সকল বেসুরের সকল অমিলের পরপারে এগিয়ে দিতে এলুম। শকুন্তলা পড়েছিস— দুষ্যন্তের ঘরে যখন শকুন্তলা যাত্রা করে বেরিয়েছিল, কণ্ব কিছুদূর পর্যন্ত তাকে পৌঁছিয়ে দিলেন। যে লোকে তাকে উত্তীর্ণ করতে তিনি

বেরিয়েছিলেন, তার মাঝখানে ছিল দুঃখ-অপমান। কিন্তু সেইখানেই থামল না তাও পেরিয়ে শকুন্তলা পৌঁচেছিল অচঞ্চল শান্তিতে। আজ সকালের ভৈরোঁর মধ্যে সেই শান্তির সুর, আমার সমস্ত অন্তঃকরণের আশীর্বাদ তোকে সেই নির্মল পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিক; সেই পরিপূর্ণতা তোর অন্তরে তোর বাহিরে, তোর সব দুঃখ তোর সব অপমানকে প্লাবিত করুক।'

কুমু কোনো কথা বললে না। বিপ্রদাসের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করলে। খানিকক্ষণ জানলার বাইরের আলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে বললে, 'দাদা, তোমার চা-রুটি আমি তৈরি করে নিয়ে আসি গে।'

মধুসূদন আজ দৈবজ্ঞকে ডাকিয়ে শুভযাত্রার লগ্ন ঠিক করে রেখেছিল। সকালে দশটার কিছু পরে। ঠিক সময়ে জরির-কাজ-করা লাল বনাতের ঘেরাটোপওয়ালা পালকি এল দরজায়, আসাসোটা নিয়ে লোকজন এল, সমারোহ করে কুমুকে নিয়ে গেল মির্জাপুরের প্রাসাদে। আজ সেখানে নহবত বাজছে, আর চলছে ব্রাহ্মণভোজন, ব্রাহ্মণবিদায়ের আয়োজন।

মানিক এল বার্লির পেয়ালা হাতে বিপ্রদাসের ঘরে। আজ বিপ্রদাস বিছানায় নেই, জানলার সামনে চৌকি টেনে নিয়ে স্থির বসে আছে। বার্লি যখন এল কোনো খবরই নিলে না। চাকর ফিরে গেল। তখন ক্ষেমা পিসি এলেন পথ্য নিয়ে, বিপ্রদাসের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, 'বিপু, বেলা হয়ে গেছে, বাবা।'

বিপ্রদাস চৌকি থেকে ধীরে ধীরে উঠে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ক্ষেমা পিসির ইচ্ছা ছিল কেমন ধুমধাম করে আদর করে ওরা কুমুকে নিয়ে গেল তার বিস্তারিত বর্ণনা করে গল্প করেন। কিন্তু বিপ্রদাসের গভীর নিস্তব্ধতা দেখে কোনো কথাই বলতে পারলেন না, মনে হল বিপ্রদাসের চোখের সামনে একটা অতলস্পর্শ শূন্যতা।

বিপ্রদাস যখন বলে উঠল, 'পিসি, কালুকে পাঠিয়ে দাও' তখন এই সামান্য কথাটাও অদৃষ্টের একটা প্রকাণ্ড নিঃশব্দ ছায়ার ভিতর দিয়ে ধ্বনিত হল। পিসির গা ছম ছম করে উঠল।

কালু যখন এল, বিপ্রদাস তার হাতে একখানা চিঠি দিলে। বিলেতের চিঠি সুবোধের লেখা। সুবোধ লিখেছে, বারের ডিনার শেষ না করেই যদি সে দেশে আসে তা হলে আবার তাকে ফিরে যেতে হবে। তার চেয়ে শেষ-ডিনার সেরে মাঘ-ফাল্গুন নাগাত দেশে ফিরে এলে তার সুবিধে হয়, অনর্থক খরচের আশঙ্কাও বেঁচে যায়। তার বিশ্বাস বিষয়কর্মের প্রয়োজন ততদিন সবুর করতে পারে।

আজকের দিনে বিষয়কর্মের সংকট নিয়ে বিপ্রদাসকে পীড়া দিতে কালুর একটুও ইচ্ছে ছিল না। কালু বললে, 'দাদা, এখনো তো টাকা তুলে নেবার কোনো কথা ওঠে নি, আর কিছুদিন যদি সাবধানে চলি, কাউকে না ঘাঁটাই, তা হলে শীঘ্র কোনো উৎপাত ঘটবে না। যাই হোক, তুমি কোনো ভাবনা কোরো না।'

বিপ্রদাস বললে, 'আমার কোনো ভাবনা নেই কালু। লেশমাত্র না।'

বিপ্রদাসের ভাবনা কালুর ভালো লাগে না—এত অত্যন্ত নির্ভাবনা তার আরো খারাপ লাগে।

বিপ্রদাস খবরের কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে লাগল, কালু বুঝলে এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করতে বিপ্রদাসের একটুও ইচ্ছা নেই। অন্যদিন কাজের কথা শেষ হলেই কালু চলে যায়, আজ সে চুপ করে বসে রইল, ইচ্ছা করতে লাগল অন্য কিছু কথা বলে, যা হয় কোনো একটা সেবায় লেগে যায়। জিজ্ঞাসা করলে, 'বাইরের দিকে ঐ জানলাটা বন্ধ করে দেব কি! রোদ্দুর আসছে।'

বিপ্রদাস হাত নেড়ে জানালে যে, দরকার নেই।

কালু তবু রইল বসে। দাদার ঘরে আজ কুমু নেই, এ শূন্যতা তার বুকে চেপে রইল। হঠাৎ শুনতে পেলে বিছানার নীচে টম কুকুরটা গুমরে গুমরে কেঁদে উঠল। কুমুকে সে চলে যেতে দেখেছে, কী একটা বুঝেছে, ভালো করে বোঝাতে পারছে না।

'তিন পুরুষ' নামের পরিবর্তে 'যোগাযোগ' নামকরণের কৈফিয়তস্বরূপ বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশকালে তৃতীয় সংখ্যায় যে 'নামান্তর' মুদ্রিত হয়, যোগাযোগ গ্রন্থের (শ্রাবণ ১৩৪০) 'ভূমিকা'-রূপে তা ব্যবহৃত হয়েছিল।

নামান্তর

'তিন পুরুষ' নাম ধরে আমার যে গল্পটা 'বিচিত্রায়' বের হচ্চে তার নাম রক্ষা করতেই হবে এমন কোনো দায় নেই। কাঁচা থাকতে থাকতেই ও নামটা বদল করব বলে স্থির করেছি। পাঠক-দরবারে তার কারণ নির্দেশ করি।

নবজাত কুমারকুমারীদের নাম দেবার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ এসে থাকে, অবকাশ মতো সে অনুরোধ পালন করেও এসেছি। কারণ এতে কোনো দায়িত্ব নেই। ব্যক্তি সম্বন্ধে মানুষের নাম তার বিশেষণ নয়, সম্বোধন মাত্র। লাউয়ের বোঁটা নিয়ে লাউয়ের বিচার কেউ করে না, ওটাতে ধরবার সুবিধে। যার নাম দিয়েছি সুশীল তার শীলতা নিয়ে আমার কোনো জবাবদিহি নেই। সুশীল-ঠিকানায় পত্র পাঠালে শব্দের সঙ্গে প্রয়োগের অসঙ্গতি দোষ নিয়ে ডাক-পেয়াদা কাগজে লেখালেখি করে না, ঠিক জায়গায় চিঠি পোঁছয়।

ব্যক্তিগত নাম ডাকবার জন্যে, বিষয়গত নাম স্বভাব নির্দেশের জন্যে। মানুষকেও যখন ব্যক্তি বলে দেখি নে, বিষয় বলে দেখি, তখন তার গুণ বা অবস্থা মিলিয়ে তার উপাধি দিই,—কাউকে বলি বড়ো-বউ, কাউকে বলি মাস্টার মশায়।

সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্যরচনার স্বভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হল গোড়াকার তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিষয়টাই সর্বেসর্বা, সেখানে গুণধর্মের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। মনস্তত্ত্বঘটিত বইয়ের শিরোনামায় যখনি দেখব 'স্ত্রীর সম্বন্ধে স্বামীর ঈর্ষা', বুঝব বিষয়টিকে ব্যাখ্যা দ্বারাই নামটি সার্থক হবে। কিন্তু 'ওথেলো' নাটকের যদি ঐ নাম হত পছন্দ করতুম না। কেন না এখানে বিষয়টি প্রধান নয়, নাটকটিই প্রধান। অর্থাৎ আখ্যানবস্তু, রচনারীতি, চরিত্রচিত্র, ভাষা, ছন্দ, ব্যঞ্জনা, নাট্যরস সবটা মিলিয়ে একটি সমগ্র বস্তু। একেই বলা চলে ব্যক্তিরূপ। বিষয়ের কাছ থেকে সংবাদ পাই, ব্যক্তির কাছ থেকে তার আত্মপ্রকাশজনিত রস পাই। বিষয়কে বিশেষণের দ্বারা মনে বাঁধি, ব্যক্তিকে সম্বোধনের দ্বারা মনে রাখি।

এমন একটা-কিছু অবলম্বন করে গল্প লিখতে বসলুম যাকে বলা যেতে পারে বিষয়। যদি মূর্তি গড়তেম একতাল মাটি নিয়ে বসতে হত। অতএব ওটাকে 'মাটি' শিরোনামায় নির্দেশ করলে বিজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানে বাধত না। বিজ্ঞান যখন কুণ্ডলকে উপেক্ষা করে তার সোনার তত্ত্ব আলোচনা করে তখন তাকে নমস্কার করি। কিন্তু কনের কুণ্ডল নিয়ে বর যখন সেই আলোচনাটাকেই প্রাধান্য দেয় তখন তাকে বলি বর্বর। রসশাস্ত্রে মূর্তিটা মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটাও বিষয়ের চেয়ে বড়ো। এই জন্যে বিষয়টাকেই শিরোধার্য করে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায় না। বস্তুত রসসৃষ্টিতে বৈষয়িকতাকে বড়ো জায়গা দেওয়া উচিত হয় না। যাঁরা বৈষয়িক প্রকৃতির পাঠক তাঁদের দাবির জোরে সাহিত্যরাজ্যে হাটের পত্তন হলে দুঃখের বিষয় ঘটে। হাটের মালিক বিষয়-বুদ্ধি-প্রধান বিজ্ঞান।

এদিকে সম্পাদক এসে বলেন, সংসারে নাম রূপ দুটোই অত্যাবশ্যক। আমি ভেবে দেখলুম, রূপের আমরা নাম দিই, বস্তুর দিই সংজ্ঞা। সন্দেশ যেখানে রূপ সেখানে তাকে বলি 'অবাক চাকি', যেখানে বস্তু সেখানে তাকে বলি মিষ্টান্ন। সম্পাদক মশায়ের

সংজ্ঞা হচ্চে 'সম্পাদক', এখানে অর্থ মিলিয়ে আদালতে হলফ করে বলতে পারি শব্দের সঙ্গে বিষয়ের ষোলো আনা মিল আছে। কিন্তু যেখানে তিনি বিষয় নন, রূপ,—অর্থাৎ স্বতন্ত্র ও একমাত্র, সেখানে কোনো একটা মাত্র সংজ্ঞা দিয়ে তাঁকে বাঁধা অসম্ভব। সেখানে তাঁর আছে নাম। সেই নামের সঙ্গে মিলিয়ে শত্রু-মিত্র কেউ তাঁর যাচাই করে না। পিতামাতা যদি তাঁকে 'সম্পাদক' নামই দিতেন তবে নাম সার্থক করবার জন্যে সম্পাদক হবার কোনো দরকারই তাঁর থাকত না।

গল্প জিনিসটাও রূপ; ইংরেজিতে যাকে বলে ক্রিয়েশন। আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় যেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। 'বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—নামে দোষ নেই। কেননা ও নামে গল্পের কোনো ব্যাখ্যাই করা হয় নি।

সম্পাদক মশায় যখন গল্পের নামের জন্যে পেয়াদা পাঠালেন তাড়াতাড়ি তখন 'তিন পুরুষ' নামটা দিয়ে তাকে বিদায় করা গেল। তার পরক্ষণেই নামটা কাহিনীর আঁচলের সঙ্গে তার গ্রন্থিবন্ধন করে নিয়ে কানে কানে মুহূর্তে মুহূর্তে বলতে লাগল, 'যদেতৎ অর্থং মম তদস্তু রূপং তব।' আমার সঙ্গে তোমাকে সম্পূর্ণ মিলে চলতে হবে। 'ছায়েবানুগতাস্বচ্ছা' ইত্যাদি। কাহিনী বলে, 'তার মানে কী হল?' নাম বলে, 'বাক্যে ভাবে আজ থেকে আমাকে সপ্রমাণ করে চলাই তোমার ধর্ম।' কাহিনী বলে, 'রেজিস্টার বইয়ে কর্তার তাড়ায় সম্মতি সই করেছি বটে, কিন্তু আজ আমি হাজার হাজার পাঠকের সামনে দাঁড়িয়েই সেটা বেকবুল করে যেতে চাই।'

কর্তা বলেন,—তিন পুরুষের তিন তোরণওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে এই আমার একটা খেয়াল মাত্র ছিল। এই চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্যে নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যেই। সুতরাং এই নামটা ত্যাগ করলে আমার গল্পের কোনো স্বত্বের দলিল কাঁচবে না।

অতএব সর্বসমক্ষে আমার গল্প আজ তার নাম খোয়াতে বসেছে। আমরা তিন সত্যের জোর মানি; 'বিচিত্রা'-র পাতায় নাম সম্বন্ধে দুইবার সত্যপাঠ হয়ে গেছে। তিনবারের বেলায় মুখ চাপা দেওয়া গেল।

আর একটা নাম ঠাউরেছি। সেটা এতই নির্বিশেষ যে গল্পমাত্রেই নির্বিচারে খাটতে পারে। সরকারি জিনিস মাত্রেরই মতো সে নামে চমৎকারিতা নেই। নাইবা রইল। জাপানে দেখেছি, তলোয়ারের ফলকটার উপরে কারিগর যখন তার কারুকলার আনন্দ ঢেলে দেয় খাপটাকে তখন নিতান্ত নিরলঙ্কার করে রাখে। গল্প নিজেই নিজের পরিচয় দেবার সাহস রাখে যেন,—নামটাকে যেন জোর গলায় আগে আগে নকীবগিরি করতে না পাঠায়।

'তিন পুরুষ' নাম ঘুচিয়ে আমার গল্পের নাম দেওয়া গেল—

'যোগাযোগ'

'কিন্তা' জাহাজ
শ্যামের পথ
৪ অক্টোবর, ১৯২৭।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৬
কে. মাৎসুহারা-অঙ্কিত

শেষের কবিতা

প্রকাশ : ১৯২৯

'শেষের কবিতা' ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে রচিত, প্রবাসী পত্রিকায় (ভাদ্র-চৈত্র ১৩৩৫) মুদ্রিত ও ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

'শেষের কবিতা'র পূর্বনাম 'মিতা' এবং মুখে মুখে কথিত একটি গল্পে এর সূচনা বলে জানা যায়।

১

অমিত-চরিত

অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজি ছাঁদে রায় পদবী 'রয়' ও 'রে' রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হল বৃদ্ধি। এই কারণে, নামের অসামান্যতা কামনা করে অমিত এমন একটি বানান বানালে যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল— অমিট রায়ে।

অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী ব্যারিস্টার। যে পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও অমিত বিনা বিপত্তিতে এ যাত্রা টি'কে গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ.-র কোঠায় পা দেবার পূর্বেই অমিত অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়; সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেল কেটে। বুদ্ধি বেশি থাকাতে পড়াশুনো বেশি করে নি, অথচ বিদ্যেতে কমতি আছে বলে ঠাহর হয় না। ওর বাপ ওর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর ইচ্ছে ছিল, তাঁর একমাত্র ছেলের মনে অক্স্‌ফোর্ডের রঙ এমন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।

অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় আমার পাঠক স্বল্প, যোগ্যতায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্যবাজারে যাদের নাম আছে তাদের স্টাইল নেই। জীবসৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেমনি ঘাড়ে-গর্দানে সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ, চালটা ঢিলে নড়বড়ে, বাংলাসাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন। সমালোচকদের কাছে সময় থাকতে বলে রাখা ভালো, মতটা আমার নয়।

অমিত বলে, ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে যারা সাহিত্যের ওমরাও-দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা-দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যাবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমি স্টাইল বঙ্কিমের লেখা 'বিষবৃক্ষে', বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন; বঙ্কিমি ফ্যাশান নসিরামের লেখা 'মনোমোহনের মোহনবাগানে', নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যাবসাদার নাচওয়ালির দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখবার বেলায় বেনারসি ওড়নার ঘোমটা চাই। কানাত হল ফ্যাশানের, আর বেনারসি হল স্টাইলের, বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখবার জন্যে। অমিত বলে, হাটের লোকের পায়ে-চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা সরতে ভরসা পায় না বলেই আমাদের দেশে স্টাইলের এত অনাদর। দক্ষযজ্ঞের গল্পে এই কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশানদুরস্ত দেবতা, যাজ্ঞিকমহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুটত। শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিন্যাল যে, মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বেদস্তুর বলে জানত। অক্স্‌ফোর্ডের বি.এ.-র মুখে এ-সব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। কেননা, আমার বিশ্বাস, আমার লেখায় স্টাইল আছে—সেইজন্যেই আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তারা 'ন পুনরাবর্তন্তে'।

আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ অমিতর এ-সব কথা একেবারে সইতে পারত না— বলত, 'রেখে দাও তোমার অক্সফোর্ডের পাস।' সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম.এ.; তাকে পড়তে হয়েছে বিস্তর, বুঝতে হয়েছে অল্প। সেদিন সে আমাকে বললে, 'অমিত কেবলই ছোটো লেখককে বড়ো করে বড়ো লেখককে খাটো করবার জন্যেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তার শখ, তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।' দুঃখের বিষয়, এই আলোচনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন আমার স্ত্রী, স্বয়ং ওর সহোদরা। কিন্তু পরম সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার শ্যালকের কথা তাঁর একটুও ভালো লাগে নি। দেখলুম, অমিতর সঙ্গেই তাঁর রুচির মিল, অথচ পড়াশুনো বেশি করেন নি। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি!

অনেক সময় আমার মনেও খটকা লাগে যখন দেখি, কত কত নামজাদা ইংরেজ লেখকদেরকেও নগণ্য করতে অমিতর বুক দমে না। তারা হল, যাদের বলা যেতে পারে বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়োবাজারের ছাপ-মারা; প্রশংসা করবার জন্যে যাদের লেখা পড়ে দেখবার দরকারই হয় না, চোখ বুজে গুণগান করলেই পাস্‌মার্ক্‌ পাওয়া যায়। অমিতর পক্ষেও এদের লেখা পড়ে দেখা অনাবশ্যক, চোখ বুজে নিন্দে করতে ওর বাধে না। আসলে, যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারি, বর্ধমানের ওয়েটিংরুমের মতো; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাসদখল, যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কামরা।

অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে। পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; মনটা এমন একরকমের চকমকি যে, ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের, যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাঁকঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায় একটা পাট-করা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে; বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ-করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর একরকমের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে, যারা বোঝে তারা বলে— কিছু আলুথালু গোছের বটে; কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে ডিস্‌টিঙ্গুইশ্‌ড্‌। নিজেকে অপরূপ করবার শখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত। কোনোমতে বয়স মিলিয়ে যারা কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এ দিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাকনাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুনবাজারে অত্যন্ত হালের আমদানি— ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট-বিশেষ। উঁচু খুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপ্‌টানো। এরা খুট খুট করে দ্রুত লয়ে চলে; উচ্চৈঃস্বরে বলে: স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি; গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর ক'রে সঞ্চালন

করে, এবং পুরুষবন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।

আপন দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতর ব্যবহার দেখে তার দলের পুরুষদের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্বিশেষভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর ঔদাসীন্য নেই, বিশেষভাবে কারও প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোনোখানে মধুর রসেরও অভাব ঘটে না। এক কথায় বলতে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। অমিত পার্টিতেও যায়, তাসও খেলে, ইচ্ছে করেই বাজিতে হারে, যে রমণীর গলা বেসুরো তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে পীড়াপীড়ি করে, কাউকে বদ-রঙের কাপড় পরতে দেখলে জিজ্ঞাসা করে কাপড়টা কোন্ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা বলে, বিশেষ পক্ষপাতের সুর লাগায়; অথচ সবাই জানে, ওর পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে মানুষ অনেক দেবতার পূজারি, আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো ব'লে স্তব করে; দেবতাদের বুঝতে বাকি থাকে না, অথচ খুশিও হন। কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েছে, অমিত সোনার রঙের দিগন্তরেখা, ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না। সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব করতে পারে, নিকটে দাহ্যবস্তু থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।

সেদিন পিকনিকে গঙ্গার ধারে যখন ওপারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত স্তব্ধতার উপরে চাঁদ উঠল, ওর পাশে ছিল লিলি গাঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস্বরে বললে, 'গঙ্গার ও পারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এ পারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনো দিনই আর হবে না।'

প্রথমটা লিলি গাঙ্গুলির মন এক মুহূর্তে ছলছলিয়ে উঠেছিল; কিন্তু সে জানত, এ কথাটায় যতখানি সত্য সে কেবল ঐ বলার কায়দাটুকুর মধ্যেই। তার বেশি দাবি করতে গেলে বুদ্বুদের উপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি করা হয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ঘোর-লাগা থেকে ঠেলা দিয়ে লিলি হেসে উঠল, বললে, 'অমিট, তুমি যা বললে সেটা এত বেশি সত্য যে, না বললেও চলত। এইমাত্র ব্যাঙটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল এটাও তো অনন্তকালের মধ্যে আর কোনোদিন ঘটবে না।'

অমিত হেসে উঠে বললে, 'তফাত আছে, লিলি, একেবারে অসীম তফাত। আজকের সন্ধ্যাবেলায় ঐ ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিস। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি—বেটোফেনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। আমার মনে হয় যেন বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে; সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আঙটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।'

'ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না, অমিট, বিশ্বকর্মার স্যাকরার বিল তোমাকে শুধতে হবে না।'

'কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করব, তার পরে কী হবে ভেবে দেখো।'

লিলি অমিতকে পাখার বাড়ি তাড়না ক'রে বললে, 'তার পরে সোনার মুহূর্তটি অন্যমনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কত মুহূর্ত খসে পড়ে গেছে, ভুলে গেছ বলে তার হিসেব নেই।'

এই বলে লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটা ঘটনার নমুনা দেওয়া গেল।

অমিতর বোন সিসি-লিসিরা ওকে বলে, 'অমি, তুমি বিয়ে কর না কেন?'

অমিত বলে, 'বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরি হচ্ছে পাত্রী, তার নীচেই পাত্র।'

সিসি বলে, 'অবাক করলে, মেয়ে এত আছে।'

অমিত বলে, 'মেয়ে বিয়ে করত সেই পুরাকালে, লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী, আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে সে অদ্বিতীয়।'

সিসি বলে, 'তোমার ঘরে এলেই তুমি হবে প্রথম, সে হবে দ্বিতীয়, তোমার পরিচয়েই হবে তার পরিচয়।'

অমিত বলে, 'আমি মনে মনে যে মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জ্বলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তুঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।'

সিসি বলে, 'অর্থাৎ, সে তোমার বোনেদের মতো একটুও না।'

অমিত বলে, 'অর্থাৎ, সে ঘরে এসে কেবল ঘরের লোকেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।'

লিসি বলে, 'আচ্ছা ভাই সিসি, বিমি বোস তো অমির জন্যে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে, ইশারা করলেই ছুটে এসে পড়ে, তাকে ওর পছন্দ নয় কেন? বলে, তার কালচার নেই। কেন ভাই, সে তো এম.এ.-তে বটানিতে ফার্স্ট্। বিদ্যেকেই তো বলে কালচার।'

অমিত বলে, 'কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।'

লিসি রেগে উঠে বলে, 'ইস, বিমি বোসের আদর নেই ওঁর কাছে! উনি নিজেই নাকি তার যোগ্য! অমি যদি বিমি বোসকে বিয়ে করতে পাগল হয়েও ওঠে আমি তাকে সাবধান করে দেব, সে যেন ওর দিকে ফিরেও না তাকায়।'

অমিত বললে, 'পাগল না হলে বিমি বোসকে বিয়ে করতে চাইবই বা কেন? সে সময়ে আমার বিয়ের কথা না ভেবে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা ভেবো।'

আত্মীয়স্বজন অমিতর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। তারা ঠিক করেছে, বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, তাই ও কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে আর উলটো কথা ব'লে মানুষকে চমক লাগিয়ে বেড়ায়। ওর মনটা আলেয়ার আলো, মাঠে বাটে ধাঁধা লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধরে আনবার জো নেই।

ইতিমধ্যে অমিত যেখানে-সেখানে হো হো করে বেড়াচ্ছে— ফিরপোর দোকানে যাকে-তাকে চা খাওয়াচ্ছে, যখন-তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে; এখান-ওখান থেকে যা-তা কিনছে আর একে-ওকে বিলিয়ে দিচ্ছে, ইংরেজি বই সদ্য কিনে এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে ফেলে আসছে, আর ফিরিয়ে আনছে না।

ওর বোনেরা ওর যে অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্ছে ওর উলটো কথা বলা। সজ্জনসভায় যা-কিছু সর্বজনের অনুমোদিত ও তার বিপরীত কিছু-একটা বলে বসবেই।

একদা কোন্ একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রাসির গুণ বর্ণনা করছিল; ও বলে উঠল, 'বিষ্ণু যখন সতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করলেন তখন দেশ জুড়ে যেখানে-সেখানে তাঁর একশোর অধিক পীঠস্থান তৈরি হয়ে গেল। ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে; খুদে খুদে অ্যারিস্টক্রাটে পৃথিবী ছেয়ে গেল— কেউ পলিটিক্সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে। তাদের কারও গাম্ভীর্য নেই, কেননা তাদের নিজের 'পরে বিশ্বাস নেই।'

একদা মেয়েদের 'পরে পুরুষের আধিপত্যের অত্যাচার নিয়ে কোনো সমাজহিতৈষী অবলা-বান্ধব নিন্দা করছিল পুরুষদের। অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ফস্ করে বললে, 'পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।'

সভাস্থ অবলা ও অবলাবান্ধবেরা চটে উঠে বললে, 'মানে কী হল।'

অমিত বললে, 'যে পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না; আফিমওয়ালি বাঁধেও বটে, ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি শয়তানী তার জোগান দেয়।'

একদিন ওদের বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। অমিতর জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হতে রাজি হয়েছিল; গিয়েছিল মনে মনে যুদ্ধসাজ প'রে। একজন সেকেলেগোছের অতি ভালোমানুষ ছিল বক্তা। রবি ঠাকুরের কবিতা যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য। দুই-একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার করলে, প্রমাণটা একরকম সন্তোষজনক।

সভাপতি উঠে বললে, 'কবিমাত্রের উচিত পাঁচ বছর মেয়াদে কবিত্ব করা, পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। এ কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, "আনো ফজলিতর আম।" বলব, "নতুনবাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে।" ডাব-নারকেলের মেয়াদ অল্প, সে রসের মেয়াদ; ঝুনো নারকেলের মেয়াদ বেশি, সে শাঁসের মেয়াদ। কবিরা হল ক্ষণজীবী, ফিলজফরের বয়সের গাছপাথর নেই।... রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে-থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। পরবর্তী যিনি আসবেন তিনিও তাল ঠুকেই গর্জাতে গর্জাতে আসবেন, তাঁর রাজত্বের অবসান নেই। অমরাবতী বাঁধা থাকবে মর্ত্যে তাঁরই দরজায়। কিছুকাল ভক্তরা দেবে মাল্যচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে, তার পরে আসবে তাঁকে বলি দেবার পুণ্য দিন—ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিত্রাণের শুভ লগ্ন। আফ্রিকায় চতুষ্পদ দেবতার পুজোর প্রণালী এইরকমই। দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী চতুর্দশপদী দেবতাদের পুজোও এই নিয়মে। পুজো জিনিসটাকে একঘেয়ে করে তোলার মতো অপবিত্র অধার্মিকতা আর কিছু হতে পারে না।... ভালো লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে, বেচারা জানতে পারে নি যে, সে মরে গেছে। একটু ঠেলা মারলেই তার নিজের কাছে প্রমাণ হবে যে, সেন্টিমেন্টাল আত্মীয়েরা তার অন্ত্যেষ্টিসৎকার করতে বিলম্ব করেছিল, বোধ করি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে চিরকাল ফাঁকি দেবার মতলবে। রবি ঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাব্লিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।'

আমাদের মণিভূষণ চশমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্ন করলে, 'সাহিত্য থেকে লয়ালটি উঠিয়ে দিতে চান?'

'একেবারেই। এখন থেকে কবি-প্রেসিডেন্টের দ্রুতনিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্‌শো-করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো। ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো। ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো। খোঁচাওয়ালা কোণওয়ালা গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়। এমন-কি যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্‌ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।... এখন থেকে ফেলে দাও মনভোলাবার ছল করা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে, যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে—অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছুদিন যেতেই কিষ্কিন্ধ্যা

জেগে উঠবে, কোন্ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্মিলন, বায়রনের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ: ডিকেন্স্‌কে বলব, মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্যলাভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েছি।... মোগল বাদশাহের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের যত মুগ্ধ মিস্ত্রি মিলে যদি যেখানে-সেখানে ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওয়ালা পাথরের বুদ্‌বুদ বানিয়ে চলত তা হলে ভদ্রলোক মাত্রই যে দিন বিশ বছর বয়স পেরোত সেই দিনই বানপ্রস্থ নিতে দেরি করত না। তাজমহলকে ভালো লাগাবার জন্যেই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।'

(এইখানে বলে রাখা দরকার, কথার তোড় সামলাতে না পেরে সভার রিপোর্টারের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সে যা রিপোর্ট লিখেছিল, সেটা অমিতর বক্তৃতার চেয়েও অবোধ্য হয়ে উঠেছিল। তারই থেকে যে-কটা টুকরো উদ্ধার করতে পারলুম তাই আমরা উপরে সাজিয়ে দিয়েছি।)

তাজমহলের পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে রবি ঠাকুরের ভক্ত আরক্তমুখে বলে উঠল, 'ভালো জিনিস যত বেশি হয় ততই ভালো।'

অমিত বললে, 'ঠিক তার উলটো। বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো. নইলে সে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হয়ে যেত মাঝারি।... যে-সব কবি ষাট-সত্তর পর্যন্ত বাঁচতে একটুও লজ্জা করে না তারা নিজেকে শাস্তি দেয় নিজেকে সস্তা ক'রে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারি দিকে ব্যূহ বেঁধে তাদেরকে মুখ ভ্যাংচাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগড়ে যায়, পূর্বের লেখা থেকে চুরি শুরু করে হয়ে পড়ে পূর্বের লেখার রিসিভর্স্ অফ স্টোল্‌ন্ প্রপার্টি। সে স্থলে লোকহিতের খাতিরে পাঠকদের কর্তব্য হচ্ছে, কিছুতেই এই-সব অতিপ্রবীণ কবিদের বাঁচতে না দেওয়া— শারীরিক বাঁচার কথা বলছি নে, কাব্যিক বাঁচা। এদের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক্ প্রবীণ অধ্যাপক, প্রবীণ পোলিটিশন, প্রবীণ সমালোচক।'

সেদিনকার বক্তা বলে উঠল, 'জানতে পারি কি, কাকে আপনি প্রেসিডেন্ট করতে চান? তার নাম করুন।'

অমিত ফস্ করে বললে, 'নিবারণ চক্রবর্তী।'

সভার নানা চৌকি থেকে বিস্মিত'রব উঠল— 'নিবারণ চক্রবর্তী? সে লোকটা কে।'

'আজকের দিনে এই-যে প্রশ্নের অঙ্কুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনস্পতি জেগে উঠবে।'

'ইতিমধ্যে আমরা একটা নমুনা চাই।'

'তবে শুনুন।' বলে পকেট থেকে একটা সরু লম্বা ক্যাম্বিসে-বাঁধা খাতা বের করে তার থেকে পড়ে গেল :

আনিলাম
অপরিচিতের নাম
ধরণীতে,
পরিচিত জনতার সরণীতে।
আমি আগন্তুক,
আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।
খোলো দ্বার,
বার্তা আনিয়াছি বিধাতার।
মহাকালেশ্বর
পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর,

বল্ দুঃসাহসী কে কে
মৃত্যু পণ রেখে
দিবি তার দুরূহ উত্তর।

শুনিবে না।
মূঢ়তার সেনা
করে পথরোধ।
ব্যর্থ ক্রোধ
হুংকারিয়া পড়ে বুকে,
তরঙ্গের নিষ্ফলতা
নিত্য যথা
মরে মাথা ঠুকে
শৈলতট-'পরে
আত্মঘাতী দম্ভভরে।

পুষ্পমাল্য নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল,
নাহি বর্ম অঙ্গদ কুণ্ডল।
শূন্য এ ললাটপট্টে লিখা
গূঢ় জয়টিকা।
ছিন্ন কন্থা দরিদ্রের বেশ।
করিব নিঃশেষ
তোমার ভাণ্ডার।
খোলো খোলো দ্বার।
অকস্মাৎ
বাড়ায়েছি হাত,
যা দিবার দাও অচিরাৎ।
বক্ষ তব কেঁপে উঠে, কম্পিত অর্গল,
পৃথ্বী টলমল।
ভয়ে আর্ত উঠিছে চীৎকারি
দিগন্ত বিদারি,
'ফিরে যা এখনি,
রে দুর্দান্ত দুরন্ত ভিখারী,
তোর কণ্ঠধ্বনি
ঘুরি ঘুরি
নিশীথনিদ্রার বক্ষে হানে তীব্র ছুরি।'

অস্ত্র আনো।
ঝঞ্ঝনিয়া আমার পঞ্জরে হানো।
মৃত্যুরে মারুক মৃত্যু, অক্ষয় এ প্রাণ
করি যাব দান।

শৃঙ্খল জড়াও তবে,
বাঁধো মোরে, খণ্ড খণ্ড হবে
মুহূর্তে চকিতে,
মুক্তি তব আমারি মুক্তিতে।

শাস্ত্র আনো।
হানো মোরে, হানো।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে
ঊর্ধ্বস্বরে চাহিবে খণ্ডিতে
দিব্য বাণী।
জানি জানি
তর্কবাণ
হয়ে যাবে খান খান।
মুক্ত হবে জীর্ণ বাক্যে আচ্ছন্ন দু চোখ-
হেরিবে আলোক।

অগ্নি জ্বালো।
আজিকার যাহা ভালো
কল্য যদি হয় তাহা কালো,
যদি তাহা ভস্ম হয়
বিশ্বময়,
ভস্ম হোক।
দূর করো শোক।
মোর অগ্নিপরীক্ষায়
ধন্য হোক বিশ্বলোক অপূর্ব দীক্ষায়।

আমার দুর্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির 'পরে মুষ্টি হানি
করিবে তাহারে উচ্চকিত,
আতঙ্কিত।
উন্মাদ আমার ছন্দ
দিবে ধন্দ
শান্তিলুব্ধ মুমুক্ষুরে,
ভিক্ষাজীর্ণ বুভুক্ষুরে।
শিরে হস্ত হেনে
একে একে নিবে মেনে
ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে
লোকালয়ে
অপরিচিতের জয়,
অপরিচিতের পরিচয়—
যে অপরিচিত

বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,
হানি বজ্রমুঠি
মেঘের কার্পণ্য টুটি
সংগোপন বর্ষণসঞ্চয়
ছিন্ন ক'রে মুক্ত করে সর্বজগন্ময়।

রবি ঠাকুরের দল সেদিন চুপ করে গেল। শাসিয়ে গেল, লিখে জবাব দেবে।

সভাটাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে মোটরে করে অমিত যখন বাড়ি আসছিল, সিসি তাকে বললে, 'একখানা আস্ত নিবারণ চক্রবর্তী তুমি নিশ্চয় আগে থাকতে গড়ে তুলে পকেটে করে নিয়ে এসেছ, কেবলমাত্র ভালোমানুষদের বোকা বানাবার জন্যে।'

অমিত বললে, 'অনাগতকে যে মানুষ এগিয়ে নিয়ে আসে তাকেই বলে অনাগতবিধাতা। আমি তাই। নিবারণ চক্রবর্তী আজ মর্ত্যে এসে পড়ল, কেউ তাকে আর ঠেকাতে পারবে না।'

সিসি অমিতকে নিয়ে মনে মনে খুব একটা গর্ব বোধ করে। সে বললে, 'আচ্ছা অমিত, তুমি কি সকালবেলা উঠেই সেদিনকার মতো তোমার যত শানিয়ে-বলা কথা বানিয়ে রেখে দাও?'

অমিত বললে, 'সম্ভবপরের জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত। এ কথাটাও আমার নোট-বইয়ে লেখা আছে।'

'কিন্তু তোমার নিজের মত বলে কোনো পদার্থই নেই; যখন যেটা বেশ ভালো শোনায় সেইটেই তুমি বলে বস।'

'আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তা হলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মুহূর্তের প্রতিবিম্ব পড়ত না।'

সিসি বললে, 'অমি, প্রতিবিম্ব নিয়েই তোমার জীবন কাটবে।'

২

সংঘাত

অমিত বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে গেল। তার কারণ, সেখানে ওর দলের লোক কেউ যায় না। আরো একটা কারণ, ওখানে কন্যাদায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়। অমিতর হৃদয়টার 'পরে যে দেবতা সর্বদা শরসন্ধান করে ফেরেন তাঁর আনাগোনা ফ্যাশানেবল পাড়ায়। দেশের পাহাড়-পর্বতে যত বিলাসী বসতি আছে তার মধ্যে শিলঙে এদের মহলে তাঁর টার্গেট-প্র্যাক্‌টিসের জায়গা সব চেয়ে সংকীর্ণ। বোনেরা মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'যেতে হয় একলা যাও, আমরা যাচ্ছি নে।'

বাঁ হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা, ডান হাতে টেনিস ব্যাট, গায়ে নকল পারসিক শালের ক্লোক পরে বোনরা গেল চলে দার্জিলিঙে। বিমি বোস আগেভাগেই সেখানে গিয়েছে। যখন ভাইকে বাদ দিয়ে বোনদের সমাগম হল তখন সে চারি দিকে চেয়ে আবিষ্কার করলে দার্জিলিঙে জনতা আছে, মানুষ নেই।

অমিত সবাইকে বলে গিয়েছিল, সে শিলঙে যাচ্ছে নির্জনতা ভোগের জন্যে—দুদিন না যেতেই বুঝলে, জনতা না থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায়। ক্যামেরা-হাতে দৃশ্য দেখে বেড়াবার শখ অমিতর নেই। সে বলে, আমি টুরিস্ট না, মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।

কিছুদিন ওর কাটল পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই পড়ে পড়ে। গল্পের বই ছুঁলে

না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মনান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে। এখানকার পাহাড় পর্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্য-জড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে ওঠে না; যেন কোনো রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মতো— ধুয়ো নেই, তাল নেই, সম নেই। অর্থাৎ তার মধ্যে বিস্তর আছে কিন্তু এক নেই— তাই এলানো জিনিস ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না। অমিতর আপন নিখিলের মাঝখানে একের অভাবে ও যে কেবলই চঞ্চলভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে সে দুঃখ ওর এখানেও যেমন, শহরেও তেমনি। কিন্তু শহরে সেই চাঞ্চল্যটাকে সে নানাপ্রকারে ক্ষয় করে ফেলে, এখানে চাঞ্চল্যটাই স্থির হয়ে জমে জমে ওঠে। ঝরনা বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হয়ে দাঁড়ায়। তাই ও যখন ভাবছে, পালাই পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে সিলেট-শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি, এমন সময় আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে; এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কূলছাড়া করবে। স্থির করলে, এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়— নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

সেদিন সে পরল হাইলান্ডারি মোটা কম্বলের মোজা, পুরু সুকতলাওয়ালা মজবুত চামড়ার জুতো, খাকি নরফোক কোর্তা, হাঁটু পর্যন্ত হ্রস্ব অধোবাস, মাথায় সোলাটুপি। অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের মতো দেখতে হল না— মনে হতে পারত রাস্তা তদারক করতে বেরিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট্ এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পকেটে ছিল গোটা পাঁচ-সাত পাতলা এডিশনের নানা ভাষার কাব্যের বই।

আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা, ডান দিকে জঙ্গলে ঢাকা খদ। এ রাস্তার শেষ লক্ষ্য অমিতর বাসা। সেখানে যাত্রী-সম্ভাবনা নেই, তাই সে আওয়াজ না করে অসতর্কভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়টায় ভাবছিল, আধুনিক কালে দূরবর্তিনী প্রেয়সীর জন্যে মোটর-দূতটাই প্রশস্ত— তার মধ্যে 'ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ' বেশ ঠিক পরিমাণেই আছে— আর, চালকের হাতে একখানি চিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক করে নিলে আগামী বৎসরে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মেঘদূতবর্ণিত রাস্তা দিয়েই মোটরে করে যাত্রা করবে, হয়তো বা অদৃষ্ট ওর পথ চেয়ে 'দেহলীদত্তপুষ্পা' যে পথিকবধূকে এতকাল বসিয়ে রেখেছে সেই অবন্তিকা হোক বা মালবিকাই হোক, বা হিমালয়ের কোনো দেবদারুবনচারিণীই হোক, ওকে হয়তো কোনো-একটা অভাবনীয় উপলক্ষে দেখা দিতেও পারে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসেই দেখলে আর-একটা গাড়ি উপরে উঠে আসছে। পাশ-কাটাবার জায়গা নেই। ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে— পরস্পর আঘাত লাগল, কিন্তু অপঘাত ঘটল না। অন্য গাড়িটা খানিকটা গড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে আটকে থেমে গেল।

একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি— চারি দিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দারপর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে— মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখলে। ড্রয়িংরুমে এ মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েটির পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার

মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কবজি পর্যন্ত, দু হাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকি কাজ-করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।

অমিত গাড়িতে টুপিটা খুলে রেখে তার সামনে চুপ করে এসে দাঁড়াল। যেন একটা পাওনা শাস্তির অপেক্ষায়। তাই দেখে মেয়েটির বুঝি দয়া হল, একটু কৌতুকও বোধ করলে। অমিত মৃদুস্বরে বললে, 'অপরাধ করেছি।'

মেয়েটি হেসে বললে, 'অপরাধ নয়, ভুল। সেই ভুলের শুরু আমার থেকেই।'

উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে, মেয়েটির কণ্ঠস্বর তারই মতো নিটোল। অল্পবয়সের বালকের গলার মতো মসৃণ এবং প্রশস্ত। সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত অনেকক্ষণ ভেবেছিল, এর গলার সুরে যে-একটি স্বাদ আছে, স্পর্শ আছে, তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে। নোট-বইখানা খুলে লিখলে, 'এ যেন অম্বুরি তামাকের হালকা ধোঁয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে— নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে গোলাপজলের স্নিগ্ধ গন্ধ।'

মেয়েটি নিজের ত্রুটি ব্যাখ্যা করে বললে, 'একজন বন্ধু আসার খবর পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। এই রাস্তায় খানিকটা উঠতেই শোফার বলেছিল, এ রাস্তা হতে পারে না। তখন শেষ পর্যন্ত না গিয়ে ফেরবার উপায় ছিল না। তাই উপরে চলেছিলাম। এমন সময় উপরওয়ালার ধাক্কা খেতে হল।'

অমিত বললে, 'উপরওয়ালার উপরেও উপরওয়ালা আছে—একটা অতি কুশ্রী কুটিল গ্রহ, এ তারই কুকীর্তি।'

অপর পক্ষের ড্রাইভার জানালে, 'লোকসান বেশি হয় নি, কিন্তু গাড়ি সেরে নিতে দেরি হবে।'

অমিত বললে, 'আমার অপরাধী গাড়িটাকে যদি ক্ষমা করেন তবে আপনি যেখানে অনুমতি করবেন সেইখানেই পৌঁছিয়ে দিতে পারি।'

'দরকার হবে না, পাহাড়ে হেঁটে চলা আমার অভ্যেস।'

'দরকার আমারই, মাপ করলেন তার প্রমাণ।'

মেয়েটি ঈষৎ দ্বিধায় নীরব রইল। অমিত বললে, 'আমার তরফে আরো একটু কথা আছে। গাড়ি হাঁকাই—বিশেষ একটা মহৎ কর্ম নয়—এ গাড়ি চালিয়ে পস্টারিটি পর্যন্ত পৌঁছবার পথ নেই। তবু আরম্ভে এই একটিমাত্র পরিচয়ই পেয়েছেন। অথচ এমনি কপাল, সেটুকুর মধ্যেও গলদ। উপসংহারে একটু দেখাতে দিন যে, জগতে অন্তত আপনার শোফারের চেয়ে আমি অযোগ্য নই।'

অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েরা সংকোচ সরাতে চায় না। কিন্তু বিপদের এক ধাক্কায় উপক্রমণিকার অনেকখানি বিস্তৃত বেড়া এক দমে গেল ভেঙে। কোন্ দৈব নির্জন পাহাড়ের পথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দুজনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে; সবুর করলে না। আকস্মিকের বিদ্যুৎ-আলোতে এমন করে যা চোখে পড়ল, প্রায় মাঝে মাঝে এ যে রাত্রে জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্যের মাঝখানটাতে তার গভীর ছাপ পড়ে গেল, নীল আকাশের উপরে সৃষ্টির কোন্ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় যেমন সূর্য-নক্ষত্রের আগুন-জ্বলা ছাপ।

মুখে কথা না বলে মেয়েটি গাড়িতে উঠে বসল। তার নির্দেশমত গাড়ি পৌঁছল যথাস্থানে। মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে বললে, 'কাল যদি আপনার সময় থাকে একবার এখানে আসবেন, আমাদের কর্তা-মার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।'

অমিতর ইচ্ছে হল বলে, 'আমার সময়ের অভাব নেই, এখনি আসতে পারি।' সংকোচে বলতে পারলে না।

বাড়ি ফিরে এসে ওর নোট-বই নিয়ে লিখতে লাগল, 'পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামি করলে। দুজনকে দু জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে আজ থেকে হয়তো এক রাস্তায় চালান করে দিলে।

অ্যাস্ট্রনমার ভুল বলেছে। অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়েছিল পৃথিবীর কক্ষপথে—লাগল তাদের মোটরে মোটরে ধাক্কা, সেই মরণের তাড়নার পর থেকে যুগে যুগে দুজনে একসঙ্গেই চলেছে; এর আলো ওর মুখে পড়ে, ওর আলো এর মুখে। চলার বাঁধন আর ছেঁড়ে না। মনের ভিতরটা বলছে, আমাদের শুরু হল যুগলচলন, আমরা চলবার সূত্রে গাঁথব ক্ষণে ক্ষণে কুড়িয়ে-পাওয়া উজ্জ্বল নিমেষগুলির মালা। বাঁধা মাইনেয় বাঁধা খোরাকিতে ভাগ্যের দ্বারে পড়ে থাকবার জো রইল না; আমাদের দেনাপাওনা সবই হবে হঠাৎ।'

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি করতে করতে অমিত মনে মনে বলে উঠল, 'কোথায় আছ নিবারণ চক্রবর্তী! এইবার ভর করো আমার 'পরে, বাণী দাও, বাণী দাও!' বেরোল লম্বা সরু খাতাটা, নিবারণ চক্রবর্তী বলে গেল :

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য;
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনক-চাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন সন্ধেবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ,
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রনগুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালন-ললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত।

এইখানে একবার পিছন ফেরা চাই। পশ্চাতের কথাটা সেরে নিতে পারলে গল্পটার সামনে এগোবার বাধা হবে না।

৩

পূর্ব ভূমিকা

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে চণ্ডীমণ্ডপের হাওয়ার সঙ্গে স্কুল-কলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটাতে সমাজবিদ্রোহের যে ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানদাশংকর। তিনি সেকালের লোক, কিন্তু তাঁর তারিখটা হঠাৎ পিছলিয়ে সরে এসেছিল অনেকখানি একালে। তিনি আগাম জন্মেছিলেন। বুদ্ধিতে বাক্যে ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক। সমুদ্রের ঢেউবিলাসী পাখির মতো লোকনিন্দার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ ছিল।

এমন-সকল পিতামহের নাতিরা যখন এইরকম তারিখের বিপর্যয় সংশোধন করতে চেষ্টা করে তখন তারা এক-দৌড়ে পেঁছয় পঞ্জিকার একেবারে উলটো দিকের টার্মিনসে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। জ্ঞানদাশংকরের নাতি বরদাশংকর বাপের মৃত্যুর পর যুগ-হিসাবে বাপ-পিতামহের প্রায় আদিম পূর্বপুরুষ হয়ে উঠলেন। মনসাকেও হাতজোড় করেন, শীতলাকেও মা বলে ঠাণ্ডা করতে চান। মাদুলি ধুয়ে জল খাওয়া শুরু হল; সহস্র দুর্গানাম লিখতে লিখতে দিনের পূর্বাহ্ণ যায় কেটে; তাঁর এলেকায় যে বৈশ্যদল নিজেদের দ্বিজত্ব প্রমাণ করতে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠেছিল অন্তরে বাহিরে সকল দিক থেকেই তাদের বিচলিত করা হল, হিন্দুত্বরক্ষার উপায়গুলিকে বিজ্ঞানের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার সাহায্যে অসংখ্য প্যাম্ফলেট ছাপিয়ে আধুনিক বুদ্ধির কপালে বিনামূল্যে ঋষিবাক্যবর্ষণ করতে কার্পণ্য করলেন না। অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্মে, জপে তপে, আসনে আচমনে, ধ্যানে স্নানে, ধূপে ধুনোয়, গোব্রাহ্মণ-সেবায়, শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্ছিদ্র করে বানালেন। অবশেষে গোদান, স্বর্ণদান, ভূমিদান, কন্যাদায় পিতৃদায় মাতৃদায়-হরণ প্রভৃতির পরিবর্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্বাদ গ্রহণ করে তিনি লোকান্তরে যখন গেলেন তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।

এঁরই পিতার পরম বন্ধু, তাঁরই সঙ্গে এক কলেজে-পড়া, একই হোটেলে চপকাটলেট-খাওয়া রামলোচন বাঁড়ুজ্যের কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে বরদার বিবাহ হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে যোগমায়ার পিতৃকুলের সঙ্গে পতিকুলের ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিল না। এঁর বাপের ঘরের মেয়েরা পড়াশুনো করেন, বাইরে বেরোন, এমন-কি, তাঁদের কেউ কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন। সেই বাড়ির মেয়ের শুচি সংস্করণে যাতে অনুস্বার-বিসর্গের ভুলচুক না থাকে সেই চেষ্টায় লাগলেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান্তরক্ষা-নীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাসপোর্টপ্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল। চোখের উপরে তাঁর ঘোমটা নামল, মনের উপরেও। দেবী সরস্বতী যখন কোনো অবকাশে এঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন তখন পাহারায় তাঁকেও কাপড়ঝাড়া দিয়ে আসতে হত। তাঁর হাতের ইংরেজি বইগুলো বাইরেই হত বাজেয়াপ্ত, প্রাগ্‌বঙ্কিম বাংলাসাহিত্যের পরবর্তী রচনা ধরা পড়লে চৌকাঠ পার হতে পেত না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎকৃষ্ট বাঁধাই বাংলা অনুবাদ যোগমায়ার শেলফে অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করে আছে। অবসর-বিনোদন উপলক্ষে সেটা তিনি আলোচনা করবেন এমন একটা আগ্রহ এ বাড়ির কর্তৃপক্ষের মনে অন্তিমকাল পর্যন্তই ছিল। এই পৌরাণিক লোহার সিন্দুকের মধ্যে নিজেকে সেফ-ডিপজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন—এঁদের সভাপণ্ডিত। যোগমায়ার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। তিনি স্পষ্টই বলতেন, 'মা, এ-সমস্ত ক্রিয়াকর্মের জঞ্জাল তোমার জন্যে নয়। যারা মূঢ় তারা কেবল যে নিজেদেরকে নিজেরাই ঠকায় তা নয়, পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত কিছুই তাদের ঠকাতে থাকে। তুমি কি মনে কর আমরা এ-সমস্ত বিশ্বাস করি। দেখ নি

কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উলটপালট করতে দুঃখ বোধ করি না। তার মানে, মনের মধ্যে আমরা বাঁধন মানি নে, বাইরে আমাদের মূঢ় সাজতে হয় মূঢ়দের খাতিরে। তুমি নিজে যখন ভুলতে চাও না তখন তোমাকে ভোলাবার কাজ আমার দ্বারা হবে না। যখন ইচ্ছা করবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি যা সত্য বলে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাব।'

এক-একদিন তিনি এসে যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রহ্মভাষ্য থেকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যেতেন। যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্বক প্রশ্ন করতেন যে, বেদান্তরত্নমশায় পুলকিত হয়ে উঠতেন; এ'র কাছে আলোচনায় তাঁর উৎসাহের অন্ত থাকত না। বরদাশংকর তাঁর চারি দিকে ছোটোবড়ো যে-সব গুরু ও গুরুতরদের জুটিয়েছিলেন তাদের প্রতি বেদান্তরত্নমহাশয়ের বিপুল অবজ্ঞা ছিল। তিনি যোগমায়াকে বলতেন, 'মা, সমস্ত শহরে একমাত্র এই তোমার ঘরে কথা কয়ে আমি সুখ পাই। তুমি আমাকে আত্মধিক্‌কার থেকে বাঁচিয়েছ।' এমনি করে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলি-বাঁধা দিনগুলো কোনোমতে কেটে গেল। জীবনটা আগাগোড়াই হয়ে উঠল আজকালকার খবরের-কাগজি কিম্ভুত ভাষায় যাকে বলে 'বাধ্যতামূলক'। স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাঁর ছেলে যতিশংকর ও মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীতের সময় থাকেন কলকাতায়, গরমের সময়ে কোনো-একটা পাহাড়ে। যতিশংকর এখন পড়ছে কলেজে; কিন্তু সুরমাকে পড়াবার মতো কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না হওয়াতে বহু সন্ধানে তার শিক্ষার জন্য লাবণ্যলতাকে পেয়েছেন। তারই সঙ্গে আজ সকালে আচমকা অমিতর দেখা।

৪

লাবণ্য-পুরাবৃত্ত

লাবণ্যের বাপ অবনীশ দত্ত এক পশ্চিমি কালেজের অধ্যক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে এমন করে মানুষ করেছেন যে, বহু পরীক্ষা-পাসের ঘষাঘষিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারে নি। এমন-কি এখনো তার পাঠানুরাগ রয়েছে প্রবল।

বাপের একমাত্র শখ ছিল বিদ্যায়, মেয়েটির মধ্যে তাঁর সেই শখটির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, জ্ঞানের চর্চায় যে মনটা নিরেট হয়ে ওঠে সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নীচে থেকে ঠেলে ওঠবার মতো সমস্ত ফাটল মরে যায়, সে মানুষের পক্ষে বিয়ে করবার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মেয়ের মনে স্বামীসেবা-আবাদের যোগ্য যে নরম জমিটুকু বাকি থাকতে পারত সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েছে— খুব মজবুত পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে— বাইরে থেকে আঁচড় লাগলে দাগ পড়ে না। তিনি এতদূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছিলেন যে, লাবণ্যর নাই বা হল বিয়ে, পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠবাঁধা হয়ে থাকল।

তাঁর আর-একটি স্নেহের পাত্র ছিল। তার নাম শোভনলাল। অল্প বয়সে পড়ার প্রতি এত মনোযোগ আর কারও দেখা যায় না। প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্যে তার চেহারাটি দেখবামাত্র মনকে টানে। মানুষটি নেহাত মুখচোরা, তার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গরিবের ছেলে, ছাত্রবৃত্তির সোপানে সোপানে দুর্গম পরীক্ষার শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে শোভন যে নাম করতে পারবে, আর সেই খ্যাতি গড়ে তোলবার প্রধান কারিগরদের

ফর্দে অবনীশের নামটা সকলের উপরে থাকবে, এই গর্ব অধ্যাপকের মনে ছিল। শোভন আসত তাঁর বাড়িতে পড়া নিতে, তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল তার অবাধ সঞ্চরণ। লাবণ্যকে দেখলে সে সংকোচে নত হয়ে যেত। এই সংকোচের অতিদূরত্ববশত শোভনলালের চেয়ে নিজের মাপটাকে বড়ো করে দেখতে লাবণ্যর বাধা ছিল না। দ্বিধা করে নিজেকে যে-পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে না।

এমন সময় একদিন শোভনলালের বাপ ননীগোপাল অবনীশের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে খুব একচোট গাল পেড়ে গেল। নালিশ এই যে, অবনীশ নিজের ঘরে অধ্যাপনার ছুতোয় বিবাহের ছেলে-ধরা ফাঁদ পেতেছেন, বৈদ্যর ছেলে শোভনলালের জাত মেরে সমাজ-সংস্কারের শখ মেটাতে চান। এই অভিযোগের প্রমাণস্বরূপে পেনসিলে-আঁকা লাবণ্যলতার এক ছবি দাখিল করলে। ছবিটা আবিষ্কৃত হয়েছে শোভনলালের টিনের প্যাঁটরার ভিতর থেকে, গোলাপফুলের পাপড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন। ননীগোপালের সন্দেহ ছিল না, এই ছবিটি লাবণ্যেরই প্রণয়ের দান। পাত্র হিসাবে শোভন-লালের বাজার-দর যে কত বেশি, এবং আর কিছুদিন সবুর করে থাকলে সে দাম যে কত বেড়ে যাবে ননীগোপালের হিসাবি বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় মেলানো ছিল। এমন মূল্যবান জিনিসকে অবনীশ বিনামূল্যে দখল করবার ফন্দি করছেন, এটাকে সিঁধ কেটে চুরি ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যেতে পারে। টাকা চুরি থেকে এর লেশমাত্র তফাত কোথায়?

এতদিন লাবণ্য জানতেই পারে নি, কোনো প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর অগোচরে তার মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে। অবনীশের লাইব্রেরির এক কোণে নানাবিধ প্যাম্ফলেট ম্যাগাজিন প্রভৃতি আবর্জনার মধ্যে লাবণ্যর একটি অযত্নম্লান ফোটোগ্রাফ দৈবাৎ শোভনের হাতে পড়েছিল, সেইটে নিয়ে ওর কোনো আর্টিস্ট বন্ধুকে দিয়ে ছবি করিয়ে ফোটোগ্রাফটি আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখেছে। গোলাপফুলগুলিও ওর তরুণ মনের সলজ্জ গোপন ভালোবাসারই মতো সহজে ফুটেছিল একটি বন্ধুর বাগানে, তার মধ্যে কোনো অনধিকার ঔদ্ধত্যের ইতিহাস নেই। অথচ শাস্তি পেতে হল। লাজুক ছেলেটি মাথা হেঁট করে, মুখ লাল করে, গোপনে চোখের জল মুছে এই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেল। দূর থেকে শোভনলাল তার আত্মনিবেদনের একটি শেষ পরিচয় দিলে, সেই বিবরণটা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানত না। বি.এ. পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম স্থান, লাবণ্য পেয়েছিল তৃতীয়। সেটাতে লাবণ্যকে বড়ো বেশি আত্মলাঘব-দুঃখ দিয়েছিল। তার দুটো কারণ ছিল, এক হচ্ছে শোভনের বুদ্ধির 'পরে অবনীশের অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে লাবণ্যকে অনেকদিন আঘাত করেছে। এই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনীশের বিশেষ স্নেহ মিশে থাকাতে পীড়াটা আরো হয়েছিল বেশি। শোভনকে পরীক্ষার ফলে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সে চেষ্টা করেছিল খুব প্রাণপণেই। তবুও শোভন যখন তাকে ছাড়িয়ে গেল তখন এই স্পর্ধার জন্যে তাকে ক্ষমা করাই শক্ত হয়ে উঠল। তার মনে কেমন একটা সন্দেহ লেগে রইল যে, বাবা তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করাতেই উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফলবৈষম্য ঘটল, অথচ পরীক্ষার পড়া সম্বন্ধে শোভনলাল কোনোদিন অবনীশের কাছে এগোয় নি। কিছুদিন পর্যন্ত শোভনলালকে দেখলেই লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। এম.এ. পরীক্ষাতেও শোভনের প্রতিযোগিতায় লাবণ্যের জেতবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবু হল জিত। স্বয়ং অবনীশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শোভনলাল যদি কবি হত তা হলে হয়তো সে খাতা ভরে কবিতা লিখত—তার বদলে আপন পরীক্ষা-পাসের অনেকগুলো মোটা মার্কা সে লাবণ্যের উদ্দেশে উৎসর্গ করে দিলে।

তার পরে এদের ছাত্রদশা গেল কেটে। এমন সময় অবনীশ হঠাৎ প্রচণ্ড পীড়ায় নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, জ্ঞানের চর্চায় মনটা ঠাস-বোঝাই থাকলেও মনসিজ তার মধ্যেই কোথা থেকে বাধা ঠেলে উঠে পড়েন, একটুও স্থানাভাব হয় না। তখন অবনীশ সাতচল্লিশ। সেই নিরতিশয় দুর্বল নিরুপায় বয়সে একটি বিধবা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলে, একেবারে তাঁর লাইব্রেরির গ্রন্থব্যূহ ভেদ করে, তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রাকার ডিঙিয়ে। বিবাহ আর কোনো বাধা ছিল না, একমাত্র বাধা লাবণ্যের

প্রতি অবনীশের স্নেহ। ইচ্ছার সঙ্গে বিষম লড়াই বাধল। পড়াশুনো করতে যান খুবই জোরের সঙ্গে, কিন্তু তার চেয়ে জোর আছে এমন কোনো-একটা চমৎকারা চিন্তা পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে। সমালোচনার জন্যে মডার্ন রিভিয়ু থেকে তাঁর লোভনীয় বই পাঠানো হয় বৌদ্ধধ্বংসাবশেষের পুরাবৃত্ত নিয়ে— অনুদ্‌ঘাটিত বইয়ের সামনে স্থির হয়ে বসে থাকেন এক ভাঙা বৌদ্ধস্তূপেরই মতো, যার উপরে চেপে আছে বহুশত বৎসরের মৌন। সম্পাদক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু জ্ঞানীর স্তূপাকার জ্ঞান যখন একবার টলে তখন তার দশা এইরকমই হয়ে থাকে। হাতি যখন চোরাবালিতে পা দেয় তখন তার বাঁচবার উপায় কী?

এতদিন পরে অবনীশের মনে একটা পরিতাপ ব্যথা দিতে লাগল। তাঁর মনে হল, তিনি হয়তো পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে দেখবার অবকাশ না পাওয়াতে দেখেন নি যে, শোভনলালকে তাঁর মেয়ে ভালোবেসেছে; কারণ, শোভনের মতো ছেলেকে না ভালোবাসতে পারাটাই অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে বাপ-জাতটার 'পরেই রাগ ধরল— নিজের উপরে, ননীগোপালের 'পরে।

এমন সময় শোভনের কাছ থেকে এক চিঠি এল। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্যে গুপ্তরাজবংশের ইতিহাস আশ্রয় করে পরীক্ষায় প্রবন্ধ লিখবে বলে সে তাঁর লাইব্রেরি থেকে গুটিকতক বই ধার চায়। তখনি তিনি তাকে বিশেষ আদর করে চিঠি লিখলেন, বললেন, 'পূর্বের মতোই আমার লাইব্রেরিতে বসেই তুমি কাজ করবে, কিছুমাত্র সংকোচ করবে না।'

শোভনলালের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ধরে নিলে, এমন উৎসাহপূর্ণ চিঠির পিছনে হয়তো লাবণ্যের সম্মতি প্রচ্ছন্ন আছে। সে লাইব্রেরিতে আসতে আরম্ভ করলে। ঘরের মধ্যে যাওয়া-আসার পথে দৈবাৎ কখনো ক্ষণকালের জন্যে লাবণ্যের সঙ্গে দেখা হয়। তখন শোভন গতিটাকে একটু মন্দ করে আনে। ওর একান্ত ইচ্ছে, লাবণ্য তাকে একটা-কোনো কথা বলে; জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ; যে প্রবন্ধ নিয়ে ও ব্যাপৃত সে সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল প্রকাশ করে। যদি করত তবে খাতা খুলে এক সময় লাবণ্যের সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে ও বেঁচে যেত। ওর কতকগুলি নিজের উদ্‌ভাবিত বিশেষ মত সম্বন্ধে লাবণ্যের মত কী জানবার জন্যে ওর অত্যন্ত ঔৎসুক্য। কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনো কথাই হল না, গায়ে পড়ে কিছু বলতে পারে এমন সাহসও ওর নেই।

এমন কয়েক দিন যায়। সেদিন রবিবার। শোভনলাল তার খাতাপত্র টেবিলের উপর সাজিয়ে একখানা বই নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে। তখন দুপুরবেলা, ঘরে কেউ নেই। ছুটির দিনের সুযোগ নিয়ে অবনীশ কোন্‌-এক বাড়িতে যাচ্ছেন তার নাম করলেন না। বলে গেলেন, আজ আর চা খেতে আসবেন না।

হঠাৎ একসময় ভেজানো দরজা জোরে খুলে গেল। শোভনলালের বুকটা ধড়াস করে উঠল কেঁপে। লাবণ্য ঘরে ঢুকল। শোভন শশব্যস্ত হয়ে উঠে কী করবে ভেবে পেল না। লাবণ্য অগ্নি-মূর্তি ধরে বললে, 'আপনি কেন এ বাড়িতে আসেন?'

শোভনলাল চমকে উঠল, মুখে কোনো উত্তর এল না।

'আপনি জানেন, এখানে আসা নিয়ে আপনার বাবা কী বলেছেন? আমার অপমান ঘটাতে আপনার সংকোচ নেই?'

শোভনলাল চোখ নিচু করে বললে, 'আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনি যাচ্ছি।'

এমন উত্তর পর্যন্ত দিলে না যে, লাবণ্যের পিতা তাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে এনেছেন। সে তার খাতাপত্র সমস্ত সংগ্রহ করে নিলে। হাত থর থর করে কাঁপছে; বোবা একটা ব্যথা বুকের পাঁজর-গুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠতে চায়, রাস্তা পায় না। মাথা হেঁট করে বাড়ি থেকে সে চলে গেল।

যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত তাকে ভালোবাসবার অবসর যদি কোনো-একটা বাধায় ঠেকে ফসকে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধ বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উলটো পিঠে। একদিন শোভনলালকে বরদান করবে বলেই বুঝি লাবণ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা করে বসে ছিল। শোভনলাল তেমন করে ডাক দিলে না। তার পরে যা-কিছু

হল সবই গেল তার বিরুদ্ধে। সকলের চেয়ে বেশি আঘাত দিলে এই শেষকালটায়। লাবণ্য মনের ক্ষোভে বাপের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার করলে। তার মনে হল, নিজে নিষ্কৃতি পাবেন ইচ্ছে করেই শোভনলালকে তিনি আবার নিজে থেকে ডেকে এনেছেন ওদের দুজনের মিলন ঘটাবার কামনায়। তাই এমন দারুণ ক্রোধ হল সেই নিরপরাধের উপরে।

তার পর থেকে লাবণ্য ক্রমাগতই জেদ করে করে অবনীশের বিবাহ ঘটালো। অবনীশ তাঁর সঞ্চিত টাকার প্রায় অর্ধাংশ তাঁর মেয়ের জন্যে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহের পরে লাবণ্য বলে বসল, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেবে না, স্বাধীন উপার্জন করে চালাবে। অবনীশ মর্মাহত হয়ে বললেন, 'আমি তো বিয়ে করতে চাই নি লাবণ্য, তুমিই তো জেদ করে বিয়ে দিইয়েছ। তবে কেন আজ আমাকে তুমি এমন করে ত্যাগ করছ।'

লাবণ্য বললে, 'আমাদের সম্বন্ধ কোনোকালে যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্যেই আমি এই সংকল্প করেছি। তুমি কিছু ভেবো না বাবা। যে পথে আমি যথার্থ সুখী হব সেই পথে তোমার আশীর্বাদ চিরদিন রেখো।'

কাজ তার জুটে গেল। সুরমাকে পড়াবার সম্পূর্ণ ভার তার উপরে। যতিকেও অনায়াসে পড়াতে পারত, কিন্তু মেয়ে-শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়বার অপমান স্বীকার করতে যতি কিছুতেই রাজি হল না।

প্রতিদিনের বাঁধা কাজে জীবন একরকম চলে যাচ্ছিল। উদ্‌বৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে, প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে হালের বার্নার্ড শ'র আমল পর্যন্ত, এবং বিশেষভাবে গ্রীক ও রোমান যুগের ইতিহাসে, গ্রোট, গিবন ও গিলবার্ট মারের রচনায়। কোনো কোনো অবকাশে একটা চঞ্চল হাওয়া এসে মনের ভিতরটা যে একটু এলোমেলো করে যেত না তা বলতে পারি নে, কিন্তু হাওয়ার চেয়ে স্থূল ব্যাঘাত হঠাৎ ঢুকে পড়তে পারে ওর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন প্রশস্ত ফাঁক ছিল না। এমন সময় ব্যাঘাত এসে পড়ল মোটরগাড়িতে চড়ে, পথের মাঝখানে, কোনো আওয়াজমাত্র না করে। হঠাৎ গ্রীস-রোমের বিরাট ইতিহাসটা হালকা হয়ে গেল; আর সমস্ত-কিছুকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্তমান ওকে নাড়া দিয়ে বললে 'জাগো'। লাবণ্য এক মুহূর্তে জেগে উঠে এতদিন পরে আপনাকে বাস্তবরূপে দেখতে পেলে— জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে।

৫

আলাপের আরম্ভ

অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে এবার ফিরে আসা যাক বর্তমানের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

লাবণ্য পড়ার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেল। সে ঘরে অমিত বসল যেন পদ্মের মাঝখানটাতে ভ্রমরের মতো। চারি দিকে চায়, সকল জিনিস থেকেই কিসের ছোঁয়া লাগে, ওর মনটাকে দেয় উদাস করে। শেলফে, পড়বার টেবিলে ইংরেজি সাহিত্যের বই দেখলে; সে বইগুলো যেন বেঁচে উঠেছে। সব লাবণ্যের পড়া বই, তার আঙুলে পাতা-ওলটানো, তার দিনরাত্রির ভাবনা-লাগা, তার উৎসুক দৃষ্টির পথ-চলা, তার অন্যমনস্ক দিনে কোলের উপর পড়ে-থাকা বই। চমকে উঠল যখন টেবিলে দেখতে পেলে ইংরেজ কবি ডন-এর কাব্যসংগ্রহ। অক্সফোর্ডে থাকতে ডন এবং তাঁর সময়কার কবিদের গীতিকাব্য ছিল অমিতর প্রধান আলোচ্য, এইখানে এই কাব্যের উপর দৈবাৎ দুজনের মন এক জায়গায় এসে পরস্পরকে স্পর্শ করল।

এতদিনকার নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, যেন

মাস্টারের হাতে ইস্কুলের প্রতি-বছরে-পড়ানো একটা ঢিলে মলাটের টেক্‌স্‌ট্‌বুক। আগামী দিনটার জন্য কোনো কৌতূহল ছিল না, আর বর্তমান দিনটাকে পুরো মন দিয়ে অভ্যর্থনা করা ওর পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। এখন সে এইমাত্র এসে পৌঁছল একটা নতুন গ্রহে; এখানে বস্তুর ভার কম; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে; প্রতি মুহূর্ত ব্যগ্র হয়ে অভাবনীয়ের দিকে এগোতে থাকে; গায়ে হাওয়া লাগে আর সমস্ত শরীরটা যেন বাঁশি হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে; আকাশের আলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে আর ওর অন্তরে অন্তরে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয় সেটা গাছের সর্বাঙ্গ-প্রবাহিত রসের মধ্যে ফুল ফোটাবার উত্তেজনার মতো। মনের উপর থেকে কতদিনের ধুলো-পড়া পর্দা উঠে গেল, সামান্য জিনিসের থেকে ফুটে উঠছে অসামান্যতা। তাই যোগমায়া যখন ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন, সেই অতি সহজ ব্যাপারেও আজ অমিতকে বিস্ময় লাগল। সে মনে মনে বললে, 'আহা, এ তো আগমন নয়, এ যে আবির্ভাব!'

চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করে নি, কেবল তাঁকে গম্ভীর শুভ্রতা দিয়েছে। গৌরবর্ণ মুখ টস টস করছে। বৈধব্যরীতিতে চুল ছাঁটা; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ; হাসিটি স্নিগ্ধ। মোটা থান চাদরে মাথা বেষ্টন ক'রে সমস্ত দেহ সংবৃত। পায়ে জুতো নেই, দুটি পা নির্মল সুন্দর। অমিত তাঁর পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করলে ওর শিরে শিরে যেন দেবীর প্রসাদের ধারা বয়ে গেল।

প্রথম পরিচয়ের পর যোগমায়া বললেন, 'তোমার কাকা অমরেশ ছিলেন আমাদের জেলার সব-চেয়ে বড়ো উকিল। একবার এক সর্বনেশে মকদ্দমায় আমরা ফতুর হতে বসেছিলুম, তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমাকে ডাকতেন বউদিদি বলে।'

অমিত বললে, 'আমি তাঁর অযোগ্য ভাইপো। কাকা লোকসান বাঁচিয়েছেন, আমি লোকসান ঘটিয়েছি। আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা।'

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মা আছেন?'

অমিত বললে, 'ছিলেন। মাসি থাকাও খুব উচিত ছিল।'

'মাসির জন্যে খেদ কেন বাবা।'

'ভেবে দেখুন-না, আজ যদি ভাঙতুম মায়ের গাড়ি, বকুনির অন্ত থাকত না; বলতেন এটা বাঁদরামি। গাড়িটা যদি মাসির হয় তিনি আমার অপটুতা দেখে হাসেন, মনে মনে বলেন ছেলে-মানুষি।'

যোগমায়া হেসে বললেন, 'তা হলে নাহয় গাড়িখানা মাসিরই হল।'

অমিত লাফিয়ে উঠে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'এইজন্যেই তো পূর্বজন্মের কর্মফল মানতে হয়। মায়ের কোলে জন্মেছি, মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করি নি—গাড়ি-ভাঙাটাকে সৎকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন—এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন।'

যোগমায়া হেসে বললেন, 'কর্মফল কার বাবা! তোমার না আমার, না যারা মোটর-মেরামতের ব্যাবসা করে তাদের?'

ঘন চুলের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে আঙুল চালিয়ে অমিত বললে, 'শক্ত প্রশ্ন। কর্ম একার নয়, সমস্ত বিশ্বের; নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তারই সম্মিলিত ধারা যুগে যুগে চলে এসে শুক্রবার ঠিক বেলা নটা বেজে আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাগালে এক ধাক্কা। তার পরে?'

যোগমায়া লাবণ্যের দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাসলেন। অমিতর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হতে-না-হতেই তিনি ঠিক করে বসে আছেন এদের দুজনের বিয়ে হওয়া চাই। সেইটের প্রতি লক্ষ করেই বললেন, 'বাবা, তোমরা দুজনে ততক্ষণ আলাপ করো, আমি এখানে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে আসি গে।'

দ্রুততালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতর। সে একেবারে শুরু করে দিলে, 'মাসিমা আমাদের

আলাপ করবার আদেশ করেছেন। আলাপের আদিতে হল নাম। প্রথমেই সেটা পাকা করে নেওয়া উচিত। আপনি আমার নাম জানেন তো? ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে প্রপার নেম।'

লাবণ্য বললে, 'আমি তো জানি আপনার নাম অমিতবাবু।'

'ওটা সব ক্ষেত্রে চলে না।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'ক্ষেত্র অনেক থাকতে পারে, কিন্তু অধিকারীর নাম তো একই হওয়া চাই।'

'আপনি যে কথাটা বলছেন ওটা একালের নয়। দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই, ওটা অবৈজ্ঞানিক। Relativity of names প্রচার করে আমি নামজাদা হব স্থির করেছি। তার গোড়াতেই জানাতে চাই আপনার মুখে আমার নাম অমিতবাবু নয়।'

'আপনি সাহেবি কায়দা ভালোবাসেন? মিস্টার রয়?'

'একেবারে সমুদ্রের ওপারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্দরে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে।'

'দ্রুতগামী নামটা কী শুনি।'

'বেগ দ্রুত করতে গেলে বস্তু কমাতে হবে। অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।'

লাবণ্য বললে, 'সহজ নয়, সময় লাগবে।'

'সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি ব'লে কোনো পদার্থ ত্রিভুবনে নেই; ট্যাঁক-ঘড়ি আছে, ট্যাঁক অনুসারে তার চাল। আইনস্টাইনের এই মত।'

লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনার কিন্তু স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।'

'ঠাণ্ডা জল শিরোধার্য করে নেব, যদি আলাপটাকে আরো একটু সময় দেন।'

'সময় আর নেই, কাজ আছে' বলেই লাবণ্য চলে গেল।

অমিত তখনি স্নান করতে গেল না। স্মিতহাস্যমিশ্রিত প্রত্যেক কথাটি লাবণ্যর ঠোঁটদুটির উপর কিরকম একটি চেহারা ধরে উঠেছিল, বসে বসে সেইটি ও মনে করতে লাগল। অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমারাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয় সেইসঙ্গে আছে মননের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এত করে আকর্ষণ করেছে। অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে, ক্ষমা নেই; বিচার আছে, ধৈর্য নেই; ও অনেক জেনেছে শিখেছে, কিন্তু শান্তি পায় নি—লাবণ্যর মুখে ও এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যে শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।

৬

নূতন পরিচয়

অমিত মিশুক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে তার বেশিক্ষণ চলে না। সর্বদাই নিজে বকা-ঝকা করা অভ্যাস। গাছপালা-পাহাড়পর্বতের সঙ্গে হাসিতামাশা চলে না, তাদের সঙ্গে কোনোরকম উলটো ব্যবহার করতে গেলেই ঘা খেয়ে মরতে হয়; তারাও চলে নিয়মে, অন্যের ব্যবহারেও তারা নিয়ম প্রত্যাশা করে; এক কথায়, তারা অরসিক, সেইজন্যে শহরের বাইরে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ কী হল, শিলঙ পাহাড়টার চার দিক থেকে অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্ছে। আজ সে উঠেছে সূর্য ওঠবার আগেই; এটা ওর স্বধর্মবিরুদ্ধ। জানলা দিয়ে দেখলে, দেবদারু গাছের ঝালরগুলো কাঁপছে, আর তার পিছনে পাতলা মেঘের উপর পাহাড়ের ওপার থেকে

সূর্য আপন তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েছে— আগুনে-জ্বলা যে-সব রঙের আভা ফুটে উঠছে তার সম্বন্ধে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা খেয়ে অমিত বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা তখন নির্জন। একটা শ্যাওলা-ধরা অতি প্রাচীন পাইন গাছের তলায় স্তরে স্তরে ঝরা-পাতার সুগন্ধঘন আস্তরণের উপর পা ছড়িয়ে বসল। সিগারেট জ্বালিয়ে দুই আঙুলে অনেকক্ষণ চেপে রেখে দিলে, টান দিতে গেল ভুলে।

যোগমায়ার বাড়ির পথে এই বন। ভোজে বসবার পূর্বে রান্নাঘরটা থেকে যেমন আগাম গন্ধ পাওয়া যায়, এই জায়গা থেকে যোগমায়ার বাড়ির সৌরভটা অমিত সেইরকম ভোগ করে। সময়টা ঘড়ির ভদ্র দাগটাতে এসে পৌঁছলেই সেখানে গিয়ে এক পেয়ালা চা দাবি করবে। প্রথমে সেখানে ওর যাবার সময় নির্দিষ্ট ছিল সন্ধেবেলায়। অমিত সাহিত্যরসিক, এই খ্যাতিটার সুযোগে আলাপ-আলোচনার জন্যে ও পেয়েছিল বাঁধা নিমন্ত্রণ। প্রথম দুই-চারি দিন যোগমায়া এই আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার কাছে ধরা পড়ল যে, তাতে করেই এ পক্ষের উৎসাহটাকে কিছু যেন কুণ্ঠিত করলে। বোঝা শক্ত নয় যে, তার কারণ দ্বিবচনের জায়গায় বহুবচন প্রয়োগ। তার পর থেকে যোগমায়ার অনুপস্থিত থাকবার উপলক্ষ ঘন ঘন ঘটত। একটু বিশ্লেষণ করতেই বোঝা গেল, সেগুলি অনিবার্য নয়, দৈবকৃত নয়, তাঁর ইচ্ছাকৃত। প্রমাণ হল, কর্তামা এই দুটি আলোচনাপরায়ণের যে অনুরাগ লক্ষ করেছেন সেটা সাহিত্যানুরাগের চেয়ে বিশেষ একটু গাঢ়তর। অমিত বুঝে নিলে যে, মাসির বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ম, অথচ মনটি আছে কোমল। এতে করেই আলোচনার উৎসাহ তার আরো প্রবল হল। নির্দিষ্ট কালটাকে প্রশস্ততর করবার অভিপ্রায়ে যতিশংকরের সঙ্গে আপসে ব্যবস্থা করলে, তাতে সকালে এক ঘণ্টা এবং বিকেলে দু ঘণ্টা ইংরেজি সাহিত্য পড়ায় সাহায্য করবে। শুরু করলে সাহায্য— এত বাহুল্যপরিমাণ যে, প্রায়ই সকাল গড়াত দুপুরে, সাহায্য গড়াত বাজে কথায়, অবশেষে যোগমায়ার এবং ভদ্রতার অনুরোধে মধ্যাহ্নভোজনটা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ত। এমনি করে দেখা গেল অবশ্যকর্তব্যতার পরিধি প্রহরে প্রহরে বেড়েই চলে।

যতিশংকরের অধ্যাপনায় ওর যোগ দেবার কথা সকাল আটটায়। ওর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা ছিল অসময়। ও বলত, যে জীবের গর্ভবাসের মেয়াদ দশ মাস তার ঘুমের মেয়াদ পশুপক্ষীদের মাপে সংগত হয় না। এতদিন অমিতর রাত্রিবেলাটা তার সকালবেলাকার অনেকগুলো ঘণ্টাকে পিলপেগাড়ি করে নিয়েছিল। ও বলত, এই চোরাই সময়টা অবৈধ বলেই ঘুমের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল।

কিন্তু আজকাল ওর ঘুমটা আর অবিমিশ্র নয়। সকাল সকাল জাগবার একটা আগ্রহ তার অন্তর্নিহিত। প্রয়োজনের আগেই ঘুম ভাঙে— তার পরে পাশ ফিরে শুতে সাহস হয় না, পাছে বেলা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়েছে; কিন্তু সময় চুরির অপরাধ ধরা পড়বার ভয়ে সেটা বার বার করা সম্ভব হত না। আজ একবার ঘড়ির দিকে চাইলে, দেখলে, বেলা এখনো সাতটার এ পারেই। মনে হল, ঘড়ি নিশ্চয় বন্ধ। কানের কাছে নিয়ে শুনলে টিকটিক শব্দ।

এমন সময় চমকে উঠে দেখে, ডান হাতে ছাতা দোলাতে দোলাতে উপরের রাস্তা দিয়ে আসছে লাবণ্য। সাদা শাড়ি, পিঠে কালো রঙের তিনকোণা শাল, তাতে কালো ঝালর। অমিতর বুঝতে বাকি নেই যে, লাবণ্যর অর্ধেক দৃষ্টিতে সে গোচর হয়েছে, কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাবণ্য নারাজ। বাঁকের মুখ পর্যন্ত লাবণ্য যেই গেছে, অমিত আর থাকতে পারলে না, দৌড়োতে দৌড়োতে তার পাশে উপস্থিত।

বললে, 'জানতেন এড়াতে পারবেন না, তবু দৌড় করিয়ে নিলেন। জানেন না কি, দূরে চলে গেলে কতটা অসুবিধা হয়।'

'কিসের অসুবিধা?'

অমিত বললে, 'যে হতভাগা পিছনে পড়ে থাকে তার প্রাণটা ঊর্ধ্বস্বরে ডাকতে চায়। কিন্তু

ডাকি কী বলে। দেবদেবীদের নিয়ে সুবিধে এই যে, নাম ধরে ডাকলেই তাঁরা খুশি। দুর্গা দুর্গা বলে গর্জন করতে থাকলেও ভগবতী দশভুজা অসন্তুষ্ট হন না। আপনাদের নিয়ে যে মুশকিল।'

'না ডাকলেই চুকে যায়।'

'বিনা সম্বোধনেই চালাই যখন কাছে থাকেন। তাই তো বলি, দূরে যাবেন না। ডাকতে চাই অথচ ডাকতে পারি নে, এর চেয়ে দুঃখ আর নেই।'

'কেন, বিলিতি কায়দা তো আপনার অভ্যাস আছে।'

'মিস ডাট? সেটা চায়ের টেবিলে। দেখুন-না, আজ এই আকাশের সঙ্গে পৃথিবী যখন সকালের আলোয় মিলল, সেই মিলনের লগ্নটি সার্থক করবার জন্যে উভয়ে মিলে একটি রূপ সৃষ্টি করলে, তারই মধ্যে রয়ে গেল স্বর্গমর্ত্যের ডাকনাম। মনে হচ্ছে না কি, একটা নাম-ধরে ডাকা উপর থেকে নীচে আসছে, নীচে থেকে উপরে উঠে চলেছে। মানুষের জীবনেও কি ঐ রকমের নাম সৃষ্টি করবার সময় উপস্থিত হয় না। কল্পনা করুন-না, যেন এখনি প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি, নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হল, আকাশের ঐ রঙিন মেঘের কাছ পর্যন্ত পৌঁছল, সামনের ঐ পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘ মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। মনে ভাবতেও কি পারেন সেই ডাকটা মিস ডাট।'

লাবণ্য কথাটাকে এড়িয়ে বললে, 'নামকরণে সময় লাগে, আপাতত বেড়িয়ে আসি গে।'

অমিত তার সঙ্গ নিয়ে বললে, 'চলতে শিখতেই মানুষের দেরি হয়, আমার হল উলটো। এতদিন পরে এখানে এসে তবে বসতে শিখেছি। ইংরেজিতে বলে, গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না—সেই ভেবেই অন্ধকার থাকতে কখন থেকে পথের ধারে বসে আছি। তাই তো ভোরের আলো দেখলুম।'

লাবণ্য কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঐ সবুজ ডানাওয়ালা পাখিটার নাম জানেন?'

অমিত বললে, 'জীবজগতে পাখি আছে সেটা এতদিন সাধারণভাবেই জানতুম, বিশেষভাবে জানবার সময় পাই নি। এখানে এসে, আশ্চর্য এই যে, স্পষ্ট জানতে পেরেছি, পাখি আছে, এমন-কি, তারা গানও গায়।'

লাবণ্য হেসে উঠে বললে, 'আশ্চর্য!'

অমিত বললে, 'হাসছেন! আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য রাখতে পারি নে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ঐ গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দশীর সর্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।'

লাবণ্য বললে, 'আমাকে দোষ দেবেন না। বোধ হয় পাখিও যদি আপনার কথা শুনত, হেসে উঠত।'

অমিত বললে, 'দেখুন, আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না বলেই হাসে, বুঝতে পারলে চুপ করে বসে ভাবত। আজ পাখিকে নতুন করে জানছি এ কথায় লোকে হাসছে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস্তই নতুন করে জানছি, নিজেকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না। ঐ দেখুন-না, কথাটা একই, অথচ এইবার আপনি একেবারেই চুপ।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'আপনি তো বেশিদিনের মানুষ না, খুবই নতুন, আরো নতুনের ঝোঁক আপনার মধ্যে আসে কোথা থেকে।'

'এর জবাবে খুব একটা গম্ভীর কথাই বলতে হল যা চায়ের টেবিলে বলা চলে না। আমার মধ্যে নতুন যেটা এসেছে সেটাই অনাদিকালের পুরোনো, ভোরবেলাকার আলোর মতোই সে পুরোনো, নতুন-ফোটা ভুঁইচাঁপা ফুলেরই মতো, চিরকালের জিনিস নতুন করে আবিষ্কার।'

কিছু না বলে লাবণ্য হাসলে।

অমিত বললে, 'আপনার এবারকার এই হাসিটি পাহারাওয়ালার চোর-ধরা গোল লণ্ঠনের হাসি।

বুঝেছি, আপনি যে কবির ভক্ত তার বই থেকে আমার মুখের এ কথাটা আগেই পড়ে নিয়েছেন। দোহাই আপনার, আমাকে দাগি চোর ঠাওরাবেন না। এক-এক সময়ে এমন অবস্থা আসে, মনের ভিতরটা শংকরাচার্য হয়ে ওঠে; বলতে থাকে, আমিই লিখেছি কি আর-কেউ লিখেছে এই ভেদ-জ্ঞানটা মায়া। এই দেখুন-না, আজ সকালে বসে হঠাৎ খেয়াল গেল, আমার জানা সাহিত্যের ভিতর থেকে এমন একটা লাইন বের করি যেটা মনে হবে এইমাত্র স্বয়ং আমি লিখলুম, আর কোনো কবির লেখবার সাধ্যই ছিল না।'

লাবণ্য থাকতে পারলে না, প্রশ্ন করলে, 'বের করতে পেরেছেন?'

'হাঁ, পেরেছি।'

লাবণ্যর কৌতূহল আর বাধা মানল না, জিজ্ঞাসা করে ফেললে, 'লাইনটা কী বলুন-না।'

অমিত খুব আস্তে আস্তে কানে কানে বলার মতো করে বললে—

'For God's sake, hold your tongue
and let me love!'

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে অমিত জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি নিশ্চয় জানেন লাইনটা কার।'

লাবণ্য একটু মাথা বেঁকিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিলে, হাঁ।

অমিত বললে, 'সেদিন আপনার টেবিলে ইংরেজ কবি ডনের বই আবিষ্কার করলুম, নইলে এ লাইন আমার মাথায় আসত না।'

'আবিষ্কার করলেন?'

'আবিষ্কার নয় তো কী। বইয়ের দোকানে বই চোখে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়। পাব্লিক লাইব্রেরির টেবিল দেখেছি, সেটা তো বইগুলিকে বহন করে; আপনার টেবিল দেখলুম, সে যে বইগুলিকে বাসা দিয়েছে। সেদিন ডনের কবিতাকে প্রাণ দিয়ে দেখতে পেয়েছি। মনে হল, অন্য কবির দরজায় ঠেলাঠেলি ভিড়, বড়োলোকের শ্রাদ্ধে কাঙালি-বিদায়ের মতো। ডনের কাব্যমহল নির্জন, ওখানে দুটি মানুষ পাশাপাশি বসবার জায়গাটুকু আছে। তাই অমন স্পষ্ট করে শুনতে পেলুম আমার সকালবেলাকার মনের কথাটি—

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর্।
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।'

লাবণ্য বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি বাংলা কবিতা লেখেন নাকি।'

'ভয় হচ্ছে, আজ থেকে লিখতে শুরু করব-বা। নতুন অমিত রায় কী-কাণ্ড করে বসবে, পুরোনো অমিত রায়ের তা কিছু জানা নেই। হয়তো-বা সে এখনি লড়াই করতে বেরোবে।'

'লড়াই? কার সঙ্গে?'

'সেইটে ঠিক করতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে খুব মস্ত কিছু একটার জন্যে এক্খুনি চোখ বুজে প্রাণ দিয়ে ফেলা উচিত, তার পরে অনুতাপ করতে হয় রয়ে বসে করা যাবে।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'প্রাণ যদি দিতেই হয় তো সাবধানে দেবেন।'

'সে কথা আমাকে বলা অনাবশ্যক। কম্যুন্যাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ। মুসলমান বাঁচিয়ে, ইংরেজ বাঁচিয়ে চলব। যদি দেখি বুড়োসুড়ো গোছের মানুষ, অহিংস্র মেজাজের ধার্মিক চেহারা, শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বলব 'যুদ্ধং দেহি'—ঐ যে-লোক অজীর্ণ রোগ সারবার জন্যে হাসপাতালে না গিয়ে এমন পাহাড়ে আসে, খিদে বাড়াবার জন্যে নির্লজ্জ হয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'লোকটা তবু যদি অমান্য করে চলে যায়?'

'তখন আমি পিছন থেকে দু হাত আকাশে তুলে বলব, এবারকার মতো ক্ষমা করলুম, তুমি

আমার ভ্রাতা, আমরা এক ভারতমাতার সন্তান।—বুঝতে পারছেন, মন যখন খুব বড়ো হয়ে ওঠে তখন মানুষ যুদ্ধও করে, ক্ষমাও করে।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'আপনি যখন যুদ্ধের প্রস্তাব করেছিলেন মনে ভয় হয়েছিল, কিন্তু ক্ষমার কথা যেরকম বোঝালেন তাতে আশ্বস্ত হলুম যে ভাবনা নেই।'

অমিত বললে, 'আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?'

'কী, বলুন।'

'আজ খিদে বাড়াবার জন্যে আর বেশি বেড়াবেন না।'

'আচ্ছা বেশ, তার পরে?'

'ঐ নীচে গাছতলায় যেখানে নানা রঙের ছ্যাতলা পড়া পাথরটার নীচে দিয়ে একটুখানি জল ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে ঐখানে বসবেন আসুন।'

লাবণ্য হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, 'কিন্তু সময় যে অল্প।'

'জীবনে সেইটেই তো শোচনীয় সমস্যা, লাবণ্যদেবী, সময় অল্প। মরুপথে সঙ্গে আছে আধ-মশক মাত্র জল। যাতে সেটা উছলে উছলে শুকনো ধুলোয় মারা না যায় সেটা নিতান্তই করা চাই। সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাঙ্কচুয়াল হওয়া শোভা পায়। দেবতার হাতে সময় অসীম তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য ওঠে, ঠিক সময়ে অস্ত যায়। আমাদের মেয়াদ অল্প, পাঙ্কচুয়াল হতে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিতব্যয়িতা। অমরাবতীর কেউ যদি প্রশ্ন করে "ভবে এসে করলে কী" তখন কোন্ লজ্জায় বলব, "ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ করতে করতে জীবনের যা-কিছু সকল সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তোলবার সময় পাই নি।" তাই তো বলতে বাধ্য হলুম, চলুন ঐ জায়গাটাতে।'

ওর যেটাতে আপত্তি নেই সেটাতে আর কারও যে আপত্তি থাকতে পারে অমিত সেই আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে কথাবার্তা কয়। সেইজন্যে তার প্রস্তাবে আপত্তি করা শক্ত। লাবণ্য বললে, 'চলুন।'

ঘনবনের ছায়া। সরু পথ নেমেছে নীচে একটা খাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্ধপথে আর-এক পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝরনার ধারা এক জায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার করে তার উপর দিয়ে নিজের অধিকারচিহ্নস্বরূপ নুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্র পথ চালিয়ে গেছে। সেইখানে পাথরের উপরে দুইজনে বসল। ঠিক সেই জায়গায় খাদটা গভীর হয়ে খানিকটা জল জমে আছে, যেন সবুজ পর্দার ছায়ায় একটি পর্দানশীন মেয়ে, বাইরে পা বাড়াতে তার ভয়। এখানকার নির্জনতার আবরণটাই লাবণ্যকে নিরাবরণের মতো লজ্জা দিতে লাগল। সামান্য যা-তা একটা-কিছু বলে এইটেকে ঢাকা দিতে ইচ্ছে করছে, কিছুতেই কোনো কথা মনে আসছে না, স্বপ্নে যেরকম কণ্ঠরোধ হয় সেই দশা।

অমিত বুঝতে পারলে, একটা-কিছু বলাই চাই। বললে, 'দেখুন আর্যা, আমাদের দেশের দুটো ভাষা—একটা সাধু, আর-একটা চলতি। কিন্তু এ ছাড়া আরো একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল—সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা এইরকম জায়গার জন্য। পাখির গানের মতো, কবির কাব্যের মতো সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরোয়। সেজন্যে মানুষকে বইয়ের দোকানে ছুটতে হয় সেটা বড়ো লজ্জা। প্রত্যেক বার হাসির জন্যে যদি ডেন্টিস্টের দোকানে দৌড়াদৌড়ি করতে হত তা হলে কী হত ভেবে দেখুন। সত্যি বলুন লাবণ্যদেবী, এখনি আপনার সুর করে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?'

লাবণ্য মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল।

অমিত বললে, 'চায়ের টেবিলের ভাষায় কোন্‌টা ভদ্র, কোন্‌টা অভদ্র, তার হিসেব মিটতে চায় না। কিন্তু এ জায়গায় ভদ্রও নেই অভদ্রও নেই। তা হলে কী উপায় বলুন। মনটাকে সহজ করবার জন্যে একটা কবিতা না আওড়ালে তো চলছে না। গদ্যে অনেক সময় নেয়, অত সময় তো হাতে নেই। যদি অনুমতি করেন তো আরম্ভ করি।'

দিতে হল অনুমতি, নইলে লজ্জা করতে গেলেই লজ্জা।

অমিত ভূমিকায় বললে, 'রবি ঠাকুরের কবিতা বোধ হয় আপনার ভালো লাগে?'

'হাঁ, লাগে।'

'আমার লাগে না। অতএব আমাকে মাপ করবেন। আমার একজন বিশেষ কবি আছে; তার লেখা এত ভালো যে, খুব অল্প লোকেই পড়ে। এমন-কি, তাকে কেউ গাল দেবার উপযুক্ত সম্মানও দেয় না। ইচ্ছে করছি আমি তার থেকে আবৃত্তি করি।'

'আপনি এত ভয় করছেন কেন।'

'এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শোকাবহ। কবিবরকে নিন্দে করলে আপনারা জাতে ঠেলেন, তাকে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে বাদ দিয়ে চললে তাতে করেও কঠোর ভাষার সৃষ্টি হয়। যা আমার ভালো লাগে তাই আর-একজনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত।'

'আমার কাছ থেকে রক্তপাতের ভয় করবেন না। আপন রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করি নে।'

'এটা বেশ বলেছেন, তা হলে নির্ভয়ে শুরু করা যাক।—

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে,
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?

বিষয়টা দেখছেন? না-চেনার বন্ধন। সবচেয়ে কড়া বন্ধন। না-চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তিতত্ত্ব।

কোন্ অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রা-জাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু-'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে।

নিজেকেই ভুলে থাকার মতো কোনো এমন ঝাপসা কোণ আর নেই। সংসারে কত যে দেখবার ধন দেখা হল না, তারা আত্মবিস্মৃতির কোণে মিলিয়ে আছে। তাই বলে তো হাল ছেড়ে দিলে চলে না।

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না—
কানে কানে মৃদুকণ্ঠে নয়।
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী—
দৃপ্ত বলে লব টানি
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধা দ্বন্দ্ব হতে
নির্দয় আলোতে।

একেবারে নাছোড়বান্দা। কতবড়ো জোর। দেখেছেন রচনার পৌরুষ?

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে,
ছিন্ন হবে ডোর—
তোরে মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর।

ঠিক এই তানটি আপনার নামজাদা লেখকের মধ্যে পাবেন না, সূর্যমণ্ডলে এ যেন আগুনের ঝড়। এ শুধু লিরিক নয়, এ নিষ্ঠুর জীবনতত্ত্ব।'—লাবণ্যর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—

'হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না,
তীব্র আকস্মিক
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি দিক,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।'

আবৃত্তি শেষ হতে-না-হতেই অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরলে। লাবণ্য হাত ছাড়িয়ে নিলে না। অমিতর মুখের দিকে চাইলে, কিছু বললে না।

এর পরে কোনো কথা বলবার কোনো দরকার হল না। লাবণ্য ঘড়ির দিকে চাইতেও ভুলে গেল।

৭

ঘটকালি

অমিত যোগমায়ার কাছে এসে বললে, 'মাসিমা, ঘটকালি করতে এলেম। বিদায়ের বেলা কৃপণতা করবেন না।'

'পছন্দ হলে তবে তো। আগে নাম-ধাম-বিবরণটা বলো।'

অমিত বললে, 'নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়।'

'তা হলে ঘটক-বিদায়ের হিসাব থেকে কিছু বাদ পড়বে দেখছি।'

'অন্যায় কথা বললেন। নাম যার বড়ো তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মান-রক্ষাতেই তার যত সময় যায়। মানুষটার অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রীর ভাগে, পুরো বিবাহের পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট নয়। নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্পবিবাহ, বহুবিবাহের মতোই গর্হিত।'

'আচ্ছা, নামটা নাহয় খাটো হল, রূপটা?'

'বলতে ইচ্ছে করি নে, পাছে অত্যুক্তি করে বসি।'

'অত্যুক্তির জোরেই বুঝি বাজারে চালাতে হবে?'

'পাত্র-বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিস লক্ষ করা চাই—নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে।'

'আচ্ছা নামরূপ থাক্‌, বাকিটা?'

'বাকি যেটা রইল সব-জড়িয়ে সেটাকে বলে পদার্থ। তা লোকটা অপদার্থ নয়।'

'বুদ্ধি?'

'লোকে যাতে ওকে বুদ্ধিমান ব'লে হঠাৎ ভ্রম করে সেটুকু বুদ্ধি ওর আছে।'

'বিদ্যে?'

'স্বয়ং নিউটনের মতো। ও জানে যে, জ্ঞানসমুদ্রের কূলে সে নুড়ি কুড়িয়েছে মাত্র। তাঁর মতো সাহস করে বলতে পারে না, পাছে লোকে ফস করে বিশ্বাস করে বসে।'

'পাত্রের যোগ্যতার ফর্দটা তো দেখছি কিছু খাটো গোছের।'

'অন্নপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করতে হবে বলেই শিব নিজেকে ভিখারি কবুল করেন, একটুও লজ্জা নেই।'

'তা হলে পরিচয়টা আরো একটু স্পষ্ট করো।'

'জানা ঘর। পাত্রটির নাম অমিতকুমার রায়। হাসছেন কেন মাসিমা। ভাবছেন কথাটা ঠাট্টা?'

'সে ভয় মনে আছে বাবা, পাছে শেষ পর্যন্ত ঠাট্টাই হয়ে ওঠে।'

'এ সন্দেহটা পাত্রের 'পরে দোষারোপ।'

'বাবা, সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম ক্ষমতা নয়।'

'মাসি, দেবতাদের সেই ক্ষমতা আছে, তাই দেবতারা বিবাহের অযোগ্য, দময়ন্তী সে কথা বুঝেছিলেন।'

'আমার লাবণ্যকে সত্যি কি তোমার পছন্দ হয়েছে।'

'কিরকম পরীক্ষা চান, বলুন।'

'একমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে, লাবণ্য যে তোমার হাতেই আছে এইটি তোমার নিশ্চিত জানা।'

'কথাটাকে আর-একটু ব্যাখ্যা করুন।'

'যে রত্নকে সস্তায় পাওয়া গেল তারও আসল মূল্য যে বোঝে সেই জানব জহুরি।'

'মাসিমা, কথাটাকে বড়ো বেশি সূক্ষ্ম করে তুলছেন। মনে হচ্ছে যেন একটা ছোটো গল্পের সাইকোলজিতে শান লাগিয়েছেন। কিন্তু কথাটা আসলে যথেষ্ট মোটা— জাগতিক নিয়মে এক ভদ্রলোক এক ভদ্ররমণীকে বিয়ে করবার জন্যে খেপেছে। দোষে গুণে ছেলেটি চলনসই, মেয়েটির কথা বলা বাহুল্য। এমন অবস্থায় সাধারণ মাসিমার দল স্বভাবের নিয়মেই খুশি হয়ে তখনি ঢেঁকিতে আনন্দনাড়ু কুটতে শুরু করেন।'

'ভয় নেই বাবা, ঢেঁকিতে পা পড়েছে। ধরেই নাও, লাবণ্যকে তুমি পেয়েইছ। তার পরেও, হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছে প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝব লাবণ্যর মতো মেয়েকে বিয়ে করবার তুমি যোগ্য।'

'আমি যে এ-হেন আধুনিক, আমাকে সুদ্ধ তাক লাগিয়ে দিলেন।'

'আধুনিকের লক্ষণটা কী দেখলে।'.

'দেখছি, বিংশ শতাব্দীর মাসিমারা বিয়ে দিতেও ভয় পান।'

'তার কারণ, আগেকার শতাব্দীর মাসিমারা যাদের বিয়ে দিতেন তারা ছিল খেলার পুতুল। এখন যারা বিয়ের উমেদার, মাসিমাদের খেলার শখ মেটাবার দিকে তাদের মন নেই।'

'ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে বলেই অমিত রায় মর্ত্যে অবতীর্ণ। নইলে আমার মোটরগাড়িটা অচেতন পদার্থ হয়েও অস্থানে অসময়ে এমন অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়ে বসবে কেন।'

'বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনো তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস্তটা বাল্য-বিবাহ হয়ে না দাঁড়ায়।'

'মাসিমা, আমার মনের স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে, তারই গুণে আমার হৃদয়ের ভারী কথাগুলোও মুখে খুব হালকা হয়ে ভেসে ওঠে, তাই বলে তার ওজন কমে না।'

যোগমায়া গেলেন ভোজের ব্যবস্থা করতে। অমিত এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ালে, দর্শনীয় কাউকে দেখতে পেলে না। দেখা হল যতিশংকরের সঙ্গে। মনে পড়ল, আজ তাকে অ্যান্টনি ক্লিয়োপ্যাট্রা পড়াবার কথা। অমিতর মুখের ভাব দেখেই যতি বুঝেছিল, জীবের প্রতি দয়া করেই আজ তার ছুটি নেওয়া আশু কর্তব্য। সে বললে, 'অমিতদা, কিছু যদি মনে না কর, আজ আমি ছুটি চাই, আপার শিলঙে বেড়াতে যাব।'

অমিত পুলকিত হয়ে বললে, 'পড়ার সময় যারা ছুটি নিতে জানে না তারা পড়ে, পড়া হজম করে না। তুমি ছুটি চাইলে আমি কিছু মনে করব এমন অসম্ভব ভয় করছ কেন।'

'কাল রবিবার ছুটি তো আছেই, পাছে তুমি তাই ভাব—'

'ইস্কুলমাস্টারি বুদ্ধি আমার নয় ভাই, বরাদ্দ ছুটিকে ছুটি বলিই নে। যে ছুটি নিয়মিত তাকে ভোগ করা, আর বাঁধা পশুকে শিকার করা, একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।'

হঠাৎ যে উৎসাহে অমিতকুমার ছুটিতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় মেতে উঠল তার মূল কারণটা অনুমান করে যতির খুব মজা লাগল। সে বললে, 'কয়দিন থেকে ছুটিতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার মাথায় নতুন নতুন ভাব উঠছে। সেদিনও আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। এমন আর কিছুদিন চললেই ছুটি নিতে আমার হাত পেকে যাবে।'

'সেদিন কী উপদেশ দিয়েছিলুম।'

'বলেছিলে, "অকর্তব্যবুদ্ধি মানুষের একটা মহদ্‌গুণ। তার ডাক পড়লেই একটুও বিলম্ব করা উচিত হয় না।" বলেই বই বন্ধ করে তখনি বাইরে দিলে ছুট। বাইরে হয়তো একটা অকর্তব্যের কোথাও আবির্ভাব হয়েছিল, লক্ষ্য করি নি।'

যতির বয়স বিশের কোঠায়। অমিতর মনে যে চাঞ্চল্য উঠেছে ওর নিজের মনেও তার আন্দোলনটা এসে লাগছে। ও লাবণ্যকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাউরেছিল, আজ অমিতর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছে সে নারীজাতীয়।

অমিত হেসে বললে, 'কাজ উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হওয়া চাই, এ উপদেশের বাজারদর বেশি, আকব্বরি মোহরের মতো; কিন্তু ওর উলটো পিঠে খোদাই থাকা উচিত অকাজ উপস্থিত হলেই সেটাকে বীরের মতো মেনে নেওয়া চাই।'

'তোমার বীরত্বের পরিচয় আজকাল প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে।'

যতির পিঠ চাপড়িয়ে অমিত বললে, 'জরুরি কাজটাকে এক কোপে বলি দেবার পবিত্র অষ্টমী-তিথি তোমার জীবনপঞ্জিকায় একদিন যখন আসবে দেবীপূজায় বিলম্ব কোরো না ভাই, তার পরে বিজয়াদশমী আসতে দেরি হয় না।'

যতি গেল চলে, অকর্তব্যবুদ্ধিও সজাগ, যাকে আশ্রয় করে অকাজ দেখা দেয় তারও দেখা নেই। অমিত ঘর ছেড়ে গেল বাইরে।

ফুলে আচ্ছন্ন গোলাপের লতা, এক ধারে সূর্যমুখীর ভিড়, আর-এক ধারে চৌকো কাঠের টবে চন্দ্রমল্লিকা। ঢালু ঘাসের খেতের উপরপ্রান্তে এক মস্ত য়ুক্যালিপ্‌টস গাছ। তারই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে লাবণ্য। ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে, পায়ের উপর পড়েছে সকালবেলাকার রোদ্দুর। কোলে রুমালের উপর কিছু রুটির টুকরো, কিছু ভাঙা আখরোট। আজ সকালটা জীবসেবায় কাটাবে ঠাউরেছিল, তাও গেছে ভুলে। অমিত কাছে এসে দাঁড়াল, লাবণ্য মাথা তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল, মৃদু হাসিতে মুখ গেল ছেয়ে। অমিত সামনাসামনি বসে বললে, 'সুখবর আছে। মাসিমার মত পেয়েছি।'

লাবণ্য তার কোনো উত্তর না করে অদূরে একটা নিষ্ফলা পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আখরোট ফেলে দিলে। দেখতে দেখতে তার গুঁড়ি বেয়ে একটা কাঠবিড়ালি নেমে এল। এই জীবটি লাবণ্যর মুষ্টিভিখারিদলের একজন।

অমিত বললে, 'যদি আপত্তি না কর তোমার নামটা একটু ছেঁটে দেব।'

'তা দাও।'

'তোমাকে ডাকব বন্য বলে।'

'বন্য!'

'না না, এ নামটাতে হয়তো তোমার বদনাম হল। এরকম নাম আমাকেই সাজে। তোমাকে ডাকব—বন্যা। কী বল।'

'তাই ডেকো, কিন্তু তোমার মাসিমার কাছে নয়।'

'কিছুতেই নয়। এ-সব নাম বীজমন্ত্রের মতো, কারও কাছে ফাঁস করতে নেই। এ রইল আমার মুখে আর তোমার কানে।'

'আচ্ছা বেশ।'

'আমারও ঐ রকমের একটা বেসরকারি নাম চাই তো। ভাবছি 'ব্রহ্মপুত্র' কেমন হয়। বন্যা হঠাৎ এল তারই কূল ভাসিয়ে দিয়ে।'

'নামটা সর্বদা ডাকবার পক্ষে ওজনে ভারী।'

'ঠিক বলেছ। কুলি ডাকতে হবে ডাকবার জন্যে। তুমিই তা হলে নামটা দাও। সেটা হবে তোমারই সৃষ্টি।'

'আচ্ছা, আমিও দেব তোমার নাম ছেঁটে। তোমাকে বলব মিতা।'

'চমৎকার! পদাবলীতে ওরই একটি দোসর আছে— বঁধু। বন্যা, মনে ভাবছি, ঐ নামে নাহয় আমাকে সবার সামনেই ডাকলে, তাতে দোষ কী।'

'ভয় হয়, এক কানের ধন পাঁচ কানে পাছে সস্তা হয়ে যায়।'

'সে কথা মিছে নয়। দুইয়ের কানে যেটা এক, পাঁচের কানে সেটা ভগ্নাংশ। বন্যা!'

'কী মিতা।'

'তোমার নামে যদি কবিতা লিখি তো কোন্ মিলটা লাগাব জান?— অনন্যা।'

'তাতে কী বোঝাবে।'

'বোঝাবে, যা তুমি তাই-ই, তুমি আর-কিছুই নও।'

'সেটা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়।'

'বল কী, খুবই আশ্চর্যের কথা। দৈবাৎ এক-একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় যাকে দেখেই চমকে বলে উঠি, এ মানুষটি একেবারে নিজের মতো, পাঁচজনের মতো নয়। সেই কথাটি আমি কবিতায় বলব—

হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা,
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।'

'তুমি কবিতা লিখবে নাকি।'

'নিশ্চয়ই লিখব। কার সাধ্য রোধে তার গতি।'

'এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন।'

'কারণ বলি। ঘুম না হলে যেমন এ-পাশ ও-পাশ করতে হয় তেমনি করেই কাল রাত্তির আড়াইটা পর্যন্ত, কেবলই অক্সফোর্ড বুক অফ ভর্সেস-এর এ-পাত ও-পাত উলটেছি। ভালোবাসার কবিতা খুঁজেই পেলুম না, আগে সেগুলো পায়ে পায়ে ঠেকত। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, আমি লিখব বলেই সমস্ত পৃথিবী আজ অপেক্ষা করে আছে।'

এই বলেই লাবণ্যর বাঁ হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললে, 'হাত জোড়া পড়ল, কলম ধরব কী দিয়ে। সব চেয়ে ভালো মিল হাতে-হাতে মিল। এই-যে তোমার আঙুল-গুলি আমার আঙুলে আঙুলে কথা কইছে, কোনো কবিই এমন সহজ করে কিছু লিখতে পারলে না।'

'কিছুই তোমার সহজে পছন্দ হয় না, সেইজন্যে তোমাকে এত ভয় করি মিতা!'

'কিন্তু আমার কথাটা বুঝে দেখো। রামচন্দ্র সীতার সত্য যাচাই করতে চেয়েছিলেন বাইরের আগুনে; তাতেই সীতাকে হারালেন। কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নিপরীক্ষায়, সে আগুন অন্তরের। যার মনে নেই সেই আগুন সে যাচাই করবে কী দিয়ে। তাকে পাঁচজনের মুখের কথা মেনে নিতে হয়, অনেক সময়ই সেটা দুর্মুখের কথা। আমার মনে আজ আগুন জ্বলছে, সেই আগুনের ভিতর দিয়ে আমার পুরোনো সব পড়া আবার পড়ে নিচ্ছি, কত অল্প টিঁকল। সব

হু হু শব্দে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কবিদের হট্টগোলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ আমাকে বলতে হল, তোমরা অত চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না, ঠিক কথাটি আস্তে বলো—

'For God's sake, hold your tongue
and let me love!'

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইল। তার পরে এক সময়ে লাবণ্যর হাতখানি তুলে ধরে অমিত নিজের মুখের উপর বুলিয়ে নিলে। বললে, 'ভেবে দেখো বন্যা, আজ এই সকালে ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীতে কত অসংখ্য লোকই চাচ্ছে, আর কত অল্প লোকই পেলে। আমি সেই অতি অল্প লোকের মধ্যে একজন। সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই সেই সৌভাগ্যবান লোককে দেখতে পেলে শিলঙ পাহাড়ের কোণে এই য়ুক্যালিপ্টস গাছের তলায়। পৃথিবীতে পরমাশ্চর্য ব্যাপারগুলিই পরম নম্র, চোখে পড়তে চায় না। অথচ তোমাদের ঐ তারিণী তলাপাত্র কলকাতার গোলদিঘি থেকে আরম্ভ করে নোয়াখালি-চাটগাঁ পর্যন্ত চীৎকার-শব্দে শূন্যের দিকে ঘুষি উঁচিয়ে বাঁকা পলিটিক্সের ফাঁকা আওয়াজ ছড়িয়ে এল, সেই দুর্দান্ত বাজে খবরটা বাংলাদেশের সর্বপ্রধান খবর হয়ে উঠল। কে জানে, হয়তো এইটেই ভালো।'

'কোন্টা ভালো।'

'ভালো এই যে, সংসারের আসল জিনিসগুলো হাটেবাটেই চলাফেরা করে বেড়ায়, অথচ বাজে লোকের চোখের ঠোকর খেয়ে খেয়ে মরে না। তার গভীর জানাজানি বিশ্বজগতের অন্তরের নাড়ীতে নাড়ীতে।— আচ্ছা বন্যা, আমি তো বকেই চলেছি, তুমি চুপ করে বসে কী ভাবছ বলো তো।'

লাবণ্য চোখ নিচু করে বসে রইল, জবাব করলে না।

অমিত বললে, 'তোমার এই চুপ করে থাকা যেন মাইনে না দিয়ে আমার সব কথাকে বরখাস্ত করে দেওয়ার মতো।'

লাবণ্য চোখ নিচু করেই বললে, 'তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয় মিতা।'

'ভয় কিসের।'

'তুমি আমার কাছে কী যে চাও আর আমি তোমাকে কতটুকুই-বা দিতে পারি ভেবে পাই নে।'

'কিছু না ভেবেই তুমি দিতে পার এইটেতেই তো তোমার দানের দাম।'

'তুমি যখন বললে কর্তামা সম্মতি দিয়েছেন, আমার মনটা কেমন করে উঠল। মনে হল, এইবার আমার ধরা পড়বার দিন আসছে।'

'ধরাই তো পড়তে হবে।'

'মিতা, তোমার রুচি তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না— না না, কিছু বোলো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়ো না। বিয়ে করে তখন গ্রন্থি খুলতে গেলে তাতে আরো জট পড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্যন্ত চলবে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ো না।'

'বন্যা, তুমি আজকের দিনের ঔদার্যের মধ্যে কালকের দিনের কার্পণ্যের আশঙ্কা কেন তুলছ।'

'মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েছ। আজ তোমাকে যা বলছি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জান। মানতে চাও না, পাছে যে রস এখন ভোগ করছ তাতে একটুও খটকা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ফের; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেছ। বলব ঠিক কথাটা? বিয়েটাকে তুমি মনে মনে জান, যাকে তুমি সর্বদাই বল, ভাল্গার। ওটা বড়ো রেস্পেক্টেবল্; ওটা শাস্ত্রের-

দোহাই-পাড়া সেই-সব বিষয়ী লোকের পোষা জিনিস যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্মিণীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে।'

'বন্যা, তুমি আশ্চর্য নরম সুরে আশ্চর্য কঠিন কথা বলতে পার।'

'মিতা, ভালোবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছ ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে আমাকে যতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না, তাতেই আমি খুশি থাকব।'

'বন্যা, এবার তবে আমার কথাটা বলতে দাও। কী আশ্চর্য করেই তুমি আমার চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছ। তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করব না। কিন্তু একটা জায়গায় তোমার ভুল আছে। মানুষের চরিত্র জিনিসটাও চলে। ঘর-পোষা অবস্থায় তার একরকম শিকলি-বাঁধা স্থাবর পরিচয়। তার পরে একদিন ভাগ্যের হঠাৎ এক ঘায়ে তার শিকল কাটে, সে ছুট দেয় অরণ্যে, তখন তার আর-এক মূর্তি।'

'আজ তুমি তার কোন্‌টা।'

'যেটা আমার বরাবরের সঙ্গে মেলে না, সেইটে। এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সমাজের কাটা খাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে রুচির ঢাকা-লণ্ঠন জ্বালিয়ে। তাতে দেখাশোনা হয়, চেনাশোনা হয় না। তুমি নিজেই বলো বন্যা, তোমার সঙ্গেও কি আমার সেই আলাপ।'

লাবণ্য চুপ করে রইল।

অমিত বললে, 'বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ করে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, কিন্তু মর্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লণ্ঠন, দোঁহে এক হয়ে ওঠবার আগুন ওঠে জ্বলে। সেই আগুন জ্বলেছে, অমিত রায় বদলে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায় দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদলিয়ে দিয়েছ বন্যা, সেই তালেই তো তোমার সুরে আমার সুরে গাঁথা পড়ল।'

লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এল। তবু এ কথা মনে না করে থাকতে পারলে না যে, অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রয়োজন সেইজন্যেই। সে-সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে লাবণ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে শাজাহান খুশি হয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সবচেয়ে বড়ো প্রেমের দান। তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায় নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।'

অমিত বললে, 'তোমার কথায় তুমি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমক লাগিয়ে দিলে। তুমি নিশ্চয়ই কবি।'

'আমি চাই নে কবি হতে।'

'কেন চাও না।'

'জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসবসভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষে ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।'

'বন্যা, তুমি কথাকে অস্বীকার করছ? জান না, তোমার কথা আমাকে কেমন করে জাগিয়ে দেয়। তুমি কী করে জানবে তুমি কী বল, আর সে বলার কী অর্থ। আবার দেখছি নিবারণ চক্রবর্তীকে ডাকতে হল। ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কিন্তু কী করব বলো, ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী। নিবারণ এখনো নিজের কাছে নিজে পুরোনো হয়ে যায় নি: ও প্রত্যেক বারেই যে কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা। সেদিন ওর খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে অল্প-দিন আগেকার একটা লেখা পাওয়া গেল। ঝরনার উপরে কবিতা— কী করে খবর পেয়েছে শিলঙ পাহাড়ে এসে আমার ঝরনা আমি খুঁজে পেয়েছি। ও লিখছে—

'ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা—
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য তারা।

'আমি নিজে যদি লিখতুম, এর চেয়ে স্পষ্টতর করে তোমার বর্ণনা করতে পারতুম না। তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে যে, আকাশের সমস্ত আলো তাতে সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার সব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া সেই আলো আমি দেখতে পাই— তোমার মুখে, তোমার হাসিতে, তোমার কথায়, তোমার স্থির হয়ে বসে থাকায়, তোমার রাস্তা দিয়ে চলায়।

'আজি মাঝে মাঝে আমার ছায়ারে
দুলায়ে খেলায়ো তারি এক ধারে,
সে ছায়ারি সাথে হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি—
দিয়ো তারে বাণী যে বাণী তোমার
চিরন্তনী।

'তুমি ঝরনা, জীবনস্রোতে তুমি যে কেবল চলছ তা নয়, তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বলা। সংসারের যে-সব কঠিন অচল পাথরগুলোর উপর দিয়ে চল তারাও তোমার সংঘাতে সুরে বেজে ওঠে।

'আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি,
নির্ঝরিণী।
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।'

লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, 'যতই আমার আলো থাক্ আর ধ্বনি থাক্, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে ছায়াকে আমি ধরে রাখতে পারব না।'

অমিত বললে, 'কিন্তু একদিন হয়তো দেখবে, আর কিছু যদি না থাকে, আমার বাণীরূপ রয়েছে।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'কোথায়। নিবারণ চক্রবর্তীর খাতায়?'

'আশ্চর্য কিছুই নেই। আমার মনের নীচের স্তরে যে ধারা বয়, নিবারণের ফোয়ারায় কেমন করে সেটা বেরিয়ে আসে।'

'তা হলে কোনো-একদিন হয়তো কেবল নিবারণ চক্রবর্তীর ফোয়ারার মধ্যেই তোমার মনটিকে পাব, আর কোথাও নয়।'

এমন সময় বাসা থেকে লোক এল ডাকতে— খাবার তৈরি।

অমিত চলতে চলতে ভাবতে লাগল যে, বুদ্ধির আলোতে লাবণ্য সমস্তই স্পষ্ট করে জানতে চায়। মানুষ স্বভাবত যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না। যে কথাটা লাবণ্য বললে সেটার তো প্রতিবাদ করতে পারছি নে। অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়— কেউ-বা করে জীবনে, কেউ-বা করে রচনায়— জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে, অথচ তার থেকে সরতে সরতে, নদী যেমন কেবলই তীর থেকে সরতে সরতে চলে, তেমনি। আমি কি কেবলই রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে সরে যাব। এইখানেই কি মেয়েপুরুষের ভেদ। পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। এমন কেন হল। এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব করে মিল সেখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি, আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা সে মিলন নয়, সে মুক্তি।'

এ কথাটা ভাবতে অমিতকে পীড়া দিল, কিন্তু ওর মন এটাকে অস্বীকার করতে পারলে না।

৮

লাবণ্য-তর্ক

যোগমায়া বললেন, 'মা লাবণ্য, তুমি ঠিক বুঝেছ?'

'ঠিক বুঝেছি মা।'

'অমিত ভারি চঞ্চল, সে কথা মানি। সেইজন্যেই ওকে এত স্নেহ করি। দেখো-না, ও কেমনতরো এলোমেলো। হাত থেকে সবই যেন পড়ে পড়ে যায়।'

লাবণ্য একটু হেসে বললে, 'ওঁকে সবই যদি ধরে রাখতে হত, হাত থেকে সবই যদি খসে খসে না পড়ত, তা হলেই ওঁর ঘটত বিপদ। ওঁর নিয়ম হচ্ছে: হয় উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। যেটা পাবেন সেটা যে আবার রাখতে হবে এটা ওঁর ধাতের সঙ্গে মেলে না।'

'সত্যি করে বলি বাছা, ওর ছেলেমানুষি আমার ভারি ভালো লাগে।'

'সেটা হল মায়ের ধর্ম। ছেলেমানুষিতে দায় যত-কিছু সব মায়ের। আর ছেলের যত-কিছু সব খেলা। কিন্তু আমাকে কেন বলছ দায় নিতে, যে পারে না তার উপরে দায় চাপাতে।'

'দেখছ-না লাবণ্য, ওর অমন দুরন্ত মন আজকাল অনেকখানি যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দেখে আমার বড়ো মায়া করে। যাই বল, ও তোমাকে ভালোবাসে।'

'তা বাসেন।'

'তবে আর ভাবনা কিসের।'

'কর্তামা, ওঁর যেটা স্বভাব তার উপর আমি একটুও অত্যাচার করতে চাই নে।'

'আমি তো এই জানি লাবণ্য, ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার চায়, অত্যাচার করেও।'

'কর্তামা, সে অত্যাচারের ক্ষেত্র আছে; কিন্তু স্বভাবের উপর পীড়ন সয় না। সাহিত্যে ভালোবাসার বই যতই পড়লেম ততই এই কথাটা বার বার আমার মনে হয়েছে, ভালোবাসার ট্রাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি, নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে জুলুম, যেখানে মনে করি আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করব।'

'তা মা, দুজনকে নিয়ে সংসার পাততে গেলে পরস্পর পরস্পরকে খানিকটা সৃষ্টি না করে নিলে চলেই না। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ, যেখানে নেই সেখানে হাতুড়ি পিটোতে গিয়ে, তুমি যাকে ট্রাজেডি বল, তাই ঘটে।'

'সংসার পাতবার জন্যেই যে মানুষ তৈরি তার কথা ছেড়ে দাও। সে তো মাটির মানুষ, সংসারের প্রতিদিনের চাপেই তার গড়নপিটন আপনি ঘটতে থাকে। কিন্তু, যে মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয় সে আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই ছাড়তে পারে না। যে মেয়ে তা না বোঝে সে যতই দাবি করে ততই হয় বঞ্চিত, যে পুরুষ তা না বোঝে সে যতই টানা-হেঁচড়া করে ততই আসল মানুষটাকে হারায়। আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই আমরা যাকে পাওয়া বলি সে আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যেরকম পায় সেই আর-কি।'

'তুমি কী করতে চাও, লাবণ্য।'

'বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাই নে। বিয়ে সকলের জন্যে নয়। জান কর্তামা, খুঁতখুঁতে মন যাদের তারা মানুষকে খানিক খানিক বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে প'ড়ে স্ত্রীপুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে—মাঝে ফাঁক থাকে না, তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয় নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো-একটা অংশ ঢাকা রাখবার জো থাকে না।'

'লাবণ্য, তুমি নিজেকে জান না। তোমাকে নিতে গেলে কিছুই বাদ দিয়ে নেবার দরকার হবে না।'

'কিন্তু, উনি তো আমাকে চান না। যে আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করি নে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয় তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।'

'তোমার মনে হয় অমিত তোমার মতো মেয়েকেও সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারবে না?'

'স্বভাব যদি বদলায় তবে পারবেন। কিন্তু বদলাবেই বা কেন। আমি তো তা চাই না।'

'তুমি কী চাও।'

'যতদিন পারি, নাহয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব। আর স্বপ্নই বা তাকে বলব কেন। সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। নাহয় সে গুটি-থেকে-বের-হয়ে-আসা দু-চারদিনের একটা রঙিন প্রজাপতিই হল, তাতে দোষ কী—জগতে প্রজাপতি আর-কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়—নাহয় সে সূর্যোদয়ের আলোতে দেখা দিল আর সূর্যাস্তের আলোতে মরেই গেল, তাতেই বা কী। কেবল এইটুকুই দেখা চাই যে সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়।'

'সে যেন বুঝলুম, তুমি অমিতর কাছে নাহয় ক্ষণকালের মায়া-রূপেই থাকবে। আর নিজে? তুমিও কি বিয়ে করতে চাও না। তোমার কাছে অমিতও কি মায়া।'

লাবণ্য চুপ করে বসে রইল, কোনো জবাব করলে না।

যোগমায়া বললেন, 'তুমি যখন তর্ক কর তখন বুঝতে পারি, তুমি অনেক-বই-পড়া মেয়ে; তোমার মতো করে ভাবতেও পারি নে, কথা কইতেও পারি নে; শুধু তাই নয়, হয়তো কাজের বেলাতেও এত শক্ত হতে পারি নে। কিন্তু তর্কের ফাঁকের মধ্যে দিয়েও যে তোমাকে দেখেছি, মা। সেদিন বারোটা রাত তখন হবে— দেখলুম তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে গিয়ে দেখি তোমার টেবিলের উপর নুয়ে পড়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে তুমি কাঁদছ। এ তো ফিলজফি-পড়া মেয়ে নয়। একবার ভাবলুম, সান্ত্বনা দিয়ে আসি; তার পরে ভাবলুম, সব মেয়েকেই কাঁদবার দিনে কেঁদে নিতে হবে, চাপা দিতে যাওয়া কিছু নয়। এ কথা খুবই জানি, তুমি সৃষ্টি করতে চাও না, ভালোবাসতে চাও। মনপ্রাণ দিয়ে সেবা না করতে পারলে তুমি বাঁচবে কী করে। তাই তো বলি, ওকে কাছে না পেলে তোমার চলবে না। বিয়ে করব না বলে হঠাৎ পণ করে বোসো না। একবার তোমার মনে একটা জেদ চাপলে আর তোমাকে সোজা করা যায় না, তাই ভয় করি।'

লাবণ্য কিছু বললে না, নতমুখে কোলের উপর শাড়ির আঁচলটা চেপে চেপে অনাবশ্যক ভাঁজ করতে লাগল। যোগমায়া বললেন, 'তোমাকে দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছে, অনেক পড়ে অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে; তোমরা ভিতরে ভিতরে যে-সব ভাব গড়ে তুলছ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ করে দেহটাকে যেন অগোচর করে দিচ্ছে। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিল, সমস্যা কিছু কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলছ, কিছুই আর সহজ রাখলে না।'

লাবণ্য একটুখানি হাসলে। এই সেদিন অমিত অদৃশ্য আলোর কথা যোগমায়াকে বোঝাচ্ছিল, তার থেকে এই যুক্তি তাঁর মাথায় এসেছে— এও তো সূক্ষ্ম। যোগমায়ার মাঠাকরুন এ কথা এমন করে বুঝতেন না। বললে, 'কর্তামা, কালের গতিকে মানুষের মন যতই স্পষ্ট করে সব কথা বুঝতে পারবে ততই শক্ত করে তার ধাক্কাও সইতে পারবে। অন্ধকারের ভয়, অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য, কেননা অস্পষ্ট।'

যোগমায়া বললেন, 'আজ আমার বোধ হচ্ছে, কোনোকালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভালো হত।'

'না না, তা বোলো না। যা হয়েছে এ ছাড়া আর কিছু যে হতে পারত এ আমি মনেও করতে পারি নে। এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুকনো— কেবল বই পড়ব আর পাস করব, এমনি করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলুম, আমিও ভালোবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হল এই আমার ঢের হয়েছে। মনে হয়, এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এর চেয়ে আর কী চাই। আমাকে বিয়ে করতে বোলো না, কর্তামা।'

বলে চৌকি থেকে মেঝেতে নেমে যোগমায়ার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

৯

বাসা-বদল

গোড়ায় সবাই ঠিক করে রেখেছিল, অমিত দিন-পনেরো মধ্যে কলকাতায় ফিরবে। নরেন মিত্তির খুব মোটা বাজি রেখেছিল যে, সাত দিন পেরোবে না। এক মাস যায়, দু মাস যায়, ফেরবার নামও নেই। শিলঙের বাসার মেয়াদ ফুরিয়েছে— রংপুরের কোন্ জমিদার এসে সেটা দখল করে বসল। অনেক খোঁজ করে যোগমায়াদের কাছাকাছি একটা বাসা পাওয়া গেছে। এক সময়ে ছিল

গোয়ালার কি মালীর ঘর, তার পরে একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল। সে কেরানিও গেছে মরে, তারই বিধবা স্ত্রী এটা ভাড়া দেয়। জানালা দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ ব্যোম এই তিন ভূতেরই অধিকার সংকীর্ণ, কেবল বৃষ্টির দিনে অপ্‌ অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচুর্যের সঙ্গে অখ্যাত ছিদ্রপথ দিয়ে।

ঘরের অবস্থা দেখে যোগমায়া একদিন চমকে উঠলেন। বললেন, 'বাবা, নিজেকে নিয়ে এ কী পরীক্ষা চলেছে।'

অমিত উত্তর করলে, 'উমার ছিল নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হল নিরাসবাবের তপস্যা—খাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় এসে ঠেকেছে শূন্য দেয়ালে। সেটা ঘটেছিল হিমালয় পর্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্ছেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা—এখন শেষ পর্যন্ত যদি কোনো কারণে কালিদাস এসে না পোঁছতে পারেন অগত্যা আমাকেই তাঁর কাজটাও যথাসম্ভব সারতে হবে।'

অমিত হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে, কিন্তু যোগমায়াকে ব্যথা দেয়। তিনি প্রায় বলতে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো—থেমে গেলেন। ভাবলেন, বিধাতা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলছেন, তার মধ্যে আমাদের হাত পড়লে অসাধ্য জট পাকিয়ে উঠতে পারে। নিজের বাসা থেকে অল্প-কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর সেইসঙ্গে এই লক্ষ্মীছাড়াটার 'পরে তাঁর করুণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লাবণ্যকে বার বার বললেন, 'মা লাবণ্য, মনটাকে পাষাণ কোরো না।'

একদিন বিষম এক বর্ষণের অন্তে অমিত কেমন আছে খবর নিতে গিয়ে যোগমায়া দেখলেন, নড়বড়ে একটা চারপেয়ে টেবিলের নীচে কম্বল পেতে অমিত একলা বসে একখানা ইংরেজি বই পড়ছে। ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে বৃষ্টিবিন্দুর অসংগত আবির্ভাব দেখে টেবিল দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে তার নীচে অমিত পা ছড়িয়ে বসে গেল। প্রথমে নিজে নিজেই হেসে নিলে এক চোট, তার পরে চলল কাব্যালোচনা। মনটা ছুটেছিল যোগমায়ার বাড়ির দিকে। কিন্তু শরীরটা দিলে বাধা। কারণ, যেখানে কোনো প্রয়োজন হয় না সেই কলকাতায় অমিত কিনেছিল এক অনেক দামের বর্ষাতি, যেখানে সর্বদাই প্রয়োজন সেখানে আসবার সময় সেটা আনবার কথা মনে হয় নি। একটা ছাতা সঙ্গে ছিল, সেটা খুব সম্ভব কোনো-একদিন সংকল্পিত গম্যস্থানেই ফেলে এসেছে, আর তা যদি না হয় তবে সেই বুড়ো দেওদারের তলে সেটা আছে পড়ে। যোগমায়া ঘরে ঢুকে বললেন, 'এ কী কাণ্ড অমিত।'

অমিত তাড়াতাড়ি টেবিলের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে বললে, 'আমার ঘরটা আজ অসম্বন্ধ প্রলাপে মেতেছে, দশা আমার চেয়ে ভালো নয়।'

'অসম্বন্ধ প্রলাপ?'

'অর্থাৎ, বাড়ির চালটা প্রায় ভারতবর্ষ বললেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আলগা। এইজন্যে উপর থেকে উৎপাত ঘটলেই চারি দিকে এলোমেলো অশ্রুবর্ষণ হতে থাকে, আর বাইরের দিক থেকে যদি ঝড়ের দাপট লাগে তবে সোঁ সোঁ ক'রে উঠতে থাকে দীর্ঘশ্বাস। আমি তো প্রোটেস্ট্‌স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ খাড়া করেছি—ঘরের মিস্‌গভর্মেন্টের মাঝখানেই নিরুপদ্রব হোমরুলের দৃষ্টান্ত। পলিটিক্‌সের একটা মূলনীতি এখানে প্রত্যক্ষ।'

'মূলনীতিটা কী শুনি।'

'সেটা হচ্ছে এই যে, যে ঘরওয়ালা ঘরে বাস করে না সে যতবড়ো ক্ষমতাশালীই হোক, তার শাসনের চেয়ে যে দরিদ্র বাসাড়ে ঘরে থাকে তার যেমন-তেমন ব্যবস্থাও ভালো।'

আজ লাবণ্যের 'পরে যোগমায়ার খুব রাগ হল। অমিতকে তিনি যতই গভীর করে স্নেহ করছেন ততই মনে মনে তার মূর্তিটা খুব উঁচু করেই গড়ে তুলছেন। 'এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা মন। গুছিয়ে কথা বলবার কী অসামান্য শক্তি! আর, যদি চেহারার

কথা বল, আমার চোখে তো লাবণ্যর চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। লাবণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন্ গ্রহের চক্রান্তে ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেছে। সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাবণ্য এত করে দুঃখ দিচ্ছে। খামকা বলে বসলেন কিনা, বিয়ে করবেন না। যেন কোন্ রাজ-রাজেশ্বরী। ধনুক-ভাঙা পণ। এত অহংকার সইবে কেন। পোড়ারমুখিকে যে কেঁদে কেঁদে মরতে হবে।'

একবার যোগমায়া ভাবলেন, অমিতকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়িতে। তার পরে কী ভেবে বললেন, 'একটু বোসো বাবা, আমি এখনি আসছি।'

বাড়ি গিয়েই চোখে পড়ল, লাবণ্য তার ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর শাল মেলে গোর্কির 'মা' বলে গল্পের বই পড়ছে। ওর এই আরামটা দেখে ওঁর মনে মনে রাগ আরো বেড়ে উঠল।

বললেন, 'চলো, একটু বেড়িয়ে আসবে।'

সে বললে, 'কর্তামা, আজ বেরোতে ইচ্ছে করছে না।'

যোগমায়া ঠিক বুঝলেন না যে, লাবণ্য নিজের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে এই গল্পের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সমস্ত দুপুরবেলা, খাওয়ার পর থেকেই, তার মনের মধ্যে একটা অস্থির অপেক্ষা ছিল, কখন আসবে অমিত। কেবলই মন বলছে, এল বুঝি। বাইরে দমকা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে পাইন গাছগুলো থেকে থেকে ছটফট করে, আর দুর্দান্ত বৃষ্টিতে সদ্যোজাত ঝরনাগুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত, যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের পাল্লা চলেছে। লাবণ্যর মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হয়ে উঠল— যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি, জন্মে-জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হুহু করে কী-যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি করেই কেউ শুনতে আসুক লাবণ্যর কথা— অমনি মস্ত করে, স্তব্ধ হয়ে, অমনি উদার মনোযোগে। কিন্তু প্রহরের পর প্রহর যায়, কেউ আসে না। ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল! এর পরে যখন কেউ আসবে তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তাণ্ডবনৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ-রব আকাশে মিলিয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে না। যে দিন সেই বাণী আসে সে দিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে— শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি, এই কথাটি অপরিচিত-সিন্ধুপার-গামী পাখির মতো কত দিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে। সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এত দিন অপেক্ষা করছিলেন। স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি— আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল। বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাবণ্য আজ কাকে এমন করে বলতে লাগল— সত্য, সত্য, এত সত্য আর কিছু নেই।

সময় চলে গেল, অতিথি এল না। অপেক্ষার গুরুভারে বুকের ভিতরটা টনটন করতে লাগল। বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে লাবণ্য খানিকটা ভিজে এল জলের ঝাপটা লাগিয়ে। তার পরে একটা গভীর অবসাদে তার মনটাকে ঢেকে ফেললে— নিবিড় একটা নৈরাশ্যে; মনে হল, ওর জীবনে যা জ্বলবার তা একবার মাত্র দপ্ করে জ্বলে তার পরে গেল নিবে, সামনে কিছুই নেই। অমিতকে নিজের ভিতরকার সত্যের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ করে স্বীকার করে নিতে ওর সাহস চলে গেল। এই কিছু আগেই ওর প্রবল যে-একটা ভরসা জেগেছিল সেটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে অবশেষে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিলে। কিছু সময় গেল মন দিতে, তার পরে গল্পের ধারার মধ্যে প্রবেশ করে কখন নিজেকে ভুলে গেল তা জানতে পারে নি।

এমন সময় যোগমায়া ডাকলেন বেড়াতে যেতে, ওর উৎসাহ হল না।

যোগমায়া একটি চৌকি টেনে লাবণ্যর সামনে বসলেন, দীপ্ত চোখ তার মুখে রেখে বললেন, 'সত্যি করে বলো দেখি লাবণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালোবাস।'

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, 'এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ কর্তামা।'

'যদি না ভালোবাস, ওকে স্পষ্ট করে বল না কেন। নিষ্ঠুর তুমি, ওকে যদি না চাও তবে ওকে ধরে রেখো না।'

লাবণ্যের বুকের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠল, মুখ দিয়ে কথা বেরল না।

'এইমাত্র যে দশা ওর দেখে এলুম বুক ফেটে যায়। এমন ভিক্ষুকের মতো কার জন্যে এখানে ও পড়ে আছে। ওর মতো ছেলে যাকে চায় সে যে কতবড়ো ভাগ্যবতী তা কি একটুও বুঝতে পার না।'

চেষ্টা করে রুদ্ধ কণ্ঠের বাধা কাটিয়ে লাবণ্য বলে উঠল, 'আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করছ কর্তামা? আমি তো ভেবে পাই নে, আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর-এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কত আশ্চর্য সে আমি কাউকে কেমন করে জানাব। আর কেউ কি এমন করে জেনেছে।'

যোগমায়া অবাক হয়ে গেলেন। চিরদিন দেখে এসেছেন লাবণ্যর মধ্যে গভীর শান্তি, এতবড়ো দুঃসহ আবেগ কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল। তাকে আস্তে আস্তে বললেন, 'মা লাবণ্য, নিজেকে চাপা দিয়ে রেখো না। অমিত অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে— সম্পূর্ণ করে তার কাছে তুমি আপনাকে জানাও, একটুও ভয় কোরো না। যে আলো তোমার মধ্যে জ্বলেছে সে আলো যদি তার কাছেও প্রকাশ পেত তা হলে তার কোনো অভাব থাকত না। চলো মা, এখনি চলো আমার সঙ্গে।'

দুজনে গেলেন অমিতর বাসায়।

১০

দ্বিতীয় সাধনা

তখন অমিত ভিজে চৌকির উপরে এক তাড়া খবরের কাগজ চাপিয়ে তার উপর বসেছে। টেবিলে এক দিস্তে ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে তার চলছে লেখা। সেই সময়েই সে তার বিখ্যাত আত্মজীবনী শুরু করেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, সেই সময়েই তার জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকালবেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো— সেদিন নিজের অস্তিত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিল, সে কথাটা প্রকাশ না করে সে থাকবে কী করে। অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তার জীবনী লেখা হয় তার কারণ, এক দিকে সংসারে সে মরে, আর-এক দিকে মানুষের মনে সে নিবিড় করে বেঁচে ওঠে। অমিতর ভাবখানা এই যে, শিলঙে সে যখন ছিল তখন এক দিকে সে মরেছিল, তার অতীতটা গিয়েছিল মরীচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর-এক দিকে সে উঠেছিল তীব্র করে বেঁচে; পিছনের অন্ধকারের উপরে উজ্জ্বল আলোর ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকাশের খবরটা রেখে যাওয়া চাই। কেননা, পৃথিবীতে খুব অল্প লোকের ভাগ্যে এটা ঘটতে পারে; তারা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটা প্রদোষচ্ছায়ার মধ্যেই যে কাটিয়ে যায়, যে বাদুড় গুহার মধ্যে বাসা করেছে তারই মতো।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, ঝোড়ো হাওয়াটা গেছে থেমে, মেঘ এসেছে পাতলা হয়ে।

অমিত চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এ কী অন্যায় মাসিমা।'

'কেন বাবা, কী করেছি।'

'আমি যে একেবারে অপ্রস্তুত। শ্রীমতী লাবণ্য কী ভাববেন।'

'শ্রীমতী লাবণ্যকে একটু ভাবতে দেওয়াই তো দরকার। যা জানবার সবটাই যে জানা ভালো। এতে শ্রীযুক্ত অমিতের এত আশঙ্কা কেন।'

'শ্রীযুক্তের যা ঐশ্বর্য সেইটেই শ্রীমতীর কাছে জানাবার। আর, শ্রীহীনের যা দৈন্য সেইটে জানাবার জন্যেই আছ তুমি, আমার মাসিমা।'

'এমন ভেদবুদ্ধি কেন বাছা।'

'নিজের গরজেই। ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবি করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্বাদ। মানবসভ্যতায় লাবণ্য-দেবীরা জাগিয়েছেন ঐশ্বর্য, আর মাসিমারা এনেছেন আশীর্বাদ।'

'দেবীকে আর মাসিমাকে একাধারেই পাওয়া যেতে পারে অমিত; অভাব ঢাকবার দরকার হয় না।'

'এর জবাব কবির ভাষায় দিতে হয়। গদ্যে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝাবার জন্যে ছন্দের ভাষ্য দরকার হয়ে পড়ে। ম্যাথ্যু আর্নল্ড কাব্যকে বলেছেন, ক্রিটিসিজ্‌ম অফ লাইফ, আমি কথাটাকে সংশোধন করে বলতে চাই, লাইফ্‌স্‌ কমেন্টারি ইন্‌ ভার্স্‌। অতিথিবিশেষকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখি, যেটা পড়তে যাচ্ছি সে লেখাটা কোনো কবিসম্রাটের নয়—

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা
রিক্ত হাতে চাস নে তারে;
সিক্ত চোখে যাস নে দ্বারে।

ভেবে দেখবেন, ভালোবাসাই হচ্ছে পূর্ণতা, তার যা আকাঙ্ক্ষা সে তো দরিদ্রের কাঙালপনা নয়; দেবতা যখন তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন তখনি আসেন ভক্তের দ্বারে ভিক্ষা চাইতে।

রত্নমালা আনবি যবে
মাল্যবদল তখন হবে,
পাতবি কি তোর দেবীর আসন
শূন্য ধূলায় পথের ধারে।

সেইজন্যেই তো সম্প্রতি দেবীকে একটু হিসেব করে ঘরে ঢুকতে বলেছিলুম। পাতবার কিছুই নেই তো পাতব কী। এই ভিজে খবরের কাগজগুলো? আজকাল সম্পাদকী কালির দাগকে সবচেয়ে ভয় করি। কবি বলছেন, ডাকবার মানুষকে ডাকি যখন জীবনের পেয়ালা উছলে পড়ে, তাকে তৃষ্ণার শরিক হতে ডাকি নে।

পুষ্প-উদার চৈত্রবনে
বক্ষে ধরিস নিত্যধনে
লক্ষ শিখায় জ্বলবে যখন
দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে।

মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম তপস্যা দারিদ্র্যের—নগ্ন সন্ন্যাসীর স্নেহসাধনা। এই কুটীরে তারই কঠোর আয়োজন্। আমি তো ঠিক করে রেখেছি, এই কুটীরের নাম দেব মাসতুত বাংলো।'

'বাবা, জীবনের দ্বিতীয় তপস্যা ঐশ্বর্যের, দেবীকে বাঁ পাশে নিয়ে প্রেমসাধনা। এ কুটীরেও

তোমার সে সাধনা ভিজে কাগজে চাপা পড়বে না। বর পাই নি বলে নিজেকে ভোলাচ্ছ? মনে মনে নিশ্চয় জান পেয়েছ।'

এই বলে লাবণ্যকে অমিতর পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিতর ডান হাতের উপর রাখলেন। লাবণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দুজনের হাত বেঁধে বললেন, 'তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক।'

অমিত লাবণ্য দুজনে মিলে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। তিনি বললেন, 'তোমরা একটু বোসো, আমি বাগান থেকে কিছু ফুল নিয়ে আসি গে।'

বলে গাড়ি করে ফুল আনতে গেলেন। অনেকক্ষণ দুইজনে খাটিয়াটার উপরে পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল। এক সময়ে অমিতর মুখের দিকে মুখ তুলে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, 'আজ তুমি সমস্ত দিন গেলে না কেন।'

অমিত উত্তর দিলে, 'কারণটা এত বেশি তুচ্ছ যে, আজকের দিনে সে কথাটা মুখে আনতে সাহসের দরকার। ইতিহাসে কোনোখানে লেখে না যে, হাতের কাছে বর্ষাতি ছিল না বলে বাদলার দিনে প্রেমিক তার প্রিয়ার কাছে যাওয়া মুলতবি রেখেছে। বরঞ্চ লেখা আছে সাঁতার দিয়ে অগাধ জল পার হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা অন্তরের ইতিহাস, সেখানকার সমুদ্রে আমিও কি সাঁতার কাটছি নে ভাবছ। সে অকূল কোনোকালে কি পার হব।

> For we are bound where mariner has not yet dared to go,
> And we will risk the ship, ourselves and all.

> আমরা যাব যেখানে কোনো
> যায় নি নেয়ে সাহস করি,
> ডুবি যদি তো ডুবি-না কেন—
> ডুবুক সবি, ডুবুক তরী।

বন্যা, আমার জন্যে আজ তুমি অপেক্ষা করে ছিলে?'

'হাঁ মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। মনে হয়েছে, কত অসম্ভব দূর থেকে যে আসছ তার ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌঁছোলে আমার জীবনে।'

'বন্যা, আমার জীবনের মাঝখানটিতে ছিল এতকাল তোমাকে-না-জানার একটা প্রকাণ্ড কালো গর্ত। ঐখানটা ছিল সবচেয়ে কুশ্রী। আজ সেটা কানা ছাপিয়ে ভরে উঠল—তারই উপরে আলো ঝলমল করে, সমস্ত আকাশের ছায়া পড়ে, আজ সেইখানটাই হয়েছে সবচেয়ে সুন্দর। এই-যে আমি ক্রমাগতই কথা কয়ে যাচ্ছি, এ হচ্ছে ঐ পরিপূর্ণ প্রাণসরোবরের তরঙ্গধ্বনি; একে থামায় কে।'

'মিতা, তুমি আজ সমস্ত দিন কী করেছিলে।'

'মনের মাঝখানটাতে তুমি ছিলে, একেবারে নিস্তব্ধ। তোমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলুম—কোথায় সেই কথা। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে আর আমি কেবলই বলেছি, কথা দাও, কথা দাও!'

> O, what is this?
> Mysterious and uncapturable bliss
> That I have known, yet seems to be
> Simple as breath and easy as a smile,
> And older than the earth.

> একি রহস্য, একি আনন্দরাশি!
> জেনেছি তাহারে, পাই নি তবুও পেয়ে।

তবু সে সহজে প্রাণে উঠে নিশ্বাসি,
তবু সে সরল যেন রে সরল হাসি,
পুরানো সে যেন এই ধরণীর চেয়ে।

বসে বসে ঐ করি। পরের কথাকে নিজের কথা করে তুলি। সুর দিতে পারতুম যদি তবে সুর লাগিয়ে বিদ্যাপতির বর্ষার গানটাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতুম—

বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

যাকে না হলে চলে না তাকে না পেয়ে কী করে দিনের পর দিন কাটবে, ঠিক এই কথাটার সুর পাই কোথায়। উপরে চেয়ে কখনো বলি কথা দাও, কখনো বলি সুর দাও। কথা নিয়ে সুর নিয়ে দেবতা নেমেও আসেন, কিন্তু পথের মধ্যে মানুষ-ভুল করেন, খামকা আর-কাউকে দিয়ে বসেন—হয়তো-বা তোমাদের ঐ রবি ঠাকুরকে।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'রবি ঠাকুরকে যারা ভালোবাসে তারাও তোমার মতো এত বার বার করে তাঁকে স্মরণ করে না।'

'বন্যা, আজ আমি বড়ো বেশি বকছি, না? আমার মধ্যে বকুনির মন্‌সুন নেমেছে। ওয়েদার-রিপোর্ট যদি রাখ তো দেখবে, এক-এক দিনে কত ইঞ্চি পাগলামি তার ঠিকানা নেই। কলকাতায় যদি থাকতুম তোমাকে নিয়ে টায়ার ফাটাতে ফাটাতে মোটরে করে একেবারে মোরাদাবাদে দিতুম দৌড়। যদি জিজ্ঞাসা করতে মোরাদাবাদে কেন, তার কোনোই কারণ দেখাতে পারতুম না। বান যখন আসে তখন সে বকে, ছোটে, সময়টাকে হাসতে হাসতে ফেনার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।'

এমন সময় ডালিতে ভরে যোগমায়া সূর্যমুখী ফুল আনলেন। বললেন, 'মা লাবণ্য, এই ফুল দিয়ে আজ তুমি ওকে প্রণাম করো।'

এটা আর কিছু নয়, একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের ভিতরকার জিনিসকে বাইরে শরীর দেবার মেয়েলি চেষ্টা। দেহকে বানিয়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা ওদের রক্তে মাংসে।

আজ কোনো-এক সময়ে অমিত লাবণ্যকে কানে কানে বললে, 'বন্যা, একটি আংটি তোমাকে পরাতে চাই।'

লাবণ্য বললে, 'কী দরকার মিতা।'

'তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েছ সে কতখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ করতে পারি নে। কবিরা প্রিয়ার মুখ নিয়েই যত কথা কয়েছে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইশারা! ভালোবাসার যত-কিছু আদর, যত-কিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ, যত অনির্বচনীয় ভাষা, সব যে ঐ হাতে। আংটি তোমার আঙুলটিকে জড়িয়ে থাকবে আমার মুখের ছোটো একটি কথার মতো। সে কথাটি শুধু এই, 'পেয়েছি।' আমার এই কথাটি সোনার ভাষায় মানিকের ভাষায় তোমার হাতে থেকে যাক-না।'

লাবণ্য বললে, 'আচ্ছা, তাই থাক্‌।'

'কলকাতা থেকে আনতে দেব, বলো কোন্‌ পাথর তুমি ভালোবাস।'

'আমি কোনো পাথর চাই নে, একটিমাত্র মুক্তো থাকলেই হবে।'

'আচ্ছা, সেই ভালো। আমিও মুক্তো ভালোবাসি।'

১১

মিলন-তত্ত্ব

ঠিক হয়ে গেল, আগামী অঘ্রান মাসে এদের বিয়ে। যোগমায়া কলকাতায় গিয়ে সমস্ত আয়োজন করবেন।

লাবণ্য অমিতকে বললে, 'তোমার কলকাতায় ফেরবার দিন অনেককাল হল পেরিয়ে গেছে। অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁধা পড়ে তোমার দিন কেটে যাচ্ছিল। এখন ছুটি। নিঃসংশয়ে চলে যাও। বিয়ের আগে আমাদের আর দেখা হবে না।'

'এমন কড়া শাসন কেন।'

'সেদিন যে সহজ আনন্দের কথা বলেছিলে তাকে সহজ রাখবার জন্যে।'

'এটা একেবারে গভীর জ্ঞানের কথা। সেদিন তোমাকে কবি বলে সন্দেহ করেছিলুম, আজ সন্দেহ করছি ফিলজফার বলে। চমৎকার বলেছ। সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়। ছন্দকে সহজ করতে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় কষে আঁটতে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাব্যে কোথাও যতি দিতে মন সরে না, ছন্দ ভেঙে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন। আচ্ছা, কালই চলে যাব, একেবারে হঠাৎ, এই ভরা দিনগুলোর মাঝখান থেকে। মনে হবে যেন মেঘনাদবধ-কাব্যের সেই চমকে থেমে-যাওয়া লাইনটা—

> চলি যবে গেলা যমপুরে
> অকালে!

শিলঙ থেকে আমিই নাহয় চললুম, কিন্তু পাঁজি থেকে অঘ্রান মাস তো ফস করে পালাবে না। কলকাতায় গিয়ে কী করব জান।'

'কী করবে।'

'মাসিমা যতক্ষণ করবেন বিয়ের দিনের ব্যবস্থা ততক্ষণ আমাকে করতে হবে তার পরের দিনগুলোর আয়োজন। লোকে ভুলে যায়, দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন করে সৃষ্টি করা চাই। মনে আছে বন্যা, রঘুবংশে অজ-মহারাজা ইন্দুমতীর কী বর্ণনা করেছিলেন।'

লাবণ্য বললে, 'প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।'

অমিত বললে, 'সেই ললিত কলাবিধিটা দাম্পত্যেরই। অধিকাংশ বর্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেইজন্যে তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।'

'মিলনের আর্ট তোমার মনে কিরকম আছে বুঝিয়ে দাও। যদি আমাকে শিষ্যা করতে চাও আজই তার প্রথম পাঠ শুরু হোক।'

'আচ্ছা, তবে শোনো। ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায়, দামি জিনিসকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেননা, শক্ত করে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড়ো কম নয়।'

'দামের হিসাবটা শুনি।'

'রোসো, তার আগে আমার মনে যে ছবিটা আছে বলি। গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মন্ড-হারবারের ঐ দিকটাতে। ছোটো একটি স্টীম লঞ্চ্ করে ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে কলকাতায় যাতায়াত করা যায়।'

'আবার কলকাতায় কী দরকার পড়ল।'

'এখন কোনো দরকার নেই, সে কথা জান। যাই বটে বার-লাইব্রেরিতে, ব্যাবসা করি নে, দাবা খেলি। অ্যাটর্নিরা বুঝে নিয়েছে, কাজে গরজ নেই তাই মন নেই। কোনো আপসের মকদ্দমা

হলে তার ব্রীফ আমাকে দেয়, তার বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্তু বিয়ের পরেই দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে— জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমের মাঝখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয়; কিন্তু ঐ শক্তটাই সমস্ত আমের আশ্রয়, ঐটেতেই সে আকার পায়। কলকাতার পাথুরে আঁঠিটাকে কিসের জন্য দরকার বুঝেছ তো? মধুরের মাঝখানে একটা কঠিনকে রাখবার জন্যে।'

'বুঝেছি। তা হলে দরকার তো আমারও আছে। আমাকেও কলকাতায় যেতে হবে— দশটা-পাঁচটা।'

'দোষ কী। কিন্তু পাড়া-বেড়াতে নয়, কাজ করতে।'

'কিসের কাজ, বলো। বিনা মাইনেয়?'

'না না, বিনা মাইনের কাজ কাজও নয়, ছুটিও নয়, বারো আনা ফাঁকি। ইচ্ছে করলেই তুমি মেয়ে-কলেজে প্রোফেসারি নিতে পারবে।'

'আচ্ছা, ইচ্ছে করব। তার পর?'

'স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি— গঙ্গার ধার; পাড়ির নীচে-তলা থেকে উঠেছে ঝুরি-নামা অতি পুরোনো বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল তখন হয়তো এই বটগাছে নৌকো বেঁধে গাছতলায় রান্না চড়িয়েছিল। ওরই দক্ষিণ-ধারে ছ্যাৎলা-পড়া বাঁধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল ধরা, কিছু কিছু ধসে-যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে সাদায় রঙ-করা আমাদের ছিপ্‌ছিপে নৌকোখানি। তারই নীল নিশানে সাদা অক্ষরে নাম লেখা। কী নাম, বলে দাও তুমি।'

'বলব? মিতালি।'

'ঠিক নামটি হয়েছে— মিতালি। আমি ভেবেছিলুম সাগরী, মনে একটু গর্বও হয়েছিল। কিন্তু তোমার কাছে হার মানতে হল।...বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু একটি খাড়ি চলে গেছে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন বয়ে। তার ও পারে তোমার বাড়ি, এ পারে আমার।'

'রোজই কি সাঁতার দিয়ে পার হবে, আর জানলায় আমার আলো জ্বালিয়ে রাখব।'

'দেব সাঁতার মনে মনে, একটা কাঠের সাঁকোর উপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম মানসী; আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।'

'দীপক।'

'ঠিক নামটি হয়েছে। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার বাড়ির চুড়োয় বসিয়ে দেব। মিলনের সন্ধেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল। কলকাতা থেকে ফিরে এসে রোজ তোমার কাছ থেকে একটি চিঠি আশা করব। এমন হওয়া চাই— সে চিঠি পেতেও পারি, না পেতেও পারি। সন্ধে আটটার মধ্যে যদি না পাই তবে হতবিধিকে অভিসম্পাত দিয়ে বারট্রান্ড্‌ রাসেলের লজিক পড়বার চেষ্টা করব। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, অনাহূত তোমার বাড়িতে কোনো-মতেই যেতে পারব না।'

'আর তোমার বাড়িতে আমি?'

'ঠিক এক নিয়ম হলেই ভালো হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে সেটা অসহ্য হবে না।'

'নিয়মের ব্যতিক্রমটাই যদি নিয়ম হয়ে না ওঠে তা হলে তোমার বাড়িটার দশা কী হবে ভেবে দেখো বরঞ্চ আমি বুর্‌কা পরে যাব।'

'তা হোক, কিন্তু আমার নিমন্ত্রণচিঠি চাই। সে চিঠিতে আর-কিছু থাকবার দরকার নেই, কেবল কোনো-একটা কবিতা থেকে দুটি-চারটি লাইন মাত্র।'

'আর আমার নিমন্ত্রণ বুঝি বন্ধ? আমি একঘরে?'

'তোমার নিমন্ত্রণ মাসে একদিন, পূর্ণিমার রাতে— চোদ্দটা তিথির খণ্ডতা যেদিন চরম পূর্ণ হয়ে উঠবে।'

'এইবার তোমার প্রিয়শিষ্যাকে একটি চিঠির নমুনা দাও।'

'আচ্ছা বেশ।' পকেট থেকে একটা নোট-বই বের করে তার পাতা ছিঁড়ে লিখলে—

'Blow gently over my garden
Wind of the southern sea
In the hour my love cometh
And calleth me.

চুমিয়া যেয়ো তুমি
আমার বনভূমি
দখিন-সাগরের সমীরণ,
যে শুভখনে মম
আসিবে প্রিয়তম,
ডাকিবে নাম ধরে অকারণ।'

লাবণ্য কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে না।

অমিত বললে, 'এবারে তোমার চিঠির নমুনা দাও, দেখি, তোমার শিক্ষা কতদূর এগোল।'

লাবণ্য একটা টুকরো কাগজে লিখতে যাচ্ছিল। অমিত বললে, 'না, আমার এই নোট-বইয়ে লেখো।'

লাবণ্য লিখে দিলে—

'মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।'

অমিত বইটা পকেটে পুরে বললে, 'আশ্চর্য এই, আমি লিখেছি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেছ পুরুষের। কিছুই অসংগত হয় নি। শিমুলকাঠই হোক আর বকুলকাঠই হোক, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।'

লাবণ্য বললে, 'নিমন্ত্রণ তো করা গেল, তার পরে?'

অমিত বললে, 'সন্ধ্যাতারা উঠেছে, জোয়ার এসেছে গঙ্গায়, হাওয়া উঠল ঝিরঝির করে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠল স্রোতের ছলছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদিঘি, সেইখানে খিড়কির নির্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেছ। তোমার এক-একদিন এক-এক রঙের কাপড়, ভাবতে ভাবতে যাব আজকে সন্ধেবেলার রঙটা কী। মিলনের জায়গারও ঠিক নেই, কোনোদিন শান-বাঁধানো চাঁপাতলায়, কোনোদিন বাড়ির ছাতে, কোনোদিন গঙ্গার ধারের চাতালে। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মলমলের ধুতি আর চাদর পরব, পায়ে থাকবে হাতির-দাঁতে-কাজ-করা খড়ম। গিয়ে দেখব, গালচে বিছিয়ে বসেছ, সামনে রুপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এক কোণে জ্বলছে ধূপ। পুজোর সময় অন্তত দু মাসের জন্যে দুজনে বেড়াতে বেরোব। কিন্তু দুজনে দু জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্বতে, আমি যাব সমুদ্রে।—এই তো আমার দাম্পত্য দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলী তোমার কাছে দাখিল করা গেল। এখন তোমার কী মত।'

'মেনে নিতে রাজি আছি।'

'মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এই দুইয়ে যে তফাত আছে বন্যা।'

'তোমার যাতে প্রয়োজন আমার তাতে প্রয়োজন না-ও যদি থাকে তবু আপত্তি করব না।'

'প্রয়োজন নেই তোমার?'

'না, নেই। তুমি আমার যতই কাছে থাক তবু আমার থেকে তুমি অনেক দূরে। কোনো নিয়ম

দিয়ে সেই দূরত্বটুকু বজায় রাখা আমার পক্ষে বাহুল্য। কিন্তু আমি জানি, আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার কাছের দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সইতে পারবে; সেইজন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল করে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।'

অমিত চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার কাছে আমি হার মানতে পারব না বন্যা, যাক গে আমার বাগানটা। কলকাতার বাইরে এক পা নড়ব না। নিরঞ্জনদের আপিসে উপরের তলায় পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নেব। সেইখানে থাকবে তুমি, আর থাকব আমি। চিদাকাশে কাছে-দূরে ভেদ নেই। সাড়ে-তিন হাত চওড়া বিছানায় বাঁ পাশে তোমার মহল মানসী, ডান পাশে আমার মহল দীপক। ঘরের পূব-দেওয়ালে একখানা আয়নাওয়ালা দেরাজ, তাতেই তোমারও মুখ দেখা আর আমারও। পশ্চিম দিকে থাকবে বইয়ের আলমারি, পিঠ দিয়ে সেটা রোদ্দুর ঠেকাবে আর সামনের দিকে সেটাতে থাকবে দুটি পাঠকের একটিমাত্র সারকুলেটিং লাইব্রেরি। ঘরের উত্তর দিকটাতে একখানি সোফা, তারই বাঁ পাশে একটু জায়গা খালি রেখে আমি বসব এক প্রান্তে, তোমার কাপড়ের আলনার আড়ালে তুমি দাঁড়াবে, দু হাত তফাতে নিমন্ত্রণের চিঠিখানা উপরের দিকে তুলে ধরব কম্পিত হস্তে, তাতে লেখা থাকবে—

ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে
ওগো দক্ষিণ-হাওয়া,
প্রেয়সীর সাথে যে নিমেষে হবে
চারি চক্ষুতে চাওয়া।

এটা কি খারাপ শোনাচ্ছে বন্যা।'

'কিছু না মিতা। কিন্তু এটা সংগ্রহ হল কোথা থেকে।'

'আমার বন্ধু নীলমাধবের খাতা থেকে। তার ভাবী বধূ তখন অনিশ্চিত ছিল। তাকে উদ্দেশ করে ঐ ইংরেজি কবিতাটাকে কলকাত্তাই ছাঁচে ঢালাই করেছিল, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম। ইকনমিক্‌সে এম. এ. পাস করে পনেরো হাজার টাকা নগদ পণ আর আশি ভরি গয়নাসমেত নববধূকে লোকটা ঘরে আনলে, চার চক্ষে চাওয়াও হল, দক্ষিণে বাতাসও বয়, কিন্তু ঐ কবিতাটাকে আর ব্যবহার করতে পারলে না। এখন তার অপর শরিককে কাব্যটির সর্বস্বত্ব সমর্পণ করতে বাধবে না।'

'তোমারও ছাতে দক্ষিণে বাতাস বইবে, কিন্তু তোমার নববধূ কি চিরদিনই নববধূ থাকবে।'

টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বললে, 'থাকবে, থাকবে, থাকবে।'

যোগমায়া পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী থাকবে অমিত। আমার টেবিলটা বোধ হচ্ছে থাকবে না।'

'জগতে যা-কিছু টেকসই সবই থাকবে। সংসারে নববধূ দুর্লভ, কিন্তু লাখের মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ পাওয়া যায়, সে চিরদিনই থাকবে নববধূ।'

'একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।'

'একদিন সময় আসবে, দেখাব।'

'বোধ হচ্ছে তার কিছু দেরি আছে, ততক্ষণ খেতে চলো।

১২

শেষ সন্ধ্যা

আহার শেষ হলে অমিত বললে, 'কাল কলকাতায় যাচ্ছি মাসিমা। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সন্দেহ করছে আমি খাসিয়া হয়ে গেছি।'

'আত্মীয়স্বজনরা কি জানে, কথায় কথায় তোমার এত বদল সম্ভব।'

'খুব জানে। নইলে আত্মীয়স্বজন কিসের। তাই বলে কথায় কথায় নয়, আর খাসিয়া হওয়া নয়। যে বদল আজ আমার হল এ কি জাত-বদল। এ যে যুগ-বদল! তার মাঝখানে একটা কল্পান্ত। প্রজাপতি জেগে উঠেছেন আমার মধ্যে এক নূতন সৃষ্টিতে। মাসিমা, অনুমতি দাও, লাবণ্যকে নিয়ে আজ একবার বেড়িয়ে আসি। যাবার আগে শিলঙ পাহাড়কে আমাদের যুগল-প্রণাম জানিয়ে যেতে চাই।'

যোগমায়া সম্মতি দিলেন। কিছুদূরে যেতে যেতে দুজনের হাত মিলে গেল, ওরা কাছে কাছে এল ঘেঁষে। নির্জন পথের ধারে নীচের দিকে চলেছে ঘন বন। সেই বনের একটা জায়গায় পড়েছে ফাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দি থেকে একটুখানি ছুটি পেয়েছে; তার অঞ্জলি ভরিয়ে নিয়েছে অস্তসূর্যের শেষ আভায়। সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়াল। অমিত লাবণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরলে। লাবণ্যর চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে, যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে, সেই অমর্ত্যজগতের অব্যক্ত ধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে।

অমিতর বুকের কাছ থেকে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, 'চলো এবার।' কেমন তার মনে হল, এইখানে শেষ করা ভালো।

অমিত সেটা বুঝলে, কিছু বললে না। লাবণ্যর মুখ বুকের উপর একবার চেপে ধরে ফেরবার পথে খুব ধীরে ধীরে চলল।

বললে, 'কাল সকালেই আমাকে ছাড়তে হবে। তার আগে আর দেখা করতে আসব না।'

'কেন আসবে না।'

'আজ ঠিক জায়গায় আমাদের শিলঙ পাহাড়ের অধ্যায়টি এসে থামল—ইতি প্রথমঃ সর্গঃ, আমাদের সয়ে-বয়ে স্বর্গ।'

লাবণ্য কিছু বললে না, অমিতর হাত ধরে চলল। বুকের ভিতর আনন্দ, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্না স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে হল, জীবনে কোনোদিন এমন নিবিড় করে অভাবনীয়কে এত কাছে পাওয়া যাবে না। পরম ক্ষণে শুভদৃষ্টি হল, এর পরে আর কি বাসর-ঘর আছে। রইল কেবল মিলন আর বিদায় একত্র মিশিয়ে একটি শেষ প্রণাম। ভারি ইচ্ছে করতে লাগল অমিতকে এখনই সেই প্রণামটি করে; বলে, তুমি আমাকে ধন্য করেছ। কিন্তু সে আর হল না।

বাসার কাছাকাছি আসতেই অমিত বললে, 'বন্যা, আজ তোমার শেষ কথাটি একটি কবিতায় বলো, তা হলে সেটা মনে করে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তোমার নিজের যা মনে আছে এমন একটা-কিছু আমাকে শুনিয়ে দাও।'

লাবণ্য একটুখানি ভেবে আবৃত্তি করলে—

'তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব-হাসি,
নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।'

'বন্যা, বড়ো অন্যায় করলে। আজকের দিনে তোমার মুখে বলবার কথা এ নয়, কিছুতেই নয়। কেন এটা তোমার মনে এল। তোমার এ কবিতা এখনি ফিরিয়ে নাও।'

'ভয় কিসের মিতা। এই আগুনে-পোড়া প্রেম, এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না—এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে।'

'কিন্তু আমি জানতে চাই, এ কবিতা তুমি পেলে কোথায়।'

'রবি ঠাকুরের।'

'তার তো কোনো বইয়ে এটা দেখি নি।'

'বইয়ে বেরোয় নি।'

'তবে পেলে কী করে।'

'একটি ছেলে ছিল, সে আমার বাবাকে গুরু বলে ভক্তি করত। বাবা দিয়েছিলেন তাকে তার জ্ঞানের খাদ্য, এ দিকে তার হৃদয়টিও ছিল তাপস। সময় পেলেই সে যেত রবি ঠাকুরের কাছে, তাঁর খাতা থেকে মুষ্টিভিক্ষা করে আনত।'

'আর নিয়ে এসে তোমার পায়ে দিত।'

'সে সাহস তার ছিল না। কোথাও রেখে দিত, যদি আমার দৃষ্টিতে পড়ে, যদি আমি তুলে নিই।'

'তাকে দয়া করেছ?'

'করবার অবকাশ হল না। মনে মনে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন তাকে দয়া করেন।'

'যে কবিতাটি আজ তুমি পড়লে, বেশ বুঝতে পারছি, এটা সেই হতভাগারই মনের কথা।'

'হাঁ, তারই কথা বইকি।'

'তবে তোমার কেন আজ ওটা মনে পড়ল।'

'কেমন করে বলব। ঐ কবিতাটির সঙ্গে আর-এক টুকরো কবিতা ছিল, সেটাও আজ আমার কেন মনে পড়ছে ঠিক বলতে পারি নে—

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশ-বন্ধ টুটে।
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদশতদল।'

অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরে বললে, 'বন্যা, সে ছেলেটা আজ আমাদের মাঝখানে কেন এসে পড়ল। ঈর্ষা করতে আমি ঘৃণা করি, এ আমার ঈর্ষা নয়। কিন্তু কেমন একটা ভয় আসছে মনে। বলো, তার দেওয়া ঐ কবিতাগুলো আজই কেন তোমার এমন করে মনে পড়ে গেল।'

'একদিন সে যখন আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তার পরে যেখানে বসে সে লিখত সেই ডেস্কে এই কবিতাদুটি পেয়েছি। এর সঙ্গে রবি ঠাকুরের আরো অনেক অপ্রকাশিত কবিতা, প্রায় এক খাতা ভরা। আজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, হয়তো সেইজন্যেই বিদায়ের কবিতা মনে এল।'

'সে বিদায় আর এ বিদায় কি একই।'

'কেমন করে বলব। কিন্তু এ তর্কের তো কোনো দরকার নেই। যে কবিতা আমার ভালো লেগেছে তাই তোমাকে শুনিয়েছি, হয়তো এ ছাড়া আর কোনো কারণ এর মধ্যে নেই।'

'বন্যা, রবি ঠাকুরের লেখা যতক্ষণ না লোকে একেবারে ভুলে যাবে ততক্ষণ ওর ভালো লেখা সত্য করে ফুটে উঠবে না। সেইজন্যে ওর কবিতা আমি ব্যবহারই করি নে। দলের লোকের ভালো-লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে লাগিয়ে তার আলোটাকে ময়লা করে ফেলে।'

'দেখো মিতা, মেয়েদের ভালো-লাগা তার আদরের জিনিসকে আপন অন্দরমহলে একলা নিজেরই করে রাখে, ভিড়ের লোকের কোনো খবরই রাখে না। সে যত দাম দিতে পারে সব দিয়ে ফেলে, অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই করতে তার মন নেই।'

'তা হলে আমারও আশা আছে বন্যা। আমার বাজার-দরের ছোট্ট একটা ছাপ লুকিয়ে ফেলে তোমার আপন দরের মস্ত একটা মার্কা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব।'

'আমাদের বাড়ি নিকটে এসে পড়ল, মিতা। এবার তোমার মুখে তোমার পথ-শেষের কবিতাটা শুনে নিই।'

'রাগ কোরো না বন্যা, আমি কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আওড়াতে পারব না।'

'রাগ করব কেন।'

'আমি একটি লেখককে আবিষ্কার করেছি, তার স্টাইল—'

'তার কথা তোমার কাছে বরাবরই শুনতে পাই। কলকাতায় লিখে দিয়েছি, তার বই পাঠিয়ে দেবার জন্যে।'

'সর্বনাশ! তার বই! সে লোকটার অন্য অনেক দোষ আছে, কিন্তু কখনো বই ছাপতে দেয় না। তার পরিচয় আমার কাছ থেকে তোমাকে ক্রমে ক্রমে পেতে হবে। নইলে হয়তো—'

'ভয় কোরো না মিতা, তুমি তাকে যেভাবে বোঝ আমিও তাকে সেইভাবেই বুঝে নেব, এমন ভরসা আমার আছে। আমারই জিত থাকবে।'

'কেন।'

'আমার ভালো লাগায় যা পাই সেও আমার, আর তোমার ভালো লাগায় যা পাব সেও আমার হবে। আমার নেবার অঞ্জলি হবে দুজনের মনকে মিলিয়ে। কলকাতায় তোমার ছোটো ঘরের বইয়ের আলমারিতে এক শেলফেই দুই কবির কবিতা ধরাতে পারব। এখন তোমার কবিতাটি বলো।'

'আর বলতে ইচ্ছে করছে না। মাঝখানে বড্ডো কতকগুলো তর্কবিতর্ক হয়ে হাওয়াটা খারাপ হয়ে গেল।'

'কিচ্ছু খারাপ হয় নি, হাওয়া ঠিক আছে।'

অমিত তার কপালের চুলগুলো কপালের থেকে উপরের দিকে তুলে দিয়ে খুব দরদের সুর লাগিয়ে পড়ে গেল—

'সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

বুঝেছ বন্যা, চাঁদ ডাক দিয়েছে শুকতারাকে, সে আপনার রাত-পোহাবার সঙ্গিনীকে চায়। নিজের রাতটার 'পরে ওর বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোকরেখারন্ধ্র।

ওর এই আধখানা জাগা, ঐ অল্প একটুখানি আলো, আঁধারটাকে সামান্য খানিকটা আঁচড়ে দিয়েছে। এই হল ওর খেদ। এই স্বল্পতার জালে ওকে জড়িয়ে ফেলেছে, সেইটে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে ও যেন সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে ঘুমোতে গুমরে উঠছে। কী আইডিয়া! গ্র্যান্ড!

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য।
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু এমন হালকা করে বাঁচার বোঝাটা যে বড়ো বেশি; যে নদীর জল মরেছে তার মন্থর স্রোতের ক্লান্তিতে জঞ্জাল জমে, যে স্বল্প সে নিজেকে বইতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়। তাই ও বলছে—

মন্দচরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে,
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

কিন্তু এই ক্লান্তিতেই কি ওর শেষ। ওর ঢিলে তারের বীণাকে নতুন করে বাঁধবার আশা ও পেয়েছে, দিগন্তের ও পারে কার পায়ের শব্দ ও যেন শুনল—

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ।
স্বপ্নে যে বাণী হল হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

উদ্ধারের আশা আছে, কানে আসছে জাগ্রত বিশ্বের বিপুল কলরব, সেই মহাপথের দূতী তার প্রদীপ হাতে করে এল বলে—

নিশীথের তল হতে তুলি
লহো তারে প্রভাতের জন্য।
আঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি,
আলোকে তাহারে করো ধন্য।
যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্দ্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।

এই হতভাগা চাঁদটা তো আমি। কাল সকালবেলা চলে যাব। কিন্তু চলে যাওয়াকে তো শূন্য রাখতে চাই নে। তার উপরে আবির্ভাব হবে সুন্দরী শুকতারার, জাগরণের গান নিয়ে। অন্ধকার জীবনের

স্বপ্নে এতদিন যা অস্পষ্ট ছিল, সুন্দরী শুকতারা তাকে প্রভাতের মধ্যে সম্পূর্ণ করে দেবে। এর মধ্যে একটা আশার জোর আছে, ভাবী প্রত্যুষের একটা উজ্জ্বল গৌরব আছে, তোমার ঐ রবি ঠাকুরের কবিতার মতো মিইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয়।'

'রাগ কর কেন মিতা। রবি ঠাকুর যা পারে তার বেশি সে পারে না, এ কথা বার বার বলে লাভ কী।'

'তোমরা সবাই মিলে তাকে নিয়ে বড়ো বেশি—'

'ও কথা বোলো না মিতা। আমার ভালো-লাগা আমারই, তাতে যদি আর-কারও সঙ্গে আমার অমিল হয় বা তোমার সঙ্গে মিল না হয়, সেটাতে কি আমার দোষ। নাহয় কথা রইল, তোমার সেই পঁচাত্তর টাকার বাসায় একদিন আমার যদি জায়গা হয় তা হলে তোমার কবির লেখা আমাকে শুনিয়ো, আমার কবির লেখা তোমাকে শোনাব না।'

'কথাটা অন্যায় হল যে। পরস্পর পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন করবে, এইজন্যেই তো বিবাহ।'

'রুচির জুলুম তোমার কিছুতেই সইবে না। রুচির ভোজে তোমরা নিমন্ত্রিত ছাড়া কাউকে ঘরে ঢুকতে দাও না, আমি অতিথিকেও আদর করে বসাই।'

'ভালো করলুম না তর্ক তুলে। আমাদের এখানকার এই শেষ সন্ধ্যাবেলার সুর বিগড়ে গেল।'

'একটুও না। যা-কিছু বলবার আছে সব স্পষ্ট করে বলেও যে সুরটা খাঁটি থাকে সেই আমাদের সুর। তার মধ্যে ক্ষমার অন্ত নেই।'

'আজ আমার মুখের বিস্বাদ ঘোচাতেই হবে। কিন্তু বাংলা কাব্যে হবে না। ইংরেজি কাব্যে আমার বিচারবুদ্ধি অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে। প্রথমে দেশে ফিরে এসে আমিও কিছুদিন প্রোফেসারি করেছিলুম।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'আমাদের বিচারবুদ্ধি ইংরেজ-বাড়ির বুল্‌ডগের মতো—ধুতির কোঁচাটা দুলছে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ধুতির মহলে কোন্‌টা ভদ্র ও তার হিসেব পায় না। বরঞ্চ খানসামার তকমা দেখলে লেজ নাড়ে।'

'তা মানতেই হবে। পক্ষপাত-জিনিসটা স্বাভাবিক জিনিস নয়। অধিকাংশ স্থলেই ওটা ফরমাশে তৈরি। ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কান-মলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। সেই অভ্যেসের জোরেই এক পক্ষকে মন্দ বলতে যেমন সাহস হয় না, অন্য পক্ষকে ভালো বলতেও তেমনি সাহসের অভাব ঘটে। থাক্‌ গে, আজ নিবারণ চক্রবর্তীও না, আজ একেবারে নিছক ইংরেজি কবিতা—বিনা তর্জমায়।'

'না না মিতা, তোমার ইংরেজি থাক্‌, সেটা বাড়ি গিয়ে টেবিলে বসে হবে। আজ আমাদের এই সন্ধেবেলাকার শেষ কবিতাটি নিবারণ চক্রবর্তীর হওয়াই চাই। আর-কারও নয়।'

অমিত উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'জয় নিবারণ চক্রবর্তীর! এতদিনে সে হল অমর। বন্যা, তাকে আমি তোমার সভাকবি করে দেব। তুমি ছাড়া আর-কারও দ্বারে সে প্রসাদ নেবে না।'

'তাতে কি সে বরাবর সন্তুষ্ট থাকবে।'

'না থাকে তো তাকে কান মলে বিদায় করে দেব।'

'আচ্ছা, কান-মলার কথা পরে স্থির করব; এখন শুনিয়ে দাও।'

অমিত আবৃত্তি করতে লাগল—

'কত ধৈর্য ধরি
ছিলে কাছে দিবসশর্বরী।
তব পদ-অঙ্কনগুলিরে
কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্যপথের ধূলিরে।

আজ যবে
দূরে যেতে হবে
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয়গান।
কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি,
শূন্যে গেছে চলি
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী।
কতবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।
এবার তোমার আগমন
হোমহুতাশন
জ্বেলেছে গৌরবে।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।
আমার আহুতি দিনশেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।
লহো এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণপরিণাম।
এ প্রণতি-'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহভরে,
তোমার ঐশ্বর্য-মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান।'

১৩

আশঙ্কা

সকালবেলায় কাজে মন দেওয়া আজ লাবণ্যর পক্ষে কঠিন। সে বেড়াতেও যায় নি। অমিত বলেছিল, শিলঙ থেকে যাবার আগে আজ সকালবেলায় সে ওদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না, সেই পণটাকে রক্ষা করবার ভার দুজনেরই উপর। কেননা, যে রাস্তায় ও বেড়াতে যায় সেই রাস্তা দিয়েই অমিতকে যেতে হবে। মনে তাই লোভ ছিল যথেষ্ট। সেটাকে কষে দমন করতে হল। যোগমায়া খুব সকালেই স্নান সেরে তাঁর আহ্নিকের জন্য কিছু ফুল তোলেন। তিনি বেরোবার আগেই লাবণ্য সে জায়গাটা থেকে চলে এল য়ুক্যালিপ্‌টাস-তলায়। হাতে দুই-একটা বই ছিল, বোধ হয় নিজেকে এবং অন্যদেরকে ভোলাবার জন্যে। তার পাতা খোলা; কিন্তু বেলা যায়, পাতা ওলটানো হয় না। মনের মধ্যে কেবলই বলছে, জীবনের মহোৎসবের দিন কাল শেষ হয়ে গেল। আজ সকালে এক-একবার

মেঘরৌদ্রের মধ্যে দিয়ে ভাঙনের দূত আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, অমিত চিরপলাতক, একবার সে সরে গেলে আর তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। রাস্তায় চলতে চলতে কখন সে গল্প শুরু করে, তার পর রাত্রি আসে, পরদিন সকালে দেখা যায়, গল্পের গাঁথন ছিন্ন, পথিক গেছে চলে। লাবণ্য তাই ভাবছিল, ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের মতো রইল বাকি। আজ সেই অসমাপ্তির ম্লানতা সকালের আলোয়, অকাল-অবসানের অবসাদ আর্দ্র হাওয়ার মধ্যে।

এমন সময়, বেলা তখন ন'টা, অমিত দুম্‌দাম-শব্দে ঘরে ঢুকেই "মাসিমা" "মাসিমা" করে ডাক দিলে। যোগমায়া প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে ভাঁড়ারের কাজে প্রবৃত্ত। আজ তাঁরও মনটা পীড়িত। অমিত তার কথায় হাসিতে চাঞ্চল্যে এতদিন তাঁর স্নেহাসক্ত মনকে, তাঁর ঘরকে ভরে রেখেছিল। সে চলে গেছে এই ব্যথার বোঝা নিয়ে তাঁর সকালবেলাটা যেন বৃষ্টিবিন্দুর ভারে সদ্যঃপাতী ফুলের মতো নুয়ে পড়েছে। তাঁর বিচ্ছেদকাতর ঘরকন্নার কাজে আজ তিনি লাবণ্যকে ডাকেন নি; বুঝেছিলেন, আজ তার দরকার ছিল একলা থাকার, লোকের চোখের আড়ালে।

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, কোলের থেকে বই গেল পড়ে, জানতেও পারলে না। এ দিকে যোগমায়া ভাঁড়ারঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী বাবা অমিত, ভূমিকম্প নাকি।'

'ভূমিকম্পই তো। জিনিসপত্র রওনা করে দিয়েছি; গাড়ি ঠিক; ডাকঘরে গেলুম দেখতে চিঠিপত্র কিছু আছে কি না। সেখানে এক টেলিগ্রাম।'

অমিতর মুখের ভাব দেখে যোগমায়া উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খবর সব ভালো তো?'

লাবণ্যও ঘরে এসে জুটল। অমিত ব্যাকুল মুখে বললে, 'আজই সন্ধেবেলায় আসছে সিসি, আমার বোন, তার বন্ধু কেটি মিত্তির, আর তার দাদা নরেন।'

'তা ভাবনা কিসের বাছা। শুনেছি, ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে একটা বাড়ি খালি আছে। যদি নিতান্ত না পাওয়া যায় আমার এখানে কি একরকম করে জায়গা হবে না।'

'সেজন্যে ভাবনা নেই মাসি। তারা নিজেরাই টেলিগ্রাফ করে হোটেলে জায়গা ঠিক করেছে।'

'আর যাই হোক বাবা, তোমার বোনেরা এসে যে দেখবে তুমি ঐ লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে আছ সে কিছুতেই হবে না। তারা আপন লোকের খ্যাপামির জন্যে দায়িক করবে আমাদেরকেই।'

'না মাসি, আমার প্যারাডাইস লস্ট। ঐ নগ্ন আসবাবের স্বর্গ থেকে আমার বিদায়। সেই দড়ির খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখস্বপ্নগুলো উড়ে পালাবে। আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতিপরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতিসভ্য কামরায়।'

কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তবু লাবণ্যর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এতদিন একটা কথা ওর মনেও আসে নি যে, অমিতর যে সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্তেই সেটা বুঝতে পারলে। অমিত যে আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছিল তার মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মূর্তি ছিল না। কিন্তু এই-যে আজ ও হোটেলে যেতে বাধ্য হল এইটেতেই লাবণ্য বুঝলে, যে-বাসা এতদিন ওরা দুজনে নানা অদৃশ্য উপকরণে গড়ে তুলছিল সেটা কোনোদিন বুঝি আর দৃশ্য হবে না।

লাবণ্যর দিকে একটু চেয়ে অমিত যোগমায়াকে বললে, 'আমি হোটেলেই যাই আর জাহান্নমেই যাই, কিন্তু এইখানেই রইল আমার আসল বাসা।'

অমিত বুঝেছে, শহর থেকে আসছে একটা অশুভ দৃষ্টি। মনে মনে নানা প্ল্যান করছে যাতে সিসির দল এখানে না আসতে পারে। কিন্তু ইদানীং ওর চিঠিপত্র আসছিল যোগমায়ার বাড়ির ঠিকানায়, তখন ভাবে নি কোনো সময়ে তাতে বিপদ ঘটতে পারে। অমিতর মনের ভাবগুলো চাপা থাকতে চায় না, এমন-কি প্রকাশ পায় কিছু আতিশয্যের সঙ্গে। ওর বোনের আসা সম্বন্ধে অমিতর এত বেশি উদ্‌বেগ যোগমায়ার কাছে অসংগত ঠেকেছিল। লাবণ্যও ভাবলে, অমিত ওকে নিয়ে বোনেদের কাছে লজ্জিত। ব্যাপারটা লাবণ্যর কাছে বিস্বাদ ও অসম্মানজনক হয়ে দাঁড়াল।

অমিত লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার কি সময় আছে। বেড়াতে যাবে?'

লাবণ্য একটু যেন কঠিন করে বললে, 'না, সময় নেই।'

যোগমায়া ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'যাও-না মা, বেড়িয়ে এসো গে।'

লাবণ্য বললে, 'কর্তামা, কিছুকাল থেকে সুরমাকে পড়ানোয় বড়ো অবহেলা হয়েছে। খুবই অন্যায় করেছি। কাল রাত্রেই ঠিক করেছিলুম, আজ থেকে কিছুতেই আর ঢিলেমি করা হবে না।' বলে লাবণ্য ঠোঁট চেপে মুখ শক্ত করে রইল।

লাবণ্যর এই জেদের মেজাজটা যোগমায়ার পরিচিত। পীড়াপীড়ি করতে সাহস করলেন না।

অমিতও নীরস কণ্ঠে বললে, 'আমিও চললুম কর্তব্য করতে, ওদের জন্যে সব ঠিক করে রাখা চাই।'

এই বলে চলে যাবার আগে বারান্দায় একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। বললে, 'বন্যা, ঐ চেয়ে দেখো। গাছের আড়াল থেকে আমার বাড়ির চালটা অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি, ঐ বাড়িটা কিনে নিয়েছি। বাড়ির মালেক অবাক। নিশ্চয় ভেবেছে, ওখানে সোনার গোপন খনি আবিষ্কার করে থাকব। দাম বেশ-একটু চড়িয়ে নিয়েছে। ওখানে সোনার খনির সন্ধান তো পেয়েইছিলুম, সে সন্ধান একমাত্র আমিই জানি। আমার জীর্ণ কুটিরের ঐশ্বর্য সবার চোখ থেকে লুকোনো থাকবে।'

লাবণ্যর মুখে গভীর একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। বললে, 'আর-কারও কথা অত করে তুমি ভাব কেন। নাহয় আর-সবাই জানতে পারলে। ঠিকমত জানতে পারাই তো চাই, তা হলে কেউ অমর্যাদা করতে সাহস করে না।'

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অমিত বললে, 'বন্যা, ঠিক করে রেখেছি বিয়ের পরে ঐ বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাকব। আমার সেই গঙ্গার ধারের বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ, সব মিলিয়ে গেছে ঐ বাড়িটার মধ্যে। তোমার দেওয়া মিতালি নাম ওকেই সাজে।'

'ও বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেছ মিতা। আবার একদিন যদি ঢুকতে চাও দেখবে, ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। সেদিন তুমি বলেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্র্যের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্যের। তার পরে শেষ সাধনার কথা বল নি; সেটা হচ্ছে ত্যাগের।'

'বন্যা, ওটা তোমাদের রবি ঠাকুরের কথা। সে লিখেছে, শাজাহান আজ তার তাজমহলকেও ছাড়িয়ে গেল। একটা কথা তোমার কবির মাথায় আসে নি যে, আমরা তৈরি করি তৈরি-জিনিসকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই। বিশ্বসৃষ্টিতে ঐটেকেই বলে এভোল্যুশন। একটা অনাসৃষ্টি-ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে, বলে, সৃষ্টি করো; সৃষ্টি করলেই ভূত নামে, তখন সৃষ্টিটাকেও আর দরকার থাকে না। কিন্তু তাই বলে ঐ ছেড়ে-যাওয়াটাই চরম কথা নয়। জগতে শাজাহান-মমতাজের অক্ষয় ধারা বয়ে চলেছেই। ওরা কি একজন মাত্র। সেইজন্যেই তো তাজমহল কোনোদিন শূন্য হতেই পারল না। নিবারণ চক্রবর্তী বাসরঘরের উপর একটা কবিতা লিখেছে— সেটা তোমাদের কবিবরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, পোস্ট্‌কার্ডে লেখা—

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।
হায় রে বাসরঘর,
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙে-চোরে,
মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন করে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন;

তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।
কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতল।
যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রী-মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার-পানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না। বন্যা, কবি কি বলে যে, আমরাও দুজন যেদিন ঐ দরজায় ঘা দেব, দরজা খুলবে না।'

'মিনতি রাখো মিতা, আজ সকালে কবির লড়াই তুলো না। তুমি কি ভাবছ প্রথম দিন থেকেই আমি জানতে পারি নি যে তুমিই নিবারণ চক্রবর্তী। কিন্তু তোমার ঐ কবিতার মধ্যে এখনি আমাদের ভালোবাসার সমাধি তৈরি করতে শুরু কোরো না, অন্তত তার মরার জন্যে অপেক্ষা কোরো।'

অমিত আজ নানা বাজে কথা বলে ভিতরের কোন্-একটা উদ্‌বেগকে চাপা দিতে চায়, লাবণ্য তা বুঝেছিল।

অমিতও বুঝতে পেরেছে, কাব্যের দ্বন্দ্ব কাল সন্ধেবেলায় বেখাপ হয় নি, আজ সকালবেলায় তার সুর কেটে যাচ্ছে। কিন্তু সেইটে যে লাবণ্যর কাছে সুস্পষ্ট সেও ওর ভালো লাগল না। একটু নীরসভাবে বললে, 'তা হলে আমি যাই, বিশ্বজগতে আমারও কাজ আছে, আপাতত সে হচ্ছে হোটেল-পরিদর্শন। ও দিকে লক্ষ্মীছাড়া নিবারণ চক্রবর্তীর ছুটির মেয়াদ এবার ফুরোল বুঝি।'

তখন লাবণ্য অমিতর হাত ধরে বললে, 'দেখো মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা করতে পার। যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ো না।' এই বলে চোখের জল ঢাকবার জন্যে দ্রুত অন্য ঘরে গেল।

অমিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে যেন অন্যমনে গেল য়ুক্যালিপ্‌টাস-তলায়। দেখলে, সেখানে আখরোটের গোটাকতক ভাঙা খোলা ছড়ানো। দেখেই ওর মনটার ভিতর কেমন-একটা ব্যথা চেপে ধরলে। জীবনের ধারা চলতে চলতে তার যে-সব চিহ্ন বিছিয়ে যায় সেগুলোর তুচ্ছতাই সবচেয়ে সকরুণ। তার পরে দেখলে, ঘাসের উপর একটা বই, সেটা রবি ঠাকুরের 'বলাকা'। তার নীচের পাতাটা ভিজে গেছে। একবার ভাবলে, ফিরিয়ে দিয়ে আসি গে, কিন্তু ফিরিয়ে দিলে না, সেটা নিল পকেটে। হোটেলে যাব-যাব করলে, তাও গেল না; বসে পড়ল গাছতলাটাতে। রাত্রের ভিজে মেঘে আকাশটাকে খুব করে মেজে দিয়েছে। ধুলো-ধোয়া বাতাসে অত্যন্ত স্পষ্ট করে প্রকাশ পাচ্ছে চার দিকের ছবিটা; পাহাড়ের আর গাছপালার সীমান্ত-গুলি যেন ঘননীল আকাশে খুদে-দেওয়া, জগৎটা যেন কাছে এগিয়ে একেবারে মনের উপরে ঠেকল। আস্তে আস্তে বেলা চলে যাচ্ছে, তার ভিতরটাতে ভৈরবীর সুর।

এখনি খুব কষে কাজে লাগবে বলে লাবণ্যের পণ ছিল, তবু যখন দূর থেকে দেখলে অমিত গাছতলায় বসে, তখন আর থাকতে পারলে না, বুকের ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠল, চোখ এল জলে ছলছলিয়ে। কাছে এসে বললে, 'মিতা, তুমি কী ভাবছ।'

'এতদিন যা ভাবছিলুম একেবারে তার উলটো।'

'মাঝে মাঝে মনটাকে উলটিয়ে না দেখলে তুমি ভালো থাক না। তা তোমার উলটো ভাবনাটা কিরকম শুনি।'

'তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতদিন কেবলি ঘর বানাচ্ছিলুম—কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে। আজ মনের মধ্যে জাগছে সকালবেলাকার আলোয় উদাস-করা একটা পথের ছবি—অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ঐ পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে। হাতে আছে লোহার-ফলা-ওয়ালা লম্বা লাঠি, পিঠে আছে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি। তুমি চলবে সঙ্গে। তোমার নাম সার্থক হোক বন্যা, তুমি আমাকে বন্ধ ঘর থেকে বের করে পথে ভাসিয়ে নিয়ে চললে বুঝি। ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দুজনের।'

'ডায়মন্ডহারবারের বাগানটা তো গেছেই, তার পরে সেই প'চাত্তর টাকার ঘর-বেচারাও গেল। তা যাক গে। কিন্তু চলবার পথে বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটা কিরকম করবে। দিনান্তে তুমি এক পান্থশালায় ঢুকবে, আর আমি আর-একটাতে?'

'তার দরকার হয় না বন্যা। চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরোনো হবার সময় পাওয়া যায় না। বসে-থাকাটাই বুড়োমি।'

'হঠাৎ এ খেয়ালটা তোমার কেন মনে হল মিতা।'

'তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়—রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-ওয়ালা। ভারত-ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান করবে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়। আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।'

লাবণ্যর বুকের ভিতরে হঠাৎ খুব একটা ধাক্কা দিলে। কথাটাকে বাধা দিয়ে অমিতকে বললে, 'শোভনলালের সঙ্গে একই বৎসর আমি এম.এ. দিয়েছি। তার সব খবরটা শুনতে ইচ্ছে করে।'

'এক সময়ে সে খেপেছিল, আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত করবে। ঐ রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রা, ঐ রাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজান্ডারের রণযাত্রা। খুব কষে পুশতু পড়লে, পাঠানি কায়দাকানুন অভ্যেস করলে। সুন্দর চেহারা, ঢিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখতে হয় না, দেখায় যেন পারসিকের মতো। আমাকে এসে ধরলে, সেখানে যে ফরাসি পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন, তাঁদের কাছে পরিচয়পত্র দিতে। ফ্রান্সে থাকতে তাঁদের কারও কারও কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন্তু ভারত-সরকারের ছাড়চিঠি জুটল না। তার পর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কখনো কাশ্মীরে কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েছে, হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের রাস্তা এ দিক দিয়ে কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ঐ পথ-খেপাটার কথা মনে করে আমারও মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ঐ পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানববিধাতার নিজের হাতে লেখা। আমার কী মনে হয় জান?'

'কী, বলো।'

'প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন্ কাঁকন-পরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানি নে, কিন্তু একদিন ওতে-আমাতে একলা ছিলুম, নানা কথায় হল প্রায় রাত দুপুর, জানলার বাইরে হঠাৎ চাঁদ দেখা দিল একটা ফুলন্ত জারুলগাছের আড়ালে, ঠিক সেই সময়টাতে কোনো-একজনের কথা বলতে গেল। নাম করলে না, বিবরণ কিছুই বললে না, অল্প একটু আভাস দিতেই গলা ভার হয়ে এল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল। বুঝতে পারলুম, ওর জীবনের মধ্যে কোন্খানে অত্যন্ত একটা নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চলতে চলতে ও পায়ে পায়ে খইয়ে দিতে চায়।'

লাবণ্যর হঠাৎ উদ্ভিদ্তত্ত্বের ঝোঁক এল, নুয়ে পড়ে দেখতে লাগল ঘাসের মধ্যে সাদায়-হলদেয়-মেলানো একটা বুনো ফুল। একান্ত মনোযোগে তার পাপড়িগুলো গুনে দেখার জরুরি দরকার পড়ল।

অমিত বললে, 'জান বন্যা, আমাকে তুমি আজ পথের দিকে ঠেলে দিয়েছ।'

'কেমন করে।'

'আমি ঘর বানিয়েছিলুম। আজ সকালে তোমার কথায় মনে হল, তুমি তার মধ্যে পা দিতে কুণ্ঠিত। আজ দু মাস ধরে মনে মনে ঘর সাজালুম। তোমাকে ডেকে বললুম, এসো বধূ, ঘরে এসো। তুমি আজ বধূসজ্জা খসিয়ে ফেললে, বললে, এখানে জায়গা হবে না বন্ধু, চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদীগমন হবে।'

বনফুলের বটানি আর চলল না। লাবণ্য হঠাৎ উঠে পড়ে ক্লিষ্টস্বরে বললে, 'মিতা, আর নয়, সময় নেই।'

১৪

ধূমকেতু

এতদিন পরে অমিত একটা কথা আবিষ্কার করেছে যে, লাবণ্যর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা শিলঙ-সুদ্ধ বাঙালি জানে। গভর্মেন্ট আপিসের কেরানিদের প্রধান আলোচ্য বিষয়— তাদের জীবিকাভাগ্যগগনে কোন্ গ্রহ রাজা হৈল কে বা মন্ত্রিবর। এমন সময় তাদের চোখে পড়ল মানবজীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে এক যুগ্মতারার আবর্তন, একেবারে ফার্স্ট্ ম্যাগ্নিচ্যুডের আলো। পর্যবেক্ষকদের প্রকৃতি অনুসারে এই দুটি নবদীপ্যমান জ্যোতিষ্কের আগ্নেয় নাট্যের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা চলছে।

পাহাড়ে হাওয়া খেতে এসে এই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়েছিল কুমার মুখুজ্জে— অ্যাটর্নি। সংক্ষেপে কেউ তাকে বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো! সিসিদের মিত্রগোষ্ঠীর অন্তশ্চর নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি, অর্থাৎ জানাশোনার দলে। অমি তাকে ধূমকেতু মুখো নাম দিয়েছিল। তার একটা কারণ সে এদের দলের বাইরে, তবু সে মাঝে মাঝে এদের কক্ষপথে পুচ্ছ বুলিয়ে যায়। সকলেই আন্দাজ করে, যে গ্রহটি তাকে বিশেষ করে টান মারছে তার নাম লিসি। এই নিয়ে সকলেই কৌতুক অনুভব করে, কিন্তু লিসি স্বয়ং এতে ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত। তাই লিসি প্রায়ই প্রবল বেগে এর পুচ্ছমর্দন করে চলে যায়, কিন্তু দেখতে পাই, তাতে ধূমকেতুর লেজার বা মুড়োর কোনোই লোকসান হয় না।

অমিত শিলঙের রাস্তায়-ঘাটে মাঝে মাঝে কুমার মুখোকে দূর থেকে দেখেছে। তাকে না দেখতে পাওয়া শক্ত। বিলেতে আজও যায় নি বলে তার বিলিতি কায়দা খুব উৎকটভাবে প্রকাশমান। তার মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা দীর্ঘ মোটা চুরুট থাকে, এইটেই তার ধূমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ। অমিত তাকে দূর থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে ভুলিয়েছে যে, ধূমকেতু বুঝি সেটা বুঝতে পারে নি। কিন্তু দেখেও দেখতে না পাওয়াটা একটা বড়ো বিদ্যের অন্তর্গত, চুরিবিদ্যের মতোই। তার সার্থকতার প্রমাণ হয়, যদি না পড়ে ধরা। তাতে প্রত্যক্ষ দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ পার করে দেখবার পারদর্শিতা চাই।

কুমার মুখো শিলঙের বাঙালিসমাজ থেকে এমন অনেক কথা সংগ্রহ করেছে যাকে মোটা অক্ষরে শিরোনামা দেওয়া যেতে পারে "অমিত রায়ের অমিতাচার"। মুখে সব-চেয়ে নিন্দে করেছে যারা, মনে সব-চেয়ে রসভোগ করেছে তারাই। যকৃতের বিকৃতি-শোধনের জন্যে কুমার কিছুদিন এখানে থাকবে বলেই স্থির ছিল, কিন্তু জনশ্রুতিবিস্তারের উগ্র উৎসাহে তাকে পাঁচদিনের মধ্যে কলকাতায় ফেরালে। সেখানে গিয়ে অমিত সম্বন্ধে তার চুরুটধূমাবৃত অত্যুক্তি-উদ্গারে সিসি-লিসি-মহলে কৌতুকে কৌতূহলে জড়িত বিভীষিকা উৎপাদন করলে।

অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই এতক্ষণে অনুমান করে থাকবেন যে, সিসি-দেবতার বাহন হচ্ছে কেটি

মিস্তিরের দাদা নরেন। তার অনেক দিনের একনিষ্ঠ বাহন-দশা এবার বৈবাহনের দশম দশায় উত্তীর্ণ হবে, এমন কথা উঠেছে। সিসি মনে মনে রাজি। কিন্তু যেন রাজি নয় ভাব দেখিয়ে একটা প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে রেখেছে। অমিতর সম্মতিসহায়ে নরেন এই সংশয়টুকু পার হতে পারবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু অমিত হাম্বাগটা না ফেরে কলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব। ইংরেজি যতগুলো গর্হিত শব্দভেদী বাক্য তার জানা ছিল সবগুলিই প্রকাশ্যে ও স্বগত উক্তিতে নিরুদ্দেশ অমিতর প্রতি নিক্ষেপ করেছে। এমন-কি, তারযোগে অত্যন্ত বে-তার বাক্য শিলঙে পাঠাতে ছাড়ে নি— কিন্তু উদাসীন নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে উদ্ধত হাউয়ের মতো কোথাও তার কোনো দাহরেখা রইল না। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল, অবস্থাটার সরেজমিন তদন্ত হওয়া দরকার। সর্বনাশের স্রোতে অমিতর ঝুঁটির ডগাটাও যদি কোথাও একটু দেখা যায়, টেনে ডাঙায় তোলা আশু দরকার। এ সম্বন্ধে তার নিজের বোন সিসির চেয়ে পরের বোন কেটির উৎসাহ অনেক বেশি। ভারতের ধন বিদেশে লুপ্ত হচ্ছে বলে আমাদের পলিটিক্সের যে আক্ষেপ, কেটি মিটারের ভাবখানা সেই জাতের।

নরেন মিটার দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিল। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও; বিদ্যার্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল, অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়, এইজন্যে আর্ট-সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। কিছুদিন চেষ্টার পর স্পষ্টবক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হল, এখন সে ছবির সমজদারিতে পরিপক্ক বলেই নিজের প্রমাণনিরপেক্ষ পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না, কিন্তু দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে। ফরাসি ছাঁচে সে তার গোঁফের দুই প্রত্যন্তদেশকে সযত্নে কণ্টকিত করেছে, এ দিকে মাথায় ঝাঁকড়া চুলের প্রতি তার সযত্ন অবহেলা। চেহারাখানা তার ভালোই, কিন্তু আরো ভালো করবার মহার্ঘ সাধনায় তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাসবৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তার মুখ-ধোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুল্য হত। দামি হাভানা দু-চার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা, এবং মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল-পোস্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো— এ-সব দেখে ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করতে সাহস হয় না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দর্জিশালার রেজেস্ট্রি-বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা এমন-সব কোঠায়, যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা-কপূরতলার নাম পাওয়া যেতে পারে। ওর স্ল্যাঙ-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত, বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ-সহযোগে অনতিব্যক্ত; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায়, ইংলন্ডের অনেক নীলরক্তবান্ আমীরদের কণ্ঠস্বরে এইরকম গদ্‌গদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।

কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কায়দা-কারখানার বকযন্ত্রপরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা— বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স। সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘকেশগৌরবের গর্বের প্রতি গর্বসহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মতো বিলুপ্ত হয়ে অনুকরণের উল্লম্ফশীল পরিণত অবস্থা প্রাপ্তিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা। জীবনের আদ্যলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ; এখন মনে হয়, সে যেন যাকে-তাকে দেখতেই পায় না। যদি-বা দেখে তো লক্ষই করে না, যদি-বা লক্ষ করে তাতে যেন আধ-খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম-বয়সে ঠোঁটদুটিতে সরল মাধুর্য ছিল, এখন বার বার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনাড়ি। তার পরিভাষা জানি নে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুরফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত; আর অনাবৃত বাহুদুটিকে

কখনো কখনো টেবিলে, কখনো চৌকির হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গিতে আলগোছে রাখবার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর, যখন সুমার্জিতনখররমণীয় দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলংকরণের অঙ্গরূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশ্যে নয়। সব চেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে সেটা ওর সমুচ্চ-খুর-ওয়ালা জুতোজোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায়; যেন ছাগলজাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দত্ত পদোন্নতির কিম্ভূত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

সিসি এখনো আছে মাঝামাঝি জায়গায়। শেষের ডিগ্রি এখনো পায় নি, কিন্তু প্রোমোশন পেয়ে চলেছে। উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুশিতে, অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে সর্বদা একটা চলন বলন টগবগ করছে, উপাসকমণ্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায়, কোথাও তার ভাবখানা পাকা, কোথাও কাঁচা—এরও তাই। খুরওয়ালা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন খোঁপাটাতে রয়ে গেছে অতীত যুগ; পায়ের দিকে শাড়ির বহর ইঞ্চি দুই-তিন খাটো, কিন্তু উত্তরচ্ছদে অসংবৃতির সীমানা এখনো আলজ্জতার অভিমুখে; অকারণ দস্তানা পরা অভ্যস্ত, অথচ এখনো এক হাতের পরিবর্তে দুই হাতেই বালা; সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন্তু পান খাবার আসক্তি এখনো প্রবল; বিস্কুটের টিনে ঢেকে আচার-আমসত্ত্ব পাঠিয়ে দিলে সে আপত্তি করে না; ক্রিস্টমাসের প্লাম পুডিং এবং পৌষ-পার্বণের পিঠে, এই দুইয়ের মধ্যে শেষটার প্রতিই তার লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিঙ্গি নাচওয়ালির কাছে সে নাচ শিখেছে, কিন্তু নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সংকোচ বোধ করে।

অমিত সম্বন্ধে জনরব শুনে এরা বিশেষ উদ্‌বিগ্ন হয়ে চলে এসেছে। বিশেষত এদের পরিভাষাগত শ্রেণীবিভাগে লাবণ্য গবর্নেস। পুরুষের জাত মারবার জন্যেই তার 'স্পেশাল ক্রিয়েশন'। মনে সন্দেহ নেই, টাকার লোভে মানের লোভেই সে অমিতকে কষে আঁকড়ে ধরেছে, ছাড়াতে গেলে সেই কাজটাতে মেয়েদেরই সম্মার্জনপটু হস্তক্ষেপ করতে হবে। চতুর্মুখ তাঁর চার জোড়া চক্ষে মেয়েদের দিকে কটাক্ষপাত ও পক্ষপাত একসঙ্গেই করে থাকবেন, সেইজন্যে মেয়েদের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিতে পুরুষদের গড়েছেন নিরেট নির্বোধ করে। তাই স্বজাতিমোহ-মুক্ত আত্মীয়-মেয়েদের সাহায্য না পেলে অনাত্মীয়-মেয়েদের মোহজাল থেকে পুরুষদের উদ্ধার পাওয়া এত দুঃসাধ্য।

আপাতত এই উদ্ধারের প্রণালীটা কিরকম হওয়া চাই তাই নিয়ে দুই নারী নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ ঠিক করেছে। এটা নিশ্চিত, গোড়ায় অমিতকে কিছুই জানতে দেওয়া হবে না। তার আগেই শত্রুপক্ষকে আর রণক্ষেত্রটাকে দেখে আসা চাই। তার পর দেখা যাবে মায়াবিনীর কত শক্তি।

প্রথমে এসেই চোখে পড়ল অমিতর উপর ঘন এক পোঁচ গ্রাম্য রঙ। এর আগেও ওর দলের সঙ্গে অমিতর ভাবের মিল ছিল না। তবু সে তখন ছিল প্রখর নাগরিক, চাঁচা মাজা ঝকঝকে। এখন কেবল যে খোলা হাওয়ায় রঙটা কিছু ময়লা হয়েছে তা নয়, সবসুদ্ধ ওর উপর যেন গাছ-পালার আমেজ দিয়েছে। ও যেন কাঁচা হয়ে গেছে এবং ওদের মতে কিছু যেন বোকা। ব্যবহারটা প্রায় যেন সাধারণ মানুষের মতো। আগে জীবনের সমস্ত বিষয়কে হাসির অস্ত্র নিয়ে তাড়া করে বেড়াত, এখন ওর সে শখ নেই বললেই হয়। এইটেকেই ওরা মনে করেছে নিদেন কালের লক্ষণ।

সিসি একদিন ওকে স্পষ্টই বললে, 'দূর থেকে আমরা মনে করছিলুম তুমি বুঝি খাসিয়া হবার দিকে নামছ। এখন দেখছি তুমি হয়ে উঠছ, যাকে বলে গ্রীন, এখানকার পাইনগাছের মতো, হয়তো আগেকার চেয়ে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু আগেকার মতো ইন্টারেস্টিং নয়।'

অমিত ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থের কবিতা থেকে নজির পেড়ে বললে, প্রকৃতির সংসর্গে থাকতে

থাকতে নির্বাক্ নিশ্চেতন পদার্থের ছাপ লেগে যায় দেহে মনে প্রাণে, যাকে কবি বলেছেন 'mute insensate things'।

শুনে সিসি ভাবলে, নির্বাক্ নিশ্চেতন পদার্থকে নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই, যারা অত্যন্ত বেশি সচেতন আর যারা কথা কইবার মধুর প্রগল্‌ভতায় সুপটু, তাদের নিয়েই আমাদের ভাবনা।

ওরা আশা করেছিল, লাবণ্য সম্বন্ধে অমিত নিজেই কথা তুলবে। একদিন দুদিন তিনদিন যায়, সে একেবারে চুপ। কেবল একটা কথা আন্দাজে বোঝা গেল, অমিতর সাধের তরণী সম্প্রতি কিছু বেশিরকম ঢেউ খাচ্ছে। ওরা বিছানা থেকে উঠে তৈরি হবার আগেই অমিত কোথা থেকে ঘুরে আসে, তার পরে মুখ দেখে মনে হয়, ঝোড়ো হাওয়ায় যে কলাগাছের পাতাগুলো ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে তারই মতো শতদীর্ণ ভাবখানা। আরো ভাবনার কথাটা এই যে, রবি ঠাকুরের বই কেউ কেউ ওর বিছানায় দেখেছে। ভিতরের পাতায় লাবণ্যের নাম থেকে গোড়ার অক্ষরটা লাল কালি দিয়ে কাটা। বোধ হয় নামের পরশপাথরেই জিনিসটার দাম বাড়িয়েছে।

অমিত ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে যায়। বলে, 'খিদে সংগ্রহ করতে চলেছি।' খিদের জোগানটা কোথায়, আর খিদেটা খুবই যে প্রবল, তা অন্যদের অগোচর ছিল না। কিন্তু তারা এমনি অবুঝের মতো ভাব করত যেন হাওয়ায় ক্ষুধাকরতা ছাড়া শিলঙে আর-কিছু আছে এ কথা কেউ ভাবতে পারে না। সিসি মনে মনে হাসে, কেটি মনে মনে জ্বলে। নিজের সমস্যাটাই অমিতর কাছে এত একান্ত যে, বাইরের কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ করার শক্তিই তার নেই। তাই সে নিঃসংকোচে সখীযুগলের কাছে বলে, 'চলেছি এক জলপ্রপাতের সন্ধানে।' কিন্তু প্রপাতটা কোন্ শ্রেণীর, আর তার গতিটা কোন্ অভিমুখী, তা নিয়ে অন্যদের মনে যে কিছু ধোঁকা আছে তা সে বুঝতে পারে না। আজ বলে গেল, এক জায়গায় কমলালেবুর মধুর সওদা করতে যাবে। মেয়েদুটি নিতান্ত নিরীহভাবে সরল ভাষায় বললে, এই অপূর্ব মধু সম্বন্ধে তাদের দুর্দমনীয় কৌতূহল, তারাও সঙ্গে যেতে চায়। অমিত বললে, পথ দুর্গম, যানবাহনের আয়ত্তাতীত। বলেই আলোচনাটাকে প্রথম অংশে ছেদন করেই দৌড় দিলে। এই মধুকরের ডানার চাঞ্চল্য দেখে দুই বন্ধু স্থির করলে, আর দেরি নয়, আজই কমলালেবুর বাগানে অভিযান করা চাই। এ দিকে নরেন গেছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, সিসিকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ ছিল। সিসি গেল না। এই নিবৃত্তিতে তার কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদি ছাড়া অন্যে কে বুঝবে।

১৫

ব্যাঘাত

দুই সখী যোগমায়ার বাগানে বাইরের দরজা পার হয়ে চাকরদের কাউকে দেখতে পেলে না। গাড়িবারান্ডায় এসে চোখে পড়ল, বাড়ির রোয়াকে একটি ছোটো টেবিল পেতে একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চলছে। বুঝতে বাকি রইল না, এরই মধ্যে বড়োটি লাবণ্য।

কেটি টক টক করে উপরে উঠে ইংরেজিতে বললে, 'দুঃখিত।'

লাবণ্য চৌকি ছেড়ে উঠে বললে, 'কাকে চান আপনারা।'

কেটি এক মুহূর্তে লাবণ্যর আপাদমস্তকে দৃষ্টিটাকে প্রখর ঝাঁটার মতো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'মিস্টার অমিট্রায়ে এখানে এসেছেন কি না খবর নিতে এলুম।'

লাবণ্য হঠাৎ বুঝতেই পারলে না, অমিট্রায়ে কোন্ জাতের জীব। বললে, 'তাঁকে তো আমরা চিনি নে।'

অমনি দুই সখীতে একটা বিদ্যুচ্চকিত চোখ-ঠারাঠারি হয়ে গেল, মুখে পড়ল একটা আড়-হাসির রেখা। কেটি ঝাঁজিয়ে উঠে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, 'আমরা তো জানি, এ বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা আছে oftener than is good for him।'

ভাব দেখে লাবণ্য চমকে উঠল, বুঝলে এরা কে আর ও কী ভুলটাই করেছে। অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'কর্তামাকে ডেকে দিই, তাঁর কাছে খবর পাবেন।'

লাবণ্য চলে গেলেই সুরমাকে কেটি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার টীচার?'

'হাঁ।'

'নাম বুঝি লাবণ্য?'

'হাঁ।'

'গট ম্যাচেস?'

হঠাৎ দেশালাইয়ের প্রয়োজন আন্দাজ করতে না পেরে সুরমা কথাটার মানেই বুঝল না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কেটি বললে, 'দেশালাই।'

সুরমা দেশালাইয়ের বাক্স নিয়ে এল। কেটি সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সুরমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ইংরেজি পড়?'

সুরমা স্বীকৃতিসূচক মাথা নেড়েই ঘরের দিকে দ্রুত চলে গেল। কেটি বললে, 'গবর্নেসের কাছে মেয়েটা আর যাই শিখুক, ম্যানার্স শেখে নি।'

তার পরে দুই সখীতে টিপ্পনী চলল। 'ফেমাস লাবণ্য! ডিল্লীশস! শিলঙ পাহাড়টাকে ভলক্যানো বানিয়ে তুলেছে, ভূমিকম্পে অমিটের হৃদয়-ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে, এ ধার থেকে ও ধার। সিলি! মেন আর ফানি!'

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। এই হাসিতে ঔদার্য ছিল। কেননা, পুরুষমানুষ নির্বোধ বলে সিসির পক্ষে আক্ষেপের কারণ ঘটে নি। সে তো পাথুরে জমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েছে, দিয়েছে একেবারে চৌচির করে। কিন্তু এ কী সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। এক দিকে কেটির মতো মেয়ে, আর অন্য দিকে ঐ অদ্ভুত-ধরনে-কাপড়-পরা গবর্নেস। মুখে মাখন দিলে গলে না, যেন একতাল ভিজে ন্যাকড়া। কাছে বসলে মনটাতে বাদলার বিস্কুটের মতো ছাতা পড়ে যায়। কী করে অমিট ওকে এক মোমেন্টও সহ্য করে।

'সিসি, তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা করে হাঁটে। কোন্-এক সৃষ্টিছাড়া উলটো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হয়েছে এঞ্জেল।'

এই বলে টেবিলে অ্যাল্‌জেব্রার বইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে কেটি ওর রুপোর-শিকল-ওয়ালা প্রসাধনের থলি বের করে মুখে একটুখানি পাউডার লাগালে, অঞ্জনের পেনসিল দিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুললে। দাদার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় সিসির যথেষ্ট রাগ হয় না, এমন-কি, ভিতরে ভিতরে একটু যেন স্নেহই হয়। সমস্ত রাগটা পড়ে পুরুষদের মুগ্ধনয়ন-বিহারিণী মেকি এঞ্জেলদের 'পরে। দাদার সম্বন্ধে সিসির এই সকৌতুক ঔদাসীন্যে কেটির ধৈর্য-ভঙ্গ হয়। খুব করে ঝাঁকানি দিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

এমন সময়ে সাদা গরদের শাড়ি পরে যোগমায়া বেরিয়ে এলেন। লাবণ্য এল না। কেটির সঙ্গে এসেছিল ঝাঁকড়া-চুলে-দুই-চোখ-আচ্ছন্নপ্রায় ক্ষুদ্রকায়া ট্যাবি-নামধারী কুকুর। সে একবার ঘ্রাণের দ্বারা লাবণ্য ও সুরমার পরিচয় গ্রহণ করেছে। যোগমায়াকে দেখে হঠাৎ কুকুরটার মনে কিছু উৎসাহ জন্মাল। তাড়াতাড়ি গিয়ে সামনের দুটো পা দিয়ে যোগমায়ার নির্মল শাড়ির উপর পঙ্কিল স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দিয়ে অকৃত্রিম প্রীতি জ্ঞাপন করলে। সিসি ঘাড় ধরে টেনে আনলে কেটির কাছে, কেটি তার নাকের উপর তর্জনী তাড়ন করে বললে, 'নটি ডগ্।'

কেটি চৌকি থেকে উঠলই না। সিগারেট টানতে টানতে অত্যন্ত নির্লিপ্ত আড় ভাবে একটু

ঘাড় বাঁকিয়ে যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। যোগমায়ার 'পরে তার আক্রোশ বোধ করি লাবণ্যর চেয়েও বেশি। ওর ধারণা, লাবণ্যর ইতিহাসে একটা খুঁত আছে। যোগমায়াই মাসি সেজে অমিতর হাতে তাকে গতিয়ে দেবার কৌশল করেছে। পুরুষমানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না, বিধাতার স্বহস্তে তৈরি ঠুলি তাদের দুই চোখে পরানো।

সিসি সামনে এসে যোগমায়াকে নমস্কারের একটু আভাস দিয়ে বললে, 'আমি সিসি, অমির বোন।'

যোগমায়া একটু হেসে বললেন, 'অমি আমাকে মাসি বলে, সেই সম্পর্কে আমি তোমারও মাসি হই মা।'

কেটির রকম দেখে যোগমায়া তাকে লক্ষই করলেন না। সিসিকে বললেন, 'এসো মা, ঘরে বসবে এসো।'

সিসি বললে, 'সময় নেই, কেবল খবর নিতে এসেছি, অমি এসেছে কি না।'

যোগমায়া বললেন, 'এখনো আসে নি।'

'কখন আসবেন জানেন?'

'ঠিক বলতে পারি নে—আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করে আসি গে।'

কেটি তার স্বস্থানে বসেই তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'যে মাস্টারনী এখানে বসে পড়াচ্ছিল সে তো ভান করলে অমিটকে সে কোনোকালে জানেই না।'

যোগমায়ার ধাঁধা লেগে গেল। বুঝলেন, কোথাও একটা গোল আছে। এও বুঝলেন, এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। এক মুহূর্তে মাসিত্ব পরিহার করে বললেন, 'শুনেছি অমিতবাবু আপনাদের হোটেলেই থাকেন, তাঁর খবর আপনাদেরই জানা আছে।'

কেটি বেশ-একটু স্পষ্ট করেই হাসলে। তাকে ভাষায় বললে বোঝায়, 'লুকোতে পার, ফাঁকি দিতে পারবে না।'

আসল কথা, গোড়াতেই লাবণ্যকে দেখে এবং অমিকে সে চেনে না শুনে কেটি মনে মনে আগুন হয়ে আছে। কিন্তু সিসির মনে আশঙ্কা আছে মাত্র, জ্বালা নেই; যোগমায়ার সুন্দর মুখের গাম্ভীর্য তার মনকে টেনেছিল। তাই যখন দেখলে কেটি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়ে চৌকি ছাড়লে না, তার মনে কেমন সংকোচ লাগল। অথচ কোনো বিষয়ে কেটির বিরুদ্ধে যেতে সাহস হয় না, কেননা, কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্রহস্ত—একটু সে বিরোধ সয় না। কর্কশ ব্যবহারে তার কোনো সংকোচ নেই। অধিকাংশ মানুষই ভীরু, অকুণ্ঠিত দুর্ব্যবহারের কাছে তারা হার মানে। নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব আছে; যাকে সে মিষ্টিমুখো ভালো-মানুষি বলে, বন্ধুদের মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখলে তাকে সে অস্থির করে তোলে। রূঢ়তাকে সে অকপটতা বলে বড়াই করে, এই রূঢ়তার আঘাতে যারা সংকুচিত তারা কোনোমতে কেটিকে প্রসন্ন রাখতে পারলে আরাম পায়। সিসি সেই দলের। সে কেটিকে মনে মনে যতই ভয় করে ততই তার নকল করে, দেখাতে যায় সে দুর্বল নয়। সব সময়ে পেরে ওঠে না। কেটি আজ বুঝেছিল যে, তার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিসির মনের কোণে একটা মুখ-চোরা আপত্তি লুকিয়ে-ছিল। তাই সে ঠিক করেছিল, যোগমায়ার সামনে সিসির এই সংকোচ কড়া করে ভাঙতে হবে। চৌকি থেকে উঠল, একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে, নিজের ধরানো সিগারেট মুখে করেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্যে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল। প্রত্যাখ্যান করতে সিসি সাহস করলে না। কানের ডগাটা একটুখানি লাল হয়ে উঠল। তবু জোর করে এমনি একটা ভাব দেখালে, যেন তাদের হাল পাশ্চাত্যিকতায় যাদের ভ্রূ এতটুকু কুঞ্চিৎ হবে তাদের মুখের উপর ও তুড়ি মারতে প্রস্তুত—that much for it!

ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপস্থিত। মেয়েরা তো অবাক। হোটেল থেকে যখন সে বেরিয়ে এল, মাথায় ছিল ফেল্ট হ্যাট, গায়ে ছিল বিলিতি কোর্তা। এখানে দেখা যাচ্ছে পরনে

তার ধুতি আর শাল। এই বেশান্তরের আড্ডা ছিল তার সেই কুটীরে। সেইখানে আছে একটি বইয়ের শেল্‌ফ্‌, একটি কাপড়ের তোরঙ্গ, আর যোগমায়ার দেওয়া একটি আরামকেদারা। হোটেল থেকে মধ্যাহ্নভোজন সেরে এইখানে সে আশ্রয় নেয়। আজকাল লাবণ্যর শাসন কড়া, সুরমাকে পড়ানোর সময়ের মাঝখানটাতে জলপ্রপাত বা কমলালেবুর সন্ধানে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেইজন্যে বিকেলে সাড়ে-চারটে বেলায় চা-পান-সভার পূর্বে এ বাড়িতে দৈহিক মানসিক কোনো-প্রকার তৃষ্ণানিবারণের সৌজন্যসম্মত সুযোগ অমিতর ছিল না। এই সময়টা কোনোমতে কাটিয়ে কাপড় ছেড়ে যথানির্দিষ্ট সময়ে এখানে সে আসত।

আজ হোটেল থেকে বেরোবার আগেই কলকাতা থেকে এসেছে তার আঙটি। কেমন করে সে সেই আঙটি লাবণ্যকে পরাবে তার সমস্ত অনুষ্ঠানটা সে বসে বসে কল্পনা করেছে। আজ হল ওর একটা বিশেষ দিন। এ দিনকে দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চলবে না। আজ সব কাজ বন্ধ করা চাই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, লাবণ্য যেখানে পড়াচ্ছে সেইখানে গিয়ে বলবে—একদিন হাতিতে চড়ে বাদশা এসেছিল, কিন্তু তোরণ ছোটো, পাছে মাথা হেঁট করতে হয় তাই সে ফিরে গেছে, নতুন-তৈরি প্রাসাদে প্রবেশ করে নি। আজ এসেছে আমাদের একটি মহাদিন, কিন্তু তোমার অবকাশের তোরণটা তুমি খাটো করে রেখেছ—সেটাকে ভাঙো, রাজা মাথা তুলেই তোমার ঘরে প্রবেশ করুন।

অমিত এ কথাও মনে করে এসেছিল যে ওকে বলবে, ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাঙ্কচুয়ালিটি; কিন্তু ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয়, ঘড়ি সময়ের নম্বর জানে, তার মূল্য জানবে কী করে।

অমিত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, মেঘে আকাশটা ম্লান, আলোর চেহারাটা বেলা পাঁচটা-ছটার মতো। অমিত ঘড়ি দেখলে না, পাছে ঘড়িটা তার অভদ্র ইশারায় আকাশের প্রতিবাদ করে, যেমন বহুদিনের জ্বরো রোগীর মা ছেলের গা একটু ঠাণ্ডা দেখে আর থার্মমিটর মিলিয়ে দেখতে সাহস করে না। আজ অমিত এসেছিল নির্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট আগে। কারণ, দুরাশা নির্লজ্জ।

বারান্দার যে কোণটায় বসে লাবণ্য তার ছাত্রীকে পড়ায়, রাস্তা দিয়ে আসতে সেটা চোখে পড়ে। আজ দেখলে সে জায়গাটা খালি। মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এতক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। এখনো তিনটে বেজে বিশ মিনিট। সেদিন ও লাবণ্যকে বলেছিল, নিয়মপালনটা মানুষের, অনিয়মটা দেবতার; মর্ত্যে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃতে অধিকার পাব বলেই। সেই স্বর্গ মাঝে মাঝে মর্ত্যেই দেখা দেয়, তখন নিয়ম ভেঙে তাকে সেলাম করে নিতে হয়। আশা হল, লাবণ্য নিয়ম-ভাঙার গৌরব বুঝেছে বা; লাবণ্যর মনের মধ্যে হঠাৎ আজ বুঝি কেমন করে বিশেষ দিনের স্পর্শ লেগেছে, সাধারণ দিনের বেড়া গেছে ভেঙে।

নিকটে এসে দেখে, যোগমায়া তাঁর ঘরের বাইরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সিসি তার মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে জ্বালিয়ে নিচ্ছে। অসম্মান যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে বাকি রইল না। ট্যাবি-কুকুরটা তার প্রথম-মৈত্রীর উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে কেটির পায়ের কাছে শুয়ে একটু নিদ্রার চেষ্টা করছিল। অমিতর আগমনে তাকে সংবর্ধনা করবার জন্যে আবার অসংযত হয়ে উঠল। সিসি আবার তাকে শাসনের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে যে, এই সদ্‌ভাবপ্রকাশের প্রণালীটা এখানে সমাদৃত হবে না।

দুই সখীর প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করে 'মাসি' বলে দূর থেকে ডেকেই অমিত যোগমায়ার পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। এ সময়ে এমন করে প্রণাম করা তার প্রথার মধ্যে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, 'মাসিমা, লাবণ্য কোথায়।'

'কী জানি বাছা, ঘরের মধ্যে কোথায় আছে।'

'এখনো তো তার পড়াবার সময় শেষ হয় নি।'

'বোধ হয় এঁরা আসাতে ছুটি নিয়ে ঘরে গেছে।'

'চলো, একবার দেখে আসি সে কী করছে।' যোগমায়াকে নিয়ে অমিত ঘরে গেল। সম্মুখে যে আর-কোনো সজীব পদার্থ আছে সেটা সে সম্পূর্ণই অস্বীকার করলে।

সিসি একটু চেঁচিয়েই বলে উঠল, 'অপমান! চলো কেটি, ঘরে যাই।'

কেটিও কম জ্বলে নি। কিন্তু শেষ-পর্যন্ত না দেখে সে যেতে চায় না।

সিসি বললে, 'কোনো ফল হবে না।'

কেটির বড়ো বড়ো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল; বললে, 'হতেই হবে ফল।'

আরো খানিকটা সময় গেল। সিসি আবার বললে, 'চলো ভাই, আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

কেটি বারান্ডায় ধন্না দিয়ে বসে রইল। বললে, 'এইখান দিয়ে তাকে বেরোতেই তো হবে।'

অবশেষে বেরিয়ে এল অমিত, সঙ্গে নিয়ে এল লাবণ্যকে। লাবণ্যর মুখে একটি নির্লিপ্ত শান্তি। তাতে একটুও রাগ নেই, স্পর্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিল না। অমিত তাঁকে ধরে নিয়ে এল। এক মুহূর্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়ল, লাবণ্যর হাতে আঙটি। মাথায় রক্ত চন করে উঠল, লাল হয়ে উঠল দুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল।

অমিত বললে, 'মাসি, এই আমার বোন শমিতা, বাবা বোধ হয় আমার নামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন, কিন্তু রয়ে গেল অমিত্রাক্ষর। ইনি কেতকী, আমার বোনের বন্ধু।'

ইতিমধ্যে আর-এক উপদ্রব। সুরমার এক পোষা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে আসাতেই ট্যাবির কুক্কুরীয় নীতিতে সে এই স্পর্ধাটাকে যুদ্ধঘোষণার বৈধ কারণ বলেই গণ্য করলে। একবার অগ্রসর হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করে, আবার বিড়ালের উদ্যত নখর ও ফোঁসফোঁসানিতে যুদ্ধের আশুফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ে ফিরে আসে। এমন অবস্থায় কিঞ্চিৎ দূর হতেই অহিংস্রগর্জননীতিই নিরাপদ বীরত্ব প্রকাশের উপায় মনে করে অপরিমিত চীৎকার শুরু করে দিলে। বিড়ালটা তার কোনো প্রতিবাদ না করে পিঠ ফুলিয়ে চলে গেল। এইবার কেটি সহ্য করতে পারলে না। প্রবল আক্রোশে কুকুরটাকে কান-মলা দিতে লাগল। এই কান-মলার অনেকটা অংশই নিজের ভাগ্যের উদ্দেশে। কুকুরটা কেঁই কেঁই স্বরে অসদ্‌ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র অভিমত জানালে। ভাগ্য নিঃশব্দে হাসল।

এই গোলমালটা একটু থামলে পর অমিত সিসিকে লক্ষ্য করে বললে, 'সিসি, এঁরই নাম লাবণ্য। আমার কাছ থেকে এঁর নাম কখনো শোন নি, কিন্তু বোধ হচ্ছে আর-দশজনের কাছ থেকে শুনেছ। এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, কলকাতায় অঘ্রান মাসে।'

কেটি মুখে হাসি টেনে আনতে দেরি করলে না। বললে, 'আই কন্‌গ্র্যাচুলেট। কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয় নি বলেই ঠেকছে। রাস্তা কঠিন নয়, মধু লাফ দিয়ে আপনিই এগিয়ে এসেছে মুখের কাছে।'

সিসি তার স্বাভাবিক অভ্যাসমত হী হী করে হেসে উঠল।

লাবণ্য বুঝলে, কথাটায় খোঁচা আছে, কিন্তু মানেটা সম্পূর্ণ বুঝলে না।

অমিত তাকে বললে, 'আজ বেরোবার সময় এরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাচ্ছ। আমি বলেছিলুম, বন্য মধুর সন্ধানে। তাই এরা হাসছে। ওটা আমারই দোষ; আমার কোন্‌ কথাটা যে হাসির নয় লোকে সেটা ঠাওরাতে পারে না।'

কেটি শান্ত স্বরেই বললে, 'কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমার তো জিত হল, এবার আমারও যাতে হার না হয় সেটা করো।'

'কী করতে হবে বলো।'

'নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে। সে বলেছিল, জেন্টেলম্যানরা যেখানে যায় কেউ

সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না, কিছুতেই তুমি রেস দেখতে যাবে না। আমি আমার হীরের আঙটি বাজি রেখে বলেছিলুম, তোমাকে রেসে নিয়ে যাবই। এ দেশে যত ঝরনা, যত মধুর দোকান আছে সব সন্ধান করে শেষকালে এখানে এসে তোমার দেখা পেলুম। বলো-না ভাই সিসি, কত ফিরতে হয়েছে বুনো হাঁস শিকারের চেষ্টায়, ইংরেজিতে যাকে বলে wild goose।'

সিসি কোনো কথা না বলে হাসতে লাগল। কেটি বললে, 'মনে পড়ছে সেই গল্পটা—একদিন তোমার কাছেই শুনেছি অমিট। কোনো পার্শিয়ান ফিলজফার তার পাগড়ি-চোরের সন্ধান না পেয়ে শেষে গোরস্থানে এসে বসে ছিল। বলেছিল, পালাবে কোথায়। মিস লাবণ্য যখন বলেছিলেন ওকে চেনেন না আমাকে ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমার মন বললে, ঘুরে ফিরে ওকে ওর সেই গোরস্থানে আসতেই হবে।'

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

কেটি লাবণ্যকে বললে, 'অমিট আপনার নাম মুখে আনলে না, মধুর ভাষাতে ঘুরিয়ে বললে কমলালেবুর মধু; আপনার বুদ্ধি খুবই বেশি সরল, ঘুরিয়ে বলবার কৌশল মুখে জোগায় না, ফস্ করে বলে ফেললেন অমিটকে জানেনই না। তবু সানডে স্কুলের বিধিমত ফল ফলল না, দণ্ডদাতা আপনাদের কোনো দণ্ডই দিলেন না, শক্ত পথের মধুও একজন এক চুমুকেই খেয়ে নিলেন আর অজানাকেও একজন এক দৃষ্টিতেই জানলেন—এখন কেবল আমার ভাগ্যেই হার হবে? দেখো তো সিসি, কী অন্যায়।'

সিসির আবার সেই উচ্চ হাসি। ট্যাবি-কুকুরটাও উচ্ছ্বাসে যোগ দেওয়া তার সামাজিক কর্তব্য মনে করে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখালে। তৃতীয়বার তাকে দমন করা হল।

কেটি বললে, 'অমিট, তুমি জান, এই হীরের আঙটি যদি হারি, জগতে আমার সান্ত্বনা থাকবে না। এই আঙটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক মুহূর্ত হাত থেকে খুলি নি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোয়াতে হবে।'

সিসি বললে, 'বাজি রাখতে গেলে কেন ভাই।'

'মনে মনে নিজের উপর অহংকার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস। অহংকার ভাঙল—এবারকার মতো আমার রেস ফুরোল, আমারই হার। মনে হচ্ছে, অমিটকে আর রাজি করতে পারব না। তা, এমন অদ্ভুত করেই যদি হারাবে, সেদিন এত আদরে আঙটি দিয়েছিলে কেন। সে দেওয়ার মধ্যে কি কোনো বাঁধন ছিল না। এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘটতে দেবে না।'

বলতে বলতে কেটির গলা ভার হয়ে এল, অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে নিলে।

আজ সাত বৎসর হয়ে গেল, কেটির বয়স তখন আঠারো। সেদিন এই আঙটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা দুজনেই ছিল ইংলন্ডে। অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবি যুবক ছিল কেটির প্রণয়মুগ্ধ। সেদিন আপসে অমিত সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে নদীতে বাচ খেলেছিল। অমিতরই হল জিত। জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা বলে উঠেছিল, মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। সেই ক্ষণে অমিত কেটির হাতে আঙটি পরিয়ে দিলে। তার মধ্যে অনেক কথাই উহ্য ছিল, কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিল না। সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগে নি, তার হাসিটি সহজ ছিল, ভাবের আবেগে তার মুখ রক্তিম হতে বাধা পেত না। আঙটি হাতে পরা হলে অমিত তার কানে কানে বলেছিল—

Tender is the night
And haply the queen moon is on her throne.

কেটি তখন বেশি কথা বলতে শেখে নি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে মনে বলেছিল, 'মন্ আমী', ফরাসি ভাষায় যার মানে হচ্ছে 'বঁধু!'

আজ অমিতর মুখেও জবাব বেধে গেল। ভেবে পেলে না কী বলবে।

কেটি বললে, 'বাজিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক্‌ অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।'

ব'লে আঙটি খুলে টেবিলটার উপর রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দর দর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

১৬

মুক্তি

একটি ছোটো চিঠি এল লাবণ্যের হাতে, শোভনলালের লেখা :

> শিলঙে কাল রাত্রে এসেছি। যদি দেখা করতে অনুমতি দাও তবে দেখতে যাব। না যদি দাও কালই ফিরব। তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কী অপরাধ করেছি আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারি নি। আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোনবার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাই নে। ভয় কোরো না। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।

লাবণ্যর চোখ জলে ভরে এল। মুছে ফেললে। চুপ করে বসে ফিরে তাকিয়ে রইল নিজের অতীতের দিকে। যে অঙ্কুরটা বড়ো হয়ে উঠতে পারত অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়তে দেয় নি, তার সেই কাঁচবেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারত। কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব, বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্বলতা বলে মনে মনে ধিক্‌কার দিয়েছে। ভালোবাসা আজ তার শোধ নিল, অভিমান হল ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হতে পারত নিশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ তা কঠিন হয়ে উঠল। সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত ব্যথিত মূর্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা এতদিন কোন্‌ অমৃতে বেঁচে রইল। আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।

লাবণ্য চিঠিতে লিখলে :

> তুমি আমার সকলের চেয়ে বড়ো বন্ধু। এ বন্ধুত্বের পুরো দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাও নি; আজও তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছ কিছুই দাবি না ক'রে। চাই নে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই।

চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে এমন সময় অমিত এসে বললে, 'বন্যা, চলো আজ দুজনে একবার বেড়িয়ে আসি গে।'

অমিত ভয়ে-ভয়েই বলেছিল; ভেবেছিল, লাবণ্য হয়তো যেতে রাজি হবে না।

লাবণ্য সহজেই বললে, 'চলো।'

দুজনে বেরোল। অমিত কিছু দ্বিধার সঙ্গেই লাবণ্যর হাতটিকে হাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা করলে। লাবণ্য একটুও বাধা না দিয়ে হাত ধরতে দিলে। অমিত হাতটি একটু জোরে চেপে ধরলে, তাতেই মনের কথা যেটুকু ব্যক্ত হয় তার বেশি কিছু মুখে এল না। চলতে চলতে সেদিনকার সেই জায়গাতে এল যেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। একটি তরুশূন্য পাহাড়ের শিখরের উপর

সূর্য আপনার শেষ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেল। অতিসুকুমার সবুজের আভা আস্তে আস্তে সুকোমল নীলে গেল মিলিয়ে। দুজনে থেমে সেই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লাবণ্য আস্তে আস্তে বললে, 'একদিন একজনকে যে আংটি পরিয়েছিলে, আমাকে দিয়ে সে আংটি খোলালে কেন?'

অমিত ব্যথিত হয়ে বললে, 'তোমাকে সব কথা বোঝাব কেমন করে বন্যা। সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে, তারা দুজনে কি একই মানুষ।'

লাবণ্য বললে, 'তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার আদরে তৈরি, আর-একজন তোমার অনাদরে গড়া।'

অমিত বললে, 'কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে আঘাতে আজকের কেটি তৈরি তার দায়িত্ব কেবল আমার একলার নয়।'

'কিন্তু মিতা, নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল তাকে তুমি আপনার করে রাখলে না কেন। যে কারণেই হোক, আগে তোমার মুঠো আলগা হয়েছে, তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মূর্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে বলেই দশের মনের মতো করে নিজেকে সাজাতে বসল। আজ তো দেখি, ও বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো; সেটা সম্ভব হত না, যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকত। থাক্ গে ও-সব কথা। তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাখতে হবে।'

'বলো, নিশ্চয় রাখব।'

'অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যে তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্জিতে বেড়িয়ে এসো। ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পার, ওকে আমোদ দিতে পারবে।'

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'আচ্ছা।'

তার পরে লাবণ্য অমিতর বুকে মাথা রেখে বললে, 'একটা কথা তোমাকে বলি মিতা, আর কোনোদিন বলব না। তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ করে বলছি নে, আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি দিয়ো না, কোনো চিহ্ন রাখবার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক্ নিরঞ্জন; বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।'

এই বলে নিজের আঙুলের থেকে আংটি খুলে অমিতর আঙুলে আস্তে আস্তে পরিয়ে দিলে। অমিত তাতে কোনো বাধা দিলে না।

সায়াহ্নের এই পৃথিবী যেমন অস্তরশ্মি-উদ্ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধরেছে, তেমনি নীরবে, তেমনি শান্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধরলে অমিতর নত মুখের দিকে।

১৭

শেষ

সাত দিন যেতেই অমিত ফিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেল। ঘর বন্ধ, সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।

সেই য়ুক্যালিপটাস গাছের তলায় অমিত এসে দাঁড়াল, খানিকক্ষণ ধরে শূন্যমনে সেইখানে ঘুরে বেড়ালে। পরিচিত মালী এসে সেলাম করে জিজ্ঞাসা করলে. 'ঘর খুলে দেব কি। ভিতরে বসবেন?' অমিত একটু দ্বিধা করে বললে, 'হাঁ।'

ভিতরে গিয়ে লাবণ্যর বসবার ঘরে গেল। চৌকি টেবিল শেল্‌ফ্‌ আছে, সেই বইগুলি নেই। মেজের উপর দুই-একটা ছেঁড়া শূন্য লেফাফা, তার উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যর নাম ও ঠিকানা লেখা; দু-চারটে ব্যবহার-করা পরিত্যক্ত নিব, এবং ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি ছোটো পেনসিল টেবিলের উপরে। পেনসিলটি পকেটে নিলে। এর পাশেই শোবার ঘর। লোহার খাটে কেবল একটা গদি. আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি। দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদির উপর শুয়ে পড়ল, লোহার খাটটা শব্দ করে উঠল। সেই ঘরটার মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা। তাকে প্রশ্ন করলে কোনো কথাই বলতে পারে না। সে একটা মূর্ছা, যে মূর্ছা কোনোদিনই আর ভাঙবে না।

তার পরে শরীরমনের উপর একটা নিরুদ্যমের বোঝা বহন করে অমিত গেল নিজের কুটীরে। যা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনিই সব আছে। এমন-কি, যোগমায়া তাঁর কেদারাটিও ফিরিয়ে নিয়ে যান নি। বুঝলে, তিনি স্নেহ করেই এই চৌকিটি তাকে দিয়ে গেছেন, মনে হল যেন শুনতে পেলে শান্ত মধুর স্বরে তাঁর সেই আহ্বান—বাছা! সেই চৌকির সামনে মাথা লুটিয়ে অমিত প্রণাম করলে।

সমস্ত শিলঙ পাহাড়ের শ্রী আজ চলে গেছে। অমিত কোথাও আর সান্ত্বনা পেল না।

১৮

শেষের কবিতা

কলকাতার কলেজে পড়ে যতিশংকর। থাকে কলুটোলা প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে। অমিত তাকে প্রায় বাড়িতে নিয়ে আসে, খাওয়ায়, তার সঙ্গে নানা বই পড়ে, নানা অদ্ভুত কথায় তার মনটাকে চমকিয়ে দেয়, মোটরে করে তাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

তার পর কিছুকাল যতিশংকর অমিতর কোনো নিশ্চিত খবর পায় না। কখনো শোনে সে নৈনিতালে, কখনো উটকামণ্ডে। একদিন শুনলে, অমিতর এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলছে, সে আজকাল কেটি মিত্তিরের বাইরেকার রঙটা ঘোচাতে উঠে-পড়ে লেগেছে। কাজ পেয়েছে মনের মতো, বর্ণান্তর করা। এতদিন অমিত মূর্তি গড়বার শখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েছে সজীব মানুষ। সে মানুষটিও একে একে আপন উপরকার রঙিন পাপড়িগুলো খসাতে রাজি, চরমে ফল ধরবে আশা ক'রে। অমিতর বোন লিসি নাকি বলছে যে, কেটিকে একেবারে চেনাই যায় না, অর্থাৎ তাকে নাকি বড্ডো বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বন্ধুদের সে বলে দিয়েছে তাকে কেতকী বলে ডাকতে; এটা তার পক্ষে নির্লজ্জতা, যে মেয়ে একদা ফিনফিনে শান্তিপুরে শাড়ি পরত সেই লজ্জাবতীর পক্ষে জামা শেমিজ পরারই মতো। অমিত তাকে নাকি নিভৃতে ডাকে 'কেয়া' বলে। এ কথাও লোকে কানাকানি করছে যে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটি তার হাল ধরেছে আর অমিত তাকে পড়ে শোনাচ্ছে রবি ঠাকুরের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। কিন্তু লোকে কী না বলে। যতিশংকর বুঝে নিলে, অমিতর মনটা পাল তুলে চলে গেছে ছুটিতত্ত্বের মাঝদরিয়ায়।

অবশেষে অমিত ফিরে এল। শহরে রাষ্ট্র, কেতকীর সঙ্গে তার বিয়ে। অথচ অমিতর নিজ মুখে একদিনও যতি এ প্রসঙ্গ শোনে নি। অমিতর ব্যবহারেরও অনেকখানি বদল ঘটেছে। পূর্বের মতোই যতিকে অমিত ইংরেজি বই কিনে. উপহার দেয়, কিন্তু তাকে নিয়ে সন্ধেবেলায় সে-সব বইয়ের আলোচনা করে না। যতি বুঝতে পারে, আলোচনার ধারাটা এখন বইছে এক নতুন খাদে। আজকাল মোটরে বেড়াতে সে যতিকে ডাক পাড়ে না। যতির বয়সে এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, অমিতর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র পার্টিতে তৃতীয় ব্যক্তির জায়গা হওয়া অসম্ভব।

যতি আর থাকতে পারলে না। অমিতকে নিজেই গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'অমিতদা, শুনলুম মিস কেতকী মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে?'

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'লাবণ্য কি এ খবর জেনেছে।'

'না, আমি তাকে লিখি নি। তোমার মুখে পাকা খবর পাই নি বলে চুপ করে আছি।'

'খবরটা সত্যি, কিন্তু লাবণ্য হয়তো-বা ভুল বুঝবে।'

যতি হেসে বললে, 'এর মধ্যে ভুল বোঝবার জায়গা কোথায়। বিয়ে কর যদি তো বিয়েই করবে, সোজা কথা।'

'দেখো যতি, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিকশনারিতে যে কথার এক মানে বেঁধে দিই, মানবজীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায়, সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।'

যতি বললে, 'অর্থাৎ তুমি বলছ বিবাহ মানে বিবাহ নয়।'

'আমি বলছি, বিবাহের হাজারখানা মানে—মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয়; মানুষকে বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।'

'তোমার বিশেষ মানেটাই বলো-না।'

'সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে বলতে হয়। যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা তা হলেও আর-একটা কথায় গিয়ে পড়ব। ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরো বেশি জ্যান্ত।'

'তা হলে অমিতদা, কথা বন্ধ করতে হয় যে। কথা কাঁধে নিয়ে মানের পিছন পিছন ছুটব, আর মানেটা বাঁয়ে তাড়া করলে ডাইনে আর ডাইনে তাড়া করলে বাঁয়ে মারবে দৌড়, এমন হলে তো কাজ চলে না।'

'ভায়া, মন্দ বল নি। আমার সঙ্গে থেকে তোমার মুখ ফুটেছে। সংসারে কোনোমতে কাজ চালাতেই হবে, তাই কথার নেহাত দরকার। যে-সব সত্যকে কথার মধ্যে কুলোয় না ব্যবহারের হাটে তাদেরই ছাঁটি, কথাটাকেই জাহির করি। উপায় কী। তাতে বোঝাপড়াটা ঠিক না হোক, চোখ বুজে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।'

'তবে কি আজকের কথাটাকে একেবারেই খতম করতে হবে।'

'এই আলোচনাটা যদি নিতান্তই জ্ঞানের গরজে হয়, প্রাণের গরজে না হয়, তা হলে খতম করতে দোষ নেই।'

'ধরে নাও প্রাণের গরজেই।'

'শাবাশ, তবে শোনো।'

এইখানে একটু পাদটীকা লাগালে দোষ নেই। অমিতর ছোটো বোন লিসির স্বহস্তে ঢালা চা যতি আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই পান করে আসছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, সেই কারণেই ওর মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই যে, অমিত ওর সঙ্গে অপরাহ্ণে সাহিত্যালোচনা এবং সায়াহ্নে মোটরে করে বেড়ানো বন্ধ করেছে। অমিতকে ও সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছে।

অমিত বললে, 'অক্সিজেন এক ভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হলে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্সিজেন আর-এক ভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার—দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এখন বুঝতে পেরেছ?'

'সম্পূর্ণ না, তবে কিনা বোঝবার ইচ্ছে আছে।'

'যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে, সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।'

'তোমার কথা ঠিক বুঝছি কি না সেইটেই বুঝতে পারি নে। আর-একটু স্পষ্ট করে বলো অমিতদা।'

অমিত বললে, 'একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ; আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।'

'কিন্তু বিবাহে তোমার ঐ সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না।'

'জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে কিন্তু ঘটে না। যে মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো; যে তা না পায়, দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সেও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু তুমি যাকে মনে কর রোম্যান্স সেইটেতে কমতি পড়ে! একটুও না। গল্পের বই থেকেই রোম্যান্সের বাঁধা বরাদ্দ ছাঁচে ঢালাই করে জোগাতে হবে নাকি। কিছুতেই না। আমার রোম্যান্স আমিই সৃষ্টি করব। আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোম্যান্স, আমার মর্ত্যেও ঘটাব রোম্যান্স। যারা ওর একটা বাঁচাতে গিয়ে আর-একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বল রোম্যান্টিক! তারা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোম্যান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল; আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা করব, সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়। জয় হোক আমার লাবণ্যর, জয় হোক আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হোক অমিত রায়।'

যতি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বোধ করি কথাটা তার ঠিক লাগল না। অমিত তার মুখ দেখে ঈষৎ হেসে বললে, 'দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলছি, হয়তো সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে, আমাকে গাল দিয়ে বসবে। একের কথার উপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট করেই না-হয় তোমাকে বলি। রূপক দিয়েই বলতে হবে, নইলে এ-সব কথার রূপ চলে যায়—কথাগুলো লজ্জিত হয়ে ওঠে। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল—প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।'

যতি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'কিন্তু অমিতদা, দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না।'

'যার হয় তারই হয়, আমার হয় না।'

'কিন্তু শ্রীমতী কেতকী যদি—'

'তিনি সব জানেন। সম্পূর্ণ বোঝেন কি না বলতে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাব যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে, লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী।'

'তা হোক, শ্রীমতী লাবণ্যকে তো তোমার বিয়ের খবর জানাতে হবে।'

'নিশ্চয় জানাব। কিন্তু তার আগে একটি চিঠি দিতে চাই, সেটি তুমি পৌঁছিয়ে দেবে?'

'দেব।'

অমিতর এই চিঠি :

> সেদিন সন্ধেবেলায় রাস্তার শেষে এসে যখন দাঁড়ালুম, কবিতা দিয়ে যাত্রা শেষ করেছি। আজও এসে থামলুম একটা রাস্তার শেষে। এই শেষমুহূর্তটির উপর একটি কবিতা রেখে যেতে চাই। আর কোনো কথার ভার সইবে না। হতভাগা নিবারণ চক্রবর্তীটা যেদিন ধরা পড়েছে সেইদিন মরেছে—অতি শৌখিন জলচর মাছের মতো। তাই উপায় না দেখে তোমারই কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে।

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার অন্তিম আগমন।
লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি;
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি।

জীবন আঁধার হল, সেই ক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।

মিতা

তার পরেও আরো কিছুকাল গেল। সেদিন কেতকী গেছে তার বোনের মেয়ের অন্নপ্রাশনে। অমিত গেল না। আরামকেদারায় বসে সামনের চৌকিতে পা-দুটো তুলে দিয়ে বিলিয়ম জেমসের পত্রাবলী পড়ছে। এমন সময় যতিশংকর লাবণ্যর লেখা এক চিঠি তার হাতে দিলে। চিঠির এক পাতে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহের খবর। বিবাহ হবে ছ মাস পরে, জ্যৈষ্ঠমাসে, রামগড় পর্বতের শিখরে। অপর পাতে :

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন।
ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহু দূরে।
মনে হয়, অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়—
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে
বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,

সেই ক্ষণে খুঁজে দেখো— কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃতিপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নাম-হারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি।
মর্তের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃতমূরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ লেগে;
তৃষার্ত আবেগ-বেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।
তোমার মানস-ভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে।
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজো তুমি নিজে
হয়তো-বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই—
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,

যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালো মন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান—
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

বন্যা

ব্যাঙ্গালুরি, বাঙ্গালোর
২৫ জুন, ১৯২৮

রবীন্দ্রনাথ। ১৯৪০
জ্. পিয়ো-অঙ্কিত

দুই বোন

প্রকাশ : ১৯৩৩

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু
করকমলে

শর্মিলা

মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।

এক জাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষাঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্তঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।

শশাঙ্কের স্ত্রী শর্মিলা মায়ের জাত।

বড়ো বড়ো শান্ত চোখ; ধীর গভীর তার চাহনি; জলভরা নবমেঘের মতো নধর দেহ, স্নিগ্ধ শ্যামল; সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণরেখা; শাড়ির কালো পাড়টি প্রশস্ত; দুই হাতে মকরমুখো মোটা দুই বালা, সেই ভূষণের ভাষা প্রসাধনের ভাষা নয়, শুভসাধনের ভাষা।

স্বামীর জীবনলোকে এমন কোনো প্রত্যন্তদেশ নেই যেখানে তার সাম্রাজ্যের প্রভাব শিথিল। স্ত্রীর অতিলালনের আওতায় স্বামীর মন হয়ে পড়েছে অসাবধান। ফাউন্টেন কলমটা সামান্য দুর্যোগে টেবিলের কোনো অনতিলক্ষ্য অংশে ক্ষণকালের জন্যে অগোচর হলে সেটা পুনরাবিষ্কারের ভার স্ত্রীর 'পরে। স্নানে যাবার পূর্বে হাতঘড়িটা কোথায় ফেলেছে শশাঙ্কর হঠাৎ সেটা মনে পড়ে না, স্ত্রীর সেটা নিশ্চিত চোখে পড়ে। ভিন্ন রঙের দু-জোড়া মোজার এক-এক পাটি এক-এক পায়ে প'রে বাইরে যাবার জন্যে যখন সে প্রস্তুত, স্ত্রী এসে তার প্রমাদ সংশোধন করে দেয়। বাংলা মাসের সঙ্গে ইংরেজি মাসের তারিখ জোড়া দিয়ে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে, তার পরে অকালে অপ্রত্যাশিত অতিথিসমাগমের আকস্মিক দায় পড়ে স্ত্রীর উপর। শশাঙ্ক নিশ্চয় জানে দিনযাত্রায় কোথাও ত্রুটি ঘটলেই স্ত্রীর হাতে তার সংস্কার হবেই, তাই ত্রুটি ঘটানোই তার স্বভাব হয়ে পড়েছে। স্ত্রী সস্নেহ তিরস্কারে বলে, 'আর তো পারি নে। তোমার কি কিছুতেই শিক্ষা হবে না!' যদি শিক্ষা হত তবে শর্মিলার দিনগুলো হত অনাবাদি ফসলের জমির মতো।

শশাঙ্ক হয়তো বন্ধুমহলে নিমন্ত্রণে গেছে। রাত এগারোটা হল, দুপুর হল, ব্রিজ খেলা চলছে। হঠাৎ বন্ধুরা হেসে উঠল, 'ওহে, তোমার সমনজারির পেয়াদা। সময় তোমার আসন্ন।'

সেই চিরপরিচিত মহেশ চাকর। পাকা গোঁফ, কাঁচা মাথার চুল, গায়ে মেরজাই পরা, কাঁধে রঙিন ঝাড়ন, বগলে বাঁশের লাঠি। মাঠাকরুন খবর নিতে পাঠিয়েছেন বাবু কি আছেন এখানে? মাঠাকরুনের ভয়, পাছে ফেরবার পথে অন্ধকার রাতে দুর্যোগ ঘটে। সঙ্গে একটা লন্ঠনও পাঠিয়েছেন।

শশাঙ্ক বিরক্ত হয়ে তাস ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। বন্ধুরা বলে, 'আহা, একা অরক্ষিত পুরুষমানুষ।'

বাড়ি ফিরে এসে শশাঙ্ক স্ত্রীর সঙ্গে যে আলাপ করে সেটা না স্নিগ্ধ ভাষায় না শান্ত ভঙ্গিতে। শর্মিলা চুপ করে ভর্ৎসনা মেনে নেয়। কী করবে, পারে না থাকতে। যতপ্রকার অসম্ভব বিপত্তি ওর অনুপস্থিতির অপেক্ষায় স্বামীর পথে ষড়যন্ত্র করে এ আশঙ্কা ও কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না।

বাইরে লোক এসেছে, হয়তো কাজের কথায়। ক্ষণে ক্ষণে অন্তঃপুর থেকে ছোটো ছোটো চিরকুট আসছে, 'মনে আছে কাল তোমার অসুখ করেছিল। আজ সকাল সকাল খেতে এসো।' রাগ করে শশাঙ্ক, আবার হারও মানে। বড়ো দুঃখে একবার স্ত্রীকে বলেছিল, 'দোহাই তোমার, চক্রবর্তী বাড়ির

গিন্নির মতো একটা ঠাকুরদেবতা আশ্রয় করো। তোমার মনোযোগ আমার একলার পক্ষে বেশি। দেবতার সঙ্গে সেটা ভাগাভাগি করে নিতে পারলে সহজ হয়। যতই বাড়াবাড়ি কর দেবতা আপত্তি করবেন না, কিন্তু মানুষ যে দুর্বল।'

শর্মিলা বললে, 'হায় হায়, একবার কাকাবাবুর সঙ্গে যখন হরিদ্বার গিয়েছিলুম, মনে আছে তোমার অবস্থা!'

অবস্থাটা যে অত্যন্ত শোচনীয় হয়েছিল এ কথা শশাঙ্কই প্রচুর অলংকার দিয়ে একদা স্ত্রীর কাছে ব্যাখ্যা করেছে। জানত এই অত্যুক্তিতে শর্মিলা যেমন অনুতপ্ত তেমনি আনন্দিত হবে। আজ সেই অমিতভাষণের প্রতিবাদ করবে কোন্ মুখে। চুপ করে মেনে যেতে হল, শুধু তাই নয়, সেদিনই ভোরবেলায় অল্প একটু যেন সর্দির আভাস দেখা দিয়েছে শর্মিলার এই কল্পনা অনুসারে তাকে কুইনিন খেতে হল দশ গ্রেন, তা ছাড়া তুলসীপাতার রস দিয়ে চা। আপত্তি করবার মুখ ছিল না। কারণ ইতিপূর্বে অনুরূপ অবস্থায় আপত্তি করেছিল, কুইনিন খায় নি, জ্বরও হয়েছিল, এই বৃত্তান্তটি শশাঙ্কের ইতিহাসে অপরিমোচনীয় অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

ঘরে আরোগ্য ও আরামের জন্যে শর্মিলার এই যেমন সস্নেহ ব্যগ্রতা, বাইরে সম্মান রক্ষার জন্যে তার সতর্কতা তেমনি সতেজ। একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে।

একবার বেড়াতে গিয়েছিল নৈনিতালে। আগে থাকতে সমস্ত পথ কামরা ছিল রিজার্ভ করা। জংশনে এসে গাড়ি বদলিয়ে আহারের সন্ধানে গেছে। ফিরে এসে দেখে উর্দিপরা দুর্জন মূর্তি ওদের বেদখল করবার উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত। স্টেশনমাস্টার এসে এক বিশ্ববিশ্রুত জেনেরালের নাম করে বললে, কামরাটা তাঁরই, ভুলে অন্য নাম খাটানো হয়েছে। শশাঙ্ক চক্ষু বিস্ফারিত করে সসম্ভ্রমে অন্যত্র যাবার উপক্রম করছে, হেনকালে শর্মিলা গাড়িতে উঠে দরজা আগলিয়ে বললে, 'দেখতে চাই কে আমাকে নামায়। ডেকে আনো তোমার জেনেরালকে।' শশাঙ্ক তখনো সরকারি কর্মচারী, উপরওয়ালার জ্ঞাতিগোত্রকে যথোচিত পাশ কাটিয়ে নিরাপদ পথে চলতে সে অভ্যস্ত। সে ব্যস্ত হয়ে যত বলে, 'আহা, কাজ কী, আরো তো গাড়ি আছে'—শর্মিলা কানই দেয় না! অবশেষে জেনেরাল-সাহেব রিফ্রেশমেন্ট রুমে আহার সমাধা করে চুরুট মুখে দূর থেকে স্ত্রীমূর্তির উগ্রতা দেখে গেল হটে। শশাঙ্ক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, 'জান কতবড়ো লোকটা!' স্ত্রী বললে, 'জানার গরজ নেই। যে-গাড়িটা আমাদের, সে-গাড়িতে ও তোমার চেয়ে বড়ো নয়।'

শশাঙ্ক প্রশ্ন করলে, 'যদি অপমান করত।'

শর্মিলা জবাব দিলে, 'তুমি আছ কী করতে।'

শশাঙ্ক শিবপুরে পাস-করা এঞ্জিনিয়ার। ঘরের জীবনযাত্রায় শশাঙ্কের যতই ঢিলেমি থাক্‌, চাকরির কাজে সে পাকা। প্রধান কারণ, কর্মস্থানে যে তুঙ্গী গ্রহের নির্মম দৃষ্টি সে হচ্ছে যাকে চলতি ভাষায় বলে বড়োসাহেব। স্ত্রীগ্রহ সে নয়। শশাঙ্ক ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারি পদে যখন অ্যাক্টিনি করছে এমন সময় আসন্ন উন্নতির মোড় ফিরে গেল উলটো দিকে। যোগ্যতা ডিঙিয়ে কাঁচা অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যে ইংরেজ যুবক বিরল গুম্ফরেখা নিয়ে তার আসন দখল করলে কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্তার সম্পর্ক ও সুপারিশ বহন করে তার এই অভাবনীয় আবির্ভাব।

শশাঙ্ক বুঝে নিয়েছে এই অর্বাচীনকে উপরের আসনে বসিয়ে নীচের স্তরে থেকে তাকেই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। কর্তৃপক্ষ পিঠে চাপড় মেরে বললে, 'ভেরি সরি মজুমদার, তোমাকে যত শীঘ্র পারি উপযুক্ত স্থান জুটিয়ে দেব।' এরা দুজনেই এক ফ্রীমেসন্ লজের অন্তর্ভুক্ত।

তবু আশ্বাস ও সান্ত্বনা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারটা মজুমদারের পক্ষে অত্যন্ত বিস্বাদ হয়ে উঠল। ঘরে এসে ছোটোখাটো সব বিষয়ে খিটখিট শুরু করে দিলে। হঠাৎ চোখে পড়ল তার আপিসঘরের এককোণে ঝুল, হঠাৎ মনে হল চৌকির উপরে যে সবুজ রঙের ঢাকাটা আছে সে-রঙটা ও দু-চক্ষে দেখতে পারে না। বেহারা বারান্দা ঝাড় দিচ্ছিল, ধুলো উড়ছে বলে তাকে দিল একটা প্রকাণ্ড ধমক। অনিবার্য ধুলো রোজই ওড়ে কিন্তু ধমকটা সদ্য নূতন।

অসম্মানের খবরটা স্ত্রীকে জানালে না। ভাবলে যদি কানে ওঠে তা হলে চাকরির জালটাতে আরো একটা গ্রন্থি পাকিয়ে তুলবে—হয়তো বা স্বয়ং কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে আসবে অমধুর ভাষায়। বিশেষত ঐ ডোনাল্ডসনের উপর তার রাগ আছে। একবার সে স্যার্কিট-হাউসের বাগানে বাঁদরের উৎপাত দমন করতে গিয়ে ছররা-গুলিতে শশাঙ্কর সোলার টুপি ফুটো করে দিয়েছে। বিপদ ঘটে নি কিন্তু ঘটতে তো পারত। লোকে বলে দোষ শশাঙ্করই, শুনে তার রাগ আরো বেড়ে ওঠে ডোনল্ডসনের 'পরেই। সকলের চেয়ে রাগের কারণটা এই. বাঁদরকে লক্ষ্য-করা গুলি শশাঙ্কের উপর পড়াতে শত্রুপক্ষ এই দুটো ব্যাপারের সমীকরণ করে উচ্চহাস্য করেছে।

শশাঙ্কের পদলাঘবের খবরটা শশাঙ্কের স্ত্রী স্বয়ং আবিষ্কার করলে। স্বামীর রকম দেখেই বুঝেছিল সংসারে কোনো দিক থেকে একটা কাঁটা উঁচিয়ে উঠেছে। তার পরে কারণ বের করতে সময় লাগে নি। কনস্টিট্যুশনাল অ্যাজিটেশনের পথে গেল না, গেল সেল্‌ফ ডিটার্মিনেশনের অভিমুখে। স্বামীকে বললে, 'আর নয়, এখনই কাজ ছেড়ে দাও।'

দিতে পারলে অপমানের জোঁকটা বুকের কাছ থেকে খসে পড়ে। কিন্তু ধ্যানদৃষ্টির সামনে প্রসারিত রয়েছে বাঁধা মাইনের অন্নক্ষেত্র, এবং তার পশ্চিম দিগন্তে পেনসনের অবিচলিত স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা।

শশাঙ্কমৌলী যে-বছর এম. এস্‌সি. ডিগ্রির সর্বোচ্চ শিখরে সদ্য অধিরূঢ়, সেই বছরেই তার শ্বশুর শুভকর্মে বিলম্ব করেন নি—শশাঙ্কের বিবাহ হয়ে গেল শর্মিলার সঙ্গে। ধনী শ্বশুরের সাহায্যেই এঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে। তার পরে চাকরিতে দ্রুত উন্নতির লক্ষণ দেখে রাজারামবাবু জামাতার ভাবী সচ্ছলতার ক্রমবিকাশ নির্ণয় করে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। মেয়েটিও আজ পর্যন্ত অনুভব করে নি তার অবস্থান্তর ঘটেছে। শুধু যে সংসারে অনটন নেই তা নয়, বাপের বাড়ির চালচলন এখানেও বজায় আছে। তার কারণ, এই পারিবারিক দ্বৈরাজ্যে ব্যবস্থাবিধি শর্মিলার অধিকারে। ওর সন্তান হয় নি, হবার আশাও বোধ করি ছেড়েছে। স্বামীর সমস্ত উপার্জন অখণ্ড-ভাবে এসে পড়ে ওরই হাতে। বিশেষ প্রয়োজন ঘটলে ঘরের অন্নপূর্ণার কাছে ফিরে ভিক্ষা না মেগে শশাঙ্কর উপায় নেই। দাবি অসংগত হলে নামঞ্জুর হয়, মেনে নেয় মাথা চুলকিয়ে। অপর কোনো দিক থেকে নৈরাশ্যটা পূরণ হয় মধুর রসে।

শশাঙ্ক বললে, 'চাকরি ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়। তোমার জন্যে ভাবি, কষ্ট হবে তোমারই।'

শর্মিলা বললে, 'তার চেয়ে কষ্ট হবে যখন অন্যায়টাকে গিলতে গিয়ে গলায় বাধবে।'

শশাঙ্ক বললে, 'কাজ তো করা চাই, ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবকে খুঁজে বেড়াব কোন্‌ পাড়ায়।'

'সে-পাড়া তোমার চোখে পড়ে না। তুমি যাকে ঠাট্টা করে বল তোমার চাকরির লুচি-স্থান, বেলুচিস্থান মরুপ্রদেশের ও পারে, তার বাইরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুমি গণ্যই কর না।'

'সর্বনাশ। সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা যে মস্ত প্রকাণ্ড। রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরোবে কে। অতবড়ো দূরবীন পাই কোন্‌ বাজারে।'

'মস্ত দূরবীন তোমাকে কষতে হবে না। আমার জ্ঞাতিসম্পর্কের মথুরদাদা কলকাতায় বড়ো কনট্রাক্টর, তাঁর সঙ্গে ভাগে কাজ করলে দিন চলে যাবে।'

'ভাগটা ওজনে অসমান হবে। এ পক্ষে বাটখারায় কমতি। খুঁড়িয়ে শরিকি করতে গেলে পদ-মর্যাদা থাকবে না।'

'এ পক্ষে কোনো অংশেই কমতি নেই। তুমি জান, বাবা আমার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখে গেছেন, সুদে বাড়ছে! শরিকের কাছে তোমাকে খাটো হতে হবে না।'

'সে কি হয়। ও টাকা যে তোমার।' বলে শশাঙ্ক উঠে পড়ল। বাইরে লোক বসে আছে।

শর্মিলা স্বামীর কাপড় ধরে টেনে বসিয়ে বললে, 'আমিও যে তোমারই।'

তার পর বললে, 'বের করো তোমার জেব থেকে ফাউন্টেনপেন, এই নাও চিঠির কাগজ, লেখো রেজিগ্‌নেশন-পত্র। সেটা ডাকে রওনা না করে আমার শান্তি নেই।'

'আমারও শান্তি নেই বোধ হচ্ছে।'

লিখলে রেজিগ্‌নেশন-পত্র।

পরদিনেই শর্মিলা চলে গেল কলকাতায়, উঠল গিয়ে মথুরদাদার বাড়িতে। অভিমান করে বললে, 'একদিনও তো বোনের খবর নাও না।'

মেয়ে-প্রতিদ্বন্দ্বী হলে বলত, 'তুমিও তো নাও না।' পুরুষের মাথায় সে জবাব জোগাল না। অপরাধ মেনে নিলে। বললে, 'নিশ্বাস ফেলবার কি সময় আছে। নিজে আছি কিনা তাই ভুল হয়ে যায়। আর, তা ছাড়া তোমরাও তো দূরে দূরে বেড়াও।'

শর্মিলা বললে, 'কাগজে দেখলুম ময়ূরভঞ্জ না মথুরগঞ্জ কোথায় একটা ব্রিজ তৈরির কাজ পেয়েছ। পড়ে এত খুশি হলুম। তখনই মনে হল মথুরদাদাকে নিজে গিয়ে কনগ্র্যাচুলেট করে আসি।'

'একটু সবুর করো খুকি। এখনো সময় হয় নি।'

ব্যাপারখানা এই : নগদ টাকা ফেলার দরকার। মাড়োয়ারি ধনীর সঙ্গে ভাগে কাজ করার কথা। শেষকালে প্রকাশ হল যেরকম শর্ত তাতে শাঁসের ভাগটাই মাড়োয়ারির আর ছিবড়ের ভাগটাই পড়বে ওর কপালে। তাই পিছোবার চেষ্টা।

শর্মিলা ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, 'এ কখনো হতেই পারে না। ভাগে কাজ করতে যদি হয় আমাদের সঙ্গে করো। এমন কাজটা তোমার হাত থেকে ফসকে গেলে ভারি অন্যায় হবে। আমি থাকতে এ হতেই দেব না, যাই বল তুমি।'

এর পরে লেখাপড়া হতেও দেরি হল না; মথুরদাদার হৃদয়ও বিগলিত হল।

•

ব্যাবসা চলল বেগে। এর আগে চাকরির দায়িত্বে শশাঙ্ক কাজ করেছে, সে দায়িত্বের সীমা ছিল পরিমিত। মনিব ছিল নিজের বাইরে, দাবি এবং দেয় সমান সমান ওজন মিলিয়ে চলত। এখন নিজেরই প্রভুত্ব নিজেকে চালায়। দাবি এবং দেয় এক জায়গায় মিলে গেছে। দিনগুলো ছুটিতে কাজেতে জাল-বোনা নয়, সময়টা হয়েছে নিরেট। যে দায়িত্ব ওর মনের উপর চেপে সেটাকে ইচ্ছে করলেই ত্যাগ করা যায় বলেই তার জোর এত কড়া। আর কিছু নয়, স্ত্রীর ঋণ শুধতেই হবে, তার পরে ধীরে সুস্থে চলবার সময় পাওয়া যাবে। বাঁ হাতের কব্‌জিতে ঘড়ি, মাথায় সোলার টুপি, আস্তিন গোটানো, খাকির প্যান্ট পরা, চামড়ার কোমরবন্ধ আঁটা, মোটা-সুকতলাওয়ালা জুতো, চোখে রোদ বাঁচাবার রঙিন চশমা— শশাঙ্ক উঠে পড়ে লেগে গেল কাজে। স্ত্রীর ঋণ যখন শোধ হবার কিনারায় এল তখনো ইস্‌টিমের দম কমায় না, মনটা তখন উঠেছে গরম হয়ে।

ইতিপূর্বে সংসারে আয়ব্যয়ের ধারাটা বইত একই খাদে, এখন হল দুই শাখা। একটা গেল ব্যাঙ্কের দিকে, আর-একটা ঘরের দিকে। শর্মিলার বরাদ্দ পূর্বের মতোই আছে. সেখানকার দেনা-পাওনার রহস্য শশাঙ্কর অগোচরে। আবার ব্যবসায়ের ঐ চামড়া-বাঁধানো হিসেবের খাতাটা শর্মিলার পক্ষে দুর্গম দুর্গবিশেষ। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু স্বামীর ব্যবসায়িক জীবনের কক্ষপথ ওর সংসারচক্রের বাইরে পড়ে যাওয়াতে সেই দিক থেকে ওর বিধিবিধান উপেক্ষিত হতে থাকে। মিনতি করে বলে, 'বাড়াবাড়ি কোরো না, শরীর যাবে ভেঙে।' কোনো ফল হয় না। আশ্চর্য এই, শরীরও ভাঙছে না। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্‌বেগ, বিশ্রামের অভাব নিয়ে আক্ষেপ, আরামের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ততা ইত্যাদি শ্রেণীর দাম্পত্যিক উৎকণ্ঠা সবেগে উপেক্ষা করে শশাঙ্ক সক্কালবেলায় সেকেন্ড্‌-হ্যান্ড ফোর্ড গাড়ি নিজে হাঁকিয়ে শিঙে বাজিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেলা দুটো-আড়াইটার সময় ঘরে ফিরে এসে বকুনি খায়, এবং আর-আর খাওয়াও দ্রুত হাত চালিয়ে শেষ করে।

একদিন ওর মোটরগাড়ির সঙ্গে আর-কার গাড়ির ধাক্কা লাগল। নিজে গেল বেঁচে, গাড়িটা

হল জখম, পাঠিয়ে দিল তাকে মেরামত করতে। শর্মিলা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। বাষ্পাকুলকণ্ঠে বললে, 'গাড়ি তুমি নিজে হাঁকাতে পারবে না।'

শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দিয়ে বললে, 'পরের হাতের আপদও একই জাতের দুশমন।'

একদিন কোন্ মেরামতের কাজ তদন্ত করতে গিয়ে জুতো ফুঁড়ে পায়ে ফুটল ভাঙা প্যাকবাক্সর পেরেক, হাসপাতালে গিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে ধনুষ্টঙ্কারের টিকে নিলে, সেদিন কান্নাকাটি করলে শর্মিলা; বললে, 'কিছুদিন থাকো শুয়ে।'

শশাঙ্ক অত্যন্ত সংক্ষেপে বললে, 'কাজ।' এর চেয়ে বাক্য আর সংক্ষেপ করা যায় না।

শর্মিলা বললে, 'কিন্তু'—এবার বিনা বাক্যেই ব্যান্ডেজসুদ্ধ চলে গেল কাজে।

জোর খাটাতে আর সাহস হয় না। আপন ক্ষেত্রে পুরুষের জোর দেখা দিয়েছে। যুক্তিতর্ক-কাকুতিমিনতির বাইরে একটিমাত্র কথা—'কাজ আছে।' শর্মিলা অকারণে উদ্‌বিগ্ন হয়ে বসে থাকে। দেরি হলেই ভাবে মোটরে বিপদ ঘটেছে। রোদ্দুর লাগিয়ে স্বামীর মুখ যখন দেখে রক্তবর্ণ, মনে করে নিশ্চয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ভয়ে ভয়ে আভাস দেয় ডাক্তারের—স্বামীর ভাবখানা দেখে ঐখানেই থেমে যায়। মন খুলে উদ্‌বেগ প্রকাশ করতেও আজকাল ভরসা হয় না।

শশাঙ্ক দেখতে দেখতে রোদে-পোড়া খটখটে হয়ে উঠেছে। খাটো আঁট কাপড়, খাটো আঁট অবকাশ, চালচলন দ্রুত, কথাবার্তা স্ফুলিঙ্গের মতো সংক্ষিপ্ত। শর্মিলার সেবা এই দ্রুত লয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চেষ্টা করে। স্টোভের কাছে কিছু খাবার সর্বদাই গরম রাখতে হয়, কখন স্বামী হঠাৎ অসময়ে বলে বসে, 'চললুম, ফিরতে দেরি হবে।' মোটরগাড়িতে গোছানো থাকে সোডাওয়াটার এবং ছোটো টিনের বাক্সে শুকনোজাতের খাবার। একটা ওডিকলোনের শিশি বিশেষ দৃষ্টিগোচররূপেই রাখা থাকে, যদি মাথা ধরে। গাড়ি ফিরে এলে পরীক্ষা করে দেখে কোনোটাই ব্যবহার করা হয় নি। মন খারাপ হয়ে যায়। সাফ কাপড় শোবার ঘরে প্রত্যহই সুপ্রকাশ্যভাবে ভাঁজ করা, তৎসত্ত্বেও অন্তত সপ্তাহে চার দিন কাপড় ছাড়বার অবকাশ থাকে না। ঘরকন্নার পরামর্শ খুবই খাটো করে আনতে হয়েছে, জরুরি টেলিগ্রামের ঠোকর-মারা ভাষার ধরনে, সেও চলতে চলতে পিছু ডাকতে ডাকতে, বলতে বলতে 'ওগো শুনে যাও কথাটা'। ওদের ব্যাবসার মধ্যে শর্মিলার যে একটুখানি যোগ ছিল তাও গেল কেটে, ওর টাকাটা এসেছে সুদে আসলে শোধ হয়ে। সুদও দিয়েছে মাপজোখ-করা হিসেবে, দস্তুরমত রসিদ নিয়ে। শর্মিলা বলে, 'বাস রে, ভালোবাসাতেও পুরুষ আপনাকে সবটা মেলাতে পারে না। একটা জায়গা ফাঁকা রাখে, সেইখানটাতে ওদের পৌরুষের অভিমান।'

লাভের টাকা থেকে শশাঙ্ক মনের মতো বাড়ি খাড়া করেছে ভবানীপুরে। ওর শখের জিনিস। স্বাস্থ্য আরাম শৃঙ্খলার নতুন নতুন প্ল্যান আসছে মাথায়। শর্মিলাকে আশ্চর্য করবার চেষ্টা। শর্মিলাও বিধিমত আশ্চর্য হতে ত্রুটি করে না। এঞ্জিনিয়ার একটা কাপড়-কাচা কলের পত্তন করেছে, শর্মিলা সেটাকে ঘুরে ফিরে দেখে খুব তারিফ করলে। মনে মনে বললে, 'কাপড় আজও যেমন ধোবার বাড়ি যাচ্ছে কালও তেমনি যাবে। ময়লা কাপড়ের গর্দভবাহনকে বুঝে নিয়েছি, তার বিজ্ঞান-বাহনকে বুঝি নে।' আলুর খোসা ছাড়াবার যন্ত্রটা দেখে তাক লেগে গেল, বললে, 'আলুর দম তৈরি করবার বারো-আনা দুঃখ যাবে কেটে। পরে শোনা গেছে সেটা ফুটো ডেকচি ভাঙা কাৎলি প্রভৃতির সঙ্গে এক বিস্মৃতিশয্যায় নৈষ্কর্ম্য লাভ করেছে।

বাড়িটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন এই স্থাবর পদার্থটার প্রতি শর্মিলার রুদ্ধ স্নেহের উদ্যম ছাড়া পেলে। সুবিধা এই যে, ইঁটকাঠের দেহটাতে ধৈর্য অটল। গোছানো-গাছানো সাজানো-গোজানোর মহোদ্যমে দুই-দুইজন বেহারা হাঁপিয়ে উঠল, একজন দিয়ে গেল জবাব। ঘরগুলোর গৃহসজ্জা চলছে শশাঙ্ককে লক্ষ্য করে। বৈঠকখানাঘরে সে আজকাল প্রায়ই বসে না, তবু তারই ক্লান্ত মেরুদণ্ডের উদ্দেশে কুশন নিবেদন করা হচ্ছে নানা ফ্যাশনের; ফুলদানি একটা-আধটা নয়,

টিপায়ে টেবিলে ঝালরওয়ালা ফুলকাটা আবরণ। শোবার ঘরে দিনের বেলায় শশাঙ্কর সমাগম আজকাল বন্ধ, কেননা তার আধুনিক পঞ্জিকায় রবিবারটা সোমবারেরই যমজ ভাই। অন্য ছুটিতে কাজ যখন বন্ধ তখনো ছুটোছাটা কাজ কোথা থেকে সে খুঁজে বের করে, আপিস-ঘরে গিয়ে প্ল্যান আঁকবার তেলা কাগজ কিংবা খাতাপত্র নিয়ে বসে। তবু সাবেক কালের নিয়ম চলছে। মোটা গদিওয়ালা সোফার সামনে প্রস্তুত থাকে পশমের চটি জোড়া। সেখানে পানের বাটায় আগেকার মতোই পান থাকে সাজা, আলনায় থাকে পাতলা সিল্কের পাঞ্জাবি, কোঁচানো ধুতি। আপিস-ঘরটাতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসের দরকার, তবু শশাঙ্কের অনুপস্থিতিকালে ঝাড়ন হাতে শর্মিলা সেখানে প্রবেশ করে। সেখানকার রক্ষণীয় এবং বর্জনীয় বস্তুব্যূহের মধ্যে সজ্জা ও শৃঙ্খলার সমন্বয়-সাধনে তার অধ্যবসায় অপ্রতিহত।

শর্মিলা সেবা করছে, কিন্তু আজকাল সেই সেবার অনেকখানি অগোচরে। আগে তার যে আত্মনিবেদন ছিল প্রত্যক্ষের কাছে, এখন তার প্রয়োগটা প্রতীকে— বাড়িঘর সাজানোয়, বাগান করায়, যে চৌকিতে শশাঙ্ক বসে তারই রেশমের ঢাকায়, বালিশের ওয়াড়ের ফুলকাটা কাজে, আপিসের টেবিলের কোণে রজনীগন্ধার গুচ্ছে সজ্জিত নীল স্ফটিকের ফুলদানিতে।

নিজের অর্ঘ্যকে পূজাবেদীর থেকে দূরে স্থাপন করতে হল, কিন্তু অনেক দুঃখে। এই অল্পদিন আগেই যে ঘা পেয়েছে তার চিহ্ন গোপনে চোখের জল ফেলে ফেলে মুছতে হয়েছে। সেদিন উনত্রিশে কার্তিক, শশাঙ্কের জন্মদিন। শর্মিলার জীবনে সব চেয়ে বড়ো পরব। যথারীতি বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হল, ঘরদুয়োর বিশেষ করে সাজানো হয়েছে ফুলে পাতায়।

সকালের কাজ সেরে শশাঙ্ক বাড়ি ফিরে এসে বললে, 'এ কী ব্যাপার। পুতুলের বিয়ে নাকি।'

'হায় রে কপাল, আজ তোমার জন্মদিন, সে কথাটাও ভুলে গেছ? যাই বল, বিকেলে কিন্তু তুমি বেরোতে পারবে না।'

'বিজনেস মৃত্যুদিন ছাড়া আর কোনো দিনের কাছে মাথা হেঁট করে না।'

'আর কখনো বলব না। আজ লোকজন নেমন্তন্ন করে ফেলেছি।'

'দেখো শর্মিলা, তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে খেলা করবার চেষ্টা কোরো না' এই বলে শশাঙ্ক দ্রুত চলে গেল। শর্মিলা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ কাঁদলে।

অপরাহ্ণে লোকজন এল। বিজনেসের সর্বোচ্চ দাবি তারা সহজেই মেনে নিলে। এটা যদি হত কালিদাসের জন্মদিন তবে শকুন্তলার তৃতীয় অঙ্ক লেখবার ওজরটাকে সকলেই নিশ্চয় নিতান্ত বাজে বলে ধরে নিত। কিন্তু বিজনেস্! আমোদপ্রমোদ যথেষ্ট হল। নালুবাবু থিয়েটারের নকল করে সবাইকে খুব হাসালেন, শর্মিলাও সে হাসিতে যোগ দিলে। শশাঙ্ক-বিরহিত শশাঙ্কের জন্মদিন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করলে শশাঙ্ক-অধিষ্ঠিত বিজনেসের কাছে।

দুঃখ যথেষ্ট হল, তবু শর্মিলার মনও দূর থেকে প্রণিপাত করলে শশাঙ্কের এই ধাবমান কাজের রথের ধ্বজাটাকে। ওর কাছে সেই দুরধিগম্য কাজ, যা কারও খাতির করে না, স্ত্রীর মিনতিকে না, বন্ধুর নিমন্ত্রণকে না, নিজের আরামকে না। এই কাজের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারা পুরুষমানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করে, এ তার আপন শক্তির কাছে আপনাকে নিবেদন। শর্মিলা ঘরকন্নার প্রাত্যহিক কর্মধারার পারে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখে তার পরপারে শশাঙ্কের কাজ। বহুব্যাপক তার সত্তা, ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায় সে দূরদেশে, দূর সমুদ্রের পারে, জানা-অজানা কত লোককে টেনে নিয়ে আসে আপন শাসনজালে। নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে পুরুষের প্রতিদিনের সংগ্রাম; তারই বন্ধুর যাত্রাপথে মেয়েদের কোমল বাহুবন্ধন যদি বাধা ঘটাতে আসে তবে পুরুষ তাকে নির্মম বেগে ছিন্ন করে যাবে বৈকি। এই নির্মমতাকে শর্মিলা ভক্তির সঙ্গেই মেনে নিলে। মাঝে মাঝে থাকতে পারে না, যেখানে অধিকার নেই হৃদয়ের টানে সেখানেও নিয়ে আসে তার সকরুণ উৎকণ্ঠা, আঘাত পায়, সে আঘাতকে প্রাপ্য গণ্য করেই ব্যথিত মনে পথ ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসে। দেবতাকে বলে 'দৃষ্টি রেখো', যেখানে তার নিজের গতিবিধি অবরুদ্ধ।

নীরদ

ব্যাঙ্কে-জমা টাকায় সওয়ার হয়ে এ পরিবারের সমৃদ্ধি যে সময়টাতে ছুটে চলেছে ছয় সংখ্যার অঙ্কের দিকে সেই সময়েই শর্মিলাকে ধরল দুর্বোধ কোন্-এক রোগে, ওঠবার শক্তি রইল না। এ নিয়ে কেন যে দুর্ভাবনা সে কথাটা বিবৃত করা দরকার।

রাজারামবাবু ছিলেন শর্মিলার বাপ। বরিশাল অঞ্চলে এবং গঙ্গার মোহনার কাছে তাঁর অনেকগুলি মস্ত জমিদারি। তা ছাড়া জাহাজ তৈরির ব্যবসায়ে তাঁর শেয়ার আছে শালিমারের ঘাটে। তাঁর জন্ম সেকালের সীমানায়, একালের শুরুতে। কুস্তিতে শিকারে লাঠিখেলায় ছিলেন ওস্তাদ। পাখোয়াজে নাম ছিল প্রসিদ্ধ। মার্চেন্ট অফ ভেনিস, জুলিয়াস সিজার, হ্যামলেট থেকে দু-চার পাতা মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। মেকলের ইংরেজি ছিল তাঁর আদর্শ, বার্কের বাগ্মিতায় ছিলেন মুগ্ধ, বাংলাভাষায় তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ছিল মেঘনাদবধকাব্য পর্যন্ত। মধ্যবয়সে মদ এবং নিষিদ্ধ ভোজ্যকে আধুনিক চিত্তোৎকর্ষের আবশ্যক অঙ্গ বলে জানতেন, শেষবয়সে ছেড়ে দিয়েছেন। সযত্ন ছিল তাঁর পরিচ্ছদ, সুন্দর গম্ভীর ছিল তাঁর মুখশ্রী, দীর্ঘ বলিষ্ঠ ছিল তাঁর দেহ, মেজাজ ছিল মজলিশি, কোনো প্রার্থী তাঁকে ধরে পড়লে 'না' বলতে জানতেন না। নিষ্ঠা ছিল না পুজোর্চনায়, অথচ সেটা সমারোহে প্রচলিত ছিল তাঁর বাড়িতে। সমারোহ দ্বারা কৌলিক মর্যাদা প্রকাশ পেত, পুজোটা ছিল মেয়েদের এবং অন্যদের জন্যে; ইচ্ছে করলে অনায়াসেই রাজা উপাধি পেতে পারতেন; ঔদাস্যের কারণ জিজ্ঞেস করলে রাজারাম হেসে বলতেন, পিতৃদত্ত রাজোপাধি ভোগ করেছেন, তার উপরে অন্য উপাধিকে আসন দিলে সম্মান খর্ব হবে। গবর্মেন্ট হৌসে তাঁর ছিল বিশেষ দেউড়িতে সম্মানিত প্রবেশিকা। কর্তৃপক্ষীয় পদস্থ ইংরেজ তাঁর বাড়িতে চিরপ্রচলিত জগদ্ধাত্রী পুজোয় শ্যাম্পেন প্রসাদ ভূরি পরিমাণেই অন্তরস্থ করতেন।

শর্মিলার বিবাহের পরে তাঁর পত্নীহীন ঘরে ছিল বড়ো ছেলে হেমন্ত, আর ছোটো মেয়ে ঊর্মিমালা। ছেলেটিকে অধ্যাপকবর্গ বলতেন দীপ্তিমান, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট। চেহারা ছিল পিছন ফিরে চেয়ে দেখবার মতো। এমন বিষয় ছিল না যাতে বিদ্যা না চড়েছে পরীক্ষামানের ঊর্ধ্বতম মার্কা পর্যন্ত। তা ছাড়া ব্যায়ামের উৎকর্ষে বাপের নাম রাখতে পারবে এমন লক্ষণ প্রবল। বলা বাহুল্য, তার চার দিকে উৎকণ্ঠিত কন্যামণ্ডলীর কক্ষপ্রদক্ষিণ সবেগে চলছিল, কিন্তু বিবাহে তার মন তখনো উদাসীন। উপস্থিত লক্ষ্য ছিল য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিসংগ্রহের দিকে। সেই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে ফরাসি জর্মন শেখা শুরু করেছিল।

আর কিছু হাতে না পেয়ে অনাবশ্যক হলেও আইন পড়া যখন আরম্ভ করেছে এমন সময় হেমন্তের অন্ত্রে কিংবা শরীরের কোন্ যন্ত্রে কী একটা বিকার ঘটল ডাক্তারেরা কিছুই তার কিনারা পেলেন না। গোপনচারী রোগ সবল দেহে যেন দুর্গের আশ্রয় পেয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া যেমন শক্ত হল তাকে আক্রমণ করাও তেমনি। সেকালের এক ইংরেজ ডাক্তারের উপর রাজারামের ছিল অবিচলিত আস্থা। অস্ত্রচিকিৎসায় লোকটি যশস্বী। রোগীর দেহে সন্ধান শুরু করলেন। অস্ত্রব্যবহারের অভ্যাসবশত অনুমান করলেন, দেহের দুর্গম গহনে বিপদ আছে বদ্ধমূল, সেটা উৎপাটনযোগ্য। অস্ত্রের সুকৌশল সাহায্যে স্তর ভেদ করে যেখানটা অনাবৃত হল সেখানে কল্পিত শত্রুও নেই, তার অত্যাচারের চিহ্নও নেই। ভুল শোধরাবার রাস্তা রইল না, ছেলেটি মারা গেল। বাপের মনে বিষম দুঃখ কিছুতেই শান্ত হতে চাইল না। মৃত্যু তাঁকে তত বাজে নি, কিন্তু অমন একটা সজীব সুন্দর বলিষ্ঠ দেহকে এমন করে খণ্ডিত করার স্মৃতিটা দিনরাত তাঁর মনের মধ্যে কালো হিংস্র পাখির মতো তীক্ষ্ন নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইল। মর্ম শোষণ করে টানলে তাঁকে মৃত্যুর মুখে।

নতুন পাস-করা ডাক্তার, হেমন্তের পূর্বসহাধ্যায়ী, নীরদ মুখুজ্জে ছিল শুশ্রূষার সহায়তা-কাজে। বরাবর জোর করে সে বলে এসেছে, ভুল হচ্ছে। সে নিজে ব্যামোর একটা স্বরূপ নির্ণয়

করেছিল, পরামর্শ দিয়েছিল দীর্ঘকাল শুকনো জায়গায় হাওয়া বদল করতে। কিন্তু রাজারামের মনে তাঁদের পৈত্রিক যুগের সংস্কার ছিল অটল। তিনি জানতেন যমের সঙ্গে দুঃসাধ্য লড়াই বাধলে তার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র ইংরেজ ডাক্তার। এই ব্যাপারে নীরদের 'পরে অযথামাত্রায় তাঁর স্নেহ ও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তাঁর ছোটো মেয়ে ঊর্মির অকস্মাৎ মনে হল, এ মানুষটার প্রতিভা অসামান্য। বাবাকে বললে, 'দেখো তো বাবা, অল্প বয়েস অথচ নিজের 'পরে কী দৃঢ় বিশ্বাস, আর অতবড়ো হাড়-চওড়া বিলিতি ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে নিজের মতকে নিঃসংশয়ে প্রচার করতে পারে এমন অসংকুচিত সাহস।'

বাবা বললেন, 'ডাক্তারিবিদ্যে কেবল শাস্ত্রগত নয়। কারও কারও মধ্যে থাকে ওটার দুর্লভ দৈব সংস্কার। নীরদের দেখছি তাই।'

এদের ভক্তির শুরু হল একটা ছোটো প্রমাণ নিয়ে, শোকের আঘাতে, পরিতাপের বেদনায়; তার পরে প্রমাণের অপেক্ষা না করে সেটা আপনিই বেড়ে চলল।

রাজারাম একদিন মেয়েকে বললেন, 'দেখ্ ঊর্মি, আমি যেন শুনতে পাই, হেমন্ত আমাকে কেবলই ডাকছে, বলছে, মানুষের রোগের দুঃখ দূর করো। স্থির করেছি তার নামে একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করব।'

ঊর্মি তার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, 'খুব ভালো হবে। আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো য়ুরোপে, ডাক্তারি শিখে ফিরে এসে যেন হাসপাতালের ভার নিতে পারি।'

কথাটা রাজারামের হৃদয়ে গিয়ে লাগল। বললেন, 'ঐ হাসপাতাল হবে দেবত্র সম্পত্তি, তুই হবি সেবায়েত। হেমন্ত বড়ো দুঃখ পেয়ে গেছে, তোকে সে বড়ো ভালোবাসত, তোর এই পুণ্যকাজে পরলোকে সে শান্তি পাবে। তার রোগশয্যায় তুই তো দিনরাত্রি তার সেবা করেছিস, সেই সেবাই তোর হাতে আরো বড়ো হয়ে উঠবে।'

বনেদি ঘরের মেয়ে ডাক্তারি করবে এটাও সৃষ্টিছাড়া বলে বৃদ্ধের মনে হল না। রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো বলতে যে কতখানি বোঝায় আজ সেটা আপন মর্মের মধ্যে বুঝেছেন। তাঁর ছেলে বাঁচে নি, কিন্তু অন্যের ছেলেরা যদি বাঁচে তা হলে যেন তার ক্ষতিপূরণ হয়, তাঁর শোকের লাঘব হতে পারে। মেয়েকে বললেন, 'এখানকার য়ুনিভার্সিটিতে বিজ্ঞানের শিক্ষাটা শেষ হয়ে যাক আগে, তার পরে য়ুরোপে।'

এখন থেকে রাজারামের মনে একটা কথা ঘুরে বেড়াতে লাগল। সে ঐ নীরদ ছেলেটির কথা। একেবারে সোনার টুকরো। যত দেখছেন ততই লাগছে চমৎকার। পাস করেছে বটে, কিন্তু পরীক্ষার তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে গিয়ে ডাক্তারিবিদ্যের সাত সমুদ্রে দিনরাত সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। অল্প বয়েস, অথচ আমোদপ্রমোদ কোনো কিছুতে টলে না মন। হালের যত কিছু আবিষ্কার তাই আলোচনা করছে উলটেপালটে, পরীক্ষা করছে, আর ক্ষতি করছে নিজের পসারের। অত্যন্ত অবজ্ঞা করছে তাদের যাদের পসার জমেছে। বলত, মূর্খেরা লাভ করে উন্নতি, যোগ্য ব্যক্তিরা লাভ করে গৌরব। কথাটা সংগ্রহ করেছে কোনো-একটা বই থেকে।

অবশেষে একদিন রাজারাম ঊর্মিকে বললেন, 'ভেবে দেখলুম, আমাদের হাসপাতালে তুই নীরদের সঙ্গিনী হয়ে কাজ করলেই কাজটা সম্পূর্ণ হবে, আর আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারব। ওর মতো অমন ছেলে পাব কোথায়।'

রাজারাম আর যাই পারুন হেমন্তের মতকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। সে বলত, মেয়ের পছন্দ উপেক্ষা করে বাপমায়ের পছন্দে বিবাহ ঘটানো বর্বরতা। রাজারাম একদা তর্ক করেছিলেন, বিবাহ ব্যাপারটা শুধু ব্যক্তিগত নয়, তার সঙ্গে সংসার জড়িত, তাই বিবাহে শুধু ইচ্ছার দ্বারা নয় অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হওয়ার দরকার আছে। তর্ক যেমনই করুন, অভিরুচি যেমনই থাক, হেমন্তের 'পরে তাঁর স্নেহ এত গভীর যে, তার ইচ্ছাই এ পরিবারে জয়ী হল।

নীরদ মুখুজ্জের এ বাড়িতে গতিবিধি ছিল। হেমন্ত ওর নাম দিয়েছিল আউল, অর্থাৎ

প্যাঁচা। অর্থ ব্যাখ্যা করতে বললে সে বলত, ও মানুষটা পৌরাণিক, মাইথলজিকাল, ওর বয়েস নেই কেবল আছে বিদ্যে, তাই আমি ওকে বলি মিনার্ভার বাহন।

নীরদ এদের বাড়িতে মাঝে মাঝে চা খেয়েছে, হেমন্তের সঙ্গে তুমুল তর্ক চালিয়েছে, মনে মনে ঊর্মিকে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে, কিন্তু ব্যবহারে করে নি যে তার কারণ এ ক্ষেত্রে যথোচিত ব্যবহারটাই ওর স্বভাবে নেই। ও আলোচনা করতে পারে, আলাপ করতে জানে না। যৌবনের উত্তাপ ওর মধ্যে যদি-বা থাকে, তার আলোটা নেই। এইজন্যেই, যে-সব যুবকের মধ্যে যৌবনটা যথেষ্ট প্রকাশমান তাদের অবজ্ঞা করেই ও আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই-সকল কারণে ওকে ঊর্মির উমেদার শ্রেণীতে গণ্য করতে কেউ সাহস করে নি। অথচ সেই প্রতীয়মান নিরাসক্তিই বর্তমান কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওর 'পরে ঊর্মির শ্রদ্ধাকে সম্ভ্রমের সীমায় টেনে এনেছিল।

রাজারাম যখন স্পষ্ট করেই বললেন যে, যদি মেয়ের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে তবে নীরদের সঙ্গে তার বিবাহ হলে তিনি খুশি হবেন, তখন মেয়ে অনুকূল ইঙ্গিতেই মাথাটা নাড়লে। কেবল সেইসঙ্গে জানালে, এ দেশের এবং বিলেতের শিক্ষার পালা সমাধা করে বিবাহ তার পরিণামে। বাবা বললেন, 'সেই কথাই ভালো, কিন্তু পরস্পরের সম্মতিক্রমে সম্বন্ধ পাকা হয়ে গেলে আর কোনো ভাবনা থাকে না।'

নীরদের সম্মতি পেতে দেরি হয় নি, যদিও তার ভাবে প্রকাশ পেল, উদ্‌বাহবন্ধন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ত্যাগ স্বীকার, প্রায় আত্মঘাতের কাছাকাছি। বোধ করি এই দুর্যোগ কথঞ্চিৎ উপশমের উপায় স্বরূপে শর্ত রইল যে, পড়াশুনো এবং সকল বিষয়েই নীরদ ঊর্মিকে পরিচালনা করবে, অর্থাৎ ভাবী পত্নীরূপে ওকে ধীরে ধীরে নিজের হাতে গড়ে তুলবে। সেটাও হবে বৈজ্ঞানিকভাবে, দৃঢ়নিয়ন্ত্রিত নিয়মে, ল্যাবরেটরির অভ্রান্ত প্রক্রিয়ার মতো।

নীরদ ঊর্মিকে বললে, 'পশুপক্ষীরা প্রকৃতির কারখানা থেকে বেরিয়েছে তৈরি জিনিস। কিন্তু মানুষ কাঁচা মালমসলা। স্বয়ং মানুষের উপর ভার তাকে গড়ে তোলা।'

ঊর্মি নম্রভাবে বললে, 'আচ্ছা, পরীক্ষা করুন। বাধা পাবেন না।'

নীরদ বললে, 'তোমার মধ্যে শক্তি নানাবিধ আছে। তাদের বেঁধে তুলতে হবে তোমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্যের চারি দিকে। তা হলেই তোমার জীবন অর্থ পাবে। বিক্ষিপ্তকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে একটা অভিপ্রায়ের টানে, আঁট হয়ে উঠবে, ডাইনামিক হবে, তবেই সেই একত্বকে বলা যেতে পারবে মরাল অর্গানিজম্‌।'

ঊর্মি পুলকিত হয়ে ভাবলে, অনেক যুবক ওদের চায়ের টেবিলে, ওদের টেনিস কোর্টে এসেছে, কিন্তু ভাববার যোগ্য কথা তারা কখনো বলে না, আর-কেউ বললে হাই তোলে। বস্তুত নিরতিশয় গভীরভাবে কথা বলবার একটা ধরন আছে নীরদের। সে যাই বলুক ঊর্মির মনে হয় এর মধ্যে একটা আশ্চর্য তাৎপর্য আছে। অত্যন্ত বেশি ইনটেলেক্‌চুয়াল।

রাজারাম ওঁর বড়ো জামাইকেও ডাকলেন। মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে চেষ্টা করলেন পরস্পরকে ভালো করে আলাপ করিয়ে দেবার। শশাঙ্ক শর্মিলাকে বলে, 'ছেলেটা অসহ্য জ্যাঠা; ও মনে করে আমরা সবাই ওর ছাত্র, তাও পড়ে আছি শেষ বেঞ্চির শেষ কোণে!'

শর্মিলা হেসে বলে, 'ওটা তোমার জেলাসি। কেন, আমার তো ওকে বেশ লাগে।'

শশাঙ্ক বলে, 'ছোটো বোনের সঙ্গে ঠাঁই বদল করলে কেমন হয়।'

শর্মিলা বলে, 'তা হলে তুমি হয়তো হাঁপ ছেড়ে বাঁচো, আমার কথা আলাদা।'

শশাঙ্কের প্রতি নীরদেরও যে ভ্রাতৃভাব বেড়ে উঠছে তা মনে হয় না। মনে মনে বলে, 'ও তো মজুর, ও কি বৈজ্ঞানিক! হাত আছে, মাথাটা কই।'

শশাঙ্ক নীরদকে নিয়ে তার শ্যালীকে প্রায় ঠাট্টা করে। বলে, 'এবার পুরোনো নাম বদলাবার দিন এল।'

'ইংরেজি মতে?'

'না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত মতে।'

'নতুন নামটা শুনি।'

'বিদ্যুৎলতা। নীরদের পছন্দ হবে। ল্যাবরেটরিতে ঐ পদার্থটার সঙ্গে পরিচয় আছে, এবার ঘরে পড়বে বাঁধা।'

মনে মনে বলে, 'সত্যি ঐ নামটাই একে ঠিক মানায় বটে।' ভিতরে ভিতরে একটা খোঁচা লাগে। 'হায় রে, এতবড়ো প্রিগ্‌টার হাতে পড়বে এমন মেয়ে!' কার হাতে পড়লে যে শশাঙ্কের রুচিতে ঠিক সন্তোষজনক এবং সান্ত্বনাজনক হতে পারত, বলা শক্ত।

অল্পদিনের মধ্যে রাজারামের মৃত্যু হল। ঊর্মির ভাবী স্বত্বাধিকারী নীরদনাথ একাগ্রমনে তার পরিণতি সাধনের ভার নিলে।

ঊর্মিমালা যতটা দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। তার চঞ্চল দেহে মনের উজ্জ্বলতা ঝলমল করে বেড়ায়। সকল বিষয়েই তার ঔৎসুক্য। সায়ান্সে যেমন তার মন, সাহিত্যে তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। ময়দানে ফুটবল দেখতে যেতে তার অসীম আগ্রহ, সিনেমা দেখাটাকে সে অবজ্ঞা করে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিদেশ থেকে এসেছে ফিজিক্সের ব্যাখ্যাকর্তা, সে সভাতেও সে উপস্থিত। রেডিয়োতে কান পাতে, হয়তো বলে 'ছ্যাঃ', কিন্তু কৌতূহলও যথেষ্ট। বিয়ে করতে রাস্তা দিয়ে বর চলেছে বাজনা বাজিয়ে, ও ছুটে আসে বারান্দায়। জুওলজিকালে বারে বারে বেড়িয়ে আসে, ভারি আমোদ লাগে, বিশেষত বাঁদরের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে। বাবা যখন মাছ ধরতে যেতেন ছিপ নিয়ে ও তাঁর পাশে গিয়ে বসত। টেনিস খেলে, ব্যাডমিন্টন খেলায় ওস্তাদ। এ-সব দাদার কাছে শিক্ষা। তন্বী সে সঞ্চারিণী লতার মতো, একটু হাওয়াতেই দুলে ওঠে। সাজসজ্জা সহজ এবং পরিপাটি। জানে কেমন করে শাড়িটাতে এখানে ওখানে অল্প একটুখানি টেনেটুনে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, ঢিল দিয়ে আঁট করে অঙ্গশোভা রচনা করতে হয়, অথচ তার রহস্যভেদ করা যায় না। গান ভালো গাইতে জানে না, কিন্তু সেতার বাজায়। সেই সংগীত দেখবার না শোনবার কে জানে। মনে হয় ওর দুরন্ত আঙুলগুলি কোলাহল করছে। কথা কবার বিষয়ের অভাব ঘটে না কখনো, হাসবার জন্যে সংগত কারণের অপেক্ষা করতে হয় না। সঙ্গ দান করবার অজস্র ক্ষমতা, যেখানে থাকে সেখানকার ফাঁক ও একলা ভরিয়ে রাখে। কেবল নীরদের কাছে ও হয়ে যায় আর-এক মানুষ, পালের নৌকোর হাওয়া যায় বন্ধ হয়ে, গুণের টানে চলে নম্রমন্থর গমনে।

সবাই বলে, ঊর্মির স্বভাব ওর ভাইয়েরই মতো প্রাণপরিপূর্ণ। ঊর্মি জানে, ওর ভাই ওর মনকে মুক্তি দিয়েছে। হেমন্ত বলত, আমাদের ঘরগুলো এক-একটা ছাঁচ, মাটির মানুষ গড়বার জন্যেই। তাই তো এতকাল ধরে বিদেশী বাজিকর এত সহজে তেত্রিশ কোটি পুতুলকে নাচিয়ে বেড়িয়েছে। সে বলত, 'আমার যখন সময় আসবে তখন এই সামাজিক পৌত্তলিকতা ভাঙবার জন্যে কালাপাহাড়ি করতে বেরোব।' সময় হল না, কিন্তু ঊর্মির মনকে খুবই সজীব করে রেখে দিয়ে গেছে।

মুশকিল বাধল এই নিয়ে। নীরদের কার্যপ্রণালী অত্যন্ত বিধিবদ্ধ। ঊর্মির জন্যে পাঠ্য পর্যায়ের বাঁধা নিয়ম করে দিলে। ওকে উপদেশ দিয়ে বললে, 'দেখো ঊর্মি, মনটাকে পথে চলতে চলতে কেবলই চলকিয়ে ফেলো না, পথের শেষে যখন পৌঁছোবে তখন ঘড়াটাতে বাকি থাকবে কী।'

বলত, 'তুমি প্রজাপতির মতো চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াও, কিছুই সংগ্রহ করে আন না। হতে হবে মৌমাছির মতো। প্রত্যেক মুহূর্তের হিসেব আছে। জীবনটা তো বিলাসিতা নয়।'

নীরদ সম্প্রতি ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরি থেকে শিক্ষাতত্ত্বর বই আনিয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে, তাতে এইরকম সব কথা আছে। ওর ভাষাটা বইয়ের ভাষা, কেননা, ওর নিজের সহজ ভাষা নেই।

ঊর্মির সন্দেহ রইল না যে সে অপরাধী। মহৎ ব্রত তার, অথচ তার থেকে কথায় কথায় মন আশে-পাশে চলে যায়। নিজেকে কেবলই লাঞ্ছিত করে। সামনেই দৃষ্টান্ত রয়েছে নীরদের; কী আশ্চর্য দৃঢ়তা, কী একাগ্র লক্ষ্য, সকলপ্রকার আমোদ-আহ্লাদের প্রতি কী কঠোর বিরুদ্ধতা! ঊর্মির টেবিলে গল্প কিংবা হালকা সাহিত্যের কোনো বই যদি দেখে তবে তখনই সেটা বাজেয়াপ্ত করে দেয়। একদিন বিকেলবেলায় ঊর্মির তদারক করতে এসে শুনলে সে গেছে ইংরেজি নাট্যশালায় সালিভ্যানের মিকাডো অপেরার বৈকালিক অভিনয় দেখবার জন্যে। তার দাদা থাকতে এরকম সুযোগ প্রায় বাদ যেত না। সেদিন নীরদ তাকে যথোচিত তিরস্কার করেছিল। অত্যন্ত গম্ভীর সুরে ইংরেজি ভাষায় বলেছিল, 'দেখো, তোমার দাদার মৃত্যুকে সমস্ত জীবন দিয়ে সার্থক করবার ভার নিয়েছ তুমি। এরই মধ্যে কি তা ভুলতে আরম্ভ করেছ।'

শুনে ঊর্মির অত্যন্ত পরিতাপ লাগল। ভাবলে, 'এ মানুষটার কী অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি। শোকস্মৃতির প্রবলতা সত্যই তো কমে আসছে— আমি নিজে তা বুঝতে পারি নি। ধিক্, এত চাপল্য আমার চরিত্রে!' সতর্ক হতে লাগল. কাপড়-চোপড় থেকে শোভার আভাস পর্যন্ত দূর করলে। শাড়িটা হল মোটা, তার রঙ সব গেল ঘুচে। দেরাজের মধ্যে জমা থাকা সত্ত্বেও চকোলেট খাওয়ার লোভটাকে দিলে ছেড়ে। অবাধ্য মনটাকে খুব কষে বাঁধতে লাগল সংকীর্ণ গণ্ডিতে, শুষ্ক কর্তব্যের খোঁটায়। দিদি তিরস্কার করে, শশাঙ্ক নীরদের উদ্দেশে যে-সব প্রখর বিশেষণ বর্ষণ করে সেগুলোর ভাষা অভিধান-বহির্ভূত উগ্র পরদেশীয়, একটুও সুশ্রাব্য নয়।

একটা জায়গায় নীরদের সঙ্গে শশাঙ্কের মেলে। শশাঙ্কের গাল দেবার আবেগ যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন তার ভাষাটা হয় ইংরেজি, নীরদের যখন উপদেশের বিষয়টা হয় অত্যন্ত উচ্চ-শ্রেণীর ইংরেজিই হয় তার বাহন। নীরদের সব চেয়ে খারাপ লাগে যখন নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে ঊর্মি তার দিদির ওখানে যায়। শুধু যায় তা নয়, যাবার ভারি আগ্রহ। ওদের সঙ্গে ঊর্মির যে আত্মীয়-সম্বন্ধ সেটা নীরদের সম্বন্ধকে খণ্ডিত করে।

নীরদ মুখ গম্ভীর করে একদিন ঊর্মিকে বললে, 'দেখো ঊর্মি, কিছু মনে কোরো না। কী করব বলো, তোমার সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব আছে, তাই কর্তব্যবোধে অপ্রিয় কথা বলতে হয়। আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, শশাঙ্কবাবুদের সঙ্গে সর্বদা মেলামেশা তোমার চরিত্রগঠনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। আত্মীয়তার মোহে তুমি অন্ধ, আমি কিন্তু দুর্গতির সম্ভাবনা সমস্তটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

ঊর্মির চরিত্র বললে যে পদার্থটা বোঝায় অন্তত তার প্রথম বন্ধকী দলিল নীরদেরই সিন্ধুকে, সেই চরিত্রের কোথাও কিছু হেরফের হলে লোকসান নীরদেরই। নিষেধের ফলে ভবানীপুর অঞ্চলে ঊর্মির গতিবিধি আজকাল নানাপ্রকার ছুতোয় বিরল হয়ে এসেছে। ঊর্মির এই আত্মশাসন মস্ত একটা ঋণশোধের মতো। ওর জীবনের দায়িত্ব নিয়ে নীরদ যে চিরদিনের মতো নিজের সাধনাকে ভারাক্রান্ত করেছে, বিজ্ঞান-তপস্বীর পক্ষে তার চেয়ে আত্ম-অপব্যয় আর কী হতে পারে।

নানা আকর্ষণ থেকে মনকে প্রতিসংহার করবার দুঃখটা ঊর্মির একরকম করে সয়ে আসছে। তবুও থেকে থেকে একটা বেদনা মনে দুর্বার হয়ে ওঠে, সেটাকে চঞ্চলতা বলে সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে না। নীরদ ওকে কেবল চালনাই করে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যে ওর সাধনা করে না কেন। এই সাধনার জন্যে ওর মন অপেক্ষা করে থাকে; এই সাধনার অভাবেই ওর হৃদয়ের মাধুর্য পূর্ণ-বিকাশের দিকে পৌঁছয় না, ওর সকল কর্তব্য নির্জীব নীরস হয়ে পড়ে। এক-একদিন হঠাৎ মনে হয়, যেন নীরদের চোখে একটা আবেশ এসেছে, যেন দেরি নেই, প্রাণের গভীরতম রহস্য এখনই ধরা পড়বে। কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, সেই গভীরের বেদনা যদি বা কোথাও থাকে তার ভাষা নীরদের জানা নেই। বলতে পারে না বলেই বলবার ইচ্ছাকে সে দোষ দেয়। বিচলিত চিত্তকে মূক রেখেই সে যে চলে আসে এটাকে সে আপন শক্তির পরিচয় বলে মনে গর্ব করে। বলে, 'সেন্টি-মেন্টালিটি করা আমার কর্ম নয়।' ঊর্মির সেদিন কাঁদতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এমনি তার দশা যে

সেও ভক্তিভরে মনে করে একেই বলে বীরত্ব। নিজের দুর্বল মনকে তখন নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করতে থাকে। যত চেষ্টাই করুক-না কেন, মাঝে মাঝে এ কথা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একদিন প্রবল শোকের মুখে যে কঠিন কর্তব্য নিজের ইচ্ছায় সে গ্রহণ করেছিল, কালক্রমে নিজের সেই ইচ্ছা দুর্বল হয়ে আসাতে অন্যের ইচ্ছাকেই আঁকড়ে ধরেছে।

নীরদ ওকে স্পষ্ট করেই বলে, 'দেখো ঊর্মি, সাধারণ মেয়েরা পুরুষদের কাছ থেকে যে সব স্তবস্তুতি প্রত্যাশা করে আমার কাছে তা পাবার সম্ভাবনা নেই, এ কথা জেনে রেখো। আমি তোমাকে যা দেব তা এই-সব বানানো কথার চেয়ে সত্য, ঢের বেশি মূল্যবান।'

ঊর্মি মাথা হেঁট করে চুপ করে থাকে। মনে মনে বলে, 'এঁর কাছে কি কোনো কথাই লুকোনো থাকবে না।'

কিছুতে মন বাঁধতে পারে না। ছাদের উপর একলা বেড়াতে যায়। অপরাহ্নের আলো ধূসর হয়ে আসে। শহরে উঁচুনিচু নানা আকারের বাড়ির চূড়া পেরিয়ে সূর্য অস্ত যায় দূর গঙ্গার ঘাটে জাহাজগুলোর মাস্তুলের পরপ্রান্তে। নানা রঙের লম্বা লম্বা মেঘের রেখা বেড়া তুলে দেয় দিনের প্রান্তসীমানায়। ক্রমে বেড়া যায় লুপ্ত হয়ে। চাঁদ উঠে আসে গির্জের শিখরের ঊর্ধ্বে; অনতিস্ফুট আলোতে শহর হয়ে আসে স্বপ্নের মতো, যেন অলৌকিক মায়াপুরী। মনে প্রশ্ন ওঠে, সত্যই কি জীবনটা এত অবিচলিত কঠিন। আর, সে কি এত কৃপণ। সে না দেবে ছুটি, না দেবে রস! হঠাৎ মনটা খেপে ওঠে, ইচ্ছে করে অত্যন্ত একটা দুষ্টুমি করতে, চেঁচিয়ে বলতে 'আমি কিচ্ছু মানি নে'।

ডামমালা

নীরদ রিসার্চের যে কাজ নিয়েছিল সেটা সমাপ্ত হল। য়ুরোপের কোনো বৈজ্ঞানিক সমাজে লেখাটা পাঠিয়ে দিলে। তারা প্রশংসা করলে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্কলারশিপ জুটল— স্থির করলে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নেবার জন্যে সমুদ্রে পাড়ি দেবে।

বিদায় নেবার সময় কোনো করুণ আলাপ হল না। কেবল এই কথাটাই বার বার করে বললে যে, 'আমি চলে যাচ্ছি, এখন তোমার কর্তব্যসাধনে শৈথিল্য করবে এই আমার আশঙ্কা।'

ঊর্মি বললে, 'কোনো ভয় করবেন না।'

নীরদ বললে, 'কিরকম ভাবে চলতে হবে, পড়াশুনো করতে হবে, তার একটা বিস্তারিত নোট দিয়ে যাচ্ছি।'

ঊর্মি বললে, 'আমি ঠিক সেই অনুসারেই চলব।'

'তোমার ঐ আলমারির বইগুলি কিন্তু আমি আমার বাসায় নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখতে চাই।'

'নিয়ে যান' বলে ঊর্মি চাবি দিল তার হাতে। সেতারটার দিকে একবার নীরদের চোখ পড়েছিল। দ্বিধা করে থেমে গেল।

অবশেষে নিতান্তই কর্তব্যের অনুরোধে নীরদকে বলতে হল, 'আমার কেবল একটা ভয় আছে, শশাঙ্কবাবুদের ওখানে আবার যদি তোমার যাতায়াত ঘন ঘন হতে থাকে তা হলে তোমার নিষ্ঠা যাবে দুর্বল হয়ে,—কোনো সন্দেহ নেই। মনে কোরো না আমি শশাঙ্কবাবুকে নিন্দা করি। উনি খুবই ভালো লোক। ব্যবসায়ে ওরকম উৎসাহ ওরকম বুদ্ধি কম বাঙালির মধ্যেই দেখেছি। ওঁর একমাত্র দোষ এই যে, উনি কোনো আইডিয়ালকেই মানেন না। সত্যি বলছি, ওঁর জন্যে অনেক সময়ই আমার ভয় হয়।'

এর থেকে শশাঙ্কের অনেক দোষের কথাই উঠল এবং যে সব দোষ আজ ঢাকা পড়ে আছে সেগুলো বয়সের সঙ্গে একে একে প্রবল আকারে প্রকাশ হয়ে পড়বে এই অত্যন্ত শোচনীয়

দুর্ভাবনার কথা নীরদ চেপে রাখতে পারল না। কিন্তু তা হোক, তবু উনি যে খুব ভালো লোক সে কথা ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে চায়। সেইসঙ্গে এ কথাও বলতে চায় ওর সঙ্গদোষ থেকে, ওদের বাড়ির আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানো ঊর্মির পক্ষে বিশেষ দরকার। ঊর্মির মন ওদের সমভূমিতে যদি নেবে যায় সেটা হবে অধঃপতন।

ঊর্মি বললে, 'আপনি কেন এত বেশি উদ্‌বিগ্ন হচ্ছেন?'

'কেন হচ্ছি শুনবে? রাগ করবে না?'

'সত্য কথা শোনবার শক্তি আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি। জানি সহজ নয়, তবু সহ্য করতে পারি।'

'তবে বলি শোনো। তোমার স্বভাবের সঙ্গে শশাঙ্কবাবুর স্বভাবের একটা মিল আছে, এ আমি লক্ষ করে দেখেছি। তাঁর মনটা একেবারে হালকা। সেইটেই তোমাকে ভালো লাগে, ঠিক কি না বলো।'

ঊর্মি ভাবে, লোকটা সর্বজ্ঞ নাকি। ভগ্নীপতিকে ওর খুব ভালো লাগে সন্দেহ নেই। তার প্রধান কারণ, শশাঙ্ক হো হো করে হাসতে পারে, উৎপাত করতে জানে, ঠাট্টা করে। আর ঠিকটি জানে ঊর্মি কোন্ ফুল ভালোবাসে আর কোন্ রঙের শাড়ি।

ঊর্মি বললে, 'হাঁ, আমার ভালো লাগে সে কথা সত্যি।'

নীরদ বললে, 'শর্মিলাদিদির ভালোবাসা স্নিগ্ধগম্ভীর, তাঁর সেবা যেন একটা পুণ্যকর্ম, কখনো কর্তব্য থেকে ছুটি নেন না। তারই প্রভাবে শশাঙ্কবাবু একমনে কাজ করতে শিখেছেন। কিন্তু যেদিন তুমি ভবানীপুরে যাও সেইদিনই ওঁর যেন মুখোশ খসে পড়ে, তোমার সঙ্গে ঝুটোপুটি বেধে যায়, চুলের কাঁটা তুলে নিয়ে খোঁপা এলিয়ে দেন, হাতে তোমার পড়বার বই দেখলে আল-মারির মাথার উপর রাখেন তুলে। টেনিস খেলবার শখ হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠে, হাতে কাজ থাকলেও।'

ঊর্মিকে মনে মনে মানতেই হল যে, শশাঙ্কদা এইরকম দৌরাত্ম্য করেন বলেই তাঁকে ওর এত ভালো লাগে। ওর নিজের ছেলেমানুষি তাঁর কাছে এলে ঢেউ খেলিয়ে ওঠে। সেও তাঁর 'পরে কম অত্যাচার করে না। দিদি ওদের দুজনের এই দুরন্তপনা দেখে তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ হাসি হাসেন। কখনো বা মৃদু তিরস্কারও করেন, কিন্তু সেটা তিরস্কারের ভান।

নীরদ উপসংহারে বললে, 'যেখানে তোমার নিজের স্বভাব প্রশ্রয় না পায় সেইখানেই তোমার থাকা চাই। আমি কাছে থাকলে ভাবনা থাকত না, কেননা আমার স্বভাব একেবারে তোমার বিপরীত। তোমার মন রক্ষে করতে গিয়ে তোমার মনকে মাটি করা, এ আমার দ্বারা কখনোই হতে পারত না।'

ঊর্মি মাথা নিচু করে বললে, 'আপনার কথা আমি সর্বদাই স্মরণ রাখব।'

নীরদ বললে, 'আমি কতকগুলো বই তোমার জন্যে রেখে যাচ্ছি। তার যে সব চ্যাপ্‌টারে দাগ দিয়েছি সেইগুলো বিশেষ করে পোড়ো, এর পরে কাজে লাগবে।'

ঊর্মির পক্ষে এই সাহায্যের দরকার ছিল। কেননা ইদানীং মাঝে মাঝে তার মনে কেবলই সন্দেহ আসছিল, ভাবছিল, 'হয়তো প্রথম উৎসাহের মুখে ভুল করেছি। হয়তো ডাক্তারি আমার ধাতের সঙ্গে মিলবে না।'

নীরদের দাগ-দেওয়া বইগুলো ওর পক্ষে শক্ত বাঁধনের কাজ করবে, ওকে টেনে নিয়ে চলতে পারবে উজান পথে।

নীরদ চলে গেলে ঊর্মি নিজের প্রতি আরো কঠিন অত্যাচার করলে শুরু। কলেজে যায়, আর বাকি সময় নিজেকে যেন একেবারে জেনেনার মধ্যে বন্ধ করে রাখে। সারা দিন পরে বাড়ি ফিরে এসে যতই তার শ্রান্ত মন ছুটি পেতে চায় ততই সে নিষ্ঠুরভাবে তাকে অধ্যয়নের শিকল জড়িয়ে আটকে রাখে। পড়া এগোয় না, একই পাতার উপর বার বার করে মন বৃথা ঘুরে বেড়ায়, তবু হার মানতে

চায় না। নীরদ উপস্থিত নেই বলেই তার দূরবর্তী ইচ্ছাশক্তি ওর প্রতি অধিক করে কাজ করতে লাগল।

নিজের উপর সব চেয়ে ধিক্‌কার হয় যখন কাজ করতে করতে আগেকার দিনের কথা কেবলই ফিরে ফিরে মনে আসে। যুবকদলের মধ্যে ওর ভক্ত ছিল অনেক। সেদিন তাদের কাউকে বা উপেক্ষা করেছে, কারো প্রতি ওর মনের টানও হয়েছিল। ভালোবাসা পরিণত হয় নি, কিন্তু ভালোবাসার ইচ্ছেটাই তখন মৃদুমন্দ বসন্তের হাওয়ার মতো মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। তাই আপন মনে গান গাইত গুন গুন করে, পছন্দসই কবিতা কপি করে রাখত খাতায়। মন অত্যন্ত উতলা হলে বাজাত সেতার। আজকাল এক-এক দিন সন্ধেবেলায় বইয়ের পাতায় যখন চোখ আছে তখন হঠাৎ চমকে উঠে জানতে পারে যে, তার মনে ঘুরছে এমন কোনো দিনের এমন কোনো মানুষের ছবি যে দিনকে যে মানুষকে পূর্বে সে কখনোই বিশেষভাবে আমল দেয় নি। এমন-কি, সে মানুষের অবিশ্রাম আগ্রহে সেদিন তাকে বিরক্ত করেছিল। আজ বুঝি তার সেই আগ্রহটাই নিজের ভিতরকার অতৃপ্তির বেদনাকে স্পর্শ করে করে যাচ্ছে, প্রজাপতির ক্ষণিক হালকা ডানা ফুলকে যেমন বসন্তের স্পর্শ দিয়ে যায়।

এ সব চিন্তাকে যত বেগে সে মন থেকে দূর করতে চায় সেই বেগের প্রতিঘাতই চিন্তাগুলিকে ততই ওর মনে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। নীরদের একখানা ফোটোগ্রাফ রেখেছে ডেস্কের উপর। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, আগ্রহের চিহ্ন নেই। সে ওকে ডাকে না, তবে ওর প্রাণ সাড়া দেবে কাকে। মনে মনে কেবলই জপ করে, কী প্রতিভা, কী তপস্যা, কী নির্মল চরিত্র, কী আমার অভাবনীয় সৌভাগ্য!

একটা বিষয়ে নীরদের জিত হয়েছে, সে কথাটাও বলা দরকার। নীরদের সঙ্গে ঊর্মির বিবাহের সম্বন্ধ হলে শশাঙ্ক এবং সন্দিগ্ধমনা আরো দশজন বিদ্রূপ করে হেসেছিল। বলেছিল, রাজারামবাবু সাদা লোক, ঠাউরে বসেছেন নীরদ আইডিয়ালিস্ট্। ওর আইডিয়ালিজম্ যে গোপনে ডিম পাড়ছে ঊর্মির টাকার থলির মধ্যে, এ কথাটা কি লম্বা লম্বা সাধুবাক্য দিয়ে ঢাকা যায়। আপনাকে স্যাক্রিফাইস্ করেছে বৈ কি, কিন্তু যে দেবতার কাছে— তাঁর মন্দিরটা ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে। আমরা সোজাসুজি শ্বশুরকে জানিয়ে থাকি, টাকার দরকার আছে, আর সে টাকা জলে পড়বে না, তাঁরই মেয়ের সেবায় লাগবে। ইনি মহৎ লোক, বলেন মহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরেই বিয়ে করবেন। তার পরে সেই উদ্দেশ্যটাকে দিনে দিনে তর্জমা করবেন শ্বশুরের চেক-বইয়ের খাতায়।

নীরদ জানত এইরকম কথাবার্তা অপরিহার্য। ঊর্মিকে বললে, 'আমার বিয়ে করার একটা শর্ত আছে; তোমার টাকা থেকে এক পয়সা নেব না, নিজের উপার্জন আমার একমাত্র অবলম্বন হবে।' শ্বশুর ওকে য়ুরোপে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন, ও কিছুতেই রাজি হল না। সেজন্যে অনেক দিন অপেক্ষা করতেও হল। রাজারামবাবুকে জানিয়েছিল, 'হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে যত টাকা দিতে চান সমস্তই দেবেন আপনার মেয়ের নামে। আমি যখন সেই হাসপাতালের ভার নেব তার থেকে কোনো বৃত্তি নেব না। আমি ডাক্তার, জীবিকার জন্যে আমার ভাবনা নেই।'

এই একান্ত নিস্পৃহতা দেখে ওর 'পরে রাজারামের ভক্তি দৃঢ় হল, আর ঊর্মি খুব গর্ব অনুভব করলে। এই গর্বের ন্যায্য কারণ ঘটাতেই শর্মিলার মন নীরদের 'পরে একেবারে বিরূপ হয়ে গেল। বললে, 'ঈস্! দেখব দেমাক কত দিন টেঁকে!' তার পর থেকে নীরদ যখন অভ্যাসমত অত্যন্ত গভীরভাবে কথা কইত শর্মিলা আলাপের মাঝখানে হঠাৎ উঠে পড়ে ঘাড় বাঁকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যেত। কিছু দূর পর্যন্ত শোনা যেত তার পায়ের শব্দ। ঊর্মির খাতিরে কিছু বলত না, কিন্তু তার না-বলার ব্যঞ্জনা যথেষ্ট তেজোদ্দীপ্ত ছিল।

প্রথম প্রথম নীরদ প্রতি মেলে চিঠিপত্রে চার-পাঁচ পাতা ধরে বিস্তারিত উপদেশ দিয়ে এসেছে। কিছুদিন পরে চমক লাগিয়ে দিলে টেলিগ্রাম। বড়ো অঙ্কের টাকার জরুরি দাবি, অধ্যয়নের প্রয়োজনে। যে গর্ব এতদিন ঊর্মির প্রধান সম্বল ছিল তাতে যথেষ্ট ঘা লাগল বটে, কিন্তু মনে

একটু সান্ত্বনাও পেলে। যত দিন যায় এবং নীরদের অনুপস্থিতি দীর্ঘ হয়ে ওঠে ততই ঊর্মির পূর্বস্বভাবটা কর্তব্যের বেড়ার মধ্যে ফাঁক খুঁজে বেড়ায়। নিজেকে নানা ছলে ফাঁকিও দেয়, অনুতাপও করে। এইরকম আত্মগ্লানির সময় নীরদকে অর্থসাহায্য ওর পরিতপ্ত মনের সান্ত্বনা-জনক।

ঊর্মি টেলিগ্রামটা ম্যানেজারের হাতে দিয়ে সসংকোচে বলে, 'কাকাবাবু, টাকাটা—'

ম্যানেজারবাবু বলেন, 'ধাঁধা লাগছে। আমরা তো জানতুম টাকাটা ও পক্ষে অস্পৃশ্য ছিল।'

ম্যানেজার নীরদকে পছন্দ করতেন না।

ঊর্মি বলে, 'কিন্তু বিদেশে—'

কথাটা শেষ করে না।

কাকাবাবু বলেন, 'এ দেশের স্বভাব বিদেশের মাটিতে বদলে যেতে পারে সে জানি—কিন্তু আমরা তার সঙ্গে তাল রাখব কী করে।'

ঊর্মি বলে, 'টাকাটা না পেলে হয়তো বিপদে পড়তে পারেন।'

'আচ্ছা বেশ, পাঠাচ্ছি মা, তুমি বেশি ভেবো না। বলে রাখছি এই শুরু হল, কিন্তু এই শেষ নয়।'

শেষ যে নয় অনতিকাল পরেই আরো বড়ো অঙ্কে তার প্রমাণ হল। এবার প্রয়োজন স্বাস্থ্যের। ম্যানেজার গম্ভীরমুখে বললেন, 'শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো।'

ঊর্মি শশব্যস্ত হয়ে বললে, 'আর যাই কর, দিদিরা এ খবরটা যেন না পান।'

'একলা এই দায়িত্ব নিতে ভালো লাগছে না।'

'একদিন তো টাকা তাঁর হাতেই পড়বে।'

'পড়বার আগে দেখতে হবে যেন জলে না পড়ে।'

'কিন্তু ওঁর স্বাস্থ্যের কথা তো ভাবতে হবে।'

'অস্বাস্থ্য নানা জাতের আছে, এটা ঠিক কোন্ জাতের বুঝে উঠতে পারছি নে। এখানে ফিরে এলে হয়তো হাওয়ার বদলে সুস্থ হতে পারেন। ফিরতি প্যাসেজের ব্যবস্থা করে পাঠানো যাক।'

ফেরবার প্রস্তাবে ঊর্মি এত যে বেশি বিচলিত হয়ে উঠল, ও নিজে ভাবলে তার কারণ পাছে নীরদের উচ্চ উদ্দেশ্য মাঝখানে বাধা পায়।

কাকা বললেন, 'এবারকার মতো টাকা পাঠাচ্ছি, কিন্তু মনে হচ্ছে এতে ডাক্তারবাবুর স্বাস্থ্য আরো বিগড়ে যাবে।'

রাধাগোবিন্দ ঊর্মির অনতিদূর সম্পর্কের আত্মীয়। কাকার কথাটার ইঙ্গিত ওকে বাজল। সন্দেহ এল মনে। ভাবতে লাগল, 'দিদিকে হয়তো বলতে হবে।'

এ দিকে নিজেকে ধাক্কা দিয়ে বার বার প্রশ্ন করছে, 'যথোচিত দুঃখ হচ্ছে না কেন।'

এই সময়ে শর্মিলার রোগটা নিয়ে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। ভাইয়ের কথা মনে পড়িয়ে ভয় লাগিয়ে দেয়। নানা ডাক্তার লাগল নানা দিক থেকে ব্যাধির আবাসগুহাটা খুঁজে বের করতে। শর্মিলা ক্লান্ত হাসি হেসে বললে, 'সি.আই.ডি.-দের হাতে অপরাধী যাবে ফসকে, খোঁচা খেয়ে মরবে নিরপরাধ।'

শশাঙ্ক চিন্তিতমুখে বললে, 'দেহটার খানাতল্লাশি চলুক শাস্ত্রমতেই, কিন্তু খোঁচাটা কিছুতেই নয়।'

এই সময়টাতেই শশাঙ্কর হাতে দুটো ভারী কাজ এসেছিল। একটা গঙ্গার ধারে পাটকলে, আর-একটা টালিগঞ্জের দিকে মীরপুরের জমিদারদের নূতন বাগানবাড়িতে। পাটকলের কুলিবস্তির কাজটা শেষ করে দেবার মেয়াদ ছিল তিন মাসের। গোটাকতক টিউবওয়েলের কাজ ছিল নানা

জায়গায়। শশাঙ্কর একটুও ফুরসুত ছিল না। শর্মিলার ব্যামোটা নিয়ে প্রায় তাকে আটকা পড়তে হয়, অথচ উৎকণ্ঠা থাকে কাজের জন্যে।

এতদিন ওদের বিবাহ হয়েছে, কিন্তু এমন কোনো ব্যামো শর্মিলার হয় নি যা নিয়ে শশাঙ্ককে কখনো বিশেষ করে ভাবতে হয়েছে। তাই এবারকার এই রোগটার উদ্‌বেগে ছেলেমানুষের মতো ছটফট করছে ওর মন। কাজ কামাই করে ঘুরে ফিরে বিছানার কাছে নিরুপায়ভাবে এসে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন আছ?' তখনি শর্মিলা উত্তর দেয়, 'তুমি মিথ্যে ভেবো না, আমি ভালোই আছি।'

সেটা বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে একান্ত ইচ্ছা বলেই শশাঙ্ক অবিলম্বে বিশ্বাস করে ছুটি পায়।

শশাঙ্ক বললে, 'ঢেংকানলের রাজার একটা বড়ো কাজ আমার হাতে এসেছে। প্ল্যানটা নিয়ে দেওয়ানের সঙ্গে আলাপ করতে হবে। যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব ডাক্তার আসবার আগেই।'

শর্মিলা অনুযোগ করে বললে, 'আমার মাথার দিব্যি রইল, তাড়াতাড়ি করে কাজ নষ্ট করতে পারবে না। বুঝতে পারছি ওদের দেশে তোমার যাবার দরকার আছে। নিশ্চয় যেয়ো, না গেলে আমি ভালো থাকব না। আমাকে দেখবার লোক ঢের আছে।'

প্রকাণ্ড একটা ঐশ্বর্য গড়ে তোলবার সংকল্প দিন-রাত জাগছে শশাঙ্কের মনে। তার আকর্ষণ ঐশ্বর্যে নয়, বড়োত্বে। বড়ো কিছুকে গড়ে তোলাতেই পুরুষের দায়িত্ব। অর্থ জিনিসটাকে তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করা চলে তখনি যখন তাতে দিনপাত হয় মাত্র। যখন তার চূড়াকে সমুচ্চ করে তোলা যায় তখনি সর্বসাধারণে তাকে শ্রদ্ধা করে। উপকার পায় বলে নয়, তার বড়োত্ব দেখাটাতেই চিত্তস্ফূর্তি। শর্মিলার শিয়রে বসে শশাঙ্কর মনে যখন উদ্‌বেগ চলছে সেই মুহূর্তেই সে না ভেবে থাকতে পারে না তার কাজের সৃষ্টিতে অনিষ্টের আশঙ্কা ঘটছে কোন্‌খানে। শর্মিলা জানে শশাঙ্কের এই ভাবনা কৃপণের ভাবনা নয়, নিজের অবস্থার নিম্নতল হতে জয়স্তম্ভ ঊর্ধ্বে গেঁথে তোলবার জন্যে পুরুষকারের ভাবনা। শশাঙ্কের এই গৌরবে শর্মিলা গৌরবান্বিত। তাই স্বামী যে ওর রোগের সেবা নিয়ে কাজে ঢিল দেবে এ তার পক্ষে সুখের হলেও ভালোই লাগে না। ওকে বারবার ফিরে পাঠায় তার কাজে।

এ দিকে নিজের কর্তব্য নিয়ে শর্মিলার উৎকণ্ঠার সীমা নেই। সে রইল বিছানায় পড়ে, ঠাকুর-চাকররা কী কাণ্ড করছে কে জানে। মনে সন্দেহ নেই যে রান্নায় ঘি দিচ্ছে খারাপ, নাবার ঘরে যথাসময়ে গরম জল দিতে ভুলেছে, বিছানার চাদর বদল করা হয় নি, নর্দমাগুলোতে মেথরের ঝাঁটা নিয়মিত পড়ছে না। ও দিকে ধোবার বাড়ির কাপড় ফর্দ মিলিয়ে বুঝে না নিলে কিরকম উলটপালট হয় সে তো জানা আছে। থাকতে পারে না, লুকিয়ে বিছানা ছেড়ে তদন্ত করতে যায়, বেদনা বেড়ে ওঠে, জ্বর যায় চড়ে, ডাক্তার ভেবে পায় না, এ কী হল!

অবশেষে ঊর্মিমালাকে তার দিদি ডেকে পাঠালে। বললে, 'কিছুদিন তোর কলেজ থাক, আমার সংসারটাকে রক্ষা কর্ বোন। নইলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারছি নে।'

এই ইতিহাসটা যাঁরা পড়ছেন এই জায়গাটাতে এসে মুচকে হেসে বলবেন 'বুঝেছি'। বুঝতে অত্যন্ত বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। যা ঘটবার তাই ঘটে, আর তাই যথেষ্ট। এমনও মনে করবার হেতু নেই ভাগ্যের খেলা চলবে তাসের কাগজ গোপন করে, শর্মিলারই চোখে ধুলো দিয়ে।

'দিদির সেবা করতে চলেছি', বলে ঊর্মির মনে খুব একটা উৎসাহ হল। এই কর্তব্যের খাতিরে অন্য সমস্ত কাজকে সরিয়ে রাখতেই হবে। উপায় নেই। তা ছাড়া এই শুশ্রূষার কাজটা ওর ভাবীকালের ডাক্তারি কাজেরই সংলগ্ন, এ তর্কও তার মনে এসেছে।

ঘটা করে একটা চামড়া-বাঁধানো নোটবই নিলে। তার মধ্যে রোগের দৈনিক জোয়ার-ভাঁটার পরিমাণটাকে রেখাঙ্কিত করবার ছক কাটা আছে। ডাক্তার পাছে অনভিজ্ঞ বলে অবজ্ঞা করে এইজন্যে স্থির করলে দিদির রোগ সম্বন্ধে যেখানে যা পাওয়া যায় পড়ে নেবে। ওর এম.এস্‌সি. পরীক্ষার

বিষয় শারীরতত্ত্ব, এইজন্যে রোগতত্ত্বের পারিভাষিক বুঝতে ওর কষ্ট হবে না। অর্থাৎ, দিদির সেবার উপলক্ষে ওর কর্তব্যসূত্র যে ছিন্ন হবে না, বরঞ্চ আরো বেশি একান্তমনে কঠিনতর চেষ্টায় তারই অনুসরণ করা হবে, এ কথাটা মনে সে নিশ্চিত করে নিয়ে ওর পড়বার বই আর খাতাপত্র ব্যাগে পুরে ভবানীপুরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। দিদির ব্যামোটা নিয়ে রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটা বইটা নাড়াচাড়া করবার সুযোগ ঘটল না। কেননা বিশেষজ্ঞরাও রোগের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারলে না।

ঊর্মি ভাবলে, সে শাসনকর্তার কাজ পেয়েছে। তাই সে গম্ভীরমুখে দিদিকে বললে, 'ডাক্তারের কথা যাতে খাটে তাই দেখবার ভার আমার উপর, আমার কথা কিন্তু মেনে চলতে হবে আমি তোমাকে বলে রাখছি।'

দিদি ওর দায়িত্বের আড়ম্বর দেখে হেসে বললে, 'তাই তো, হঠাৎ এত গম্ভীর হতে শিখলি কোন্ গুরুর কাছে। নতুন দীক্ষা বলেই এত বেশি উৎসাহ। আমারই কথা মেনে চলবি বলেই তোকে আমি ডেকেছি। তোর হাসপাতাল তো এখনো তৈরি হয় নি, আমার ঘরকন্না তৈরি হয়েই আছে। আপাতত সেই ভারটা নে, তোর দিদি একটু ছুটি পাক।'

রোগশয্যার কাছ থেকে ঊর্মিকে জোর করেই দিদি সরিয়ে দিলে।

আজ দিদির গৃহরাজ্যে প্রতিনিধিপদ ওর। সেখানে অরাজকতা ঘটছে, আশু তার প্রতিবিধান চাই। এ সংসারের সর্বোচ্চ শিখরে একটিমাত্র যে পুরুষ বিরাজ করছেন তাঁর সেবায় সামান্য কোনো ত্রুটি না হয়, এই মহৎ উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ত্যাগস্বীকার এই ঘরের ছোটো-বড়ো সমস্ত অধিবাসীর একটিমাত্র সাধনার বিষয়। মানুষটি নিরতিশয় নিরুপায় এবং দেহযাত্রানির্বাহে শোচনীয়ভাবে অকর্মণ্য, এই সংস্কার কোনোমতেই শর্মিলার মন থেকে ঘুচতে চায় না। হাসিও পায়, অথচ মনটা স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে, যখন দেখে চুরটের আগুনে ভদ্রলোকের আস্তিন খানিকটা পুড়েছে, অথচ লক্ষ্যই নেই। ভোরবেলায় মুখ ধুয়ে শোবার ঘরের কোণের কলটা খুলে রেখে এঞ্জিনিয়র কাজের তাড়ায় দৌড় দিয়েছে বাইরে, ফিরে এসে দেখে মেজে জলে থইথই করছে, নষ্ট হয়ে গেল কার্পেটটা। এই জায়গায় কলটা বসাবার সময়ে গোড়াতেই আপত্তি করেছিল শর্মিলা। জানত এই পুরুষটির হাতে বিছানার অদূরে ঐ কোণাটাতে প্রতিদিন জলে-স্থলে একটা পঙ্কিল অনাসৃষ্টি বাধবে। কিন্তু মস্ত এঞ্জিনিয়র, বৈজ্ঞানিক সুবিধার দোহাই দিয়ে যতরকম অসুবিধাকে জটিল করে তুলতেই ওর উৎসাহ। খামকা কী মাথায় এল একবার, নিজের সম্পূর্ণ ওরিজিনাল প্ল্যানে একটা স্টোভ বানিয়ে বসল। তার এ দিকে দরজা, ও দিকে দরজা; এ দিকে একটা চোঙ, ও দিকে আরেকটা; এক দিকে আগুনের অপব্যয়হীন উদ্দীপন, আর একদিকে ঢালু পথে ছাইয়ের নিঃশেষে অধঃপাতন—তার পরে সেঁকবার ভাজবার সিদ্ধ করবার জল-গরমের নানা আকারের খোপখাপ, গুহাগহ্বর, কলকৌশল। কলটাকে উৎসাহের ভঙ্গিতে ও ভাষাতেই মেনে নিতে হয়েছিল, ব্যবহারের জন্যে নয়, শান্তি ও সদ্ভাব-রক্ষার জন্যে। প্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের এই খেলা! বাধা দিলে অনর্থ বাধে, অথচ দুদিনেই যায় ভুলে। চিরদিনের বাঁধা ব্যবস্থায় মন যায় না, উদ্ভট একটা-কিছু সৃষ্টি করে, আর স্ত্রীদের দায়িত্ব হচ্ছে মুখে ওদের মতে সায় দেওয়া এবং কাজে নিজের মতে চলা। এই স্বামী পালনের দায় এতদিন আনন্দে বহন করে এসেছে শর্মিলা।

এতকাল তো কাটল। নিজেকে বিবর্জিত করে শশাঙ্কের জগৎকে শর্মিলা কল্পনাই করতে পারে না। আজ ভয় হচ্ছে মৃত্যুর দূত এসে জগৎ আর জগদ্ধাত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায় বুঝি-বা। এমন-কি, ওর আশঙ্কা যে, মৃত্যুর পরেও শশাঙ্কের দৈহিক অযত্ন শর্মিলার বিদেহী আত্মাকে শান্তিহীন করে রাখবে। ভাগ্যে ঊর্মি ছিল। সে ওর মতো শান্ত নয়। তবু ওর হয়ে কাজকর্ম চালিয়ে নিচ্ছে। সে কাজও তো মেয়েদের হাতের কাজ। ঐ স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ না থাকলে পুরুষদের প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনে রস থাকে না যে, সমস্তই যে কিরকম শ্রীহীন হয়ে যায়। তাই ঊর্মি যখন তার সুন্দর হাতে ছুরি নিয়ে আপেলের খোসা ছাড়িয়ে কেটে কেটে রাখে, কমলালেবুর

কোয়াগুলিকে গুছিয়ে রাখে সাদা পাথরের থালার এক পাশে, বেদানা ভেঙে তার দানাগুলিকে যত্ন করে সাজিয়ে দেয়, তখন শর্মিলা তার বোনের মধ্যে যেন নিজেকেই উপলব্ধি করে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকে সর্বদাই কাজের ফরমাশ করছে—

ওর সিগারেট-কেস্‌টা ভরে দে-না, ঊর্মি

দেখছিস নে ময়লা রুমালটা বদলাবার খেয়াল নেই

ঐ দেখ্‌, জুতোটা সিমেন্টে বালিতে জমে নিরেট হয়ে রয়েছে। বেহারাকে সাফ করতে হুকুম করবে তার হুঁশ নেই

বালিশের ওয়াড়গুলো বদলে দে-না ভাই

ফেলে দে ঐ ছেঁড়া কাগজগুলো ঝুড়ির মধ্যে।

একবার আপিস ঘরটা দেখে আসিস তো ঊর্মি, আমি নিশ্চয় বলছি ওঁর ক্যাশবাক্সের চাবিটা ডেস্কের উপর ফেলে রেখে বেরিয়ে গেছেন

ফুলকোপির চারাগুলি তুলে পোঁতবার সময় হল, মনে থাকে যেন

মালীকে বলিস গোলাপের ডালগুলো ছেঁটে দিতে

ঐ দেখ্‌ কোটের পিঠেতে চুন লেগেছে—এত তাড়া কিসের, একটু দাঁড়াও-না—ঊর্মি, দে তো বোন, বুরুশ ক'রে।

ঊর্মি বই-পড়া মেয়ে, কাজ-করা মেয়ে নয়, তবু ভারি মজা লাগছে। যে কড়া নিয়মের মধ্যে সে ছিল তার থেকে বেরিয়ে এসে কাজকর্ম সমস্তই ওর কাছে অনিয়মের মতোই ঠেকছে। এই সংসারের কর্মধারার ভিতরে ভিতরে যে উদ্‌বেগ আছে, সাধনা আছে, সে তো ওর মনে নেই—সেই চিন্তার সূত্রটি আছে ওর দিদির মধ্যে। তাই ওর কাছে এই কাজগুলো খেলা, একরকম ছুটি, উদ্দেশ্যবিবর্জিত উদ্‌যোগ। ও যেখানে এতদিন ছিল এ তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ। এখানে ওর সম্মুখে কোনো লক্ষ্য তর্জনী তুলে নেই, অথচ দিনগুলো কাজ দিয়ে পূর্ণ, সে কাজ বিচিত্র। ভুল হয়, ত্রুটি হয়, তার জন্যে কঠিন জবাবদিহি নেই। যদি-বা দিদি একটু তিরস্কার করতে চেষ্টা করে শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দেয়, যেন ঊর্মির ভুলটাতেই বিশেষ একটা রস আছে। বস্তুত আজকাল ওদের ঘরকন্নাতে দায়িত্বের গাম্ভীর্য চলে গেছে; ভুলচুকে কিছু আসে যায় না এমন একটা আলগা অবস্থা ঘটেছে; এইটেই শশাঙ্কের কাছে ভারি আরামের ও কৌতুকের। মনে হচ্ছে যেন পিক্‌নিক্‌ চলছে। আর, ঊর্মি যে কিছুতেই চিন্তিত নয়, দুঃখিত নয়, লজ্জিত নয়, সব-তাতেই উচ্ছ্বসিত, এতে শশাঙ্কের নিজের মন থেকে তার গুরুভার কর্মের পীড়নকে লঘু করে দেয়। কাজ শেষ হলেই, এমন-কি না হলেও, বাড়িতে ফিরে আসবার জন্যে ওর মন উৎসুক হয়ে ওঠে।

এ কথা মানতেই হবে ঊর্মি কাজে পটু নয়। তবু একটা জিনিস লক্ষ করে দেখা গেল, কাজ দিয়ে না হোক, নিজেকে দিয়েই এ বাড়ির অনেক দিনের মস্ত একটা অভাব পূরণ করেছে—সেই অভাবটা ঠিক যে কী তা নির্দিষ্ট ভাষায় বলা যায় না। তাই, শশাঙ্ক যখন বাড়িতে আসে তখন সেখানকার হাওয়ায় খেলানো একটা ছুটির হিল্লোল অনুভব করে। সেই ছুটি কেবল ঘরের সেবায় নয়, কেবল অবকাশমাত্রে নয়, তার একটা রসময় স্বরূপ আছে। বস্তুত ঊর্মির নিজের ছুটির আনন্দ এখানকার সমস্ত শূন্যকে পূর্ণ করেছে, দিনরাত্রিকে চঞ্চল করে রেখেছে। সেই নিরন্তর চাঞ্চল্য কর্মক্লান্ত শশাঙ্কের রক্তকে দোলায়িত করে তোলে। অপর পক্ষে শশাঙ্ক ঊর্মিকে নিয়ে আনন্দিত, সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই ঊর্মিকে আনন্দ দেয়। এতকাল সেই সুখটাই ঊর্মি পায় নি। সে যে আপনার অস্তিত্বমাত্র দিয়ে কাউকে খুশি করতে পারে এই তথ্যটি অনেক দিন তার কাছে চাপা পড়ে গিয়েছিল, এতেই তার যথার্থ গৌরবহানি হয়েছিল।

শশাঙ্কের খাওয়া-পরা অভ্যাসমত চলছে কি না, ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসের জোগান হল কি হল না, সেটা এ বাড়ির প্রভুর মনে গৌণ হয়েছে আজ; অমনিতেই, অকারণেই আছে প্রসন্ন। শর্মিলাকে

সে বলে, 'তুমি খুঁটিনাটি নিয়ে অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। অভ্যাসের একটু হেরফের হলে তো অসুবিধে হয় না, সে তো ভালোই লাগে।'

শশাঙ্কর মনটা এখন জোয়ারভাঁটার মাঝখানকার নদীর মতো। কাজের বেগটা থমথমে হয়ে এসেছে। একটু কোনো দেরিতেই বা বাধাতেই মুশকিল হবে, লোকসান হবে, এমনতরো উদ্‌বেগের কথা সদাসর্বদা শোনা যায় না। সেরকম কিছু প্রকাশ হলে ঊর্মি তার গাম্ভীর্য ভেঙে দেয়, হেসে ওঠে, মুখের ভাবখানা দেখে বলে, 'আজ তোমার জুজু এসেছিল বুঝি, সেই সবুজ পাগড়ি-পরা কোন-দেশী দালাল—ভয় দেখিয়ে গেছে বুঝি।'

শশাঙ্ক বিস্মিত হয়ে বলে, 'তুমি তাকে জানলে কী করে।'

'আমি তাকে খুব চিনি। তুমি সেদিন বেরিয়ে গিয়েছিলে, ও একলা বারান্দায় বসে ছিল। আমিই তাকে নানা কথা বলে ভুলিয়ে রেখেছিলুম। তার বাড়ি বিকানীয়রে, তার স্ত্রী মরেছে মশারিতে আগুন লেগে, আর-একটা বিয়ের সন্ধানে আছে।'

'তা হলে এখন থেকে হিসেব করে সে রোজ আসবে, যখন আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব। যতদিন স্ত্রীর ঠিকানা না মেলে ততদিন তার স্বপ্নটা জমবে।'

'আমাকে বলে যেয়ো ওর কাছ থেকে কী কাজ আদায় করতে হবে। ভাব দেখে বোধ হয় আমি পারব।'

আজকাল শশাঙ্কর মুনফার খাতায় নিরেনব্বইয়ের ওপারে যে মোটা অঙ্কগুলো চলৎ অবস্থায়, তারা মাঝে মাঝে যদি একটু সবুর করে সেটাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠবার মতো চাঞ্চল্য দেখা যায় না। সন্ধ্যাবেলায় রেডিয়োর কাছে কান পাতবার জন্যে শশাঙ্ক মজুমদারের উৎসাহ এত কাল অনভিব্যক্ত ছিল। আজকাল ঊর্মি যখন তাকে টেনে আনে তখন ব্যাপারটাকে তুচ্ছ এবং সময়টাকে ব্যর্থ মনে হয় না। এরোপ্লেন-ওড়া দেখবার জন্যে একদিন ভোরবেলা দমদম পর্যন্ত যেতে হল, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তার প্রধান আকর্ষণ নয়। নিউমার্কেটে শপিং করতে এই তার প্রথম হাতে-খড়ি। এর আগে শর্মিলা মাঝে মাঝে মাছমাংস ফলমূল শাকসবজি কিনতে সেখানে যেত। সে জানত এ কাজটা বিশেষভাবে তারই বিভাগের। এখানে শশাঙ্ক যে তার সহযোগিতা করবে এমন কথা সে কখনো মনেও করে নি, ইচ্ছেও করে নি। কিন্তু ঊর্মি তো কিনতে যায় না, কেবল জিনিসপত্র উলটেপালটে দেখে বেড়ায়, ঘেঁটে বেড়ায়, দর করে। শশাঙ্ক যদি কিনে দিতে চায় তার টাকার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে হাজতে রাখে।

শশাঙ্কর কাজের দরদ ঊর্মি একটুও বোঝে না। কখনো কখনো অত্যন্ত বাধা দেওয়ায় শশাঙ্কর কাছে তিরস্কার পেয়েছে। তার ফল এমন শোকাবহ হয়েছিল যে তার শোচনীয়তা অপসারণ করবার জন্যে শশাঙ্ককে দ্বিগুণ সময় দিতে হয়েছে। এক দিকে ঊর্মির চোখে বাষ্পসঞ্চার, অন্য দিকে অপরিহার্য কাজের তাড়া। তাই, সংকটে পড়ে অবশেষে বাড়ির বাইরে চেম্বারেই ওর সমস্ত কাজকর্ম সেরে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু অপরাহ্ণ পেরোলেই সেখানে থাকা দুঃসহ হয়ে ওঠে। কোনো কারণে যেদিন বিশেষ দেরি করে সেদিন ঊর্মির অভিমান দুর্ভেদ্য মৌনের অন্তরালে দুরভিভব হয়ে ওঠে। এই রুদ্ধ অশ্রুতে কুহেলিকাচ্ছন্ন অভিমানটা ভিতরে ভিতরে শশাঙ্ককে আনন্দ দেয়। ভালোমানুষটির মতো বলে, 'ঊর্মি, কথা কইবে না এ সত্যাগ্রহ রক্ষা করাই উচিত। কিন্তু দোহাই ধর্ম, খেলবে না এমন পণ তো ছিল না।' তার পরে টেনিস-ব্যাট হাতে করে চলে আসে। খেলায় শশাঙ্ক জিতের কাছাকাছি এসে ইচ্ছে করেই হারে। নষ্ট সময়ের জন্যে আবার পরের দিন সকালে উঠেই অনুতাপ করতে থাকে।

কোনো-একটা ছুটির দিনে বিকেলবেলায় শশাঙ্ক যখন ডান হাতে লাল-নীল পেন্সিল নিয়ে বাঁ আঙুলগুলো দিয়ে অকারণে চুল উসকোখুসকো করতে করতে আপিসের ডেস্কে বসে কোনো-একটা দুঃসাধ্য কাজের উপর ঝুঁকে পড়েছে, ঊর্মি এসে বলে, 'তোমার সেই দালালের সঙ্গে

ঠিক করেছি আজ আমাকে পরেশনাথের মন্দির দেখাতে নিয়ে যাবে। চলো আমার সঙ্গে। লক্ষ্মীটি।'

শশাঙ্ক মিনতি করে বলে, 'না ভাই, আজ না, এখন আমার ওঠবার জো নেই।'

কাজের গুরুত্বে ঊর্মি একটুও ভয় পায় না। বলে, 'অবলা রমণীকে অরক্ষিত অবস্থায় সবুজ পাগড়ি-ধারীর হাতে সমর্পণ করে দিতে সংকোচ নেই, এই বুঝি তোমার শিভল্‌রি!'

শেষকালে ওর টানাটানিতে শশাঙ্ক কাজ ফেলে যায় মোটর হাঁকিয়ে। এইরকম উৎপাত চলছে টের পেলে শর্মিলা বিষম বিরক্ত হয়। কেননা, ওর মতে পুরুষের সাধনার ক্ষেত্রে মেয়েদের অনধিকার প্রবেশ কোনোমতেই মার্জনীয় নয়। ঊর্মিকে শর্মিলা বরাবর ছেলেমানুষ বলেই জেনেছে। আজও সেই ধারণাটা ওর মনে আছে। তা হোক, তাই বলে আপিস-ঘর তো ছেলেখেলার জায়গা নয়। তাই, ঊর্মিকে ডেকে যথেষ্ট কঠিনভাবেই তিরস্কার করে। সে তিরস্কারের নিশ্চিত ফল হতে পারত, কিন্তু স্ত্রীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে শশাঙ্ক স্বয়ং দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ঊর্মিকে আশ্বাস দিয়ে চোখ টিপতে থাকে। তাসের প্যাক দেখিয়ে ইশারা করে, ভাবখানা এই যে, 'চলে এসো, আপিস-ঘরে বসে তোমাকে পোকার খেলা শেখাব।' এখন খেলার সময় একেবারেই নয়, এবং খেলবার কথা মনে আনবারও সময় ও অভিপ্রায় ওর ছিল না। কিন্তু দিদির কঠোর ভর্ৎসনায় ঊর্মির মনে বেদনা লাগছে এটা তাকে যেন ঊর্মির চেয়েও বেশি বাজে। ও নিজেই তাকে অনুনয়, এমন-কি, ঈষৎ তিরস্কার করে কাজের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখতে পারত, কিন্তু শর্মিলা যে এই নিয়ে ঊর্মিকে শাসন করবে এইটে সহ্য করা ওর পক্ষে বড়ো কঠিন।

শর্মিলা শশাঙ্ককে ডেকে বলে, 'তুমি ওর সব আবদার এমন করে শুনলে চলবে কেন। সময় নেই, অসময় নেই, তোমার কাজের লোকসান হয় যে।'

শশাঙ্ক বলে, 'আহা ছেলেমানুষ, এখানে ওর সঙ্গী নেই কেউ, একটু খেলাধুলো না পেলে বাঁচবে কেন।'

এই তো গেল নানাপ্রকার ছেলেমানুষি। ও দিকে শশাঙ্ক যখন বাড়ি তৈরির প্ল্যান নিয়ে পড়ে, ও তার পাশে চৌকি টেনে নিয়ে এসে বলে 'বুঝিয়ে দাও'। সহজেই বোঝে, গাণিতিক নিয়মগুলো জটিল ঠেকে না। শশাঙ্ক ভারি খুশি হয়ে উঠে ওকে প্রব্‌লেম দেয়, ও কষে নিয়ে আসে। জুট্‌ কোম্পানির স্টীমলঞ্চে শশাঙ্ক কাজ তদন্ত করতে যায়, ও ধরে বসে 'আমিও যাব'। শুধু যায় তা নয়, মাপজোখের হিসাব নিয়ে তর্ক করে, শশাঙ্ক পুলকিত হয়ে ওঠে। ভরপুর কবিত্বের চেয়ে এর রস বেশি। এখন তাই চেম্বারের কাজ যখন বাড়িতে নিয়ে আসে তা নিয়ে ওর মনে আশঙ্কা থাকে না! লাইন টানা, আঁক কষার কাজে তার সঙ্গী জুটেছে। ঊর্মিকে পাশে নিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কাজ এগোয়। খুব দ্রুতবেগে এগোয় না বটে, কিন্তু সময়ের দীর্ঘতাকে সার্থক মনে হয়।

এইখানটাতে শর্মিলাকে রীতিমত ধাক্কা দেয়। ঊর্মির ছেলেমানুষিও সে বোঝে, তার গৃহিণীপনার ত্রুটিও সস্নেহে সহ্য করে, কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীবুদ্ধির দূরত্বকে স্বয়ং অনিবার্য বলে মেনে নিয়েছিল— সেখানে ঊর্মির অবাধে গতিবিধি ওর একটুও ভালো লাগে না। ওটা নিতান্তই স্পর্ধা। আপন আপন সীমা মেনে চলাকেই গীতা বলেন স্বধর্ম।

মনে মনে অত্যন্ত অধীর হয়েই একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা ঊর্মি, তোর কি ঐ-সব আঁকাজোখা, আঁক কষা, ট্রেস্‌ করা সত্যিই ভালো লাগে।'

'আমার ভারি ভালো লাগে, দিদি।'

শর্মিলা অবিশ্বাসের সুরে বললে, 'হাঃ ভালো লাগে! ওকে খুশি করবার জন্যই দেখাস যেন ভালো লাগে।'

নাহয় তাই হল। খাওয়ানো-পরানো সেবা-যত্নে শশাঙ্ককে খুশি করাটা তো শর্মিলার মনঃপূত। কিন্তু এই জাতের খুশিটা ওর নিজের খুশির জাতের সঙ্গে মেলে না।

শশাঙ্ককে বারবার ডেকে বলে, 'ওকে নিয়ে সময় নষ্ট কর কেন? ওতে যে তোমার কাজের ক্ষতি হয়। ও ছেলেমানুষ, এ-সব কী বুঝবে?'

শশাঙ্ক বলে, 'আমার চেয়ে কম বোঝে না।'

মনে করে এই প্রশংসায় দিদিকে বুঝি আনন্দ দেওয়াই হল। নির্বোধ!

নিজের কাজের গৌরবে শশাঙ্ক যখন আপন স্ত্রীর প্রতি মনোযোগকে খাটো করেছিল তখন শর্মিলা সেটা যে শুধু অগত্যা মেনে নিয়েছিল তা নয়, তাতে সে গর্ব বোধ করত। তাই, ইদানীং আপন সেবাপরায়ণ হৃদয়ের দাবি অনেক পরিমাণেই কমিয়ে এনেছে। ও বলত, পুরুষমানুষ রাজার জাত, দুঃসাধ্য কর্মের অধিকার ওদের নিয়তই প্রশস্ত করতে হবে। নইলে তারা মেয়েদের চেয়েও নিচু হয়ে যায়। কেননা মেয়েরা আপন স্বাভাবিক মাধুর্যে ভালোবাসার জন্মগত ঐশ্বর্যেই সংসারে প্রতিদিন আপন আসনকে সহজেই সার্থক করে। কিন্তু পুরুষের নিজেকে সার্থক করতে হয় প্রত্যহ যুদ্ধের দ্বারা। সেকালে রাজারা বিনা প্রয়োজনেই রাজ্যবিস্তার করতে বেরোত। রাজ্যলোভের জন্যে নয়, নূতন করে পৌরুষের গৌরব প্রমাণের জন্যে। এই গৌরবে মেয়েরা যেন বাধা না দেয়। শর্মিলা বাধা দেয় নি, ইচ্ছা করেই শশাঙ্ককে তার লক্ষ্যসাধনায় সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিয়েছে। এক সময়ে তাকে ওর সেবাজালে জড়িয়ে ফেলেছিল, মনে দুঃখ পেলেও সেই জালকে ক্রমশ খর্ব করে এনেছে। এখনো সেবা যথেষ্ট করে, অদৃশ্যে, নেপথ্যে।

হায় রে, আজ ওর স্বামীর এ কী পরাভব দিনে দিনে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। রোগশয্যা থেকে সব ও দেখতে পায় না, কিন্তু যথেষ্ট আভাস পায়। শশাঙ্কের মুখ দেখলেই বুঝতে পারে, সে যেন সর্বদাই কেমন আবিষ্ট হয়ে আছে। ঐ একরত্তি মেয়েটা এসে অল্প এই কদিনেই এতবড়ো সাধনার আসন থেকে ঐ কর্মকঠিন পুরুষকে বিচলিত করে দিলে। আজ স্বামীর এই অশ্রদ্ধেয়তা শর্মিলাকে রোগের বেদনার চেয়েও বেশি করে বাজছে।

শশাঙ্কের আহারবিহার বেশবাসের চিরাচরিত ব্যবস্থায় নানারকম ত্রুটি হচ্ছে সন্দেহ নেই। যে পথ্যটা তার বিশেষ রুচিকর সেটাই খাবার সময় হঠাৎ দেখা যায় অবর্তমান। তার কৈফিয়ত মেলে, কিন্তু কোনো কৈফিয়তকে এ সংসার এতদিন আমল দেয় নি। এ-সব অনবধানতা ছিল অমার্জনীয়, কঠোর শাসনের যোগ্য; সেই বিধিবদ্ধ সংসারে আজ এতবড়ো যুগান্তর ঘটেছে যে, গুরুতর ত্রুটিগুলোও প্রহসনের মতো হয়ে উঠল। দোষ দেব কাকে! দিদির নির্দেশমত ঊর্মি যখন রান্নাঘরে বেতের মোড়ার উপর বসে পাকপ্রণালীর পরিচালনকার্যে নিযুক্ত, সঙ্গে সঙ্গে পাচক-ঠাকরুনের পূর্বজীবনের বিবরণগুলির পর্যালোচনাও চলছে, এমন সময় শশাংক হঠাৎ এসে বলে, 'ও-সব এখন থাক্।'

'কেন, কী করতে হবে?'

'আমার এ বেলা ছুটি আছে, চলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিল্‌ডিংটা দেখবে। ওটার গুমর দেখলে হাসি পায় কেন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।'

এত বড়ো প্রলোভনে কর্তব্যে ফাঁকি দিতে ঊর্মির মনও তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। শর্মিলা জানে পাকশালা থেকে তার সহোদরার অন্তর্ধানে আহার্যের উৎকর্ষসাধনে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না, তবু স্নিগ্ধ হৃদয়ের যত্নটুকু শশাঙ্কের আরামকে অলংকৃত করে। কিন্তু আরামের কথা তুলে কী হবে যখন প্রতিদিনই স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আরামটা সামান্য হয়ে গেছে, স্বামী হয়েছে খুশি।

এইদিক থেকে শর্মিলার মনে এল অশান্তি। রোগশয্যায় এপাশ-ওপাশ ফিরতে ফিরতে নিজেকে বারবার করে বলেছে, মরবার আগে ঐ কথাটুকু বুঝে গেলুম। আর সবই করেছি, কেবল খুশি করতে পারি নি। ভেবেছিলুম ঊর্মিমালার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাব, কিন্তু ও তো আমি নয়, ও যে সম্পূর্ণ আর-এক মেয়ে।' জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে, 'আমার জায়গা ও নেয় নি, ওর জায়গা আমি নিতে পারব না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে, কিন্তু ও চলে গেলে সব শূন্য হবে।'

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শীতের দিন আসছে, গরম কাপড়গুলো রোদ্দুরে দেওয়া চাই। ঊর্মি তখন শশাঙ্কর সঙ্গে পিংপং খেলছিল, ডেকে পাঠালে।

বললে, 'ঊর্মি, এই নে চাবি। গরম কাপড়গুলো ছাদের উপর রোদে মেলে দে গে।'

ঊর্মি আলমারিতে চাবি সবেমাত্র লাগিয়েছে এমন সময় শশাঙ্ক এসে বললে, 'ও-সব পরে হবে, ঢের সময় আছে। খেলাটা শেষ করে যাও।'

'কিন্তু দিদি—'

'আচ্ছা, দিদির কাছে ছুটি নিয়ে আসছি।'

দিদি ছুটি দিলে, সেইসঙ্গে বড়ো একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

দাসীকে ডেকে বললে, 'দে তো আমার মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটি।'

যদিও অনেক দিন পরে হঠাৎ ঊর্মি ছাড়া পেয়ে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, তবু সহসা এক-এক দিন মনে পড়ত ওর জীবনের কঠিন দায়িত্ব। ও তো স্বাধীন নয়, ও যে বাঁধা ওর ব্রতের সঙ্গে। তারই সঙ্গে মিলিয়ে যে বাঁধন ওকে ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বেঁধেছে তার অনুশাসন আছে ওর 'পরে। ওর দৈনিক কর্তব্যের খুঁটিনাটি সেই তো স্থির করে দিয়েছে। ওর জীবনের 'পরে তার চিরকালের অধিকার এ কথা ঊর্মি কোনোমতে অস্বীকার করতে পারে না। যখন নীরদ উপস্থিত ছিল স্বীকার করা সহজ ছিল, জোর পেত মনে। এখন ওর ইচ্ছে একেবারেই বিমুখ হয়ে গেছে, অথচ কর্তব্যবুদ্ধি তাড়া দিচ্ছে। কর্তব্যবুদ্ধির অত্যাচারেই মন আরো যাচ্ছে বিগড়িয়ে। নিজের অপরাধ ক্ষমা করা কঠিন হয়ে উঠল বলেই অপরাধ প্রশ্রয় পেতে লাগল। বেদনায় আফিমের প্রলেপ দেবার জন্যে শশাঙ্কের সঙ্গে খেলায় আমোদে নিজেকে সর্বক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। বলে, যখন সময় আসবে তখন আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে, এখন যে-কয়দিন ছুটি ও-সব কথা থাক। আবার হঠাৎ এক-এক দিন মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বই খাতা ট্রাঙ্কের থেকে বের করে তার উপরে মাথা গুঁজে বসে। তখন শশাঙ্কর পালা। বইগুলো টেনে নিয়ে পুনরায় বাক্সজাত ক'রে সেই বাক্সর উপর সে চেপে বসে। ঊর্মি বলে, 'শশাঙ্কদা, ভারি অন্যায়। আমার সময় নষ্ট কোরো না।'

শশাঙ্ক বলে, 'তোমার সময় নষ্ট করতে গেলে আমারও সময় নষ্ট। অতএব শোধবোধ।'

তার পরে খানিকক্ষণ কাড়াকাড়ির চেষ্টা করে অবশেষে ঊর্মি হার মানে। সেটা যে ওর পক্ষে নিতান্ত আপত্তিজনক তা মনে হয় না। এইরকম বাধা পেলেও কর্তব্যবুদ্ধির পীড়ন দিন পাঁচ-ছয় একাদিক্রমে চলে, তার পরে আবার তার জোর কমে যায়। বলে, 'শশাঙ্কদা, আমাকে দুর্বল মনে কোরো না। মনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করেই রেখেছি।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ, এখানে ডিগ্রি নিয়ে য়ুরোপে যাব ডাক্তারি শিখতে।'

'তার পরে?'

'তার পরে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে তার ভার নেব।'

'আর কার ভার নেবে। ঐ-যে নীরদ মুখুজ্জে বলে একটা ইনসাফারেব্‌ল্‌—'

শশাঙ্কের মুখ চাপা দিয়ে ঊর্মি বলে, 'চুপ করো। এই-সব কথা বল যদি তোমার সঙ্গে একেবারে ঝগড়া হয়ে যাবে।'

নিজেকে ঊর্মি খুব কঠিন করে বলে, 'সত্য হতে হবে, আমাকে সত্য হতে হবে।' নীরদের সঙ্গে ওর যে সম্বন্ধ বাবা স্বয়ং স্থির করে দিয়েছেন তার প্রতি খাঁটি না হতে পারাকে ও অসতীত্ব বলে মনে করে।

কিন্তু মুশকিল এই যে, অপর পক্ষ থেকে কোনো জোর পায় না। ঊর্মি যেন এমন একটি গাছ যা মাটিকে আঁকড়ে আছে, কিন্তু আকাশের আলো থেকে বঞ্চিত, পাতাগুলো পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে। এক-একসময় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে; মনে মনে ভাবে, এ মানুষটা চিঠির মতো চিঠি লিখতে পারে না কেন।

ঊর্মি অনেক কাল কন্‌ভেন্টে পড়েছে। আর-কিছু না হোক, ইংরেজিতে ওর বিদ্যে পাকা। সে কথা নীরদের জানা ছিল। সেইজন্যেই, ইংরেজি লিখে নীরদ ওকে অভিভূত করবে এই ছিল তার পণ। বাংলায় চিঠি লিখলে বিপদ বাঁচত, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বেচারা জানে না যে সে ইংরেজি জানে না। ভারী ভারী শব্দ জুটিয়ে এনে, পুঁথিগত দীর্ঘপ্রস্থ বচন যোজনা ক'রে, ওর বাক্যগুলোকে করে তুলত বস্তা-বোঝাই গোরুর গাড়ির মতো। ঊর্মির হাসি আসত, কিন্তু হাসতে সে লজ্জা পেত; নিজেকে তিরস্কার করে বলত, বাঙালির ইংরেজিতে ত্রুটি হলে তা নিয়ে দোষ ধরা স্নবিশ্‌।

দেশে থাকতে মোকাবিলায় যখন নীরদ ক্ষণে ক্ষণে সদুপদেশ দিয়েছে তখন ওর রকম-সকমে সেগুলো গভীর হয়ে উঠেছে গৌরবে। যতটা কানে শোনা যেত তার চেয়ে আন্দাজে তার ওজন হত বেশি। কিন্তু লম্বা চিঠিতে আন্দাজের জায়গা থাকে না। কোমর-বাঁধা ভারী ভারী কথা হালকা হয়ে যায়, মোটা মোটা আওয়াজেই ধরা পড়ে বলবার বিষয়ের কম্‌তি।

নীরদের যে ভাবটা কাছে থাকতে ও সয়ে গিয়েছিল সেইটে দূরের থেকে ওকে সব চেয়ে বাজে। লোকটা একেবারেই হাসতে জানে না। চিঠিতে সব চেয়ে প্রকাশ পায় সেই অভাবটা। এই নিয়ে শশাঙ্কের সঙ্গে তুলনা ওর মনে আপনিই এসে পড়ে।

তুলনার একটা উপলক্ষ এই সেদিন হঠাৎ ঘটেছে। কাপড় খুঁজতে গিয়ে বাক্সের তলা থেকে বেরোল পশমে-বোনা একপাটি অসমাপ্ত জুতো। মনে পড়ে গেল চার বছর আগেকার কথা। তখন হেমন্ত ছিল বেঁচে। ওরা সকলে মিলে গিয়েছিল দার্জিলিঙে। আমোদের অন্ত ছিল না। হেমন্তে আর শশাঙ্কে মিলে ঠাট্টাতামাশার পাগলা-ঝোরা বইয়ে দিয়েছিল। ঊর্মি তার এক মাসির কাছ থেকে পশমের কাজ নতুন শিখেছে। জন্মদিনে দাদাকে দেবে বলে একজোড়া জুতো বুনছিল। তা নিয়ে শশাঙ্ক ওকে কেবলই ঠাট্টা করত; বলত, 'দাদাকে আর যাই দাও, জুতো নয়। ভগবান মনু বলেছেন ওতে গুরুজনের অসম্মান হয়।'

ঊর্মি কটাক্ষ করে বলেছিল, 'ভগবান মনু তবে কাকে প্রয়োগ করতে বলেন।'

শশাঙ্ক গম্ভীর মুখে বললে, 'অসম্মানের সনাতন অধিকার ভগ্নীপতির। আমার পাওনা আছে। সেটা সুদে ভারী হয়ে উঠল।'

'মনে তো পড়ছে না।'

'পড়বার কথা নয়, তখন ছিলে নিতান্ত নাবালিকা। সেই কারণেই তোমার দিদির সঙ্গে শুভলগ্নে যেদিন এই সৌভাগ্যবানের বিবাহ হয়, সেদিন বাসররজনীর কর্ণধারপদ গ্রহণ করতে পার নি। আর সেই কোমল করপল্লবের অরচিত কানমলাটাই রূপ গ্রহণ করছে সেই করপল্লবরচিত জুতোযুগলে। ওটার প্রতি আমার দাবি রইল জানিয়ে রেখে দিলুম।'

দাবি শোধ হয় নি, সে জুতো যথাসময়ে প্রণামীরূপে নিবেদিত হয়েছিল দাদার চরণে। তার পর কিছুকাল পরে শশাঙ্কর কাছ থেকে ঊর্মি একখানি চিঠি পেল। পেয়ে খুব হেসেছে সে। সেই চিঠি আজও তার বাক্সে আছে। আজ খুলে সে আবার পড়লে—

কাল তো তুমি চলে গেলে। তোমার স্মৃতি পুরাতন হতে না হতে তোমার নামে একটা কলঙ্ক রটনা হয়েছে, সেটা তোমার কাছে গোপন করা অকর্তব্য মনে করি।

আমার পায়ে একজোড়া তালতলায় চটি অনেকেই লক্ষ করেছে। কিন্তু তার চেয়ে লক্ষ করেছে তার ছিদ্র ভেদ করে আমার চরণনখরপঙ্‌ক্তি মেঘমুক্ত চন্দ্রমালার মতো। (ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল দ্রষ্টব্য। উপমার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ ঘটলে তোমার দিদির কাছে মীমাংসনীয়।) আজ সকালে আমার আপিসের বৃন্দাবন নন্দী যখন আমার সপাদুক চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলে তখন আমার পদমর্যাদায় যে বিদীর্ণতা প্রকাশ পেয়েছে তারই অগৌরব মনে আন্দোলিত হল। সেবককে জিজ্ঞাসা করলেম, 'মহেশ, আমার সেই অন্য নূতন চটিজোড়াটা গতিলাভ করেছে অন্য কোন্‌ অনধিকারীর শ্রীচরণে।' সে মাথা চুলকিয়ে বললে, 'ও বাড়ির ঊর্মিমাসিদের সঙ্গে আপনিও যখন দার্জিলিঙ যান সেই সময়ে চটিজোড়াটাও গিয়েছিল। আপনি ফিরে এসেছেন, সেইসঙ্গে ফিরে

এসেছে তার এক পাটি, আর-এক পাটি—' তার মুখ লাল হয়ে উঠল। আমি এক ধমক দিয়ে বললুম, 'বাস, চুপ।' সেখানে অন্য অনেক লোক ছিল। চটিজুতো-হরণ হীনকার্য। কিন্তু মানুষের মন দুর্বল, লোভ দুর্দম, এমন কাজ করে ফেলে, ঈশ্বর বোধ করি ক্ষমা করেন। তবু অপহরণ-কাজে বুদ্ধির পরিচয় থাকলে দুষ্কার্যের গ্লানি অনেকটা কাটে। কিন্তু এক পাটি চটি!!! ধিক্‌!!!

যে এ কাজ করেছে, যথাসাধ্য তার নাম আমি উহ্য রেখেছি। সে যদি তার স্বভাবসিদ্ধ মুখরতার সঙ্গে এই নিয়ে অনর্থক চেঁচামেচি করে তা হলে কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে যাবে। চটি নিয়ে চটাচটি সেইখানেই খাটে যেখানে মন খাঁটি। মহেশের মতো নিন্দুকের মুখ বন্ধ এখনি করতে পার একজোড়া শিল্পকার্যখচিত চটির সাহায্যে। যেমন তার আস্পর্ধা। পায়ের মাপ এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি।'

চিঠিখানা পেয়ে ঊর্মি স্মিতমুখে পশমের জুতো বুনতে বসেছিল কিন্তু শেষ করে নি। পশমের কাজে আর তার উৎসাহ ছিল না। আজ এটা আবিষ্কার করে স্থির করলে এই অসমাপ্ত জুতোটাই দেবে শশাঙ্ককে সেই দার্জিলিঙ-যাত্রার সাম্বৎসরিক দিনে। সেদিন আর কয়েক সপ্তাহ পরেই আসছে। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল— হায় রে, কোথায় সেই হাস্যোজ্জ্বল আকাশে হালকা পাখায় উড়ে-যাওয়া দিনগুলি! এখন থেকে সামনে প্রসারিত নিরবকাশ কর্তব্যকঠোর মরুজীবন।

আজ ২৬শে ফাল্গুন। হোলিখেলার দিন। মফস্বলের কাজে এ খেলায় শশাঙ্কের সময় ছিল না, এদিনের কথা তারা ভুলেই গেছে। ঊর্মি আজ তার শয্যাগত দিদির পায়ে আবীরের টিপ দিয়ে প্রণাম করেছে। তার পরে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখলে, শশাঙ্ক আপিসঘরের ডেস্কে ঝুঁকে পড়ে একমনে কাজ করছে। পিছন থেকে গিয়ে দিলে তার মাথায় আবীর মাখিয়ে, রাঙিয়ে উঠল তার কাগজপত্র। মাতামাতির পালা পড়ে গেল। ডেস্কে ছিল দোয়াতে লাল কালি। শশাঙ্ক দিলে ঊর্মির শাড়িতে ঢেলে। হাত চেপে ধরে তার আঁচল থেকে ফাগ কেড়ে নিয়ে ঊর্মির মুখে দিলে ঘষে, তার পরে দৌড়াদৌড়ি, ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি। বেলা যায় চলে, স্নানাহারের সময় যায় পিছিয়ে, ঊর্মির উচ্চহাসির স্বরোচ্ছ্বাসে সমস্ত বাড়ি মুখরিত। শেষকালে শশাঙ্কের অস্বাস্থ্য-আশঙ্কায় দূতের পরে দূত পাঠিয়ে শর্মিলা এদের নিবৃত্ত করলে।

দিন গেছে। রাত্রি হয়েছে অনেক। পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখাজাল ছাড়িয়ে পূর্ণচাঁদ উঠেছে অনাবৃত আকাশে। হঠাৎ ফাল্গুনের দমকা হাওয়ায় ঝরঝর শব্দে দোলাদুলি করে উঠেছে বাগানের সমস্ত গাছপালা, তলাকার ছায়ার জাল তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। জানলার কাছে ঊর্মি চুপ করে বসে। ঘুম আসছে না কিছুতেই। বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শান্ত হয় নি। আমের বোলের গন্ধে মন উঠেছে ভরে। আজ বসন্তে মাধবীলতার মজ্জায় মজ্জায় যে ফুল ফোটাবার বেদনা সেই বেদনা যেন ঊর্মির সমস্ত দেহকে ভিতর থেকে উৎসুক করেছে। পাশের নাবার ঘরে গিয়ে মাথা ধুয়ে নিলে, গা মুছলে ভিজে তোয়ালে দিয়ে। বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে কিছুক্ষণ পরে স্বপ্নজড়িত ঘুমে আবিষ্ট হয়ে পড়ল।

রাত্রি তিনটের সময় ঘুম ভেঙেছে। চাঁদ তখন জানলার সামনে নেই। ঘরে অন্ধকার, বাইরে আলোয় ছায়ায় জড়িত সুপারিগাছের বীথিকা। ঊর্মির বুক ফেটে কান্না এল, কিছুতে থামতে চায় না। উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। প্রাণের এই কান্না, ভাষায় এর শব্দ নেই, অর্থ নেই। প্রশ্ন করলে ও কি বলতে পারে, কোথা থেকে এই বেদনার জোয়ার উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে ওর দেহে মনে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিনের কর্মতালিকা, রাত্রের সুখনিদ্রা?

সকালে ঊর্মি যখন ঘুম ভেঙে উঠল তখন ঘরের মধ্যে রৌদ্র এসে পড়েছে। সকালবেলাকার কাজে ফাঁক পড়ল, ক্লান্তির কথা মনে করে শর্মিলা ওকে ক্ষমা করেছে। কিসের অনুতাপে ঊর্মি আজ অবসন্ন। কেন মনে হচ্ছে, ওর হার হতে চলল। দিদিকে গিয়ে বললে, 'দিদি, আমি তো তোমার কোনো কাজ করতেই পারি নে— বল তো বাড়ি ফিরে যাই।'

আজ তো শর্মিলা বলতে পারলে না, 'না, যাস নে'। বললে, 'আচ্ছা, যা তুই। তোর পড়াশুনোর ক্ষতি হচ্ছে। যখন মাঝে মাঝে সময় পাবি দেখে-শুনে যাস।'

শশাঙ্ক তখন কাজে বেরিয়ে গেছে। সেই অবকাশে সেই দিনই ঊর্মি বাড়ি চলে গেল।

শশাঙ্ক সেদিন যান্ত্রিক ছবি আঁকার এক সেট সরঞ্জাম কিনে বাড়ি ফিরলে। ঊর্মিকে দেবে, কথা ছিল তাকে এই বিদ্যেটা শেখাবে। ফিরে এসে তাকে যথাস্থানে না দেখতে পেয়ে শর্মিলার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ঊর্মি গেল কোথায়।'

শর্মিলা বললে, 'এখানে তার পড়াশুনোর অসুবিধে হচ্ছে বলে সে বাড়ি চলে গেছে।'

'কিছুদিন অসুবিধে করবে বলে সে তো প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। অসুবিধের কথা হঠাৎ আজই মনে উঠল কেন।'

কথার সুর শুনে শর্মিলা বুঝলে শশাঙ্ক তাকেই সন্দেহ করছে। সে সম্বন্ধে কোনো বৃথা তর্ক না করে বললে, 'আমার নাম করে তুমি তাকে ডেকে নিয়ে এসো, নিশ্চয় কোনো আপত্তি করবে না।'

ঊর্মি বাড়িতে ফিরে এসে দেখলে, অনেকদিন পরে বিলেত থেকে ওর নামে নীরদের চিঠি এসে অপেক্ষা করছে। ভয়ে খুলতেই পারছিল না। মনে জানে, নিজের তরফে অপরাধ জমা হয়ে উঠেছে। নিয়মভঙ্গের কৈফিয়ত-স্বরূপ এর আগে দিদির রোগের উল্লেখ করেছিল। কিছুদিন থেকে কৈফিয়তটা প্রায় এসেছে মিথ্যে হয়ে। শশাঙ্ক বিশেষ জেদ করে শর্মিলার জন্যে দিনে একজন রাত্রে একজন নার্স নিযুক্ত করে দিয়েছে। ডাক্তারের বিধানমতে রোগীর ঘরে সর্বদা আত্মীয়দের আনা-গোনা তারা রোধ করে। ঊর্মি মনে জানে নীরদ দিদির রোগের কৈফিয়তটাকেও গুরুতর মনে করবে না; বলবে, 'ওটা কোনো কাজের কথা নয়।' বস্তুতই কাজের কথা নয়— আমাকে তো দরকার হচ্ছে না। অনুতপ্তচিত্তে স্থির করলে, এবারে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইব। বলব, আর কখনো ত্রুটি হবে না, কিছুতে নিয়মভঙ্গ করব না।

চিঠি খোলবার আগে অনেক দিন পরে আবার বের করলে সেই ফোটোগ্রাফখানা। টেবিলের উপর রেখে দিলে। জানে ঐ ছবিটা দেখলে শশাঙ্ক খুব বিদ্রূপ করবে। তবু ঊর্মি কিছুতেই কুণ্ঠিত হবে না তার বিদ্রূপে; এই তার প্রায়শ্চিত্ত। নীরদের সঙ্গে ওর বিবাহ হবে এই প্রসঙ্গটা দিদিদের বাড়িতে ও চাপা দিত। অন্যেরাও তুলত না, কেননা এ প্রসঙ্গটা ওখানকার সকলের অপ্রিয়। আজ হাত মুঠো করে ঊর্মি স্থির করলে— ওর সকল ব্যবহারেই এই সংবাদটা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করবে। কিছুদিন থেকে লুকিয়ে রেখেছিল এন্‌গেজ্‌মেন্ট্‌ আঙটি। সেটা বের করে পরলে। আঙটিটা নিতান্তই কম দামের— নীরদ আপন অনেস্‌ট্‌ গরিবিয়ানার গর্বের দ্বারাই ঐ সস্তা আঙটির দাম হীরের চেয়ে বেশি বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভাবখানা এই যে, 'আঙটির দামেই আমার দাম নয়, আমার দামেই আঙটির দাম।'

নিজেকে যথাসাধ্য শোধন করে নিয়ে ঊর্মি অতি ধীরে লেফাফাটা খুললে।

চিঠিখানা পড়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ইচ্ছা করল নাচতে, কিন্তু নাচ ওর অভ্যেস নেই। সেতারটা ছিল বিছানার উপর, সেটা তুলে নিয়ে সুর না বেঁধেই ঝনাঝন্‌ ঝংকার দিয়ে যা-তা বাজাতে লাগল।

ঠিক এমন সময়ে শশাঙ্ক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ব্যাপারখানা কী। বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল বুঝি?'

'হাঁ শশাঙ্কদা, স্থির হয়ে গেছে।'

'কিছুতেই নড়চড় হবে না?'

'কিছুতেই না।'

'তা হলে এইবেলা সানাই বায়না দিই, আর ভীমনাগের সন্দেশ?'

'তোমাকে কোনো চেষ্টা করতে হবে না।'

'নিজেই সব করবে? ধন্য বীরাঙ্গনা। আর কনেকে আশীর্বাদ?'

'সে আশীর্বাদের টাকাটা আমার নিজের পকেট থেকেই গেছে।'

'মাছের তেলেই মাছভাজা? ভালো বোঝা গেল না।'

'এই নাও, বুঝে দেখো।'

বলে চিঠিখানা ওর হাতে দিলে।

পড়ে শশাঙ্ক হো হো করে হেসে উঠল।

লিখছে : যে রিসার্চের দুরূহ কাজে নীরদ আত্মনিবেদন করতে চায় ভারতবর্ষে তা সম্ভব নয়। সেইজন্যেই ওর জীবনে আর-একটা মস্ত স্যাক্রিফাইস মেনে নিতে হল। ঊর্মির সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করলে উপায় নেই। একজন য়ুরোপীয় মহিলা ওকে বিবাহ করে ওর কাজে আত্মদান করতে সম্মত। কিন্তু কাজটা সেই একই, ভারতবর্ষেই করা হোক আর এখানেই। রাজারামবাবু যে কাজের জন্য অর্থ দিতে চেয়েছিলেন তার কিয়দংশ সেখানে নিযুক্ত করলে অন্যায় হবে না। তাতে মৃতব্যক্তির 'পরে সম্মান করাই হবে।

শশাঙ্ক বললে, 'জীবিত ব্যক্তিটাকে কিছু কিছু দিয়ে যদি সেই দূরদেশেই দীর্ঘকাল জিইয়ে রাখতে পার তো মন্দ হয় না। টাকা বন্ধ করলে পাছে খিদের জ্বালায় মরিয়া হয়ে এখানে দৌড়ে আসে এই ভয় আছে।'

ঊর্মি হেসে বললে, 'সে ভয় যদি তোমার মনে থাকে টাকা তুমিই দিয়ো, আমি এক পয়সাও দেব না।'

শশাঙ্ক বললে, 'আবার তো মন বদল হবে না? মানিনীর অভিমান তো অটল থাকবে?'

'বদল হলে তোমার তাতে কী শশাঙ্কদা!'

'প্রশ্নের সত্য উত্তর দিলে অহংকার বেড়ে যাবে, অতএব তোমার হিতের জন্যে চুপ করে রইলুম। কিন্তু ভাবছি, লোকটার গণ্ডদেশ তো কম নয়, ইংরেজিতে যাকে বলে চীক্।'

ঊর্মির মনের মধ্যে থেকে প্রকাণ্ড একটা ভার নেমে গেল— বহু দিনের ভার। মুক্তির আনন্দে ও কী যে করবে তা ভেবে পাচ্ছে না। ওর সেই কাজের ফর্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে। গলিতে ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছিল, জানলা থেকে আঙটিটা ছুঁড়ে ফেললে তার দিকে।

জিজ্ঞাসা করলে, 'এই পেনসিলের দাগ দেওয়া মোটা বইগুলো কি কোনো হকার কিনবে।'

'নাই যদি কেনে, তার ফলাফলটা কী আগে শুনি।'

'যদি ওর মধ্যে সাবেক কালের ভূতটা বাসা করে, মাঝে মাঝে অর্ধেক রাত্রে তর্জনী তুলে আমার বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়।'

'সে আশঙ্কা যদি থাকে হকারের অপেক্ষা করব না, আমি নিজেই কিনব।'

'কিনে কী করবে।'

'হিন্দুশাস্ত্রমতে অন্ত্যেষ্টিসৎকার। গয়া পর্যন্ত যেতে রাজি, তাতে যদি তোমার মন সান্ত্বনা পায়।'

'না, অতটা বাড়াবাড়ি সইবে না।'

'আচ্ছা, আমার লাইব্রেরির কোণে পিরামিড বানিয়ে ওদের মামি করে রেখে দেব।'

'আজ কিন্তু তুমি কাজে বেরোতে পাবে না।'

'সমস্ত দিন?'

'সমস্ত দিনই।'

'কী করতে হবে।'

'মোটরে করে উধাও হয়ে যাব।'

'দিদির কাছে ছুটি নিয়ে এসো গে।'

'না, ফিরে এসে দিদিকে বলব, তখন খুব বকুনি খাব। সে বকুনি সইবে।'

'আচ্ছা, আমিও তোমার দিদির বকুনি হজম করতে রাজি। টায়ার যদি ফাটে দুঃখিত হব না। ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইল বেগে দুটো-চারটে মানুষ চাপা দিয়ে একেবারে জেলখানা পর্যন্ত পেঁছতে আপত্তি নেই। কিন্তু তিন সত্যি দাও যে, মোটর-রথযাত্রা সাঙ্গ করে আমাদেরই বাড়িতে তুমি ফিরে আসবে।'

'আসব, আসব, আসব।'

মোটর-যাত্রার শেষে ভবানীপুরের বাড়িতে দুজনে এল, কিন্তু ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ মাইলের বেগ রক্ত থেকে এখনো কিছুতেই থামতে চায় না। সংসারের সমস্ত দাবি সমস্ত ভয় লজ্জা এই বেগের কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

কয়দিন শশাঙ্কের সব কাজ গেল ঘুলিয়ে। মনের ভিতরে ভিতরে সে বুঝেছে যে, এটা ভালো হচ্ছে না। কাজের ক্ষতি খুব গুরুতর হওয়াও অসম্ভব নয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুর্ভাবনায় দুঃসম্ভাবনাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে। কিন্তু পরের দিনে আবার সে স্বাধিকারপ্রমত্ত, মেঘদূতের যক্ষের মতন। মদ একবার খেলে তার পরিতাপ ঢাকতে আবার খেতে হয়।

শশাঙ্ক

কিছুকাল এইরকম যায়। লাগল চোখে ঘোর, মন উঠল আবিল হয়ে।

নিজেকে সুস্পষ্ট বুঝতে ঊর্মির সময় লেগেছে, কিন্তু একদিন হঠাৎ চমকে উঠে বুঝলে।

মথুরদাদাকে ঊর্মি কী জানি কেন ভয় করত, এড়িয়ে বেড়াত তাকে। সেদিন মথুর সকালে দিদির ঘরে এসে বেলা দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে গেল।

তারপরে দিদি ঊর্মিকে ডেকে পাঠালে। মুখ তার কঠোর অথচ শান্ত। বললে, 'প্রতিদিন ওর কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কী কাণ্ড করেছিস জানিস তা?'

ঊর্মি ভয় পেয়ে গেল। বললে, 'কী হয়েছে দিদি।'

দিদি বললে, 'মথুরদাদা জানিয়ে গেল, কিছুদিন ধরে তোর ভগ্নীপতি নিজে কাজ একেবারে দেখেন নি। জহরলালের উপরে ভার দিয়েছিলেন; সে মালমসলায় দুহাত চালিয়ে চুরি করেছে, বড়ো বড়ো গুদামঘরের ছাদ একেবারে ঝাঁজরা; সেদিনকার বৃষ্টিতে ধরা পড়েছে মাল যাচ্ছে নষ্ট হয়ে। আমাদের কোম্পানির মস্ত নাম, তাই ওরা পরীক্ষা করে নি, এখন মস্ত অখ্যাতি এবং লোকসানের দায় পড়েছে ঘাড়ে। মথুরদাদা স্বতন্ত্র হবেন।'

ঊর্মির বুক ধক্ করে উঠল, মুখ হয়ে গেল পাঁশের মতো। এক মুহূর্তে বিদ্যুতের আলোয় আপন মনের প্রচ্ছন্ন রহস্য প্রকাশ পেলে। স্পষ্ট বুঝলে, কখন অজ্ঞাতসারে তার মনের ভিতরটা উঠেছিল মাতাল হয়ে, ভালোমন্দ কিছুই বিচার করতে পারে নি। শশাঙ্কর কাজটাই যেন ছিল তার প্রতিযোগী, তারই সঙ্গে ওর আড়াআড়ি। কাজের থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সর্বদা সম্পূর্ণ কাছে পাবার জন্যে ঊর্মি কেবল ভিতরে ভিতরে ছটফট করত। কতদিন এমন ঘটেছে, শশাঙ্ক যখন স্নানে, এমন সময় কাজের কথা নিয়ে লোক এসেছে; ঊর্মি কিছু না ভেবে বলে পাঠিয়েছে, 'বল গে, এখন দেখা হবে না।'

ভয়, পাছে স্নান করে এসেই শশাঙ্ক আর অবকাশ না পায়, পাছে এমন করে কাজে জড়িয়ে পড়ে যে ঊর্মির দিনটা হয় ব্যর্থ। তার দুরন্ত নেশার সাংঘাতিক ছবিটা সম্পূর্ণ চোখে জেগে উঠল। তৎক্ষণাৎ দিদির পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। বারবার করে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলতে লাগল, 'তাড়িয়ে দাও তোমাদের ঘর থেকে আমাকে, এখনি দূর করে তাড়িয়ে দাও।'

আজ দিদি নিশ্চিত স্থির করে বসেছিল কিছুতেই ঊর্মিকে ক্ষমা করবে না। মন গেল গলে।

আস্তে আস্তে ঊর্মিমালার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, 'কিছু ভাবিস নে, যা হয় একটা উপায় হবে।'

ঊর্মি উঠে বসল। বললে, 'দিদি, তোমাদেরই বা কেন লোকসান হবে। আমারও তো টাকা আছে।'

শর্মিলা বললে, 'পাগল হয়েছিস। আমার বুঝি কিছু নেই। মথুরদাদাকে বলেছি, এই নিয়ে তিনি যেন কিছু গোল না করেন। লোকসান আমি পুরিয়ে দেব। আর তোকেও বলছি, আমি যে কিছু জানতে পেরেছি এ কথা যেন তোর ভগ্নীপতি না টের পান।'

'মাপ করো দিদি, আমাকে মাপ করো' এই বলে ঊর্মি আবার দিদির পায়ের উপর পড়ে মাথা ঠুকতে লাগল।

শর্মিলা চোখের জল মুছে ক্লান্ত সুরে বললে, 'কে কাকে মাপ করবে, বোন। সংসারটা বড়ো জটিল। যা মনে করি তা হয় না, যার জন্যে প্রাণপণ করি তা যায় ফেঁসে।'

দিদিকে ছেড়ে ঊর্মি এক মুহূর্ত নড়তে চায় না— ওষুধপত্র দেওয়া, নাওয়ানো, খাওয়ানো, শোওয়ানো সমস্ত খুঁটিনাটি নিজের হাতে। আবার বই পড়তে আরম্ভ করেছে, সেও দিদির বিছানার পাশে বসে। নিজেকেও আর বিশ্বাস করে না, শশাঙ্ককেও না।

ফল হল এই যে, শশাঙ্ক বার বার আসে রোগীর ঘরে। পুরুষমানুষের অন্ধতাবশতই বুঝতে পারে না ছটফটানির তাৎপর্য স্ত্রীর কাছে পড়ছে ধরা, লজ্জায় মরছে ঊর্মি। শশাঙ্ক আসে মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচের প্রলোভন নিয়ে, ব্যর্থ হয়। পেনসিলের দাগ দেওয়া খবরের কাগজ মেলে দেখায় বিজ্ঞাপনে চার্লি চ্যাপলিনের নাম, ফল হয় না কিছুই। ঊর্মি যখন দুর্লভ ছিল না তখনো বাধার ভিতর দিয়ে শশাঙ্ক কাজকর্ম চালাতে চেষ্টা করত। এখন অসম্ভব হয়ে এল।

হতভাগার এই নিরর্থক নিপীড়নে প্রথম প্রথম শর্মিলা বড়ো দুঃখেও সুখ পেত। কিন্তু ক্রমে দেখলে ওর যন্ত্রণা উঠছে প্রবল হয়ে, মুখ গেছে শুকিয়ে, চোখের নীচে পড়ছে কালি। ঊর্মি খাওয়ার সময় কাছে বসে না, সেজন্য শশাঙ্কর খাওয়ার উৎসাহ এবং পরিমাণ কমে যাচ্ছে তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। সম্প্রতি হঠাৎ এ বাড়িতে আনন্দের যে বান ডেকে এসেছিল সেটা গেছে সম্পূর্ণ ভাঁটিয়ে, অথচ পূর্বে ওদের যে একটা সহজ দিনযাত্রা ছিল সেও রইল না।

একদা শশাঙ্ক নিজের চেহারার চর্চায় উদাসীন ছিল। নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটাত প্রায় ন্যাড়া করে। আঁচড়াবার প্রয়োজন ঠেকেছিল সিকির সিকিতে। শর্মিলা তাই নিয়ে অনেকবার প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ইদানীং ঊর্মির উচ্চহাস্যসংযুক্ত সংক্ষিপ্ত আপত্তি নিষ্ফল হয় নি। নূতন সংস্করণের কেশোদ্‌গমের সঙ্গে সুগন্ধি তৈলের সংযোগসাধন শশাঙ্কর মাথায় এই প্রথম ঘটল। কিন্তু তারপর আজকাল কেশোন্নতিবিধানের অনাদরেই ধরা পড়ছে অন্তর্বেদনা। এতটা বেশি যে, এ নিয়ে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য তীব্র হাসি আর চলে না। শর্মিলার উৎকণ্ঠা তার ক্ষোভকে ছাড়িয়ে গেল। স্বামীর প্রতি করুণায় ও নিজের প্রতি ধিক্‌কারে তার বুকের মধ্যে টনটন করে উঠছে। রোগের ব্যথাকে দিচ্ছে এগিয়ে।

ময়দানে হবে কেল্লার ফৌজদের যুদ্ধের খেলা। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে এল, 'যাবে ঊর্মি, দেখতে? ভালো জায়গা ঠিক করে রেখেছি।'

ঊর্মি কোনো উত্তর দেবার পূর্বেই শর্মিলা বলে উঠল, 'যাবে বৈ কি। নিশ্চয় যাবে। একটু বাইরে ঘুরে আসবার জন্যে ও যে ছটফট করছে।'

প্রশ্রয় পেয়ে দুদিন না যেতেই জিজ্ঞাসা করলে, 'সার্কাস?'

এ প্রস্তাবে ঊর্মিমালার উৎসাহই দেখা গেল।

তারপরে, 'বোটানিকাল গার্ডেন?'

এইটেতে একটু বাধল। দিদিকে ফেলে বেশিক্ষণ দূরে থাকতে ঊর্মির মন সায় দিচ্ছে না।

দিদি স্বয়ং পক্ষ নিল শশাঙ্কর। রাজ্যের রাজমজুরদের সঙ্গে দিনে দুপুরে ঘুরে ঘুরে খেটে

খেটে মানুষটা যে হয়রান হল— সারা দিন কেবল খাটছে ধুলোবালির মধ্যে। হাওয়া না খেয়ে এলে শরীর যে পড়বে ভেঙে।

এই একই যুক্তি অনুসারে স্টীমারে করে রাজগঞ্জ পর্যন্ত ঘুরে আসা অসংগত হল না।

শর্মিলা মনে মনে বলে, যার জন্যে কাজ খোয়াতে ওর ভাবনা নেই তাকে সুদ্ধ খোয়ানো ওর সইবে না।

শশাঙ্ককে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলে নি বটে, কিন্তু চারি দিক থেকেই সে একটা অব্যক্ত সমর্থন পাচ্ছে। শশাঙ্ক একরকম ঠিক করে নিয়েছে, শর্মিলার মনে বিশেষ কোনো ব্যথা নেই, ওদের দুজনকে একত্র মিলিয়ে খুশি দেখেই সে খুশি। সাধারণ মেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারত না, কিন্তু শর্মিলা যে অসাধারণ। শশাঙ্কর চাকরির আমলে একজন আর্টিস্ট্ রঙিন পেনসিল দিয়ে শর্মিলার একটা ছবি এঁকেছিল। এতদিন সেটা ছিল পোর্ট্‌ফোলিয়োর মধ্যে। সেইটেকে বের করে বিলিতি দোকানে খুব দামি ফ্যাশানে বাঁধিয়ে নিয়ে আপিসঘরে যেখানে বসে ঠিক তার সমুখে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে। সামনের ফুলদানিতে রোজ মালী ফুল দিয়ে যায়।

অবশেষে একদিন শশাঙ্ক বাগানে সূর্যমুখী কিরকম ফুটছে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ ঊর্মির হাত চেপে ধরে বললে, 'তুমি নিশ্চয় জান, তোমাকে আমি ভালোবাসি; আর, তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমন করি নে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।'

এ কথা দিদি বারবার করে ঊর্মিকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তার অবর্তমানে সব চেয়ে যেটা সান্ত্বনার বিষয় সে ঊর্মিকে নিয়েই। এ সংসারে অন্য কোনো মেয়ের আবির্ভাব কল্পনা করতেও দিদিকে বাজত, অথচ শশাঙ্ককে যত্ন করবার জন্যে কোনো মেয়েই থাকবে না এমন লক্ষ্মীছাড়া অবস্থাও দিদি মনে মনে সইতে পারত না। ব্যাবসার কথাও দিদি ওকে বুঝিয়েছে; বলেছে, যদি ভালোবাসায় বাধা পায় তা হলে সেই ধাক্কায় ওর কাজকর্ম সব যাবে নষ্ট হয়ে। ওর মন যখন তৃপ্ত হবে তখনি আবার কাজকর্মে আপনি আসবে শৃঙ্খলা।

শশাঙ্কের মন উঠেছে মেতে। ও এমন একটা চন্দ্রলোকে আছে যেখানে সংসারের সব দায়িত্ব সুখতন্দ্রায় লীন। আজকাল রবিবার-পালনে বিশুদ্ধ খৃস্টানের মতোই ওর অস্খলিত নিষ্ঠা। একদিন শর্মিলাকে গিয়ে বললে, 'দেখো, পাটের সাহেবদের কাছে তাদের স্টীমলঞ্চ পাওয়া গেছে— আজ রবিবার, মনে করছি ভোরে ঊর্মিকে নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারের কাছে যাব, সন্ধ্যার আগেই আসব ফিরে।'

শর্মিলার বুকের শিরাগুলো কে যেন দিলে মুচড়ে, বেদনায় কপালের চামড়া উঠল কুঞ্চিত হয়ে। শশাঙ্কের চোখেই পড়ল না। শর্মিলা কেবল একবার জিজ্ঞাসা করলে, 'খাওয়াদাওয়ার কী হবে।'

শশাঙ্ক বললে, 'হোটেলের সঙ্গে ঠিক করে রেখেছি।'

একদিন এই সমস্ত ঠিক করবার ভার যখন ছিল শর্মিলার উপর তখন শশাঙ্ক ছিল উদাসীন। আজ সমস্ত উলটপালট হয়ে গেল।

যেমনি শর্মিলা বললে, 'আচ্ছা, তা যেয়ো' অমনি মুহূর্ত অপেক্ষা না করে শশাঙ্ক বেরিয়ে গেল ছুটে। শর্মিলার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করল। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে বারবার করে বলতে লাগল, 'আর কেন আছি বেঁচে।'

কাল রবিবারে ছিল ওদের বিবাহের সাম্বৎসরিক। আজ পর্যন্ত এ অনুষ্ঠানে কোনোদিন ছেদ পড়ে নি। এবারেও স্বামীকে না বলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত আয়োজন করছিল। আর কিছুই নয়, বিয়ের দিন শশাঙ্ক যে লাল বেনারসির জোড় পরেছিল সেইটে ওকে পরাবে, নিজে পরবে বিয়ের চেলি। স্বামীর গলায় মালা পরিয়ে ওকে খাওয়াবে সামনে বসিয়ে— জ্বালাবে ধূপবাতি, পাশের ঘরে গ্রামোফোনে বাজবে সানাই। অন্যান্য বছর শশাঙ্ক ওকে আগে থাকতে না জানিয়ে একটা-

কিছু শখের জিনিস কিনে দিত। শর্মিলা ভেবেছিল 'এবারেও নিশ্চয় দেবে, কাল পাব জানতে।'

আজ ও আর কিছুই সহ্য করতে পারছে না। ঘরে যখন কেউ নেই তখন কেবলই বলে বলে উঠছে, 'মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে, কী হবে এই খেলায়।'

রাত্রে ঘুম হল না। ভোরবেলা শুনতে পেলে মোটরগাড়ি দরজার কাছ থেকে চলে গেল। শর্মিলা ফুঁপিয়ে উঠে কেঁদে বললে, 'ঠাকুর, তুমি মিথ্যে।'

এখন থেকে রোগ দ্রুত বেড়ে চলল। দুর্লক্ষণ যেদিন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে সেদিন শর্মিলা ডেকে পাঠালে স্বামীকে। সন্ধেবেলা, ক্ষীণ আলো ঘরে, নার্সকে সংকেত করলে চলে যেতে। স্বামীকে পাশে বসিয়ে হাতে ধরে বললে, 'জীবনে আমি যে বর পেয়েছিলুম ভগবানের কাছে সে তুমি। তার যোগ্য শক্তি আমাকে দেন নি। সাধ্যে যা ছিল করেছি। ত্রুটি অনেক হয়েছে, মাপ কোরো আমাকে।'

শশাঙ্ক কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে বললে, 'না, কিছু বোলো না। ঊর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। সে আমার আপন বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরো অনেক বেশি পাবে যা আমার মধ্যে পাও নি। না, চুপ করো, কিছু বোলো না। মরবার কালেই আমার সৌভাগ্য পূর্ণ হল, তোমাকে সুখী করতে পারলুম।'

নার্স বাইরে থেকে বললে, 'ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

শর্মিলা বললে, 'ডেকে দাও।'

কথাটা বন্ধ হয়ে গেল।

শর্মিলার মামা যতরকম অশাস্ত্রীয় চিকিৎসার সন্ধানে উৎসাহী। সম্প্রতি এক সন্ন্যাসীর সেবায় তিনি নিযুক্ত। যখন ডাক্তাররা বললে আর কিছু করবার নেই তখন তিনি ধরে পড়লেন, হিমালয়ের ফেরত বাবাজির ওষুধ পরীক্ষা করতে হবে। কোন্ তিব্বতি শিকড়ের গুঁড়ো আর প্রচুর পরিমাণে দুধ, এই হচ্ছে উপকরণ।

শশাঙ্ক কোনোরকম হাতুড়েদের সহ্য করতে পারত না। সে আপত্তি করলে। শর্মিলা বললে, 'আর কোনো ফল হবে না, অন্তত মামা সান্ত্বনা পাবেন।'

দেখতে দেখতে ফল হল। নিশ্বাসের কষ্ট কমেছে, রক্ত ওঠা গেল বন্ধ হয়ে।

সাত দিন যায়, পনেরো দিন যায়, শর্মিলা উঠে বসল। ডাক্তার বললে, মৃত্যুর ধাক্কাতেই অনেক সময় শরীর মরিয়া হয়ে উঠে শেষ-ঠেলায় আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে তোলে।

শর্মিলা বেঁচে উঠল।

তখন সে ভাবতে লাগল, 'এ কী আপদ, কী করি! শেষকালে বেঁচে ওঠাই কি মরার বাড়া হয়ে দাঁড়াবে।'

ও দিকে ঊর্মি জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। এখানে তার পালা শেষ হল।

দিদি এসে বললে, 'তুই যেতে পারবি নে।'

'সে কী কথা।'

'হিন্দুসমাজে বোন-সতিনের ঘর কি কোনো মেয়ে কোনো দিন করে নি।'

'ছিঃ!'

'লোকনিন্দা! বিধির বিধানের চেয়ে বড়ো হবে লোকের মুখের কথা!'

শশাঙ্ককে ডাকিয়ে বললে: 'চলো আমরা যাই নেপালে। সেখানে রাজ-দরবারে তোমার কাজ পাবার কথা হয়েছিল— চেষ্টা করলেই পাবে। সে দেশে কোনো কথা উঠবে না।'

শর্মিলা কাউকে দ্বিধা করবার অবকাশ দিল না। যাবার আয়োজন চলছে। ঊর্মি তবু বিমর্ষ হয়ে কোণে কোণে লুকিয়ে বেড়ায়।

শশাঙ্ক তাকে বললে, 'আজ যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও তা হলে কী দশা হবে ভেবে দেখো।'

ঊর্মি বললে, 'আমি কিছু ভাবতে পারি নে। তোমরা দুজনে যা ঠিক করবে তাই হবে।'

গুছিয়ে নিতে কিছুদিন লাগল। তার পর সময় যখন কাছে এসেছে ঊর্মি বললে, 'আর দিন-সাতেক অপেক্ষা করো, কাকাবাবুর সঙ্গে কাজের কথা শেষ করে আসি গে।'

চলে গেল ঊর্মি।

এই সময়ে মথুর এল শর্মিলার কাছে মুখ ভার করে। বললে, 'তোমরা চলে যাচ্ছ ঠিক সময়েই। তোমার সঙ্গে কথাবার্তা স্থির হয়ে যাবার পরেই আমি আপসে শশাঙ্কের জন্যে কাজ বিভাগ করে দিয়েছিলেম। আমার সঙ্গে ওর লাভ-লোকসানের দায় জড়িয়ে রাখি নি। সম্প্রতি কাজ গুটিয়ে নেবার উপলক্ষে শশাঙ্ক ক-দিন ধরে হিসাব বুঝে নিচ্ছিল। দেখা গেল তোমার টাকা সম্পূর্ণ ডুবেছে। তা ছাপিয়েও যা দেনা জমেছে তাতে বোধ হয় বাড়ি বিক্রি করতে হবে।'

শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, 'সর্বনাশ এত দূর এগিয়ে চলেছিল, উনি জানতে পারেন নি!'

মথুর বললে, 'সর্বনাশ জিনিসটা অনেক সময় বাজ পড়ার মতো, যে মুহূর্তে মারে তার আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ জানান দেয় না। ও বুঝেছিল ওর লোকসান হয়েছে। তখনো অল্পেই সামলে নেওয়া যেত। কিন্তু দুর্বুদ্ধি ঘটল; ব্যাবসার গলদ তাড়াতাড়ি শুধরে নেবে মনে করে আমাকে লুকিয়ে পাথুরে কয়লার হাটে তেজিমন্দি খেলা শুরু করলে। চড়ার বাজারে যা কিনেছে সস্তার বাজারে তাই বেচে দিতে হল। হঠাৎ আজ দেখলে হাউইয়ের মতো ওর সব গেছে উড়ে পুড়ে, বাকি রইল ছাই। এখন ভগবানের কৃপায় নেপালে কাজ পেলে তোমাদের ভাবতে হবে না।'

শর্মিলা দৈন্যকে ভয় করে না। বরঞ্চ ও জানে, অভাবের দিনে স্বামীর সংসারে ওর স্থান আরো বেড়ে যাবে। দারিদ্র্যের কঠোরতাকে যথাসম্ভব মৃদু করে এনে দিন চালাতে পারবে, এ বিশ্বাস ওর আছে। বিশেষত গয়না যা হাতে রইল তা নিয়ে এখনো কিছুকাল বিশেষ দুঃখ পেতে হবে না। এ কথাটাও সসংকোচে মনে উঁকি মেরেছে যে, ঊর্মির সঙ্গে বিয়ে হলে তার সম্পত্তিও তো স্বামীরই হবে। কিন্তু শুধু জীবনযাত্রাই তো যথেষ্ট নয়। এত দিন ধরে নিজের শক্তিতে নিজের হাতে স্বামী যে সম্পদ সৃষ্টি করে তুলেছিল, যার খাতিরে আপন হৃদয়ের অনেক প্রবল দাবিকেও শর্মিলা ইচ্ছে করে দিনে দিনে ঠেকিয়ে রেখেছে, সেই ওদের উভয়ের সম্মিলিত জীবনের মূর্তিমান আশা আজ মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল, এরই অগৌরব ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। মনে মনে বলতে লাগল, তখনি যদি মরতুম তা হলে তো এই ধিক্‌কারটা বাঁচত আমার। আমার ভাগ্যে যা ছিল তা তো হল, কিন্তু দৈন্য-অপমানের এই নিদারুণ শূন্যতা একদিন কি পরিতাপ আনবে না ওঁর মনে। যার মোহে অভিভূত হয়ে এটা ঘটতে পারল একদিন হয়তো তাকে মাপ করতে পারবেন না, তার দেওয়া অন্ন ওঁর মুখে বিষ ঠেকবে। নিজের মাতলামির ফল দেখে লজ্জা পাবেন, কিন্তু দোষ দেবেন মদিরাকে। যদি অবশেষে ঊর্মির সম্পত্তির উপর নির্ভর করা অবশ্য হয়ে ওঠে তা হলে সেই আত্মাবমাননার ক্ষোভে ঊর্মিকে মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বালিয়ে মারবেন।

এ দিকে মথুরের সঙ্গে সমস্ত হিসেবপত্র শোধ করতে গিয়ে শশাঙ্ক হঠাৎ জানতে পেরেছে যে শর্মিলার সমস্ত টাকা ডুবেছে তার ব্যবসায়ে। এ কথা শর্মিলা এত দিন তাকে জানায় নি, মিটমাট করে নিয়েছিল মথুরের সঙ্গে।

শশাঙ্কের মনে পড়ল, চাকরির অন্তে সে একদিন শর্মিলার টাকা ধার নিয়েই গড়ে তুলেছিল তার ব্যাবসা। আজ নষ্ট ব্যাবসার অন্তে সেই শর্মিলারই ঋণ মাথায় করে চলেছে সে চাকরিতে। এ ঋণ তো আর নামাতে পারবে না। চাকরির মাইনে দিয়ে কোনোকালে শোধ হবার রাস্তা কই।

আর দিন-দশেক বাকি আছে নেপাল-যাত্রার। সমস্ত রাত ঘুমতে পারে নি। ভোরবেলায় শশাঙ্ক ধড়্‌ফড়্‌ করে বিছানা থেকে উঠেই আয়নার টেবিলের উপরে হঠাৎ সবলে মুষ্টিঘাত করে

বলে উঠল, 'যাব না নেপালে।' দৃঢ় পণ করলে, 'আমরা দুজনে ঊর্মিকে নিয়ে কলকাতাতেই থাকব— ভ্রূকুটিকুটিল সমাজের ক্রূর দৃষ্টির সামনেই। আর এইখানেই ভাঙা ব্যাবসাকে আর-একবার গড়ে তুলব এই কলকাতাতেই বসে।'

যে-যে জিনিস সঙ্গে যাবে, যা রেখে যেতে হবে, শর্মিলা বসে বসে তারই ফর্দ করছিল একটা খাতায়। ডাক শুনতে পেলে, 'শর্মিলা! শর্মিলা!' তাড়াতাড়ি খাতা ফেলে ছুটে গেল স্বামীর ঘরে। অকস্মাৎ অনিষ্টের আশঙ্কা করে কম্পিতহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হয়েছে।'

বললে, 'যাব না নেপালে। গ্রাহ্য করব না সমাজকে। থাকব এইখানেই।'

শর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন, কী হয়েছে।'

শশাঙ্ক বললে, 'কাজ আছে।'

সেই পুরাতন কথা। কাজ আছে। শর্মিলার বুক দুরুদুরু করে উঠল।

'শর্মি, ভেবো না আমি কাপুরুষ। দায়িত্ব ফেলে পালাব আমি, এত অধঃপতন কল্পনা করতেও পার?'

শর্মিলা কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে বললে, 'কী হয়েছে আমাকে বুঝিয়ে বলো।'

শশাঙ্ক বললে, 'আবার ঋণ করেছি তোমার কাছে, সে কথা ঢাকা দিয়ো না।'

শর্মিলা বললে, 'আচ্ছা, বেশ।'

শশাঙ্ক বললে, 'সেইদিনকার মতোই আজ থেকে আবার ঋণ শোধ করতে বসলুম। যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবই এই রইল কথা, শুনে রাখো। একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে তেমনি আবার আমাকে বিশ্বাস করো।'

শর্মিলা স্বামীর বুকের উপর মাথা রেখে বললে, 'তুমিও আমাকে বিশ্বাস কোরো। কাজ বুঝিয়ে দিয়ো আমাকে, তৈরি করে নিয়ো আমাকে, তোমার কাজের যোগ্য যাতে হতে পারি সেই শিক্ষা আজ থেকে আমাকে দাও।'

বাইরে থেকে আওয়াজ এল 'চিঠি'। ঊর্মির হাতের অক্ষরে দুখানা চিঠি। একখানি শশাঙ্কের নামে—

আমি এখন বোম্বাইয়ের রাস্তায়। চলেছি বিলেতে। বাবার আদেশমত ডাক্তারি শিখে আসব। ছয়-সাত বছর লাগবার কথা। তোমাদের সংসারে এসে যা ভাঙচুর করে গেলুম ইতিমধ্যে কালের হাতে আপনিই তা জোড়া লাগবে। আমার জন্যে ভেবো না, তোমার জন্যই ভাবনা রইল মনে।'

শর্মিলার চিঠি—

দিদি, শতসহস্র প্রণাম তোমার পায়ে। অজ্ঞানে অপরাধ করেছি, মাপ কোরো। যদি সেটা অপরাধ না হয় তবে তাই জেনেই সুখী হব। তার চেয়ে সুখী হবার আশা রাখব না মনে। কিসে সুখ তাই বা নিশ্চিত কী জানি। আর সুখ যদি না হয় তো নাই হল। ভুল করতে ভয় করি।

মালঞ্চ

প্রকাশ : ১৯৩৪

'মালঞ্চ' উপন্যাস বিচিত্রা মাসিকপত্রে ধারাবাহিক প্রকাশিত (আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৪০) হওয়ার পূর্বেই কবি 'মালঞ্চের নাট্যকরণে' ব্রতী হন। যদিও সেই নাট্যরূপ কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নি। পরে 'রবীন্দ্র জিজ্ঞাসা' দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৬৬) এবং ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'মালঞ্চ' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির অন্তত তিনটি কপিতে কবির সংশোধন দৃষ্ট হয়।

১

পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু-করা। নীরজা আধ-শোয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হালকা মেঘের তলায়। ফ্যাকাসে তার শাঁখের মতো রং, ঢিলে হয়ে পড়েছে চুড়ি, রোগা হাতে নীল শিরার রেখা, ঘনপক্ষ্ম চোখের পল্লবে লেগেছে রোগের কালিমা।

মেঝে সাদা মারবেলে বাঁধানো, দেয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি, ঘরে পালঙ্ক, একটি টিপাই, দুটি বেতের মোড়া আর এক কোণে কাপড় ঝোলাবার আলনা ছাড়া অন্য কোনো আসবাব নেই; এক কোণে পিতলের কলসিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, তারই মৃদু গন্ধ বাঁধা পড়েছে ঘরের বন্ধ হাওয়ায়।

পুবদিকে জানলা খোলা। দেখা যায় নিচের বাগানে অর্কিডের ঘর, ছিটে বেড়ায় তৈরি; বেড়ার গায়ে গায়ে অপরাজিতার লতা। অদূরে ঝিলের ধারে পাম্প চলছে, জল কুলকুল করে বয়ে যায় নালায় নালায়, ফুলগাছের কেয়ারির ধারে ধারে। গন্ধনিবিড় আমবাগানে কোকিল ডাকছে যেন মরিয়া হয়ে।

বাগানের দেউড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল বেলা দুপুরের। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের সঙ্গে তার সুরের মিল। তিনটে পর্যন্ত মালীদের ছুটি। ঐ ঘণ্টার শব্দে নীরজার বুকের ভিতরটা ব্যথিয়ে উঠল, উদাস হয়ে গেল তার মন। আয়া এল দরজা বন্ধ করতে। নীরু বললে, না না থাক। চেয়ে রইল যেখানে ছড়াছড়ি যাচ্ছে রৌদ্র-ছায়া গাছগুলোর তলায় তলায়।

ফুলের ব্যবসায়ে নাম করেছে তার স্বামী আদিত্য। বিবাহের পরদিন থেকে নীরজার ভালোবাসা আর তার স্বামীর ভালোবাসা নানা ধারায় এসে মিলেছে এই বাগানের নানা সেবায় নানা কাজে। এখানকার ফুলে পল্লবে দুজনের সম্মিলিত আনন্দ নব নব রূপ নিয়েছে নব নব সৌন্দর্যে। বিশেষ বিশেষ ডাক আসবার দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রবাসী যেমন অপেক্ষা করে চিঠির, ঋতুতে ঋতুতে তেমনি ওরা অপেক্ষা করেছে ভিন্ন ভিন্ন গাছের পুঞ্জিত অভ্যর্থনার জন্যে।

আজ কেবল নীরজার মনে পড়ছে সেইদিনকার ছবি। বেশিদিনের কথা নয়, তবু মনে হয় যেন একটা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যুগান্তরের ইতিহাস। বাগানের পশ্চিমধারে প্রাচীন মহানিম গাছ। তারই জুড়ি আরো একটা নিমগাছ ছিল; সেটা কবে জীর্ণ হয়ে পড়ে গেছে; তারই গুঁড়িটাকে সমান করে কেটে নিয়ে বানিয়েছে একটা ছোটো টেবিল। সেইখানেই ভোরবেলায় চা খেয়ে নিত দুজনে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ ডালে-ছাঁকা রৌদ্র এসে পড়ত পায়ের কাছে; শালিখ কাঠবিড়ালি হাজির হত প্রসাদপ্রার্থী। তার পরে দোঁহে মিলে চলত বাগানের নানা কাজ। নীরজার মাথার উপরে একটা ফুলকাটা রেশমের ছাতি, আর আদিত্যর মাথায় সোলার টুপি, কোমরে ডাল-ছাঁটা কাঁচি। বন্ধুবান্ধবরা দেখা করতে এলে বাগানে কাজের সঙ্গে মিলিত হত লৌকিকতা। বন্ধুদের মুখে প্রায় শোনা যেত,—'সত্যি বলছি, ভাই, তোমার ডালিয়া দেখে হিংসে হয়।' কেউ বা আনাড়ির মতো জিজ্ঞাসা করেছে, 'ওগুলো কি সূর্যমুখী।' নীরজা ভারি খুশি হয়ে হেসে উত্তর করেছে, 'না না, ও তো গাঁদা।' একজন বিষয়বুদ্ধিপ্রবীণ একদা বলেছিল—'এতবড়ো মোতিয়া বেল কেমন করে জন্মালেন, নীরজা দেবী। আপনার হাতে জাদু আছে। এ যেন টগর।' সমজদারের পুরস্কার মিলল; হলা মালীর ভ্রূকুটি উৎপাদন করে পাঁচটা টবসুদ্ধ সে নিয়ে গেছে বেলফুলের গাছ। কতদিন মুগ্ধ বন্ধুদের নিয়ে চলত কুঞ্জপরিক্রম, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, সবজির বাগানে। বিদায়কালে নীরজা ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, কারনেশন—তার সঙ্গে পেঁপে, কাগজিলেবু, কয়েতবেল—ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েতবেল। যথাঋতুতে সব-

শেষে আসত ডাবের জল। তৃষিতেরা বলত, 'কী মিষ্টি জল।' উত্তরে শুনত, 'আমার বাগানের গাছের ডাব।' সবাই বলত, 'ওঃ, তাই তো বলি।'

সেই ভোরবেলাকার গাছতলায় দার্জিলিং চায়ের বাষ্পে-মেশা নানা ঋতুর গন্ধস্মৃতি দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে মিলে হায় হায় করে ওর মনে। সেই সোনার রঙে রঙিন দিনগুলোকে ছিঁড়ে ফিরিয়ে আনতে চায় কোন্ দস্যুর কাছ থেকে। বিদ্রোহী মন কাউকে সামনে পায় না কেন। ভালো-মানুষের মতো মাথা হেঁট করে ভাগ্যকে মেনে নেবার মেয়ে নয় ও তো। এর জন্যে কে দায়ী। কোন বিশ্বব্যাপী ছেলেমানুষ। কোন বিরাট পাগল। এমন সম্পূর্ণ সৃষ্টিটাকে এতবড়ো নিরর্থক-ভাবে উলটপালট করে দিতে পারলে কে।

বিবাহের পর দশটা বছর একটানা চলে গেল অবিমিশ্র সুখে। মনে মনে ঈর্ষা করেছে সখীরা; মনে করেছে ওর যা বাজারদর তার চেয়ে ও অনেক বেশি পেয়েছে। পুরুষ বন্ধুরা আদিত্যকে বলেছে, 'লাকি ডগ।'

নীরজার সংসার-সুখের পালের নৌকো প্রথম যে ব্যাপার নিয়ে ধস্ করে একদিন তলায় ঠেকল সে ওদের 'ডলি' কুকুর-ঘটিত। গৃহিণী এ সংসারে আসবার পূর্বেই ডলিই ছিল স্বামীর একলা ঘরের সঙ্গিনী। অবশেষে তার নিষ্ঠা বিভক্ত হল দম্পতির মধ্যে। ভাগে বেশি পড়েছিল নীরজার দিকেই। দরজার কাছে গাড়ি আসতে দেখলেই কুকুরটার মন যেত বিগড়িয়ে। ঘন ঘন লেজ আন্দোলনে আসন্ন রথযাত্রার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করত। অনিমন্ত্রণে গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে ওঠবার দুঃসাহস নিরস্ত হত স্বামিনীর তর্জনী সংকেতে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে লেজের কুণ্ডলীর মধ্যে নৈরাশ্যকে বেষ্টিত করে দ্বারের কাছে পড়ে থাকত। ওদের ফেরবার দেরি হলে মুখ তুলে বাতাস ঘ্রাণ করে করে ঘুরে বেড়াত, কুকুরের অব্যক্ত ভাষায় আকাশে উচ্ছ্বসিত করত করুণ প্রশ্ন। অবশেষে এই কুকুরকে হঠাৎ কী রোগে ধরলে, শেষ পর্যন্ত ওদের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি স্তব্ধ রেখে নীরজার কোলে মাথা দিয়ে মারা গেল।

নীরজার ভালোবাসার ছিল প্রচণ্ড জেদ। সেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে বিধাতারও হস্তক্ষেপ তার কল্পনার অতীত। এতদিন অনুকূল সংসারকে সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছে। আজ পর্যন্ত বিশ্বাস নড়বার কারণ ঘটে নি। কিন্তু আজ ডলির পক্ষেও যখন মরা অভাবনীয়রূপে সম্ভবপর হল তখন ওর দুর্গের প্রাচীরে প্রথম ছিদ্র দেখা দিল। মনে হল এটা অলক্ষণের প্রথম প্রবেশদ্বার। মনে হল বিশ্বসংসারের কর্মকর্তা অব্যবস্থিতচিত্ত—তাঁর আপাতপ্রত্যক্ষ প্রসাদের উপরেও আর আস্থা রাখা চলে না।

নীরজার সন্তান হবার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের আশ্রিত গণেশের ছেলেটাকে নিয়ে যখন নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলেছে, আর ছেলেটা যখন তার অশান্ত অভিঘাত আর সইতে পারছে না এমন সময় ঘটল সন্তানসম্ভাবনা। ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় উঠল ভরে, ভাবীকালের দিগন্ত উঠল নবজীবনের প্রভাত-আভায় রক্তিম হয়ে, গাছের তলায় বসে বসে আগন্তুকের জন্যে নানা অলংকরণে নীরজা লাগল সেলাইয়ের কাজে।

অবশেষে এল প্রসবের সময়। ধাত্রী বুঝতে পারলে আসন্ন সংকট। আদিত্য এত বেশি অস্থির হয়ে পড়ল যে ডাক্তার ভর্ৎসনা করে তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখলে। অস্ত্রাঘাত করতে হল, শিশুকে মেরে জননীকে বাঁচালে। তারপর থেকে নীরজা আর উঠতে পারলে না। বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার স্বল্পরক্ত দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে। প্রাণশক্তির অজস্রতা একেবারেই হল নিঃস্ব। বিছানার সামনে জানলা খোলা, তপ্ত হাওয়ায় আসছে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ, কখনো বাতাবিফুলের নিশ্বাস, যেন তার সেই পূর্বকালের দূরবর্তী বসন্তের দিন মৃদুকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'কেমন আছ।'

সকলের চেয়ে তাকে বাজল যখন দেখলে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্যে আদিত্যের দূর-সম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েছে। খোলা জানলা থেকে যখনি সে দেখে অভ্র ও রেশমের

কাজ-করা একটা টোকা মাথায় সরলা বাগানের মালীদের খাটিয়ে বেড়াচ্ছে তখন নিজের অকর্মণ্য হাতপাগুলোকে সহ্য করতে পারত না। অথচ সুস্থ অবস্থায় এই সরলাকেই প্রত্যেক ঋতুতে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে নতুন চারারোপণের উৎসবে। ভোরবেলা থেকে কাজ চলত। তারপরে ঝিলে সাঁতার কেটে স্নান, তারপরে গাছের তলায় কলাপাতায় খাওয়া, একটা গ্র্যামোফোনে বাজত দিশি-বিদিশি সংগীত। মালীদের জুটত দই চিঁড়ে সন্দেশ। তেঁতুলতলা থেকে তাদের কলরব শোনা যেত। ক্রমে বেলা আসত নেমে, ঝিলের জল উঠত অপরাহ্ণের বাতাসে শিউরিয়ে, পাখি ডাকত বকুলের ডালে, আনন্দময় ক্লান্তিতে হত দিনের অবসান।

ওর মনের মধ্যে যে রস ছিল নিছক মিষ্ট, আজ কেন সে হয়ে গেল কটু; যেমন আজকালকার দুর্বল শরীরটা ওর অপরিচিত, তেমনি এখনকার তীব্র নীরস স্বভাবটাও ওর চেনা স্বভাব নয়। সে স্বভাবে কোনো দাক্ষিণ্য নেই। এক-একবার এই দারিদ্র্য ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, লজ্জা জাগে মনে, তবু কোনোমতে সামলাতে পারে না। ভয় হয়, আদিত্যের কাছে এই হীনতা ধরা পড়ছে বুঝি, কোন্‌দিন হয়তো সে প্রত্যক্ষ দেখবে নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো, ভদ্র-প্রয়োজনের অযোগ্য।

বাজল দুপুরের ঘণ্টা। মালীরা গেল চলে। সমস্ত বাগানটা নির্জন। নীরজা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে দুরাশার মরীচিকাও আভাস দেয় না, যেখানে ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যতার পরে শূন্যতার অনুবৃত্তি।

২

নীরজা ডাকল, 'রোশনি।'

আয়া এল ঘরে। প্রৌঢ়া, কাঁচা-পাকা চুল, শক্ত হাতে মোটা পিতলের কংকণ, ঘাঘরার উপরে ওড়না। মাংসবিরল দেহের ভঙ্গিতে ও শুষ্ক মুখের ভাবে একটা চিরস্থায়ী কঠিনতা। যেন ওর আদালতে এদের সংসারের প্রতিকূলে ও রায় দিতে বসেছে। মানুষ করেছে নীরজাকে, সমস্ত দরদ তার 'পরেই। তার কাছাকাছি যারা যায় আসে, এমন-কি নীরজার স্বামী পর্যন্ত, তাদের সকলেরই সম্বন্ধে ওর একটা সতর্ক বিরুদ্ধতা।

ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'জল এনে দেব খোঁখী?'

'না, বোস্‌।' মেঝের উপর হাঁটু উঁচু করে বসল আয়া।

নীরজার দরকার কথা কওয়া, তাই আয়াকে চাই। আয়া ওর স্বগত উক্তির বাহন।

নীরজা বললে, 'আজ ভোরবেলায় দরজা খোলার শব্দ শুনলুম।'

আয়া কিছু বললে না, কিন্তু তার বিরক্ত মুখভাবের অর্থ এই যে, 'কবে না শোনা যায়।'

নীরজা অনাবশ্যক প্রশ্ন করল, 'সরলাকে নিয়ে বুঝি বাগানে গিয়েছিলেন।'

কথাটা নিশ্চিত জানা, তবু রোজই একই প্রশ্ন। একবার হাত উলটিয়ে মুখ বাঁকিয়ে আয়া চুপ করে বসে রইল।

নীরজা বাইরের দিকে চেয়ে আপন মনে বলতে লাগল, 'আমাকেও ভোরে জাগাতেন, আমিও যেতুম বাগানের কাজে, ঠিক ঐ সময়েই। সে তো বেশিদিনের কথা নয়।'

এই আলোচনায় যোগ দেওয়া কেউ তার কাছে আশা করে না, তবু আয়া থাকতে পারলে না। বললে, 'ওঁকে না নিলে বাগান বুঝি যেত শুকিয়ে?'

নীরজা আপন মনে বলে চলল, 'নিয়ু মার্কেটে ভোরবেলাকার ফুলের চালান না পাঠিয়ে আমার একদিনও কাটত না। সেইরকম ফুলের চালান আজও গিয়েছিল, গাড়ির শব্দ শুনেছি। আজকাল চালান কে দেখে দেয় রোশনি।'

এই জানা কথার কোনো উত্তর করল না আয়া, ঠোঁট চেপে রইল বসে।

নীরজা আয়াকে বললে, 'আর যাই হোক, আমি যতদিন ছিলুম, মালীরা ফাঁকি দিতে পারে নি।'

আয়া উঠল গুমরিয়ে, বললে, 'সে দিন নেই, এখন লুঠ চলছে দু-হাতে।'

'সত্যি না কি।'

'আমি কি মিথ্যা বলছি। কলকাতার নতুনবাজারে ক'টা ফুলই বা পৌঁছয়। জামাইবাবু বেরিয়ে গেলেই খিড়কির দরজায় মালীদের ফুলের বাজার বসে যায়।'

'এরা কেউ দেখে না?'

'দেখবার গরজ এত কার।'

'জামাইবাবুকে বলিস নে কেন।'

'আমি বলবার কে। মান বাঁচিয়ে চলতে হবে তো। তুমি বল না কেন। তোমারই তো সব।'

'হোক-না, হোক-না, বেশ তো। চলুক-না এমনই কিছুদিন, তার পরে যখন ছারখার হয়ে আসবে আপনি পড়বে ধরা। একদিন বোঝবার সময় আসবে, মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়। চুপ করে থাক-না।'

'কিন্তু তাও বলি খোঁখী, তোমার ঐ হলা মালীটাকে দিয়ে কোনও কাজ পাওয়া যায় না।'

হলার কাজে ঔদাসীন্যই যে আয়ার একমাত্র বিরক্তির কারণ তা নয়, ওর উপরে নীরজার স্নেহ অসংগতরূপে বেড়ে উঠছে, এই কারণটাই সবচেয়ে গুরুতর।

নীরজা বললে, 'মালীকে দোষ দিই নে। নতুন মনিবকে সইতে পারবে কেন। ওদের হল সাত-পুরুষে মালীগিরি, আর তোমার দিদিমণির বইপড়া বিদ্যে, হুকুম করতে এলে সে কি মানায়। হলা ছিষ্টিছাড়া আইন মানতে চায় না, আমার কাছে এসে নালিশ করে। আমি বলি কানে আনিস নে কথা, চুপ করে থাক্।'

'সেদিন জামাইবাবু ওকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল।'

'কেন, কী জন্যে।'

'ও বসে বসে বিড়ি টানছে, আর ওর সামনে বাইরের গোরু এসে গাছ খাচ্ছে। জামাইবাবু বললে, "গোরু তাড়াস নে কেন।" ও মুখের উপর জবাব করলে, "আমি তাড়াব গোরু! গোরুই তো তাড়া করে আমাকে। আমার প্রাণের ভয় নেই"!'

শুনে হাসলে নীরজা, বললে, 'ওর ঐরকম কথা। তা যাই হোক, ও আমার আপন হাতে তৈরি।'

'জামাইবাবু তোমার খাতিরেই তো ওকে সয়ে যায়, তা গোরুই ঢুকুক আর গণ্ডারই তাড়া করুক। এতটা আবদার ভালো নয়, তাও বলি।'

'চুপ কর্ রোশনি। কী দুঃখে ও গোরু তাড়ায় নি সে কি আমি বুঝি নে। ওর আগুন জ্বলছে বুকে। ঐ যে হলা মাথায় গামছা দিয়ে কোথায় চলেছে। ডাক্ তো ওকে।'

আয়ার ডাকে হলধর মালী এল ঘরে। নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, 'কী রে, আজকাল নতুন ফরমাশ কিছু আছে?'

হলা বললে, 'আছে বৈকি। শুনে হাসিও পায়, চোখে জলও আসে।'

'কী রকম, শুনি।'

'ঐ যে সামনে মল্লিকদের পুরোনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, ঐখান থেকে ইঁটপাটকেল নিয়ে এসে গাছের তলায় বিছিয়ে দিতে হবে। এই হল ওঁর হুকুম। আমি বললুম, রোদের বেলায় গরম লাগবে গাছের। কান দেয় না আমার কথায়।'

'বাবুকে বলিস নে কেন।'

'বাবুকে বলেছিলেম। বাবু ধমক দিয়ে বলে, চুপ করে থাক্। বউদিদি, ছুটি দাও আমাকে, সহ্য হয় না আমার।'

'তাই দেখেছি বটে, ঝুড়ি করে রাবিশ বয়ে আনছিলি।'

'বউদিদি, তুমি আমার চিরকালের মনিব। তোমারই চোখের সামনে আমার মাথা হেঁট করে দিলে। দেশের লোকের কাছে আমার জাত যাবে। আমি কি কুলিমজুর।'

'আচ্ছা, এখন যা। তোদের দিদিমণি যখন তোকে ইঁটসুরকি বইতে বলবে আমার নাম করে বলিস আমি বারণ করেছি। দাঁড়িয়ে রইলি যে?'

'দেশ থেকে চিঠি এসেছে বড়ো হালের গোরুটা মারা গেছে।' বলে মাথা চুলকাতে লাগল।

নীরজা বললে, 'না মারা যায় নি, দিব্যি বেঁচে আছে। নে দুটো টাকা, আর বেশি বকিস নে।' এই বলে টিপাইয়ের উপরকার পিতলের বাক্স থেকে টাকা বের করে দিলে।

'আবার কী।'

'বউয়ের জন্যে একখানা পুরোনো কাপড়। জয়জয়কার হবে তোমার।' এই বলে পানের ছোপে কালো-বর্ণ মুখ প্রসারিত করে হাসলে।

নীরজা বললে, 'রোশনি, দে তো ওকে আলনার ঐ কাপড়খানা।'

রোশনি সবলে মাথা নেড়ে বললে, 'সে কী কথা, ও যে তোমার ঢাকাই শাড়ি।'

'হোক-না ঢাকাই শাড়ি। আমার কাছে আজ সব শাড়িই সমান। কবেই বা আর পরব।'

রোশনি দৃঢ়মুখ করে বললে, 'না সে হবে না। ওকে তোমার সেই লালপেড়ে কলের কাপড়টা দেব। দেখ্ হলা, খোঁখীকে যদি এমনি জ্বালাতন করিস বাবুকে বলে তোকে দূর করে তাড়িয়ে দেব।'

হলা নীরজার পা ধরে কান্নার সুরে বললে, 'আমার কপাল ভেঙেছে বউদিদি।'

'কেন রে, কী হয়েছে তোর।'

'আয়াজিকে মাসি বলি আমি। আমার মা নেই, এতদিন জানতেম হতভাগা হলাকে আয়াজি ভালোবাসেন। আজ বউদিদি, তোমার যদি দয়া হল উনি কেন দেন বাগড়া। কারো দোষ নয় আমারই কপালের দোষ। নইলে তোমার হলাকে পরের হাতে দিয়ে তুমি আজ বিছানায় পড়ে।'

'ভয় নেই রে, তোর মাসি তোকে ভালোই বাসে। তুই আসবার আগেই তোর গুণগান করছিল। রোশনি, দে ওকে ঐ কাপড়টা, নইলে ও ধন্না দিয়ে পড়ে থাকবে।'

অত্যন্ত বিরস মুখে আয়া কাপড়টা এনে ফেলে দিলে ওর সামনে। হলা সেটা তুলে নিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলে। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এই গামছাটা দিয়ে মুড়ে নিই বউদিদি। আমার ময়লা হাত, দাগ লাগবে।' সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই আলনা থেকে তোয়ালেটা নিয়েই কাপড় মুড়ে দ্রুতপদে হলা প্রস্থান করলে।

নীরজা আয়াকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা আয়া, তুই ঠিক জানিস বাবু বেরিয়ে গেছেন?'

'নিজের চক্ষে দেখলুম। কী তাড়া। টুপিটা নিতে ভুলে গেলেন।'

'আজ এই প্রথম হল। আমার সকালবেলাকার পাওনা ফুলে ফাঁকি পড়ল। দিনে দিনে এই ফাঁকি বাড়তে থাকবে। শেষকালে আমি গিয়ে পড়ব আমার সংসারের আঁস্তাকুড়ে, যেখানে নিবে-যাওয়া পোড়া কয়লার জায়গা।'

সরলাকে আসতে দেখে আয়া মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল।

সরলা ঢুকল ঘরে। তার হাতে একটি অরকিড। ফুলটি শুভ্র, পাপড়ির আগায় বেগনির রেখা। যেন ডানা-মেলা মস্ত প্রজাপতি। সরলা ছিপছিপে লম্বা, শামলা রং, প্রথমেই লক্ষ্য হয় তার বড়ো বড়ো চোখ, উজ্জ্বল এবং করুণ। মোটা খদ্দরের শাড়ি, চুল অযত্নে বাঁধা, শ্লথবন্ধনে নেমে পড়েছে কাঁধের দিকে। অসজ্জিত দেহ যৌবনের সমাগমকে অনাদৃত করে রেখেছে।

নীরজা তার মুখের দিকে তাকালে না। সরলা ধীরে ধীরে ফুলটি বিছানায় তার সামনে রেখে দিলে।

নীরজা বিরক্তির ভাব গোপন না করেই বললে, 'কে আনতে বলেছে।'

'আদিতদা।'

'নিজে এলেন না যে?'

'নিয়ু মার্কেটের দোকানে তাড়াতাড়ি যেতে হল চা খাওয়া সেরেই।'

'এত তাড়া কিসের।'

'কাল রাত্রে আপিসের তালা ভেঙে টাকা-চুরির খবর এসেছে।'

'টানাটানি করে কি পাঁচ মিনিটও সময় দিতে পারতেন না।'

'কাল রাত্রে তোমার ব্যথা বেড়েছিল। ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। দরজার কাছ পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন দুপুরের মধ্যে যদি নিজে না আসতে পারেন এই ফুলটি যেন দিই তোমাকে।'

দিনের কাজ আরম্ভের পূর্বেই রোজ আদিত্য বিশেষ বাছাই-করা একটি করে ফুল স্ত্রীর বিছানায় রেখে যেত। নীরজা প্রতিদিন তারই অপেক্ষা করেছে। আজকের দিনের বিশেষ ফুলটি আদিত্য সরলার হাতে দিয়ে গেল। এ কথা তার মনে আসে নি যে, ফুল দেওয়ার প্রধান মূল্য নিজের হাতে দেওয়া। গঙ্গার জল হলেও নলের ভিতর থেকে তার সার্থকতা থাকে না।

নীরজা ফুলটা অবজ্ঞার সঙ্গে ঠেলে দিয়ে বললে, 'জান মার্কেটে এ ফুলের দাম কত? পাঠিয়ে দাও সেখানে, মিছে নষ্ট করবার দরকার কী।' বলতে বলতে গলা ভার হয়ে এল।

সরলা বুঝলে ব্যাপারখানা। বুঝলে জবাব দিতে গেলে আক্ষেপের বেগ বাড়বে বৈ কমবে না। চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে। একটু পরে খামখা নীরজা প্রশ্ন করলে, 'জান এ ফুলের নাম?'

বললেই হত, জানি নে, কিন্তু বোধ করি অভিমানে ঘা লাগল, বললে, 'এমারিলিস।'

নীরজা অন্যায় উষ্মার সঙ্গে ধমক দিলে, 'ভারি তো জান তুমি; ওর নাম গ্র্যান্ডিফ্লোরা।'

সরলা মৃদুস্বরে বললে, 'তা হবে।'

'তা হবে মানে কী। নিশ্চয়ই তাই। বলতে চাও, আমি জানি নে?'

সরলা জানত নীরজা জেনেশুনেই ভুল নামটা দিয়ে প্রতিবাদ করলে। অন্যকে জ্বালিয়ে নিজের জ্বালা উপশম করবার জন্যে। নীরবে হার মেনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল, নীরজা ফিরে ডাকল, 'শুনে যাও। কী করছিলে সমস্ত সকাল, কোথায় ছিলে।'

'অর্কিডের ঘরে।'

নীরজা উত্তেজিত হয়ে বললে, 'অর্কিডের ঘরে তোমার ঘন ঘন যাবার এত কী দরকার।'

'পুরোনো অর্কিড চিরে ভাগ করে নতুন অর্কিড করবার জন্যে আদিতদা আমাকে বলে গিয়েছিলেন।'

নীরজা বলে উঠল ধমক দেওয়ার সুরে, 'আনাড়ির মতো সব নষ্ট করবে তুমি। আমি নিজের হাতে হলা মালীকে তৈরি করে শিখিয়েছি, তাকে হুকুম করলে সে কি পারত না।'

এর উপর জবাব চলে না। এর অকপট উত্তরটা ছিল এই যে, নীরজার হাতে হলা মালীর কাজ চলত ভালোই, কিন্তু সরলার হাতে একেবারেই চলে না। এমন-কি, ওকে সে অপমান করে ঔদাসীন্য দেখিয়ে।

মালী এটা বুঝে নিয়েছিল যে, এ-আমলে ঠিকমতো কাজ না করলেই ও-আমলের মনিব হবেন খুশি। এ যেন কলেজ বয়কট করে পাশ না করার দামটাই ডিগ্রি পাওয়ার চেয়ে বড়ো হয়েছে।

সরলা রাগ করতে পারত কিন্তু রাগ করলে না। সে বোঝে বউদিদির বুকের ভিতরটা টনটন করছে। নিঃসন্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছে যে বাগান, দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে, তবু এই বাগানের থেকে নির্বাসন। চোখের সামনেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ। নীরজা বললে, 'দাও, বন্ধ

করে দাও ঐ জানলা।' সরলা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এইবার কমলালেবুর রস নিয়ে আসি।'

'না কিছু আনতে হবে না, এখন যেতে পারো।'

সরলা ভয়ে ভয়ে বললে, 'মকরধ্বজ খাবার সময় হয়েছে।'

'না দরকার নেই মকরধ্বজ। তোমার উপর বাগানের আর কোনো কাজের ফরমাশ আছে নাকি।'

'গোলাপের ডাল পুঁততে হবে।'

নীরজা একটু খোঁটা দিয়ে বললে, 'তার সময় এই বুঝি! এ বুদ্ধি তাঁকে দিলে কে, শুনি।'

সরলা মৃদুস্বরে বললে, 'মফস্বল থেকে হঠাৎ অনেকগুলো অর্ডার এসেছে দেখে কোনোমতে আসছে বর্ষার আগেই বেশি করে গাছ বানাতে পণ করেছেন। আমি বারণ করেছিলুম।'

'বারণ করেছিলে বুঝি! আচ্ছা, আচ্ছা, ডেকে দাও হলা মালীকে।'

এল হলা মালী। নীরজা বললে, 'বাবু হয়ে উঠেছ? গোলাপের ডাল পুঁততে হাতে খিল ধরে! দিদিমণি তোমার অ্যাসিস্টেন্ট মালী নাকি। বাবু শহর থেকে ফেরবার আগেই যতগুলো পারিস ডাল পুঁতবি, আজ তোদের ছুটি নেই বলে দিচ্ছি। পোড়া ঘাসপাতার সঙ্গে বালি মিশিয়ে জমি তৈরি করে নিস ঝিলের ডান পাড়িতে।' মনে মনে স্থির করলে এইখানে শুয়ে-শুয়েই গোলাপের গাছ সে তৈরি করে তুলবেই। হলা মালীর আর নিষ্কৃতি নেই।

হঠাৎ হলা প্রশ্রয়ের হাসিতে মুখ ভরে বললে, 'বউদিদি, এই একটা পিতলের ঘটি। কটকের হরসুন্দর মাইতির তৈরি। এ জিনিসের দরদ তুমিই বুঝবে। তোমার ফুলদানি মানাবে ভালো।'

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, 'এর দাম কত।'

জিভ কেটে হলা বললে, 'এমন কথা বোলো না। এ ঘটির আবার দাম নেব! গরিব আমি, তা বলে তো ছোটোলোক নই। তোমারই খেয়ে-পরে যে মানুষ।'

ঘটি টিপাইয়ের উপর রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজাতে লাগল। অবশেষে যাবার-মুখো হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমাকে জানিয়েছি আমার ভাগনীর বিয়ে। বাজুবন্ধর কথা ভুলো না বউদিদি। পিতলের গয়না যদি দিই তোমারই নিন্দে হবে। এতবড়ো ঘরের মালী, তারই ঘরে বিয়ে, দেশসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে।'

নীরজা বললে, 'আচ্ছা তোর ভয় নেই, তুই এখন যা।' হলা চলে গেল। নীরজা হঠাৎ পাশ ফিরে বালিশে মাথা রেখে গুমরে উঠে বলে উঠল, 'রোশনি, রোশনি, আমি ছোটো হয়ে গেছি, ঐ হলা মালীর মতোই হয়েছে আমার মন।'

আয়া বললে, 'ও কী বলছ খোঁখী, ছি ছি।'

নীরজা আপনিই বলতে লাগল, 'আমার পোড়া কপাল আমাকে বাইরে থেকে নামিয়ে দিয়েছে, আবার ভিতর থেকে নামিয়ে দিলে কেন। আমি কি জানি নে আমাকে হলা আজ কী চোখে দেখছে। আমার কাছে লাগালাগি করে হাসতে হাসতে বকশিশ নিয়ে চলে গেল। ওকে ডেকে দে। খুব করে ওকে ধমকে দেব, ওর শয়তানি ঘোচাতে হবে।'

আয়া যখন হলাকে ডাকবার জন্যে উঠল, নীরজা বললে, 'থাক্ থাক্ আজ থাক্।'

৩

কিছুক্ষণ পরে ওর খুড়তুতো দেওর রমেন এসে বললে, 'বউদি, দাদা পাঠিয়ে দিলেন। আজ আপিসে কাজের ভিড়, হোটেলে খাবেন, দেরি হবে ফিরতে।'

নীরজা হেসে বললে, 'খবর দেবার ছুতো করে একদৌড়ে ছুটে এসেছ ঠাকুরপো। কেন, আপিসের বেহারাটা মরেছে বুঝি?'

'তোমার কাছে আসতে তুমি ছাড়া অন্য ছুতোর দরকার কিসের বউদি। বেহারা বেটা কী বুঝবে এই দূত-পদের দরদ।'

'ওগো মিষ্টি ছড়াচ্ছ অস্থানে। এ ঘরে এসেছ কোন্ ভুলে। তোমার মালিনী আছেন আজ একাকিনী নেবুকুঞ্জবনে, দেখো গে যাও।'

'কুঞ্জবনের বনলক্ষ্মীকে দর্শনী দিই আগে, তার পরে যাব মালিনীর সন্ধানে।' এই বলে বুকের পকেট থেকে একখানা গল্পের বই বের করে নীরজার হাতে দিল।

নীরজা খুশি হয়ে বললে, '"অশ্রু-শিকল", এই বইটাই চাচ্ছিলুম। আশীর্বাদ করি, তোমার মালঞ্চের মালিনী চিরদিন বুকের কাছে বাঁধা থাক্ হাসির শিকলে। ঐ যাকে তুমি বল তোমার কল্পনার দোসর, তোমার স্বপ্ন-সঙ্গিনী। কী সোহাগ গো।'

রমেন হঠাৎ বললে, 'আচ্ছা বউদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিয়ো।'

'কী কথা।'

'সরলার সঙ্গে আজ কি তোমার ঝগড়া হয়ে গেছে।'

'কেন বলো তো।'

'দেখলুম ঝিলের ধারে ঘাটে চুপ করে সে বসে আছে। মেয়েদের তো পুরুষদের মতো কাজ-পালানো উড়ো মন নয়। এমন বেকার দশা আমি সরলার কোনোদিন দেখি নি। জিজ্ঞাসা করলুম, "মন কোন্‌দিকে।" ও বললে, "যেদিকে তপ্ত হাওয়া শুকনো পাতা ওড়ায় সেইদিকে।" আমি বললুম, "ওটা হল হেঁয়ালি। স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।" সে বললে, "সব কথারই ভাষা আছে?" আবার দেখি হেঁয়ালি। তখন গানের বুলিটা মনে পড়ল "কাহার বচন দিয়েছে বেদন"।'

'হয়তো তোমার দাদার বচন।'

'হতেই পারে না। দাদা যে পুরুষমানুষ। সে তোমার ঐ মালীগুলোকে হুংকার দিতে পারে। কিন্তু 'পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ' এও কি সম্ভব হয়।'

'আচ্ছা, বাজে কথা বকতে হবে না। একটা কাজের কথা বলি, আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। দোহাই তোমার, সরলাকে তুমি বিয়ে করো। আইবুড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।'

'পুণ্যের লোভ রাখি নে কিন্তু ঐ কন্যার লোভ রাখি, এ কথা বলছি তোমার কাছে হলফ করে।'

'তাহলে বাধাটা কোথায়। ওর কি মন নেই।'

'সে কথা জিজ্ঞাসাও করি নি। বলেইছি-তো ও আমার কল্পনার দোসরই থাকবে, সংসারের দোসর হবে না।'

হঠাৎ তীব্র আগ্রহের সঙ্গে নীরজা রমেনের হাত চেপে ধরে বললে, 'কেন হবে না, হতেই হবে। মরবার আগে তোমাদের বিয়ে দেখবই, নইলে ভূত হয়ে তোমাদের জ্বালাতন করব বলে রাখছি।'

নীরজার ব্যগ্রতা দেখে রমেন বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে রইল চেয়ে। শেষকালে মাথা নেড়ে বললে, 'বউদি, আমি সম্পর্কে ছোটো, কিন্তু বয়সে বড়ো। উড়ো বাতাসে আগাছার বীজ আসে ভেসে, প্রশ্রয় পেলে শিকড় ছড়ায়, তার পরে আর ওপড়ায় কার সাধ্যি।'

'আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। আমি তোমার গুরুজন, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, বিয়ে করো। দেরি কোরো না। এই ফাল্গুন মাসে ভালো দিন আছে।'

'আমার পাঁজিতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই ভালো দিন। কিন্তু দিন যদি বা থাকে, রাস্তা নেই। আমি একবার গেছি জেলে, এখনো আছি পিছল পথে জেলের কবলটার দিকে। ও পথে প্রজাপতির পেয়াদার চল নেই।'

'এখনকার মেয়েরাই বুঝি জেলখানাকে ভয় করে?'

'না করতে পারে কিন্তু সপ্তপদী গমনের রাস্তা ওটা নয়। ও রাস্তায় বধূকে পাশে না রেখে মনের মধ্যে রাখলে জোর পাওয়া যায়। রইল চিরদিন আমার মনে।'

হরলিক্‌স্‌ দুধের পাত্র টিপাইয়ের উপর রেখে সরলা চলে যাচ্ছিল। নীরজা বললে, 'যেয়ো না, শোনো সরলা, এই ফোটোগ্রাফটা কার। চিনতে পার?'

সরলা বললে, 'ও তো আমার।'

'তোমার সেই আগেকার দিনের ছবি। যখন তোমার জ্যাঠামশায়ের ওখানে তোমরা দুজনে বাগানের কাজ করতে। দেখে মনে হচ্ছে, বয়সে পনেরো হবে। মারাঠি মেয়ের মতো মালকোঁচা দিয়ে শাড়ি পরেছ।'

'এ তুমি কোথা থেকে পেলে।'

'দেখেছিলুম ওর একটা ডেস্কের মধ্যে, তখন ভালো করে লক্ষ করি নি। আজ সেখান থেকে আনিয়ে নিয়েছি। ঠাকুরপো, তখনকার চেয়ে সরলাকে এখন আরো অনেক ভালো দেখতে হয়েছে। তোমার কী মনে হয়।'

রমেন বললে, 'তখন কি কোনো সরলা কোথাও ছিল। অন্তত আমি তাকে জানতুম না। আমার কাছে এখনকার সরলাই একমাত্র সত্য। তুলনা করব কিসের সঙ্গে।'

নীরজা বললে, 'ওর এখনকার চেহারা হৃদয়ের কোনো একটা রহস্যে ঘন হয়ে ভরে উঠেছে— যেন যে-মেঘ ছিল সাদা তার ভিতর থেকে শ্রাবণের জল আজ ঝরিঝরি করছে— একেই তোমরা রোম্যান্টিক বল, না ঠাকুরপো?'

সরলা চলে যেতে উদ্যত হল, নীরজা তাকে বললে, 'সরলা, একটু বোসো। ঠাকুরপো, একবার পুরুষমানুষের চোখ দিয়ে সরলাকে দেখে নিই। ওর কী সকলের আগে চোখে পড়ে বলো দেখি।'

রমেন বললে, 'সমস্তটাই একসঙ্গে।'

'নিশ্চয়ই ওর চোখ দুটো; কেমন একরকম গভীর করে চাইতে জানে। না, উঠো না সরলা। আর-একটু বোসো। ওর দেহটাও কেমন নিরেট নিটোল।'

'তুমি কি ওকে নিলেম করতে বসেছ নাকি বউদি। জানই তো অমনিতেই আমার উৎসাহের কিছু কমতি নেই।'

নীরজা দালালির উৎসাহে বলে উঠল, 'ঠাকুরপো, দেখো সরলার হাত দুখানি, যেমন জোরালো তেমনি সুডোল, কোমল, তেমনি তার শ্রী। এমনটি আর দেখেছ?'

রমেন হেসে বললে, 'আর কোথাও দেখেছি কি না তার উত্তরটা তোমার মুখের সামনে রূঢ় শোনাবে।'

'অমন দুটি হাতের 'পরে দাবি করবে না?'

'চিরদিনের দাবি নাই করলেম, ক্ষণে ক্ষণে দাবি করে থাকি। তোমাদের ঘরে যখন চা খেতে আসি তখন চায়ের চেয়ে বেশি কিছু পাই ঐ হাতের গুণে। সেই রসগ্রহণে পাণিগ্রহণের যেটুকু সম্পর্ক থাকে অভাগার পক্ষে সে-ই যথেষ্ট।'

সরলা মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরবার উপক্রম করতেই রমেন দ্বার আগলে বললে, 'একটা কথা দাও তবে পথ ছাড়ব।'

'কী, বলো।'

'আজ শুক্লাচতুর্দশী। আমি মুসাফির আসব তোমার বাগিচায়, কথা যদি থাকে তবু কইবার দরকারই হবে না। আকাল পড়েছে, পেট ভরে দেখাই জোটে না। হঠাৎ এই ঘরে মুষ্টিভিক্ষার দেখা— এ মঞ্জুর নয়। আজ তোমাদের গাছতলায় বেশ একটু রয়ে-সয়ে মনটা ভরিয়ে নিতে চাই।'

সরলা সহজ সুরেই বললে, 'আচ্ছা, এসো তুমি।'

রমেন খাটের কাছে ফিরে এসে বললে, 'তবে আসি বউদি।'

'আর থাকবার দরকার কী। বউদির যে কাজটুকু ছিল, সে তো সারা হল।'

রমেন চলে গেল।

৪

রমেন চলে গেলে নীরজা হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বিছানায় পড়ে রইল। ভাবতে লাগল, এমন মন-মাতানো দিন তারও ছিল। কত বসন্তের রাতকে সে উতলা করেছে। সংসারের বারো আনা মেয়ের মতো সে কি ছিল স্বামীর ঘরকন্নার আসবাব। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলই মনে পড়ে, কতদিন তার স্বামী তার অলক ধরে টেনে আর্দ্রকণ্ঠে বলেছে, 'আমার রংমহলের সাকী।' দশ বছরে রং একটু ম্লান হয় নি, পেয়ালা ছিল ভরা। তার স্বামী তাকে বলত, 'সেকালে মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া লেগে ফুল ধরত অশোকে, মুখমদের ছিটে পেলে বকুল উঠত ফুটে, আমার বাগানে সেই কালিদাসের কাল দিয়েছে ধরা। যে পথে রোজ তোমার পা পড়ে, তারি দু-ধারে ফুল ফুটেছে রঙে রঙে, বসন্তের হাওয়ায় দিয়েছে মদ ছড়িয়ে, গোলাপবনে লেগেছে তার নেশা।' কথায় কথায় সে বলত, 'তুমি না থাকলে এই ফুলের স্বর্গে বেনের দোকান বৃত্রাসুর হয়ে দখল জমাত। আমার ভাগ্যগুণে তুমি আছ নন্দনবনের ইন্দ্রাণী।' হায় রে, যৌবন তো আজও ফুরোয় নি কিন্তু চলে গেল তার মহিমা। তাই তো ইন্দ্রাণী আপন আসন আজ ভরাতে পারছে না। সেদিন ওর মনে কোথাও কি ছিল লেশমাত্র ভয়। সে যেখানে ছিল সেখানে আর কেউই ছিল না, ওর আকাশে ও ছিল সকাল-বেলার অরুণোদয়ের মতো পরিপূর্ণ একা। আজ কোনোখানে একটু ছায়া দেখলেই বুক দুরদুর করে উঠছে, নিজের উপর আর ভরসা নেই। নইলে কে ঐ সরলা, কিসের ওর গুমর। আজ তাকে নিয়েও সন্দেহে মন দুলে উঠছে। কে জানত বেলা না ফুরোতেই এত দৈন্য ঘটবে কপালে। এতদিন ধরে এত সুখ এত গৌরব অজস্র দিয়ে অবশেষে বিধাতা এমন করে চোরের মতো সিঁধ কেটে দত্তাপহরণ করলেন।

'রোশনি, শুনে যা।'

'কী খোঁখী।'

'তোদের জামাইবাবু একদিন আমাকে ডাকত রংমহলের রঙ্গিনী। দশ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে সেই রং তো এখনো ফিকে হয় নি, কিন্তু সেই রংমহল?'

'যাবে কোথায়, আছে তোমার মহল। কাল তুমি সারারাত ঘুমোও নি, একটু ঘুমোও তো, পায়ে হাত বুলিয়ে দিই।'

'রোশনি, আজ তো পূর্ণিমার কাছাকাছি। এমন কত জ্যোৎস্নারাত্রে ঘুমোই নি। দুজনে বেড়িয়েছি বাগানে। সেই জাগা আর এই জাগা। আজ তো ঘুমোতে পারলে বাঁচি, কিন্তু পোড়া ঘুম আসতে চায় না যে।'

'একটু চুপ করে থাকো দেখি, ঘুম আপনি আসবে।'

'আচ্ছা, ওরা কি বাগানে বেড়ায় জ্যোৎস্নারাত্রে।'

'ভোরবেলাকার চালানের জন্য ফুল কাটতে দেখেছি। বেড়াবে কখন, সময় কোথায়।'

'মালীগুলো আজকাল খুব ঘুমোচ্ছে। তাহলে মালীদের বুঝি জাগায় না ইচ্ছে করেই?'

'তুমি নেই এখন ওদের গায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি।'

'ঐ না শুনলেম গাড়ির শব্দ?'

'হাঁ, বাবুর গাড়ি এল।'

'হাত-আয়নাটা এগিয়ে দে। বড়ো গোলাপটা নিয়ে আয় ফুলদানি থেকে। সেফটিপিনের বাক্সটা কোথায় দেখি। আজ আমার মুখ বড়ো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। যা তুই ঘর থেকে।'

'যাচ্ছি কিন্তু দুধ বার্লি পড়ে আছে, খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি।'

'থাক্‌ পড়ে, খাব না।'

'দু-দাগ ওষুধ তোমার আজ খাওয়া হয় নি।'

'তোর বকতে হবে না, তুই যা বলছি, ঐ জানলাটা খুলে দিয়ে যা।'

'মালঞ্চ' উপন্যাসের এক পৃষ্ঠা

আয়া চলে গেল।

ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। আরক্ত হয়ে এসেছে রোদ্দুরের রং, ছায়া হেলে পড়েছে পূর্বদিকে, বাতাস এল দক্ষিণ থেকে, ঝিলের জল উঠল টল টল করে। মালীরা লেগেছে কাজে, নীরজা দূর থেকে যতটা পারে তাই দেখে।

দ্রুতপদে আদিত্য ছুটে এল ঘরে। হাত জোড়া বাসন্তী রংএর দেশী ল্যাবার্নাম ফুলের মঞ্জরীতে। তাই দিয়ে ঢেকে দিল নীরজার পায়ের কাছটা। বিছানায় বসেই তার হাত চেপে ধরে বললে, 'আজ কতক্ষণ তোমাকে দেখি নি নীরু।' শুনে নীরজা আর থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আদিত্য খাটের থেকে নেমে মেজের উপর হাঁটু গেড়ে নীরজার গলা জড়িয়ে ধরলে, তার ভিজে গালে চুমো খেয়ে বললে, 'মনে মনে তুমি নিশ্চয় জান আমার দোষ ছিল না।'

'অত নিশ্চয় করে কী করে জানব বলো। আমার কি আর সেদিন আছে।'

'দিনের কথা হিসেব করে কী হবে। তুমি তো আমার সেই তুমিই আছ।'

'আজ যে আমার সকলতাতেই ভয় করে। জোর পাই নে যে মনে।'

'অল্প একটু ভয় করতে ভালো লাগে। না? খোঁটা দিয়ে আমাকে একটুখানি উসকিয়ে দিতে চাও। এ চাতুরী মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ।'

'আর ভুলে-যাওয়া বুঝি পুরুষদের স্বভাবসিদ্ধ নয়?'

'ভুলতে ফুরসৎ দাও কই।'

বোলো না বোলো না, পোড়া বিধাতার শাপে লম্বা ফুরসৎ দিয়েছি যে।'

'উলটো বললে। সুখের দিনে ভোলা যায়, ব্যথার দিনে নয়।'

'সত্যি বলো, আজ সকালে তুমি ভুলে চলে যাও নি?'

'কী কথা বল তুমি। চলে যেতে হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ না ফিরেছি মনে স্বস্তি ছিল না।'

'কেমন করে বসেছ তুমি। তোমার পা দুটো বিছানায় তোলো।'

'বেড়ি দিতে চাও পাছে পালাই!'

'হাঁ বেড়ি দিতে চাই। জনমে মরণে তোমার পা দুখানি নিঃসন্দেহে রইল আমার কাছে বাঁধা।'

'মাঝে মাঝে একটু একটু সন্দেহ কোরো, তাতে আদরের স্বাদ বাড়ায়।'

'না, একটুও সন্দেহ না। এতটুকুও না। তোমার মতো এমন স্বামী কোন্ মেয়ে পেয়েছে। তোমাকেও সন্দেহ, তাতে যে আমাকেই ধিক্‌কার।'

'আমিই তাহলে তোমাকে সন্দেহ করব, নইলে জমবে না নাটক।'

'তা কোরো, কোনো ভয় নেই। সেটা হবে প্রহসন।'

'যাই বল আজ কিন্তু রাগ করেছিলে আমার 'পরে।'

'কেন আবার সে কথা। শাস্তি তোমার দিতে হবে না—নিজের মধ্যেই তার দণ্ডবিধান।'

'দণ্ড কিসের জন্য। রাগের তাপ যদি মাঝে মাঝে দেখা না দেয় তাহলে বুঝব ভালোবাসার নাড়ি ছেড়ে গেছে।'

'যদি কোনো দিন ভুলে তোমার উপরে রাগ করি, নিশ্চয় জেনো সে আমি নয়, কোনো অপ-দেবতা আমার উপরে ভর করেছে।'

'অপদেবতা আমাদের সকলেরই একটা করে থাকে, মাঝে মাঝে অকারণে জানান দেয়। সুবুদ্ধি যদি আসে, রাম নাম করি, দেয় সে দৌড়।'

আয়া ঘরে এল। বললে, 'জামাইবাবু, আজ সকাল থেকে খোঁখী দুধ খায় নি, ওষুধ খায় নি, মালিশ করে নি। এমন করলে আমরা ওর সঙ্গে পারব না।' বলেই হন হন করে হাত দুলিয়ে চলে গেল।

শুনেই আদিত্য দাঁড়িয়ে উঠল, বললে, 'এবার তবে আমি রাগ করি।'

'হাঁ করো, খুব রাগ করো, যত পার রাগ করো, অন্যায় করেছি, কিন্তু মাপ কোরো তার পরে।' আদিত্য দরজার কাছে এসে ডাক দিতে লাগল, 'সরলা, সরলা।'

শুনেই নীরজার শিরায় শিরায় যেন ঝন ঝন করে উঠল। বুঝলে বেঁধানো কাঁটায় হাত পড়েছে। সরলা এল ঘরে। আদিত্য বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলে, 'নীরুকে ওষুধ দাও নি আজ, সারাদিন কিছু খেতেও দেওয়া হয় নি?' নীরজা বলে উঠল, 'ওকে বকছ কেন। ওর দোষ কী। আমিই দুষ্টুমি করে খাই নি, আমাকে বকো-না। সরলা তুমি যাও; মিছে কেন দাঁড়িয়ে বকুনি খাবে।'

'যাবে কী, ওষুধ বের করে দিক। হরলিক্‌স্‌ মিল্ক তৈরি করে আনুক।'

'আহা সমস্ত দিন ওকে মালীর কাজে খাটিয়ে মার তার উপরে আবার নার্সের কাজ কেন। একটু দয়া হয় না তোমার মনে? আয়াকে ডাকো-না।'

'আয়া কি ঠিকমত পারবে এ-সব কাজ।'

'ভারি তো কাজ, খুব পারবে। আরো ভালোই পারবে।'

'কিন্তু—'

'কিন্তু আবার কিসের। আয়া আয়া।'

'অত উত্তেজিত হোয়ো না। একটা বিপদ ঘটাবে দেখছি।'

'আমি আয়াকে ডেকে দিচ্ছি' বলে সরলা চলে গেল। নীরজার কথার যে একটা প্রতিবাদ করবে, সেও তার মুখে এল না। আদিত্যও মনে মনে আশ্চর্য হল, ভাবলে সরলাকে কি সত্যিই অন্যায় খাটানো হচ্ছে।

ওষুধ পথ্য হয়ে গেলে আদিত্য আয়াকে বললে, 'সরলাদিদিকে ডেকে দাও।'

'কথায় কথায় কেবলই সরলাদিদি, বেচারাকে তুমি অস্থির করে তুলবে দেখছি।'

'কাজের কথা আছে।'

'থাক্‌-না এখন কাজের কথা।'

'বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'সরলা মেয়েমানুষ, ওর সঙ্গে এত কাজের কথা কিসের, তার চেয়ে হলা মালীকে ডাকো-না।'

'তোমাকে বিয়ে করবার পর থেকে একটা কথা আবিষ্কার করেছি যে, মেয়েরাই কাজের, পুরুষেরা হাড়ে অকেজো। আমরা কাজ করি দায়ে পড়ে, তোমরা কাজ কর প্রাণের উৎসাহে। এই সম্বন্ধে একটা থীসিস লিখব মনে করেছি। আমার ডায়রি থেকে বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যাবে।'

'সেই মেয়েকেই আজ তার প্রাণের কাজ থেকে বঞ্চিত করেছে যে বিধাতা, তাকে কী বলে নিন্দে করব। ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে আমার কাজের চূড়া পড়েছে ভেঙে, তাই তো পোড়ো বাড়িতে ভূতের বাসা হল।'

সরলা এল। আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, 'অর্কিড-ঘরের কাজ হয়ে গেছে?'

'হাঁ হয়ে গেছে।'

'সবগুলো?'

'সবগুলোই।'

'আর গোলাপের কাটিং?'

'মালী তার জমি তৈরি করছে।'

'জমি! সে তো আমি আগেই তৈরি করে রেখেছি। হলা মালীর উপর ভার দিয়েছ, তাহলেই দাঁতন-কাটির চাষ হবে আর কী।'

কথাটাতে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে নীরজা বললে, 'সরলা, যাও তো, কমলালেবুর রস করে নিয়ে এসো গে, তাতে একটু আদার রস দিয়ো, আর মধু।'

সরলা মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, 'আজ তুমি ভোরে উঠেছিলে যেমন আমরা রোজ উঠতুম?'

'হাঁ উঠেছিলুম।'

'ঘড়িতে তেমনি এলারমের দম দেওয়া ছিল?'

'ছিল বৈকি।'

'সেই নিমগাছতলায় সেই কাটা গাছের গুঁড়ি। তার উপরে চায়ের সরঞ্জাম। সব ঠিক রেখেছিল বাসু?'

'রেখেছিল। নইলে খেসারতের দাবিতে নালিশ রুজু করতুম তোমার আদালতে।'

'দুটো চৌকিই পাতা ছিল?'

'পাতা ছিল সেই আগেকার মতোই। আর ছিল সেই নীল-পাড়-দেওয়া বাসন্তী রঙের চায়ের সরঞ্জাম; দুধের জ্যগ রুপোর, ছোটো সাদা পাথরের বাটিতে চিনি, আর ড্রাগন-আঁকা জাপানি ট্রে।'

'অন্য চৌকিটা খালি রাখলে কেন।'

'ইচ্ছে করে রাখি নি। আকাশে তারাগুলো গোনাগুনতি ঠিকই ছিল, কেবল শুক্লপঞ্চমীর চাঁদ রইল দিগন্তের বাইরে। সুযোগ থাকলে তাকে আনতেম ধরে।'

'সরলাকে কেন ডাক না তোমার চায়ের টেবিলে।'

এর উত্তরে বললেই হত, তোমার আসনে আর কাউকে ডাকতে মন যায় না। সত্যবাদী তা না বলে বললে, 'সকালবেলায় বোধ হয় সে জপতপ কিছু করে, আমার মতো ভজনপূজনহীন স্লেচ্ছ তো নয়।'

'চা খাওয়ার পরে আজ বুঝি অরকিড-ঘরে তাকে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'হাঁ, কিছু কাজ ছিল, ওকে বুঝিয়ে দিয়েই ছুটতে হল দোকানে।'

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরলার সঙ্গে রমেনের বিয়ে দাও-না কেন।'

'ঘটকালি কি আমার ব্যাবসা।'

'না, ঠাট্টা নয়। বিয়ে তো করতেই হবে, রমেনের মতো পাত্র পাবে কোথায়।'

'পাত্র আছে একদিকে, পাত্রীও আছে আর-এক দিকে, মাঝখানটাতে মন আছে কি না সে খবর নেবার ফুরসৎ পাই নি। দূরের থেকে মনে হয় যেন ঐখানটাতেই খটকা।'

একটু ঝাঁঝের সঙ্গে বললে নীরজা, 'কোনো খটকা থাকত না যদি তোমার সত্যিকারের আগ্রহ থাকত।'

'বিয়ে করবে অন্য পক্ষ, সত্যিকার আগ্রহটা থাকবে একা আমার, এটাতে কি কাজ চলে। তুমি চেষ্টা দেখো-না।'

'কিছুদিন গাছপালা থেকে ঐ মেয়েটার দৃষ্টিটাকে ছুটি দাও দেখি, ঠিক জায়গায় আপনি চোখ পড়বে।'

'শুভদৃষ্টির আলোতে গাছপালা পাহাড়পর্বত সমস্তই স্বচ্ছ হয়ে যায়। ও একজাতের এক্‌স্‌রেজ আর কি?'

'মিছে বকছ। আসল কথা, তোমার ইচ্ছে নয় বিয়েটা ঘটে।'

'এতক্ষণে ধরেছ ঠিক। সরলা গেলে আমার বাগানের দশা কী হবে বলো। লাভ লোকসানের কথাটাও ভাবতে হয়। ও কী ও, হঠাৎ তোমার বেদনাটা বেড়ে উঠল না কি।'

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল আদিত্য। নীরজা রুক্ষ গলায় বললে, 'কিছু হয় নি। আমার জন্যে তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না।'

স্বামী যখন উঠি-উঠি করছে, সে বলে উঠল, 'আমাদের বিয়ের পরেই ঐ অরকিড-ঘরের প্রথম পত্তন, ভুলে যাও নি তো সে কথা? তার পরে দিনে দিনে আমরা দুজনে মিলে ঐ ঘরটাকে সাজিয়ে তুলেছি। ওটাকে নষ্ট করতে দিতে তোমার মনে একটুও লাগে না!'

আদিত্য বিস্মিত হয়ে বললে, 'সে কেমন কথা। নষ্ট হতে দেবার শখ আমার দেখলে কোথায়।'

উত্তেজিত হয়ে নীরজা বললে, 'সরলা কী জানে ফুলের বাগানের।'

'বল কী। সরলা জানে না? যে মেসোমশায়ের ঘরে আমি মানুষ, তিনি যে সরলার জ্যাঠামশায়। তুমি তো জান তাঁরই বাগানে আমার হাতেখড়ি। জ্যাঠামশায় বলতেন, ফুলের বাগানের কাজ মেয়েদেরই, আর গোরু দোওয়ানো। তাঁর সব কাজে ও ছিল তাঁর সঙ্গিনী।'

'আর তুমি ছিলে সঙ্গী।'

'ছিলেম বৈকি। কিন্তু আমাকে করতে হত কলেজের পড়া, ওর মতো অত সময় দিতে পারি নি। ওকে মেসোমশায় নিজে পড়াতেন।'

'সেই বাগান নিয়ে তোমার মেসোমশায়ের সর্বনাশ হয়ে গেল। এমনই ও মেয়ের পয়। আমার তো তাই ভয় করে। অলক্ষুণে মেয়ে। দেখো-না মাঠের মতো কপাল, ঘোড়ার মতন লাফিয়ে চলন। মেয়েমানুষের পুরুষালি বুদ্ধিটা ভালো নয়। ওতে অকল্যাণ ঘটায়।'

'তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো নীরু। কী কথা বলছ। মেসোমশায় বাগান করতেই জানতেন, ব্যাবসা করতে জানতেন না। ফুলের চাষ করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, নিজের লোকসান করতেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। সকলের কাছে তিনি নাম পেতেন, দাম পেতেন না। বাগান করবার জন্যে আমাকে যখন মূলধনের টাকা দিয়েছিলেন আমি কি জানতুম তখনি তাঁর তহবিল ডুবোডুবো। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তাঁর মরবার আগেই সমস্ত দিয়েছি শোধ করে।'

সরলা কমলালেবুর রস নিয়ে এল। নীরজা বললে, 'ঐখানে রেখে যাও।' রেখে সরলা চলে গেল। পাত্রটা পড়ে রইল, ও ছুঁলই না।

'সরলাকে তুমি বিয়ে করলে না কেন।'

'শোনো একবার কথা। বিয়ের কথা কোনোদিন মনেও আসে নি।'

'মনেও আসে নি! এই বুঝি তোমার কবিত্ব।'

'জীবনে কবিত্বের বালাই প্রথম দেখা দিল যেদিন তোমাকে দেখলুম। তার আগে আমরা দুই বুনোয় মিলে দিন কাটিয়েছি বনের ছায়ায়। নিজেদের ছিলুম ভুলে। হাল আমলের সভ্যতায় যদি মানুষ হতুম তাহলে কী হত বলা যায় না।'

'কেন সভ্যতার অপরাধটা কী।'

'এখনকার সভ্যতাটা দুঃশাসনের মতো হৃদয়ের বস্ত্রহরণ করতে চায়। অনুভব করবার পূর্বেই সেয়ানা করে তোলে চোখে আঙুল দিয়ে। গন্ধের ইশারা ওর পক্ষে বেশি সূক্ষ্ম, খবর নেয় পাপড়ি ছিঁড়ে।'

'সরলাকে তো দেখতে মন্দ নয়।'

'সরলাকে জানতুম সরলা বলেই। ও দেখতে ভালো কি মন্দ সে তত্ত্বটা সম্পূর্ণ বাহুল্য ছিল।'

'আচ্ছা, সত্যি বলো, ওকে তুমি ভালোবাসতে না?'

'নিশ্চয় ভালোবাসতুম। আমি কি জড় পদার্থ, যে, ওকে ভালোবাসব না। মেসোমশায়ের ছেলে রেঙ্গুনে ব্যারিস্টারি করে, তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। তাঁর বাগানটি নিয়ে সরলা থাকবে এই ছিল তাঁর জীবনের সাধ। এমন-কি, তাঁর বিশ্বাস ছিল এই বাগানই ওর সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করবে। ওর বিয়ে করবার গরজ থাকবে না। তার পরে তিনি চলে গেলেন, অনাথা হল সরলা, পাওনাদারের হাতে বাগানটি গেল বিকিয়ে। সেদিন আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল, দেখ নি কি তুমি। ও যে ভালোবাসবার জিনিস, ভালোবাসব না ওকে? মনে তো আছে একদিন সরলার মুখে হাসিখুশি ছিল উচ্ছ্বসিত। মনে হত যেন পাখির ওড়া ছিল ওর পায়ের চলার মধ্যে। আজ ও চলেছে বুকভরা বোঝা বয়ে বয়ে, তবু ভেঙে পড়ে নি। একদিনের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নি আমারও কাছে, নিজেকে তার অবকাশও দিলে না।'

আদিত্যের কথা চাপা দিয়ে নীরজা বললে, 'থামো গো থামো, অনেক শুনেছি ওর কথা তোমার কাছে, আর বলতে হবে না। অসামান্য মেয়ে। সেইজন্যে বলছি ওকে সেই বারাসতের মেয়ে-স্কুলের হেড্‌মিস্‌ট্রেস করে দাও। তারা তো কতবার ধরাধরি করেছে।'

'বারাসতের মেয়ে ইস্কুল? কেন আন্ডামানও তো আছে।'

'না, ঠাট্টা নয়। সরলাকে তোমার বাগানের আর যে-কোনো কাজ দিতে হয় দিয়ো কিন্তু ঐ অরকিড-ঘরের কাজ দিতে পারবে না।'

'কেন হয়েছে কী।'

'আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, সরলা অরকিড ভালো বোঝে না।'

'আমিও তোমাকে বলছি, আমার চেয়ে সরলা ভালো বোঝে। মেসোমশায়ের প্রধান শখ ছিল অরকিডে। তিনি নিজের লোক পাঠিয়ে সেলিবিস থেকে, জাভা থেকে, এমন-কি চীন থেকে অরকিড আনিয়েছেন, তার দরদ বোঝে এমন লোক তখন ছিল না।'

কথাটা নীরজা জানে, সেইজন্যে কথাটা তার অসহ্য।

'আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ বেশ, ও না হয় আমার চেয়ে ঢের ভালো বোঝে এমন-কি তোমার চেয়েও। তা হোক, তবু বলছি ঐ অরকিডের ঘর শুধু তোমার আমার, ওখানে সরলার কোনো অধিকার নেই। তোমার সমস্ত বাগানটা ওকেই দিয়ে দাও-না যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছে হয়; কেবল খুব অল্প একটু কিছু রেখো যেটুকু কেবল আমাকেই উৎসর্গ-করা। এতকাল পরে অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি। কপালদোষে না হয় আজ আছি বিছানায় পড়ে, তাই বলে—' কথা শেষ করতে পারলে না, বালিশে মুখ গুঁজে অশান্ত হয়ে কাঁদতে লাগল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল আদিত্য। ঠিক যেন এতদিন স্বপ্নে চলছিল, ঠোকর খেয়ে উঠল চমকে। এ কী ব্যাপার। বুঝতে পারল এই কান্না অনেকদিনকার। বেদনার ঘূর্ণিবাতাস নীরজার অন্তরে অন্তরে বেগ পেয়ে উঠছিল দিনে দিনে, আদিত্য জানতে পারে নি মুহূর্তের জন্যেও। এমন নির্বোধ যে, মনে করেছিল, সরলা বাগানের যত্ন করতে পারে এতে নীরজা খুশি। বিশেষত ঋতুর হিসাব করে বাছাই-করা ফুলে কেয়ারি সাজাতে ও অদ্বিতীয়। আজ হঠাৎ মনে পড়ল, একদিন যখন কোনো উপলক্ষে সরলার প্রশংসা করে ও বলেছিল, 'কামিনীর বেড়া এমন মানানসই করে আমি তো লাগাতে পারতুম না', তখন তীব্র হেসে বলেছে নীরজা, 'ওগো মশায়, উচিত পাওনার চেয়ে বেশি দিলে আখেরে মানুষের লোকসান করাই হয়।' আদিত্যের আজ মনে পড়ল, গাছপালা সম্বন্ধে কোনোমতে সরলার একটা ভুল যদি ধরতে পারত নীরজা উচ্চহাস্যে কথাটাকে ফিরে ফিরে মুখরিত করে তুলত। স্পষ্ট মনে পড়ল, ইংরেজি বই খুঁজে খুঁজে নীরজা মুখস্থ করে রাখত অল্পপরিচিত ফুলের উদ্ভট নাম; ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করত সরলাকে, যখন সে ভুল করত, তখন থামতে চাইত না ওর হাসির হিল্লোল; 'ভারি পণ্ডিত, কে না জানে ওর নাম ক্যাসিয়া জাভানিকা। আমার হলা মালীও বলতে পারত।'

আদিত্য অনেকক্ষণ ধরে বসে ভাবলে। তার পরে হাত ধরে বললে, 'কেঁদো না নীরু, বলো কী করব। তুমি কি চাও সরলাকে বাগানের কাজে না রাখি।'

নীরজা হাত ছিনিয়ে নিয়ে বললে, 'কিছু চাই নে, কিচ্ছু না, ও তো তোমারই বাগান। তুমি যাকে খুশি রাখতে পারো আমার তাতে কী।'

'নীরু, এমন কথা তুমি বলতে পারলে, আমারই বাগান? তোমার নয়? আমাদের মধ্যে এই ভাগ হয়ে গেল কবে থেকে।'

'যবে থেকে তোমার রইল বিশ্বের আর সমস্ত-কিছু আর আমার রইল কেবল এই ঘরের কোণ। আমার এই ভাঙা প্রাণ নিয়ে দাঁড়াব কিসের জোরে তোমার ঐ আশ্চর্য সরলার সামনে। আমার সে-শক্তি আজ কোথায় যে তোমার সেবা করি, তোমার বাগানের কাজ করি।'

'নীরু, তুমি তো কতদিন এর আগে আপনি সরলাকে ডেকে পাঠিয়েছ, নিয়েছ ওর পরামর্শ।

মনে নেই কি এই কয়েক বছর আগে বাতাবিলেবুর সঙ্গে কলম্বালেবুর কলম বেঁধেছ দুইজনে, আমাকে আশ্চর্য করে দেবার জন্যে।'

'তখন তো ওর এত গুমর ছিল না। বিধাতা যে আমারই দিকে আজ অন্ধকার করে দিলে, তাই তো তোমার কাছে হঠাৎ ধরা পড়ছে, ও এত জানে ও তত জানে, অর্কিড চিনতে আমি ওর কাছে লাগি নে। সেদিন তো এসব কথা কোনোদিন শুনি নি। তবে আজ আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনে কেন দুজনের তুলনা করতে এলে। আজ আমি ওর সঙ্গে পারব কেন। মাপে সমান হব কী নিয়ে।'

'নীরু, আজ তোমার কাছে এই যা সব শুনছি তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলুম না। মনে হচ্ছে এ যেন আমার নীরুর কথা নয়, এ যেন আর কেউ।'

'না গো না, সেই নীরুই বটে। তার কথা এতদিনেও তুমি বুঝলে না। এই আমার সবচেয়ে শাস্তি। বিয়ের পর যেদিন আমি জেনেছিলেম তোমার বাগান তোমার প্রাণের মতো প্রিয়, সেদিন থেকে ঐ বাগান আর আমার মধ্যে ভেদ রাখি নি একটুকুও। নইলে তোমার বাগানের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া বাধত, ওকে সইতে পারতুম না। ও হত আমার সতিন। তুমি তো জান, আমার দিন-রাতের সাধনা। জান কেমন করে ওকে মিলিয়ে নিয়েছি আমার মধ্যে। একেবারে এক হয়ে গেছি ওর সঙ্গে।'

'জানি বৈকি। আমার সব কিছুকে নিয়েই যে তুমি।'

'ও সব কথা রাখো। আজ দেখলুম ঐ বাগানের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করলে আর-একজন। কোথাও একটুও ব্যথা লাগল না। আমার দেহখানাকে চিরে ফেলবার কথা কি মনে করতেও পারতে, আর কারু প্রাণ তার মধ্যে চালিয়ে দেবার জন্যে। আমার ঐ বাগান কি আমার দেহ নয়। আমি হলে কি এমন করতে পারতুম।'

'কী করতে তুমি।'

'বলব কী করতুম? বাগান ছারখার হয়ে যেত হয়তো। ব্যাবসা হত দেউলে। একটার জায়গায় দশটা মালী রাখতুম কিন্তু আসতে দিতুম না আর কোনো মেয়েকে, বিশেষত এমন কাউকে যার মনে গুমর আছে সে আমার চেয়েও বাগানের কাজ ভালো জানে। ওর এই অহংকার দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করবে প্রতিদিন, যখন আমি আজ মরতে বসেছি, যখন উপায় নেই নিজের শক্তি প্রমাণ করবার? এমনটা কেন হতে পারল, বলব?'

'বলো।'

'তুমি আমার চেয়ে ওকে ভালোবাস বলে। এতদিন সে-কথা লুকিয়ে রেখেছিলে।'

আদিত্য কিছুক্ষণ মাথার চুলের মধ্যে হাত গুঁজে বসে রইল। তার পরে বিহ্বলকণ্ঠে বললে, 'নীরু, দশ বৎসর তুমি আমাকে জেনেছ, সুখে দুঃখে নানা অবস্থায় নানা কাজে, তারপরেও তুমি যদি এমন কথা আজ বলতে পার তবে আমি কোনো জবাব করব না। চললুম। কাছে থাকলে তোমার শরীর খারাপ হবে। ফর্ণারির পাশে যে জাপানি ঘর আছে সেইখানে থাকব। যখন আমাকে দরকার হবে ডেকে পাঠিয়ো।'

৫

দিঘির ও পারের পাড়িতে চালতা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠছে, জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া। এ পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মতো রাঙা, তার কাঁচাসোনার বরন ফুল, ঘন গন্ধ ভারী হয়ে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াশা যেন। জোনাকির দল ঝলমল করছে জারুল গাছের ডালে। শান-বাঁধানো ঘাটের বেদীর উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সরলা। বাতাস নেই

কোথাও, পাতায় নেই কাঁপন, জল যেন কালো ছায়ার ফ্রেমে বাঁধানো পালিশ-করা রুপোর আয়না।

পিছনের দিক থেকে প্রশ্ন এল, 'আসতে পারি কি।'

সরলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'এসো।' রমেন বসল ঘাটের সিঁড়ির উপর, পায়ের কাছে। সরলা ব্যস্ত হয়ে বললে, 'কোথায় বসলে রমেন দাদা, উপরে এসো।'

রমেন বললে, 'জান দেবীদের বর্ণনা আরম্ভ পদপল্লব থেকে? পাশে জায়গা থাকে তো পরে বসব। দাও তোমার হাতখানি, অভ্যর্থনা শুরু করি বিলিতি মতে।'

সরলার হাত নিয়ে চুম্বন করলে। বললে, 'সম্রাজ্ঞীর অভিবাদন গ্রহণ করো।'

তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটুখানি আবির নিয়ে দিলে ওর কপালে মাখিয়ে।

'এ আবার কী।'

'জান না আজ দোলপূর্ণিমা? তোমাদের গাছে গাছে ডালে ডালে রঙের ছড়াছড়ি। বসন্তে মানুষের গায়ে তো রঙ লাগে না, লাগে তার মনে। সেই রঙটাকে বাইরে প্রকাশ করতে হবে, নইলে, বনলক্ষ্মী, অশোকবনে তুমি নির্বাসিত হয়ে থাকবে।'

'তোমার সঙ্গে কথার খেলা করি এমন ওস্তাদি নেই আমার।'

'কথার দরকার কিসের। পুরুষ পাখিই গান করে, তোমরা মেয়ে পাখি চুপ করে শুনলেই উত্তর দেওয়া হল। এইবার বসতে দাও পাশে।'

পাশে এসে বসল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুইজনেই। হঠাৎ সরলা প্রশ্ন করলে, 'রমেনদা, জেলে যাওয়া যায় কী করে, পরামর্শ দাও আমাকে।'

'জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে কী করে জেলে না যাওয়া যায় সেই পরামর্শই কঠিন হয়ে উঠল। এ যুগে গোরার বাঁশি ঘরে টিঁকতে দিল না।'

'না আমি ঠাট্টা করছি নে, অনেক ভেবে দেখলুম আমার মুক্তি ঐখানেই।'

'ভালো করে খুলে বলো তোমার মনের কথাটা।'

'বলছি সব কথা। সম্পূর্ণ বুঝতে পারতে, যদি আদিতদার মুখখানা দেখতে পেতে।'

'আভাসে কিছু দেখেছি।'

'আজ বিকেলবেলায় একলা ছিলেম বারান্দায়। আমেরিকা থেকে ফুলগাছের ছবি-দেওয়া ক্যাটালগ এসেছে, দেখছিলেম পাতা উলটিয়ে; রোজ বিকেলে সাড়ে চারটার মধ্যে চা খাওয়া সেরে আদিতদা আমাকে ডেকে নেন বাগানের কাজে। আজ দেখি অন্যমনে বেড়াচ্ছেন ঘুরে ঘুরে; মালীরা কাজ করে যাচ্ছে তাকিয়েও দেখছেন না। মনে হল আমার বারান্দার দিকে আসবেন বুঝি, দ্বিধা করে গেলেন ফিরে। অমন শক্ত লম্বা মানুষ, জোরে চলা, জোরে কাজ, সর্বদিকেই সজাগ দৃষ্টি, কড়া মনিব অথচ মুখে ক্ষমার হাসি; আজ সেই মানুষের সেই চলন নেই, দৃষ্টি নেই বাইরে, কোথায় তলিয়ে আছেন মনের ভিতরে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে এলেন কাছে। অন্যদিন হলে তখনি হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বলতেন, সময় হয়েছে, আমিও উঠে পড়তুম। আজ তা না বলে আস্তে আস্তে পাশে চৌকি টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন ক্যাটালগ দেখছ বুঝি। আমার হাত থেকে ক্যাটালগ নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। কিছু যে দেখলেন তা মনে হল না। হঠাৎ একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন, যেন পণ করলেন আর দেরি না করে এখনি কী একটা বলাই চাই। আবার তখনি পাতার দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, 'দেখেছ সরি, কতবড়ো ন্যাস্‌টার্শিয়াম।' কণ্ঠে গভীর ক্লান্তি। তারপর অনেকক্ষণ কথা নেই, চলল পাতা ওলটানো। আর-একবার হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাইলেন, চেয়েই ধাঁ করে বই বন্ধ করে আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। আমি বললেম, "যাবে না বাগানে?" আদিতদা বললেন, "না ভাই বাইরে বেরতে হবে, কাজ আছে" বলেই তাড়াতাড়ি নিজেকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলেন।'

'আদিতদা তোমাকে কী বলতে এসেছিলেন; কী আন্দাজ কর তুমি।'

'বলতে এসেছিলেন, আগেই ভেঙেছে তোমার এক বাগান, এবার হুকুম এল, তোমার কপালে আর-এক বাগান ভাঙবে।'

'তাই যদি ঘটে, সরি, তাহলে জেলে যাবার স্বাধীনতা যে আমার থাকবে না।'

সরলা ম্লান হেসে বললে, 'তোমার সে-রাস্তা কি আমি বন্ধ করতে পারি। সম্রাটবাহাদুর স্বয়ং খোলাসা রাখবেন।'

'তুমি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়, আর আমি শিকলে ঝংকার দিতে দিতে চমক লাগিয়ে চলব জেলখানায়, এ কি কখনো হতে পারে। এখন থেকে তাহলে যে আমাকে এই বয়সে ভালোমানুষ হতে শিখতে হবে।'

'কী করবে তুমি।'

'তোমার অশুভগ্রহের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করে দেব। কুষ্ঠি থেকে তাকে তাড়াব। তার পরে লম্বা ছুটি পাব, এমনকি কালাপানির পার পর্যন্ত।'

'তোমার কাছে কোনো কিছুই লুকোতে পারি নে। একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কিছুদিন থেকে। আজ সেটা তোমাকে বলব, কিছু মনে কোরো না।'

'না বললে মনে করব।'

'ছেলেবেলা থেকে আদিতদার সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েছি। ভাই বোনের মতো নয়, দুই ভাইয়ের মতো। নিজের হাতে দুজনে পাশাপাশি মাটি কুপিয়েছি, গাছ কেটেছি। জ্যাঠাইমা আর মা দু তিন দিন পরে পরে মারা যান টাইফয়েডে, আমার বয়স তখন ছয়। বাবার মৃত্যু তার দু বছর পরে। জ্যাঠামশাইয়ের মস্ত সাধ ছিল আমিই তাঁর বাগানটিকে বাঁচিয়ে রাখব আমার প্রাণ দিয়ে। তেমনি করেই আমাকে তৈরি করেছিলেন। কাউকে তিনি অবিশ্বাস করতে জানতেন না। যে বন্ধুদের টাকা ধার দিয়েছিলেন তারা শোধ করে বাগানকে দায়মুক্ত করবে এতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। শোধ করেছেন কেবল আদিতদা, আর কেউ না। এই ইতিহাস হয়তো তুমি কিছু কিছু জান কিন্তু তবু আজ সব কথা গোড়া থেকে বলতে ইচ্ছে করছে।'

'সমস্ত আবার নূতন লাগছে আমার।'

'তারপরে জান হঠাৎ সবই ডুবল। যখন ডাঙায় টেনে তুলল বন্যা থেকে, তখন আর-একবার আদিতদার পাশে এসে ঠেকল আমার ভাগ্য। মিললুম তেমনি করেই,—আমরা দুই ভাই, আমরা দুই বন্ধু। তার পর থেকে আদিতদার আশ্রয়ে আছি এও যেমন সত্যি, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি সেও তেমনি সত্যি। পরিমাণে আমার দিক থেকে কিছু কম হয় নি এ আমি জোর করে বলব। তাই আমার পক্ষে একটুও কারণ ঘটে নি সংকোচ করবার। এর আগে একত্রে ছিলেম যখন, তখন আমাদের যে-বয়স ছিল সেই বয়সটা নিয়েই যেন ফিরলুম, সেই সম্বন্ধ নিয়ে। এমনি করেই চিরদিন চলে যেতে পারত। আর বলে কী হবে।'

'কথাটা শেষ করে ফেলো।'

'হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মেরে কেন জানিয়ে দিলে যে আমার বয়স হয়েছে। যেদিনকার আড়ালে একসঙ্গে কাজ করেছি সেদিনকার আবরণ উড়ে গেছে একমুহূর্তে। তুমি নিশ্চয় সব জান রমেনদা, আমার কিছুই ঢাকা থাকে না তোমার চোখে। আমার উপরে বউদির রাগ দেখে প্রথম প্রথম ভারি আশ্চর্য লেগেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারি নি। এতদিন দৃষ্টি পড়ে নি নিজের উপর, বউদিদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে। আমার কথা বুঝতে পারছ কি।'

'তোমার ছেলেবেলাকার তলিয়ে-থাকা ভালোবাসা নাড়া খেয়ে ভেসে উঠছে উপরের তলায়।'

'আমি কী করব বলো। নিজের কাছ থেকে নিজে পালাই কী করে।' বলতে বলতে রমেনের হাত চেপে ধরলে।

রমেন চুপ করে রইল। আবার সে বললে, 'যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ বেড়ে চলেছে আমার অন্যায়।'

'অন্যায় কার উপরে।'

'বউদির উপরে।'

'দেখো সরলা, আমি মানি নে ও-সব পুঁথির কথা। দাবির হিসেব বিচার করবে কোন্ সত্য দিয়ে। তোমাদের মিলন কতকালের; তখন কোথায় ছিল বউদি।'

'কী বলছ রমেনদা! আপন ইচ্ছের দোহাই দিয়ে এ কী আবদারের কথা। আদিতদার কথাও তো ভাবতে হবে।'

'হবে বৈকি। তুমি কি ভাবছ, যে-আঘাতে চমকিয়ে দিয়েছে তোমাকে, সেই আঘাতটাই তাঁকে লাগে নি।'

'রমেন নাকি।' পিছন থেকে শোনা গেল।

'হাঁ দাদা।' রমেন উঠে পড়ল।

'তোমার বউদি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আয়া এসে এইমাত্র জানিয়ে গেল।'

রমেন চলে গেল, সরলাও তখনি উঠে যাবার উপক্রম করলে।

আদিত্য বললে, 'যেয়ো না সরি, একটু বোসো।' আদিত্যের মুখ দেখে সরলার বুক ফেটে যেতে চায়। ঐ অবিশ্রাম কর্মরত আপনা-ভোলা মস্ত মানুষটা এতক্ষণ যেন কেবল পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল হালভাঙা ঢেউখাওয়া নৌকার মতো।

আদিত্য বললে, 'আমরা দুজনে এ-সংসারে জীবন আরম্ভ করেছিলেম একেবারে এক হয়ে। এত সহজ আমাদের মিল যে এর মধ্যে কোনো ভেদ কোনো কারণে ঘটতে পারে সে কথা মনে করাই অসম্ভব। তাই কি নয় সরি।'

'অঙ্কুরে যা এক থাকে, বেড়ে উঠে তা ভাগ হয়ে যায় এ কথা না মেনে তো থাকবার জো নেই আদিতদা।'

'সে ভাগ তো বাইরে, কেবল চোখে দেখার ভাগ। অন্তরে তো প্রাণের মধ্যে ভাগ হয় না। আজ তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ধাক্কা এসেছে। আমাকে যে এত বেশি বাজবে এ আমি কোনোদিন ভাবতেই পারতুম না। সরি, তুমি কি জান কী ধাক্কাটা এল হঠাৎ আমাদের 'পরে।'

'জানি ভাই, তুমি জানবার আগে থাকতেই।'

'সইতে পারবে সরি?'

'সইতেই হবে।'

'মেয়েদের সহ্য করবার শক্তি কি আমাদের চেয়ে বেশি, তাই ভাবি।'

'তোমরা পুরুষমানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই কর, মেয়েরা যুগে যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য, এ ছাড়া আর তো কিছুই সম্বল নেই তাদের।'

'তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘটতে দেব না, দেব না। এ অন্যায়, এ নিষ্ঠুর অন্যায়।'—ব'লে মুঠো শক্ত করে আকাশে কোন্ অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত হল।

সরলা কোলের উপর আদিত্যের হাতখানা নিয়ে তার উপরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলে গেল যেন আপন মনে ধীরে ধীরে, 'ন্যায় অন্যায়ের কথা নয় ভাই, সম্বন্ধের বন্ধন যখন ফাঁস হয়ে ওঠে তার ব্যথা বাজে নানা লোকের মধ্যে, টানাটানি পড়ে নানা দিক থেকে, কাকেই বা দোষ দেব।'

'তুমি সহ্য করতে পারবে তা জানি। একদিনের কথা মনে পড়ছে। কী চুল ছিল তোমার, এখনো আছে। সেই চুলের গর্ব ছিল তোমার মনে। সবাই সেই গর্বে প্রশ্রয় দিত। একদিন ঝগড়া হল তোমার সঙ্গে। দুপুরবেলা বালিশের 'পরে চুল মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আমি কাঁচি হাতে অন্তত

আধহাতখানেক কেটে দিলাম। তখনি জেগে তুমি দাঁড়িয়ে উঠলে, তোমার ঐ কালো চোখ আরো কালো হয়ে উঠল। শুধু বললে, “মনে করেছ আমাকে জব্দ করবে?” ব'লে আমার হাত থেকে কাঁচি টেনে নিয়ে ঘাড় পর্যন্ত চুল কেটে ফেললে কচ কচ করে। মেসোমশায় তোমাকে দেখে আশ্চর্য। বললেন, “এ কী কাণ্ড।” তুমি শান্তমুখে অনায়াসে বললে, “বড়ো গরম লাগে।” তিনিও একটু হেসে সহজেই মেনে নিলেন। প্রশ্ন করলেন না, ভর্ৎসনা করলেন না, কেবল কাঁচি নিয়ে সমান করে দিলেন তোমার চুল। তোমারই তো জ্যাঠামশায়!'

সরলা হেসে বললে, 'তোমার যেমন বুদ্ধি। তুমি ভাবছ এটা আমার ক্ষমার পরিচয়? একটুও নয়। সেদিন তুমি আমাকে যতটা জব্দ করেছিলে তার চেয়ে অনেক বেশি জব্দ করেছিলুম আমি তোমাকে। ঠিক কি না বলো।'

'খুব ঠিক। সেই কাটা চুল দেখে আমি কেবল কাঁদতে বাকি রেখেছিলুম। তার পরদিন তোমাকে মুখ দেখাতে পারি নি লজ্জায়। পড়বার ঘরে চুপ করে ছিলেম বসে। তুমি ঘরে ঢুকেই হাত ধ'রে আমাকে হিড়্‌হিড় করে টেনে নিয়ে গেলে বাগানের কাজে, যেন কিছুই হয় নি। আর-একদিনের কথা মনে পড়ে, সেই যেদিন ফাল্গুন মাসে অকালে ঝড় উঠে আমার বিছন লাগাবার ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়েছিল তখন তুমি এসে—'

'থাক্ আর বলতে হবে না আদিতদা' ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, 'সে-সব দিন আর আসবে না' বলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

আদিত্য ব্যাকুল হয়ে সরলার হাত চেপে ধরে বললে, 'না যেয়ো না, এখনি যেয়ো না, কখন একসময়ে যাবার দিন আসবে তখন—'

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'কোনোদিন কেন যেতে হবে। কী অপরাধ ঘটেছে। ঈর্ষা! আজ দশ বৎসর সংসারযাত্রায় আমার পরীক্ষা হল তারই এই পরিণাম? কী নিয়ে ঈর্ষা। তা হলে তো তেইশ বছরের ইতিহাস মুছে ফেলতে হয়, যখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার দেখা।'

'তেইশ বছরের কথা বলতে পারি নে ভাই, কিন্তু তেইশ বছরের এই শেষ বেলাতে ঈর্ষার কি কোনো কারণই ঘটে নি। সত্যি কথা তো বলতে হবে। নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কী। তোমার আমার মধ্যে কোনো কথা যেন অস্পষ্ট না থাকে।'

আদিত্য কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বলে উঠল, 'অস্পষ্ট আর রইল না। অন্তরে অন্তরে বুঝেছি তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তোমাকে জীবনের প্রথম বেলায়, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না।'

'কথা বোলো না আদিতদা, দুঃখ আর বাড়িয়ো না। একটু স্থির হয়ে দাও ভাবতে।'

'ভাবনা নিয়ে তো পিছনের দিকে যাওয়া যায় না। দুজনে যখন জীবন আরম্ভ করেছিলেম মেসোমশায়ের কোলের কাছে, সে তো না ভেবে চিন্তে। আজ কোনো রকমের নিড়ুনি দিয়ে কি উপড়ে ফেলতে পারবে সেই আমাদের দিনগুলিকে। তোমার কথা বলতে পারি নে, সরি, আমার তো সাধ্য নেই।'

'পায়ে পড়ি, দুর্বল কোরো না আমাকে। দুর্গম কোরো না উদ্ধারের পথ।'

আদিত্য সরলার দুই হাত চেপে ধরে বললে, 'উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখব না। ভালোবাসি তোমাকে, এ কথা আজ এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম।'

'চুপ চুপ, আর বোলো না। আজকের রাত্তিরের মতো মাপ করো, মাপ করো আমাকে।'

'সরি, আমিই কৃপাপাত্র, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমিই তোমার ক্ষমার যোগ্য। কেন আমি ছিলুম অন্ধ। কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভুল করে। তুমি তো কর নি, কত পাত্র এসেছিল তোমাকে কামনা করে, সে তো আমি জানি।'

'জ্যাঠামশায় যে আমাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাঁর বাগানের কাছে, নইলে হয়তো—'

'না না—তোমার মনের গভীরে ছিল তোমার সত্য উজ্জ্বল। না জেনেও তার কাছে তুমি বাঁধা রেখেছিলে নিজেকে। আমাকে কেন তুমি চেতন করে দাও নি। আমাদের পথ কেন হল আলাদা।'

'থাক্, থাক্, যাকে মেনে নিতেই হবে তাকে না মানবার জন্য ঝগড়া করছ কার সঙ্গে। কী হবে মিথ্যে ছটফট করে। কাল দিনের বেলায় যা হয় একটা উপায় স্থির করা যাবে।'

'আচ্ছা, চুপ করলুম। কিন্তু এমন জ্যোৎস্নারাত্রে আমার হয়ে কথা কইবে এমন কিছু রেখে যাব তোমার কাছে।'

বাগানে কাজ করবার জন্য আদিত্যের কোমরে একটা ঝুলি থাকে বাঁধা, কিছু না কিছু সংগ্রহ করবার দরকার হয়। সেই ঝুলি থেকে বের করলে ছোটো তোড়ায় বাঁধা পাঁচটি নাগকেশরের ফুল। বললে, 'আমি জানি নাগকেশর তুমি ভালোবাস। তোমার কাঁধের ঐ আঁচলের উপর পরিয়ে দেব? এই এনেছি সেফটিপিন।'

সরলা আপত্তি করলে না। আদিত্য বেশ একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিলে। সরলা উঠে দাঁড়াল, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে, দুই হাত ধরে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেমন তাকিয়ে আছে আকাশের চাঁদ। বললে, 'কী আশ্চর্য তুমি সরি, কী আশ্চর্য।'

সরলা হাত ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আদিত্য অনুসরণ করলে না, যতক্ষণ দেখা যায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে। তার পরে বসে পড়ল সেই ঘাটের বেদীর 'পরে। চাকর এসে খবর দিল 'খাবার এসেছে'। আদিত্য বলল, 'আজ আমি খাব না।'

৬

রমেন দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলে, 'বউদি ডেকেছ কি।' নীরজা রুদ্ধ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে উত্তর দিলে, 'এসো।'

ঘরের সব আলো নেবানো। জানালা খোলা, জ্যোৎস্না পড়েছে বিছানায়, পড়েছে নীরজার মুখে, আর শিয়রের কাছে আদিত্যের দেওয়া সেই ল্যাবার্নম গুচ্ছের উপর। বাকি সমস্ত অস্পষ্ট। বালিশে হেলান দিয়ে নীরজা অর্ধেক উঠে বসে আছে, চেয়ে আছে জানলার বাইরে। সেদিকে অরকিডের ঘর পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে সুপুরি গাছের সার। এইমাত্র হাওয়া জেগেছে, দুলে উঠছে পাতাগুলো, গন্ধ আসছে আমের বোলের। অনেক দূর থেকে শব্দ শোনা যায় মাদলের আর গানের, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের বস্তিতে হোলি জমেছে। মেঝের উপর পড়ে আছে থালায় বরফি আর কিছু আবির। দারোয়ান দিয়ে গেছে উপহার। রোগীর বিশ্রামভঙ্গের ভয়ে সমস্ত বাড়ি আজ নিস্তব্ধ। এক গাছ থেকে আর-এক গাছে 'পিয়ুকাঁহা' পাখির চলেছে উত্তর প্রত্যুত্তর, কেউ হার মানতে চায় না। রমেন মোড়া টেনে এনে বসল বিছানার পাশে। পাছে কান্না ভেঙে পড়ে এই ভয়ে অনেকক্ষণ নীরজা কোনো কথা বললে না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, গলার কাছটাতে যেন বেদনার ঝড় পাক খেয়ে উঠছে। কিছু পরে সামলে নিলে, ল্যাবার্নম গুচ্ছের দুটো খসে-পড়া ফুল দলিত হয়ে গেল তার মুঠোর মধ্যে। তার পরে কোনো কথা না বলে একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে। চিঠিখানা আদিত্যের লেখা। তাতে আছে—

'এতদিনের পরিচয়ের পরে আজ হঠাৎ দেখা গেল আমার নিষ্ঠায় সন্দেহ করা সম্ভবপর হল তোমার পক্ষে। এ নিয়ে যুক্তি তর্ক করতে লজ্জা বোধ করি। তোমার মনের বর্তমান অবস্থায় আমার সকল কথা সকল কাজই বিপরীত হবে তোমার অনুভবে। সেই অকারণ পীড়ন তোমার দুর্বল শরীরকে আঘাত করবে প্রতিমুহূর্তে। আমার পক্ষে দূরে থাকাই ভালো, যে পর্যন্ত না তোমার মন সুস্থ হয়। এও বুঝলুম, সরলাকে এখানকার কাজ থেকে বিদায় করে দিই, এই তোমার ইচ্ছা।

হয়তো দিতে হবে। ভেবে দেখলুম তা ছাড়া অন্য পথ নেই। তবু বলে রাখি, আমার শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি সমস্তই সরলার জ্যাঠামশায়ের প্রসাদে; আমার জীবনে সার্থকতার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তাঁরই স্নেহের ধন সরলা সর্বস্বান্ত নিঃসহায়। আজ ওকে যদি ভাসিয়ে দিই তো অধর্ম হবে। তোমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেও পারব না।

অনেক ভেবে স্থির করেছি, আমাদের ব্যবসায়ে নতুন বিভাগ একটা খুলব, ফুল সবজির বীজ তৈরির বিভাগ। মানিকতলায় বাড়িসুদ্ধ জমি পাওয়া যেতে পারবে। সেইখানেই সরলাকে বসিয়ে দেব কাজে। এই কাজ আরম্ভ করবার মতো নগদ টাকা হাতে নেই আমার। আমাদের এই বাগান-বাড়ি বন্ধক রেখে টাকা তুলতে হবে। এ প্রস্তাবে রাগ কোরো না এই আমার একান্ত অনুরোধ। মনে রেখো, সরলার জ্যাঠামশায় আমার এই বাগানের জন্যে আমাকে মূলধন বিনাসুদে ধার দিয়েছিলেন, শুনেছি তারও কিছু অংশ তাঁকে ধার করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাজ শুরু করে দেবার মতো বীজ, কলমের গাছ, দুর্লভ ফুলগাছের চারা, অর্কিড, ঘাসকাটা কল ও অন্যান্য অনেক যন্ত্র দান করেছেন বিনামূল্যে। এতবড়ো সুযোগ যদি আমাকে না দিতেন, আজ ত্রিশটাকা বাসাভাড়ায় কেরানিগিরি করতে হত, তোমার সঙ্গে বিবাহও ঘটত না কপালে। তোমার সঙ্গে কথা হবার পর এই প্রশ্নই বার বার মনে আমার উঠেছে, আমিই ওকে আশ্রয় দিয়েছি, না আমাকেই আশ্রয় দিয়েছে সরলা? এই সহজ কথাটাই ভুলে ছিলেম, তুমিই আমাকে দিলে মনে করিয়ে। এখন তোমাকেও মনে রাখতে হবে। কখনো ভেবো না সরলা আমার গলগ্রহ। ওদের ঋণ শোধ করতে পারব না কোনোদিন, ওর দাবিরও অন্ত থাকবে না আমার 'পরে। তোমার সঙ্গে কখনো যাতে ওর দেখা না হয় সে চেষ্টা রইল মনে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হবার নয় সে কথা আজ যেমন বুঝেছি এমন এর আগে কখনো বুঝি নি। সব কথা বলতে পারলুম না, আমার দুঃখ আজ কথার অতীত হয়ে গেছে। যদি অনুমানে বুঝতে পার তো পারলে, নইলে জীবনে এই প্রথম আমার বেদনা, যা রইল তোমার কাছে অব্যক্ত।'—

রমেন চিঠিখানা পড়লে দুইবার। পড়ে চুপ করে রইল।

নীরজা ব্যাকুলস্বরে বললে, 'কিছু একটা বলো ঠাকুরপো।'

রমেন তবু কিছু উত্তর দিলে না।

নীরজা তখন বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে বালিশে মাথা ঠুকতে লাগল, বললে, 'অন্যায় করেছি, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু কেউ কি তোমরা বুঝতে পার না কিসে আমার মাথা দিল খারাপ করে।'

'কী করছ বউদি। শান্ত হও, তোমার শরীর যে যাবে ভেঙে।'

'এই ভাঙা শরীরই তো আমার কপাল ভেঙেছে, ওর জন্যে মমতা কিসের। তার 'পরে আমার অবিশ্বাস—এ দেখা দিল কোথা থেকে। এ যে অক্ষম জীবন নিয়ে আমার নিজেরই উপরে অবিশ্বাস। সেই তাঁর নীরু আজ আছে কোথায়, যাকে তিনি কখনো বলতেন "মালিনী", কখনো বলতেন "বনলক্ষ্মী"। আজ কে নিলে কেড়ে তার উপবন। আমার কি একটাই নাম ছিল। কাজ সেরে আসতে যেদিন তাঁর দেরি হত আমি বসে থাকতুম তাঁর খাবার আগলে, তখন আমাকে ডেকেছেন "অন্নপূর্ণা"। সন্ধ্যাবেলায় তিনি বসতেন দিঘির ঘাটে, ছোটো রুপোর থালায় বেলফুল রাশ করে তার উপরে পান সাজিয়ে দিতেম তাঁকে, হেসে আমাকে বলতেন, "তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী"। সেদিন সংসারের সব পরামর্শই আমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি। আমাকে নাম দিয়েছিলেন "গৃহসচিব", কখনো বা "হোম সেক্রেটারি"। আমি যেন সমুদ্রে এসেছিলেম ভরা নদী, ছড়িয়েছিলেম নানা শাখা নানা দিকে, সব শাখাতেই আজ এক দণ্ডে জল গেল শুকিয়ে, বেরিয়ে পড়ল পাথর।'

'বউদি আবার তুমি সেরে উঠবে, তোমার আসন আবার অধিকার করবে পূর্ণশক্তি দিয়ে।'

'মিছে আশা দিয়ো না ঠাকুরপো। ডাক্তার কী বলে সে আমার কানে আসে। সেইজন্যেই এত-দিনের সুখের সংসারকে এত করে আঁকড়ে ধরতে আমার এই নৈরাশ্যের কাঙালপনা।'

'দরকার কী বউদি। আপনাকে এতদিন তো ঢেলে দিয়েছ তোমার সংসারে। তার চেয়ে বড়ো কথা আর কিছু আছে কি। যেমন দিয়েছ তেমনি পেয়েছ, এত পাওয়াই বা কোন্ মেয়ে পায়। যদি ডাক্তারের কথা সত্যি হয়, যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তাহলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও। এতদিন যে গৌরবে কাটিয়েছ সে গৌরবকে খাটো করে দিয়ে যাবে কেন। এ বাড়িতে তোমার শেষ স্মৃতিকে যাবার সময় নূতন মহিমা দিয়ো।'

'বুক ফেটে যায় ঠাকুরপো, বুক ফেটে যায়। আমার এতদিনের আনন্দকে ফেলে রেখে হাসি-মুখেই চলে যেতে পারতুম। কিন্তু কোনোখানে কি এতটুকু ফাঁক থাকবে না যেখানে আমার জন্যে একটা বিরহের দীপ টিমটিম করেও জ্বলবে। এ কথা ভাবতে গেলে যে মরতেও ইচ্ছে করে না। ঐ সরলা সমস্তটাই দখল করবে একেবারে পুরোপুরি, বিধাতার এই কি বিচার।'

'সত্যি কথা বলব বউদি, রাগ কোরো না। তোমার কথা ভালো বুঝতেই পারি নে। যা নিজে ভোগ করতে পারবে না, তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পার না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? তোমার ভালোবাসার উপর এত বড়ো খোঁটা থেকে যাবে? তোমার সংসারে তোমারই শ্রদ্ধার প্রদীপ তুমি আপনিই আজ চুরমার করতে বসেছ। তার ব্যথা তুমি চলে যাবে এড়িয়ে, কিন্তু চিরদিন সে আমাদের বাজবে যে। মিনতি করে বলছি তোমার সারাজীবনের দাক্ষিণ্যকে শেষমুহূর্তে কৃপণ করে যেয়ো না।'

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নীরজা। চুপ করে বসে রইল রমেন, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা মাত্র করলে না, কান্নার বেগ থেমে গেলে নীরজা বিছানায় উঠে বসল। বললে, 'আমার একটি ভিক্ষা আছে ঠাকুরপো।'

'হুকুম করো বউদি।'

'বলি শোনো। যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ঐ পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন বিশ্রী ছোটো। যেমন করে পার আমাকে গুরুর সন্ধান দাও। না হলে কাটবে না বন্ধন। আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ব। যে সংসারে সুখের জীবন কাটিয়েছি, মরার পরে সেইখানেই দুঃখের হাওয়ায় যুগযুগান্তর কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে; তার থেকে উদ্ধার করো আমাকে, উদ্ধার করো।'

'তুমি তো জান বউদি শাস্ত্রে যাকে বলে পাষণ্ড, আমি তাই। কিছু মানি নে। প্রভাস মিত্তির অনেক টানাটানি করে একবার আমাকে তার গুরুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা পড়বার আগেই দিলেম দৌড়। জেলখানার মেয়াদ আছে, এ বাঁধন বেমেয়াদি।'

'ঠাকুরপো, তোমার মন জোরালো, তুমি কিছুতে বুঝবে না আমার বিপদ। বেশ জানি যতই আঁকুবাঁকু করছি ততই ডুবছি অগাধ জলে, সামলাতে পারছি নে।'

'বউদি, একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি। কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার,—"দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দুর্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি"—সব ভার যাবে একমুহূর্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে। গুরুকে দরকার নেই; এখনি বলো—"দিলেম, দিলেম, কিছুই হাতে রাখলেম না, আমার সব কিছু দিলেম, নির্মুক্ত হয়ে নির্মল হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেম, কোনো দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে রেখে গেলেম না সংসারে"।'

'আহা, বলো, বলো ঠাকুরপো, বার বার করে শোনাও আমাকে। তাঁকে এ পর্যন্ত যা কিছু দিতে পেরেছি তাতেই পেয়েছি আনন্দ, আজ যা দিতে পারছি নে, তাতেই এত করে মারছে। দেব, দেব, দেব, সব দেব আমার—আর দেরি নয়, এখনি। তুমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।'

'আজ নয় বউদি, কিছুদিন ধরে মনটাকে বেঁধে নাও, সহজ হোক তোমার সংকল্প।'

'না, না, আর সইতে পারছি নে। যখন থেকে বলে গেছেন এ বাড়ি ছেড়ে জাপানী ঘরে গিয়ে

থাকবেন তখন থেকে এ শয্যা আমার কাছে চিতাশয্যা হয়ে উঠেছে। যদি ফিরে না আসেন এ রাত্তির কাটবে না, বুক ফেটে মরে যাব। অমনি ডেকে এনো সরলাকে, আমি শেল উপড়ে ফেলব বুকের থেকে, ভয় পাব না এই তোমাকে বলছি নিশ্চয় করে।'

'সময় হয় নি, বউদি, আজ থাক্।'

'সময় যায় পাছে এই ভয়। এক্ষণি ডেকে আনো।' পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু-হাত জোড় করে বললে, 'বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে। আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পুজো অর্চনা সব গেল আমার। ঠাকুরপো, একটা কথা বলি, আপত্তি কোরো না।'

'কী বলো।'

'একবার আমাকে ঠাকুরঘরে যেতে দাও দশ মিনিটের জন্যে, তা হলে আমি বল পাব, কোনো ভয় থাকবে না।'

'আচ্ছা, যাও, আপত্তি করব না।'

'আয়া।'

'কী খোঁখী।'

'ঠাকুরঘরে নিয়ে চল্ আমাকে।'

'সে কী কথা। ডাক্তারবাবু—'

'ডাক্তারবাবু যমকে ঠেকাতে পারবে না আর আমার ঠাকুরকে ঠেকাবে?'

'আয়া, তুমি ওঁকে নিয়ে যাও, ভয় নেই, ভালোই হবে।'

আয়াকে অবলম্বন করে নীরজা যখন চলে গেল এমন সময় আদিত্য ঘরে এল।

আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, 'এ কী, নীরু ঘরে নেই কেন।'

'এখনি আসবেন, তিনি ঠাকুরঘরে গেছেন।'

'ঠাকুরঘরে? ঘর তো কাছে নয়। ডাক্তারের নিষেধ আছে যে।'

'শুনো না দাদা। ডাক্তারের ওষুধের চেয়ে কাজে লাগবে। একবার কেবল ফুলের অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করেই চলে আসবেন।'

নীরজাকে চিঠি লিখে যখন পাঠিয়ে দিয়েছিল তখন আদিত্য স্পষ্ট জানত না যে অদৃষ্ট তার জীবনের পটে প্রথম যে লিপিখানি অদৃশ্য কালিতে লিখে রেখেছে, বাইরের তাপ লেগে সেটা হঠাৎ এতখানি উঠবে উজ্জ্বল হয়ে। প্রথমে ও সরলাকে বলতে এসেছিল— আর উপায় নেই, ছাড়াছাড়ি করতে হবে। সেই কথা বলবার বেলাতেই ওর মুখ দিয়ে বেরল উলটো কথা। তার পরে জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘাটে বসে বসে বার বার করে বলেছে— জীবনের সত্যকে আবিষ্কার করেছে বিলম্বে, তাই বলেই তাকে অস্বীকার করতে পারে না। ওর তো অপরাধ নেই, লজ্জা করবার নেই কিছু। অন্যায় তবেই হবে, যদি সত্যকে গোপন করতে যায়। করবে না গোপন, নিশ্চয় স্থির; ফলাফল যা হয় তা হোক। এ কথা আদিত্য বেশ বুঝেছে যে, যদি তার জীবনের কেন্দ্র থেকে কর্মের ক্ষেত্র থেকে সরলাকে আজ সরিয়ে দেয়, তবে সেই একাকিতায়, সেই নীরসতায় ওর সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে, ওর কাজ পর্যন্ত যাবে বন্ধ হয়ে।

'রমেন, তুমি আমাদের সব কথা জান, আমি জানি।'

'হাঁ জানি।'

'আজ চুকিয়ে দেব সব, আজ পরদা ফেলব উঠিয়ে।'

'তুমি তো একলা নও দাদা। বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেললেই তো হল না। বউদি রয়েছেন ওদিকে। সংসারের গ্রন্থি জটিল।'

'তোমার বউদি আর আমার মধ্যে মিথ্যাকে খাড়া করে রাখতে পারব না। বাল্যকাল থেকে সরলার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই সে কথা মান তো?'

'মানি বৈকি।'

'সেই সহজ সম্বন্ধের তলায় গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল, জানতে পারি নি, সে কি আমাদের দোষ।'

'কে বলে দোষ?'

'আজ সেই কথাটাই যদি গোপন করি তা হলেই মিথ্যাচরণের অপরাধ হবে। আমি মুখ তুলেই বলব।'

'গোপনই বা করতে যাবে কী জন্যে, আর সমারোহ করে প্রকাশই বা করবে কেন। বউদিদির যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর ক'টা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা আপনিই এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি কোরো না। বউদি যা বলতে চান শোনো, তার উত্তরে তোমারও যা বলা উচিত আপনিই সহজ হয়ে যাবে।'

নীরজাকে ঘরে আসতে দেখে রমেন বেরিয়ে গেল।

নীরজা ঘরে ঢুকেই আদিত্যকে দেখেই মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ে পায়ে মাথা রেখে অশ্রু-গদ্‌গদ কণ্ঠে বললে, 'মাপ করো, মাপ করো আমাকে, অপরাধ করেছি। এতদিন পরে ত্যাগ কোরো না আমাকে, দূরে ফেলো না আমাকে।' আদিত্য দুই হাতে তাকে তুলে ধরে বুকে করে নিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলে। বললে, 'নীরু, তোমার ব্যথা কি আমি বুঝি নে।' নীরজার কান্না থামতে চায় না। আদিত্য আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নীরজা আদিত্যের হাত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, বললে, 'সত্যি বলো আমাকে মাপ করেছ। তুমি প্রসন্ন না হলে মরার পরেও আমার সুখ থাকবে না।'

'তুমি তো জান নীরু, মাঝে মাঝে মনান্তর হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু মনের মিল কি ভেঙেছে তা নিয়ে।'

'এর আগে তো কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাও নি তুমি। এবারে গেলে কেন। এত নিষ্ঠুর তোমাকে করেছে কিসে।'

'অন্যায় করেছি নীরু, মাপ করতে হবে।'

'কী বল তার ঠিক নেই। তোমার কাছ থেকেই আমার সব শাস্তি, সব পুরস্কার। অভিমানে তোমার বিচার করতে গিয়েই তো আমার এমন দশা ঘটেছিল।—ঠাকুরপোকে বলেছিলুম, সরলাকে ডেকে আনতে, এখনো আনলেন না কেন।'

সরলাকে ডেকে আনবার কথায় ধক করে ঘা লাগল আদিত্যের মনে। সমস্যাকে অন্তত আজকের মতো কোনোক্রমে পাশে সরিয়ে রাখতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হয়। বললে, 'রাত হয়েছে, এখন থাক্‌।' এমন সময় নীরজা বলে উঠল, 'ঐ শোনো, আমার মনে হচ্ছে ওরা অপেক্ষা করছে দরজার বাইরে। ঠাকুরপো, ঘরে এসো তোমরা।'

সরলাকে নিয়ে রমেন ঘরে ঢুকল। নীরজা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সরলা প্রণাম করলে নীরজার পা ছুঁয়ে। নীরজা বললে, 'এসো বোন আমার কাছে এসো।'

সরলার হাত ধরে বিছানায় বসাল। বালিশের নিচে থেকে গয়নার কেস টেনে নিয়ে একটি মুক্তোর মালা বের করে সরলাকে পরিয়ে দিলে। বললে, 'একদিন ইচ্ছে করেছিলুম, যখন চিতায় আমার দাহ হবে এই মালাটি যেন আমার গলায় থাকে। কিন্তু তার চেয়ে এই ভালো। আমার হয়ে মালা তুমিই গলায় প'রে থেকো শেষদিন পর্যন্ত। বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতবার পরেছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সেই দিনগুলি ওঁর মনে পড়বে।'

'অযোগ্য আমি, দিদি, অযোগ্য, কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছ।'

নীরজা মনে করেছিল, আজ তার সর্বদানযজ্ঞের এও একটা অঙ্গ। কিন্তু তার অন্তরতর মনের জ্বালা যে এই দানের মধ্যে দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেল সে কথা সে নিজেও স্পষ্ট বুঝতে পারে নি। ব্যাপারটা সরলাকে যে কতখানি বাজল তা অনুভব করলে আদিত্য। বললে, 'ঐ মালাটা আমাকে

দাও-না সরলা। ওর মূল্য আমার কাছে যতখানি, এমন আর কারো কাছে নয়। ও আমি আর কাউকে দিতে পারব না।'

নীরজা বললে, 'আমার কপাল। এত করেও বোঝাতে পারলুম না বুঝি। সরলা, শুনেছিলেম এই বাগান থেকে তোমার চলে যাবার কথা হয়েছিল। সে আমি কোনোমতেই ঘটতে দেব না। তোমাকে আমি আমার সংসারের যা-কিছু সমস্তর সঙ্গে রাখব বেঁধে, এই হারটি তারই চিহ্ন। এই আমার বাঁধন তোমার হাতে দিয়েছিলুম যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।'

'ভুল করছ দিদি, আমাকে বাঁধতে চেয়ো না, ভালো হবে না তাতে।'

'সে কী কথা।'

'আমি সত্যি কথাই বলব। এতদিন আমাকে বিশ্বাস করতে পারতে। কিন্তু আজ আমাকে বিশ্বাস কোরো না, এই আমি তোমাদের সকলের সামনেই বলছি। ভাগ্য যে দান থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে, কাউকে বঞ্চনা ক'রে সে আমি নেব না। এই রইল তোমার পায়ে আমার প্রণাম, আমি চললেম। অপরাধ আমার নয়, অপরাধ সেই আমার ঠাকুরের যাঁকে সরল বিশ্বাসে রোজ দু-বেলা পুজো করেছি। সেও আজ আমার শেষ হল।'

এই বলে সরলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আদিত্য নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না, সেও গেল চলে।

'ঠাকুরপো, এ কী হল ঠাকুরপো। বলো ঠাকুরপো, একটা কথা কও।'

'এইজন্যেই বলেছিলেম আজ রাত্রে ডেকো না।'

'কেন, মন খুলে আমি তো সবই দিয়েছি। ও কি তাও বুঝল না।'

'বুঝেছে বৈকি। বুঝেছে যে, মন তোমার খোলে নি। সুর বাজল না।'

'কিছুতে বিশুদ্ধ হল না আমার মন। এত মার খেয়েও। কে বিশুদ্ধ করে দেবে। ওগো সন্ন্যাসী, আমাকে বাঁচাও-না। ঠাকুরপো, কে আমার আছে, কার কাছে যাব আমি।'

'আমি আছি বউদি। তোমার দায় আমি নেব। তুমি এখন ঘুমোও।'

'ঘুমোব কেমন করে। এ বাড়ি থেকে আবার যদি উনি চলে যান তা হলে মরণ নইলে আমার ঘুম হবে না।'

'চলে উনি যেতে পারবেন না; সে ওঁর ইচ্ছায় নেই, শক্তিতে নেই। এই নাও ঘুমের ওষুধ, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি যাব।'

'যাও ঠাকুরপো, তুমি যাও, ওরা দুজনে কোথায় গেল দেখে এসো, নইলে আমি নিজেই যাব, তাতে আমার শরীর ভাঙে ভাঙুক।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।'

৭

আদিত্য ওর সঙ্গে এল দেখে সরলা বললে, 'কেন এলে। ভালো করো নি। ফিরে যাও। আমার সঙ্গে তোমাকে এমন করে দেব না জড়াতে।'

'তুমি দেবে কি না সে তো কথা নয়, জড়িয়ে যে গেছেই। সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক তাতে আমাদের হাত নেই।'

'সে সব কথা পরে হবে, ফিরে যাও রোগীকে শান্ত করো গে।'

'আমাদের এই বাগানের আর-একটা শাখা বাড়াব সেই কথাটা—'

'আজ থাক্। আমাকে দু-চার দিন ভাববার সময় দাও, এখন আমার ভাববার শক্তি নেই।'

রমেন এসে বললে, 'যাও দাদা, বউদিকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও গে, দেরি কোরো না। কিছুতেই কোনো কথা কইতে দিয়ো না ওঁকে। রাত হয়ে গেছে।'

আদিত্য চলে গেলে পর সরলা বললে, 'শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কাল তোমাদের একটা সভা আছে না?'

'আছে।'

'তুমি যাবে না?'

'যাবার কথা ছিল। কিন্তু এবার আর যাওয়া হল না।'

'কেন।'

'সে কথা তোমাকে বলে কী হবে।'

'তোমাকে ভীতু বলে সবাই নিন্দে করবে।'

'যারা আমায় পছন্দ করে না তারা আমায় নিন্দে করবে বৈকি।'

'তা হলে শোনো আমার কথা, আমি তোমাকে মুক্তি দেব। সভায় তোমাকে যেতেই হবে।'

'আর-একটু স্পষ্ট করে বলো।'

'আমিও যাব, সভায় নিশেন হাতে নিয়ে।'

'বুঝেছি।'

'পুলিসে বাধা দেয় সেটা মানতে রাজি আছি কিন্তু তুমি বাধা দিলে মানব না।'

'আচ্ছা বাধা দেব না।'

'এই রইল কথা?'

'রইল।'

'আমরা দুজন একসঙ্গে যাব কাল বিকেল পাঁচটার সময়।'

'হাঁ যাব, কিন্তু ওই দুর্জনরা তার পরে আমাদের আর একসঙ্গে থাকতে দেবে না।'

এমন সময় আদিত্য এসে পড়ল। সরলা জিজ্ঞাসা করলে, 'ও কী, এখনি এলে যে বড়ো।'

'দুই একটা কথা বলতে বলতেই নীরজা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আমি আস্তে আস্তে চলে এলুম।'

রমেন বললে, 'আমার কাজ আছে চললুম।'

সরলা হেসে বললে, 'বাসা ঠিক করে রেখো, ভুলো না।'

'কোনো ভয় নেই। চেনা জায়গা।' এই বলে সে চলে গেল।

৮

সরলা বসে ছিল, সে উঠে দাঁড়াল, বললে, 'যে-সব কথা বলবার নয় সে আমাকে বোলো না আজ, পায়ে পড়ি।'

'কিচ্ছু বলব না, ভয় নেই।'

'আচ্ছা, তা হলে আমিই কিছু বলতে চাই তুমি শোনো। বলো, কথা রাখবে।'

'অরক্ষণীয় না হলে কথা নিশ্চয় রাখব তুমি তা জান।'

'বুঝতে বাকি নেই আমি কাছে থাকলে একেবারেই চলবে না। এই সময়ে দিদির সেবা করতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু সে আমার ভাগ্যে সইবে না। আমাকে অনুপস্থিত থাকতেই হবে। একটু থামো, কথাটা শেষ করতে দাও। শুনেইছ ডাক্তার বলেছেন বেশিদিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর মধ্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়তে দিয়ো না ওঁর জীবনে।'

'আমার মন থেকে আপনিই ছায়া যদি পড়ে, তবে কী করতে পারি।'

'না না, নিজের সম্বন্ধে অমন অশ্রদ্ধার কথা বোলো না। সাধারণ বাঙালি ছেলের মতো ভিজে মাটির তলতলে মন কি তোমার। কক্ষনো না, আমি তোমাকে জানি।'

আদিত্যের হাত ধরে বললে, 'আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ ক'টা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ ক'রে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে আমি এসেছিলাম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙে দেবার জন্যে।'

আদিত্য চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

'কথা দাও ভাই।'

'দেব, কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। বলো রাখবে।'

'তোমার সঙ্গে আমার তফাত এই যে, আমি যদি তোমাকে কিছু প্রতিজ্ঞা করাই সেটা সাধ্য, কিন্তু তুমি যদি করাও সেটা হয়তো অসম্ভব হবে।'

'না হবে না।'

'আচ্ছা বলো।'

'যে কথা মনে মনে বলি সে কথা তোমার কাছে মুখে বলতে অপরাধ নেই। তুমি যা বলছ তা শুনব এবং সেটা বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূন্যতা। কেন চুপ করে রইলে।'

'জানি নে যে ভাই, প্রতিজ্ঞা পালনে কী বিঘ্ন একদিন ঘটতে পারে।'

'বিঘ্ন তোমার অন্তরে আছে কি। সেই কথাটা বলো আগে।'

'কেন আমাকে দুঃখ দাও। তুমি কি জান না এমন কথা আছে ভাষায় বললে যার আলো যায় নিভে।'

'আচ্ছা, এই শুনলুম, এই শুনেই চললুম কাজে।'

'আর ফিরে তাকাবে না এখন?'

'না, কিন্তু অব্যক্ত প্রতিজ্ঞার শিলমোহর করে নিতে ইচ্ছা করছে তোমার মুখটিতে।'

'যা সহজ তাকে নিয়ে জোর কোরো না। থাক্ এখন।'

'আচ্ছা, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখন কী করবে, থাকবে কোথায়।'

'সে ভার নিয়েছেন রমেনদা।'

'রমেন তোমাকে আশ্রয় দেবে? সে লক্ষ্মীছাড়ার চালচুলো আছে কি।'

'ভয় নেই তোমার। পাকা আশ্রয়। নিজের সম্পত্তি নয়, কিন্তু বাধা ঘটবে না।'

'আমি জানতে পারব তো?'

'নিশ্চয় জানতে পারবে কথা দিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে দেখবার জন্যে একটুও ব্যস্ত হতে পারবে না এই সত্য করো।'

'তোমারও মন ব্যস্ত হবে না?'

'যদি হয় অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ তা জানতে পারবে না।'

'আচ্ছা, কিন্তু যাবার সময় ভিক্ষার পাত্র একেবারে শূন্য রেখেই বিদায় দেবে?'

পুরুষের চোখ ছল ছল করে উঠল।

সরলা কাছে এসে নীরবে মুখ তুলে ধরলে।

৯

'রোশনি।'

'কি খোঁখী।'

'কাল থেকে সরলাকে দেখছি নে কেন।'

'সে কী কথা, জান না, সরকার বাহাদুর যে তাকে পুলিপোলাও চালান দিয়েছে?'

'কেন, কী করেছিল।'

'দারোয়ানের সঙ্গে ষড় করে বড়োলাটের মেমসাহেবের ঘরে ঢুকেছিল।'

'কী করতে।"

'মহারানীর শিলমোহর থাকে যে-বাক্সয় সেইটে চুরি করতে, আচ্ছা বুকের পাটা।'

'লাভ কী।'

'ঐ শোনো! সেটা পেলেই তো সব হল। লাটসাহেবের ফাঁসি দিতে পারত। সেই মোহরের ছাপেই তো রাজ্যিখানা চলছে।'

'আর ঠাকুরপো?'

'সিঁধকাঠি বেরিয়েছে তাঁর পাগড়ির ভিতর থেকে, দিয়েছে তাঁকে হরিণবাড়িতে, পাথর ভাঙাবে পঁচাশ বছর। আচ্ছা খোঁখী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি থেকে যাবার সময় সরলাদিদি তার জাফরানি রঙের দামি শাড়িখানা আমাকে দিয়ে গেল। বললে, 'তোমার ছেলের বউকে দিয়ো।' চোখে আমার জল এল। কম দুঃখ তো দিই নি ওকে। এই শাড়িটা যদি রেখে দিই কোম্পানি বাহাদুর ধরবে না তো?'

'ভয় নেই তোর। কিন্তু শীগগির যা। বাইরের ঘরে খবরের কাগজ পড়ে আছে, নিয়ে আয়।'

পড়ল কাগজ। আশ্চর্য হল, আদিত্য তাকে এতবড়ো খবরটাও দেয় নি। এ কি অশ্রদ্ধা ক'রে। জেলে গিয়ে জিতল ঐ মেয়েটা। আমি কি পারতুম না যেতে যদি শরীর থাকত। হাসতে হাসতে ফাঁসি যেতে পারতুম।

'রোশনি, তোদের সরলা দিদিমণির কাণ্ডটা দেখলি? হাটের লোকের সামনে ভদ্রঘরের মেয়ে—'

আয়া বললে, 'মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়, চোরডাকাতের বাড়া। ছি ছি।'

'ওর সব তাতেই গায়ে-পড়া বাহাদুরি। বেহায়াগিরির একশেষ, বাগান থেকে আরম্ভ করে জেলখানা পর্যন্ত। মরতে মরতেও দেমাক ঘোচে না।'

আয়ার মনে পড়ল জাফরানি রঙের শাড়ির কথা। বললে, 'কিন্তু খোঁখী, দিদিমণির মনখানা দরাজ।'

কথাটা নীরজাকে মস্ত একটা ধাক্কা দিলে। সে যেন হঠাৎ জেগে উঠে বললে, 'ঠিক বলেছিস রোশনি, ঠিক বলেছিস। ভুলে গিয়েছিলুম। শরীর খারাপ থাকলেই মন খারাপ হয়। আগের থেকে কত যেন নিচু হয়ে গেছি। ছি ছি নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে। সরলা খাঁটি মেয়ে, মিথ্যে জানে না। অমন মেয়ে দেখা যায় না। আমার চেয়ে অনেক ভালো। শীগগির আমাদের গণেশ সরকারকে ডেকে দে।'

আয়া চলে গেলে ও পেনসিল নিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসল। গণেশ এল। তাকে বললে, 'চিঠি পেঁৗছিয়ে দিতে পারবে জেলখানায় সরলাদিদিকে?'

গণেশ গাঙ্গুলীর কৃতিত্বের অভিমান ছিল। বললে, 'পারব। কিছু খরচ লাগবে। কিন্তু কী লিখলে মা, শুনি, কেননা পুলিসের হাত হয়ে যাবে চিঠিখানা।'

নীরজা পড়ে শোনালে, 'ধন্য তোমার মহত্ত্ব। এবার জেলখানা থেকে বেরিয়ে যখন আসবে, তখন দেখবে তোমার পথের সঙ্গে আমার পথ মিলে গেছে।'

গণেশ বললে, 'ঐ যে পথটার কথা লিখেছ ভালো শোনাচ্ছে না। আমাদের উকিলবাবুকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে।'

গণেশ চলে গেল। নীরজা মনে মনে রমেনকে প্রণাম করে বললে, 'ঠাকুরপো, তুমি আমার গুরু।'

১০

আদিত্য একটা পেয়ালায় ওষুধ নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলে।

নীরজা বললে, 'এ আবার কী।'

আদিত্য বললে, 'ডাক্তার বলে গেছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হবে।'

'ওষুধ খাওয়াবার জন্যে বুঝি আর পাড়ায় লোক জুটল না। না হয় দিনের বেলাকার জন্যে একজন নার্স রেখে দাও-না, যদি মনে এতই উদ্‌বেগ থাকে।'

'সেবার ছলে কাছে আসবার সুযোগ যদি পাই ছাড়ব কেন।'

'তার চেয়ে কোনো সুযোগে তোমার বাগানের কাজে যদি যাও তো ঢের বেশি খুশি হব। আমি পড়ে আছি, আর দিনে দিনে বাগান যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

'হোক-না নষ্ট। সেরে ওঠ আগে, তারপর সেদিনকার মতো দুজনে মিলে কাজ করব।'

'সরলা চলে গেছে, তুমি একলা পড়েছ, কাজে মন যাচ্ছে না। কিন্তু উপায় কী। তাই বলে লোকসান করতে দিয়ো না।'

'লোকসানের কথা আমি ভাবছি নে, নীরু। বাগান করাটা যে আমার ব্যাবসা সে কথা এতদিন তুমিই ভুলিয়ে রেখেছিলে, কাজে তাই সুখ ছিল। এখন মন যায় না।'

'অমন করে আক্ষেপ করছ কেন। বেশ তো কাজ করছিলে এই সেদিন পর্যন্ত। কিছুদিনের জন্যে যদি বাধা পড়ে তাই নিয়ে এত ব্যাকুল হোয়ো না।'

'পাখাটা কি চালিয়ে দেব।'

'বাড়াবাড়ি কোরো না তুমি, ঐ-সব কাজ তোমাদের নয়। এতে আমাকে আরো ব্যস্ত করে তোলে। যদি কোনোরকম ক'রে দিন কাটাতে চাও তোমাদের তো হর্টিকালচরিস্‌ট্‌ ক্লাব আছে।'

'তুমি যে রঙিন লিলি ভালোবাস, বাগানে অনেক খুঁজেছিলুম, একটাও পাই নি। এবারে ভালো বৃষ্টি হয় নি বলে গাছগুলোর তেজ নেই।'

'কী তুমি মিছিমিছি বকছ। তার চেয়ে হলাকে ডেকে দাও, আমি শুয়ে শুয়েই বাগানের কাজ করব। তুমি কি বলতে চাও আমি শয্যাগত বলেই আমার বাগানও হবে শয্যাগত। শোনো আমার কথা। শুকনো সীজন ফুলের গাছগুলো উপড়িয়ে ফেলে সেখানে জমি তৈরি করিয়ে নাও। আমার সিঁড়ির নিচের ঘরে সরষের খোলের বস্তা আছে। হলার কাছে আছে তার চাবি।'

'তাই নাকি, হলা তো এতদিন কিছুই বলে নি।'

'বলতে ওর রুচবে কেন। ওকে কি তোমরা কম হেনস্তা করেছ। কাঁচা সাহেব এসে প্রবীণ কেরানিকে যেরকম গ্রাহ্য করে না সেই রকম আর কি।'

'হলা মালীর সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে যদি চাই তবে সেটা অপ্রিয় হয়ে উঠবে।'

'আচ্ছা, আমি এই বিছানায় পড়ে থেকেই ওকে দিয়ে কাজ করাব, দেখবে দু-দিনেই বাগানের চেহারা ফেরে কি না। বাগানের ম্যাপটা আমার কাছে দিয়ো। আর আমার বাগানের ডায়রিটা। আমি ম্যাপে পেন্‌সিলের দাগ দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।'

'আমার তাতে কোনো হাত থাকবে না?'

'না। যাবার আগে এ বাগানে সম্পূর্ণ আমারই ছাপ মেরে দেব। বলে রাখছি রাস্তার ধারের ঐ বট্‌ল পামগুলো আমি একটাও রাখব না। ওখানে ঝাউগাছের সার লাগিয়ে দেব। অমন করে

মাথা নেড়ো না। হয়ে গেলে তখন দেখো। তোমাদের ঐ লনটা আমি রাখব না, ওখানে মারবেলের একটা বেদী বাঁধিয়ে দেব।'

'বেদীটা কি ও-জায়গায় মানাবে। একটু যেন—যাকে বলে সস্তা নবাবি।'

'চুপ করো। খুব মানাবে। তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না। কিছুদিনের জন্যে এ বাগানটা হবে একলা আমার, সম্পূর্ণ আমার। তার পরে সেই আমার বাগানটা আমি তোমাকে দিয়ে যাব। ভেবেছিলে আমার শক্তি গেছে। দেখিয়ে দেব কী করতে পারি। আরো তিনজন মালী আমার চাই, আর মজুর লাগবে জন-ছয়েক। মনে আছে একদিন তুমি বলেছিলে, বাগান সাজিয়ে তোলার শিক্ষা আমার হয় নি। হয়েছে কি না তার পরীক্ষা দিয়ে যাব। তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে এ আমার বাগান, আমারই বাগান, আমার স্বত্ব কিছুতে যাবে না।'

'আচ্ছা সেই ভালো, তা হলে আমি কী করব।'

'তুমি তোমার দোকান নিয়ে থাকো; সেখানে তোমার আপিসের কাজ তো কম নয়।'

'তোমাকে নিয়ে থাকাও তা হলে নিষিদ্ধ?'

'হাঁ, সর্বদা কাছে থাকবার মতো সে আমি আর নেই, এখন আমি কেবল আর-একজনকে মনে করিয়েই দিতে পারি—তাতে লাভ কী।'

'আচ্ছা বেশ। যখন তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে তখনি আসব। ডেকে পাঠিয়ো আমাকে। আজ সাজিতে তোমার জন্যে গন্ধরাজ এনেছি, রেখে যাই তোমার বিছানায়, কিছু মনে কোরো না।' বলে আদিত্য উঠে পড়ল।

নীরজা হাত ধরে বললে, 'না যেয়ো না, একটু বোসো।' ফুলদানিতে একটা ফুল দেখিয়ে বললে, 'জান এ ফুলের নাম?'

আদিত্য জানে কী জবাব দিলে ও খুশি হবে, তাই মিথ্যে করে বললে, 'না জানি নে।'

'আমি জানি। বলব? পেট্যুনিয়া। তুমি মনে কর আমি কিছু জানি নে, মূর্খু আমি।'

আদিত্য হেসে বললে, 'সহধর্মিণী তুমি, যদি মূর্খ হও অন্তত আমার সমান মূর্খ। আমাদের জীবনে মূর্খতার কারবার আধাআধি ভাগে চলছে।'

'সে কারবার আমার ভাগ্যে এইবারে শেষ হয়ে এল। ঐ যে দারোয়ানটা ঐখানে বসে তামাক কুটছে, ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরেই আমি থাকব না। ঐ যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে ওর যাতায়াত চলবে রোজ রোজ, কিন্তু চলবে না আমার এই হৃদয়যন্ত্রটা।' আদিত্যের হাত হঠাৎ জোর করে চেপে ধরলে, বললে, 'একেবারেই থাকব না, কিছুই থাকব না? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ, বলো-না আমাকে সত্যি করে।'

'যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর। যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছি আর এগোই নি।'

'বলো-না, তুমি কী মনে কর। একটুও থাকব না? এতটুকুও না?'

'এখন আছি এটাই যদি সম্ভব হয়, তখন থাকব সেও সম্ভব।'

'নিশ্চয়ই সম্ভব, ঐ বাগানটা সম্ভব আর আমিই হব অসম্ভব, এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধ্যেবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপুরিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁয়া আছে তাতে। বলো, মনে করবে?'

আদিত্যকে বলতে হল, 'হাঁ মনে করব।' কিন্তু এমন সুরে বলতে পারলে না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।

নীরজা অস্থির হয়ে বলে উঠল, 'তোমাদের বই যারা লেখে ভারি তো পণ্ডিত তারা, কিছু জানে না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব, আমি এইখানেই থাকব,

আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই তোমাকে বলে যাচ্ছি, কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার বাগানের গাছপালা সমস্তই আমি দেখব, যেমন আগে দেখতুম তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। কাউকে দরকার হবে না। কাউকে না।'

বিছানায় শুয়েছিল নীরজা; উঠে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসল, বললে, 'আমাকে দয়া কোরো, দয়া কোরো। তোমাকে এত ভালোবাসি সেই কথা মনে করে আমাকে দয়া কোরো। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনি করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে সব ফুল ফুটবে তেমনি করেই মনে মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তা হলে তো এখানে আমি থাকতে পারব না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তা হলে হাওয়ায় হাওয়ায় কোন্ শূন্যে আমি ভেসে বেড়াব?' নীরজার দুই চক্ষু দিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল।

আদিত্য মোড়া ছেড়ে বিছানার উপর উঠে বসল। নীরজার মুখ বুকে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল তার মাথায়। বললে, 'নীরু, শরীর নষ্ট কোরো না।'

'যাক গে আমার শরীর। আমি আর কিছু চাই নে, আমি কেবল তোমাকে চাই এই সমস্ত কিছু নিয়ে। শোনো একটা কথা বলি, রাগ কোরো না আমার উপর, রাগ কোরো না,' বলতে বলতে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। একটু শান্ত হলে পর বললে, 'সরলার উপর অন্যায় করেছি। তোমার পায়ে ধরে বলছি আর অন্যায় করব না। যা হয়েছে, তার জন্যে আমাকে মাপ কোরো। কিন্তু আমাকে ভালোবেসো, ভালোবেসো তুমি, যা চাও আমি সব করব।'

আদিত্য বললে, 'শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন ছিল অসুস্থ, নীরু, তাই নিজেকে মিথ্যা পীড়ন করেছ।'

'শোনো বলি। কাল রাত্রি থেকে বার বার পণ করেছি, এবার দেখা হলে নির্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো। তুমি আমাকে এই শেষ প্রতিজ্ঞা রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না, তা হলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।'

এ কথার কোনো উত্তর না করে আদিত্য বারবার চুম্বন করলে ওর মুখ, ওর কপাল। মুদে এল নীরজার চোখ। খানিক বাদে নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, 'সরলা কবে খালাস পাবে সেই দিন গুনছি। ভয় হয় পাছে তার আগে মরে যাই। পাছে বলে যেতে না পারি যে আমার মন একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এইবার আলো জ্বালাও। আমাকে পড়ে শোনাও অক্ষয় বড়ালের 'এষা'। বালিশের নিচে থেকে বই বের করে দিলে। আদিত্য পড়ে শোনাতে লাগল।

শুনতে শুনতে যেই একটু ঘুম এসেছে আয়া ঘরে এসে বলল, 'চিঠি', ঘোর ভেঙে নীরজা চমকে উঠল। ধড়ধড় করতে লাগল তার বুক। কোনো বন্ধু আদিত্যকে খবর দিয়েছে, জেলে স্থানাভাব, তাই যে-কয়টি কয়েদীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই ছেড়ে দেওয়া হবে সরলা তার মধ্যে একজন। আদিত্যের মনটা লাফিয়ে উঠল। প্রাণপণ বলে চেপে রাখলে মনের উল্লাস। নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, 'কার চিঠি, কী খবর।'

পাছে পড়তে গেলে গলার আওয়াজ যায় কেঁপে, চিঠিখানা দিলে নীরজার হাতেই। নীরজা আদিত্যের মুখের দিকে চাইলে। মুখে কথা নেই বটে কিন্তু কথার প্রয়োজন ছিল না। নীরজার মুখেও কথা বেরল না কিছুক্ষণ। তার পরে খুব জোর করে বললে, 'তা হলে তো আর দেরি নেই। আজই আসবে। নিশ্চয়ই ওকে আনবে আমার কাছে।'

'ও কী। কী হল। নীরু! নার্স, ডাক্তার আছেন?'

'আছেন বাইরের ঘরে।'

'এখনি নিয়ে এসো, এই যে ডাক্তার! এইমাত্র বেশ সহজ শরীরে কথা বলছিল, বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল।'

ডাক্তার নাড়ী দেখে চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে রোগী চোখ মেলেই বললে, 'ডাক্তার আমাকে বাঁচাতেই হবে। সরলাকে না দেখে যেতে পারব না, ভালো হবে না তাতে। আশীর্বাদ করব তাকে। শেষ আশীর্বাদ।'

আবার এল চোখ বুজে। হাতের মুঠো শক্ত হল, বলে উঠল, 'ঠাকুরপো, কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না।'

এক-একবার চেতনা ক্ষীণ হয়ে জগৎ ঝাপসা হয়ে আসছে আবার নিবু-নিবু প্রদীপের মতো জীবন-শিখা উঠছে জ্বলে। স্বামীকে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করছে, 'কখন আসবে সরলা।'

থেকে থেকে সে ডেকে ওঠে, 'রোশনি।'

আয়া বলে, 'কী খোঁখী।'

'ঠাকুরপোকে ডেকে দে এক্ষুনি।' একবার আপনি বলে উঠল, 'কী হবে আমার, ঠাকুরপো। দেব দেব দেব, সব দেব।'

রাত্রি তখন ন-টা। নীরজার ঘরের কোণে ক্ষীণ আলোতে জ্বলছে একটা মোমের বাতি। বাতাসে দোলনচাঁপার গন্ধ। খোলা জানলার থেকে দেখা যায় বাগানের গাছগুলোর পুঞ্জীভূত কালিমা, আর তার উপরের আকাশে কালপুরুষের নক্ষত্রশ্রেণী। রোগী ঘুমোচ্ছে আশঙ্কা করে সরলাকে দরজার কাছে রেখে আদিত্য ধীরে ধীরে এল নীরজার বিছানার কাছে।

আদিত্য দেখলে ঠোঁট নড়ছে। যেন নিঃশব্দে কী জপ করছে। জ্ঞানে অজ্ঞানে জড়িত বিহ্বল মুখ। কানের কাছে মাথা নামিয়ে আদিত্য বললে, 'সরলা এসেছে।' চোখ ঈষৎ মেলে নীরজা বললে, 'তুমি যাও'—একবার ডেকে উঠল, 'ঠাকুরপো।' কোথাও সাড়া নেই।

সরলা এসে প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত আপনি গেল সরে।

ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।'

বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে—চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ন হল, বললে, 'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।'

হঠাৎ ঢিলে শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, 'পালা পালা পালা এখনি, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।' বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

গলার শব্দ শুনে আদিত্য ছুটে এল ঘরে, প্রাণের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে ফেলে দিয়ে নীরজার শেষ কথা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

চার অধ্যায়

প্রকাশ : ১৯৩৪

'চার অধ্যায়'-এর প্রথম সংস্করণে (১৩৪১) 'আভাস' শিরোনামে যে ভূমিকা ছিল সাময়িকপত্রে তার তীব্র সমালোচনা হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৪২) থেকে স্থানচ্যুত হয়। এখানে গ্রন্থশেষে সেই 'আভাস' সংযোজিত।

ভূমিকা

এলার মনে পড়ে তার জীবনের প্রথম সূচনা বিদ্রোহের মধ্যে। তার মা মায়াময়ীর ছিল বাতিকের ধাত, তাঁর ব্যবহারটা বিচার-বিবেচনার প্রশস্ত পথ ধরে চলতে পারত না। বেহিসাবি মেজাজের অসংযত ঝাপটায় সংসারকে তিনি যখন-তখন ক্ষুব্ধ করে তুলতেন, শাসন করতেন অন্যায় করে, সন্দেহ করতেন অকারণে। মেয়ে যখন অপরাধ অস্বীকার করত, ফস করে বলতেন, মিথ্যে কথা বলছিস। অথচ অবিমিশ্র সত্যকথা বলা মেয়ের একটা ব্যসন বললেই হয়। এজন্যেই সে শাস্তি পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। সকল রকম অবিচারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা তার স্বভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে। তার মার কাছে মনে হয়েছে, এইটেই স্ত্রীধর্মনীতির বিরুদ্ধ।

একটা কথা সে বাল্যকাল থেকে বুঝেছে যে, দুর্বলতা অত্যাচারের প্রধান বাহন। ওদের পরিবারে যে-সকল আশ্রিত অন্নজীবী ছিল, যারা পরের অনুগ্রহ-নিগ্রহের সংকীর্ণ বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রের মধ্যে নিঃসহায়ভাবে আবদ্ধ তারাই কলুষিত করেছে ওদের পরিবারের আবহাওয়াকে, তারাই ওর মায়ের অন্ধ প্রভুত্বচর্চাকে বাধাবিহীন করে তুলেছে। এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপেই ওর মনে অল্পবয়স থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এত দুর্দাম হয়ে উঠেছিল।

এলার বাপ নরেশ দাশগুপ্ত সাইকলজিতে বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। তীক্ষ্ন তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি, অধ্যাপনায় তিনি বিশেষভাবে যশস্বী। প্রাদেশিক প্রাইভেট কলেজে তিনি স্থান নিয়েছেন যেহেতু সেই প্রদেশে তাঁর জন্ম, সাংসারিক উন্নতির দিকে তাঁর লোভ কম, সে সম্বন্ধে দক্ষতাও সামান্য। ভুল ক'রে লোককে বিশ্বাস করা ও বিশ্বাস ক'রে নিজের ক্ষতি করা বারবারকার অভিজ্ঞতাতেও তাঁর শোধন হয় নি। ঠকিয়ে কিংবা অনায়াসে যারা উপকার আদায় করে তাদের কৃতঘ্নতা সবচেয়ে অকরুণ। যখন সেটা প্রকাশ পেত সেটাকে মনস্তত্ত্বের বিশেষ তথ্য বলে মানুষটি অনায়াসে স্বীকার করে নিতেন, মনে বা মুখে নালিশ করতেন না। বিষয়বুদ্ধির ত্রুটি নিয়ে স্ত্রীর কাছে কখনো তিনি ক্ষমা পান নি, খোঁটা খেয়েছেন প্রতিদিন। নালিশের কারণ অতীতকালবর্তী হলেও তাঁর স্ত্রী কখনো ভুলতে পারতেন না, যখন-তখন তীক্ষ্ন খোঁচায় উসকিয়ে দিয়ে তার দাহকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া অসাধ্য করে তুলতেন। বিশ্বাসপরায়ণ ঔদার্যগুণেই তার বাপকে কেবলই ঠকতে ও দুঃখ পেতে দেখে বাপের উপর এলার ছিল সদাব্যথিত স্নেহ—যেমন সকরুণ স্নেহ মায়ের থাকে অবুঝ বালকের 'পরে। সবচেয়ে তাকে আঘাত করত যখন মায়ের কলহের ভাষায় তীব্র ইঙ্গিত থাকত যে, বুদ্ধিবিবেচনায় তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এলা নানা উপলক্ষে মায়ের কাছে তার বাবার অসম্মান দেখতে পেয়েছে, তা নিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে চোখের জলে রাত্রে তার বালিশ গেছে ভিজে। এরকম অতিমাত্র ধৈর্য অন্যায় ব'লে এলা অনেক সময় তার বাবাকে মনে মনে অপরাধী না করে থাকতে পারে নি।

অত্যন্ত পীড়িত হয়ে একদিন এলা বাবাকে বলেছিল, 'এরকম অন্যায় চুপ করে সহ্য করাই অন্যায়।'

নরেশ বললেন, 'স্বভাবের প্রতিবাদ করাও যা আর তপ্ত লোহায় হাত বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে যাওয়াও তাই, তাতে বীরত্ব থাকতে পারে কিন্তু আরাম নেই।'

'চুপ করে থাকাতে আরাম আরো কম'—বলে এলা দ্রুত চলে গেল।

এদিকে সংসারে এলা দেখতে পায়, যারা মায়ের মন জুগিয়ে চলবার কৌশল জানে তাদের চক্রান্তে নিষ্ঠুর অন্যায় ঘটে অপরাধহীনের প্রতি। এলা সইতে পারে না, উত্তেজিত হয়ে সত্য প্রমাণ উপস্থিত করে বিচারকর্ত্রীর সামনে। কিন্তু কর্তৃত্বের অহমিকার কাছে অকাট্য যুক্তিই দুঃসহ স্পর্ধা। অনুকূল ঝোড়ো হাওয়ার মতো তাতে বিচারের নৌকো এগিয়ে দেয় না, নৌকো দেয় কাত করে।

এই পরিবারে আরো একটি উপসর্গ ছিল যা এলার মনকে নিয়ত আঘাত করেছে। সে তার মায়ের শুচিবায়ু। একদিন কোনো মুসলমান অভ্যাগতকে বসবার জন্যে এলা মাদুর পেতে দিয়েছিল— সে মাদুর মা ফেলে দিলেন, গালচে দিলে দোষ হত না। এলার তার্কিক মন, তর্ক না করে থাকতে পারে না। বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা এইসব ছোঁয়াছুঁয়ি নাওয়াখাওয়া নিয়ে কটকেনা মেয়েদেরই কেন এত পেয়ে বসে? এতে হৃদয়ের তো স্থান নেই, বরং বিরুদ্ধতা আছে; এ তো কেবল যন্ত্রের মতো অন্ধভাবে মেনে চলা।' সাইকলজিস্ট বাবা বললেন, 'মেয়েদের হাজার বছরের হাতকড়ি-লাগানো মন; তারা মানবে, প্রশ্ন করবে না— এইটেতেই সমাজ-মনিবের কাছে বকশিশ পেয়েছে, সেইজন্যে মানাটা যত বেশি অন্ধ হয় তার দাম তাদের কাছে তত বড়ো হয়ে ওঠে। মেয়েলি পুরুষদেরও এই দশা।' আচারের নিরর্থকতা সম্বন্ধে এলা বারবার মাকে প্রশ্ন ক'রে থাকতে পারে নি, বারবার তার উত্তর পেয়েছে ভর্ৎসনায়। নিয়ত এই ধাক্কায় এলার মন অবাধ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

নরেশ দেখলেন পারিবারিক এইসব দ্বন্দ্বে মেয়ের শরীর খারাপ হয়ে উঠছে, সেটা তাঁকে অত্যন্ত বাজল। এমন সময় একদিন এলা একটা বিশেষ অবিচারে কঠোর-ভাবে আহত হয়ে নরেশের কাছে এসে জানালো, 'বাবা, আমাকে কলকাতায় বোর্ডিঙে পাঠাও।' প্রস্তাবটা তাদের দুইজনের পক্ষেই দুঃখকর, কিন্তু বাপ অবস্থা বুঝলেন, এবং মায়াময়ীর দিক থেকে প্রতিকূল ঝঞ্ঝাঘাতের মধ্যেও এলাকে পাঠিয়ে দিলেন দূরে। আপন নিষ্করুণ সংসারে নিমগ্ন হয়ে রইলেন অধ্যয়ন-অধ্যাপনায়।

মা বললেন, 'শহরে পাঠিয়ে মেয়েকে মেমসাহেব বানাতে চাও তো বানাও কিন্তু ঐ তোমার আদুরে মেয়েকে প্রাণান্ত ভুগতে হবে শ্বশুরঘর করবার দিনে। তখন আমাকে দোষ দিয়ো না।' মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ দেখে এই আশঙ্কা তার মা বারবার প্রকাশ করেছেন। এলা তার ভাবী শাশুড়ির হাড় জ্বালাতন করবে সেই সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনে সেই কাল্পনিক গৃহিণীর প্রতি তাঁর অনুকম্পা মুখর হয়ে উঠত। এর থেকে মেয়ের মনে ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, বিয়ের জন্যে মেয়েদের প্রস্তুত হতে হয় আত্মসম্মানকে পঙ্গু ক'রে, ন্যায়-অন্যায়বোধকে অসাড় করে দিয়ে।

এলা যখন ম্যাট্রিক পার হয়ে কলেজে প্রবেশ করেছে তখন মায়ের মৃত্যু হল। নরেশ মাঝে মাঝে বিয়ের প্রস্তাবে মেয়েকে রাজি করতে চেষ্টা করেছেন। এলা অপূর্ব সুন্দরী, পাত্রের তরফে প্রার্থীর অভাব ছিল না, কিন্তু বিবাহের প্রতি বিমুখতা তার সংস্কারগত। মেয়ে পরীক্ষাগুলো পাস করলে, তাকে অবিবাহিত রেখেই বাপ গেলেন মারা।

সুরেশ ছিল তাঁর কনিষ্ঠ ভাই। নরেশ এই ভাইকে মানুষ করেছেন, শেষ পর্যন্ত পড়িয়েছেন খরচ দিয়ে। দু-বছরের মতো তাকে বিলেতে পাঠিয়ে স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছিত এবং মহাজনের কাছে ঋণী হয়েছেন। সুরেশ এখন ডাকবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কর্ম উপলক্ষে ঘুরতে হয় নানা প্রদেশে। তাঁরই উপর পড়ল এলার ভার। একান্ত যত্ন করেই ভার নিলেন।

সুরেশের স্ত্রীর নাম মাধবী। তিনি যে-পরিবারের মেয়ে সে-পরিবারে স্ত্রীলোক-দের পরিমিত পড়াশুনোই ছিল প্রচলিত; তার পরিমাণ মাঝারি মাপের চেয়ে কম বৈ বেশি নয়। স্বামী বিলেত থেকে ফিরে এসে উচ্চপদ নিয়ে দূরে দূরে যখন ঘুরতেন তখন তাঁকে বাইরের নানা লোকের সঙ্গে সামাজিকতা করতে হত। কিছুদিন অভ্যাসের পরে মাধবী নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে বিজাতীয় লৌকিকতা পালন করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। এমন-কি, গোরাদের ক্লাবেও পঙ্গু ইংরেজি ভাষাকে সকারণ ও অকারণ হাসির দ্বারা পূরণ করে কাজ চালিয়ে আসতে পারতেন।

এমন সময় সুরেশ কোনো প্রদেশের বড়ো শহরে যখন আছেন এলা এল তাঁর ঘরে; রূপে গুণে বিদ্যায় কাকার মনে গর্ব জাগিয়ে তুললে। ওঁর উপরিওয়ালা বা সহকর্মী এবং দেশী ও বিলিতি আলাপী-পরিচিতদের কাছে নানা উপলক্ষে এলাকে প্রকাশিত করবার জন্যে তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এলার স্ত্রীবুদ্ধিতে বুঝতে বাকি রইল না যে, এর ফল ভালো হচ্ছে না। মাধবী মিথ্যা আরামের ভান করে ক্ষণে ক্ষণে বলতে লাগলেন, 'বাঁচা গেল—বিলিতি কায়দার সামাজিকতার দায় আমার ঘাড়ে চাপানো কেন বাপু। আমার না আছে বিদ্যে, না আছে বুদ্ধি।' ভাবগতিক দেখে এলা নিজের চারি দিকে প্রায় একটা জেনানা খাড়া করে তুললে। সুরেশের মেয়ে সুরমার পড়াবার ভার সে অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে নিলে। একটা থীসিস লিখতে লাগিয়ে দিলে তার বাকি সময়টুকু। বিষয়টা বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা। এই নিয়ে সুরেশ মহা উৎসাহিত। এই সংবাদটা চার দিকে প্রচার করে দিলেন। মাধবী মুখ বাঁকা করে বললেন, 'বাড়াবাড়ি।'

স্বামীকে বললেন, 'এলার কাছে ফস করে মেয়েকে পড়তে দিলে! কেন, অধর মাস্টার কী দোষ করেছে? যাই বল-না আমি কিন্তু—'

সুরেশ অবাক হয়ে বললেন, 'কী বল তুমি! এলার সঙ্গে অধরের তুলনা?'

'দুটো নোট বই মুখস্থ করে পাস করলেই বিদ্যে হয় না'—বলে ঘাড় বেঁকিয়ে গৃহিণী ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

একটা কথা স্বামীকে বলতেও তাঁর মুখে বাধে—'সুরমার বয়স তেরো পেরোতে চলল, আজ বাদে কাল পাত্র খুঁজতে দেশ ঝেঁটিয়ে বেড়াতে হবে, তখন এলা সুরমার কাছে থাকলে—ছেলেগুলোর চোখে যে ফ্যাকাসে কটা রঙের নেশা—ওরা কি জানে কাকে বলে সুন্দর?' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন আর ভাবেন, এসব কথা কর্তাকে জানিয়ে ফল নেই, পুরুষরা যে সংসার-কানা।

যত শীঘ্র হয় এলার বিয়ে হয়ে যাক এই চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন গৃহিণী। বেশি চেষ্টা করতে হয় না, ভালো ভালো পাত্র আপনি এসে জোটে—এমন সব পাত্র, সুরমার সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ ঘটাবার জন্য মাধবী লুব্ধ হয়ে ওঠেন। অথচ এলা তাদের বারে বারে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেয়।

ভাইঝির একগুঁয়ে অবিবেচনায় উদ্‌বিগ্ন হলেন সুরেশ, কাকি হলেন অত্যন্ত অসহিষ্ণু। তিনি জানেন সৎপাত্রকে উপেক্ষা করা সমর্থবয়সের বাঙালি মেয়ের পক্ষে অপরাধ। নানারকম বয়সোচিত দুর্যোগের আশঙ্কা করতে লাগলেন, এবং দায়িত্ব-বোধে অভিভূত হল তাঁর অন্তঃকরণ। এলা স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে, সে তার কাকার স্নেহের সঙ্গে কাকার সংসারের দ্বন্দ্ব ঘটাতে বসেছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রনাথ এলেন সেই শহরে। দেশের ছাত্রেরা তাঁকে মানত রাজ-চক্রবর্তীর মতো। অসাধারণ তাঁর তেজ, আর বিদ্যার খ্যাতিও প্রভূত। একদিন সুরেশের ওখানে তাঁর নিমন্ত্রণ। সেদিন কোনো এক সুযোগে এলা অপরিচয়সত্ত্বেও

অসংকোচে তাঁর কাছে এসে বললে, 'আমাকে আপনার কোনো একটা কাজ দিতে পারেন না?'

আজকালকার দিনে এরকম আবেদন বিশেষ আশ্চর্যের নয় কিন্তু তবু মেয়েটির দীপ্তি দেখে চমক লাগল ইন্দ্রনাথের। তিনি বললেন, 'কলকাতায় সম্প্রতি নারায়ণী হাই স্কুল মেয়েদের জন্যে খোলা হয়েছে। তোমাকে তার কর্ত্রীপদ দিতে পারি, প্রস্তুত আছ?'

'প্রস্তুত আছি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন।'

ইন্দ্রনাথ এলার মুখের দিকে তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টি রেখে বললেন, 'আমি লোক চিনি। তোমাকে বিশ্বাস করতে আমার মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় নি। তোমাকে দেখবা-মাত্রই মনে হয়েছে, তুমি নবযুগের দূতী, নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে!'

হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মুখে এমন কথা শুনে এলার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল।

সে বললে, 'আপনার কথায় আমার ভয় হয়। ভুল করে আমাকে বাড়াবেন না। আপনার ধারণার যোগ্য হবার জন্যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করতে গেলে ভেঙে পড়ব। আমার শক্তির সীমার মধ্যে যতটা পারি বাঁচিয়ে চলব আপনার আদর্শ, কিন্তু ভান করতে পারব না।'

ইন্দ্রনাথ বললেন, 'সংসারের বন্ধনে কোনোদিন বদ্ধ হবে না এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তুমি সমাজের নও, তুমি দেশের।'

এলা মাথা তুলে বললে, 'এই প্রতিজ্ঞাই আমার।'

কাকা গমনোদ্যত এলাকে বললেন, 'তোকে আর কোনোদিন বিয়ের কথা বলব না। তুই আমার কাছেই থাক্। এখানেই পাড়ার মেয়েদের পড়াবার ভার নিয়ে একটা ছোটোখাটো ক্লাস খুললে দোষ কী।'

কাকি স্নেহার্দ্র স্বামীর অবিবেচনায় বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ওর বয়স হয়েছে, ও নিজের দায় নিজেই নিতে চায়, সে ভালোই তো। তুমি কেন বাধা দিতে যাও মাঝের থেকে। তুমি যা-ই মনে কর না কেন, আমি বলে রাখছি ওর ভাবনা আমি ভাবতে পারব না।'

এলা খুব জোর করেই বললে, 'আমি কাজ পেয়েছি, কাজ করতেই যাব।'

এলা কাজ করতেই গেল।

এই ভূমিকার পরে পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হল, এখন কাহিনী অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

দৃশ্য—চায়ের দোকান। তারই একপাশে একটি ছোটো ঘর। সেই ঘরে বিক্রির জন্যে সাজানো কিছু স্কুলকালেজপাঠ্য বই, অনেকগুলি সেকেন্ডহ্যান্ড। কিছু আছে য়ুরোপীয় আধুনিক গল্প-নাটকের ইংরেজি তর্জমা। সেগুলো অল্পবিত্ত ছেলেরা পাত উলটিয়ে পড়ে চলে যায়, দোকানদার আপত্তি করে না। স্বত্বাধিকারী কানাই গুপ্ত, পুলিসের পেনশনভোগী সাবেক সাব-ইনস্পেক্টর।

সামনে সদর রাস্তা, বাঁ পাশ দিয়ে গেছে গলি। যারা নিভৃতে চা খেতে চায় তাদের জন্যে ঘরের এক অংশ ছিন্নপ্রায় চটের পর্দা দিয়ে ভাগ করা। আজ সেইদিকটাতে একটা বিশেষ আয়োজনের লক্ষণ। যথেষ্ট পরিমাণ টুলচৌকির অসদ্ভাব পূরণ করেছে দার্জিলিং চা কোম্পানির মার্কা-মারা প্যাকবাক্স। চায়ের পাত্রেও অগত্যা বৈসাদৃশ্য, তাদের কতকগুলি নীলরঙের এনামেলের, কতকগুলি সাদা চীনামাটির। টেবিলে হাতলভাঙা দুধের জগে ফুলের তোড়া। বেলা প্রায় তিনটে। ছেলেরা এলালতাকে নিমন্ত্রণের সময় নির্দেশ করে দিয়েছিল ঠিক আড়াইটায়। বলেছিল, এক মিনিট পিছিয়ে এলে চলবে না। অসময়ে নিমন্ত্রণ, যেহেতু ঐ সময়টাতেই দোকান শূন্য থাকে। চা-পিপাসুর ভিড় লাগে সাড়ে চারটার পর থেকে। এলা ঠিক সময়েই উপস্থিত। কোথাও ছেলেদের একজনেরও দেখা নেই। একলা বসে তাই ভাবছিল—তবে কি শুনতে তারিখের ভুল হয়েছে। এমন সময় ইন্দ্রনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখে চমকে উঠল। এ জায়গায় তাঁকে কোনোমতেই আশা করা যায় না।

ইন্দ্রনাথ য়ুরোপে কাটিয়েছেন অনেক দিন; বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন সায়ান্সে। যথেষ্ট উঁচু-পদে প্রবেশের অধিকার তাঁর ছিল; য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের প্রশংসাপত্র ছিল উদার ভাষায়। য়ুরোপে থাকতে ভারতীয় কোনো একজন পোলিটিক্যাল বদনামির সঙ্গে তাঁর কদাচিৎ দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছিল, দেশে ফিরে এলে তারই লাঞ্ছনা তাঁকে সকল কর্মে বাধা দিতে লাগল। অবশেষে ইংলন্ডের খ্যাতনামা কোনো বিজ্ঞান-আচার্যের বিশেষ সুপারিশে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছিলেন, কিন্তু সে কাজ অযোগ্য অধিনায়কের অধীনে। অযোগ্যতার সঙ্গে ঈর্ষা থাকে প্রখর, তাই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার চেষ্টা উপরওয়ালার হাত থেকে ব্যাঘাত পেতে লাগল পদে পদে। শেষে এমন জায়গায় তাঁকে বদলি হতে হল যেখানে ল্যাবরেটরি নেই। বুঝতে পারলেন এদেশে তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ অধ্যবসায়ের পথ অবরুদ্ধ। একই প্রদক্ষিণপথে অধ্যাপনার চিরাভ্যস্ত চাকা ঘুরিয়ে অবশেষে কিঞ্চিৎ পেনশন ভোগ করে জীবলীলা সংবরণ করবেন, নিজের এই দুর্গতির আশঙ্কা তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারলেন না। তিনি নিশ্চিত জানতেন অন্য যে-কোনো দেশে সম্মানলাভের শক্তি তাঁর প্রচুর ছিল।

একদা ইন্দ্রনাথ জার্মান ফরাসি ভাষা শেখাবার একটা প্রাইভেট ক্লাস খুললেন, সেই সঙ্গে ভার নিলেন বটানি ও জিয়লজিতে কালেজের ছাত্রদের সাহায্য করবার। ক্রমে এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের গোপন তলদেশ বেয়ে একটা অপ্রকাশ্য সাধনার জটিল শিকড় জেলখানার প্রাঙ্গণের মাঝখান দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বহুদূরে।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এলা, তুমি যে এখানে?'

এলা বললে, 'আপনি আমার বাড়িতে ওদের যাওয়া নিষেধ করেছেন সেইজন্যে ছেলেরা এখানেই আমাকে ডেকেছে।'

'সে খবর আগেই পেয়েছি। পেয়েই জরুর তাদের অন্যত্র কাজে লাগিয়ে দিলুম। ওদের সকলের হয়ে অ্যাপলজি করতে এসেছি। বিলও শোধ করে দেব।'

'কেন আপনি আমার নিমন্ত্রণ ভেঙে দিলেন?'

'ছেলেদের সঙ্গে তোমার সহৃদয়তার সম্পর্ক আছে সেই কথাটা চাপা দেবার জন্য। কাল দেখতে পাবে তোমার নাম করে একটা প্রবন্ধ কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'আপনি লিখেছেন? আপনার কলমে বেনামি চলে না; লোকে ওটাকে অকৃত্রিম বলে বিশ্বাস করবে না।'

'বাঁ হাত দিয়ে কাঁচা করে লেখা; বুদ্ধির পরিচয় নেই, সদুপদেশ আছে।'

'কিরকম?'

'তুমি লিখছ—ছেলেরা অকালবোধনে দেশকে মারতে বসেছে। বঙ্গনারীদের কাছে তোমার সকরুণ আপিল এই যে, তারা যেন লক্ষ্মীছাড়াদের মাথা ঠান্ডা করে। বলেছ—দূর থেকে ভর্ৎসনা করলে কানে পৌঁছোবে না। ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়তে হবে, যেখানে ওদের নেশার আড্ডা। শাসনকর্তাদের সন্দেহ হতে পারে, তা হোক। বলেছ—তোমরা মায়ের জাত; ওদের শাস্তি নিজে নিয়েও যদি ওদের বাঁচাতে পার, মরণ সার্থক হবে। আজকাল সর্বদাই বলে থাক—তোমরা মায়ের জাত, ঐ কথাটাকে লবণাম্বুতে ভিজিয়ে লেখার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। মাতৃবৎসল পাঠকের চোখে জল আসবে। যদি তুমি পুরুষ হতে, এর পরে রায়বাহাদুর পদবী পাওয়া অসম্ভব হত না।'

'আপনি যা লিখেছেন সেটা যে একেবারেই আমার কথা হতে পারে না তা আমি বলব না। এই সর্বনেশে ছেলেগুলোকে আমি ভালোবাসি—অমন ছেলে আছে কোথায়! একদিন ওদের সঙ্গে কালেজে পড়েছি। প্রথম প্রথম ওরা আমার নামে বোর্ডে লিখেছে যা-তা—পিছন থেকে ছোটো এলাচ বলে চেঁচিয়ে ডেকেই ভালোমানুষের মতো আকাশের দিকে তাকিয়েছে। ফোর্থ ইয়ারে পড়ত আমার বন্ধু ইন্দ্রাণী—তাকে বলত বড়ো এলাচ, সে-বেচারার বহরে কিছু বাহুল্য ছিল, রঙটাও উজ্জ্বল ছিল না। এইসব ছোটোখাটো উৎপাত নিয়ে অনেক মেয়ে রাগারাগি করত, আমি কিন্তু ছেলেদের পক্ষ নিয়েছি। আমি জানতুম, আমরা ওদের চোখে অনভ্যস্ত তাই ওদের ব্যবহারটা হয়ে পড়ে এলোমেলো—কদর্যও হয় কখনো কখনো, কিন্তু সেটা ওদের স্বাভাবিক নয়। যখন অভ্যেস হয়ে গেল, সুর আপনি এল সহজ হয়ে। ছোটো এলাচ হল এলাদি। মাঝে মাঝে কারো সুরে মধুর রস লেগেছে—কেনই বা লাগবে না? আমি কখনো ভয় করি নি তা নিয়ে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার করা খুবই সহজ, মেয়েরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে যদি ওদের মৃগয়া করবার দিকে ঝোঁক না দেয়। তার পরে একে একে দেখলুম ওদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো যারা, যাদের ইতরতা নেই, মেয়েদের 'পরে সম্মান যাদের পুরুষের যোগ্য—'

'অর্থাৎ কলকাতার রসিক ছেলেদের মতো যাদের রস গাঁজিয়ে-ওঠা নয়—'

'হাঁ তারাই, ছুটল মৃত্যুদূতের পিছন পিছন মরিয়া হয়ে, তারা প্রায় সবাই আমারই মতো বাঙাল। ওরাই যদি মরতে ছোটে আমি চাই নে ঘরের কোণে বেঁচে থাকতে। কিন্তু দেখুন মাস্টার-মশায়, সত্যি কথা বলব। যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হয়ে নেশা হয়ে উঠছে। আমাদের কাজের পদ্ধতি চলেছে যেন নিজের বেতালা ঝোঁকে বিচারশক্তির বাইরে। ভালো লাগছে না। অমন সব ছেলেদের কোন্ অন্ধশক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে! আমার বুক ফেটে যায়।'

'বৎসে, এই যে ধিক্‌কার এটাই কুরুক্ষেত্রের উপক্রমণিকা। অর্জুনের মনেও ক্ষোভ লেগেছিল। ডাক্তারি শেখবার গোড়ায় মড়া কাটবার সময় ঘৃণায় প্রায় মূর্ছা গিয়েছিলুম। ঐ ঘৃণাটাই ঘৃণ্য। শক্তির গোড়ায় নিষ্ঠুরের সাধনা, শেষে হয়তো ক্ষমা। তোমরা বলে থাক—মেয়েরা মায়ের জাত, কথাটা গৌরবের নয়। মা তো প্রকৃতির হাতে স্বতই বানানো। জন্তুজানোয়াররাও বাদ যায় না। তার চেয়ে বড়ো কথা তোমরা শক্তিরূপিণী, এইটেকেই প্রমাণ করতে হবে দয়ামায়ার জলাজমি পেরিয়ে গিয়ে শক্ত ডাঙায়। শক্তি দাও, পুরুষকে শক্তি দাও।'

'এ সব মস্ত কথা বলে আপনি ভোলাচ্ছেন আমাদের। আমরা আসলে যা, তার চেয়ে দাবি করছেন অনেক বেশি। এতটা সইবে না।'

'দাবির জোরেই দাবি সত্য হয়। তোমাদের আমরা যা বিশ্বাস করতে থাকব তোমরা তাই হয়ে উঠবে। তোমরাও তেমনি করে আমাদের বিশ্বাস করো যাতে আমাদের সাধনা সত্য হয়।'

'আপনাকে কথা কওয়াতে ভালোবাসি কিন্তু এখন সে নয়। আমি নিজে কিছু বলতে ইচ্ছে করি।'

'আচ্ছা। তা হলে এখানে নয়, চলো ঐ পিছনের ঘরটাতে।'

পর্দাটানা আধা অন্ধকার ঘরে গেল ওরা। সেখানে একখানা পুরোনো টেবিল, তার দুধারে দুখানা বেঞ্চ, দেয়ালে একটা বড়ো সাইজের ভারতবর্ষের ম্যাপ।

'আপনি একটা অন্যায় করছেন—এ কথা না বলে থাকতে পারলুম না।'

ইন্দ্রনাথকে এমন করে বলতে একমাত্র এলাই পারে। তবু তার পক্ষেও বলা সহজ নয়, তাই অস্বাভাবিক জোর লাগল গলায়।

ইন্দ্রনাথকে ভালো দেখতে বললে সবটা বলা হয় না। ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণ-শক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। মুখের ভাবে মাজাঘষা ভদ্রতা, শান-দেওয়া ছুরির মতো। কড়া কথা বলতে বাধে না কিন্তু হেসে বলে; গলার সুর রাগের বেগেও চড়ে না, রাগ প্রকাশ পায় হাসিতে। যতটুকু পরিচ্ছন্নতায় মর্যাদা রক্ষা হয় ততটুকু কখনো ভোলে না এবং অতিক্রমও করে না। চুল অনতিপরিমাণে ছাঁটা, যত্ন না করলেও এলোমেলো হবার আশঙ্কা নেই। মুখের রঙ বাদামি, লালের আভাস দেওয়া। ভুরুর উপর দুইপাশে প্রশস্ত টানা কপাল, দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্নতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব। অত্যন্ত দুঃসাধ্য রকমের দাবি সে অনায়াসে করতে পারে, জানে সেই দাবি সহজে অগ্রাহ্য হবে না। কেউ জানে তার বুদ্ধি অসামান্য, কেউ জানে তার শক্তি অলৌকিক। তার 'পরে কারো আছে সীমাহীন শ্রদ্ধা, কারো আছে অকারণ ভয়।

ইন্দ্রনাথ হাসিমুখে বললে, 'কী অন্যায়?'

'আপনি উমাকে বিয়ে করতে হুকুম করেছেন, সে তো বিয়ে করতে চায় না।'

'কে বললে চায় না?'

'সে নিজেই বলে।'

'হয়তো সে নিজে ঠিক জানে না, কিংবা নিজে ঠিক বলে না।'

'সে আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিয়ে করবে না।'

'তখন সেটা ছিল সত্য, এখন সেটা সত্য নেই। মুখের কথায় সত্য সৃষ্টি করা যায় না। প্রতিজ্ঞা উমা আপনিই ভাঙত, আমি ভাঙালুম, ওর অপরাধ বাঁচিয়ে দিলুম।'

'প্রতিজ্ঞা রাখা না-রাখার দায়িত্ব ওরই, নাহয় ভাঙত, নাহয় করত অপরাধ।'

'ভাঙতে ভাঙতে আশেপাশে ভাঙচুর করত বিস্তর, লোকসান হত আমাদের সকলেরই।'

'ও কিন্তু বড়ো কান্নাকাটি করছে।'

'তা হলে কান্নাকাটির দিন আর বাড়তে দেব না—কাল-পরশুর মধ্যেই বিয়ে চুকিয়ে দেওয়া যাবে।'

'কাল-পরশুর পরেও তো ওর সমস্ত জীবনটাই আছে।'

'মেয়েদের বিয়ের আগেকার কান্না প্রভাতে মেঘডম্বরং।'

'আপনি নিষ্ঠুর!'

'কেননা, মানুষকে যে-বিধাতা ভালোবাসেন তিনি নিষ্ঠুর, জন্তুকেই তিনি প্রশ্রয় দেন।'

'আপনি জানেন উমা সুকুমারকে ভালোবাসে।'

'সেইজন্যেই ওকে তফাত করতে চাই।'

'ভালোবাসার শাস্তি?'

'ভালোবাসার শাস্তির কোনো মানে নেই। তা হলে বসন্ত রোগ হয়েছে বলেও শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু গুটি বেরোলে ঘর থেকে বের করে রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোই শ্রেয়।'

'সুকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো হয়।'

'সুকুমার তো কোনো অপরাধ করে নি। ওর মতো ছেলে আমাদের মধ্যে কজন আছে?'

'ও যদি নিজেই উমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়?'

'অসম্ভব নয়। সেইজন্যেই এত তাড়া। ওর মতো উঁচুদরের পুরুষের মনে বিভ্রম ঘটানো মেয়েদের পক্ষে সহজ; সৌজন্যকে প্রশ্রয় বলে সুকুমারের কাছে প্রমাণ করা দুই-এক ফোঁটা চোখের জলেই সম্ভব হতে পারে। রাগ করছ শুনে?'

'রাগ করব কেন? মেয়েরা নিঃশব্দ নৈপুণ্যে প্রশ্রয় ঘটিয়েছে আর তার দায় মানতে হয়েছে পুরুষকে, আমার অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনার অভাব নেই। সময় হয়েছে সত্যের অনুরোধে ন্যায়-বিচার করবার। আমি সেটা করে থাকি বলেই মেয়েরা আমাকে দেখতে পারে না। যার সঙ্গে উমার বিয়ের হুকুম সেই ভোগীলালের মত কী?'

'সেই নিষ্কণ্টক ভালোমানুষের মতামত বলে কোনো উপসর্গ নেই। বাঙালির মেয়েমাত্রকেই সে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি বলে জানে। ওরকম মুগ্ধ স্বভাবের ছেলেকে দলের বাইরের আঙিনায় সরিয়ে ফেলা দরকার। জঞ্জাল ফেলবার সবচেয়ে ভালো ঝুড়ি বিবাহ।'

'এই সমস্ত উৎপাতের আশঙ্কা সত্ত্বেও আপনি মেয়ে-পুরুষকে একত্র করেছেন কেন?'

'শরীরটাতে ছাই দিয়েছে যে সন্ন্যাসী, আর প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে-ভস্মকুণ্ড সেই ক্লীবদের নিয়ে কাজ হবে না বলে। যখন দেখব আমাদের দলের কোনো অগ্নি-উপাসক অসাবধানে নিজের মধ্যেই অগ্নিকাণ্ড করতে বসেছে— দেব তাদের সরিয়ে। আমাদের অগ্নিকাণ্ড দেশ জুড়ে, নেবানো মন দিয়ে তা হবে না, আর হবে না তাদের দিয়ে আগুন যারা চাপতে জানে না।'

গম্ভীর মুখে এলা বসে রইল। কিছুক্ষণ বাদে চোখ নামিয়ে বললে, 'আমাকে আপনি তবে ছেড়ে দিন।'

'এতখানি ক্ষতি করতে বল কেন?'

'আপনি জানেন না।'

'জানি নে কে বললে? দেখা গেল একদিন তোমার খদ্দরে একটুখানি রঙ লেগেছে। জানা গেল অন্তরে অরুণোদয়। বুঝতে পারি একটা কোন্ পায়ের শব্দের প্রত্যাশায় তোমার কান পাতা থাকে। গেল শুক্রবারে যখন এলুম তোমার ঘরে, তুমি ভেবেছিলে আর-কেউ বা। দেখলুম মনটা ঠিক করে নিতে কিছু সময় লাগল। লজ্জা কোরো না তুমি, এতে অসংগত কিছুই নেই।'

কর্ণমূল লাল করে চুপ করে রইল এলা।

ইন্দ্রনাথ বললে, 'তুমি একজনকে ভালোবেসেছ, এই তো? তোমার মন তো জড় পাষাণে গড়া নয়। যাকে ভালোবাস তাকেও জানি। অনুশোচনার কারণ কিছুই দেখছি নে।'

'আপনি বলেছিলেন একমনা হয়ে কাজ করতে হবে। সকল অবস্থায় তা সম্ভব না হতে পারে।'

'সকলের পক্ষে নয়। কিন্তু ভালোবাসার গুরুভারে তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি তেমন মেয়ে নও।'

'কিন্তু—'

'এর মধ্যে কিন্তু কিছুই নেই— তুমি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না।'

'আমি তো আপনাদের কোনো কাজে লাগি নে, সে আপনি জানেন।'

'তোমার কাছ থেকে কাজ চাই নে, কাজের কথা সব জানাইও নে তোমাকে। কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনেয় কাজ করাতে গেলে পুরো কাজ পাব না। আমরা কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগী নই। যেখানে কাঞ্চনের প্রভাব সেখানে কাঞ্চনকে অবজ্ঞা করি নে, যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিনীকে বেদীতে বসিয়েছি।'

'আপনার কাছে মিথ্যে বলব না, বুঝতে পারছি আমার ভালোবাসা দিনে দিনেই আমার অন্য সকল ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

'কোনো ভয় নেই, খুব ভালোবাসো। শুধু মা মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে, তারা চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনারীশ্বর— মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি। এই মিলনকে নিস্তেজ কোরো না সংসার-পিঁজরেয় বেঁধে।'

'কিন্তু তবে আপনি যে ঐ উমা—'

'উমা! কালু!— ভালোবাসার শুষ্ক রুদ্ররূপ ওরা সইতে পারবে কী করে? যে দাম্পত্যের ঘাটে ওদের সকল সাধনার অন্ত্যেষ্টিসৎকার, সময় থাকতে সেখানেই দুজনকে গঙ্গাযাত্রায় পাঠাচ্ছি।— সে কথা থাক্। শোনা গেল তোমার ঘরে ডাকাত ঢুকেছিল পরশু রাত্রে।'

'হাঁ, ঢুকেছিল।'

'তোমার জুজুৎসু শিক্ষায় ফল পেয়েছিলে কি?'

'আমার বিশ্বাস ডাকাতের কব্জি দিয়েছি ভেঙে।'

'মনটার ভিতর আহা উহু করে ওঠে নি?'

'করত কিন্তু ভয় ছিল ও আমাকে অপমান করবে। ও যদি যন্ত্রণায় হার মানত আমি শেষ পর্যন্ত মোচড় দিতে পারতুম না।'

'চিনতে পেরেছিলে সে কে?'

'অন্ধকারে দেখতে পাই নি।'

'যদি পেতে তা হলে জানতে, সে অনাদি।'

'আহা সে কী কথা। আমাদের অনাদি! সে যে ছেলেমানুষ।'

'আমিই তাকে পাঠিয়েছিলুম।'

'আপনিই! কেন এমন কাজ করলেন?'

'তোমারও পরীক্ষা হল, তারও।'

'কী নিষ্ঠুর।'

'ছিলুম নীচের ঘরে, তখনি হাড় ঠিক করে দিয়েছি। তুমি নিজেকে মনে কর ব্যথাকাতর। বোঝাতে চেয়েছিলুম বিপদের মুখে কাতরতা স্বাভাবিক নয়। সেদিন তোমাকে বললুম, ছাগল-ছানাটাকে পিস্তল করে মারতে। তুমি বললে, কিছুতেই পারবে না। তোমার পিসতুত বোন বাহাদুরি করে মারলে গুলি। যখন দেখলে জন্তুটা পা ভেঙে পড়ে গেল, কাঠিন্যের ভান করে হা হা করে হেসে উঠল। হিস্টিরিয়ার হাসি, সেদিন রাত্তিরে তার ঘুম হয় নি। কিন্তু তোমাকে যদি বাঘে খেতে আসত আর তুমি যদি ভীতু না হতে তা হলে তখনি তাকে মারতে, দ্বিধা করতে না। আমরা সেই বাঘটাকে মনের সামনে স্পষ্ট দেখছি, দয়ামায়া দিয়েছি বিসর্জন, নইলে নিজেকে সেন্টিমেন্টাল বলে ঘৃণা করতুম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন। নির্দয় হবে না কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে। বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি।'

'যদি বুঝে থাক একটা প্রশ্ন করব। তুমি অতীনকে ভালোবাস?'

কোনো উত্তর না দিয়ে এলা চুপ করে রইল।

'যদি কখনো সে আমাদের সকলকে বিপদে ফেলে, তাকে নিজের হাতে মারতে পার না?'

'তার পক্ষে এতই অসম্ভব যে হাঁ বলতে আমার মুখে বাধবে না।'

'যদিই সম্ভব হয়?'

'মুখে যা-ই বলি না কেন, নিজেকে কি শেষ পর্যন্ত জানি?'

'জানতেই হবে নিজেকে। সমস্ত নিদারুণ সম্ভাবনা প্রত্যহ কল্পনা করে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।'

'আমি নিশ্চিত বলছি, আপনি আমাকে ভুল করে বেছে নিয়েছেন।

'আমি নিশ্চিত জানি আমি ভুল করি নি।'

'মাস্টারমশায়, আপনার পায়ে পড়ি, দিন অতীনকে নিষ্কৃতি।'

'আমি নিষ্কৃতি দেবার কে? ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সংকল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোনো কালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে। প্রতিমুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।'

'লোক চিনতে আপনি কি কখনো ভুল করেন না?'

'করি। অনেক মানুষ আছে যাদের স্বভাবে দু রকম বুনোনির কাজ। দুটোর মধ্যে মিল নেই। অথচ দুটোই সত্য। তারা নিজেকেও নিজে ভুল করে।'

ভারী গলায় আওয়াজ এল, 'কী হে ভায়া।'

'কানাই বুঝি? এসো এসো।'

কানাই গুপ্ত এল ঘরে। বেঁটে মোটা মানুষটি আধবুড়ো। সপ্তাহখানেক দাড়িগোঁফ কামাবার অবকাশ ছিল না, কন্টকিত হয়ে উঠেছে মুখমণ্ডল। সামনের মাথায় টাক; ধুতির উপর মোটা খদ্দরের চাদর, ধোবার প্রসাদ-বঞ্চিত, জামা নেই। হাত দুটো দেহের পরিমাণে খাটো, মনে হয়, সর্বদা কাজে উদ্যত, দলের লোকের যথাসম্ভব অন্নসংস্থানের জন্যই কানাইয়ের চায়ের দোকান।

কানাই তার স্বাভাবিক চাপা ভাঙা গলায় বললে, 'ভায়া, তোমার খ্যাতি আছে বাক্‌সংযমে, তুমি মুনি বললেই হয়। এলাদি তোমার সেই খ্যাতি বুঝি দিলে মাটি করে।'

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, 'কথা না বলারই সাধনা আমাদের। নিয়মটাকে রক্ষা করবার জন্যেই ব্যতিক্রমের দরকার। এই মেয়েটি নিজে কথা বলে না, অন্যকে কথা বলবার ফাঁক দেয়, বাক্যের 'পরে এ একটি বহুমূল্য আতিথ্য।'

'কী বল তুমি ভায়া। এলাদি কথা বলে না! তোমার কাছে চুপ, কিন্তু যেখানে মুখ খোলে সেখানে বাণীর বন্যা। আমি তো মাথাপাকা মানুষ, সাড়া পেলেই খাতাপত্র ফেলে আড়াল থেকে ওর কথা শুনতে আসি। এখন আমার প্রতি একটু মনোযোগ দিতে হবে। এলাদির মতো কণ্ঠ নয় আমার, কিন্তু সংক্ষেপে যেটুকু বলব তা মর্মে প্রবেশ করবে।'

এলা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ইন্দ্রনাথ বললে, 'যাবার আগে একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। দলের লোকের কাছে আমি তোমাকে নিন্দে করে থাকি। এমন-কি, এমন কথাও বলেছি, যে একদিন তোমাকে হয়তো একেবারে নিশ্চিহ্ন সরিয়ে দিতে হবে। বলেছি, অতীনকে তুমি ভাঙিয়ে নিচ্ছ, সেই ভাঙনে আরো কিছু ভাঙবে।'

'বলতে বলতে কথাটাকে সত্য করে তুলছেন কেন? কী জানি, এখানকার সঙ্গে হয়তো আমার একটা অসামঞ্জস্য আছে।'

'থাকা সত্ত্বেও তোমাকে সন্দেহ করি নে। কিন্তু তবু ওদের কাছে তোমার নিন্দে করি। তোমার শত্রু কেউ নেই এই জনপ্রবাদ, কিন্তু দেখতে পাই তোমার বারো-আনা অনুরক্তের বাংলাদেশী মন নিন্দা বিশ্বাস করবার আগ্রহে লালায়িত হয়ে ওঠে। এই নিন্দাবিলাসীরা নিষ্ঠাহীন। এদের নাম খাতায় টুকে রাখি। অনেকগুলো পাতা ভরতি হল।'

'মাস্টারমশায়, ওরা নিন্দে ভালোবাসে বলেই নিন্দে করে, আমার উপর রাগ আছে বলে নয়।'

'অজাতশত্রু নাম শুনেছ এলা। এরা সবাই জাতশত্রু। জন্মকাল থেকেই এদের অহৈতুক শত্রুতা বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সমস্ত চেষ্টাকে কেবলই ধূলিসাৎ করছে।'

'ভায়া, আজ এই পর্যন্ত, বিষয়টা আগামীবারে সমাপ্য। এলাদি, তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ ভাঙবার মূলে যদি গোপনে আমি থাকি, কিছু মনে কোরো না। আমার চায়ের দোকানটাতে কুলুপ পড়বার সময় আসন্ন। বোধ হয় মাইল শ-তিন তফাতে গিয়ে এবার নাপিতের দোকান খুলতে হবে। ইতিমধ্যে অলকানন্দা তৈল পাঁচ পিপে তৈরি করে রেখেছি। মহাদেবের জটা নিংড়ে বের-

করা। একটা সার্টিফিকেট দিয়ো বৎসে, বোলো, অলকা তেল মাখার পর থেকে চুল-বাঁধা একটা আপদ হয়েছে, দীর্ঘায়মানা বেণী সামলে তোলা স্বয়ং দশভুজা দেবীর দুঃসাধ্য।'

যাবার সময় এলা দরজার কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'মাস্টারমশায়, মনে রইল আপনার কথা, প্রস্তুত থাকব। আমাকে সরাবার দিন হয়তো আসবে, নিঃশব্দেই মিলিয়ে যাব।'

এলা চলে গেলে ইন্দ্রনাথ বললে, 'তোমাকে চঞ্চল দেখছি কেন হে কানাই?'

'সম্প্রতি রাস্তার ধারে আমার ঐ সামনের টেবিলেই বসে গোটাতিনেক গুণ্ডা ছেলে বীররস প্রচার করছিল। আওয়াজে বোঝা যায় জন বুষেভেরই পুষ্যি বাছুর। আমি সিডিশনের নমুনা সুদ্ধ ওদের নামে পুলিসে রিপোর্ট করে দিয়েছি।'

'আন্দাজ করতে ভুল কর নি তো কানাই?'

'বরং ভুল করে সন্দেহ করা ভালো, কিন্তু সন্দেহ না করে ভুল করা সাংঘাতিক। খাঁটি বোকাই যদি হয় তা হলে কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না, আর যদি হয় খাঁটি দুশমন তা হলে ওদের মারবে কে? আমার রিপোর্টে উন্নতিই হবে। সেদিন চড়া গলায় শয়তানি শাসনপ্রণালীর উপর দিয়ে রক্তগঙ্গা বওয়াবার প্রস্তাব তুলেছিল। নিশ্চয়ই অভয়চরণ রক্ষিত এদের উপাধি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্যাশবাক্স নিয়ে হিসেব মেলাতে বসেছিলুম। হঠাৎ একটা ধুলোমাখা ছেঁড়া কাপড়-পরা ছেলে এসে চুপি চুপি বললে, টাকা চাই পাঁচশটা, যেতে হবে দিনাজপুরে। আমাদের মথুর মামার নাম করলে। আমি লাফ দিয়ে উঠে চীৎকার করে বলে উঠলুম, শয়তান, এতবড়ো আস্পর্ধা তোমার। এখনি ধরিয়ে দেব পুলিসের হাতে।— সময় হাতে একটুও ছিল না, নইলে প্রহসনটা শেষ করতুম, নিয়ে যেতুম থানায়। তোমার ছেলেরা যারা পাশের ঘরে বসে চা খাচ্ছিল তারা আমার উপর অগ্নিশর্মা; ওকে দেবে বলে চাঁদা তোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে, সবার পকেট কুড়িয়ে তেরো আনার বেশি ফণ্ড উঠল না। ছেলেটা আমার মূর্তি দেখে সরে পড়েছে।'

'তবে তো দেখছি তোমার ঢাকনির ফুটো দিয়ে গন্ধ বেরিয়ে পড়েছে— মাছির আমদানি শুরু হল।'

'সন্দেহ নেই। ভায়া, এখনি ছড়িয়ে ফেলো তোমার ছেলেগুলোকে দূরে দূরে— ওদের একজনও যেন বেকার না থাকে। Ostensible means of livelihood প্রত্যেকেরই থাকা চাই।'

'চাই নিশ্চয়ই। কিন্তু উপায় ঠাউরেছ?'

'অনেকদিন থেকে। হাত খোলসা ছিল না, নিজে করতে পারি নি। ভেবে রেখেছি, উপকরণও জমিয়েছি ধীরে ধীরে। মাধব কবিরাজ বিক্রি করে জ্বরাশনি বটিকা, তার বারো-আনা কুইনীন। সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে লেবেল বদলে নাম দেব ম্যালেরিয়ারি গুটিকা, কুইনীনের পিছনে অনেকখানি মিথ্যে কথা জুড়তে হবে। প্রতুল সেনকে লাগানো যাবে ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে ঐ গুটিকা প্রচার করার কাজে। তোমার নিবারণ ফর্স্ট ক্লাস এম.এসসি.। লজ্জা ত্যাগ করে পড়ুক ভৈরবী কবচ নিয়ে, এই কবচে সপ্ত-ধাতুর উপরে নব্য রসায়নের আরো গোটাকতক নূতন ধাতুর নাম জড়িয়ে প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সম্মিলন সাধন করা যেতে পারে। জগবন্ধু সংস্কৃত শ্লোকের উপর ব্যাকরণের ভেলকি লাগিয়ে উচ্চস্বরে প্রমাণ করতে থাকুক যে, চাণক্য জন্মেছিলেন বাংলাদেশে নেত্রকোণায়, আমারও জন্মস্থান ঐ সাবডিভিশনে। এই নিয়ে সাংঘাতিক কথা-কাটাকাটি চলুক সাহিত্যে, অবশেষে চাণক্য-জয়ন্তী করা যাবে আমারই প্রপিতামহের পোড়ো ভিটের 'পরে। তোমাদের ক্যাম্বেলি ডাক্তার তারিণী সাণ্ডেল মা শীতলার মন্দির নির্মাণের জন্যে চাঁদা চেয়ে পাড়া অস্থির করে বেড়াক। আসল কথা হচ্ছে, তোমার সবচেয়ে মাথা উঁচু গ্রেনেডিয়ার ছেলের দলকে কিছুদিন বাজে ব্যবসায়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে— কেউ-বা ওদের বোকা বলুক, কেউ-বা বলুক ওরা চতুর বিষয়ী লোক।'

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, 'তোমার কথা শুনে আমার ইচ্ছে হচ্ছে একটা ব্যবসায়ে লাগি। আর-কিছুর জন্যে না, কেবল দেউলে হবার কার্যপ্রণালী এবং সাইকলজি অনুশীলন করবার জন্যে।'

কানাই বললে, 'তুমি যে-ব্যবসায়ে লেগেছ ভায়া, সেটা আজ হোক বা কাল হোক নিশ্চিত দেউলে হবারই মুখে আছে। যারা দেউলে হয় তারা বোঝে না বলে হয় তা নয়, তারা লোকসানের রাস্তা কোনোমতে ছাড়তে পারে না বলেই হয়—দেউলে হওয়ার মরণটান একটা সাব্লাইম আকর্ষণ। ও-বিষয়টা বর্তমানে আলোচনা করে ফল নেই; একটা প্রশ্ন মনে আছে সেটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নিই। এলার মতো সুন্দরী সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় না—এ-কথা মান কি না?'

'মানি বৈকি।'

'তা হলে ওকে তোমাদের মধ্যে রেখেছ কোন্ সাহসে?'

'কানাই, এতদিনে আমাকে তোমার বোঝা উচিত ছিল। আগুনকে যে ভয় করে সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না। আমার কাজে আমি আগুনকে বাদ দিতে চাই নে।'

'অর্থাৎ তাতে কাজ নষ্ট হোক বা না হোক, তুমি কেয়ার কর না।'

'সৃষ্টিকর্তা আগুন নিয়ে খেলা করে। নিশ্চিত ফলের হিসেব করে সৃষ্টির কাজ চলে না; অনিশ্চিতের প্রত্যাশাতেই তার বিরাট প্রবর্তনা। ঠাণ্ডা মালমসলা নিয়ে বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে যে পুতুল গড়া হয় তার বাজারদর খতিয়ে লোভ করবার মন আমার নয়। ঐ যে অতীন ছেলেটা এসেছে এলার টানে, ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট আছে—ওর প্রতি তাই আমার এত ঔৎসুক্য।'

'ভায়া, তোমার এই ভীষণ ল্যাবরেটরিতে আমরা ঝাড়ন কাঁধে বেহারার কাজ করি মাত্র। খেপে ওঠে যদি কোনো গ্যাস, যদি কোনো যন্ত্র ফেটে ফুটে ছিটকে পড়ে তা হলে আমাদের কপাল ভাঙবে সাতখানা হয়ে। সেটা নিয়ে গর্ব করবার মতো জোর আমাদের খুলির তলায় নেই।'

'জবাব দিয়ে বিদায় নেও না কেন?'

'ফলের লোভ যে আছে আমাদের, তোমার না থাকতে পারে। তোমারই দালালদের মুখে একদা শুনেছিলুম Elixir of life হয়তো মিলতে পারে। তোমার এই সর্বনেশে রিসার্চের চক্রান্তে গরিব আমরা ধরা দিয়েছি নিশ্চিত আশারই টানে, অনিশ্চিতের কুহকে নয়। তুমি এটাকে দেখছ জুয়ো-খেলার দিক থেকে, আমরা দেখছি ব্যাবসার সাদা চোখে। অবশেষে খতেনের খাতায় আগুন লাগিয়ে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা কোরো না ভায়া। ওর প্রত্যেক সিকি পয়সায় আছে আমাদের বুকের রক্ত।'

'আমার মনে কোনো অন্ধ বিশ্বাস নেই কানাই। হারজিতের কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। প্রকাণ্ড কর্মের ক্ষেত্রে আমি কর্তা, এইখানেই আমাকে মানায় বলেই আমি আছি—এখানে হারও বড়ো জিতও বড়ো। ওরা চার দিকের দরজা বন্ধ ক'রে আমাকে ছোটো করতে চেয়েছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা ক'রে চারি দিকে এসে জুটল; সে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ কানাই। কেন? আমি ডাকতে পারি বলেই। সেই কথাটা ভালো করে জেনে এবং জানিয়ে যাব, তার পরে যা হয় হোক। তোমাকে তো বাইরে থেকে একদিন দেখতে ছিল সামান্য কিন্তু তোমার অসামান্যকে আমি প্রকাশিত করেছি। রসিয়ে তুললুম তোমাদের, মানুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা। আর বেশি কী চাই? ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে। গোলামি-চাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও যে একটা সুযোগ।'

'ভায়া, আমার মতো অকাল্পনিক প্র্যাকটিক্যাল লোককেও তুমি টান মেরে এনেছ ঘোরতর পাগলামির তাণ্ডব নৃত্যমঞ্চে। ভাবি যখন, এ রহস্যের অন্ত পাই নে আমি।'

'আমি কাঙালের মতো করে কিছুই চাই নে বলেই তোমাদের 'পরে আমার এত জোর। মায়া দিয়ে ভুলিয়ে লোভ দেখিয়ে ডাকি নে কাউকে। ডাক দিই অসাধ্যের মধ্যে, ফলের জন্যে নয়, বীর্য প্রমাণের জন্যে। আমার স্বভাবটা ইম্পার্সোন্যাল। যা অনিবার্য তাকে আমি অক্ষুব্ধমনে স্বীকার করে নিতে পারি। ইতিহাস তো পড়েছি, দেখেছি কত মহা মহা সাম্রাজ্য গৌরবের অভ্রভেদী শিখরে উঠেছিল আজ তারা ধুলোয় মিলিয়ে গেছে—তাদের হিসাবের খাতায় কোথায় মস্ত একটা দেনা

জমে উঠেছিল যা তারা শোধ করে নি। আর এই দেশ যেহেতু এ আমারই দেশ, সৌভাগ্যের চিরস্বত্ব নিয়ে ইতিহাসের উঁচু গদিতে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবে পরাভবের সমস্ত কারণগুলোর গায়ে সিঁদুরচন্দন মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে পুজো করতে করতে, বোকার মতো এমন আবদার করব কার কাছে? আমি তা কখনোই করি নে। বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ মন নিয়ে মেনে নিই যার মরণদশা সে মরবেই।'

'তবে!'

'তবে! দেশের চরম দুরবস্থা আমার মাথা হেঁট করতে পারবে না, আমি তারও অনেক ঊর্ধ্বে— আত্মার অবসাদ ঘটতে দেব না মরবার সমস্ত লক্ষণ দেখেও।'

'আর আমরা?'

'তোমরা কি খোকা! মাঝদরিয়ায় যে-জাহাজের তলা গিয়েছে সাত জায়গায় ফাঁক হয়ে, কেঁদে কেটে মন্ত্র পড়ে কর্তার দোহাই পেড়ে তাকে বাঁচাতে পারবে?'

'না যদি পারি তবে?'

'তবে কী। তোমরা কজনে জেনে শুনে সেই ডুবোজাহাজেই ঝড়ের মুখে সাংঘাতিক পাল তুলে দিয়েছ, তোমাদের পাঁজর কাঁপে নি। এমন যে-কজনকে পাই ডুবতে ডুবতে তাদের নিয়েই আমাদের জিত। রসাতলে যাবার জন্যে যে-দেশ অন্ধভাবে প্রস্তুত তারি মাস্তুলে তোমরা শেষ পর্যন্ত জয়ধ্বজা উড়িয়েছ. তোমরা না করেছ মিথ্যে আশা, না করেছ কাঙালপনা, না কেঁদেছ নৈরাশ্যে হাউ হাউ করে। তোমরা তবু হাল ছাড় নি যখন জলে ভরেছে জাহাজের খোল। হাল ছাড়াতেই কাপুরুষতা—বাস, আমার কাজ হয়ে গেছে তোমাদের যে-কজনকে পেয়েছি তাদেরই নিয়ে। তার পরে? কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

'তুমি যা বলছ তার মধ্যে থেকে একটা প্রধান কথা বাদ গেছে বলে বোধ হয়।'

'কোন্ কথাটা?'

'তোমার মনে কি রাগও নেই? এত ইম্পার্সোন্যাল তুমি!'

'রাগ কার 'পরে?'

'ইংরেজের 'পরে।'

'যে জোয়ান মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লড়তে পারেই না, সেই গ্রাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি। রাগের মাথায় কর্তব্য করতে গেলে অকর্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশি।'

'তা হোক, কিন্তু রাগের কারণ থাকলে রাগ না করাটা অমানবিক।'

'সমস্ত য়ুরোপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি ইংরেজকেও জানি। যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সবচেয়ে বড়ো জাত। রিপুর তাড়ায় ওরা যে মারতে পারে না তা নয় কিন্তু পুরোপুরি পারে না—লজ্জা পায়। ওদের নিজেদের মধ্যে যারা বড়ো তাদেরই কাছে জবাবদিহি করতে ওদের সবচেয়ে ভয়; ওরা নিজেকে ভোলায় তাদেরও ভোলায়। ওদের উপরে যতটা রাগ করলে ফুল স্টীম বানিয়ে তোলা যায় ততটা রাগ আমার দ্বারা সম্ভব হয় না।'

'অদ্ভুত তুমি।'

'ষোলো-আনা মারের চোটে আমাদের মেরুদণ্ড ওরা চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারত। সেটা ওরা পারলে না। আমি ওদের মনুষ্যত্বকে বাহাদুরি দিই। পরের দেশ শাসন করতে করতে সেই মনুষ্যত্ব ক্ষয় হয়ে আসছে তাতেই মরণদশা ধরছে ওদের ভিতর থেকে। এত বেশি বিদেশের বোঝা আর কোনো জাতের ঘাড়ে নেই, এতে ওদের স্বভাব যাচ্ছে নষ্ট হয়ে।'

'সে ওরা বুঝবে। কিন্তু তোমার এই অধ্যবসায়কে প্রায় অহৈতুক করে তুলেছ এটা আমার কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকে।'

'অত্যন্ত ভুল। আমি অবিচার করব না, উন্মত্ত হব না, দেশকে দেবী বলে মা মা বলে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর।'

'শত্রুকে যদি শত্রু বলে তাকে দ্বেষ না কর তবে তার বিরুদ্ধে হাত চালাবে কী করে?'

'রাস্তায় পাথর পড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন করে, অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে। ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয় নয়। ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে—এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে আমার মানবস্বভাবকে আমি স্বীকার করি।'

'কিন্তু সফলতা সম্বন্ধে তোমার নিশ্চিত আশা নেই।'

'নাই রইল, তবু নিজের স্বভাবের অপমান ঘটাব না—সামনে মৃত্যুই যদি সবচেয়ে নিশ্চিত হয় তবুও; পরাভবের আশঙ্কা আছে বলেই স্পর্ধা করে তাকে উপেক্ষা করে আত্মমর্যাদা রাখতে হবে। আমি তো মনে করি এইটেই আজ আমাদের শেষ কর্তব্য।'

'ঐ আসছেন রক্তগঙ্গা বওয়াবার মেকি ভগীরথ। ওঁকে চা খাইয়ে আসি গে। সেই সঙ্গে স্পষ্ট-ভাষায় খবরও দেব যে, পুলিসকে সব কথা রিপোর্ট করা হয়েছে। তোমার দলের বোকারা আমাকে লিঞ্চ করে না বসে।'

দ্বিতীয় অধ্যায়

এলা বসে আছে কেদারায়, পিঠে বালিশ গোঁজা। লিখছে একমনে। পায়ের উপর পা তোলা। দেশবন্ধুর মূর্তি-আঁকা খাতা কাঠের বোর্ডে কোলের উপর আড় করে ধরা। দিন ফুরোতে দেরি নেই, কিন্তু তখনো চুল রয়েছে অযত্নে। বেগনি রঙের খদ্দরের শাড়ি গায়ে, সেটাতে মলিনতা অব্যক্ত থাকে, তাই নিভৃতে ব্যবহারে তার অনাদৃত প্রয়োজন। এলার হাতে একজোড়া লালরঙ-করা শাঁখা, গলায় একছড়া সোনার হার। হাতির দাঁতের মতো গৌরবর্ণ শরীরটি আঁটসাঁট; মনে হয় বয়স খুব কম কিন্তু মুখে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য। খদ্দরের সবুজ রঙের চাদরে ঢাকা সংকীর্ণ লোহার খাট ঘরের প্রান্তে দেয়াল-ঘেঁষা। নারায়ণী স্কুলের তাঁতে-বোনা শতরঞ্চ মেঝের উপর পাতা। একধারে লেখবার ছোটো টেবিলে ব্লটিং প্যাড; তার একপাশে কলম পেনসিল সাজানো দোয়াতদান, অন্যধারে পিতলের ঘটিতে গন্ধরাজ ফুল। দেয়ালে ঝুলছে কোনো একটি দূরবর্তী কালের ফোটোগ্রাফের প্রেতাত্মা, ক্ষীণ হলদে রেখায় বিলীনপ্রায়। অন্ধকার হল, আলো জ্বালবার সময় এসেছে। উঠি-উঠি করছে এমন সময় খদ্দরের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে অতীন্দ্র দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকেই ডাক দিল, 'এলী।'

এলা খুশিতে চমকে উঠে বললে, 'অসভ্য, জানান না দিয়ে এ ঘরে আসতে সাহস কর।'

এলার পায়ের কাছে ধপ করে মেঝের উপর বসে অতীন বললে, 'জীবনটা অতি ছোটো, কায়দা-কানুন অতি দীর্ঘ, নিয়ম বাঁচিয়ে চলবার উপযুক্ত পরমায়ু ছিল সনাতন যুগে মান্ধাতার। কলিকালে তার টানাটানি পড়েছে।'

'আমার কাপড় ছাড়া হয় নি এখনো।'

'ভালোই। তা হলে আমার সঙ্গে মিশ খাবে। তুমি থাকবে রথে, আমি থাকব পদাতিক হয়ে— এ রকম দ্বন্দ্ব মনুর নিয়মে অধর্ম। এককালে আমি ছিলুম নিখুঁত ভদ্রলোক, খোলসটা তুমিই দিয়েছ ঘুচিয়ে। বর্তমান বেশভূষাটা দেখছ কী রকম?'

'অভিধানে ওকে বেশভূষা বলে না।'

'কী বলে তবে?'

'শব্দ পাচ্ছি নে খুঁজে। বোধ হয় ভাষায় নেই। জামার সামনেটাতেই ঐ-যে বাঁকাচোরা ছেঁড়ার দাগ, ও কি তোমার স্বকৃত সেলাইয়ের লম্বা বিজ্ঞাপন?'

'ভাগ্যের আঘাত দারুণ হলেও বুক পেতেই নিয়ে থাকি— ওটা তারই পরিচয়। এ জামা দরজিকে দিতে সাহস হয় না, তার তো আত্মসম্মানবোধ আছে।'

'আমাকে দিলে না কেন?'

'নব যুগের সংস্কারভার নিয়েছ, তার উপরে পুরোনো জামার সংস্কার?'

'ওটাকে সহ্য করবার এমনই কী দরকার ছিল?'

'যে দরকারে ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে সহ্য করে।'

'তার অর্থ?'

'তার অর্থ, একটির বেশি নেই বলে।'

'কী বল তুমি অন্তু! বিশ্বসংসারে তোমার ঐ একটি বৈ জামা আর নেই?'

'বাড়িয়ে বলা অন্যায়, তাই কমিয়ে বললুম। পূর্ব আশ্রমে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রবাবুর জামা ছিল বহুসংখ্যক ও বহুবিধ। এমন সময়ে দেশে এল বন্যা। তুমি বক্তৃতায় বললে, যে অশ্রুপ্লাবিত দুর্দিনে (মনে আছে অশ্রুপ্লাবিত বিশেষণটা?) বহু নরনারীর লজ্জারক্ষার মতো কাপড় জুটছে না, সে সময়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড় যার আছে লজ্জা তারই। বেশ গুছিয়ে বলেছিলে। তখনো তোমার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে হাসতে সাহস ছিল না। মনে মনে হেসেছিলুম। নিশ্চিত জানতুম আবশ্যকের বেশি জামা ছিল তোমার বাক্সে। কিন্তু মেয়েদের পঞ্চাশ রঙের পঞ্চাশটা জামা থাকলেও পঞ্চাশটাই

অত্যাবশ্যক। সেদিন দেশহিতৈষিণীদের মধ্যে রেষারেষি চলছিল— কে কত দান সংগ্রহ করতে পারে। এনে দিলুম আমার কাপড়ের তোরঙ্গ তোমার চরণতলে। হাততালি দিয়ে উঠলে খুশিতে।'

'সে কী কথা! আমি কি জানি অমন নিঃশেষ করে দেবে?'

'আশ্চর্য হও কেন? দুঃসাধ্য ক্ষতিসাধনের শক্তি এই দেহে দুর্জয়বেগে সঞ্চার করলে কে? সংগ্রহের ভার যদি থাকত আমাদের গণেশ মজুমদারের 'পরে তা হলে তার পৌরুষ আমার কাপড়ের বাক্সে ক্ষতি করত অতি সামান্য।'

'ছি ছি অন্তু, কেন আমাকে বললে না?'

'দুঃখ কোরো না। একান্ত শোচনীয় নয়, দুটো জামা রাঙিয়ে রেখে দিলুম নিত্য আবশ্যকের গরজে, পালা করে কেচে পরা চলছে। আরো দুটো আছে আপদ্ধর্মের জন্যে ভাঁজ করা। যদি কোনোদিন সন্দিগ্ধ সংসারে ভদ্রবংশীয় বলে প্রমাণ দেবার প্রয়োজন ঘটে সেই জামা দুটোতে ধোবা-দরজির সার্টিফিকেট রইল।'

'সৃষ্টিকর্তার সার্টিফিকেট রয়েছে ঐ চেহারাতেই— সাক্ষী ডাকতে হবে না তোমার।'

'স্তুতি! নারীর দরবারে স্তবের অত্যুক্তি চিরদিন পুরুষদেরই অধিকারভুক্ত, তুমি উলটিয়ে দিতে চাও?'

'হাঁ চাই। প্রচার করতে চাই, আধুনিক কালে মেয়েদের অধিকার বেড়ে চলেছে। পুরুষের সম্বন্ধেও সত্য বলতে তাদের বাধা নেই। নব্য সাহিত্যে দেখি বাঙালি মেয়েরা নিজেদেরই প্রশংসায় মুখরা, দেবীপ্রতিমা বানাবার কুমোরের কাজটা নিজেরাই নিয়েছে। স্বজাতির গুণগরিমার উপরে সাহিত্যিক রঙ চড়াচ্ছে। সেটা তাদের অঙ্গরাগেরই শামিল, স্বহস্তের বাঁটা, বিধাতার হাতের নয়। আমার এতে লজ্জা করে। এখন চলো বসবার ঘরে।'

'এ ঘরেও বসবার জায়গা আছে। আমি তো একাই একটা বিরাট সভা নই।'

'আচ্ছা তবে বলো জরুরি কথাটা কী?'

'হঠাৎ কবিতার একটা পদ মনে পড়ে গেছে অথচ কোথায় পড়েছি কিছুতেই মনে আসছে না। সকাল থেকে হাওয়া হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি: তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলুম।'

'অত্যন্ত জরুরি দেখছি। আচ্ছা বলো।'

'একটু ভেবে বলো কার রচনা—

তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।'

'কোনো নামজাদা কবির তো নয়ই।'

'পূর্বশ্রুত বলে মনে হচ্ছে না তোমার?'

'চেনা গলার আভাস পাচ্ছি একটুখানি। অন্য লাইনটা গেল কোথায়?'

'আমার বিশ্বাস ছিল, অন্য লাইনটা আপনি তোমার মনে আসবে।'

'তোমার মুখে যদি একবার শুনি তা হলে নিশ্চয় মনে আসবে।'

'তবে শোনো—

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।'

অতীনের মাথায় করাঘাত করে এলা বললে, 'আজকাল কী পাগলামি শুরু করেছ তুমি?'

'সেই চৈত্রমাসের বারবেলা থেকেই আমার পাগলামি শুরু। যে-সব দিন চরমে না পৌঁছোতেই ফুরিয়ে যায় তারা ছায়ামূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কল্পলোকের দিগন্তে। তোমার সঙ্গে আমার মিলন

সেই মরীচিকার বাসরঘরে। আজ সেইখানে তোমাকে ডাক দিতে এলুম— কাজের ক্ষতি করব।'

কাঠের বোর্ড আর খাতাখানা মেঝের উপর ফেলে দিয়ে এলা বললে, 'থাক্ পড়ে আমার কাজ। আলোটা জেব্‌লে দিই।'

'না থাক্— আলো প্রত্যক্ষকে প্রমাণ করে, চলো দীপহীন পথে অপ্রত্যক্ষের দিকে। চার বছরের কিছু কম হবে, স্টীমারে খেয়া পার হচ্ছি মোকামার ঘাটে। তখনো আঁকড়ে ছিলুম পৈতৃক সম্পত্তির ভাঙা কিনারটাকে, সেটা ছিল দেনার গর্তে ভরা। তখনো দেহে মনে শৌখিনতার রঙ লেগে ছিল দেউলে দিনান্তের মেঘের মতো। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পাট-করা মুগার চাদর কাঁধে, একলা বসে আছি ফর্স্ট ক্লাস ডেক-এ বেতের কেদারায়। ফেলে দেওয়া খবরের কাগজের পাতাগুলো ফরফর করে এধারে ওধারে উড়ে বেড়াচ্ছিল, মজা লাগছিল দেখতে, মনে হচ্ছিল মূর্তিমতী জনশ্রুতির এলোমেলো নৃত্য। তুমি জনসাধারণের দলে, কোমর বেঁধে ডেক-প্যাসেঞ্জার। হঠাৎ আমার পশ্চাদ্‌বর্তী অগোচরতার মধ্যে থেকে দ্রুতবেগে এসে পড়লে আমার সামনে। আজও চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি তোমার সেই ব্রাউন রঙের শাড়ি; খোঁপার সঙ্গে কাঁটায় বেঁধা তোমার মাথার কাপড় মুখের দুই ধারে হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। চেষ্টাকৃত অসংকোচের ভান করেই প্রশ্ন করলে, আপনি খদ্দর পরেন না কেন?— মনে পড়ছে?'

'খুব স্পষ্ট। তোমার মনের ছবিকে তুমি কথা কওয়াতে পার, আমার ছবি বোবা।'

'আমি আজ সেদিনের পুনরুক্তি করে যাব, তোমাকে শুনতে হবে।'

'শুনব না তো কী। সেদিন যেখানে আমার নূতন জীবনের ধুয়ো, পুনঃপুনঃ সেখানে আমার মন ফিরে আসতে চায়।'

'তোমার গলার সুরটি শুনেই আমার সর্বশরীর চমকে উঠল, সেই সুর আমার মনের মধ্যে এসে লাগল হঠাৎ আলোর ছটার মতো; যেন আকাশ থেকে কোন এক অপরূপ পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে। অপরিচিতা মেয়েটির অভাবনীয় স্পর্ধায় যদি রাগ করতে পারতুম তা হলে সেদিনকার খেয়াতরী এতবড়ো আঘাটায় পৌঁছিয়ে দিত না— ভদ্রপাড়াতেই শেষ পর্যন্ত দিন কাটত চলতি রাস্তায়। মনটা আর্দ্র দেশলাইকাঠির মতো, রাগের আগুন জবলল না। অহংকার আমার স্বভাবের সর্বপ্রধান সদ্‌গুণ, তাই ধাঁ করে মনে হল, মেয়েটি যদি আমাকে বিশেষভাবে পছন্দ না করত তা হলে এমন বিশেষভাবে ধমক দিতে আসত না, খদ্দরপ্রচার— ও একটা ছুতো, সত্যি কি না বলো।'

'ওগো, কতবার বলেছি— অনেকক্ষণ ধরে ডেকের কোণে বসে তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম আর-কেউ সেটা লক্ষ করছে কি না। জীবনে সেই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য এক-চমকের চিরপরিচয়। মন বললে, কোথা থেকে এল এই অতিদূর জাতের মানুষটি, চার দিকের পরিমাপে তৈরি নয়, শ্যাওলার মধ্যে শতদল পদ্ম। তখনি মনে মনে পণ করলুম, এই দুর্লভ মানুষটিকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে।'

'আমার কপালে তোমার একবচনের চাওয়াটা চাপা পড়ল বহুবচনের চাওয়ার তলায়।'

'আমার উপায় ছিল না অন্তু। দ্রৌপদীকে দেখবার আগেই কুন্তী বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিয়ো। তুমি আসবার আগেই শপথ করে দেশের আদেশ স্বীকার করেছি, বলেছি আমার একলার জন্যে কিছুই রাখব না। দেশের কাছে আমি বাগ্‌দত্তা।'

'অধার্মিক তোমার পণগ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্মবিদ্রোহ। পণ যদি ভাঙতে তবে সত্যরক্ষা হত। যে লোভ পবিত্র, যা অন্তর্যামীর আদেশবাণী, তাকে দলের পায়ে দলিত করেছ, এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।'

'অন্তু, শাস্তির সীমা নেই, দিনরাত মারছে আমাকে। যে আশ্চর্য সৌভাগ্য সকল সাধনার অতীত, যা দৈবের অযাচিত দান তা এল আমার সামনে তবু নিতে পারলুম না। হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁঠ বাঁধা, তৎসত্ত্বেও এতবড়ো দুঃসহ বৈধব্য কোনো মেয়ের ভাগ্যে যেন না ঘটে। একটা মন্ত্রপড়া বেড়ার

মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র মন উৎসুক হয়ে উঠল, বললে, ভাঙুক সব বেড়া। এমন বিপ্লব ঘটতে পারে সে-কথা কোনোদিন ভাবতে পারি নি। এর আগে কখনো মন বিচলিত হয় নি বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু চঞ্চলতা জয় করে খুশি হয়েছি নিজের শক্তির গর্বে। জয় করবার সেই গর্ব আজ নেই, ইচ্ছে হারিয়েছি— বাহিরের কথা ছেড়ে দাও, অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখো, হেরেছি আমি। তুমি বীর, আমি তোমার বন্দিনী।'

'আমিও হেরেছি আমার সেই বন্দিনীর কাছে। হার শেষ হয় নি, প্রতি মুহূর্তের যুদ্ধে প্রতি মুহূর্তেই হারছি।'

অন্তু, ফস্ট ক্লাস ডেক-এ যখন অপূর্ব আবির্ভাবের মতো আমাকে দূর থেকে দেখা দিয়েছিলে তখনো জানতুম থর্ড ক্লাসের টিকিটটা আমাদের আধুনিক আভিজাত্যের একটা উজ্জ্বল নিদর্শন। অবশেষে তুমি চড়লে রেলগাড়িতে সেকেন্ড ক্লাসে। আমার দেহমনকে প্রবল টান দিলে সেই ক্লাসের দিকে। এমন-কি, মনে একটা চাতুরীর কল্পনা এসেছিল, ভেবেছিলুম, ট্রেন ছাড়বার শেষমুহূর্তে উঠে পড়ব তোমার গাড়িতে, বলব, তাড়াতাড়িতে ভুলে উঠেছি। কাব্যশাস্ত্রে মেয়েরাই অভিসার করে এসেছে, সংসারবিধিতে বাধা আছে বলেই কবিদের এই করুণা। উসখুস-করা মনের যত সব এলোমেলো ইচ্ছে ভিতরের আঁধার কোঠায় ঘুর খেয়ে খেয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়ায়। এদের কথা মেয়েরা পর্দার বাইরে কিছুতে স্বীকার করতে চায় না। তুমি আমাকে স্বীকার করিয়েছ।'

'কেন স্বীকার করলে?'

'নারীজাতির গুমর ভেঙে কেবল ঐ স্বীকারটুকুই তোমাকে দিতে পেরেছি, আর তো কিছু পারি নি।'

হঠাৎ অতীন এলার হাত চেপে ধরে বলে উঠল, 'কেন পারলে না? কিসের বাধা ছিল আমাকে গ্রহণ করতে? সমাজ? জাতিভেদ?'

'ছি, ছি, এমন কথা মনেও কোরো না। বাইরে বাধা নয়, বাধা অন্তরে।'

'যথেষ্ট ভালোবাস নি?'

'ঐ যথেষ্ট কথাটার কোনো মানে নেই অন্তু। যে শক্তি হাত দিয়ে পর্বতকে ঠেলতে পারে নি তাকে দুর্বল বলে অপবাদ দিয়ো না। শপথ করে সত্য গ্রহণ করেছিলুম, বিয়ে করব না। না করলেও হয়তো বিয়ে সম্ভব হত না।'

'কেন হত না?'

'রাগ কোরো না অন্তু, ভালোবাসি বলেই সংকোচ। আমি নিঃস্ব, কতটুকুই বা তোমাকে দিতে পারি!'

'স্পষ্ট করেই বলো।'

'অনেকবার বলেছি।'

'আবার বলো, আজ সব বলা কওয়া শেষ করে নিতে চাই, এর পরে আর জিজ্ঞাসা করব না।'

বাইরে থেকে ডাক এল, 'দিদিমণি।'

'কী রে অখিল, আয়-না ভিতরে।'

ছেলেটার বয়স ষোলো কিংবা আঠারো হবে। জেদালো দুষ্টুমি-ভরা প্রিয়দর্শন চেহারা। কোঁকড়া চুল ঝাঁকড়ামাকড়া, কচি শামলা রঙ, চঞ্চল চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। খাকি রঙের শর্টপরা, কোমর পর্যন্ত ছাঁটা সেই রঙেরই একটা বোতাম-খোলা জামা, বুক বের করা; শর্টের দুই দিককার পকেট নানা বাজে সম্পত্তিতে ফুলে-ওঠা, বুকের পকেটে বিচিত্র ফলাওয়ালা একটা হরিণের শিঙের ছুরি; কখনো বা সে খেলার নৌকো, কখনো এরোপ্লেনের নমুনা বানায়। সম্প্রতি মল্লিক কোম্পানির আয়ুর্বৈদিক বাগানে দেখে এসেছে জলতোলা হাওয়া-যন্ত্র; বিস্কুটের টিন প্রভৃতি নানা ফালতো জিনিস জোড়াতাড়া দিয়ে তারই নকলের চেষ্টা চলছে। আঙুল কেটেছে, তার উপরে ন্যাকড়া জড়ানো, এলা জিজ্ঞাসা করলে কানেই আনে না। এলা এই বাপ-মা-মরা ছেলের দূরসম্পর্কের আত্মীয়,

অনেক উৎপাত সহ্য করে। কার কাছ থেকে বেঁটে জাতের এক বাঁদর অখিল সস্তা দামে কিনেছে। জন্তুটা ভাঁড়ারে চৌর্যবৃত্তিতে সুদক্ষ। এলার ছোটো পরিবারে এই জন্তুটা একটা মস্ত অত্যাচার।

ঘরে ঢুকেই অখিল সলজ্জ দ্রুতবেগে পা ছুঁয়ে এলাকে প্রণাম করলে। এলা বুঝলে প্রণামটা একটা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের অন্তর্গত, কেননা ভক্তিবৃত্তিটা অখিলের স্বভাবসিদ্ধ নয়।

এলা বললে, 'তোর অন্তুদাদাকে প্রণাম করবি নে?'

কোনো জবাব না দিয়ে অখিল অতীনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। অতীন উচ্চস্বরে হেসে উঠল। অখিলের পিঠ চাপড়িয়ে বললে, 'শাবাশ, মাথা যদি হেঁট করতেই হয় তো এক-দেবতার পায়ে। সেই একেশ্বরীর কাছে আমারও মাথা হেঁট, এখন প্রসাদের ভাগ নিয়ে রাগারাগি কোরো না ভাই, উদ্‌বৃত্তই বেশি।'

এলা অখিলকে বললে, 'তোর কী কথা আছে বলে যা।'

অখিল বললে, 'কাল আমার মায়ের মৃত্যুদিন।'

'তাই তো। একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। কাউকে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে চাস?'

'কাউকে না।'

'তবে কী চাস?'

'পড়ার ছুটি চাই তিন দিন।'

'কী করবি ছুটি নিয়ে?'

'খরগোশের খাঁচা বানাব।'

'খরগোশ তোর একটিও বাকি নেই, খাঁচা বানাবি কার জন্যে?'

অতীন হেসে বললে, 'খরগোশ তো কল্পনা করলেই হয়, খাঁচাটা বানানোই আসল কথা। মানুষ অনিত্য, আসে আর যায় কিন্তু নিত্যকালের মতো পাকা করে তাদের খাঁচা বানাবার ভার নিয়েছেন ভগবান মনু থেকে আরম্ভ করে মনুর আধুনিক অবতার পর্যন্ত। এই কাজে তাদের ভীষণ শখ।'

'আচ্ছা অখিল, যা তোর ছুটি।'

দ্বিতীয় কথাটি না বলে অখিল দৌড়ে চলে গেল।

অতীন বললে, 'ওকে পোষ মানাতে পারলুম না। আমার সাবেক সম্পত্তির ঝড়তিপড়তির মধ্যে ছিল একটা কব্‌জিঘড়ি, আধুনিক ছেলেদের পক্ষে সাত রাজার ধন। একদিন সেটা ওকে দিতে গিয়েছিলুম। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল। এর থেকে বুঝবে ওতে আমাতে ব্যাপারটা কম্যুন্যাল হয়ে উঠেছে, অন্তু-অখিল রায়ট হবার লক্ষণ।'

'ছেলেদের সঙ্গে ভাব করতে তোমার জুড়ি কেউ নেই, তবু এই বাঁদরটার কাছে হার মানলে কেন?'

'মাঝখানে আছে তৃতীয় পক্ষ, নইলে ওতে আমাতে হরিহর বনে যেতুম। থাক্‌ সে-কথা; এখন বলো, তোমার কৈফিয়তটা কী? কেন আমাকে সরিয়ে রাখলে?'

'একটা সোজা কথা কেন তুমি মনে রাখ না যে, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়ো?'

'কারণ এই সোজা কথাটা ভুলতে পারি নি যে, তোমার বয়স আটাশ, আমার বয়স আটাশ পেরিয়ে কয়েক মাস। প্রমাণ করা খুব সহজ, কারণ দলিলটা তাম্রশাসনে ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা নয়।'

'আমার আটাশ তোমার আটাশকে বহুদূরে পেরিয়ে গেছে। তোমার আটাশে যৌবনের সব সলতেই নির্ধূম জ্বলছে। এখনো তোমার জানলা খোলা যাদের দিকে, তারা অনাগত তারা অভাবিত।'

'এলী, আমার কথাটা কিছুতে বুঝতে চাচ্ছ না বলেই বুঝছ না। দলের কাছে ভগবানের সত্যের বিরুদ্ধে সত্য নিয়েছ, তাই নানা তর্ক বানিয়ে নিজেকে ভোলাচ্ছ, আমাকেও। ভোলাও কিন্তু এ-কথা বোলো না আমার জীবনে এখনো অনাগত অভাবিত দূরে রয়ে গেছে। এসেছে সে, সে তুমি।

তবুও আজও সে অনাগত। চিরদিনই কি তবে জানলা খোলা থাকবে তার দিকে? সেই শূন্যের ভিতর দিয়ে কেবলই বাজবে আমার আর্ত স্বর, চাই তোমাকে চাই, আর অন্য দিক দিয়ে ফিরে আসবে না কোনো উত্তর?'

'ফিরে আসছে না, এমন কথা বলছ কী করে অকৃতজ্ঞ? চাই, চাই, চাই, তোমার চেয়ে বেশি কিছুই চাই নে এ জগতে। যে সময়ে দেখা হলে শুভদৃষ্টি সম্পূর্ণ হত সে সময়ে হয় নি যে দেখা। কিন্তু তবু বলছি ভাগ্যে হয় নি।'

'কেন? কী ক্ষতি হত তাতে?'

'আমার জীবন সার্থক হত, কতটুকুই বা তার দাম। কারো মতো নও যে তুমি; মস্ত তুমি। তফাতে আছি বলেই দেখতে পেলুম সেই তোমার আলোকসামান্য প্রকাশ। সামান্য আমাকে দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবার কথা কল্পনা করতে আমার ভয় করে। আমার ছোটো সংসারে প্রতি-দিনের তুচ্ছতার মানুষ হবে তুমি! আমি কত উপরে মুখ তুলে তোমার মাথা দেখতে পাই তোমাকে বোঝাব কেমন করে? মেয়েদের সম্বল জীবনের যত সব খুঁটিনাটি, সেই বোঝা দিয়ে তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে ভয় পায় না এমন মেয়ে হয়তো আছে; তারা ট্র্যাজেডি ঘটিয়েছে কত আমি তা জানি। চোখের সামনে দেখেছি লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে দিল না; সেই মেয়েরা বুঝি মনে করে তাদের জড়িয়ে ধরাই যথেষ্ট।'

'এলা, যে পায় সেই জানে যথেষ্ট কাকে বলে।'

'নিজেকে ভোলাতে চাই নে, অন্তু। প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এসেছি জগতে। সঙ্গে সঙ্গে এনেছি জীবপ্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র। সেগুলো ঠিকমত ব্যবহার করতে জানলেই সস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন। সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রমাণ করতে হয় তার শ্রেষ্ঠতা। সেই শ্রেষ্ঠতা যে কী, ভাগ্যক্রমে আমি তা জানবার সুযোগ পেয়েছি। পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো।'

'মাথায় বড়ো।'

'হাঁ মাথায় বড়োই তো। প্রকৃতিকে অতিক্রম করে বড়ো হবার তোরণদ্বার সেই মাথায়। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি যথেষ্ট থাক্ না-থাক্, আমি নম্র হয়ে নিজেকে নিবেদন করতে পেরেছি সেই উপরের দিকে চেয়ে।'

'কোনো নীচ উৎপাত করে নি?'

'করেছে। আমাদের টানে যারা নেমে আসে বায়োলজির নীচের তলায়, তারা বিশ্রী হয়ে বিগড়ে যায়। ব্যক্তিগত বিশেষ ইচ্ছে বা প্রয়োজন না থাকলেও নীচে টেনে আনবার একটা সাধারণ ষড়যন্ত্রে আমরা সমস্ত মেয়ে এক হয়ে যোগ দিয়েছি, সাজে সজ্জায় হাবেভাবে বানানো কথায়।'

'বোকাদের ভোলাবার জন্যে?'

'হাঁ গো, তোমরা বোকা! অতি সহজ মন্ত্রেই ভোল, তাই আমাদের এত গুমর। আমরা বোকাদের ভালোবেসেছি, তবু তাদের স্থূল বোকামির সর্বোচ্চ শিখরে দেখেছি সূর্যোদয়, আলো এনেছে তারা, পূজা করেছি তখন। অনেক দেখেছি ইতর নোংরা নিন্দুক, অনেক দেখেছি কৃপণ কুৎসিত। সব বাদ দিয়ে সব মেনে নিয়ে তবু অনেক বাকি থাকে। সেই বাকিদেরই দেখেছি উজ্জ্বল আলোয়। তাদের অনেকের নাম থাকবে না কারো মনে, তবু তারা বড়ো।'

'এলী, তোমার কথা শুনে লজ্জা করছে, মনে হচ্ছে একটা প্রতিবাদ না করলে ভালো শোনাবে না। তবু ভালোও লাগছে। কিন্তু সত্য কথায় তোমার কাছে হার মানতে পারব না। আমাদের দেশের পুরুষদের যে কাপুরুষতার লক্ষণ ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, যার কথা আমাকে বারবার ভাবিয়েছে, সে আমি আজ তোমার কাছে বলব। আমি দেখেছি আমার জানা পরিবারের মধ্যে এবং আমার নিজের পরিবারেও শাশুড়ির অসহ্য অন্যায় আধিপত্য। শাশুড়ির অত্যাচারের কথা চিরকাল এদেশে প্রচলিত।'

'হাঁ সে তো জানি। নিজের ঘরে দেখেছি, যে-মানুষ হাড়ে দুর্বল, দুর্বলের যম সে—তার মতো নিষ্ঠুর কেউ হতে পারে না।'

'এলা, ও-কথা বলে তুমি তোমার ভাবী শাশুড়ির নিন্দার ভূমিকা করে রেখো না। নববধূর 'পরে অমানুষিক অত্যাচারের খবর প্রায় শুনতে পাই, আর দেখি তার প্রধান নায়িকা শাশুড়ি। কিন্তু শাশুড়িকে অপ্রতিহত অন্যায় করবার অধিকার দিয়েছে কে? সে তো ঐ মায়ের খোকারা। অত্যাচারিণীর বিরুদ্ধে নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রম রাখবার শক্তি নেই যাদের সেই নাবালকদের কখনোই কি বিয়ে করবার বয়স হয়? যখন হয় তখন তারা স্ত্রীর খোকা হয়ে ওঠে। যেখানে পুরুষের পৌরুষ দুর্বল সেখানেই মেয়েরা নেবে আসে আর নাবায় নীচতার দিকে। আজ দেখি আমাদের দেশে যারা বড়ো-কিছু করবার সংকল্প করে তারা মেয়েকে ত্যাগ করতে চায়—মেয়েকে ভয় করে সেই স্ত্রৈণ কাপুরুষেরা। সেইজন্যেই এই কাপুরুষের দেশে তুমি পণ করেছ বিয়ে করবে না, পাছে কোনো কচি মন বেঁকে যায় তোমার মেয়েলি প্রভাবে। যথার্থ পুরুষ যারা, তারা যথার্থ মেয়ের জোরেই চরিতার্থ হবে—বিধাতার নিজের হাতের এই হুকুমনামা আছে আমাদের রক্তে। যে সেই বিধি-লিপিকে ব্যর্থ করে সে পুরুষ নামের যোগ্য নয়। পরীক্ষার ভার ছিল তোমার হাতে, আমাকে পরীক্ষা করে দেখলে না কেন?'

'অন্তু, তর্ক করতে পারতুম কিন্তু তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কেননা, জানি তুমি নিতান্ত ক্ষোভের মুখে এই-সব কুযুক্তি পেড়েছ। আমার পণের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছ না।'

'না ভুলতে পারব না। তুমি বললে কি না, পুরুষেরা মস্ত বড়ো, মেয়েরা তাদের ছোটো করবে এই তোমার ভয়! মেয়েদের বড়ো হবার দরকারই হয় না। তারা যতটুকু ততটুকুই সুসম্পূর্ণ। হতভাগা যে-পুরুষ বড়ো নয় সে অসম্পূর্ণ, তার জন্যে সৃষ্টিকর্তা লজ্জিত।'

'অন্তু, সেই অসম্পূর্ণের মধ্যেও আমরা বিধাতার ইচ্ছাটা দেখতে পাই—সেটা বড়ো ইচ্ছা।'

'এলী, বিধাতার ইচ্ছাটাই যে বড়ো তা বলতে পারি নে, তাঁর কল্পনাটাও কোনো অংশে ছোটো নয়। সেই কল্পনার তুলির ছোঁয়ায় জাদু লেগেছে মেয়েদের প্রকৃতিতে, তারা সংসারের ক্ষেত্রে এনেছে আর্টিস্টের সাধনা, রঙে সুরে আপন দেহে মনে প্রাণে অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করছে। এটা সহজ শক্তির কর্ম, সেইজন্যেই এটা সহজ নয়। ঐ যে তোমার শাঁখের মতো চিকন রঙের কণ্ঠে সোনার হারটি দেখা দিয়েছে ওর জন্যে তোমাকে নোটবই মুখস্থ করতে হয় নি। আপনার জীবন-লোকে রূপের সৃষ্টিতে রস জোগাতে পারল না এমন হতভাগিনী আছে, মোটা সোনার বালা পরে গিন্নীপনা করে সেই মুখরা; নয় তো দাসী হয়ে জীবন কাটায় উঠোন নিকিয়ে। সংসারে এইসব অকিঞ্চিৎকরের সীমাসংখ্যা নেই।'

'সৃষ্টিকর্তাকেই দোষ দেব অন্তু। লড়াই করবার শক্তি কেন দেন নি মেয়েদের? বঞ্চনা করে কেন তাদের আপনাকে বাঁচাতে হয়? পৃথিবীতে সবচেয়ে জঘন্য যে স্পাইয়ের ব্যাবসা সেই ব্যাবসাতে মেয়েদের নৈপুণ্য পুরুষের চেয়ে বেশি, এ-কথা যখন বইয়ে পড়লুম তখন বিধাতার পায়ে মাথা ঠুকে বলেছি, সাতজন্মে যেন মেয়ে হয়ে না জন্মাই। আমি মেয়ের চোখে দেখেছি পুরুষকে, তাই সব কাটিয়ে তাদের ভালোকে দেখতে পেয়েছি, তাদের বড়োকে। যখন দেশের কথা ভাবি তখন সেই-সব সোনার টুকরো ছেলেদের কথাই ভাবি, আমার দেশ তারাই। তারা ভুল যদি করে, খুব বড়ো করেই ভুল করে। আমার বুক ফেটে যায় যখন ভাবি আপন ঘরে এরা জায়গা পেল না। আমি ওদেরই মা, ওদেরই বোন, ওদেরই মেয়ে—এই কথা মনে ক'রে বুক ভরে ওঠে আমার। নিজেকে সেবিকা বলতে ইংরেজি-পড়া মেয়েদের মুখে বাধে—কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় বলে ওঠে আমি সেবিকা, তোমাদের সেবা করা আমার সার্থকতা। আমাদের ভালোবাসার চরম এই ভক্তিতে।'

'ভালোই তো: তোমার সেই ভক্তির জন্যে অনেক পুরুষ আছে, কিন্তু আমাকে কেন? ভক্তি না

হলেও আমার চলবে। মেয়েদের সম্বন্ধের যে ফর্দটা তুমি দিলে, মা বোন মেয়ে, তার মধ্যে প্রধান একটা বাদ পড়ে গেল, আমারই কপালদোষে।'

'তোমার নিজের চেয়ে তোমাকে আমি বেশি জানি অন্তু। আমার আদরের ছোটো খাঁচায় দুদিনে তোমার ডানা উঠত ছটফটিয়ে। যে-তৃপ্তির সামান্য উপকরণ আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার কাছে একদিন ঠেকত তলানিতে এসে। তখন জানতে পারতে আমি কতই গরিব। তাই আমার সমস্ত দাবি তুলে নিয়েছি, সম্পূর্ণমনে সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে। সেখানে তোমার শক্তি স্থান-সংকোচে দুঃখ পাবে না।'

অত্যন্ত ব্যথার জায়গায় যেন ঘা লাগল, জ্বলে উঠল অতীনের দুই চোখ। পায়চারি করে এল ঘরের এধার থেকে ওধারে। তার পরে এলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমাকে শক্ত কথা বলবার সময় এসেছে। জিজ্ঞাসা করি, দেশের কাছে হোক যার কাছেই হোক তুমি আমাকে সঁপে দেবার কে? তুমি সঁপে দিতে পারতে মাধুর্যের দান, যা তোমার যথার্থ আপন সামগ্রী। তাকে সেবা বল তো তাই বলো, বরদান বল যদি তাও বলতে পার; অহংকার করতে যদি দাও তো করব অহংকার, নম্র হয়ে যদি আসতে বল দ্বারে তবে তাও আসতে পারি। কিন্তু তোমার আপন দানের অধিকারকে আজ দেখছ তুমি ছোটো করে। নারীর মহিমায় অন্তরের ঐশ্বর্য যা তুমি দিতে পারতে, তা সরিয়ে নিয়ে তুমি বলছ--দেশকে দিলে আমার হাতে। পার না দিতে, পার না, কেউ পারে না। দেশ নিয়ে এক হাত থেকে আর-এক হাতে নাড়ানাড়ি চলে না।'

বিবর্ণ হয়ে এল এলার মুখ। বললে, 'কী বলছ, ভালো বুঝতে পারছি নে।'

'আমি বলছি নারীকে কেন্দ্র করে যে-মাধুর্যলোক বিস্তৃত, তার প্রসার যদি-বা দেখতে হয় ছোটো, অন্তরে তার গভীরতার সীমা নেই—সে খাঁচা নয়। কিন্তু দেশ উপাধি দিয়ে যার মধ্যে আমার বাসা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলে তোমাদের দলের বানানো দেশে—অন্যের পক্ষে যাই হোক আমার স্বভাবের পক্ষে সেই তো খাঁচা। আমার আপন শক্তি তার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না বলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিকৃতি ঘটে তার, যা তার যথার্থ আপন নয় তাকেই ব্যক্ত করতে গিয়ে পাগলামি করে, লজ্জা পাই, অথচ বেরোবার দরজা বন্ধ। জান না, আমার ডানা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, দুই পায়ে আঁট হয়ে লেগেছে বেড়ি। আপন দেশে আপন স্থান নেবার দায় ছিল আপন শক্তিতেই, সে শক্তি আমার ছিল। কেন তুমি আমাকে সে কথা ভুলিয়ে দিলে?'

ক্লিষ্টকণ্ঠে এলা বললে, 'তুমি ভুললে কেন, অন্তু?'

'ভোলাবার শক্তি তোমাদের অমোঘ, নইলে ভুলেছি বলে লজ্জা করতুম। আমি হাজারবার করে মানব যে, তুমি আমাকে ভোলাতে পার, যদি না ভুলতুম, সন্দেহ করতুম আমার পৌরুষকে।'

'তাই যদি হয় তবে আমাকে ভর্ৎসনা করছ কেন?'

'কেন? সেই কথাটাই বলছি। ভুলিয়ে তুমি সেইখানেই নিয়ে যাও যেখানে তোমার আপন বিশ্ব, আপন অধিকার। দলের লোকের কথার প্রতিধ্বনি করে বললে, জগতে একটিমাত্র কর্তব্যের পথ বেঁধে দিয়েছ তোমরা কজনে। তোমাদের সেই শানবাঁধানো সরকারি কর্তব্যপথে ঘুর খেয়ে কেবলই ঘুলিয়ে উঠছে আমার জীবনস্রোত।'

'সরকারি কর্তব্য?'

'হাঁ, তোমাদের স্বদেশী কর্তব্যের জগন্নাথের রথ। মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে—এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উলটোরথের যাত্রায়! ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির 'পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারি পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে শুরু করলে,

আশ্চর্য হয়ে ভাবলে—একেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওয়ালা যেই একটু আলগা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ-পুতুল।'

'অন্তু, ওদের অনেকেই যে পাগলামি করে পা ফেলতে লাগল, তাল রাখতে পারলে না।'

'গোড়াতেই জানা উচিত ছিল মানুষ বেশিক্ষণ পুতুল-নাচ নাচতে পারে না। মানুষের স্বভাবকে হয়তো সংস্কার করতে পার, তাতে সময় লাগে। স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে পুতুল বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা ভুল। মানুষকে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব মনে করলেই সত্য মনে করা হয়। আমাকে সেই জীব বলে শ্রদ্ধা যদি করতে তা হলে আমাকে দলে তোমার টানতে না, বুকে টানতে।'

'অন্তু, গোড়াতেই কেন আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে না? কেন আমাকে অপরাধী করলে!'

'সে তো তোমাকে বারবার বলেছি। তোমার সঙ্গে মিলতে চেয়েছিলুম এইটে অত্যন্ত সহজ কথা। দুর্জয় সেই লোভ। প্রচলিত পথটা ছিল বন্ধ। মরিয়া হয়ে জীবন পণ করলুম বাঁকা পথে। তুমি মুগ্ধ হলে। আজ জেনেছি আমাকে মরতে হবে এই রাস্তায়। সেই মরাটা চুকে গেলে তুমি আমাকে দু-হাত বাড়িয়ে ফিরে ডাকবে—ডাকবে তোমার শূন্য বুকের কাছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।'

'পায়ে পড়ি, অমন করে বোলো না।'

'বোকার মতো বলছি, রোমান্টিক শোনাচ্ছে। যেন দেহহীন বস্তুহীন পাওয়াকে পাওয়া বলে! যেন তোমার সেদিনকার বিরহ আজকের দিনের প্রতিহত মিলনের এক কড়াও দাম শোধ করতে পারে!'

'আজ তোমাকে কথায় পেয়েছে, অন্তু।'

'কী বলছ! আজ পেয়েছে! চিরকাল পেয়েছে। যখন আমার বয়স অল্প, ভালো করে মুখ ফোটে নি, তখন সেই মৌনের অন্ধকারের ভিতর থেকে কথা ফুটে ফুটে উঠছিল, কত উপমা কত তুলনা কত অসংলগ্ন বাণী। বয়স হল, সাহিত্যলোকে প্রবেশ করলুম, দেখলুম ইতিহাসের পথে পথে রাজ্যসাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ, দেখলুম বীরের রণসজ্জা পড়ে আছে ভেঙে, বিদীর্ণ জয়স্তম্ভের ফাটলে উঠেছে অশথগাছ; বহু শতাব্দীর বহু প্রয়াস ধুলার স্তূপে স্তব্ধ। কালের সেই আবর্জনা-রাশির সর্বোচ্চে দেখলুম অটল বাণীর সিংহাসন। সেই সিংহাসনের পায়ের কাছে যুগযুগান্তরের তরঙ্গ পড়ছে লুটিয়ে লুটিয়ে। কতদিন কল্পনা করেছি সেই সিংহাসনের সোনার স্তম্ভে অলংকার রচনা করবার ভার নিয়ে এসেছি আমিও। তোমার অন্তু চিরদিন কথায়-পাওয়া মানুষ। তাকে কোনোদিন ঠিকমত চিনবে সে আশা আর রইল না—তাকে কি না ভরতি করে নিলে দলের শতরঞ্চ খেলায় বড়ের মধ্যে!'

এলা চৌকি থেকে নেমে পড়ে অতীনের পায়ের উপর মাথা রাখলে। অতীন তাকে টেনে তুলে পাশে বসালে। বললে, 'তোমার এই ছিপছিপে দেহখানিকে কথা দিয়ে দিয়েই মনে মনে সাজিয়েছি, তুমি আমার সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, তুমি আমার সুখস্মিতি বা দুঃখস্মিতি বা। আমার চারি দিকে আছে অদৃশ্য আবরণ, বাণীর আবরণ, সাহিত্যের অমরাবতী থেকে নেমে এসে ভিড় ঠেকিয়ে রাখে তারা। আমি চিরস্বতন্ত্র, সে-কথা জানেন তোমাদের মাস্টারমশায়, তবু আমাকে বিশ্বাস করেন কেন?'

'সেইজন্যেই বিশ্বাস করেন। সবার সঙ্গে মিলতে হলে সবার মধ্যে নাবতে হয় তোমাকে। তুমি কিছুতেই নাবতে পার না। তোমার 'পরে আমার বিশ্বাস সেইজন্যেই। কোনো মেয়ে কোনো পুরুষকে এত বিশ্বাস করতে পারে নি। তুমি যদি সাধারণ পুরুষ হতে তা হলে সাধারণ মেয়ের মতোই আমি তোমাকে ভয় করতুম। নির্ভয় তোমার সঙ্গ।'

'ধিক সেই নির্ভয়কে। ভয় করলেই পুরুষকে উপলব্ধি করতে। দেশের জন্যে দুঃসাহস দাবি

কর, তোমার মতো মহীয়সীর জন্যে করবে না কেন? কাপুরুষ আমি। অসম্মতির নিষেধ ভেদ করে কেন তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারি নি বহুপূর্বে যখন সময় হাতে ছিল? ভদ্রতা! ভালোবাসা তো বর্বর! তার বর্বরতা পাথর ঠেলে পথ করবার জন্যে। পাগলাঝোরা সে, ভদ্রশহরের পোষ-মানা কলের জল নয়।'

এলা দ্রুত উঠে পড়ে বললে, 'চলো অন্তু, ঘরে চলো।'

অতীন উঠে দাঁড়াল, বললে, 'ভয়! এতদিন পরে শুরু হল ভয়! জিত হল আমার। যৌবন যখন প্রথম এসেছিল তখনো মেয়েদের চিনি নি। কল্পনায় তাদের দুর্গম দূরে রেখে দেখেছি; প্রমাণ করবার সময় বলে গেল যে, তোমরা যা চাও তাই আমি। অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদ্দাম। সময় যদি না হারাতুম এখনি তোমাকে বজ্রবন্ধনে চেপে ধরতুম, তোমার পাঁজরের হাড় টনটন করে উঠত; তোমাকে ভাববার সময় দিতুম না, কাঁদবার মতো নিশ্বাস তোমার বাকি থাকত না, নিষ্ঠুরের মতো টেনে নিয়ে যেতুম আপন কক্ষপথে। আজ যে-পথে এসে পড়েছি এ-পথ ক্ষুরধারার মতো সংকীর্ণ, এখানে দুজনে পাশাপাশি চলবার জায়গা নেই।'

'দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও, এই নাও, এই নাও।' এই বলে দু-হাত বাড়িয়ে গেল অতীনের কাছে, চোখ বুজে তার বুকের উপর পড়ে তার মুখের দিকে মুখ তুলে ধরলে।

জানলা থেকে এলা রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, 'সর্বনাশ! ঐ দেখতে পাচ্ছ?'

'কী বলো দেখি?'

'ঐ যে রাস্তার মোড়ে। নিশ্চয় বটু—এখানেই আসছে।'

'আসবার যোগ্য জায়গা সে চেনে।'

'ওকে দেখলে আমার সমস্ত শরীর সংকুচিত হয়ে ওঠে। ওর স্বভাবে অনেকখানি মাংস, অনেকখানি ক্লেদ। যত চেষ্টা করি পাশ কাটিয়ে চলতে, ওকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে, ততই ও কাছে এসে পড়ে। অশুচি, অশুচি ঐ মানুষটা।'

'আমিও ওকে সহ্য করতে পারি নে এলা।'

'ওর সম্বন্ধে অন্যায় কল্পনা করছি বলে নিজেকে শান্ত করবার অনেক চেষ্টা করি—কোনো-মতেই পারি নে। ওর ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটো দূরের থেকে লালায়িত স্পর্শে যেন আমার অপমান করে।'

'ওর প্রতি ভ্রূক্ষেপ কোরো না এলা। মনে মনে ওর অস্তিত্বকে একেবারে উপেক্ষা করতে পার না?'

'ওকে ভয় করি বলেই মন থেকে সরাতে পারি নে। ওর একটা ভিতরকার চেহারা দেখতে পাই কুৎসিত অক্টোপস জন্তুর মতো। মনে হয়, ও আপনার অন্তর থেকে আটটা চটচটে পা বের করে আমাকে একদিন অসম্মানে ঘিরে ফেলবে—কেবলই তারই চক্রান্ত করছে। একে তুমি আমার অবুঝ মেয়েলি আশঙ্কা বলে হেসে উড়িয়ে দিতে পার, কিন্তু এই ভয়টা ভূতে পাওয়ার মতো আমাকে পেয়েছে। শুধু আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে আমার আরো ভয় হয়, আমি জানি তোমার দিকে ওর ঈর্ষা সাপের ফণার মতো ফোঁস ফোঁস করছে।'

'এলা, ওর মতো জন্তুদের সাহস নেই, আছে দুর্গন্ধ, তাই কেউ ওদের ঘাঁটাতে চায় না। কিন্তু আমাকে ও সর্বান্তঃকরণে ভয় করে, আমি ভয়ংকর বলে যে তা নয়, আমি ওর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতীয় বলে।'

'দেখো অন্তু, জীবনে অনেক দুঃখবিপদের সম্ভাবনা আমি ভেবেছি, তার জন্যে প্রস্তুতও আছি কিন্তু একদিন কোনো দুর্যোগে যেন ওর কবলে না পড়ি, তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।' অন্তুর হাত চেপে ধরলে, যেন এখনি উদ্ধার করবার সময় হয়েছে।

'জানো অন্তু, হিংস্র জন্তুর হাতে অপমৃত্যুর কল্পনা কখনো কখনো মনে আসে, তখন

দেবতাকে জানাই, বাঘে খায় ভালুকে খায় সেও ভালো, কিন্তু আমাকে পাঁকের মধ্যে টেনে নিয়ে কুমিরে খাবে—এ যেন কিছুতে না ঘটে।'

'আমি কি বাঘভালুকের কোঠায় না কি?'

'না গো, তুমি আমার নরসিংহ, তোমার হাতে মরণেই আমার মুক্তি। ঐ শোনো পায়ের শব্দ। উপরে উঠে এল বলে।'

অতীন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোর গলায় বললে, 'বটু, এখানে নয়, চলো নীচে বসবার ঘরে—'

বটু বললে, 'এলাদি—'

'এলাদি এখন কাপড় ছাড়তে গেলেন, চলো নীচে।'

'কাপড় ছাড়তে? এত দেরিতে? সাড়ে আটটা—'

'হাঁ হাঁ, আমিই দেরি করিয়ে দিয়েছি।'

'কেবল একটা কথা। পাঁচ মিনিট।'

'তিনি স্নানের ঘরে গেছেন। বলে গেছেন, এ ঘরে কেউ আসে তাঁর ইচ্ছে নয়।'

'আপনি?'

'আমি ছাড়া।'

বটু খুব স্পষ্ট একটা ঠোঁটবাঁকা হাসি হাসলে। বললে, 'আমরা চিরকাল রইলুম ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মে, আর আপনি দুদিন এসেই উঠে পড়েছেন, আর্ষপ্রয়োগে। এক্সেপশন পিছল পথের প্রশ্রয়, বেশিকাল সয় না বলে রেখে দিলুম।' বলে তর তর করে নেমে চলে গেল।

ছোটো একটা করাত হাতে দোলাতে দোলাতে অখিল এসে বললে, 'চিঠি।' ওর অসমাপ্ত সৃষ্টিকাজের মাঝখান থেকে উঠে এসেছে।

'তোমার দিদিমণির?'

'না আপনার। আপনারই হাতে দিতে বললে।'

'কে?'

'চিনি নে।' বলেই চিঠিখানা দিয়ে চলে গেল। চিঠির কাগজের লাল রঙ দেখেই অতীন বুঝলে, এটা ডেন্জর সিগন্যাল। গোপন ভাষায় লেখা চিঠি পড়ে দেখলে—'এলার বাড়িতে আর নয়, তাকে কিছু না জানিয়ে এই মুহূর্তে চলে এসো।'

কর্মের যে শাসন স্বীকার করে নিয়েছে তাকে অসম্মান করাকে অতীন আত্মসম্মানের বিরুদ্ধ বলেই জানে। চিঠিখানা যথারীতি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললে। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল রুদ্ধ নাবার ঘরের বাইরে। পরক্ষণে দ্রুতবেগে গেল বেরিয়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার দোতলার দিকে তাকালে। জানলা খোলা, বাইরে থেকে দেখা যায় আরামকেদারার একটা অংশ, আর তার সঙ্গে সংলগ্ন লালেতে হলদেতে ডোরা-কাটা চৌকো বালিশের এক কোণা। লাফ দিয়ে অতীন চলতি ট্রামগাড়িতে চড়ে বসল।

তৃতীয় অধ্যায়

গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি ফিকে-সবুজ গাঢ়-সবুজ হলদে-সবুজ ব্রাউন-সবুজ রঙের গুল্মে বনস্পতিতে জড়িত নিবিড়তা, বাঁশপাতা-পচা পাঁকের স্তরে ভরে ওঠা ডোবা; তারই পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি, গোরুরগাড়ি চাকায় বিক্ষত। ওল, কচু, ঘেঁটু, মনসা, মাঝে মাঝে আস্‌শেওড়ার বেড়া। ক্বচিৎ ফাঁকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আল দিয়ে বাঁধা কচি ধানের খেতে জল দাঁড়িয়েছে। গলি শেষ হয়েছে গঙ্গার ঘাটে। সেকালের ছোটো ছোটো ইঁট দিয়ে গাঁথা ভাঙা ফাটা ঘাট কাত হয়ে পড়েছে, তলায় চর পড়ে গঙ্গা গেছে সরে, কিছুদূরে তীরে ঘাট পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরোনো ভাঙা বাড়ির অভিশপ্ত ছায়ায় দেড়শ বছর আগেকার মাতৃহত্যাপাতকীর ভূত আশ্রয় নিয়েছে বলে জনপ্রবাদ। অনেককাল কোনো সজীব স্বত্বাধিকারী সেই অশরীরীর বিরুদ্ধে আপন দাবি স্থাপনের চেষ্টামাত্র করে নি। দৃশ্যটা এইখানকার পরিত্যক্ত পুরোনো পুজোর দালান, তার সামনে শ্যাওলা-পড়া রাবিশে এবড়োখেবড়ো প্রশস্ত আঙিনা। কিছুদূরে নদীর ধারে ভেঙে-পড়া দেউল, ভাঙা রাসমঞ্চ, প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, ডাঙায় তোলা পাঁজর বের-করা ভাঙা নৌকো ঝুরিনামা বটগাছের অন্ধকার তলায়।

এইখানে দিনের শেষ প্রহরে অতীনের বর্তমান বাসস্থানে ছায়াচ্ছন্ন দালানে প্রবেশ করল কানাই গুপ্ত। চমকে উঠল অতীন, কেননা এখানকার ঠিকানা কানাইয়েরও জানবার কথা ছিল না।

'আপনি যে!'

কানাই বললে, 'গোয়েন্দাগিরিতে বেরিয়েছি।'

'ঠাট্টাটা বুঝিয়ে দেবেন।'

'ঠাট্টা নয়। আমি তোমাদের রসদ-জোগানদারদের সামান্য একজন। চায়ের দোকানে শনি প্রবেশ করলে, বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে চলল ওদের কুদৃষ্টি। শেষকালে ওদেরই গোয়েন্দার খাতায় নাম লিখিয়ে এলুম। নিমতলা ঘাটের রাস্তা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই যাদের সামনে, তাদের পক্ষে এটা গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড, দেশের বুকের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বরাবর লম্বমান।'

'চা বানানো ছেড়ে খবর বানাচ্ছেন?'

'বানালে এ ব্যাবসা চলে না। বিশুদ্ধ খাঁটি খবরই দিতে হয়। যে-শিকার জালে পড়েইছে আমি তার ফাঁস টেনে দিই। তোমাদের হরেনের সাড়ে পনেরো আনা খবর ওদের কাছে পৌঁছোল, শেষ বাহুল্য খবরটা আমি দিয়েছি। সে এখন জলপাইগুড়িতে সরকারি ধর্মশালায়।'

'এবার বুঝি আমার পালা?'

'ঘনিয়ে এসেছে। কাজ অনেকখানি এগিয়ে এনেছে বটু। আমার অংশে যেটুকু পড়ল তাতে কিছু সময় পাবে। সাবেক বাসায় থাকতে হঠাৎ তোমার ডায়ারি হারিয়েছিল। মনে আছে?'

'খুব মনে আছে।'

'সেটা পুলিসের হাতে নিশ্চিত পড়ত, কাজেই আমাকেই চুরি করতে হল।'

'আপনি?'

'হাঁ, সাধু যার সংকল্প ভগবান তার সহায়। একদিন সেটা লিখছিলে, আমারই কৌশলে সরে গেলে পাঁচ মিনিটের জন্যে। সেই সময়ে সরিয়েছি।'

অতীন মাথায় হাত দিয়ে বললে, 'সবটা পড়েছেন?'

'নিশ্চিত পড়েছি। পড়তে পড়তে রাত হয়ে গেল দেড়টা। বাংলা ভাষায় এত তেজ এত রস তা আগে জানতুম না। ওর মধ্যে গোপনীয় কথা আছে বৈকি। কিন্তু সেটা ব্রিটিশসাম্রাজ্য সম্পর্কে নয়।'

'কাজটা কি ভালো করেছেন?'

'কত ভালো করেছি তা বলতে পারি নে। তুমি সাহিত্যিক, তুমি সমস্ত খাতায় খুঁটিনাটি কথা কিছু লেখ নি, কারো নাম পর্যন্ত নেই। কেবল ভাবের দিক থেকে এত ঘৃণা এত অশ্রদ্ধা যে, তা কোনো পেনশনভোগী মন্ত্রিপদপ্রার্থীর কলম দিয়ে বেরোলে রাজদরবারে তার মোক্ষলাভ হত। বটু যদি তোমার সঙ্গে না লাগত তা হলে ঐ খাতাখানাই তোমার গ্রহস্বস্ত্যয়নের কাজ করত।'

'বলেন কী? সবটাই পড়েছেন?'

'পড়েছি বৈকি। কী বলব বাবাজি, আমার যদি মেয়ে থাকত আর এমন লেখা যদি সে তোমার কলম থেকে বের করতে পারত তা হলে সার্থক মানতুম আপন পিতৃপদকে। সত্যি কথা বলি, তোমাকে দলে জড়িয়ে ইন্দ্রনাথ ভায়া দেশের লোকসান করেছেন।'

'আপনার এই ব্যাবসার কথা দলের সবাই জানে?'

'কেউ না।'

'মাস্টারমশায়?'

'বুদ্ধিমান, আন্দাজ করতে পারেন কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নি, শোনেন নি আমার মুখ থেকে।'

'আমাকে বললেন যে!'

'এইটেই আশ্চর্য কথা। আমার মতো সন্দেহজীবী মানুষ কাউকে যদি বিশ্বাস না করতে পারে তা হলে দম আটকে মরে। আমি ভাবুক নই, বোকাও নই, তাই ডায়ারি রাখি নে, যদি রাখতুম তোমার হাতে দিতে পারলে মন খোলসা হত।'

'মাস্টারমশায়—'

'মাস্টারমশায়ের কাছে খবর দেওয়া চলে কিন্তু মন খোলা চলে না। ইন্দ্রনাথের প্রধান মন্ত্রী আমি, কিন্তু তার সব কথা আমি যে জানি তা মনেও কোরো না। এমন কথা আছে যা আন্দাজ করতেও সাহস হয় না। আমার বিশ্বাস, আমাদের দলের যারা আপনি ঝরে পড়ে, ইন্দ্রনাথ আমার মতোই তাদের ঝেঁটিয়ে ফেলে পুলিসের পাঁশতলায়। কাজটা গর্হিত কিন্তু নিষ্পাপ। বলে রাখছি, একদিন ওরই বা আমারই সাহায্যে তোমার হাতে শেষ হাতকড়ি পড়বে, তখন কিছু মনে কোরো না যেন। তোমার এ-বাড়িতে আসার খবর বটুই প্রথম থানার কানাকানি-বিভাগে জানিয়েছে। কাজেই আমাকে টেক্কা দিতে হল, ফোটোগ্রাফ তুলে ওদের কাছে দিয়েছি। এখন কাজের কথা বলি। চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে সময় দিচ্ছি, তার পরেও যদি এখানে থাক তা হলে আমিই তোমাকে থানার পথে এগিয়ে দেব। এখান থেকে কোথায় যেতে হবে সবিস্তারে তার রাস্তাঘাট এই লিখে দিয়েছি— এর অক্ষর তোমার জানা আছে, তবু মুখস্থ করেই ছিঁড়ে ফেলো। এই দেখো ম্যাপ। রাস্তার এপাশে তোমার বাসা, ইস্কুলবাড়ির কোণের ঘরে। ঠিক সামনে পুলিসের থানা। সেখানে আছে আমার কোনো এক সম্পর্কে নাতি, রাইটর কনস্টেবল, তাকে রাঘব বোয়াল বলি। তিনপুরুষে পশ্চিমে বাস। বাংলা পড়াবার মাস্টারি পেয়েছ তুমি। সেখানে গেলেই রাঘব তোমার তোরঙ্গ ঘাঁটবে, পকেট ঝাড়া দেবে, গুতোগাঁতাও দিতে পারে। সেইটেকেই ভগবানের দয়া বলে মনে কোরো। বাঙালি মাত্রই যে শ্যালকসম্প্রদায়ভুক্ত এই তত্ত্বটি রঘুবীরের হিন্দিভাষায় সর্বদাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। তুমি তার কোনোপ্রকার রূঢ় প্রতিবাদের চেষ্টামাত্র কোরো না, প্রাণ থাকতে এদেশে ফিরে এসো না। বাইসিক্‌লটা রইল বাইরে। ইশারা যখনি পাবে সেই মুহূর্তে চড়ে বোসো। এসো বাবাজি, শেষ দিনের মতো কোলাকুলি করে নিই।' কোলাকুলি হয়ে গেলে চলে গেল কানাই।

অতীন চুপ করে বসে রইল। তাকিয়ে দেখতে লাগল অন্তরের দিকে। অকালে এসে পড়ল তার জীবনের শেষ অঙ্ক, যবনিকা আসন্নপতনমুখী, দীপ নিবে এসেছে। যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল

নির্মল ভোরের আলোয়; সেখান থেকে আজ অনেক দূরে এসে পড়েছে। পথে পা বাড়াবার সময় যে পাথেয় হাতে ছিল তার কিছুই বাকি নেই; পথের শেষভাগে নিজেকে কেবলই ঠকিয়ে খেয়েছে; একদিন হঠাৎ পথের একটা বাঁকের মুখে সৌন্দর্যের যে আশ্চর্য দান নিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী তার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে যেন অলৌকিক; তেমন অপরিসীম ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ হবে ওর জীবনে, সে-কথা এর আগে ও কখনোই সম্ভব বলে ভাবতে পারে নি, কেবল তার রূপরূপ দেখেছে কাব্যে ইতিহাসে; বারে বারে মনে হয়েছে দান্তে বিয়াত্রিচে নূতন জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের ভিতরে কথা কয়েছে, দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্তের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাঁপ দিয়ে, কিন্তু তার সত্য কোথায়, বীর্য কোথায়, গৌরব কোথায়, দেখতে দেখতে অনিবার্য বেগে যে পাঁকের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে এল সেই মুখোশপরা চুরিডাকাতি-খুনোখুনির অন্ধকারে ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ কখনো উঠবে না। আত্মার সর্বনাশ ঘটিয়ে অবশেষে আজ সে দেখছে কোনো যথার্থ ফল নেই এতে, নিঃসংশয় পরাভব সামনে। পরাভবেরও মূল্য আছে কিন্তু আত্মার পরাভবের নয়, যে-পরাভব টেনে আনল গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়, যার অর্থ নেই, যার অন্ত নেই।

দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। ঝিঁঝি পোকার ডাক উঠেছে প্রাঙ্গণে, কোথায় গোরুর গাড়ি চলেছে তার আর্তস্বর শোনা যায়।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে দ্রুতপদে এসে পড়ল এলা, আত্মহত্যার জন্যে একঝোঁকে মানুষ জলে পড়ে যেমন ভাবে তেমনি আলুথালু অন্ধবেগে। অতীন লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতেই তার বুকের উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলতে লাগল, 'অতীন, অতীন, পারলুম না থাকতে।'

অতীন ধীরে ধীরে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে সরিয়ে ধরে ওর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বললে, 'এলী, কী কাণ্ড করলে তুমি?'

সে বললে, 'কিছু জানি নে, কী করেছি।'

'এ ঠিকানা কেমন করে জানলে?'

এলা গভীর অভিমানে বললে, 'তোমার ঠিকানা তুমি তো জানাও নি।'

'যে তোমাকে জানিয়েছে সে তোমার বন্ধু নয়।'

'তাও আমি নিশ্চিত জানি কিন্তু তোমার কোনো পথ না জানতে পারলে শূন্যে শূন্যে মন ঘুরে বেড়ায়, অসহ্য হয়ে উঠে। শত্রুমিত্র বিচার করবার মতো অবস্থা আমার নয়। কতকাল তোমাকে দেখি নি বলো দেখি?'

'ধন্য তুমি!'

'তুমি ধন্য অন্তু! যেমনি আমার বাড়িতে আসা নিষেধ হল অমনি সেটা তো মেনে নিতে পারলে!'

'ওটা আমার স্বাভাবিক স্পর্ধা। প্রচণ্ড ইচ্ছে আমাকে অজগর সাপের মতো দিনরাত পাক দিয়ে দিয়ে পিষেছিল তবু তাকে মানতে পারলুম না। ওরা আমাকে বলে সেন্টিমেন্টাল, মনে ঠিক করে রেখেছিল সংকটের সময় প্রমাণ হবে আমি ভিজে মাটিতেই তৈরি। ওরা ভাবতেই পারে না সেন্টিমেন্টেই আমার অমোঘশক্তি।'

'মাস্টারমশায়ও তা জানেন।'

'এলী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই ভূতুড়ে পাড়া সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি ভদ্রমহিলা এই জায়গাটার স্বরূপ নির্ধারণ করে নি।'

'তার কারণ, বাংলাদেশের কোনো ভদ্রমহিলার অদৃষ্টে এতবড়ো গরজ এমন দুঃসহ হয়ে কোনোদিন প্রকাশ পায় নি।'

'কিন্তু এলী, আজ তুমি যে কাজ করলে সেটা অবৈধ।'

'জানি সে-কথা, মানব আমার দুর্বলতা, তবু ভাঙব নিয়ম, শুধু নিজের হয়ে না, তোমার

হয়েও। প্রতিদিন আমার মন বলেছে তুমি ডাকছ আমাকে। সাড়া দিতে পারি নে বলে যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে। বলো, আমি এসেছি বলে খুশি হয়েছ!'

'এত খুশি হয়েছি যে তা প্রমাণ করবার জন্যে বিপদ স্বীকার করতে রাজি আছি।'

'না না, তোমার কেন হবে বিপদ। যা হয় তা আমার হোক। তা হলে আমি যাই অন্তু।'

'কিছুতেই না। তুমি নিয়ম ভেঙে চলে এসেছ, আমি নিয়ম ভেঙে তোমাকে ধরে রাখব। দুজনে মিলে অপরাধ সমান করে নেওয়া যাক। নতুন বিস্ময়ের বসন্তী রঙে একদিন দেখেছিলুম তোমার ঐ মুখ, সে আজ যুগান্তরে পিছিয়ে গেছে। আজ সেই দিনটিকে আবাহন করা যাক এই পোড়ো ঘরটার মধ্যে। এসো, আরো কাছে।'

'রোসো, ঘরটা একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করি।'

'হায় রে, টাকের মাথায় চিরুনি চালাবার চেষ্টা!'

এলা একবার চারি দিক ঘুরে দেখলে। মেঝের উপর কম্বল, তার উপর চাটাই। বালিশের বদলে বই দিয়ে ভরা একটা পুরোনো ক্যাম্বিসের থলি। লেখাপড়া করবার জন্যে একখানা প্যাক-বাক্স। কোণে জলের কলসি মাটির ভাঁড় দিয়ে ঢাকা। জীর্ণ চাঙারিতে একছড়া কলা, তার মধ্যে এনামেল উঠে-যাওয়া একখানা বাটি, দৈবাৎ সুযোগ ঘটলে চা খাওয়া চলে। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা বড়ো চওড়া সিন্দুক, তার উপরে গণেশের একটি মাটির মূর্তি। তার থেকে প্রমাণ হয় এখানে অতীনের কোনো-এক দোসর আছে। এক থাম থেকে আর-এক থাম পর্যন্ত দড়ি খাটানো, তাতে নানা রঙের ছোপলাগা অনেকগুলো ময়লা গামছা। স্যাঁতসেতে ঘরে শ্বাসরুদ্ধ আকাশের বাষ্পঘন গন্ধ।

ঠিক এমন না হোক এই জাতের দৃশ্য এলা দেখেছে মাঝে মাঝে। কখনো বিশেষ দুঃখ পায় নি, বরঞ্চ ত্যাগবীর ছেলেদেরকে মনে মনে বাহাদুরি দিয়েছে। একদা এক জঙ্গলের ধারে দেখেছিল অনিপুণ হাতে রান্নার চেষ্টায় পোড়ো চালের খড়-বাখারি জ্বালানো চুলোর ভস্মাবশেষ; মনে হয়েছিল রাষ্ট্রবিপ্লবী রোমান্সের এ একটা অঙ্গারে-আঁকা ছবি। আজ কিন্তু কষ্টে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। আরামের বাহুবেষ্টনে ঘেরা ধনীর ছেলেকে অবজ্ঞা করাই এলার অভ্যস্ত। কিন্তু অতীনকে এই অপরিচ্ছন্ন মলিন অভাবজীর্ণ অকিঞ্চনতার মধ্যে কিছুতে ওর মন মিশ খাওয়াতে পারে না।

এলার উদ্‌বিগ্ন মুখ দেখে অতীন হেসে উঠল, বললে, 'আমার ঐশ্বর্য দেখছ স্তম্ভিত হয়ে, তার যে বিরাট অংশটা দেখা যাচ্ছে না, সেইটেতেই তুমি বিস্মিত। আমাদের পা খোলসা রাখতে হয়—দৌড় মারবার সময় মানুষও পিছু ডাকে না, জিনিসপত্রও না। কিছু দূরে পাটকলের মজুর-দের বস্‌তি, তারা আমাকে মাস্টারবাবু বলে ডাকে। চিঠি পড়িয়ে নেয়, ঠিকানা লিখিয়ে নেয়, বুঝিয়ে নেয় দেনাপাওনার রসিদ ঠিক হল কি না। এদের কোনো কোনো সন্তানবৎসলার শখ, ছেলেকে একদিন মজুরশ্রেণী থেকে হুজুরশ্রেণীতে ওঠাবে। আমার সাহায্য চায়, ফলফুলুরি দেয় এনে, কারো-বা ঘরে গোরু আছে দুধ জুগিয়ে থাকে।'

'অন্তু, কোণে ঐ-যে সিন্দুক আছে ওটা কার সম্পত্তি?'

'অজায়গায় একলা থাকলেই বেশি করে চোখে পড়তে হয়। অলক্ষ্মীর ঝাঁটার মুখে রাস্তার থেকে এসে পড়েছে এই ঘরটাতে মাড়োয়ারি, তৃতীয় বারকার দেউলে। আমার সন্দেহ হচ্ছে দেউলে হওয়াই ওর সর্বপ্রধান ব্যাবসা। এই পোড়ো দালানটা ওর দুজন ভাইপোর ট্রেনিং অ্যাকাডেমি। তারা ভোরবেলায় ছাতু খেয়ে কাজ করতে আসে, বস্‌তির মেয়েদের জন্যে সস্তাদামের কাপড় রঙায়, বেচে মূলধনের সুদ দেয়, আসলেরও কিছু কিছু শোধ করে। ঐ যে মাটির গামলাগুলো দেখছ, ও আমি আমার যজ্ঞের রান্নায় ব্যবহার করি নে; ওগুলোতে রঙ গোলা হয়। কাপড়গুলো তুলে রেখে যায় ঐ বাক্সের ভিতর। তা ছাড়া ওতে আছে বস্‌তির মেয়েদের প্রসাধনযোগ্য নানা জিনিস—বেলোয়ারি চুড়ি, চিরুনি, ছোটো আয়না, পিতলের বাজু। রক্ষা করবার ভার আমার

উপর আর প্রেতাত্মার উপর। বেলা তিনটের সময় সওদা করতে বেরোয়, এখানে আর ফেরে না। কলকাতায় মাড়োয়ারি জানি নে কিসের দালালি করে। আমার ইংরেজি জানার লোভে আমাকে অংশীদার করতে চেয়েছিল, জীবের প্রতি দয়া করে রাজি হই নি। আমার আর্থিক অবস্থারও সন্ধান নেবার চেষ্টা ছিল, বুঝিয়ে দিয়েছি পূর্বপুরুষের ঘরে যা ছিল মজুত আজ তারই চোদ্দো আনা ওদেরই পূর্বপুরুষের ঘরে জন্মান্তরিত।'

'এখানে তোমার মেয়াদ কতদিনের?'

'আন্দাজ করছি চব্বিশ ঘণ্টা। ঐ আঙিনায় রসে-বিগলিত নানা রঙের লীলা সমানে চলবে দিনের পর দিন, অতীন্দ্র বিলীন হয়ে যাবে পাণ্ডুবর্ণ দূরদিগন্তে। আমার ছোঁয়াচ লেগেছে যে-মাড়োয়ারিকে তাকে বেড়ি-পরা মহামারীতে না পায় এই আমি কামনা করি। এখনো বিনা মূলধনে আমার ভাগ্যভাগী হবার সম্ভবনা যে তার নেই তা বলতে পারি নে।'

'তোমার ভবিষ্যৎ ঠিকানাটা?'

'হুকুম নেই বলবার।'

'তা হলে কি কল্পনাও করতে পারব না তুমি আছ কোথায়?'

'কল্পনা করতে দোষ কী। মানস-সরোবরের তীরটা ভালো জায়গা।'

ইতিমধ্যে ঝুলির ভিতর থেকে বইগুলো বের করে এলা উলটেপালটে দেখছে। কাব্য, তার কিছু ইংরেজি, আর দুই-একখানা বাংলা।

অতীন বললে, 'এতদিন ওগুলো বয়ে বেরিয়েছি পাছে নিজের জাত ভুলি। ওরই বাণীলোকে ছিল আমার আদি বসতি। পাতা খুললেই পেনসিলে চিহ্নিত তার রাস্তা-গলির নির্দেশ পাবে। আর আজ! এই দেখো চেয়ে।'

এলা হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে অতীনের পা জড়িয়ে ধরলে। বললে, 'মাপ করো, অন্তু, আমাকে মাপ করো।'

'তোমাকে মাপ করবার কী আছে এলী? ভগবান যদি থাকেন, তাঁর যদি থাকে অসীম দয়া, তবে তিনি যেন আমাকে মাপ করেন।'

'যখন তোমাকে চিনতুম না তখন তোমাকে এই রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি।'

অতীন হেসে উঠে বললে, 'নিজেরই পাগলামির ফুল-স্টীমে এই অস্থানে পেঁচেছি সে খ্যাতিটুকুও দেবে না আমাকে? আমাকে নাবালকের কোঠায় ফেলে অভিভাবকগিরি করতে এলে আমি সইব না বলে রাখছি। তার চেয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এসো; আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলো—এসো এসো বঁধু এসো, আধো আঁচরে বোসো।'

'হয়তো বলতুম কিন্তু আজ তুমি এমন করে খেপে উঠলে কেন?'

'খেপব না? বললে কিনা ভুজমৃণালের জোরে তুমি আমাকে পথে বের করেছ!'

'সত্যি কথা বললে রাগ কর কেন?'

'সত্যি কথা হল? আমি ছিটকে পড়েছি রাস্তায় অন্তরের বেগে, তুমি উপলক্ষ মাত্র। অন্য কোনো শ্রেণীর বঙ্গমহিলাকে উপলক্ষ পেলে এতদিনে গোরা-কালা-সম্মিলনী ক্লাবে ব্রিজ খেলতে যেতুম, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গবর্নরের বক্সের অভিমুখে স্বর্গারোহণপর্বের সাধনা করতুম। যদি প্রমাণ হয় আমি মূঢ়, তবে জাঁক করে বলব, সে মূঢ়তা স্বয়ং আমারই, যাকে বলে ভগবদ্দত্ত প্রতিভা।'

'অন্তু, দোহাই তোমার, আর বাজে বকুনি বোকো না। তোমার জীবিকা আমিই ভাসিয়ে দিয়েছি, এ দুঃখ কখনো ভুলতে পারব না। দেখতে পাচ্ছি তোমার জীবনের মূল গেছে ছিন্ন হয়ে।'

'এতক্ষণে সেই মেয়ের প্রকাশ হল, যে-মেয়েটি রিয়ল। একটুকুতেই ধরা পড়ে দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে তুমি রোম্যান্টিক। যে-সংসারে কাঁসার থালায় দুধ-ভাত মাছের মুড়ো তারই কেন্দ্রে বসে

আছ তালপাতার পাখা হাতে। যেখানে পোলিটিক্যাল ঠ্যাঙার গুঁতি সেখানে আলুথালু চুলে চোখদুটো পাকিয়ে এসে পড় অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকে, সহজবুদ্ধি নিয়ে নয়।'

'খুব কথাও বলতে পার, অন্তু, মেয়েমানুষও তোমার কাছে হার মানে।'

'মেয়েমানুষ কথা বলতে পারে নাকি! তারা তো শুধু বকে। কথার টর্নেডো দিয়ে সনাতন মূঢ়তার ভিত ভাঙব বলে একদিন মনের মধ্যে ঝোড়ো মেঘ জমে উঠেছিল। সেই মূঢ়তার উপরেই তোমাদের জয়স্তম্ভ গাঁথতে বেরিয়েছ কেবল গায়ের জোরে।'

'তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বুঝিয়ে দাও আমার ভুলে তুমি ভুল কেন করলে? কেন নিলে জীবিকাবর্জনের দুঃখ?'

'ওটা আমার ব্যঞ্জনা, ইংরেজিতে যাকে বলে জেস্‌চার। ওটা আমার নিদেনকালের ভাষা। যদি দুঃখ না মানতুম তা হলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে, কিছুতে বুঝতে না তোমাকে কতখানি ভালোবেসেছি। সেই কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বোলো না ওটা দেশকে ভালোবাসা।'

'দেশ এর মধ্যে নেই অন্তু?'

'দেশের সাধনা আর তোমার সাধনা এক হয়েছে বলেই দেশ এর মধ্যে আছে। একদিন বীর্যের জোরে যোগ্যতা দেখিয়ে পেতে হত মেয়েকে। আজ সেই মরণপণের সুযোগ পেয়েছি। সে-কথাটা ভুলে সামান্য আমার জীবিকার অভাব নিয়ে তোমার ব্যথা লেগেছে অন্নপূর্ণা!'

'আমরা মেয়েরা সাংসারিক। সংসারে অকুলোন সইতে পারি নে। আমার একটা কথা তোমাকে রাখতেই হবে। আমার আছে পৈতৃক বাড়ি, আরো আছে কিছু জমা টাকা। দোহাই তোমার, বারবার দোহাই দিচ্ছি, কথা রাখো, আমার কাছে টাকা নিতে সংকোচ কোরো না। জানি তোমার খুবই দরকার।'

'খুবই দরকার পড়লে ম্যাট্রিকুলেশনের নোটবই লেখা থেকে আরম্ভ করে কুলিগিরি পর্যন্ত খোলা রয়েছে।'

'আমি মানছি, অন্তু, আমার সমস্ত জমা টাকা দেশের কাজে এতদিনে খরচ করে ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু উপার্জনে আমাদের সুযোগ কম বলেই সঞ্চয়ে আমাদের অন্ধ আসক্তি। ভীতু আমরা।'

'ওটা তোমাদের সহজবুদ্ধির উপদেশ। নিঃসম্বলতায় মেয়েদের শ্রী নষ্ট হয়।'

'আমাদের ছোটো নীড়, সেখানে টুকিটাকি কিছু আমরা জমা করি। কিন্তু সে তো কেবল বাঁচবার প্রয়োজনে নয়, ভালোবাসবার প্রয়োজনে। আমার যা-কিছু সমস্তই তোমার জন্যে এ-কথা যদি বুঝিয়ে দিতে পারি তা হলে বাঁচি।'

'কিছুতেই বুঝব না ও-কথাটা। আজ পর্যন্ত মেয়েরা জুগিয়েছে সেবা, পুরুষরা জুগিয়েছে জীবিকা। তার বিপরীত ঘটলে মাথা হেঁট হয়। যে-চাওয়া নিয়ে অসংকোচে তোমার কাছে হাত পাততে পারি তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে তুমি পণের বাঁধ বেঁধেছ। সেদিন নারায়ণী ইস্কুলের খাতা নিয়ে হিসেব মেলাচ্ছিলে। বসে পড়লুম কাছে, ঝড়ের ঘা খেয়ে চিল যেমন ধুলায় পড়ে তেমনি। মার-খাওয়া মন নিয়ে এসেছিলুম। কর্তব্যের যেমন-তেমন একটা ছাপমারা জিনিসে মেয়েদের নিষ্ঠা পাণ্ডার পায়ে তাদের অটল ভক্তির মতোই, ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব। মুখ তুলে চাইলে না। বসে বসে এক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ইচ্ছা করছিলুম ঐ সুকুমার আঙুলগুলির ডগা দিয়ে স্পর্শ-সুধা পড়ুক ঝরে আমার দেহে মনে। দরদ লাগল না তোমার কোনোখানেই। কৃপণ, সেটুকুও দিতে পারলে না! মনে মনে বললুম, আরো বেশি দাম দিতে হবে বুঝি। একদিন ফাটা মাথা কাটা দেহ নিয়ে পড়ব মাটিতে, তখন ভেঙে-পড়া প্রাণটাকে নেবে তোমার কোলে তুলে।'

এলার চোখ ছলছলিয়ে এল, বললে, 'আঃ, তোমার সঙ্গে পারি নে, অন্তু! এটুকু না চেয়ে নিতে পারলে না? কেড়ে নিলে না কেন আমার খাতা? বুঝতে পার না, তোমারই সংকোচ আমাকে সংকুচিত করে। অন্তু, তোমার স্বভাব এক জায়গায় মেয়েদের মতো। ইচ্ছে থাকতে পারে প্রবল কিন্তু উদ্দামভাবে তার দাবি প্রকাশ করতে তোমার রুচিতে ঠেকে।'

'বংশগত ধারণা, ছেলেবেলা থেকে রক্তে মাংসে জড়ানো। বরাবর ভেবে এসেছি মেয়েদের দেহে

মনে একটা শুচিতার মর্যাদা আছে; তাদের দেহের সম্মানকে সশঙ্কচিত্তে রক্ষা করা আমাদের পূর্বপুরুষগত অভ্যাস। আমার কুণ্ঠিত মনকে একটুমাত্র প্রশ্রয় দেবার জন্যে তোমার মন যদি কখনো আর্দ্র হয় তবে আমার পক্ষ থেকে ভিক্ষে চাইবার অপেক্ষা কোরো না। আমি শিখি নি তেমন করে চাইতে। ক্ষুধার সীমা নেই, তাই বলে পেটুক হতে পারব না, ওটা আমার ধাতে নেই। আমার কামনার কৌলীন্য নষ্ট করতে পারি নে।'

এলা অতীনের কাছে এসে ঘেঁষে বসল, তার মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার উপরে নিজের মাথা হেলিয়ে রাখলে। কখনো কখনো আস্তে আস্তে চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অতীন মাথা তুলে বসে এলার হাত চেপে ধরলে। বললে, 'যেদিন মোকামায় খেয়া-জাহাজে চড়েছিলুম সেদিন ভাগ্যদেবী পিতামহী অদৃশ্য হাতে কান মলে দিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারি নি। তার অনতিকাল পর থেকেই মনটা কেবল আকাশকুসুম চয়ন করে বেড়াচ্ছে স্মৃতির আকাশে। সেদিনের কথা তোমার কাছে পুরোনো হয়েছে কি?'

'একটুও না।'

'তা হলে শোনো। ভারী মাল নীচের ডেক থেকে গাড়িতে নিয়ে গেছে আমার বিহারি চাকরটা। কাছে ছিল ছোটো একটা চামড়ার কেস—এদিক ওদিকে তাকাচ্ছি কুলির অপেক্ষায়। নেহাত ভালোমানুষের মতো হঠাৎ কাছে এসে বললে, কুলি চান? দরকার কী! আমি নিচ্ছি।—হাঁ হাঁ, করেন কী, করেন কী, বলতে বলতেই সেটা তুলে ফেললে। আমার বিপত্তি দেখে যেন পুনশ্চ নিবেদনে বললে, সংকোচ বোধ করেন তো এক কাজ করুন, আমার বাক্সটা ঐ আছে তুলে নিন, পরস্পর ঋণ শোধ হয়ে যাবে।—তুলতে হল। আমার কেসের চেয়ে সাতগুণ ভারী। হাতলটা ধরে ডান হাতে বাঁ হাতে বদল করতে করতে টলতে টলতে রেলগাড়ির থর্ডক্লাস কামরায় টেনে তুললেম। তখন সিল্কের জামা ঘামে ভিজে, নিশ্বাস দ্রুত, নিস্তব্ধ অট্টহাস্য তোমার মুখে। হয়তো বা করুণা কোনো একটা জায়গায় লুকোনো ছিল, সেটা প্রকাশ করা অকর্তব্য মনে করেছিলে। সেদিন আমাকে মানুষ করবার মহৎ দায়িত্ব ছিল তোমারই হাতে।'

'ছি ছি, বোলো না, বোলো না, মনে করতে লজ্জা বোধ হয়। কী ছিলুম তখন, কী বোকা, কী অদ্ভুত! তখন তুমি হাসি চেপে রাখতে বলেই আমার স্পর্ধা বেড়ে গিয়েছিল। সহ্য করেছিলে কী করে? মেয়েদের কি বুদ্ধি থাকবার কোনো দরকার নেই?'

'থাক্ বা না থাক্ তাতে তো কিছু আসে যায় নি। সেদিন যে-পরিবেশের মধ্যে আমার কাছে দেখা দিয়েছিলে সে তো হায়ার ম্যাথম্যাটিকস নয়, লজিক নয়। সেটা যাকে বলে মোহ। শংকরাচার্যের মতো মহামল্লও যার উপর মুদ্গরপাত করে একটু টোল খাওয়াতে পারেন নি। তখন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে যাকে বলে কনে-দেখা মেঘ। গঙ্গার জল লাল আভায় টলটল করছে। ঐ ছিপছিপে ক্ষিপ্রগমন শরীরটি সেই রাঙা আলোর ভূমিকায় চিরদিন আঁকা রয়ে গেল আমার মনে। কী হল তার পরে? তোমার ডাক শুনলুম কানে। কিন্তু এসে পড়েছি কোথায়? তোমার থেকে কতদূরে! তুমিও কি জান তার সব বিবরণ?'

'আমাকে জানতে দাও না কেন অন্তু?'

'বারণ মানতে হয়। শুধু তাই কি? কী হবে সব কথা বলে?—আলো কমে গিয়েছে, এসো আরো কাছে এসো। আমার চোখ দুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে। একমাত্র তোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোটো তার আয়তন, সোনার জলে রাঙানো ফ্রেমের মতো। তারই মধ্যে ছবিটিকে বাঁধিয়ে নিই নে কেন? ঐ-যে তোমার দুই-এক গুছি অশিষ্ট চুল আলগা হয়ে চোখের উপর এসে পড়েছে, দ্রুত হাতে তুলে তুলে দিচ্ছ, কালো পাড় দেওয়া তসরের শাড়ি, ব্রোচ নেই কাঁধে, আঁচলটা মাথার চুলে বিঁধিয়ে রাখা, চোখে ক্লান্ত ক্লেশের ছায়া, ঠোঁটে মিনতির আভাস, চারি দিকে দিনের আলো ডুবে এসেছে শেষ অস্পষ্টতায়। এই যা দেখছি এইটিই আশ্চর্য সত্য, এর মানে কী কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। কোনো এক অদ্বিতীয় কবির হাতেই ধরা দিতে

পারল না বলে এর অব্যক্ত মাধুর্যের মধ্যে এত গভীর বিষাদ। এই ছোটো একটি অপরূপ পরিপূর্ণতাকে চার দিকে ভ্রূকুটি করে ঘিরে আছে বড়ো নামওয়ালা বড়ো ছায়াওয়ালা বিকৃতি।'

'কী বলছ, অন্তু!'

'অনেকখানি মিথ্যে। মনে পড়ছে কুলি-বস্‌তিতে আমাকে বাসা নিতে বলেছিলে। তোমার মনের মধ্যে ছিল আমার বংশের অভিমানকে ধূলিসাৎ করবার অভিপ্রায়। তোমার সেই সুমহৎ অধ্যবসায়ে আমার মজা লাগল। ডিমক্রাটিক পিকনিকে নাবা গেল। গাড়োয়ান-পাড়াতে ঘুরলুম। দাদা-খুড়োর সম্পর্ক পাতিয়ে চললুম বহুবিধ মোষের গোয়ালঘরের পাশে পাশে। কিন্তু তাদেরও বুঝতে বাকি ছিল না, আমারও নয় যে এই সম্পর্কের ছাপগুলো ধোপ সইবে না। নিশ্চয় এমন মহৎ লোক আছেন সব যন্ত্রেই যাঁদের সুর বাজে, এমন-কি, তুলো-ধোনা যন্ত্রেও। আমরা নকল করতে গেলে সুর মেলে না। দেখ নি তোমাদের পাড়ার খৃস্টশিষ্যকে, ব্রাদার বলে যাকে-তাকে বুকে চেপে ধরা তার অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এতে খৃস্টকে ব্যঙ্গ করা হয়।'

'কী হয়েছে তোমার অন্তু! কোন্ ক্ষোভের মুখে এ-সব কথা বলছ? তুমি কি বলতে চাও কর্তব্যকে কর্তব্য বলে মানা যায় না অরুচি কাটিয়ে দিয়েও?'

'রুচির কথা হচ্ছে না এলী, স্বভাবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরের কর্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যন্ত অরুচি সত্ত্বেও; কুরুক্ষেত্র চাষ করবার উদ্দেশে এগ্রিকালচারাল ইকনমিকস চর্চা করতে বলেন নি।'

'শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে হলে কী বলতেন, অন্তু?'

'অনেকদিন আগেই কানে-কানে বলে রেখেছেন। সেই তাঁর কানে-কানে কথাটাকে মুখ খুলে বলবার ভার ছিল আমার 'পরে। নির্বিচারে সবারই একই কর্তব্য, গুরুমশায় কানে ধরে এই কথাটা বলতেই এত কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে! তোমাকে মুখের উপরই বলছি ওদের যে-পাড়ায় অহংকার করে নম্রতা করতে যাও সেখানে তোমারও জায়গা নেই। দেবী! সবাই দেবী তোমরা! নকল দেবীর কৃত্রিম সাজ, মেয়েদের অন্য সাজেরই মতো, পুরুষ-দর্জির দোকানে বানানো।'

'দেখো অন্তু, আজও বুঝতে পারি নে যে-পথ তোমার নয়, সে-পথ থেকে কেন তুমি জোর করে ফিরে আস নি?'

'তা হলে বলি। অনেক কথা জানতুম না, অনেক কথা ভাবি নি এই পথে প্রবেশ করবার আগে। একে একে এমন সব ছেলেকে কাছে দেখলুম, বয়সে যারা ছোটো না হলে যাদের পায়ের ধুলো নিতুম। তারা চোখের সামনে কী দেখেছে, কী সয়েছে, কী অপমান হয়েছে তাদের, সে-সব দুর্বিষহ কথা কোথাও প্রকাশ হবে না। এরই অসহ্য ব্যথায় আমাকে খেপিয়ে তুলেছিল। বারবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভয়ে হার মানব না, পীড়নে হার মানব না, পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব তবু তুড়ি মেরে উপেক্ষা করব সেই হৃদয়হীন দেয়ালটাকে।'

'তার পরে কি তোমার মত বদলে গেল?'

'শোনো আমার কথা। শক্তিমানের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে, সে উপায়বিহীন হলেও সেই শক্তিমানের সমকক্ষে দাঁড়ায়; তাতে তার সম্মান রক্ষা হয়। সেই সম্মানের অধিকার আমি কল্পনা করেছিলুম। দিন যতই এগোতে থাকল চোখের সামনে দেখা গেল—অসাধারণ উচ্চ মনের ছেলে অল্পে অল্পে মনুষ্যত্ব খোয়াতে থাকল। এতবড়ো লোকসান আর কিছুই নেই। নিশ্চিত জানতুম আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে, রেগে বিদ্রূপ করবে, তবু ওদের বলেছি অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হলেও তাতে হার, পরাজয়ের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানব-ধর্মে বড়ো—নইলে এতবড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন? নির্বুদ্ধিতার আত্মঘাতের জন্যে?—আমার কথা ওদের কেউ বোঝে নি তা নয়। কিন্তু কতজনই বা!'

'তখনো ওদের ছাড়লে না কেন?'

'আর কি ছাড়তে পারি? তখন যে শাস্তির নিষ্ঠুর জাল সম্পূর্ণ জড়িয়ে এসেছে ওদের

চার দিকে। ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, বুঝতে পেরেছি ওদের মর্মান্তিক বেদনা, সেইজন্যেই রাগই করি আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারি নে। কিন্তু একটা কথা এই অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ বুঝেছি, গায়ের জোরে আমরা যাদের অত্যন্ত অসমকক্ষ তাদের সঙ্গে গায়ের জোরের মল্লযুদ্ধ করতে চেষ্টা করলে আন্তরিক দুর্গতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। রোগ সব শরীরেই দুঃখের কিন্তু ক্ষীণ শরীরে মারাত্মক। মনুষ্যত্বের অপমান করেও কিছুদিনের মতো জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা যাদের আছে বাহুবল, কিন্তু আমরা পারব না। আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষসীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।'

'কিছুকাল থেকে এই ভয়ংকর ট্র্যাজেডির চেহারা আমার কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্তু। গৌরবের আহ্বানে নেমেছিলেম কিন্তু লজ্জা বেড়ে উঠছে প্রতিদিন। এখন আমরা কী করতে পারি বলো আমাকে।'

'সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে, সেখানে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং। কিন্তু অন্তত আমাদের কজনের জন্যে এ-যাত্রায় সে-ক্ষেত্রের পথ বন্ধ। এখানকার কর্মফল এখানেই নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে।'

'সব বুঝতে পারছি, তবু অন্তু, আমাদের দেশের কাজ নিয়ে কিছুদিন থেকে এমন কঠিন ধিক্‌কার দিয়ে তুমি কথা বল, সে আমাকে বড়ো বাজে।'

'তার কারণ কী সে-কথা এখন আর না বললেও হয়, সময় চলে গেছে।'

'তবু বলো।'

'আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে—তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকো। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তর ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না, যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায়।'

'আচ্ছা অন্তু, তুমি যাকে আত্মঘাত বল সে কি কেবল আমাদেরই দেশে?'

'তা বলি নে। দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে—এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুরঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ-উদ্ধারচেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ-জন্মের মতো বলবার সময় হল না। আমার বেদনা তাই আজ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।'

এলা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, বললে, 'ফিরে এসো অন্তু।'

'আর ফেরবার পথ নেই।'

'কেন নেই?'

'অজায়গায় যদি এসে পড়ি সেখানকারও দায়িত্ব আছে শেষ পর্যন্ত।'

এলা অতীনের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'ফিরে এসো, অন্তু। এত বছর ধরে যে-বিশ্বাসের মধ্যে বাসা নিয়েছিলুম তার ভিত তুমি ভেঙে দিয়েছ। আজ আছি ভেসে-চলা ভাঙা নৌকো আঁকড়িয়ে। আমাকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাও।—অমন চুপ করে বসে থেকো না, বলো অন্তু, একটা কথা বলো। এখনি তুমি হুকুম করো আমি ভাঙব পণ। ভুল করেছি আমি। আমাকে মাপ করো।'

'উপায় নেই।'

'কেন উপায় নেই? নিশ্চয় আছে।'

'তীর লক্ষ্য হারাতে পারে, তূণে ফিরতে পারে না।'

'চার অধ্যায়' উপন্যাসের এক পৃষ্ঠা

'আমি স্বয়ংবরা, আমাকে বিয়ে করো অন্তু। আর সময় নষ্ট করতে পারব না—গান্ধর্ব বিবাহ হোক, সহধর্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে।'

'বিপদের পথ হলে নিয়ে যেতুম সঙ্গে। কিন্তু যেখানে ধর্ম নষ্ট হয়েছে সেখানে তোমাকে সহধর্মিণী করতে পারব না।—থাক্ থাক্, ও-সব কথা থাক্। এ-জীবনের নৌকোডুবির অবসানে কিছু সত্য এখনো বাকি আছে। তারই কথাটা শুনি তোমার মুখে।'

'কী বলব?'

'বলো, তুমি ভালোবেসেছ।'

'হাঁ বেসেছি।'

'বলো, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি সে-কথা তোমার মনে থাকবে আমি যখন থাকব না তখনো।'

এলা নিরুত্তরে চুপ করে বসে রইল, জল পড়তে লাগল দুই চোখে। অনেকক্ষণ পরে বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললে, 'আবার বলছি অন্তু, কিছু নাও আমার হাত থেকে—নাও এই আমার গলার হার।'

এই বলে পায়ের উপর রাখল হার।

'কিছুতেই না।'

'কেন, অভিমান?'

'হাঁ, অভিমান। এমন দিন ছিল তখন যদি দিতে, পরতুম গলায়—আজ দিলে পকেটে, অন্নাভাবের গর্তটার মধ্যে। ভিক্ষে নেব না তোমার কাছে।'

এলা অতীনের পায়ের কাছে লুটিয়ে বললে, 'নাও আমাকে তোমার সঙ্গিনী করে।'

'লোভ দেখিয়ো না এলা। অনেকবার বলেছি আমার পথ তোমার নয়।'

'তবে সে-পথ তোমারও নয়। ফিরে এসো, ফিরে এসো।'

'পথ আমার নয়, আমিই পথের। গলার ফাঁসকে গলার গয়না কেউ বলে না।'

'অন্তু, নিশ্চয় জেনো, তুমি চলে গেলে একমুহূর্ত আমি বাঁচব না। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, এ কথায় আজ যদি বা সন্দেহ কর, একান্ত মনে আশা করি মৃত্যুর পরে সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচাবার একটা কোনো রাস্তা কোথাও আছে।'

হঠাৎ অতীন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তীরের মতো তীক্ষ্ম হুইস্‌লের শব্দ এল দূর থেকে। চমকে বলে উঠল, 'চললুম।'

এলা তাকে জড়িয়ে ধরলে, বললে, 'আর-একটু থাকো।'

'না।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'কিচ্ছু জানি নে।'

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমি তোমার সেবিকা, তোমার চরণের সেবিকা, আমাকে ফেলে যেয়ো না, ফেলে যেয়ো না।'

একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল অতীন। দ্বিতীয়বার হুইস্‌লের শব্দ এল। অতীন গর্জন করে বললে, 'ছেড়ে দাও।' বলে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এলা মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে। তার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে, তার চোখে জল নেই। এমন সময় গম্ভীর গলার ডাক শুনতে পেল, 'এলা।'

চমকে উঠে বসল। দেখলে ইলেকট্রিক টর্চ হাতে ইন্দ্রনাথ। তখনি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ফিরিয়ে আনুন অন্তুকে।'

'সে কথা থাক্। এখানে কেন এলে?'

'বিপদ আছে জেনেই এসেছি।'

তীব্র ভর্ৎসনার সুরে ইন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমার বিপদের কথা কে ভাবছে? এখানকার খবর তোমাকে কে দিলে?'

'বটু।'

'তবু বুঝলে না মতলব?'

'বোঝবার বুদ্ধি আমার ছিল না। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল।'

'তোমাকে মারতে পারলে এখনি মারতুম। যাও ঘরে ফিরে। ট্যাক্‌সি আছে বাইরে।'

চতুর্থ অধ্যায়

'আবার অখিল!—পালিয়েছিস বোর্ডিং থেকে! তোর সঙ্গে কোনোমতে পারবার জো নেই। বারবার বলেছি, এ বাড়িতে খবরদার আসিস নে। মরবি যে।'

অখিল কোনো উত্তর না দিয়ে গলার সুর নামিয়ে বললে, 'একজন দাড়িওয়ালা কে পিছনের পাঁচিল টপকিয়ে বাগানে ঢুকল। তাই তোমার এ ঘরে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলুম।—ঐ শোনো পায়ের শব্দ।' অখিল তার ছুরির সবচেয়ে মোটা ফলাটা খুলে দাঁড়াল।

এলা বললে, 'ছুরি খুলতে হবে না তোমাকে, বীরপুরুষ। দে বলছি।' ওর হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিলে।

সিঁড়ি থেকে আওয়াজ এল, 'ভয় নেই, আমি অন্তু।'

মুহূর্তে এলার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে এল—বললে, 'দে দরজা খুলে।'

দরজা খুলে দিয়ে অখিল জিজ্ঞাসা করলে, 'সেই দাড়িওয়ালা কোথায়?'

'দাড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে বাগানে, বাকি মানুষটাকে পাবে এইখানেই। যাও খোঁজ করো গে দাড়ির।' অখিল চলে গেল।

এলা পাথরের মূর্তির মতো ক্ষণকাল একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, 'অন্তু, এ কী চেহারা তোমার?'

অতীন বললে, 'মনোহর নয়।'

'তবে কি সত্যি?'

'কী সত্যি?'

'তোমাকে সর্বনেশে ব্যামোয় ধরেছে।'

'নানা ডাক্তারের নানা মত, বিশ্বাস না করলেও চলে।'

'নিশ্চয় তোমার খাওয়া হয় নি?'

'ও-কথাটা থাক্। সময় নষ্ট কোরো না।'

'কেন এলে, অন্তু, কেন এলে? এরা যে তোমাকে ধরবার অপেক্ষায় আছে।'

'ওদের নিরাশ করতে চাই নে।'

অতীনের হাত চেপে ধরে এলা বললে, 'কেন এলে এই নিশ্চিত বিপদের মধ্যে। এখন উপায় কী?'

'কেন এলুম সেই কথাটা যাবার ঠিক আগেই বলে চলে যাব। ইতিমধ্যে যতক্ষণ পারি ঐ কথাটাই ভুলে থাকতে চাই। নীচের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে আসি গে।'

খানিক পরে উপরে এসে বললে, 'চলো ছাদে। নীচের তলাকার আলোর বাল্‌বগুলো সব খুলে নিয়েছি। ভয় পেয়ো না।'

দুজনে ছাদে এসে ছাদে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে দিলে। বন্ধ দরজায় ঠেসান দিয়ে বসল অতীন, এলা বসল তার সামনে।

'এলা, মন সহজ করো। যেন কিছু হয় নি, যেন আমরা দুজনে আছি লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ হবার আগে সুন্দরকাণ্ডে। তোমার হাত অমন বরফের মতো ঠাণ্ডা কেন? কাঁপছে যে। দাও গরম করে দিই।'

এলার হাত দুখানি নিয়ে অতীন জামার নীচে বুকের উপর চেপে রাখলে। তখন দূরের পাড়ায় বিয়েবাড়িতে সানাই বাজছে।

'ভয় করছে, এলী?'

'কিসের ভয়?'

'সমস্ত কিছুর। প্রত্যেক মুহূর্তের।'

'ভয় তোমার জন্যে অন্তু, আর কিছুর জন্যে নয়।'

অতীন বললে, 'এলী, মনে করতে চেষ্টা করো আমরা আছি পঞ্চাশ কি একশো বছর পরেকার এমনি এক নিস্তব্ধ রাতে। উপস্থিতের গণ্ডিটা নিতান্ত সংকীর্ণ, তার মধ্যে ভয়ভাবনা দুঃখকষ্ট সমস্তই প্রকাণ্ডতার ভান করে দেখা দেয়। বর্তমান সেই নীচ পদার্থ যার ছোটো মুখে বড়ো কথা। ভয় দেখায় সে মুখোশ পরে—যেন আমরা মুহূর্তের কোলে নাচানো শিশু। মৃত্যু মুখোশখানা টান মেরে ফেলে দেয়। মৃত্যু অত্যুক্তি করে না। যা অত্যন্ত করে চেয়েছি তার গায়ে মোটা অঙ্কের দাম লেখা ছিল বর্তমানের ফাঁকির কলমে, যা অত্যন্ত করে হারিয়েছি তার গায়ে দুর্দিনের কালি লেবেল মেরে লিখেছে অপরিসীম দুঃখ। মিথ্যে কথা! জীবনটা জালিয়াত, সে অনন্তকালের হস্তাক্ষর জাল করে চালাতে চায়। মৃত্যু এসে হাসে, বঞ্চনার দলিলটা লোপ করে দেয়। সে হাসি নিষ্ঠুর হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, শিবের হাসির মতো সে শান্ত সুন্দর হাসি, মোহরাত্রির অবসানে। এলী, রাত্রে একলা বসে কখনো মৃত্যুর স্নিগ্ধ সুগভীর মুক্তি অনুভব করেছ, যার মধ্যে চিরকালের ক্ষমা?'

'তোমার মতো বড়ো করে দেখবার শক্তি আমার নেই অন্তু—তবু তোমাদের কথা মনে করে উদ্‌বেগে যখন অভিভূত হয়ে পড়ে মন, তখন এই কথাটা খুব নিশ্চিত করে অনুভব করতে চেষ্টা করি যে মরা সহজ।'

'ভীরু, মৃত্যুকে পালাবার পথ বলে মনে করছ কেন? মৃত্যু সবচেয়ে নিশ্চিত—জীবনের সব গতিস্রোতের চরম সমুদ্র, সব সত্যমিথ্যা ভালোমন্দর নিঃশেষ সমন্বয় তার মধ্যে। এইরাত্রে এখনি আমরা আছি সেই বিরাটের প্রসারিত বাহুর বেষ্টনে, আমরা দুজনে—মনে পড়ছে ইবসেনের চারিটি লাইন—

> Upwards
> Towards the peaks,
> Towards the stars,
> Towards the vast silence.'

এলা অতীনের হাত কোলে নিয়ে বসে রইল স্তব্ধ হয়ে। হঠাৎ অতীন হেসে উঠল। বললে, 'পিছনে মরণের কালো পর্দাখানা নিশ্চল টানা রয়েছে অসীমে, তারই উপর জীবনের কৌতুকনাট্য নেচে চলছে অন্তিম অঙ্কের দিকে। তারই একটা ছবি আজ দেখো চেয়ে। আজ তিন বছর আগে এই ছাদের উপর তুমি আমার জন্মদিনের উৎসব করেছিলে, মনে আছে?'

'খুব মনে আছে।'

'তোমার ভক্ত ছেলের দল সবাই এসেছিল। ভোজের আয়োজন ঘটা করে হয় নি। চিঁড়ে ভেজেছিলে সঙ্গে ছিল কলাইশুঁটি সিদ্ধ, মরিচের গুঁড়ো ছিটানো, ডিমের বড়াও ছিল মনে পড়ছে। সবাই মিলে খেল কাড়াকাড়ি করে। হঠাৎ মতিলাল হাত পা ছুঁড়ে শুরু করলে, আজ নবযুগে অতীনবাবুর নবজন্মের দিন—আমি লাফ দিয়ে উঠে তার মুখ চেপে ধরলুম, বললুম, বক্তৃতা যদি কর, তবে তোমার পুরোনো জন্মের দিনটা এইখানেই কাবার। বটু বললে, ছি ছি অতীনবাবু, বক্তৃতার ভ্রূণহত্যা?—নবযুগ, নবজন্ম, মৃত্যুর তোরণ প্রভৃতি ওদের বাঁধাবুলিগুলো শুনলে আমার লজ্জা করে। ওরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছে আমার মনের উপর ওদের দলের তুলি বুলোতে—কিছুতে রঙ ধরল না।'

'অন্তু, নির্বোধ আমি; আমিই ভেবেছিলুম তোমাকে মিলিয়ে নেব আমাদের সকল পদাতিকের সঙ্গে এক উর্দি পরিয়ে।'

'তাই আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওদের সঙ্গে ঘোরতর দিদিয়ানা করতে। ভেবেছিলে, আমার সংশোধনের পক্ষে কিছু ঈর্ষার প্রয়োজন আছে। স্নেহযত্ন, কুশলসম্ভাষণ, বিশেষ মন্ত্রণা, অনাবশ্যক

উদ্‌বেগ, মনিহারির রঙিন সামগ্রীর মতো ওদের সামনে সাজিয়ে রেখেছিলে তোমার পসরায়। আজও তোমার করুণ প্রশ্ন কানে শুনতে পাচ্ছি, নন্দকুমার, তোমার চোখমুখ লাল দেখছি কেন। বেচারা ভালোমানুষ, সত্যের অনুরোধে মাথাধরা অস্বীকার করতে না-করতে ছেঁড়া ন্যাকড়ার জলপটি এসে উপস্থিত। আমি মুগ্ধ, তবু বুঝতুম এই অতি অমায়িক দিদিয়ানা তোমার অতি পবিত্র ভারতবর্ষের বিশেষ ফরমাশের। একেবারে আদর্শ স্বদেশী দিদিবৃত্তি।'

'আঃ চুপ করো, চুপ করো অন্তু।'

'অনেক বাজে জিনিসের বাহুল্য ছিল সেদিন তোমার মধ্যে, অনেক হাস্যকর ভড়ং—সে কথা তোমাকে মানতেই হবে।'

'মানছি, মানছি, একশো বার মানছি। তুমিই সে-সমস্ত নিঃশেষে ঘুচিয়ে দিয়েছ। তবে আজ আবার অমন নিষ্ঠুর করে বলছ কেন?'

'কোন্‌ মনস্তাপে বলছি, শোনো। জীবিকা থেকে ভ্রষ্ট করেছ বলে সেদিন আমার কাছে মাপ চাইছিলে। যথার্থ জীবনের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি অথচ সেই সর্বনাশের পরিবর্তে যা দাবি করতে পারতুম তা মেটে নি। আমি ভেঙেছি আমার স্বভাবকে, কুসংস্কারে অন্ধ তুমি ভাঙতে পারলে না তোমার পণকে যার মধ্যে সত্য ছিল না; এজন্যে মাপ চাওয়া কি বাহুল্য ছিল? জানি, তুমি ভাবছ এতটা কী করে সম্ভব হল।'

'হাঁ অন্তু, আমার বিস্ময় কিছুতেই যায় না—জানি নে আমার এমন কী শক্তি ছিল।'

'তুমি কী করে জানবে? তোমাদের শক্তি তোমাদের নিজের নয়, ও মহামায়ার। কী আশ্চর্য সুর তোমার কণ্ঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি করে। আর তোমার এই হাতখানি, ঐ আঙুলগুলি, সত্যমিথ্যে সব-কিছুর 'পরে পরশমণি ছুঁইয়ে দিতে পারে। জানি নে, কী মোহের বেগে, ধিক্‌কার দিতে দিতেই নিয়েছি স্খলিত জীবনের অসম্মান। ইতিহাসে পড়েছি এমন বিপত্তির কথা, কিন্তু আমার মতো বুদ্ধি-অভিমানীর মধ্যে এটা যে ঘটতে পারে কখনো তা ভাবতে পারতুম না। এবার জাল ছেঁড়বার সময় এল, তাই আজ বলব তোমাকে সত্য কথা, যত কঠোর হোক।'

'বলো, বলো, যা বলতে হয় বলো। দয়া কোরো না আমাকে। আমি নির্মম, নির্জীব, আমি মূঢ়—তোমাকে বোঝবার শক্তি আমার কোনোকালে ছিল না। অতুল্য যা তাই এসেছিল হাত বাড়িয়ে আমার কাছে, অযোগ্য আমি, মূল্য দিই নি। বহুভাগ্যের ধন চিরজন্মের মতো চলে গেল। এর চেয়ে শাস্তি যদি থাকে, দাও শাস্তি।'

'থাক্‌, থাক্‌, শাস্তির কথা। ক্ষমাই করব আমি। মৃত্যু যে ক্ষমা করে সেই অসীম ক্ষমা। সেইজন্যেই আজ এসেছি।'

'সেইজন্যে?'

'হাঁ কেবলমাত্র সেইজন্যে।'

'না-ই ক্ষমা জানাতে তুমি। কিন্তু কেন এলে এমন করে বেড়া-আগুনের মধ্যে? জানি, জানি, বাঁচবার ইচ্ছে নেই তোমার। তা যদি হয় তা হলে কটা দিন কেবলমাত্র আমাকে দাও, দাও তোমার সেবা করবার শেষ অধিকার। পায়ে পড়ি তোমার।'

'কী হবে সেবা! ফুটো জীবনের ঘটে ঢালবে সুধা! তুমি জান না, কী অসহ্য ক্ষোভ আমার। শুশ্রূষা দিয়ে তার কী করতে পার, যে-মানুষ আপন সত্য হারিয়েছে!'

'সত্য হারাও নি অন্তু। সত্য তোমার অন্তরে আছে অক্ষুণ্ণ হয়ে।'

'হারিয়েছি, হারিয়েছি।'

'বোলো না, বোলো না অমন কথা।'

'আমি যে কী যদি জানতে পারতে তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠত।'

'অন্তু, আত্মনিন্দা বাড়িয়ে তুলছ কল্পনায়। নিষ্কামভাবে যা করেছ তার কলঙ্ক কখনোই লাগবে না তোমার স্বভাবে।'

'স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারি নি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই পাপে, আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না। পাণিগ্রহণ! এই হাত নিয়ে! কিন্তু কেন এ-সব কথা! সমস্ত কালো দাগ মুছবে যম-কন্যার কালো জলে, তারই কিনারায় এসে বসেছি। আজ বলা যাক্ যত-সব হালকা কথা হাসতে হাসতে। সেই জন্মদিনের ইতিবৃত্তটা শেষ করে দিই। কী বল, এলী?'

'অন্তু, মন দিতে পারছি নে।'

'আমাদের দুজনের জীবনে মন দেবার যোগ্য যা-কিছু আছে সে কেবল ঐরকম গোটাকয়েক হালকা দিনের মধ্যে। ভোলবার যোগ্য ভারী ভারী দিনই তো বহুবিস্তর।'

'আচ্ছা, বলো অন্তু।'

'জন্মদিনের খাওয়া হয়ে গেল। হঠাৎ নীরদের শখ হল পলাশির যুদ্ধ আবৃত্তি করবে। উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে গিরিশ ঘোষের ভঙ্গিতে আওড়িয়ে গেল—

কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্র কিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও ওগো দিনমণি।

নীরদ লোক ভালো, অত্যন্ত সাদাসিধে, কিন্তু নির্দয় তার স্মরণশক্তি। সভাটা ভেঙে ফেলবার জন্যে আমার মন যখন হন্যে হয়ে উঠেছে তখন ওরা ভবেশকে গান গাইতে অনুরোধ করলে। ভবেশ বললে হার্মোনিয়ম সঙ্গে না থাকলে ও হাঁ করতে পারে না।—তোমার ঘরে ঐ পাপটা ছিল না। ফাঁড়া কাটল। আশান্বিত মনে ভাবছি এইবার উপসংহার, এমন সময় সতু খামকা তর্ক তুললে, মানুষ জন্মায় জন্মদিনে না জন্মতিথিতে? যত বলি থামো, সে থামে না। তর্কের মধ্যে দেশাত্মবোধের ঝাঁজ লাগল, চড়তে লাগল গলার আওয়াজ, বন্ধুবিচ্ছেদ হয় আর কি। বিষম রাগ হল তোমার উপরে। আমার জন্মদিনকে একটা সামান্য উপলক্ষ করেছিলে, মহত্তর লক্ষ্য ছিল কর্মভাইদের একত্র করা।'

'কোন্‌টা লক্ষ্য কোন্‌টা উপলক্ষ বাইরে থেকে বিচার কোরো না অন্তু। শাস্তির যোগ্য আমি, কিন্তু অন্যায় শাস্তির না। মনে নেই তোমার, সেইবারকার জন্মদিনেই অতীন্দ্রবাবু আমার মুখে নাম নিলেন অন্তু? সেটা তো খুব ছোটো কথা নয়। তোমার অন্তু নামের ইতিহাসটা বলো শুনি।'

'সখী, তবে শ্রবণ করো। তখন বয়স আমার চার পাঁচ বছর, মাথায় ছিলুম ছোটো, কথা ছিল না মুখে, শুনেছি বোকার মতো ছিল চোখের চাহনি। জ্যাঠামশায় পশ্চিম থেকে এসে আমাকে প্রথম দেখলেন। কোলে তুলে নিলেন, বললেন, এই বালখিল্যটার নাম অতীন্দ্র রেখেছে কে? অতিশয়োক্তি অলংকার, এর নাম দাও অনতীন্দ্র। সেই অনতি শব্দটা স্নেহের কণ্ঠে অন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার কাছেও একদিন অতি হয়েছে অনতি, ইচ্ছে করে খুইয়েছে মান।'

হঠাৎ অতীন চমকে উঠে থেমে গেল। বললে, 'পায়ের শব্দ শুনেছি যেন।'

এলা বললে, 'অখিল।'

আওয়াজ এল, 'দিদিমণি।'

ছাদে আসবার দরজা খুলে দিয়ে এলা জিজ্ঞাসা করলে, 'কী।'

অখিল বললে, 'খাবার।'

বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা নেই। অদূরবর্তী দিশি রেস্‌টোরাঁ থেকে বরাদ্দমত খাবার দিয়ে যায়।

এলা বললে, 'অন্তু, চলো খেতে।'

'খাওয়ার কথা বলো না। না খেয়ে মরতে মানুষের অনেকদিন লাগে। নইলে ভারতবর্ষ টিঁকত না। ভাই অখিল, আর রাগ রেখো না মনে। আমার ভাগটা তুমিই খেয়ে নাও। তার পরে পলায়নেন সমাপয়েৎ—দৌড় দিয়ো যত পার।'

অখিল চলে গেল।

দুজনে ছাদের মেঝের উপর বসল। অতীন আবার শুরু করলে। 'সেদিনকার জন্মদিন চলতে লাগল একটানা, কেউ নড়বার নাম করে না। আমি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি, ওটা একটা ইঙ্গিত রাত-কানাদের কাছে। শেষকালে তোমাকে বললুম, সকাল সকাল তোমার শুতে যাওয়া উচিত, এই সেদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছ।— প্রশ্ন উঠল, "কটা বেজেছে?" উত্তর "সাড়ে দশটা।" সভা ভাঙবার দুটো-একটা হাইতোলা গড়িমসি-করা লক্ষণ দেখা গেল। বটু বললে, বসে রইলেন যে অতীনবাবু? চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক্।— কোথায়? না, মেথরদের বস্তিতে; হঠাৎ গিয়ে পড়ে ওদের মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে।— সর্বশরীর জ্বলে উঠল। বললুম, মদ তো বন্ধ করবে, তার বদলে দেবে কী।— বিষয়টা নিয়ে এতটা উত্তেজিত হবার দরকার ছিল না। ফল হল, যারা চলে যাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে গেল। শুরু হল— আপনি কি তবে বলতে চান— তীব্রস্বরে বলে উঠলুম— কিছু বলতে চাই নে।— এতটা বেশি ঝাঁজও বেমানান হল। গলা ভারী করে তোমার দিকে আধখানা চোখে চেয়ে বললুম, তবে আজ আসি। দোতলায় তোমার ঘরের সামনে পর্যন্ত এসে পা চলতে চায় না। কী বুদ্ধি হল বুকের পকেট চাপড়িয়ে বললুম, ফাউন্টেন পেনটা বুঝি ফেলে এসেছি। বটু বললে আমিই খুঁজে আনছি— বলেই দ্রুত চলে গেল ছাদে। পিছু পিছু ছুটলুম আমি। খানিকটা খোঁজবার ভান করে বটু ঈষৎ হেসে বললে, দেখুন তো বোধ করি পকেটেই আছে। নিশ্চিত জানতুম আমার ফাউন্টেন পেনটা আবিষ্কার করতে হলে ভূগোল সন্ধানের প্রয়োজন আমার নিজের বাসাতেই। স্পষ্ট বলতে হল, এলাদির সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। বটু বললে, বেশ তো অপেক্ষা করছি। আমি বললুম, অপেক্ষা করতে হবে না, যাও। বটু ঈষৎ হেসে বললে, 'রাগ করেন কেন অতীনবাবু, আমি চললুম।'

আবার পায়ের শব্দ শুনে অতীন চমকে উঠে থামল। অখিল এল ছাদে। বললে, 'কে একজন এই চিরকুট দিয়েছে অতীনবাবুকে। তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

এলার বুক ধড়াস করে উঠল, বললে, 'কে এল?'

অতীন বললে, 'বাবুকে ঢুকতে দাও ঘরে।' অখিল জোরের সঙ্গে বললে, 'না, দেব না।'

অতীন বললে, 'ভয় নেই, বাবুকে তুমি চেন; অনেকবার দেখেছ।'

'না চিনি নে।'

'খুব চেন। আমি বলছি, ভয় নেই, আমি আছি।'

এলা বললে, 'অখিল, যা তুই মিথ্যে ভয় করিস নে।'

অখিল চলে গেল।

এলা জিজ্ঞাসা করলে, 'বটু এসেছে না কি?'

'না বটু নয়।'

'বলো-না, কে এসেছে। আমার ভালো লাগছে না।'

'থাক্ সে-কথা, যা বলছিলুম বলতে দাও।'

'অন্তু, কিছুতেই মন দিতে পারছি নে।'

'এলা, শেষ করতে দাও আমার কাহিনী। বেশি দেরি নেই।— তুমি উঠে এলে ছাদে। মৃদুগন্ধ পেলুম রজনীগন্ধার। ফুলের গুচ্ছটি সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে একলা আমার হাতে দেবে বলে। আমাদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অন্তুর জীবনলীলা শুরু হল এই লাজুক ফুলের গোপন অভ্যর্থনায়, তার পর থেকে অতীন্দ্রনাথের বিদ্যাবুদ্ধি গাম্ভীর্য ক্রমে ক্রমে তলিয়ে গেল অতলস্পর্শ আত্মবিস্মৃতিতে। সেইদিন প্রথম তুমি আমার গলা জড়িয়ে ধরলে, বললে এই নাও জন্মদিনের উপহার— সেই পেয়েছি প্রথম চুম্বন। আজ দাবি করতে এসেছি শেষ চুম্বনের।'

অখিল এসে বললে, 'বাবুটি দরজায় ধাক্কা মারতে শুরু করেছে। ভাঙল বুঝি। বলছে, জরুরি কথা।'

'ভয় নেই অখিল, দরজা ভাঙবার আগেই তাকে ঠান্ডা করব। বাবুকে ঐখানেই অনাথ করে রেখে তুমি এখনি পালাও অন্য ঠিকানায়। আমি আছি এলাদির খবর নিতে।'

এলা অখিলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমো খেয়ে বললে, 'সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, ভাই আমার, তুই চলে যা। তোর জন্যে কখানা নোট আমার আঁচলে বেঁধে রেখেছি, তোর এলাদির আশীর্বাদ। আমার পা ছুঁয়ে বল্, এখনি তুই যাবি, দেরি করবি নে।'

অতীন বললে, 'অখিল, আমার একটি পরামর্শ তোমাকে শুনতেই হবে। যদি তোমাকে কখনো কোনো প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করে তুমি ঠিক কথাই বলবে। বোলো এই রাত এগারোটার সময় আমিই তোমাকে জোর করে এ-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। চলো কথাটাকে সত্য করে আসি।'

এলা আর-একবার অখিলকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, 'আমার জন্যে ভাবিস নে ভাই। তোর অন্তুদা রইল, কোনো ভয় নেই।'

অখিলকে যখন ঠেলে নিয়ে অতীন চলছে এলা বললে, 'আমিও যাই তোমার সঙ্গে অন্তু।'

আদেশের স্বরে অতীন বললে, 'না, কিছুতেই না।'

ছাদের ছোটো পাঁচিলটার উপর বুক চেপে ধরে এলা দাঁড়িয়ে রইল— কণ্ঠের কাছে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল কান্না, বুঝলে আজ রাত্রে ওর কাছ থেকে চিরকালের মতো অখিল গেল চলে!

ফিরে এল অতীন। এলা জিজ্ঞাসা করলে, 'কী হল, অন্তু?'

অতীন বললে, 'অখিল গেছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।'

'আর সেই লোকটি?'

'তাকেও দিয়েছি ছেড়ে। সে বসে বসে ভাবছিল কাজ ফাঁকি দিয়ে আমি বুঝি কেবল গল্পই করছি। যেন নতুন একটা আরব্য উপন্যাস শুরু হয়েছে। আরব্য উপন্যাসই বটে, সমস্তটাই গল্প, একেবারেই আজগবি গল্প। ভয় করছে এলা? আমাকে ভয় নেই তোমার?'

'তোমাকে ভয়, কী যে বল।'

'কী না করতে পারি আমি! পড়েছি পতনের শেষ সীমায়। সেদিন আমাদের দল অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুঠ করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ির গ্রামসম্পর্কে চেনা লোক— খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সে-ই এনেছে দলকে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বিধবা তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, মনু, বাবা তুই এমন কাজ করতে পারলি? তার পরে বুড়িকে আর বাঁচতে দিলে না। যাকে বলি দেশের প্রয়োজন সেই আত্মধর্মনাশের প্রয়োজনে টাকাটা এই হাত দিয়েই পৌঁচেছে যথাস্থানে। আমার উপবাস ভেঙেছি সেই টাকাতেই। এতদিন পরে যথার্থ দাগি হয়েছি চোরের কলঙ্কে, চোরাই মাল ছুঁয়েছি, ভোগ করেছি। চোর অতীন্দ্রের নাম বটু ফাঁস করে দিয়েছে। পাছে প্রমাণাভাবে শাস্তি না পাই বা অল্প শাস্তি পাই সেইজন্য পুলিস-সুপারিন্টেন্ডেন্টের মারফত সে-মকর্দমা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের না হয়ে যাতে বাঙালি জয়ন্ত হাজরার এজলাসে ওঠে কমিশনরের কাছ থেকে সেই হুকুম আনাবে বলে মন্ত্রণা করে রেখেছে। সে নিশ্চিত জানে, কাল ধরা পড়বই। ইতিমধ্যে ভয় কোরো আমাকে, আমি নিজে ভয় করি আমার মৃত আত্মার কালো ভূতটাকে। আজ তোমার ঘরে কেউ নেই।'

'কেন, তুমি আছ।'

'আমার হাত থেকে বাঁচাবে কে?'

'নেই বা বাঁচালে?'

'তোমারই আপন মণ্ডলীতে একদিন যারা ছিল এলাদির সব দেশভাই— ভাইফোঁটা দিয়েছ যাদের কপালে প্রতিবৎসর— তাদেরই মধ্যে কথা উঠেছে যে তোমার বেঁচে থাকা উচিত নয়।'

'তাদের চেয়ে বেশি অপরাধ আমি কী করেছি?'

'অনেক কথা জান তুমি, অনেকের নামধাম। পীড়ন করলে বেরিয়ে পড়বে।'

'কখনোই না।'

'কী করে বলব যে-মানুষটা এসেছিল আজ, এই হুকুম নিয়েই সে আসে নি? হুকুমের জোর কত সে তো জান তুমি।'

এলা চমকে উঠে বললে, 'সত্যি বলছ অন্তু, সত্যি?'

'একটা খবর পেয়েছি আমরা।'

'কী খবর?'

'আজ ভোররাত্রে পুলিস আসবে তোমাকে ধরতে।'

'নিশ্চিত জানতুম একদিন পুলিস আমাকে ধরতে আসছে।'

'কেমন করে জানলে?'

'কাল বটুর চিঠি পেয়েছি, সে খবর দিয়েছে পুলিস আমাকে ধরবে, লিখেছে— সে এখনো আমাকে বাঁচাতে পারে।'

'কী উপায়ে?'

'বলছে, যদি আমি তাকে বিয়ে করি তা হলে সে আমার জামিন হয়ে আমার দায় গ্রহণ করবে।'

অন্ধকার হয়ে উঠল অতীনের মুখ, জিজ্ঞাসা করলে, 'কী জবাব দিলে তুমি?'

এলা বললে, 'আমি সেই চিঠির উপরে কেবল লিখে দিলুম, পিশাচ। আর-কিছু নয়।'

'খবর পেয়েছি, সেই বটুই আসবে কাল পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে। তোমার সম্মতি পেলেই বাঘের সঙ্গে রফা করে তোমাকে কুমিরের গর্তে আশ্রয় দেবার হিতব্রতে সে উঠে পড়ে লাগবে। তার হৃদয় কোমল।'

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, 'মারো আমাকে অন্তু, নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু হতে পারে না।' মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বারবার চুমো খেয়ে খেয়ে বললে, 'মারো, এইবার মারো।' ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা।

অতীন পাথরের মূর্তির মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এলা বললে, 'একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার, সম্পূর্ণই তোমার— মরণেও তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।'

অতীন কঠিন সুরে বললে, 'যাও, এখনি শুতে যাও, হুকুম করছি শুতে যাও।'

অতীনকে বুকে চেপে ধরে এলা বলতে লাগল— 'অন্তু, অন্তু আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালোবেসেছি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই, মারো, আমাকে মারো।'

অতীন এলার হাত জোর করে ধরে তাকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, বললে, 'শোও, এখনি শোও। ঘুমোও।'

'ঘুম হবে না।'

'ঘুমোবার ওষুধ আছে আমার হাতে।'

'কিচ্ছু দরকার নেই অন্তু। আমার চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত তুমিই নাও। ক্লোরোফর্‌ম এনেছ? দাও ওটাকে ফেলে। ভীরু নই আমি; জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো। শেষ চুম্বন আজ অফুরান হল। অন্তু! অন্তু!'

দূরের থেকে হুইস্‌লের শব্দ এল।

কান্ডি। সিংহল
৫ জুন ১৯৩৪

আভাস

একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন Twentieth Century মাসিক পত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখি নি। সেই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপরপক্ষে বৈদান্তিক, তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্য প্রভাবশালী। অধ্যাত্ম বিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা-কালে যে সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।

এমন সময় লর্ড কার্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দু-মুসলমান বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালী জাতকে কৃশ করে দেবে, এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্‌বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্‌লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন 'সন্ধ্যা' কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন, তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকা-পন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এত বড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।

এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র-আন্দোলন প্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।

নানাদিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোয় তেতালার ঘরে একলা বসেছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।' এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।

এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা।

উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

পরিশিষ্ট

করুণা

সাময়িকপত্রে প্রকাশ: ১৮৭৭-৭৮

ভূমিকা

গ্রামের মধ্যে অনুপকুমারের ন্যায় ধনবান আর কেহই ছিল না। অতিথিশালানির্মাণ, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতি নানা সৎকর্মে তিনি ধনব্যয় করিতেন। তাঁহার সিন্ধুক-পূর্ণ টাকা ছিল, দেশবিখ্যাত যশ ছিল ও রূপবতী কন্যা ছিল। সমস্ত যৌবনকাল ধন উপার্জন করিয়া অনুপ বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখন কেবল তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল যে, কন্যার বিবাহ দিবেন কোথায়। সৎপাত্র পান নাই ও বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র আশ্রয়স্থল কন্যাকে পরগৃহে পাঠাইতে ইচ্ছা নাই—তজ্জন্যও আজ কাল করিয়া আর তাঁহার দুহিতার বিবাহ হইতেছে না।

সঙ্গিনী-অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। সে এমন কাল্পনিক ছিল, কল্পনার স্বপ্নে সে সমস্ত দিন-রাত্রি এমন সুখে কাটাইয়া দিত যে, মুহূর্তমাত্রও তাহাকে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। তাহার একটি পাখি ছিল, সেই পাখিটি হাতে করিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর পাড়ে কল্পনার রাজ্য নির্মাণ করিত। কাঠবিড়ালির পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া, জলে ফুল ভাসাইয়া, মাটির শিব গড়িয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইয়া দিত। এক-একটি গাছকে আপনার সঙ্গিনী ভগ্নী কন্যা বা পুত্র কল্পনা করিয়া তাহাদের সত্য-সত্যই সেইরূপ যত্ন করিত, তাহাদিগকে খাবার আনিয়া দিত, মালা পরাইয়া দিত, নানা প্রকার আদর করিত এবং তাদের পাতা শুকাইলে, ফুল ঝরিয়া পড়িলে, অতিশয় ব্যথিত হইত। সন্ধ্যাবেলা পিতার নিকট যা-কিছু গল্প শুনিত, বাগানে পাখিটিকে তাহাই শুনানো হইত। এইরূপে করুণা তাহার জীবনের প্রত্যুষ-কাল অতিশয় সুখে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার পিতা ও প্রতিবাসীরা মনে করিতেন যে, চিরকালই বুঝি ইহার এইরূপে কাটিয়া যাইবে।

কিছু দিন পরে করুণার একটি সঙ্গী মিলিল। অনুপের অনুগত কোনো একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মরিবার সময় তাঁহার অনাথ পুত্র নরেন্দ্রকে অনুপকুমারের হস্তে সঁপিয়া যান। নরেন্দ্র অনুপের বাটীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত, পুত্রহীন অনুপ নরেন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। নরেন্দ্রের মুখশ্রী বড়ো প্রীতিজনক ছিল না কিন্তু সে কাহারও সহিত মিশিত না, খেলিত না ও কথা কহিত না বলিয়া, ভালোমানুষ বলিয়া তাহার বড়োই সুখ্যাতি হইয়াছিল। পল্লীময় রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, নরেন্দ্রের মতো শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালক আর নাই এবং পাড়ায় এমন বৃদ্ধ ছিল না যে তাহার বাড়ির ছেলেদের প্রত্যেক কাজেই নরেন্দ্রের উদাহরণ উত্থাপন না করিত।

কিন্তু আমি তখনি বলিয়াছিলাম যে, 'নরেন্দ্র, তুমি বড়ো ভালো ছেলে নও।' কে জানে নরেন্দ্রের মুখশ্রী আমার কোনোমতে ভালো লাগিত না। আসল কথা এই, অমন বাল্যবৃদ্ধ গম্ভীর সুবোধ শান্ত বালক আমার ভালো লাগে না।

অনুপকুমারের স্থাপিত পাঠশালায় রঘুনাথ সার্বভৌম নামে এক গুরুমহাশয় ছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে অপরিমিত ভালোবাসিতেন, নরেন্দ্রকে প্রায় আপনার বাড়িতে লইয়া যাইতেন এবং অনুপের নিকট তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

এই নরেন্দ্রই করুণার সঙ্গী। করুণা নরেন্দ্রের সহিত সেই পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়া কাদার ঘর নির্মাণ করিত, ফুলের মালা গাঁথিত এবং পিতার কাছে যে-সকল গল্প শুনিয়াছিল তাহাই নরেন্দ্রকে শুনাইত, কাল্পনিক বালিকার যত কল্পনা সব নরেন্দ্রের উপর ন্যস্ত হইল। করুণা নরেন্দ্রকে এত ভালোবাসিত যে কিছুক্ষণ তাহাকে না দেখিতে পাইলে ভালো থাকিত না, নরেন্দ্র পাঠশালে গেলে সে সেই পাখিটি হাতে করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিত, দূর হইতে নরেন্দ্রকে দেখিলে তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া সেই পুষ্করিণীর পাড়ে সেই নারিকেল গাছের তলায় আসিত, ও তাহার কল্পনারচিত কত কী অদ্ভুত কথা শুনাইত।

নরেন্দ্র ক্রমে কিছু বড়ো হইলে কলিকাতায় ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। কলিকাতার

বাতাস লাগিয়া পল্লীগ্রামের বালকের কতকগুলি উৎকট রোগ জন্মিল। শুনিয়াছি স্কুলের বেতন ও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার ব্যয় যাহাকিছু পাইত তাহাতে নরেন্দ্রের তামাকের খরচটা বেশ চলিত। প্রতি শনিবারে দেশে যাইবার নিয়ম আছে। কিন্তু নরেন্দ্র তাহার সঙ্গীদের মুখে শুনিল যে, শনিবারে যদি কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়া হয় তবে গলায় দড়ি দিয়া মরাটাই বা কী মন্দ! বালক বাটীতে গিয়া অনুপকে বুঝাইয়া দিল যে, সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন বাড়িতে থাকিলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অনুপ নরেন্দ্রের বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগ দেখিয়া মনে-মনে ঠিক দিয়া রাখিলেন যে, বড়ো হইলে সে ডিপুটি মাজিস্টর হইবে।

তখন দুই-এক মাস অন্তর নরেন্দ্র বাড়িতে আসিত। কিন্তু এ আর সে নরেন্দ্র নহে। পানের পিকে ওষ্ঠাধর প্লাবিত করিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া, দুই পার্শ্বের দুই সঙ্গীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কন্‌স্টেবলদের ভীতিজনক যে নরেন্দ্র প্রদোষে কলিকাতার গলিতে গলিতে মারামারি খুঁজিয়া বেড়াইত, গাড়িতে ভদ্রলোক দেখিলে কদলীর অনুকরণে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিত, নিরীহ পান্থ বেচারিদিগের দেহে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নির্দোষীর মতো আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিত, এ সে নরেন্দ্র নহে—অতি নিরীহ, আসিয়াই অনুপকে ঢীপ্‌ করিয়া প্রণাম করে। কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে মৃদুস্বরে, নতমুখে, অতি দীনভাবে উত্তর দেয় এবং যে পথে অনুপ সর্বদা যাতায়াত করেন সেইখানে একটি ওয়েব্‌স্টার ডিক্‌সনারী বা তৎসদৃশ অন্য কোনো দীর্ঘকায় পুস্তক খুলিয়া বসিয়া থাকে।

নরেন্দ্র বহুদিনের পর বাড়ি আসিলে করুণা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। নরেন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া কত কী গল্প শুনাইত। বালিকা গল্প শুনাইতে যত উৎসুক, শুনিতে তত নহে। কাহারও কাছে কোনো নূতন কথা শুনিলেই যতক্ষণ না নরেন্দ্রকে শুনাইতে পাইত, ততক্ষণ উহা তাহার নিকট বোঝা-স্বরূপ হইয়া থাকিত। কিন্তু করুণার এইরূপ ছেলেমানুষিতে নরেন্দ্রের বড়োই হাসি পাইত, কখনো কখনো সে বিরক্ত হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিত। নরেন্দ্র সঙ্গীদের নিকটে করুণার কথাপ্রসঙ্গে নানাবিধ উপহাস করিত।

নরেন্দ্র বাড়ি আসিলে পণ্ডিতমহাশয় সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এমন-কি, সেদিন সন্ধ্যার সময়েও গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বাঁশঝাড়ময় পল্লীপথ দিয়া রামনাম জপিতে জপিতে নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, নরেন্দ্রকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া নানাবিধ কুশলসংবাদ লইতেন। এই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া দুই-একজন সঙ্গী নরেন্দ্রকে তাঁহার টিকি কাটিতে পরামর্শ দিয়াছিল, এ বিষয় লইয়া গম্ভীরভাবে অনেক পরামর্শ ও অনেক ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল, কিন্তু দেশে নরেন্দ্রের তেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল না বলিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের টিকিটি নির্বিঘ্নে ছিল।

এই রূপে দেশে আদর ও বিদেশে আমোদ পাইয়া নরেন্দ্র বাড়িতে লাগিল। নরেন্দ্রের বাল্যকাল অতীত হইল।

অনুপ এখন অতিশয় বৃদ্ধ, চক্ষে দেখিতে পান না, শয্যা হইতে উঠিতে পারেন না, এক মুহূর্তও করুণাকে কাছ-ছাড়া করিতেন না। অনুপের জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে; তিনি নরেন্দ্রকে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া আনিয়াছেন, অন্তিম কালে নরেন্দ্র ও পণ্ডিতমহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহাদের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

অনুপের মৃত্যুর পর সার্বভৌমমহাশয় নিজে পৌরোহিত্য করিয়া নরেন্দ্রের সহিত করুণার বিবাহ দিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে। নরেন্দ্র যে কিরূপ লোক তাহা এতদিনে পাড়ার লোকেরা টের পাইল, আর হতভাগিনী করুণাকে যে কষ্ট পাইতে হইবে তাহা এতদিনে তাহারা বুঝিতে পারিল। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় দুয়ের কোনোটাই বুঝিলেন না।

করুণা আজকাল কিছু মনের কষ্টে আছে। মনের উল্লাসে বিজন কাননে সে খেলা করিবে, বক্ষে করিয়া লইয়া পাখির সঙ্গে কত কী কথা কহিবে, কোলের উপর রাশি রাশি ফুল রাখিয়া পাদুটি ছড়াইয়া আপন মনে গুন গুন করিয়া গান গাইতে গাইতে মালা গাঁথিবে, যাহাকে ভালোবাসে তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া অস্ফুট আহ্লাদে বিহ্বল ও অস্ফুটভাবে ভোর হইয়া যাইবে—সেই বালিকা বড়ো কষ্ট পাইয়াছে। তাহার মনের মতো কিছুই হয় না। অভাগিনী যে নরেন্দ্রকে এত ভালোবাসে—যাহাকে দেখিলে খেলা ভুলিয়া যায়, মালা ফেলিয়া দেয়, পাখি রাখিয়া দিয়া ছুটিয়া আসে, সে কেন করুণাকে দেখিলে যেন বিরক্ত হয়। করুণা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কী বলিতে আসে, সে কেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ভার করিয়া থাকে। করুণা তাহাকে কাছে বসিতে কত মিনতি করে, সে কেন কোনো ছল করিয়া চলিয়া যায়। নরেন্দ্র তাহার সহিত এমন নির্জীবভাবে এমন নীরসভাবে কথাবার্তা কয়, সকল কথায় এমন বিরক্তভাবে উত্তর দেয়, সকল কাজে এমন প্রভুভাবে আদেশ করে যে, বালিকার খেলা ঘুরিয়া যায় ও মালা গাঁথা সাঙ্গ হয় বুঝি—বালিকার আর বুঝি পাখির সহিত গান গাওয়া হইয়া উঠে না।

মূল কথাটা এই, নরেন্দ্র ও করুণায় কখনোই বনিতে পারে না। দুইজনে দুই বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত। নরেন্দ্র করুণার সেই ভালোবাসার কত কী অসংলগ্ন কথার মধ্যে কিছুই মিষ্টতা পাইত না, তাহার সেই প্রেমে-মাখানো অতৃপ্ত স্থির দৃষ্টি-মধ্যে ঢলঢল লাবণ্য দেখিতে পাইত না, তাহার সেই উচ্ছ্বসিত নির্ঝরিণীর ন্যায় অধীর সৌন্দর্যের মিষ্টতা নরেন্দ্র কিছুই বুঝিত না। কিন্তু সরলা করুণা, সে অত কী বুঝিবে! সে ছেলেবেলা হইতেই নরেন্দ্রের গুণ ছাড়া দোষের কথা কিছুই শুনে নাই। কিন্তু করুণার একি দায় হইল। তাহার কেমন কিছুতেই আশ মিটে না, সে আশ মিটাইয়া নরেন্দ্রকে দেখিতে পায় না, সে আশ মিটাইয়া মনের সকল কথা নরেন্দ্রকে বলিতে পারে না—সে সকল কথাই বলে অথচ মনে করে যেন কোনো কথাই বলা হইল না।

একদিন নরেন্দ্রকে বেশ পরিবর্তন করিতে দেখিয়া করুণা জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যাইতেছ।'

নরেন্দ্র কহিলেন, 'কলিকাতায়।'

করুণা। কলিকাতায় কেন যাইবে।

নরেন্দ্র ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, 'কাজ না থাকিলে কখনো যাইতাম না।'

একটা বিড়ালশাবক ছুটিয়া গেল। করুণা তাহাকে ধরিতে গেল, অনেকক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া ধরিতে পারিল না। অবশেষে ঘরে ছুটিয়া আসিয়া নরেন্দ্রের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, 'আজ যদি তোমাকে কলিকাতায় যাইতে না দিই?'

নরেন্দ্র কাঁধ হইতে হাত ফেলিয়া দিয়া কহিল, 'সরো, দেখো দেখি, আর একটু হলেই ডিক্যান্‌টারটি ভাঙিয়া ফেলিতে আর কি।'

করুণা। দেখো, তুমি কলিকাতায় যাইয়ো না। পণ্ডিতমহাশয় তোমাকে যাইতে দিতে নিষেধ করেন।

নরেন্দ্র কিছুই উত্তর না দিয়া শিস্‌ দিতে দিতে চুল আঁচড়াইতে লাগিলেন। করুণা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ও এক শিশি এসেন্স্‌ আনিয়া নরেন্দ্রের চাদরে খানিকটা ঢালিয়া দিল।

নরেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। করুণা দুই একবার বারণ করিল, কিছু হাঁ হুঁ না দিয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরি গাইতে গাইতে নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ নরেন্দ্রকে দেখা যায় করুণা চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর সে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত হইতেই চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া পাখিটি হাতে করিয়া লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে মালা গাঁথিতে বসিল।

বালিকা স্বভাবত এমন প্রফুল্লহৃদয় যে, বিষাদ অধিকক্ষণ তাহার মনে তিষ্ঠিতে পারে না। হাসির লাবণ্যে তাহার বিশাল নেত্র দুটি এমন মগ্ন যে রোদনের সময়ও অশ্রুর রেখা ভেদ করিয়া হাসির কিরণ জ্বলিতে থাকে। যাহা হউক, করুণার চপল ব্যবহারে পাড়ার মেয়েমহলে বেহায়া বলিয়া তাহার বড়োই অখ্যাতি জন্মিয়াছিল—'বুড়াধাড়ি মেয়ে'র অতটা বাড়াবাড়ি তাহাদের ভালো লাগিত না। এ-সকল নিন্দার কথা করুণা বাড়ির পুরাতন দাসী ভবির কাছে সব শুনিতে পাইত। কিন্তু তাহাতে তাহার আইল গেল কী? সে তেমনি ছুটাছুটি করিত, সে ভবির গলা ধরিয়া তেমনি করিয়াই হাসিত, সে পাখির কাছে মুখ নাড়িয়া তেমনি করিয়াই গল্প করিত। কিন্তু এই প্রফুল্ল হৃদয় একবার যদি বিষাদের আঘাতে ভাঙিয়া যায়, এই হাস্যময় অজ্ঞান শিশুর মতো চিন্তাশূন্য সরল মুখশ্রী একবার যদি দুঃখের অন্ধকারে মলিন হইয়া যায়, তবে বোধ হয় বালিকা আহত লতাটির ন্যায় জন্মের মতো ম্রিয়মাণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, বর্ষার সলিলসেকে—বসন্তের বায়ুবীজনে আর বোধ হয় সে মাথা তুলিতে পারে না।

নরেন্দ্র অনুপের যে অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহাতে পল্লীগ্রামে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। অনুপের জীবদ্দশায় খেতের ধান, পুকুরের মাছ ও বাগানের শাক-সব্জি ফলমূলে দৈনিক আহারব্যয় যৎসামান্য ছিল। ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইত, নিয়মিত পূজা-অর্চনা দানধ্যান ও আতিথ্যের ব্যয় ভিন্ন আর কোনো ব্যয়ই ছিল না। অনুপের মৃত্যুর পর অতিথিশালাটি বাবুর্চিখানা হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণগুলার জ্বালায় গোটা চারেক দরোয়ান রাখিতে হইল, তাহারা প্রত্যেক ভট্টাচার্যকে রীতিমত অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিত এবং প্রত্যেক ভট্টাচার্য বিধিমতে নরেন্দ্রকে উচ্ছিন্ন যাইবার ব্যবস্থা করিয়া যাইত। নরেন্দ্র গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটি ডিস্‌পেন্‌সরি স্থাপন করিলেন। শুনিয়াছি নহিলে সেখানে ব্রাণ্ডি কিনিবার অন্য কোনো সুবিধা ছিল না। গবর্নমেন্টের সস্তা দোকান হইতে রায়বাহাদুরের খেলানা কিনিবার জন্য ঘোড়দৌড়ের চাঁদা পুস্তকে হাজার টাকা সই করিয়াছিলেন এবং এমন আরো অনেক সৎকার্য করিয়াছিলেন যাহা লইয়া অমৃতবাজারের একজন পত্রপ্রেরক ভারি ধুমধাম করিয়া এক পত্র লেখে। তাহার প্রতিবাদ ও তাহার পুনঃপ্রতিবাদের সময় অমূলক অপবাদ দেওয়া যে ভদ্রলোকের অকর্তব্য ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয়।

নরেন্দ্রকে পল্লীর লোকেরা জাতিচ্যুত করিল, কিন্তু নরেন্দ্র সে দিকে কটাক্ষপাতও করিলেন না। নরেন্দ্রের একজন সমাজসংস্কারক বন্ধু তাঁহার 'মরাল করেজ' লইয়া সভায় তুমুল আন্দোলন করিলেন।

নরেন্দ্র বাগবাজারে এক বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন ও কাশীপুরে এক বাগান ক্রয় করিয়াছেন। একদিন বাগবাজারের বাড়িতে সকালে বসিয়া নরেন্দ্র চা খাইতেছেন। নরেন্দ্রের সকাল ও আমাদের সকালে অনেক তফাত, সেদিন শনিবারে কুঠি যাইবার সময় দেখিয়া আসিলাম, নরেন্দ্রের নাক ডাকিতেছে। দুইটার সময় ফিরিয়া আসিবার কালে দেখি চোখ রগড়াইতেছেন, তখনো আন্তরিক ইচ্ছা আর-এক ঘুম দেন। যাহাই হউক নরেন্দ্র চা খাইতেছেন এমন সময়ে সমাজসংস্কারক গদাধরবাবু, কবিতাকুসুমমঞ্জরীপ্রণেতা কবিবর স্বরূপচন্দ্রবাবু, আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম অভ্যর্থনা সমাপ্ত হইলে সকলে চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন।

নানাবিধ কথোপকথনের পর গদাধরবাবু কহিলেন, 'দেখুন মশায়, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের দশা বড়ো শোচনীয়।'

এই সময়ে নরেন্দ্র শোচনীয় শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বরূপচন্দ্রবাবু কহিলেন—

'deplorable'। নরেন্দ্রের পক্ষে উভয় কথাই সমান ছিল, কিন্তু নরেন্দ্র এই প্রতিশব্দটি শুনিয়া শোচনীয় শব্দের অর্থটা যেন জল বুঝিয়া গেলেন। গদাধরবাবু কহিলেন, 'এখন আমাদিগের উচিত তাহাদের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিয়া দেওয়া।'

অমনি নরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে কহিলেন, 'কিন্তু এটা কতদূর হতে পারে তাই দেখা যাক। তেমন সুবিধা পাইলে অন্তঃপুরের প্রাচীর অনেক সময় ভাঙিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু পুলিসের লোকেরা তাহাতে বড়োই আপত্তি করিবে। ভাঙিয়া ফেলা দূরে থাক, একবার আমি অন্তঃপুরের প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে গিয়াছিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট তাতে আমার উপর বড়ো সন্তুষ্ট হয় নাই।'

অনেক তর্কের পর গদাধর ও স্বরূপে মিলিয়া নরেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল যে, সত্যসত্যই অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইতেছে না— তাহার তাৎপর্য এই যে স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুর হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া।

গদাধরবাবু কহিলেন, 'কত বিধবা একাদশীর যন্ত্রণায় রোদন করিতেছে, কত কুলীনপত্নী স্বামী জীবিত-সত্ত্বেও বৈধব্যজ্বালা সহ্য করিতেছে।'

স্বরূপবাবু কহিলেন, 'এ বিষয়ে আমার অনেক কবিতা আছে, কাগজওয়ালারা তার বড়ো ভালো সমালোচনা করেছে। দেখো নরেন্দ্রবাবু, শরৎকালের জ্যোৎস্নারাত্রে কখনো ছাতে শুয়েছ? চাঁদ যখন ঢলঢল হাসি ঢালতে ঢালতে আকাশে ভেসে যায় তখন তাকে দেখেছ? আবার সেই হাস্যময় চাঁদকে যখন ঘোর অন্ধকারে মেঘে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন মনের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট উপস্থিত হয়, তা কি কখনো সহ্য করেছ। তা যদি করে থাকো তবে বলো দেখি স্ত্রীলোকের কষ্ট দেখলে সেইরূপ কষ্ট হয় কি না।'

নরেন্দ্রের সম্মুখে এতগুলি প্রশ্ন একে একে খাড়া হইল, নরেন্দ্র ভাবিয়া আকুল। অনেকক্ষণের পর কহিলেন, 'আমার এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।'

গদাধরবাবু কহিলেন, 'এখন কথা হচ্ছে যে, স্ত্রীলোকদের কষ্টমোচনে আমরা যদি দৃষ্টান্ত না দেখাই তবে কে দেখাইবে। এসো, আজ থেকেই এ বিষয়ের চেষ্টা করা যাক।'

নরেন্দ্রের তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। তিনি মনে-মনে কেবল ভাবিতে লাগিলেন, এখন কাহার অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিতে হইবে। গদাধরবাবু কহিলেন, 'স্মরণ থাকতে পারে মোহিনী নামে এক বিধবার কথা সেদিন বলেছিলুম, আমাদের প্রথম পরীক্ষা তাহার উপর দিয়াই চলুক। এ বিষয়ে যা-কিছু বাধা আছে তা আলোচনা করে দেখা যাক। যেমন এক একটা পোষা পাখি শৃঙ্খলমুক্ত হলেও স্বাধীনতা পেতে চায় না, তেমনি সেই বিধবাটিও স্বাধীনতার সহস্র উপায় থাকিতেও অন্তঃপুরের কারাগার হইতে মুক্ত হইতে চায় না। সুতরাং আমাদের প্রথম কর্তব্য তাহাকে স্বাধীনতার সুমিষ্ট আস্বাদ জানাইয়া দেওয়া।'

নরেন্দ্র কহিলেন সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে এ বিষয়ে কাহারও কোনোপ্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। সে বিধবার ভরণপোষণ বাসস্থান ইত্যাদি সমুদয় বন্দোবস্তের ভার নরেন্দ্র নিজ স্কন্ধে লইতে স্বীকৃত হইলেন। ক্রমে ত্রিভঙ্গচন্দ্র বিশ্বম্ভর ও জন্মেজয়বাবু আসিলেন, ক্রমে সন্ধ্যাও হইল, প্লেট আসিল, বোতল আসিল। গদাধরবাবু স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়া ও স্বরূপবাবু জ্যোৎস্না-রাত্রির বিষয়ে নানাবিধ কবিতাময় উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, ত্রিভঙ্গচন্দ্র ও বিশ্বম্ভরবাবু স্খলিত স্বরে গান জুড়িয়া দিলেন, নরেন্দ্র ও জন্মেজয় কাহাকে যে গালাগালি দিতে লাগিলেন বুঝা গেল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র

মহেন্দ্র এতদিন বেশ ভালো ছিল। ইস্কুলে ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে, কলেজে এলে, বি. এ. পাস করিয়াছে, মেডিকাল কলেজে তিন চার বৎসর পড়িয়াছে, আর কিছুদিন পড়িলেই পাস হইত— কিন্তু বিবাহ হওয়ার পর হইতেই অমন হইয়া গেল কেন। আমাদের সঙ্গে আর দেখা করিতে আসে না, আমরা গেলে ভালো করিয়া কথা কয় না— এ-সব তো ভালো লক্ষণ নয়। সহসা এরূপ পরিবর্তন যে কেন হইল আমরা ভিতরে ভিতরে তাহার সন্ধান লইয়াছি। মূল কথাটা এই, কন্যাকর্তাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া মহেন্দ্রের পিতা যে কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন তাহা মহেন্দ্রের বড়ো মনোনীত হয় নাই। মনোনীত না হইবারই কথা বটে। তাহার নাম রজনী ছিল, বর্ণও রজনীর ন্যায় অন্ধকার; তাহার গঠনও যে কিছু উৎকৃষ্ট ছিল তাহা নয়; কিন্তু মুখ দেখিলে তাহাকে অতিশয় ভালো মানুষ বলিয়া বোধ হয়। বেচারি কখনো কাহারও কাছে আদর পায় নাই, পিত্রালয়ে অতিশয় উপেক্ষিত হইয়াছিল। বিশেষত তাহার রূপের দোষে বর পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যাহার তাহার কাছে তাহাকে নিগ্রহ সহিতে হইত। কখনো কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করে নাই। একদিন আয়না খুলিয়া কপালে টিপ পরিতেছিল বলিয়া কত লোকে কত রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিল; সেই অবধি উপহাসের ভয়ে বেচারি কখনো আয়নাও খুলে নাই, কখনো বেশভূষাও করে নাই। স্বামী-আলয়ে আসিল। সেখানে স্বামীর নিকট হইতে এক মুহূর্তের নিমিত্তও আদর পাইল না, বিবাহরাত্রের পরদিন হইতে মহেন্দ্র তাহার কাছে শুইত না। এ দিকে মহেন্দ্র এমন বিদ্বান, এমন মৃদুস্বভাব, এমন সদ্‌বন্ধু ছিল, এমন আমোদদায়ক সহচর ছিল, এমন সহৃদয় লোক ছিল যে, সেও সকলকে ভালোবাসিত, তাহাকেও সকলে ভালোবাসিত। রজনীর কপালদোষে সে মহেন্দ্রও বিগড়াইয়া গেল। মহেন্দ্র পিতাকে কখনো অভক্তি করে নাই, কিন্তু বিবাহের পরদিনেই পিতাকে যাহা বলিবার নয় তাহাই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছে। পিতা ভাবিলেন তাঁহারই বুঝিবার ভুল, কলেজে পড়িলেই ছেলেরা যে অবাধ্য হইয়া যাইবে ইহা তো কথাই আছে।

রজনীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। আমি মহেন্দ্রকে গিয়া বুঝাইলাম। আমি বলিলাম, 'রজনীর ইহাতে কী দোষ আছে। তাহার কুরূপের জন্য সে কিছু দোষী নহে, দ্বিতীয়ত তাহার বিবাহের জন্য তোমার পিতাই দোষী। তবে বিনা অপরাধে বেচারিকে কেন কষ্ট দাও।' মহেন্দ্র কিছুই বুঝিল না বা আমাকেও বুঝাইল না, কেবল বলিল তাহার অবস্থায় যদি পড়িতাম তবে আমিও ঐরূপ ব্যবহার করিতাম। এ কথা যে মহেন্দ্র অতি ভুল বুঝিয়াছিল তাহা বুঝাইবার কোনো প্রয়োজন নাই, কারণ আমার সহিত গল্পের অতি অল্পই সম্বন্ধ আছে।

এ সময়ে মহেন্দ্রের কলেজ ছাড়িয়া দেওয়াটা ভালো হয় নাই। পোড়ো জমিতে কাঁটাগাছ জন্মায়, অব্যবহৃত লোহে মরিচা পড়ে, মহেন্দ্র এমন অবস্থায় কাজকর্ম ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে অনেক কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি আপনি মহেন্দ্রের কাছে গেলাম, সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম, মহেন্দ্র বিরক্ত হইল, আমি আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম।

একটা-কিছু আমোদ নহিলে কি মানুষ বাঁচিতে পারে। মহেন্দ্র যেরূপ কৃতবিদ্য, লেখাপড়ায় সে তো অনেক আমোদ পাইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা দিয়া দিয়া বইগুলার উপর মহেন্দ্রের এমন একটা অরুচি জন্মিয়াছে যে, কলেজ হইতে টাটকা বাহির হইয়াই আর একটা কিছু নূতন আমোদ পাইলেই তাহার পক্ষে ভালো হইত। মহেন্দ্র এখন একটু-আধটু করিয়া শেরী খায়। কিন্তু তাহাতে কী হানি হইল। কিন্তু হইল বৈকি। মহেন্দ্রও তাহা বুঝিত— এক-একবার বড়ো ভয় হইত, এক-একবার অনুতাপ করিত, এক-একবার প্রতিজ্ঞা করিত, আবার এক-একদিন খাইয়াও ফেলিত

এবং খাইবার পক্ষে নানাবিধ যুক্তিও ঠিক করিত। ক্রমে ক্রমে মহেন্দ্র অধোগতির গহ্বরে এক-এক সোপান করিয়া নাবিতে লাগিলেন। মদ্যটা মহেন্দ্রের এখন খুব অভ্যস্ত হইয়াছে। আমি কখনো জানিতাম না এমন-সকল সামান্য বিষয় হইতে এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটিতে পারে। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে সেই ভালো মানুষ মহেন্দ্র, স্কুলে যে ধীরে ধীরে কথা কহিত, মৃদু মৃদু হাসিত, অতি সন্তর্পণে চলাফিরা করিত, সে আজ মাতাল হইয়া অমন যা-তা বকিতে থাকিবে, সে অমন বৃদ্ধ পিতার মুখের উপর উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে। সর্বাপেক্ষা অসম্ভব মনে করিতাম যে, ছেলেবেলা আমার সঙ্গে মহেন্দ্রের এত ভাব ছিল, সে আজ আমাকে দেখিলেই বিরক্ত হইবে, আমাকে দেখিলেই ভয় করিবে যে 'বুঝি ঐ আবার লেক্‌চার দিতে আসিয়াছে'। কিন্তু আমি আর তাহাকে কিছু বুঝাইতে যাইতাম না। কাজ কী। কথা মানিবে না যখন, কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র, তখন তাহাকে বুঝাইয়া আর কী করিব। কিন্তু তাহাও বলি, মহেন্দ্র হাজার মাতাল হউক তাহার অন্য কোনো দোষ ছিল না, আপনার ঘরে বসিয়াই মাতাল হইত, কখনো ঘরের বাহির হইত না। কিন্তু অল্প দিন হইল মহেন্দ্রের চাকর শম্ভু আসিয়া আমাকে কহিল যে, বাবু বিকাল হইলে বাহির হইয়া যান আর অনেক রাত্রি হইলে বাড়ি ফিরিয়া আসেন। এই কথা শুনিয়া আমার বড়ো কষ্ট হইল, খোঁজ লইলাম, দেখিলাম দুষ্য কিছু নয়—মহেন্দ্র তাহাদের বাগানের ঘাটে বসিয়া থাকে। কিন্তু তাহার কারণ কী। এখনো তো বিশেষ কিছু সন্ধান পাই নাই।

সংস্কারক মহাশয় যে বিধবা মোহিনীর কথা বলিতেছিলেন, সে মহেন্দ্রের বাড়ির পাশেই থাকিত। মহেন্দ্রের বাড়িও আসিত, মহেন্দ্রও রোগ-বিপদে সাহায্য করিতে তাহাদের বাড়ি যাইত। মোহিনীকে দেখিতে বেশ ভালো ছিল—কেমন উজ্জ্বল চক্ষু, কেমন প্রফুল্ল ওষ্ঠাধর, সমস্ত মুখের মধ্যে কেমন একটা মিষ্ট ভাব ছিল, তাহা বলিবার নয়।

যাহা হউক, মোহিনীকে স্বাধীনতার আলোকে আনিবার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। মোহিনীকে একাদশী করিতে হয়, মোহিনী মাছ খাইতে পায় না, মোহিনীর প্রতি সমাজের এই-সকল অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া গদাধরবাবু অত্যন্ত কাতর আছেন। স্বরূপবাবু মোহিনীর উদ্দেশে নানা সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রিকায় নানাবিধ প্রেমের কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন, তাহার মধ্যে আমাদের বাংলা সমাজকে ও দেশাচারকে অনেক গালি দিলেন ও অবশেষে সমস্ত মানবজাতির উপর বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজে বড়ো বিষণ্ণ হইয়া গেলেন ও সমস্ত দিন রাত্রি অনেক নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের কাশীপুরস্থ বাগানের পাশেই মোহিনীর বাড়ি। যে ঘাটে মোহিনী জল আনিতে যাইত, নরেন্দ্র সেখানে দিন কতক আনাগোনা করিতে লাগিলেন। এই-সকল দেখিয়া মোহিনী বড়ো ভালো বুঝিল না, সে আর সে ঘাটে জল আনিতে যাইত না। সে তখন হইতে মহেন্দ্রের বাগানের ঘাটে জল তুলিতে ও স্নান করিতে যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মোহিনীর ও মহেন্দ্রের মনের কথা

'এমন করিলে পারিয়া উঠা যায় না। মহেন্দ্রের বাড়ি ছাড়িয়া দিলাম—ভাবিলাম দূরে হোক গে, ও দিকে আর মন দিব না। মহেন্দ্র আমাদের বাড়িতে আসিলে আমি রান্নাঘরে গিয়া লুকাইতাম, কিন্তু আজকাল মহেন্দ্র আবার ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকে, কী দায়েই পড়িলাম, তাহার জন্য জল আনা বন্ধ হইবে নাকি। আচ্ছা, নাহয় ঘাটেই বসিয়া থাকিল, কিন্তু অমন করিয়া তাকাইয়া থাকে কেন। লোকে কী বলিবে। আমার বড়ো লজ্জা করে। মনে করি ঘাটে আর যাইব না, কিন্তু না যাইয়া কী করি। আর কেনই বা না যাইব। সত্য কথা বলিতেছি, মহেন্দ্রকে দেখিলে আমার নানান ভাবনা আইসে, কিন্তু সে-সব ভাবনা ভুলিতেও ইচ্ছা করে না। বিকাল বেলা একবার যদি মহেন্দ্রকে দেখিতে পাই তাহাতে হানি কী। হানি হয় হউক গে, আমি তো না দেখিয়া বাঁচিব না। কিন্তু মহেন্দ্রকে জানিতে দিব না যে তাহাকে ভালোবাসি, তাহা হইলে সে আমার প্রতি যাহা খুশি তাহাই করিবে। আর এ-সকল ভালোবাসাবাসির কথা রাষ্ট্র হওয়াও কিছু নয়'—এই তো গেল মোহিনীর মনের কথা।

মহেন্দ্র ভাবে—'আমি তো রোজ ঘাটে বসিয়া থাকি, কিন্তু মোহিনী তো একদিনও আমার দিকে ফিরিয়া চায় না। আমি যেদিকে থাকি, সেদিক দিয়াও যায় না, আমাকে দেখিলে শশব্যস্তে ঘোমটা টানিয়া দেয়, পথে আমাকে দেখিলে প্রান্তভাগে সরিয়া যায়, মোহিনীর বাড়িতে গেলে কোথায় পলাইয়া যায়—এমন করিলে বড়ো কষ্ট হয়। আগে জানিতাম মোহিনী আমাকে ভালোবাসে। ভালো না বাসুক, যত্ন করে। কিন্তু আজকাল অমন করে কেন। এ কথা মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিতে কী দোষ আছে। মোহিনীকে তো আমি কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। মোহিনীর বাড়ির সকলে আমাকে এত ভালোবাসে যে, মোহিনীর সহিত কথাবার্তা কহিলে কেহ তো কিছু মনে করে না।'

একদিন বিকালে মোহিনী জল তুলিতে আসিল। মহেন্দ্র যেমন ঘাটে বসিয়া থাকিত, তেমনি বসিয়া আছে। বাগানে আর কেহ লোক নাই। মোহিনী জল তুলিয়া চলিয়া যায়। মহেন্দ্র কম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে ডাকিল, 'মোহিনী!' মোহিনী যেন শুনিতে পাইল না, চলিয়া গেল। মহেন্দ্র ফিরিয়া আর ডাকিতে সাহস করিল না। আর-একদিন মোহিনী বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে, মহেন্দ্র সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; মোহিনী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল। মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘর্মাক্ত ললাট হইয়া কত কথা কহিল, কত কথা বাধিয়া গেল, কোনো কথাই ভালো করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিল না।

মোহিনী শশব্যস্তে কহিল, 'সরিয়া যান, আমি জল লইয়া যাইতেছি।'

সেইদিন মহেন্দ্র বাড়ি গিয়াই একটা কী সামান্য কথা লইয়া পিতার সহিত ঝগড়া করিল, নির্দোষী রজনীকে অকারণ অনেকক্ষণ ধরিয়া তিরস্কার করিল, শম্ভু চাকরটাকে দুই-তিন বার মারিতে উদ্যত হইল ও মদের মাত্রা আরো খানিকটা বাড়াইল। কিছু দিনের মধ্যে গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের আলাপ হইল, তাহার দিন চারেক পরে স্বরূপবাবুর সহিত সখ্যতা জন্মিল, তাহার সপ্তাহ খানেক পরে নরেন্দ্রের সহিত পরিচয় হইল ও মাসেকের মধ্যে মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সভায় সন্ধ্যাগমে নিত্য অতিথিরূপে হাজির হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতমহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ

পূর্বে রঘুনাথ সার্বভৌম মহাশয়ের একটি টোল ছিল। অর্থাভাবে অল্প দিনেই টোলটি উঠিয়া যায়। গ্রামের বর্ধিষ্ণু জমিদার অনুপকুমার যে পাঠশালা স্থাপন করেন, অল্প বেতনে তিনি তাহার গুরুমহাশয়ের পদে নিযুক্ত হন কিন্তু গুরুমহাশয়ের পদে আসীন হইয়া তাঁহার শান্তপ্রকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

পণ্ডিতমহাশয় বলিতেন, তাঁহার বয়স সবে চল্লিশ বৎসর। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শপথ করিয়া বলা যায় তাঁহার বয়স আটচল্লিশ বৎসরের ন্যূন নয়। সাধারণ পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার আর কোনো বিষয় মিল ছিল না—তিনি খুব টসটসে রসিক পুরুষ ছিলেন না বা খটখটে ঘট-পট-বাগীশ ছিলেন না, দলাদলির চক্রান্ত করিতেন না, শাস্ত্রের বিচার লইয়া বিবাদে লিপ্ত থাকিতেন না, বিদায়-আদায়ের কোনো আশাই রাখিতেন না। কেবল মিল ছিল প্রশস্ত উদরটিতে, নস্যের ডিবাটিতে, ক্ষুদ্র টিকিটিতে ও শ্মশ্রুবিহীন মুখে। পাঠশালার বালকেরা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা তাঁহার বাড়িতেই পড়িয়া থাকিত। এই বালকদের জন্য তাঁহার অনেক সন্দেশ খরচ হইত; সন্দেশের লোভ পাইয়া বালকেরা ছিনা জোঁকের মতো তাঁহার বাড়ির মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিত। পণ্ডিতমশাই বড়োই ভালোমানুষ ছিলেন এবং দুষ্ট বালকেরা তাঁহার উপর বড়োই অত্যাচার করিত। পণ্ডিতমহাশয়ের নিদ্রাটি এমন অভ্যস্ত ছিল যে, তিনি শুইলেই ঘুমাইতেন, বসিলেই ঢুলিতেন ও দাঁড়াইলেই হাই তুলিতেন। এই সুবিধা পাইয়া বালকেরা তাঁহার নস্যের ডিবা, চটিজুতা ও চশমার ঠুঙিটি চুরি করিয়া লইত। একে তো পণ্ডিতমহাশয় অতিশয় আলগা লোক, তাহাতে পাঠশালার দুষ্ট বালকেরা তাঁহার বাটীতে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা রাখিত না। পাঠশালায় যাইবার সময় কোনোমতে তাঁহার চটিজুতা খুঁজিয়া পাইতেন না, অবশেষে শূন্যপদেই যাইতেন। একদিন সকালে উঠিয়া দৈবাৎ দেখিতে পাইলেন তাঁহার শয়নগৃহে বোলতায় চাক করিয়াছে, ভয়ে বিব্রত হইয়া সে ঘরই পরিত্যাগ করিলেন; সে ঘরে তিন পরিবার বোলতায় তিনটি চাক বাঁধিল, ইঁদুরে গর্ত করিল, মাকড়সা প্রাসাদ নির্মাণ করিল এবং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পিপীলিকা সার বাঁধিয়া গৃহময় রাজপথ বসাইয়া দিল। বালীর পক্ষে ঋষ্যমুখ পর্বত যেরূপ, পণ্ডিতমহাশয়ের পক্ষে এই ঘরটি সেরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠশালায় গমনে অনিচ্ছুক কোনো বালক যদি সেই গৃহে লুকাইত তবে আর পণ্ডিতমহাশয় তাহাকে ধরিতে পারিতেন না।

গৃহের এইরূপ আলগা অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিতমহাশয় অনেক দিন হইতে একটি গৃহিণীর চিন্তায় আছেন। পূর্বকার গৃহিণীটি বড়ো প্রচণ্ড স্ত্রীলোক ছিলেন। নিরীহপ্রকৃতি সার্বভৌম মহাশয় দিল্লীশ্বরের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। স্ত্রী নিকটে থাকিলে অন্য স্ত্রীলোক দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকিতেন। একবার একটি অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার দিকে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পত্নী সেই বালিকাটির মৃত পিতৃপিতামহ প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া যথেষ্ট গালি বর্ষণ করেন ও সার্বভৌম মহাশয়ের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, 'তুমি মরো, তুমি মরো, তুমি মরো!' পণ্ডিতমহাশয় মরণকে বড়ো ভয় করিতেন, মরণের কথা শুনিয়া তাঁহার বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর দৈনিক গালি না পাইয়া অভ্যাসদোষে দিনকতক বড়ো কষ্ট অনুভব করিতেন।

যাহা হউক, অনেক কারণে পণ্ডিতমহাশয় বিবাহের চেষ্টায় আছেন। পণ্ডিতমহাশয়ের একটা কেমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি সহস্রমিষ্টান্নের লোভ পাইলেও কাহারও বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিতেন না। কাহারও বিবাহের সংবাদ শুনিলে সমস্ত দিন মন খারাপ হইয়া থাকিত। পণ্ডিত-মহাশয়ের এক ভট্টাচার্যবন্ধু ছিলেন; তাঁহার মনে ধারণা ছিল যে তিনি বড়োই রসিক, যে ব্যক্তি তাঁহার

কথা শুনিয়া না হাসিত তাহার উপরে তিনি আন্তরিক চটিয়া যাইতেন। এই রসিক বন্ধু মাঝে মাঝে আসিয়া ভট্টাচার্যীয় ভঙ্গি ও স্বরে সার্বভৌম মহাশয়কে কহিতেন, 'ওহে ভায়া, শাস্ত্রে আছে—

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্ধোভবেৎ পুমান্।
যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্‌গৃহম্।

কিন্তু তোমাতে তদ্‌বৈপরীত্যই লক্ষিত হচ্ছে। কারণ কিনা, যখন তোমার ব্রাহ্মণী বিদ্যমান ছিলেন তখন তুমি ভয়ে আশঙ্কায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিলে, স্ত্রীবিয়োগের পর আবার দেখতে দেখতে শরীর দ্বিগুণ হয়ে উঠল। অপরন্তু শাস্ত্রে যে লিখছে বালকের দ্বারা পরিবৃত না হইলে গৃহ শ্মশানসমান হয়, কিন্তু বালক-কর্তৃক পরিবৃত হওয়া প্রযুক্তই তোমার গৃহ শ্মশানসমান হয়েছে।'

এই বলিয়া সমীপস্থ সকলকে চোখ টিপতেন ও সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিলে পর তিনি সন্তোষের সহিত মুহুর্মুহু নস্য লইতেন।

ওপারের একটি মেয়ের সঙ্গে সার্বভৌম মহাশয়ের সম্বন্ধ হইয়াছে। এ কয়দিন পণ্ডিতমহাশয় বড়ো মনের স্ফূর্তিতে আছেন। পাঠশালার ছুটি হইয়াছে। আজ পাত্র দেখিতে আসিবে, পাড়ার কোনো দুষ্ট লোকের পরামর্শ শুনিয়া পণ্ডিতমহাশয় নরেন্দ্রের নিকট হইতে এক জোড়া ফুল মোজা, জরির পোশাক ও পাগড়ি চাহিয়া আনিলেন। পাড়ার দুষ্ট লোকেরা এই-সকল বেশ পরাইয়া তাঁহাকে সঙ সাজাইয়া দিল। ক্ষুদ্রপরিসর পাগড়িটি পণ্ডিতমহাশয়ের বিশাল মস্তকের টিকির অংশটুকু অধিকার করিয়া রহিল মাত্র, চার-পাঁচটা বোতাম ছিঁড়িয়া কষ্টে-সৃষ্টে পণ্ডিতমহাশয়ের উদরের বেড়ে চাপকান কুলাইল। অনেকক্ষণের পর বেশভূষা সমাপ্ত হইলে পর সার্বভৌম মহাশয় দর্পণে একবার মুখ দেখিলেন। জরির পোশাকের চাকচিক্য দেখিয়া তাঁহার মন বড়ো তৃপ্ত হইল। কিন্তু সেই ঢলঢলে জুতা পরিয়া, আঁট সাঁট চাপকান গায়ে দিয়া চলিতেও পারেন না, নড়িতেও পারেন না, জড়ভরতের মতো এক স্থানে বসিয়াই রহিলেন। মাথা একটু নিচু করিলেই মনে হইতেছে পাগড়ি বুঝি খসিয়া পড়িবে। ঘাড়-বেদনা হইয়া উঠিল, তথাপি যথাসাধ্য মাথা উঁচু করিয়া রাখিলেন। ঘণ্টাখানেক এইরূপ বেশে থাকিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল, অনর্গল ঘর্ম প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। পল্লীর ভদ্রলোকেরা আসিয়া অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া তাঁহার বেশ পরিবর্তন করাইল।

ভট্টাচার্যমহাশয় তাঁহার অব্যবস্থিত গৃহ পরিষ্কৃত ও সজ্জিত করিবার নিমিত্ত নানা খোশামোদ করিয়া নিধিরাম ভট্টকে আহ্বান করিয়াছেন। এই নিধিরামের উপর পণ্ডিতমহাশয়ের অতিরিক্ত ভক্তি ছিল। তিনি বলিতেন, গার্হস্থ্য ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে নিধি তাঁহার পুরাতন গৃহিণীর সমান, মকদ্দমার নানাবিধ জটিল তর্কে সে স্বয়ং মেজেস্টোর সাহেবকেও ঘোল পান করাইতে পারে এবং সকল বিষয়ের সংবাদ রাখিতে ও চতুরতাপূর্বক সকল কাজ সম্পন্ন করিতে সে কালেজের ছেলেদের সমানই হউক বা কিছু কমই হউক।

চতুরতাভিমানী লোকেরা আপনার অভাব লইয়া গর্ব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য ব্যবস্থার চতুরতা জানাইতে চায় সে আপনার দারিদ্র্য লইয়া গর্ব করে, অর্থাৎ 'অর্থের অভাব সত্ত্বেও কেমন সুচারুরূপে সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেছি'। নিধি তাঁহার মূর্খতা লইয়া গর্ব করিতেন। গল্পবাগীশ লোক মাত্রেই পণ্ডিতমহাশয়ের প্রতি বড়ো অনুকূল। কারণ, নীরবে সকল প্রকারের গল্প শুনিয়া যাইতে ও বিশ্বাস করিতে পল্লীতে পণ্ডিতমহাশয়ের মতো আর কেহই ছিল না। এই গুণে বশীভূত হইয়া নিধি মাসের মধ্যে প্রায় দুই শত বার করিয়া তাঁহার এক বিবাহের গল্প শুনাইতেন। গল্পের ডালপালা ছাঁটিয়া-ছুটিয়া দিলে সারমর্ম এইরূপ দাঁড়ায়— নিধিরাম ভট্ট বর্ণ-পরিচয় পর্যন্ত শিখিয়াই লেখাপড়ায় দাঁড়ি দিয়াছিলেন, কিন্তু চালাকির জোরে বিদ্যার অভাব পূরণ করিতেন। নিধির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু এমন শ্বশুর পৃথিবীতে নাই যে নিধির মতো গোমূর্খকে জানিয়া শুনিয়া কন্যা সম্প্রদান করে। অনেক কৌশলে ও পরিশ্রমে পাত্রী

স্থির হইল। আজ জামাতাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। অদ্বিতীয় চতুর নিধি দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পালকি আনাইল এবং চাপকান ও শামলা পরিয়া গুটিকতক কাগজের তাড়া হাতে করিয়া কন্যা-কর্তাদিগের সম্মুখেই পালকিতে চড়িলেন। দাদা কহিলেন, 'ও নিধি, আজ যে তোমাকে দেখতে এয়েচেন।' নিধি কহিলেন, 'না দাদা, আজ সাহেব সকাল-সকাল আসবে, ঢের কাজ ঢের লেখাপড়া আছে, আজ আর হচ্ছে না।' কন্যাকর্তারা জানিয়া গেল যে; নিধি কাজ কর্ম করে, লেখাপড়াও জানে। তাহার পরদিনেই বিবাহ হইয়া গেল। নিধি ইহার মধ্যে একটি কথা চাপিয়া যায়, আমরা সেটি সন্ধান পাইয়াছি—পাড়ার একটি এন্‌ট্রেন্স ক্লাসের ছাত্র তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, 'যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন্‌ কলেজে পড়, তবে বলিয়ো বিশপ্‌স কলেজে।' দৈবক্রমে বিবাহসভায় ঐ প্রশ্ন করায় নিধি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়াছিল বিষাক্ত কালেজে। ভাগ্যে কন্যা কর্তারা নিধির মুর্খতাকে রসিকতা মনে করে তাই সে যাত্রায় সে মানে মানে রক্ষা পায়।

নিধি আসিয়াই মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। 'ওরে ও'—'ওরে তা'—এ ঘরে একবার, ও ঘরে একবার—এটা ওল্‌টাইয়া, ওটা পাল্‌টাইয়া—দুই-একটা বাসন ভাঙিয়া, দুই-একটা পুঁথি ছিঁড়িয়া—পাড়া-সুদ্ধ তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। কোনো কাজই করিতেছেন না অথচ মহা গোল, মহা ব্যস্ত। চটিজুতা চট চট করিয়া এ ঘর ও ঘর, এ বাড়ি ও বাড়ি, এ পাড়া ও পাড়া করিতেছেন—কোনোখানেই দাঁড়াইতেছেন না, ঊর্ধ্বশ্বাসে ইহাকে দু-একটি উহাকে দুই-একটি কথা বলিয়া আবার সট সট করিয়া গুরুমহাশয়ের বাড়ি প্রবেশ করিতেছেন। ফলটা এই সন্ধ্যার সময় গিয়া দেখিব—সার্বভৌম মহাশয়ের বাড়ি যে-কে-সেই, তবে পূর্বে এক দিনে যাহা পরিষ্কৃত হইত এখন এক সপ্তাহেও তাহা হইবে না। যাহা হউক, গৃহ পরিষ্কার করিতে গিয়া একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল—ঝাঁটার আঘাতে, লোকজনের কোলাহলে, তিন-ঘর বোলতা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিধিরামের নাক মুখ ফুলিয়া উঠিল—চটি জুতা ফেলিয়া, টিকি উড়াইয়া, কোঁচার কাপড়ে পা জড়াইতে জড়াইতে, চৌকাটে হুঁচুট খাইতে খাইতে, পণ্ডিতমশায়কে গালি দিতে দিতে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া বাড়ির ঘরে ঘরে বিশৃঙ্খল বোলতার দল উড়িয়া বেড়াইত। বেচারি পণ্ডিতমহাশয় দশ দিন আর অরক্ষিত গৃহে বোলতার ভয়ে প্রবেশ করেন নাই, প্রতিবাসীর বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ও যাইবার সময় ঘটী ঘড়া ইত্যাদি যে-সকল দ্রব্য বাড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলেন, আসিবার সময় তাহা আর দেখিতে পাইলেন না।

অদ্য বিবাহ হইবে। পণ্ডিতমহাশয় কাল সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বহুকালের পুরানো সেই ঝাঁটাগাছটি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এটি তাঁহার শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হইল। হাসিতে হাসিতে প্রত্যুষেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। চেলীর জোড় পরিয়া চন্দনচর্চিত কলেবরে ভাবে ভোর হইয়া বসিয়া আছেন। থাকিয়া থাকিয়া সহসা পণ্ডিতমহাশয়ের মনে একটি দুর্ভাবনার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, সকলই তো হইল, এখন নৌকায় উঠিবেন কী করিয়া। অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন; বিশ-বাইশ ছিলিম তাম্রকূট ভস্ম হইলে ও দুই-এক ডিবা নস্য ফুরাইয়া গেলে পর একটা সদুপায় নির্ধারিত হইল। তিনি ঠিক করিলেন যে নিধিরামকে সঙ্গে লইবেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিধিরাম সঙ্গে থাকিলে নৌকা ডুবিবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। নিধির অন্বেষণে চলিলেন। সেদিনকার দুর্ঘটনার পরে নিধি 'আর পণ্ডিতমহাশয়ের বাড়িমুখো হইব না' বলিয়া স্থির করিয়াছিল, অনেক খোশামোদে স্বীকৃত হইল। এইবার নৌকায় উঠিতে হইবে। সার্বভৌমমহাশয় তীরে দাঁড়াইয়া নস্য লইতে লাগিলেন। আমাদের নিধিরামও নৌকাকে বড়ো কম ভয় করিতেন না, যদি কন্যাকর্তাদের বাড়িতে আহারের প্রলোভন না থাকিত তাহা হইলে প্রাণান্তেও নৌকায় উঠিতেন না। অনেক কষ্টে পাঁচ-ছয়-জন মাঝিতে ধরাধরি করিয়া তাঁহাদিগকে কোনোক্রমে তো নৌকায় তুলিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা যতই নড়েচড়ে পণ্ডিতমহাশয় ততই ছটফট করেন, পণ্ডিতমহাশয় যতই ছটফট করেন নৌকা ততই টলমল করে; মহা হাঙ্গাম, মাঝিরা বিব্রত, পণ্ডিতমহাশয় চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন ও মাঝিদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন

যে, যদিই পাড়ি দিতে হইল তবে যেন ধার ধার দিয়া দেওয়া হয়। নিধিরামের মুখে কথাটি নাই। তিনি এমন অবস্থায় আছেন যে, একটু বাতাস উঠিলে বা একটু মেঘ দেখা দিলেই নৌকার মাস্তুলটা লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। পণ্ডিতমহাশয় আকুল ভাবে নিধির মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। দুই-এক জায়গায় তরঙ্গবেগে নৌকা একটু টলমল করিল, নিধি লাফাইয়া উঠিল, পণ্ডিত-মহাশয় নিধিকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখনো তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিধিকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে প্রাণহানির কোনো সম্ভাবনা নাই। নিধি সার্বভৌমমহাশয়ের বাহুপাশ ছাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতমহাশয় ততই প্রাণপণে আঁটিয়া ধরিতে লাগিলেন। শীর্ণকায় নিধি দারুণ নিষ্পেষণে রুদ্ধশ্বাস হইয়া যায় আর-কি, রোষে বিরক্তিতে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিতে করিতে নৌকা তীরে লাগিল। মাঝিরা এরূপ নৌকাযাত্রা আর কখনো দেখে নাই। তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কণ্ঠাগতপ্রাণ নিধি নিশ্বাস লইয়া বাঁচিলেন, পণ্ডিতমহাশয় এক ঘটী জল খাইয়া বাঁচিলেন।

বিবাহের সন্ধ্যা উপস্থিত। পণ্ডিতমহাশয় টিকিযুক্ত শিরে টোপর পরিয়া গদির উপর বসিয়া আছেন। অনাহারে, নৌকার পরিশ্রমে ও অভ্যাসদোষে দারুণ ঢুলিতেছেন। মাথার উপর হইতে মাঝে মাঝে টোপর খসিয়া পড়িতেছে। পার্শ্ববর্তী নিধি মাঝে মাঝে এক-একটি গুঁতা মারিতেছে; সে এমন গুঁতা যে তাহাতে মৃত ব্যক্তিরও চৈতন্য হয়, সেই গুঁতা খাইয়া পণ্ডিতমহাশয় আবার ধড়ফড়িয়া উঠিতেছেন ও শিরচ্যুত টোপরটি মাথায় পরিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চারি দিক অবলোকন করিতেছেন, সভাময় চোখ-টেপাটেপি করিয়া হাসি চলিতেছে। লগ্ন উপস্থিত হইল, বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন, পুরোহিতটি তাঁহারই টোল-আউট শিষ্য। শিষ্য মহা লজ্জায় পড়িয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয় কানে কানে কহিলেন, তাহাতে আর লজ্জা কী! এবং লজ্জা করিবার যে কোনো প্রয়োজন নাই এ কথা তিনি স্কন্দ ও কল্কিপুরাণ হইতে উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করিলেন। সার্বভৌমমহাশয় বিবাহ-আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত মন্ত্র বলিবার সময় একটা ভুল করিল। সংস্কৃতে ভুল পণ্ডিতমহাশয়ের সহ্য হইল না, অমনি মুগ্ধবোধ ও পাণিনি হইতে গণ্ডা আষ্টেক সূত্র আওড়াইয়া ও তাহা ব্যাখ্যা করিয়া পুরোহিতের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। পুরোহিত অপ্রস্তুত হইয়া ও ভেবাচেকা খাইয়া আরো কতকগুলি ভুল করিল। পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন যে, তিনি টোলে তাহাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন পুরোহিত বাবাজি চাল-কলার সহিত তাহা নিঃশেষে হজম করিয়াছেন। বিবাহ হইয়া গেল। উঠিবার সময় সার্বভৌমমহাশয় কিরূপ বেগতিকে পায়ে পা জড়াইয়া তাঁহার শ্বশুরের ঘাড়ে পড়িয়া গেলেন, উভয়ে বিবাহসভায় ভূমিসাৎ হইলেন। বরের কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, টোপর ভাঙিয়া গেল। শ্বশুরের শূলবেদনা ছিল, স্থূলকায় ভট্টাচার্যমহাশয় তাঁহার উদর চাপিয়া পড়াতে তিনি বিষম চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সাত-আট জন ধরাধরি করিয়া উভয়কে তুলিল, সভাসুদ্ধ লোক হাসিতে লাগিল, পণ্ডিতমহাশয় মর্মান্তিক অপ্রস্তুত হইলেন ও দুই-একটি কী কথা বলিলেন তাহার অর্থ বুঝা গেল না। একবার দৈবাৎ অপ্রস্তুত হইলে পদে পদে অপ্রস্তুত হইতেই হইবে। অন্তঃপুরে গিয়া গোলেমালে পণ্ডিত-মহাশয় তাঁহার শাশুড়ির পা মাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার শাশুড়ি 'নাঃ—কিছু হয় নাই' বলিলেন ও অন্দরে গিয়া সিক্ত বস্ত্রখণ্ড তাঁহার পায়ের আঙুলে বাঁধিয়া আসিলেন। আহার করিবার সময় দৈবক্রমে গলায় জল বাধিয়া গেল, আধঘণ্টা ধরিয়া কাশিতে কাশিতে নেত্র অশ্রুজলে ভরিয়া গেল। বাসর-ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটা আরসুলা আসিয়া তাঁহার গায়ে উড়িয়া বসিল। অমনি লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া, হাত পা ছড়াইয়া, মুখ বিকটাকার করিয়া তাঁহার শালীদের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িলেন। আবার দুইটি-চারিটি কান-মলা খাইয়া ঠিক স্থানে আসিয়া বসিলেন। একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি, স্ত্রী-আচার করিবার সময় পণ্ডিতমহাশয় এমন উপর্যুপরি হাঁচিতে লাগিলেন যে চারি দিকের মেয়েরা বিব্রত হইয়া পড়িল। বাসর-ঘরের বিপদ হইতে কী করিয়া উদ্ধার হইবেন এ বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয় অনেক ভাবিয়াছিলেন; সহসা নিধিকে মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু নিধির বাসর-

ঘরে যাইবার কোনো উপায় ছিল না। যাহা হউক, ভালোমানুষ বেচারি অতিশয় গোলে পড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দুটি-একটি কী কথার উত্তর দিতে গিয়া স্মৃতি ও বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এবং যখন তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করে, অনেক পীড়াপীড়ির পর গাহিয়াছিলেন 'কোথায় তারিণী মা গো বিপদে তারহ সুতে'। এই তিনি মনের সঙ্গে গাহিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্যমহাশয় রাগিণীর দিকে বড়ো একটা নজর করেন নাই, যে সুরে তিনি পুঁথি পড়িতেন সেই সুরেই গানটি গাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, অনেক কষ্টে বিবাহরাত্রি অতিবাহিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র নরেন্দ্রদের দলে মিশিয়াছে বটে, কিন্তু এখনো মহেন্দ্রের আচার-ব্যবহারে এমন একটি মহত্ত্ব জড়িত ছিল যে, নরেন্দ্র তাহার সহিত ভালো করিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না। এমন-কি, সে থাকিলে নরেন্দ্র কেমন একটা অসুখ অনুভব করিত, সে চলিয়া গেলে কেমন একটু শান্তিলাভ করিত। অলক্ষিতভাবে নরেন্দ্রের মন মহেন্দ্রের মোহিনীশক্তির পদানত হইয়াছিল।

মহেন্দ্র বড়ো মৃদুস্বভাব লোক—হাসিবার সময় মুচকিয়া হাসে, কথা কহিবার সময় মৃদুস্বরে কথা কহে, আবার অধিক লোকজন থাকিলে মূলেই কথা কহে না। সে কাহারো কথায় সায় দিতে হইলে 'হাঁ' বলিত বটে, কিন্তু সায় দিবার ইচ্ছা না থাকিলে 'হাঁ'ও বলিত না, 'না'ও বলিত না। এ মহেন্দ্র নরেন্দ্রের মনের উপর যে অমন আধিপত্য স্থাপন করিবে তাহা কিছু আশ্চর্যের বিষয় বটে।

মহেন্দ্রের সহিত গদাধরের বড়ো ভাব হইয়াছিল। ঘরে বসিয়া উভয়ে মিলিয়া দেশাচারের বিরুদ্ধে নিদারুণ কাল্পনিক সংগ্রাম করিতেন। স্বাধীনবিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গে মহেন্দ্র সংস্কারকমহাশয়ের সহিত উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন, কিন্তু বহুবিবাহনিবারণ-প্রসঙ্গে তাঁহার তেমন উৎসাহ থাকিত না। এ ভাবের তাৎপর্য যদিও গদাধরবাবু বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আমরা এক রকম বুঝিয়া লইয়াছি।

গদাধর ও স্বরূপের সঙ্গে মহেন্দ্রের যেমন বনিয়া গিয়াছিল, এমন নরেন্দ্র ও তাহার দলবলের সহিত হয় নাই। মহেন্দ্র ইহাদের নিকট ক্রমে তাহার দুই-একটি করিয়া মনের কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে মোহিনীর সহিত প্রণয়ের কথাটাও অবশিষ্ট রহিল না। এই প্রণয়ের কথাটা শুনিয়া স্বরূপবাবু অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন মহেন্দ্র তাঁহার প্রণয়ের অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন; অনেক দুঃখ করিয়া অনেক কবিতা লিখিলেন এবং আপনাকে একজন উপন্যাস নাটকের নায়ক কল্পনা করিয়া মনে-মনে একটু তৃপ্ত হইলেন।

গদাধর কোনো প্রকারে মোহিনীর পারিবারিক অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া তাহাকে মুক্ত বায়ুতে আনয়ন করিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। তিনি কহেন, গৃহ হইতে আমাদের স্বাধীনতা শিক্ষা করা উচিত, প্রথমে পারিবারিক অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে শিখিলে ক্রমশ আমরা স্বাধীনতাপথে অগ্রসর হইতে পারিব। ইংরাজি শাস্ত্রে লেখে : Charity begins at home। তেমনি গৃহ হইতে স্বাধীনতা শুরু। সংস্কারকমহাশয় নিজে বাল্যকাল হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আসিতেছেন। বারো বৎসর বয়সে পিতার সহিত বিবাদ করিয়া তিনি গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হন, ষোলো বৎসর বয়সে শিক্ষকের সহিত বিবাদ করিয়া ক্লাস ছাড়িয়া চলিয়া আসেন, কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রীর সহিত মনান্তর হয় এবং তাঁহাকে তাঁহার বাপের

বাড়ি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন এবং এইরূপে স্বাধীনতার সোপানে সোপানে উঠিয়া সম্প্রতি ত্রিশ বৎসর বয়সে নিজে সমস্ত কুসংস্কার ও প্রেজুডিসের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া অসভ্য বঙ্গদেশের নির্দয় দেশাচার সমূহকে বক্তৃতার ঝটিকায় ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের মতের ঐক্য হইল না, এমন-কি, মহেন্দ্র মনে-মনে একটু অসন্তুষ্ট হইল। গদাধর আর অধিক কিছু বলিল না; ভাবিল, 'আরো দিনকতক যাক, তাহার পরে পুনরায় এই কথা তুলিব।'

আরো দিনকতক গেল, মহেন্দ্র এখন নরেন্দ্রদের দলে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিয়াছে। মহেন্দ্রের মনে আর মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। গদাধর আর-একবার পূর্বকার কথা পাড়িল, মহেন্দ্রের তাহাতে কোনো আপত্তি হইল না।

মহেন্দ্রের নামে কলঙ্ক ক্রমে রাষ্ট্র হইতে লাগিল। কিন্তু মহেন্দ্রের হৃদয়ে এতটুকু লোকলজ্জা অবশিষ্ট ছিল না যে, এই অপবাদে তাহার মন তিলমাত্র ব্যথিত হইতে পারে।

মহেন্দ্রের ভগিনী পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা ইহাতে কিছু কষ্ট পাইল বটে, কিন্তু হতভাগিনী রজনীর হৃদয়ে যেমন আঘাত লাগিল এমন আর কাহারো নয়। যখন মহেন্দ্র মদ খাইয়া এলোমেলো বকিতে থাকে তখন রজনীর কী মর্মান্তিক ইচ্ছা হয় যে, আর কেহ সেখানে না আসে। যখন মহেন্দ্র মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে আইসে রজনী তাহাকে কোনো ক্রমে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তখন তাহার কতই-না ভয় হয় পাছে আর কেহ দেখিতে পায়। অভাগিনী মহেন্দ্রকে কোনো কথা বলিতে, পরামর্শ দিতে বা বারণ করিতে সাহস করিত না, তাহার যতদূর সাধ্য কোনো-মতে মহেন্দ্রের দোষ আর কাহাকেও দেখিতে দিত না। মহেন্দ্রের অসম্বৃত অবস্থায় রজনীর ইচ্ছা করিত তাহাকে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখে, যেন আর কেহ দেখিতে না পায়। কেহ তাহার সাক্ষাতে মহেন্দ্রের নিন্দা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না, অন্তরালে গিয়া ক্রন্দন করা ভিন্ন তাহার আর কোনো উপায় ছিল না। সে তাহার মহেন্দ্রের জন্য দেবতার কাছে কত প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু মহেন্দ্র তাহার মত্ত অবস্থায় রজনীর মরণ ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করে নাই। রজনী মনে মনে কহিত, 'রজনীর মরিতে কতক্ষণ, কিন্তু রজনী মরিলে তোমাকে কে দেখিবে।'

একদিন রাত্রি দুইটার সময় টলিতে টলিতে মহেন্দ্র ঘরে আসিয়া ভূমিতলে শুইয়া পড়িল। রজনী জাগিয়া জানালায় বসিয়া ছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বসিল। মহেন্দ্র তখন অচৈতন্য। রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কতক্ষণের পর মহেন্দ্রের মাথা কোলে তুলিয়া লইল। আর কখনো সে মহেন্দ্রের মাথা কোলে রাখে নাই; সাহসে বুক বাঁধিয়া আজ রাখিল। একটি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। ভোরের সময় মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিল; পাখা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল, 'এখানে কী করিতেছ। ঘুমাও গে না!' রজনী ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া গেল। মহেন্দ্র আবার ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতের রৌদ্র মুক্ত বাতায়ন দিয়া মহেন্দ্রের মুখের উপর পড়িল, রজনী আস্তে আস্তে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রজনী মহেন্দ্রকে যত্ন করিত, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে করিতে সাহস করিত না। সে গোপনে মহেন্দ্রের খাবার গুছাইয়া দিত, বিছানা বিছাইয়া দিত এবং সে অল্পস্বল্প যাহাকিছু মাসহারা পাইত তাহা মহেন্দ্রের খাদ্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিতেই ব্যয় করিত, কিন্তু এ-সকল কথা কেহ জানিতে পাইত না। গ্রামের বালিকারা, প্রতিবেশিনীরা, এত লোক থাকিতে নির্দোষী রজনীরই প্রতি কার্যে দোষারোপ করিত, এমন-কি, বাড়ির দাসীরাও মাঝে মাঝে তাহাকে দুই-এক কথা শুনাইতে ত্রুটি করিত না, কিন্তু রজনী তাহাতে একটি কথাও কহিত না— যদি কহিতে পারিত তবে অত কথা শুনিতেও হইত না।

. .

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইবে। মেঘ করিয়াছে, একটু বাতাস নাই, গাছে গাছে পাতায় পাতায় হাজার হাজার জোনাকি-পোকা মিট মিট করিতেছে। মোহিনীদের বাড়িতে একটি মানুষ আর জাগিয়া

নাই, এমন সময়ে তাহাদের খিড়কির দরজা খুলিয়া দুইজন তাহাদের বাগানে প্রবেশ করিল। একজন বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিল, আর-একজন গৃহে প্রবেশ করিল। যিনি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন তিনি গদাধর, যিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন তিনি মহেন্দ্র। দুইজনেরই অবস্থা বড়ো ভালো নহে, গদাধরের এমন বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে তাহা বলিবার নহে এবং মহেন্দ্রের পথের মধ্যে এমন শয়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে কী বলিব। ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, গদাধর দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলেন। পরোপকারের জন্য কী কষ্ট না সহ্য করা যায়, এমন-কি, এখনই যদি বজ্র পড়ে গদাধর তাহা মাথায় করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এই কথাটা অনেকক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, এখনই তাহাতে তিনি প্রস্তুত নহেন; বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবীর অনেক উপকার করিতে পারিবেন। বৃষ্টিবজ্রের সময় বৃক্ষতলে দাঁড়ানো ভালো নয় জানিয়া একটি ফাঁকা জায়গায় গিয়া বসিলেন, বৃষ্টি দ্বিগুণ বেগে পড়িতে লাগিল।

এ দিকে মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া মোহিনীর ঘরের দিকে চলিল, যতই সাবধান হইয়া চলে ততই খস খস শব্দ হয়। ঘরের সম্মুখে গিয়া আস্তে আস্তে দরজায় ধাক্কা মারিল, ভিতর হইতে দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, 'মোহিনী! দেখ্ তো বিড়াল বুঝি!'

দিদিমার গলা শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি সরিবার চেষ্টা দেখিলেন। সরিতে গিয়া একরাশি হাঁড়ি-কলসির উপর গিয়া পড়িলেন। হাঁড়ির উপর কলসি পড়িল, কলসির উপর হাঁড়ি পড়িল এবং কলসি হাঁড়ি উভয়ের উপর মহেন্দ্র পড়িল। হাঁড়িতে কলসিতে, থালায় ঘটিতে দারুণ ঝন ঝন শব্দ বাধাইয়া দিল এবং কলসি হইতে ঘড় ঘড় শব্দে জল গড়াইতে লাগিল। বাড়ির ঘরে ঘরে 'কী হইল' 'কী হইল' শব্দ উপস্থিত হইল। মা উঠিলেন, পিসি উঠিলেন, দিদি উঠিলেন, খোকা কাঁদিয়া উঠিল, দিদিমা বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে পোড়ারমুখা বিড়ালের মরণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—মোহিনী প্রদীপ হস্তে বাহিরে আসিল। দেখিল মহেন্দ্র; তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া কহিল, 'পালাও! পালাও!'

মহেন্দ্র পলাইবার উদ্যোগ করিল ও মোহিনী তাড়াতাড়ি প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিল। দিদিমা চক্ষে কম দেখিতেন বটে, কিন্তু কানে বড়ো ঠিক ছিলেন। মোহিনীর কথা শুনিতে পাইলেন, তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, 'কাহাকে পলাইতে বলিতেছিস মোহিনী।'

দিদিমা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু পলায়নের ধুপ ধাপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে বাড়িসুদ্ধ লোক জমা হইল।

মহেন্দ্র তো অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিল। এ দিকে গদাধর বাগানে বসিয়া ভিজিতেছিলেন, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিতেই শুইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন যেন তিনি বক্তৃতা করিতেছেন, আর হাততালির ধ্বনিতে সভা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, সভায় গভর্নর জেনেরাল উপস্থিত ছিলেন, তিনি বক্তৃতা-অন্তে পরম তুষ্ট হইয়া আপনি উঠিয়া শেক্‌হ্যান্‌ড্ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠে দারুণ এক লাঠির আঘাত লাগিল। ধড়্‌ফড়িয়া উঠিলেন; একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এখানে কী করিতেছিস। কে তুই।'

গদাধর জড়িত স্বরে কহিলেন, 'দেশ ও সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রাণ দেওয়া সকল মনুষ্যেরই কর্তব্য। ডাল ও ভাত সঞ্চয় করাই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা গলায় দড়ি দিয়া মরিলেও পৃথিবীর কোনো অনিষ্ট হয় না। দেশ-সংস্কারের জন্য রাত্রি নাই, দিবা নাই, আপনার বাড়ি নাই, পরের বাড়ি নাই, সকল সময়ে সর্বত্রই কোনো বাধা মানিবে না, কোনো বিঘ্ন মানিবে না—কেবল ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। যে না করে সে পশু, সে পশু, সে পশু! অতএব'—

আর অধিক অগ্রসর হইতে হইল না; প্রহারের চোটে তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, আর অল্পক্ষণ থাকিলে শরীর-সংস্কারের আবশ্যকতা হইত। অতিশয় বাড়াবাড়ি দেখিয়া গদাধর বক্তৃতা-ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া গোঙানিচ্ছন্দে তাঁহার মৃত পিতা, মাতা, কনেস্টেবল, পুলিস ও দেশের

লোককে ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। তাহারা বুঝিল যে, অধিক গোলযোগ করিলে তাহাদেরই বাড়ির নিন্দা হইবে, এইজন্য আস্তে আস্তে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিল।

মোহিনীর উপরে তাহার বাড়িসুদ্ধ লোকের বড়োই সন্দেহ হইল। রাত্রে কে আসিয়াছিল এবং কাহাকে সে পলাইতে কহিল, এই কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য তাহার প্রতি দারুণ নিগ্রহ আরম্ভ হইল, কিন্তু সে কোনোমতে কহিল না। কিন্তু এ কথা চাপা থাকিবার নহে। মহেন্দ্র পলাইবার সময় তাহার চাদর ও জুতা ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সকলে বুঝিতে পারিল যে মহেন্দ্রেরই এই কাজ। এই তো পাড়াময় ঢী ঢী পড়িয়া গেল! পুকুরের ঘাটে, গ্রামের পথে, ঘরের দাওয়ায়, বৃদ্ধদের চণ্ডীমণ্ডপে এই এক কথারই আলোচনা হইতে লাগিল। মোহিনীর ঘর হইতে বাহির হওয়া দায় হইল, সকলেই তাহার পানে কটাক্ষ করিয়া কথা কয়। না কহিলেও মনে হয় তাহারই কথা হইতেছে। পথে কাহারো হাস্যমুখ দেখিলে তাহার মনে হইত তাহাকে লক্ষ করিয়াই হাসি তামাসা চলিতেছে। অথচ মোহিনীর ইহাতে কোনো দোষ ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র যখন বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন তখনো অনেক রাত আছে। নেশা অনেকক্ষণ ছুটিয়া গেছে। মহেন্দ্রের মনে এক্ষণে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। ঘৃণায় লজ্জায় বিরক্তিতে ম্রিয়মাণ হইয়া শুইয়া পড়িল। একে একে কত কী কথা মনে পড়িতে লাগিল; শৈশবের এক-একটি স্মৃতি বজ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিন্ধ হইতে লাগিল। যৌবনের নবোন্মেষের সময় ভবিষ্যৎ-জীবনের কী মধুময় চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল—কত মহান আশা, কত উদার কল্পনা তাঁহার উদ্দীপ্ত হৃদয়ের শিরায় শিরায় জড়িত বিজড়িত ছিল। যৌবনের সুখস্বপ্নে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম মাতৃভূমির ইতিহাসে গৌরবের অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাঁহার জীবন তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতাদের আদর্শস্বরূপ হইবে এবং ভবিষ্যৎকাল আদরে তাঁহার যশ বক্ষে পোষণ করিতে থাকিবে। কিন্তু সে হৃদয়ের, সে আশার, সে কল্পনার আজ কী পরিণাম হইল। তাঁহার যশ কলঙ্কিত হইয়াছে, চরিত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে, হৃদয় দারুণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কালি হইতে তাঁহাকে দেখিলে গ্রামের কুলবধূগণ সংকোচে সরিয়া যাইবে, বন্ধুরা লজ্জায় নতশির হইবে, শত্রুদের অধর ঘৃণার হাস্যে কুটিল হইবে, বৃদ্ধেরা তাঁহার শৈশবের এই অনপেক্ষিত পরিণামে দুঃখ করিবে, যুবকেরা অন্তরালে তাঁহার নামে তীব্র উপহাস বিদ্রূপ করিবে—সর্বাপেক্ষা, তিনি যে নিরপরাধিনী বিধবার পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিলেন তাহার আর মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। মহেন্দ্র মর্মভেদী কষ্টে শয্যায় পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের রোদন দেখিয়া রজনীর কী কষ্ট হইতে লাগিল, রজনীই তাহা জানে। মনে-মনে কহিল, 'তোমার কী হইয়াছে বলো, যদি আমার প্রাণ দিলেও তাহার প্রতিকার হয় তবে আমি তাহাও দিব।' রজনী আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিল। কত বার মনে করিল যে, পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে, কী হইয়াছে। কিন্তু সাহস করিয়া পারিল না, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

মহেন্দ্র মনের আবেগে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া গেল। রজনী ভাবিল সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র চলিয়া গেল। আর থাকিতে পারিল না; কাতর স্বরে কহিল, 'আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি শোও!'

মহেন্দ্র তাহার কিছুই উত্তর না দিয়া অন্যমনে চলিয়া গেল।

ধীরে ধীরে বাতায়নে গিয়া বসিল। তখন মেঘমুক্ত চতুর্থীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। বাতায়নের নিম্নে পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ধারের পরস্পরসংলগ্ন অন্ধকার নারিকেল-কুঞ্জের মস্তকে অস্ফুট জ্যোৎস্নার রজতরেখা পড়িয়াছে। অস্ফুট জ্যোৎস্নায় পুষ্করিণীতীরের ছায়াময় অন্ধকার গম্ভীরতর দেখাইতেছে। জ্যোৎস্নাময় গ্রাম যতদূর দেখা যাইতেছে, এমন শান্ত, এমন পবিত্র, এমন ঘুমন্ত যে মনে হয় এখানে পাপ তাপ নাই, দুঃখ যন্ত্রণা নাই—এক স্নেহহাস্যময় জননীর কোলে যেন কতকগুলি শিশু এক সঙ্গে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। মহেন্দ্রের মন ঘোর উদাস হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল 'সকলেই কেমন ঘুমাইতেছে, কাহারও কোনো দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। কাল সকালে আবার নিশ্চিন্তভাবে উঠিবে, আপনার আপনার কাজকর্ম করিবে। কেহ এমন কাজ করে নাই যাহাতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে সে মুখ লুকাইয়া বাঁচে, এমন কাজ করে নাই যাহাতে প্রতি মুহূর্তে তীব্রতম অনুতাপে তাহার মর্মে মর্মে শেল বিদ্ধ হয়। আমিও যদি এইরূপ নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে পারিতাম, নিশ্চিন্তভাবে জাগিতে পারিতাম! আমার যদি মনের মতো বিবাহ হইত, গৃহস্থের মতো বিনা দুঃখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিতাম, স্ত্রীকে কত ভালোবাসিতাম, সংসারের কত উপকার করিতাম! কেমন সহজে দিনের পর রাত্রি, রাত্রের পর দিন কাটিয়া যাইত, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ও সমস্ত দিন ঘুমাইয়া এই বিরক্তিময় জীবন বহন করিতে হইত না। আহা—কেমন জ্যোৎস্না, কেমন রাত্রি, কেমন পৃথিবী! আঁধার নারিকেলবৃক্ষগুলি মাথায় একটু একটু জ্যোৎস্না মাখিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিয়া আছে; যেন তাহাদের বুকের ভিতর কী একটি কথা লুকানো রহিয়াছে। তাহাদের আঁধার ছায়া আঁধার পুষ্করিণীর জলের মধ্যে নিদ্রিত।'

মহেন্দ্র কতক্ষণ দেখিতে লাগিল, দেখিয়া দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল—'আমার ভাগ্যে পৃথিবী ভালো করিয়া ভোগ করা হইল না।'

মহেন্দ্র সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করিতে মনস্থ করিল, ভাবিল পৃথিবীতে যাহাকে ভালোবাসিয়াছে সকলকেই ভুলিয়া যাইবে। ভাবিল সে এ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো উপকার করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন হইতে পরোপকারের জন্য তাহার স্বাধীন জীবন উৎসর্গ করিবে। কিন্তু গৃহে রজনীকে একাকিনী ফেলিয়া গেলে সে নিরপরাধিনী যে কষ্ট পাইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে। এ কথা ভাবিলে অনেকক্ষণ ভাবা যাইত, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাবিতে ইচ্ছা হইল না—ভাবিল না।

মহেন্দ্র তাহার নিজ দোষের যত-কিছু অপবাদ-যন্ত্রণা সমুদয় অভাগিনী রজনীকে সহিতে দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বায়ু স্তম্ভিত, গ্রামপথ আঁধার করিয়া দুই ধারে বৃক্ষশ্রেণী স্তব্ধ-গম্ভীর-বিষণ্নভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সেই আঁধার পথ দিয়া ঝটিকাময়ী নিশীথিনীতে বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র একখানি মেঘখণ্ডের ন্যায় মহেন্দ্র যে দিকে ইচ্ছা চলিতে লাগিলেন।

রজনী ভাবিল যে, সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র অন্যত্র চলিয়া গেল। বাতায়নে বসিয়া জ্যোৎস্নাসুপ্ত পুষ্করিণীর জলের পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

করুণা ভাবে এ কী দায় হইল, নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসে না কেন। অধীর হইয়া বাড়ির পুরাতন চাকরানী ভবির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র কেন আসিতেছেন না। সে হাসিয়া কহিল, সে তাহার কী জানে।

করুণা কহিল, 'না, তুই জানিস।'

ভবি কহিল, 'ওমা, আমি কী করিয়া বলিব।'

করুণা কোনো কথায় কর্ণপাত করিল না। ভবির বলিতেই হইবে নরেন্দ্র কেন আসিতেছে না। কিন্তু অনেক পীড়াপীড়িতেও ভবির কাছে বিশেষ কোনো উত্তর পাইল না। করুণা অতিশয় বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল ও প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি মঙ্গলবারের মধ্যে নরেন্দ্র না আসেন তবে তাহার যতগুলি পুতুল আছে সব জলে ফেলিয়া দিবে। ভবি বুঝাইয়া দিল যে, পুতুল ভাঙিয়া ফেলিলেই যে নরেন্দ্রের আসিবার বিশেষ কোনো সুবিধা হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহার কথা শুনে কে। না আসিলে ভাঙিয়া ফেলিবেই ফেলিবে।

বাস্তবিক নরেন্দ্র অনেক দিন দেশে আসে নাই। কিন্তু পাড়ার লোকেরা বাঁচিয়াছে, কারণ আজকাল নরেন্দ্র যখনি দেশে আসে তখনি গোটা দুই-তিন কুকুর এবং তদপেক্ষা বিরক্তিজনক গোটা দুই-চার সঙ্গী তাহার সঙ্গে থাকে। তাহারা দুই-তিন দিনের মধ্যে পাড়াসুদ্ধ বিব্রত করিয়া তুলে। আমাদের পণ্ডিতমহাশয় এই কুকুরগুলা দেখিলে বড়োই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

যাহা হউক, পণ্ডিতমহাশয়ের বিবাহের কথাটা লইয়া পাড়ায় বড়ো হাসিতামাসা চলিতেছে। কিন্তু ভট্টাচার্যমহাশয় বিশ-বাইশ ছিলিম তামাকের ধুঁয়ায়, গোটাকতক নস্যের টিপে এবং নব-গৃহিণীর অভিমানকুঞ্চিত ভ্রূমেঘনিক্ষিপ্ত দুই-একটি বিদ্যুতালোকের আঘাতে সকল কথা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেন। নিধিরাম ব্যতীত পণ্ডিতমহাশয়কে বাটী হইতে কেহ বাহির করিতে পারিত না। পণ্ডিতমহাশয় আজকাল একখানি দর্পণ ক্রয় করিয়াছেন, চশমাটি সোনা দিয়া বাঁধাইয়াছেন, দূরদেশ হইতে সূক্ষ্মশুভ্র উপবীত আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী কাত্যায়নী পাড়ার মেয়েদের কাছে গল্প করিয়াছে যে, মিন্‌সা নাকি আজকাল মৃদু হাসি হাসিয়া উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে রসিকতা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন। কিন্তু পণ্ডিতমশায়ের নামে পূর্বে কখনো এরূপ কথা উঠে নাই। আমরা পণ্ডিতমহাশয়ের রসিকতার যে দুই-একটা নিদর্শন পাইয়াছি তাহার মর্মার্থ বুঝা আমাদের সাধ্য নহে। তাহার মধ্যে প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহংকার, প্রমা, অবিদ্যা, রজ্জুতে সর্পভ্রম, পর্বতোবহ্নিমান ধূমাৎ ইত্যাদি নানাবিধ দার্শনিক হাঙ্গামা আছে। পণ্ডিতমহাশয়ের বেদান্তসূত্র ও সাংখ্যের উপর মাকড়সায় জাল বিস্তার করিয়াছে, আজকাল জয়দেবের গীতগোবিন্দ লইয়া পণ্ডিতমহাশয় ভাবে ভরপুর হইয়া আছেন। এই তো গেল পণ্ডিতমহাশয়ের অবস্থা।

আর আমাদের কাত্যায়নী ঠাকুরানীটি দিন কতক আসিয়াই পাড়ার মেয়েমহল একেবারে সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মতো গল্পগুজব করিতে পাড়ায় আর কাহারও সামর্থ্য নাই। হাত-পা নাড়িয়া চোখ-মুখ ঘুরাইয়া চতুর্দশ ভুবনের সংবাদ দিতেন। একজন তাঁহার নিকট কলিকাতা শহরটা কী প্রকার তাহারই সংবাদ লইতে গিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, সেখানে বড়ো বড়ো মাঠ, সায়েবরা চাষ করে, রাস্তার দু ধার সিপাহি শান্তির গোরার পাহারা, ঘরে ঘরে গোরু কাটে ইত্যাদি। আরো অনেক সংবাদ দিয়াছিলেন, সকল কথা আবার মনেও নাই। কাত্যায়নীর পতি-ভক্তি অতিরিক্ত ছিল এবং এই পতিভক্তি-সংক্রান্ত নিন্দার কথা তাঁহার কাছে যত শুনিতে পাইব এমন আর কাহারও কাছে নয়। পাড়ার সকল মেয়ের নাড়ীনক্ষত্র পর্যন্ত অবগত ছিলেন। তাঁহার আর-একটি স্বভাব ছিল যে, তিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সকলকে মনে করাইয়া দিতেন যে, মিছামিছি পরের চর্চা তাঁর কোনোমতে ভালো লাগে না আর বিন্দু, হারার মা ও বোসেদের বাড়ির বড়োবউ যেমন বিশ্বনিন্দুক এমন আর কেহ নয়। কিন্তু তাহাও বলি, কাত্যায়নী ঠাকুরানীকে দেখিতে মন্দ ছিল না—তবে চলিবার, বলিবার, চাহিবার ভাবগুলি কেমন এক প্রকারের। তা হউক গে, অমন এক-একজনের স্বাভাবিক হইয়া থাকে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্রের অনেকগুলি দোষ জুটিয়াছে সত্য, কিন্তু করুণাকে সে-সকল কথা কে বলে বলো দেখি। সে বেচারি কেমন বিশ্বস্তচিত্তে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহার সে স্বপ্ন ভাঙাইবার প্রয়োজন কী। কিন্তু সে অত শত বুঝেও না, অত কথায় কানও দেয় না। কিন্তু রাত দিন শুনিতে শুনিতে দুই-একটা কথা মনে লাগিয়া যায় বৈকি। করুণার অমন প্রফুল্ল মুখ, সেও দুই-একবার মলিন হইয়া যায়— নয় তো কী! কিন্তু নরেন্দ্রকে পাইলেই সে সকল কথা ভুলিয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিতে মনেই থাকে না, অবসরই পায় না। তাহার অন্যান্য এত কথা কহিবার আছে যে, তাহাই ফুরাইয়া উঠিতে পারে না, তো, অন্য কথা! কিন্তু করুণার এ ভাব আর অধিক দিন থাকিবে না তাহা বলিয়া রাখিতেছি। নরেন্দ্র যেরূপ অন্যায় আরম্ভ করিয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। নরেন্দ্র এখন আর কলিকাতায় বড়ো একটা যাতায়াত করে না। করুণাকে ভালোবাসিয়া যে যায় না, সে ভ্রম যেন কাহারও না হয়। কলিকাতায় সে যথেষ্ট ঋণ করিয়াছে, পাওনাদারদের ভয়ে সে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

দিনে দিনে করুণার মুখ মলিন হইয়া আসিতেছে। নরেন্দ্র যখন কলিকাতায় থাকিত, ছিল ভালো। চব্বিশ ঘণ্টা চোখের সামনে থাকিলে কাহাকেই বা না চিনা যায়? নরেন্দ্রের স্বভাব করুণার নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। করুণার কিছুই তাহার ভালো লাগিত না। সর্বদাই খিট খিট, সর্বদাই বিরক্ত। এক মুহূর্তও ভালো মুখে কথা কহিতে জানে না— অধীরা করুণা যখন হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া তাহার নিকট আসে, তখন সে সহসা এমন বিরক্ত হইয়া উঠে যে করুণার মন একেবারে দমিয়া যায়। নরেন্দ্র সর্বদাই এমন রুষ্ট থাকে যে করুণা তাহাকে সকল কথা বলিতে সাহস করে না, সকল সময় তাহার কাছে যাইতে ভয় করে, পাছে সে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়া উঠে। তদ্‌ভিন্ন সন্ধ্যাবেলা তাহার নিকট কাহারও ঘেঁষিবার জো ছিল না, সে মাতাল হইয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিত। যাহা হউক, করুণার মুখ দিনে দিনে মলিন হইয়া আসিতে লাগিল। অলীক কল্পনা বা সামান্য অভিমান ব্যতীত অন্য কোনো কারণে করুণার চক্ষে প্রায় জল দেখি নাই—এইবার ঐ অভাগিনী আন্তরিক মনের কষ্টে কাঁদিল। ছেলেবেলা হইতেই সে কখনো অনাদর উপেক্ষা সহ্য করে নাই, আজ আদর করিয়া তাহার অভিমানের অশ্রু মুছাইবার আর কেহই নাই। অভিমানের প্রতিদানে তাহাকে এখন বিরক্তি সহ্য করিতে হয়। যাহা হউক, করুণা আর বড়ো একটা খেলা করে না, বেড়ায় না, সেই পাখিটি লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে বসিয়া থাকে। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে কলিকাতায় গেলে দেখিয়াছি এক-একদিন করুণা সমস্ত জ্যোৎস্নারাত্রি বাগানের সেই বাঁধা ঘাটটির উপরে শুইয়া আছে, কত কী ভাবিতেছে জানি না—ক্রমে তাহার নিদ্রাহীন নেত্রের সম্মুখ দিয়া সমস্ত রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র যেমন অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল, তেমনি ঋণও সঞ্চয় করিতে লাগিল। সে নিজে এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারে নাই, টাকার উপর তাহার তেমন মায়াও জন্মে নাই, তবে এক—পরিবারের মুখ চাহিয়া লোকে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে, তা নরেন্দ্রের সে-সকল খেয়ালই আসে নাই। একটু-আধটু করিয়া যথেষ্ট ঋণ সঞ্চিত হইল। অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ঘর হইতে দুটা-একটা জিনিস বন্ধক রাখিবার প্রয়োজন হইল।

করুণার শরীর অসুস্থ হইয়াছে। অনর্থক কতকগুলো অনিয়ম করিয়া তাহার পীড়া উপস্থিত

হইয়াছে। নরেন্দ্র কহিল সে দিবারাত্র এক পীড়া লইয়া লাগিয়া থাকিতে পারে না; তাই বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। এ দিকে করুণার তত্ত্বাবধান করে কে তাহার ঠিক নাই; পণ্ডিতমহাশয় যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেই বা কী হইবে। করুণা কোনো প্রকার ঔষধ খাইতে চায় না, কোনো নিয়ম পালন করে না। করুণার পীড়া বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল; পণ্ডিতমহাশয় মহা বিব্রত হইয়া নরেন্দ্রকে আসিবার জন্য এক চিঠি লিখিলেন। নরেন্দ্র আসিল, কিন্তু করুণার পীড়া-বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া নয়, কলিকাতায় গিয়া তাহার এত ঋণবৃদ্ধি হইয়াছে যে চারি দিক হইতে পাওনাদারেরা তাহার নামে নালিশ আরম্ভ করিয়াছে, গতিক ভালো নয় দেখিয়া নরেন্দ্র সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

নরেন্দ্রের এবার কিছু ভয় হইয়াছে, দেশে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। এবং মদের পাত্রের মধ্যে মনের সমুদয় আশঙ্কা ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। আর কাহারও সঙ্গে দেখা করে নাই, কথা কহে নাই, তাহার সে ঘরটিতে কাহারও প্রবেশ করিবার জো নাই। নরেন্দ্র যেরূপ রুষ্ট ও যেরূপ কথায় কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, চাকর-বাকরেরা তাহার কাছে ঘেঁষিতেও সাহস করে না। পীড়িতা করুণা খাদ্যাদি গুছাইয়া ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল; নরেন্দ্র মহা রুক্ষ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কে তাহাকে সে ঘরে আসিতে কহিল। এ কথার উত্তর আর কী হইতে পরে। তাহার পরে পিশাচ যাহা করিল তাহা কল্পনা করিতেও কষ্ট বোধ হয়— পীড়িতা করুণাকে এমন নিষ্ঠুর পদাঘাত করে যে, সে সেইখানেই মূর্ছিত হইয়া পড়িল। নরেন্দ্র সে ঘর হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

অল্প দিনের মধ্যে করুণার এমন আকার পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যায় না। তাহার সে শীর্ণ বিবর্ণ বিষণ্ন মুখখানি দেখিলে এমন মায়া হয় যে, কী বলিব। নরেন্দ্র এবার তাহার উপর যত দূর অত্যাচার করিবার তাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরলা সমস্তই নীরবে সহ্য করিতেছে, একটি কথা কহে নাই, নরেন্দ্রের নিকটে এক মুহূর্তের জন্য রোদনও করে নাই। একদিন কেবল অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া অনেকক্ষণ নরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমি তোমার কী করিয়াছি।'

নরেন্দ্র তাহার উত্তর না দিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

দশম পরিচ্ছেদ

একবার ঋণের আবর্ত-মধ্যে পড়িলে আর রক্ষা নাই। যখনি কেহ নালিশের ভয় দেখাইত, নরেন্দ্র তখনি তাড়াতাড়ি অন্যের নিকট হইতে অপরিমিত সুদে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিত। এইরূপে আসল অপেক্ষা সুদ বাড়িয়া উঠিল। নরেন্দ্র এবার অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। নালিশ দায়ের হইল, সমনও বাহির হইল। একদিন প্রাতঃকালে শুভ মুহূর্তে নরেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল ও ধীরে ধীরে শ্রীঘরে বাস করিতে চলিলেন।

বেচারি করুণা না খাওয়া, না দাওয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া একাকার করিয়া দিল। কী করিতে হয় কিছুই জানে না, অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় এ কুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কী করিতে হইবে সে বিষয়ে তাঁর করুণা অপেক্ষা অধিক জানিবার কথা নহে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া নিধিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; নিধি জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া ধার শুধিতে পরামর্শ দিল। এখন বিক্রয় করে কে। সে স্বয়ং তাহার ভার লইল। করুণার অলংকার অল্পই ছিল— পূর্বেই নরেন্দ্র তাহার অধিকাংশ বন্ধক দিয়াছে ও বিক্রয় করিয়াছে, যাহা-কিছু

অবশিষ্ট ছিল সমস্ত আনিয়া দিল। নিধি সেই সমুদয় অলংকার ও অন্যান্য গার্হস্থ্য দ্রব্য অধিকাংশ নিজে যৎসামান্য মূল্যে, কোনো কোনোটা বা বিনা মূল্যেই গ্রহণ করিল ও অবশিষ্ট বিক্রয় করিল। পণ্ডিতমহাশয় তো কাঁদিতে বসিলেন, ভয়ে কষ্টে করুণা অধীর হইয়া উঠিল। বিক্রয় করিয়া যাহা-কিছু পাওয়া গেল তাহাতে পণ্ডিতমহাশয় নিজের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ দিয়া দেয়-অর্থ কোনো প্রকারে পূরণ করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কারাগার হইতে মুক্ত হইল, কিন্তু ঋণ হইতে মুক্ত হইল না। তদ্‌ভিন্ন এই ঘটনায় তাহার কিছুমাত্র শিক্ষাও হইল না। যেরকম করিয়াই হউক-না কেন, এখন মদ নহিলে তাহার আর চলে না। করুণার প্রতি কিছুমাত্র সদয় হয় নাই, করুণা গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি কেন অমন করিয়া বিক্রয় করিল তাহাই লইয়া নরেন্দ্র করুণাকে যথেষ্ট পীড়ন করিয়াছে।

গদাধর ও স্বরূপ এখানে আসিয়াও জুটিয়াছে। সেবারকার প্রহারের পরও গদাধরের অন্তঃপুর-সংস্কার-প্রিয়তা কিছুমাত্র কমে নাই; বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেখানেই যাউক-না কেন সেখানেই তাঁহার ঐ চিন্তা, নরেন্দ্রের দেশেও তাঁহার সেই উদ্দেশ্যেই আগমন। ইচ্ছা আছে এখানেও দুই-একটি সৎ উদাহরণ রাখিয়া যাইবেন। পূর্বপরিচিত বন্ধুদের পাইয়া নরেন্দ্র বিলক্ষণ আমোদ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ ও গদাধরের নিকট আরো অনেক ঋণ করিলেন। তাহারা জানিত না যে নরেন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বিশ্বস্তচিত্তে কিঞ্চিৎ সুদের আশা করিয়া ধার দিল।

গদাধরের হস্তে এইবার একটি কাজ পড়িয়াছে। নরেন্দ্রের মুখে সে কাত্যায়নী ঠাকুরানীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়াছে, শুনিয়া সে মহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এত বয়সের তারতম্য কোনো হৃদয়সম্পন্ন মনুষ্য সহ্য করিতে পারে না— বিশেষত সমাজ-সংস্কারই যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, হৃদয়ের প্রধান আশা, অবকাশের প্রধান ভাবনা, কার্যক্ষেত্রের প্রধান কার্য, তাহারা সমাজের এ-সকল অন্যায় অবিচার কোনোমতেই সহ্য করিতে পারে না। ইহা সংশোধনের জন্য, এ প্রকার অন্যায়রূপে বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য সংস্কারকদিগের সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করা কর্তব্য, এবং আমাদের কাত্যায়নী দেবীর উদ্ধারের জন্য গদাধর সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতেই প্রস্তুত আছেন। আর, যখন স্বরূপবাবু তাঁহার ক্ষুদ্র কবিতাবলী পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন, তাহার মধ্যে 'রাহুগ্রাসে চন্দ্র' নামে একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে, যে বিধাতা কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, কোকিলে কুরূপ দিয়াছেন, তাঁহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়া একটি বিবাহবর্ণনা লিখিত ছিল; আমরা গোপনে সন্ধান লইয়া শুনিয়াছিলাম যে, তাহা কাত্যায়নী ঠাকুরানীকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয়। অনেক সমালোচক নাকি তাহাতে অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিন মেঘ-মেঘ করিয়া আছে, বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, বাদলার আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। আজ করুণা মন্দিরে মহাদেবের পূজা করিতে গিয়াছে। কাঁদিয়া-কাটিয়া প্রার্থনা করিল— যেন তাহাকে আর অধিক দিন এরূপ কষ্টভোগ করিতে না হয়; এবার তাহার যে সন্তান হইবে সে যেন পুত্র হয়, কন্যা না হয়; নারীজন্মের যন্ত্রণা যেন আর কেহ ভোগ না করে। করুণা প্রার্থনা করিল— তাহার মরণ হউক, তাহা হইলে নরেন্দ্র স্বেচ্ছামতে অকণ্টকে সুখ ভোগ করিতে পাইবে।

এই দুঃখের সময় নরেন্দ্রের এক পুত্র জন্মিল। অর্থের অনটনে সমস্ত খরচপত্র চলিবে কী করিয়া তাহার ঠিক নাই। নরেন্দ্রের পূর্বকার চাল কিছুমাত্র বিগড়ায় নাই। সেই সন্ধ্যাকালে গদাধর ও স্বরূপের সহিত বসিয়া তেমনি মদটি খাওয়া আছে— তেমনি ঘড়িটি, ঘড়ির চেনটি, ফিনফিনে

ধুতিটি, এসেন্সটুকু, আতরটুকু, সমস্তই আছে, কেবল নাই অর্থ। করুণার গার্হস্থ্যপটুতা কিছুমাত্র নাই; তাহার সকলই উলটাপালটা, গোলমাল। গুছাইয়া কী করিয়া খরচপত্র করিতে হয় তাহার কিছুই জানে না, হিসাবপত্রের কোনো সম্পর্কই নাই, কী করিতে যে কী করে তাহার ঠিক নাই। করুণা যে কী গোলে পড়িয়াছে তাহা সেই জানে। নরেন্দ্র তাহাকে কোনো সাহায্য করে না, কেবল মাঝে মাঝে গালাগালি দেয় মাত্র— নিজে যে কী দরকার, কী অদরকার, কী করিতে হইবে, কী না করিতে হইবে, তাহার কিছুই ভাবিয়া পায় না। করুণা রাত দিন ছেলেটি লইয়া থাকে বটে, কিন্তু কী করিয়া সন্তান পালন করিতে হয় তাহার কিছু যদি জানে।

ভবি বলিয়া বাড়ির যে পুরাতন দাসী ছিল সে করুণার এই দুর্দশায় বড়ো কষ্ট পাইতেছে। করুণাকে সে নিজহস্তে মানুষ করিয়াছে, এই জন্য তাহাকে সে অত্যন্ত ভালোবাসে। নরেন্দ্রের অন্যায়াচরণ দেখিয়া সে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে খুব মুখনাড়া দিয়া আসিত, হাত মুখ নাড়িয়া যাহা না বলিবার তাহা বলিয়া আসিত। নরেন্দ্র মহা রুষ্ট হইয়া কহিত, 'তুই বাড়ি হইতে দূর হইয়া যা!'

সে কহিত, 'তোমার মতো পিশাচের হস্তে করুণাকে সমর্পণ করিয়া কোন প্রাণে চলিয়া যাই?'

অবশেষে নরেন্দ্র উঠিয়া দুই-চারিটি পদাঘাত করিলে পরে সে গর গর করিয়া বকিতে বকিতে কখনো বা কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে চলিয়া যাইত।

ভবিই বাড়ির গিন্নি, সেই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম করিত, করুণাকে কোনো কাজ করিতে দিত না। করুণার এই অসময়ে সে যাহা করিবার তাহা করিয়াছে। ভবির আর কেহ ছিল না। যাহা-কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, সমস্ত করুণার জন্য ব্যয় করিত। করুণা যখন একলা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিত তখন সে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। করুণাও ভবিকে বড়ো ভালোবাসিত; যখন মনের কষ্টের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিত না, তখন দুই হস্তে ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া এমন কাঁদিয়া উঠিত যে, ভবিও আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিত না, সে শিশুর মতো কাঁদিয়া একাকার করিয়া দিত। ভবি না থাকিলে করুণা ও নরেন্দ্রের কী হইত বলিতে পারি না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

স্বরূপবাবু কহেন যে, পৃথিবী তাঁহাকে ক্রমাগতই জ্বালাতন করিয়া আসিয়াছে, এই নিমিত্ত মানুষকে তিনি পিশাচ জ্ঞান করেন। কিন্তু আমরা যতদূর জানি তাহাতে তিনিই দেশের লোককে জ্বালাতন করিয়া আসিতেছেন। তিনি যাহার সহিত কোনো সংশ্রবে আসিয়াছেন তাহাকেই অবশেষে এমন গোলে ফেলিয়াছেন যে, কী বলিব।

স্বরূপবাবু সর্বদা এমন কবিত্বচিন্তায় মগ্ন থাকেন যে, অনেক ডাকাডাকিতেও তাঁহার উত্তর পাওয়া যায় না ও সহসা 'অ্যাঁ' বলিয়া চমকিয়া উঠেন। হয়তো অনেক সময়ে কোনো পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন, অথচ যে সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে মানুষ আছে তাহা টেরও পান নাই, অথবা যাহারা দাঁড়াইয়া আছে তাহারা টের পায় নাই যে তিনি টের পাইতেছেন। ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে হয়তো থাকিয়া থাকিয়া বাহিরে চলিয়া যান। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, জানালার ভিতর দিয়া তিনি এক খণ্ড মেঘ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তেমন সুন্দর মেঘ কখনো দেখেন নাই। কখনো কখনো তিনি যেখানে বসিয়া থাকেন, ভুলিয়া দুই-এক খণ্ড তাঁহার কবিতা-লিখা কাগজ ফেলিয়া যান, নিকটস্থ কেহ সে কাগজ তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলে তিনি 'ও! এ কিছুই নহে' বলিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। বোধ হয় তাঁহার কাছে

তাহার আর একখানা নকল থাকে। কিন্তু লোকে বলে যে, না, অনেক বড়ো বড়ো কবির ঐরূপ অভ্যাস আছে। মনের ভুল এমন আর কাহারও দেখি নাই। কাগজপত্র কোথায় যে কী ফেলেন তাহার ঠিক নাই, এইরূপ কাগজপত্র যে কত হারাইয়া ফেলিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে! কিন্তু সুখের বিষয়, ঘড়ি টাকা বা অন্য কোনো বহুমূল্য দ্রব্য কখনো হারান নাই। স্বরূপবাবুর আর-একটি রোগ আছে, তিনি যে-কোনো কবিতা লিখেন তাহার উপরে বন্ধনীচিহ্নের মধ্যে 'বিজন কাননে' বা 'গভীর নিশীথে লিখিত' বলিয়া লিখা থাকে। কিন্তু আমি বেশ জানি যে, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্তানগণ-দ্বারা পরিবৃত গৃহে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমাদের স্বরূপবাবু বড়ো প্রেমিক ব্যক্তি। তিনি যত শীঘ্র প্রেমে বাঁধা পড়েন এত আর কেহ নয়; ইহাতে তিনিও কষ্ট পান আর অনেককেই কষ্ট দেন।

স্বরূপবাবু দিবারাত্রি নরেন্দ্রের বাড়িতে আছেন। মাঝে মাঝে আড়ালে-আবডালে করুণাকে দেখিতে পান, কিন্তু তাহাতে বড়ো গোলযোগ বাধিয়াছে। তাঁহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে ও রাত্রে ঘুম হইতেছে না। তিনি ঘোর ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়াছেন—সুতরাং এখন তাঁহাকে কোকিলেও ঠোকরায় না, চন্দ্রকিরণও দগ্ধ করে না বটে, কিন্তু হইলে হয় কী—পৃথিবী তাঁহার চক্ষে অরণ্য, শ্মশান হইয়া গিয়াছে। ফুল শুকাইতেছে আবার ফুটিতেছে, সূর্য অস্ত যাইতেছে আবার উঠিতেছে, দিবস আসিতেছে ও যাইতেছে, মানুষ শুইতেছে ও খাইতেছে, সকলই যেমন ছিল তেমনি আছে, কিন্তু হায়! তাঁহার হৃদয়ে আর শান্তি নাই, দেহে বল নাই, নয়নে নিদ্রা নাই, হৃদয়ে সুখ নাই—এক কথায়, যাহাতে যাহা ছিল তাহাতে আর তাহা নাই! স্বরূপ কতকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিল, তাহাতে যাহা লিখিবার সমস্তই লিখিল। তাহাতে ইঙ্গিতে করুণার নাম পর্যন্ত গাঁথিয়া দিল। এবং সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া মধ্যস্থ-নামক কাগজে পাঠাইয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

নিধি নরেন্দ্রের বাড়িতে মাঝে মাঝে আইসে। কিন্তু আমরা যে ঘটনার সূত্র অবলম্বন করিয়া আসিতেছি সে সূত্রের মধ্যে কখনো পড়ে নাই, এইবার পড়িয়াছে। স্বরূপবাবু তাঁহার অভ্যাসানুসারে ইচ্ছাপূর্বক বা দৈবক্রমেই হউক, এক খণ্ড কাগজ ঘরে ফেলিয়া গিয়াছেন, নিধি সে কাগজটি কুড়াইয়া পাইয়াছে। সে কাগজটিতে গুটিদুয়েক কবিতা লিখা আছে। অন্য লোক হইলে সে কবিতাগুলির সরল অর্থটি বুঝিয়া পড়িত ও নিশ্চিন্ত থাকিত, কিন্তু বুদ্ধিমান নিধি সেরূপ লোকই নহে। যদি বা তাহার কোনো গূঢ় অর্থ না থাকিত তথাপি নিধি তাহা বাহির করিতে পারিত। তবু ইহাতে তো কিছু ছিল। নিধির সে কবিতাগুলি বড়ো ভালো ঠেকিল না। ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল ও ভাবিল ইহার নিগূঢ় তাহাকে জানিতে হইবে। অমন বুদ্ধিমান লোকের কাছে কিছুই ঢাকা থাকে না, ইঙ্গিতে সকলই বুঝিয়া লইল। চতুরতাভিমানী লোকেরা নিজবুদ্ধির উপর অসন্দিগ্ধরূপে নির্ভর করিয়া এক-এক সময়ে যেমন সর্বনাশ ঘটায়, এমন আর কেহই নহে।

'দিদি, কেমন আছ দেখিতে আসিয়াছি' বলিয়া নিধি করুণার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। নিধি ছেলেবেলা হইতেই অনুপের অন্তঃপুরে যাইত ও করুণার মাকে মা বলিয়া ডাকিত। নিধি এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই করুণা কেমন আছে দেখিতে আইসে। একদিন নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছে। নরেন্দ্র কবে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবে, করুণা স্বরূপবাবুর নিকট ভাবিকে জানিয়া আসিতে কহিল। নিধি আড়াল হইতে শুনিতে পাইল, মনে মনে কহিল 'হুঁহুঁ—বুঝিয়াছি, এত

লোক থাকিতে স্বরূপবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠানো কেন! গদাধরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেও তো চলিত।'

একদিন করুণা ভবিকে কী কথা বলিতেছিল, দূর হইতে নিধি শুনিতে পাইল না, কিন্তু মনে হইল করুণা যেন একবার 'স্বরূপবাবু' বলিয়াছিল— আর-একটি প্রমাণ জুটিল। আর একদিন নরেন্দ্র স্বরূপ ও গদাধর বাগানে বসিয়াছিল, করুণা সহসা জানালা দিয়া সেই দিক পানে চাহিয়া গেল, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে করুণা স্বরূপেরই দিকে চাহিয়াছিল। নিধি এই তো তিনটি অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছে, ইহা অন্য লোকের নিকট যাহাই হউক কিন্তু নিধির নিকট ইহা সমস্তই পরিষ্কার প্রমাণ। শুদ্ধ ইহাই যথেষ্ট নহে, করুণা যে দিনে দিনে শীর্ণ বিষণ্ণ রুগ্‌ণ হইয়া যাইতেছে, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার কারণ আর কিছুই নয়— স্বরূপের ভাবনা।

এখন স্বরূপের নিকট কথা আদায় করিতে হইবে, এই ভাবিয়া নিধি ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ গিয়া কহিল, 'করুণা তো, ভাই, তোমার জন্য একেবারে পাগল।'

স্বরূপ একেবারে চমকিয়া উঠিল। আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কী করিয়া জানিলে।'

নিধি মনে মনে কহিল, 'হুঁ-হুঁ, আমি তোমাদের ভিতরকার কথা কী করিয়া সন্ধান পাইলাম ভাবিয়া ভয় পাইতেছ? পাইবে বৈকি, কিন্তু নিধিরামের কাছে কিছুই এড়াইতে পায় না।' কহিল, 'জানিলাম, এক রকম করিয়া।'

বলিয়া চোখ টিপিতে টিপিতে চলিয়া গেল। তাহার পরদিন গিয়া আবার স্বরূপকে কহিল, 'করুণার সহিত তুমি যে গোপনে গোপনে দেখাসাক্ষাৎ করিতেছ ইহা নরেন্দ্র যেন টের না পায়।'

স্বরূপ কহিল, 'সেকি! করুণার সহিত একবারও তো আমার দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা হয় নাই।'

নিধি মনে মনে কহিল, 'নিশ্চয় দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল, নহিলে এত করিয়া ভাঁড়াইবার চেষ্টা করিবে কেন।' ইহাও একটি প্রমাণ হইল, কিন্তু আবার স্বরূপ যদি বলিত যে 'হাঁ দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল' তবে তাহাও একটি প্রমাণ হইত।

যাহা হউক, নিধির মনে আর সন্দেহ রহিল না। এমন একটি নিগূঢ় বার্তা নিধি আপনার বুদ্ধিকৌশলে জানিতে পারিয়াছে, এ কথা কি সে আর গোপনে রাখে। তাহার বুদ্ধির পরিচয় লোকে না পাইলে আর হইল কী। 'তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহা নয়, আমি ভিতরকার কথা সকল জানি'— চতুরতাভিমানী লোকেরা ইহা বুঝাইতে পারিলে বড়োই সন্তুষ্ট হয়। নিধির কাছে যদি বল যে, 'রামহরিবাবু বড়ো সৎলোক' অমনি নিধি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, 'কী বলিতেছ। কে সৎলোক। রামহরিবাবু? ও'— এমন করিয়া বলিবে যে তুমি মনে করিবে, এ বুঝি রামহরিবাবুর ভিতরকার কী একটা দোষ জানে। পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কহিবে, 'সে অনেক কথা।' নিধি সম্প্রতি যে গুপ্ত খবর পাইয়াছে তাহা পরামর্শ দিবার ছলে নরেন্দ্রকে বলিবে, এইরূপ মনে মনে স্থির করিল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কয়দিন ধরিয়া ছোটো ছেলেটির পীড়া হইয়াছে। তাহা হইবে না তো কী। কিছুরই তো নিয়ম নাই। করুণা ডাক্তার ডাকাইয়া আনিল, ডাক্তার আসিয়া কহিল পীড়া শক্ত হইয়াছে। করুণা তো দিন রাত্রি তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। পীড়া বাড়িতে লাগিল, করুণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। গ্রামের নেটিব ডাক্তার কপালীচরণবাবু পীড়ার তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাঁহাকে কি

দিবার সময় তিনি কহিলেন, 'থাক, থাক, পীড়া অগ্রে সারুক।' পণ্ডিতমহাশয় বুঝিলেন, নরেন্দ্রদের দুরবস্থা শুনিয়া দয়ার্দ্র ডাক্তারটি বুঝি ফি লইতে রাজি নহেন। দুই বেলা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, তিনিও অম্লানবদনে আসিলেন।

নরেন্দ্র এক্ষণে বাড়িতে নাই। ও পাড়ার পিতৃমাতৃহীন নাবালক জমিদারটি সম্প্রতি সাবালক হইয়া উঠিয়া জমিদারি হাতে লইয়াছেন, নরেন্দ্র তাঁহাকেই পাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারই স্কন্ধে চাপিয়া নরেন্দ্র দিব্য আরামে আমোদ করিতেছেন এবং গদাধর ও স্বরূপকে তাঁহারই হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গদাধর ও স্বরূপকে যে শীঘ্র তাঁহার স্কন্ধ হইতে নড়াইবেন, তাহার জো নাই—গদাধরের একটি উদ্দেশ্য আছে, স্বরূপেরও এক উদ্দেশ্য আছে।

ছেলেটির পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার ডাকিতে একজন লোক পাঠানো হইল। ডাক্তারটি তাহার হস্ত দিয়া, তাঁহার দু বেলার যাতায়াতের দরুন যাহা পাওনা আছে সমস্ত হিসাব সমেত এক বিল পাঠাইয়া দিলেন। ছেলেটি অবশ হইয়া পড়িয়াছে, করুণা তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে। সকল কর্মে নিপুণ নিধি মাঝে মাঝে তাহার নাড়ি দেখিতেছে, কহিল নাড়ি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আকুলহৃদয়ে সকলেই ডাক্তারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় বিল লইয়া সেই লোকটি ফিরিয়া আসিল। সকলেই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তার কই?' সে সেই বিল হাজির করিল। সকলেই তো অবাক। মুখ চোখ শুকাইয়া পণ্ডিতমহাশয় তো ঘামিতে লাগিলেন; নিধির হাত ধরিয়া কহিলেন, 'এখন উপায় কী।'

নিধি কহিল, 'টাকার জোগাড় করা হউক।'

সহসা টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে। এ দিকে পীড়ার অবস্থা ভালো নহে, যত কালবিলম্ব হয় ততই খারাপ হইবে। মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল, করুণা বেচারি কাঁদিতে লাগিল। পণ্ডিত-মহাশয় বিব্রত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, হাতে যাহা-কিছু ছিল আনিলেন। কাত্যায়নী ঠাকুরানীটি টাকা বাহির করিয়া দিবার সময় অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া তবে টাকা বাহির করেন। ভবি তাহার শেষ সম্বল বাহির করিয়া দিল।

অনেক কষ্টে অবশেষে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা। ডাক্তারটি অম্লান বদনে কহিলেন, 'ছেলে বাঁচিবে না।'

এমন সময় টলিতে টলিতে নরেন্দ্র ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘরে ঢুকিয়া ঘরে যে কিসের গোল-মাল কিছুই ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ শূন্যনেত্রে পণ্ডিতমহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, অবশেষে কী বিড় বিড় করিয়া বকিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিল—পণ্ডিতমহাশয়ও মহা গোলযোগে পড়িয়া গেলেন। ডাক্তার ছাড়াইতে গেলেন, তাঁহার হাতে এমন একটি কামড় দিল যে রক্ত পড়িতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিয়া সেইখানে শুইয়া পড়িল।

ক্রমে শিশুর মুখ নীল হইয়া আসিল। করুণা সমস্ত গোলমালে অর্ধ-হতজ্ঞান হইয়া বালিশে ঠেস দিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে শিশুর মৃত্যু হইল, কিন্তু দুর্বল করুণা তখন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আহা, বিষণ্ন করুণাকে দেখিলে এমন কষ্ট হয় যে, ইচ্ছা করে প্রাণ দিয়াও তাহার মনের যন্ত্রণা দূর করি। কতদিন তাহাকে আর হাসিতে দেখি নাই। ভালো করিয়া আহার করে না, স্নান করে না, ঘুমায় না; মলিন, বিবর্ণ, ম্রিয়মাণ, শীর্ণ; জ্যোতিহীন চক্ষু বসিয়া গিয়াছে; মুখশ্রী এমন দীন করুণ হইয়া গিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় না যে এ বালিকা কখনো হাসিতে জানিত। ভবির হস্তে

যাহা-কিছু অর্থ ছিল সমস্ত প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, কী করিয়া সংসার চলিবে তাহার কিছুই ঠিক নাই। পণ্ডিতমহাশয়ের সাহায্যে কোনোমতে দিন চলিতেছে।

নিধি স্বরূপের উল্লেখ করিয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সে বাবুটি কী করে বলিতে পার।'

নরেন্দ্র। কেন বলো দেখি।

নিধি। ও লোকটিকে আমার তো বড়ো ভালো ঠেকে না।

নরেন্দ্র। কেন, কী হইয়াছে।

নিধি। না, কিছুই হয় নাই, তবে কিনা—সে কথা থাক—বাবুটির বাড়ি কোথায়।

নরেন্দ্র। কলিকাতা।

নিধি। আমিও তাহাই ঠাওরাইয়াছিলাম, নহিলে এমন স্বভাব হইবে কেন।

নরেন্দ্র। কেন, কী হইয়াছে, বলোই-না।

নিধি। আমি সে কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু উহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দেও।

নরেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়া কহিল, 'কী কথা বলিতেই হইবে।'

নিধি কহিল, 'যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর চারা নাই, কিন্তু সাবধান থাকিয়ো, ও লোকটি আর যেন বাড়ির ভিতরের দিকে না যায়।'

নরেন্দ্র। সেকি কথা, স্বরূপ তো বাড়ির ভিতরে যায় নাই।

নিধি। সে কি তোমাকে বলিয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র অবাক হইয়া নিধির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিধি কহিল, 'আমি তো ভাই, আমার কাজ করিলাম, এখন তোমার যাহা কর্তব্য হয় করো।'

নরেন্দ্র ভাবিল, এ-সকল তো বড়ো ভালো লক্ষণ নয়।

স্বরূপ কয়দিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, করুণা তাহার জন্য একেবারে পাগল এ কথা নিধি সহসা তাহাকে কেন কহিল; বুঝিল, নিশ্চয় করুণা তাহাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে। স্বরূপ ভাবিল, 'তবে আমিও তাহার প্রেমে পাগল এ কথাও তো তাহাকে জানানো উচিত।' স্থির করিল, সুবিধা পাইলে নিজে গিয়া জানাইবে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। ছেলেবেলা করুণা যেখানে দিন-রাত্রি খেলা করিয়া বেড়াইত সেই বাগানের ঘাটের উপর সে শুইয়া আছে, অতি ধীরে ধীরে বাতাসটি গায়ে লাগিতেছে। সেই জ্যোৎস্নারাত্রির সঙ্গে, সেই মৃদু বাতাসটির সঙ্গে, সেই নারিকেলবনটির সঙ্গে তাহার ছেলেবেলাকার কথা এমন জড়িত ছিল, যেন তাহারা তার ছেলেবেলাকারই একটি অংশ। সেই দিনকার কথাগুলি, শ্মশানে বায়ু-উচ্ছ্বাসের ন্যায় করুণার প্রাণের ভিতর গিয়া হু হু করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় করুণার বুক ফাটিয়া, বুকের বাঁধন যেন ছিঁড়িয়া অশ্রুর স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বাগানে আর দুইজন লোক লুকাইয়া আছে, নরেন্দ্র ও স্বরূপ। নরেন্দ্র চুপিচুপি স্বরূপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে, দেখিবে স্বরূপ কী করে।

করুণা সহসা দেখিল একজন লোক আসিতেছে। চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'কেও।'

স্বরূপ কহিল, 'আমি স্বরূপচন্দ্র। নিধিকে দিয়া যে কথা বলিয়া পাঠানো হইয়াছিল তাহা কি স্মরণ নাই!'

করুণা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে নরেন্দ্র আর না থাকিতে পারিয়া বাহির হইয়া পড়িল। করুণা তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র ভাবিল তাহাকে দেখিতে পাইয়াই করুণা ভয়ে পলাইয়া গেল বুঝি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র কহিল, 'হতভাগিনী, বাহির হইয়া যা!'

করুণা কিছুই কহিল না।

'এখনই দূর হইয়া যা!'

করুণা নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র মহা রুষ্ট হইল, অগ্রসর হইয়া কঠোর ভাবে করুণার হস্ত ধরিল। করুণা কহিল, 'কোথায় যাইব।'

নরেন্দ্র করুণার কেশগুচ্ছ ধরিয়া নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতে লাগিল; কহিল, 'এখনই দূর হইয়া যা।'

ভবি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, 'কোথায় দূর হইয়া যাইবে।'

এবং স্মরণ করাইয়া দিল যে, ইহা তাহার পিতার বাটী নহে।

নরেন্দ্র তাহাকে উচ্চতম স্বরে কহিল, 'তুই কী করিতে আইলি।'

ভবি মাঝে পড়িয়া করুণাকে ছাড়াইয়া লইল ও কহিল, 'আমার প্রাণ থাকিতে কেমন তুমি করুণাকে অনুপের বাটী হইতে বাহির করিতে পার দেখি!'

নরেন্দ্র ভবিকে যতদূর প্রহার করিবার করিল ও অবশেষে শাসাইয়া গেল যে, 'পুলিসে খবর পাঠাইয়া দিই গে।'

ভবি কহিল, 'ইহা তো আর মগের মুলুক নহে।'

নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর করুণা ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'ভবি, আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দে, আমি চলিয়া যাই।'

ভবি করুণাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিল, 'সেকি মা, কোথায় যাইবে। আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি ততদিন আর তোমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতে হইবে না।'

বলিতে বলিতে ভবি কাঁদিয়া ফেলিল। করুণা আর একটি কথা বলিতে পারিল না, তাহার বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত দিন করুণা কিছু খাইল না, ভবি আসিয়া কত সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু কোনোমতে তাহাকে খাওয়াইতে পারিল না।

সমস্ত দিন তো কোনো প্রকারে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইল, পল্লীর কুটীরে কুটীরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে, পূজার বাড়িতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে। সমস্ত দিন করুণা তাঁহার সেই শয্যাতেই পড়িয়া আছে, রাত্রি হইলে পর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্তঃপুরের সেই বাগানটিতে চলিয়া গেল। সেখানে কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিল, রাত্রি আরো গভীরতর হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীকে ঘুম পাড়াইয়া নিশীথের বায়ু অতি ধীর পদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে; এমন শান্ত ঘুমন্ত গ্রাম যে মনে হয় না এ গ্রামে এমন কেহ আছে যে এমন রাত্রে মর্মভেদী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মরণকে আহ্বান করিতেছে!

করুণার বিজন ভাবনায় সহসা ব্যাঘাত পড়িল। করুণা সহসা দেখিল নরেন্দ্র আসিতেছে। বেচারি ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া বসিল। নরেন্দ্র আসিয়া অতি কর্কশ স্বরে কহিল, 'আমি উঁহাকে প্রতি ঘরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, উনি কিনা বাগানে আসিয়া বসিয়া আছেন! আজ রাত্রে যে বড়ো বাগানে আসিয়া বসা হইয়াছে? স্বরূপ তো এখানে নাই।'

করুণা মনে করিল এইবার উত্তর দিবে, নিরপরাধিনীর উপর কেন নরেন্দ্রের এইরূপ সংশয় হইল—জিজ্ঞাসা করিবে—কিন্তু কী কথা বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। নরেন্দ্রের ভাব দেখিয়া সে ভয়ে আকুল হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না।

নরেন্দ্র কহিল, 'আয়, বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকিতে পাইবি না।'

করুণা একটি কথাও কহিল না, কিসের অলক্ষিত আকর্ষণে যেন সে অগ্রসর হইতে লাগিল। একবার সে মনে করিল বলিবে 'ভবির সহিত দেখা করিয়াই যাই', কিন্তু একটি কথাও বলিতে

পারিল না। গৃহের দ্বার পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিল, ব্যাকুল হৃদয়ে দেখিল সম্মুখে দিগন্তপ্রসারিত মাঠে জনপ্রাণী নাই। মনে করিল—সে নরেন্দ্রের পায়ে ধরিয়া বলিবে তাহার বড়ো ভয় হইতেছে, সে যাইতে পারিবে না, সে পথ ঘাট কিছুই চিনে না। কিন্তু মুখে কথা সরিল না। ধীরে ধীরে দ্বারের বাহিরে গেল। নরেন্দ্র কহিল, 'কালি সকালে তোকে যদি গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাই তবে পুলিসের লোক ডাকাইয়া বাহির করিয়া দিব।'

দ্বার রুদ্ধ হইল, ভিতর হইতে নরেন্দ্র তালা বন্ধ করিল। করুণার মাথা ঘুরিতে লাগিল, করুণা আর দাঁড়াইতে পারিল না, অবসন্ন হইয়া প্রাচীরের উপর পড়িয়া গেল।

কতক্ষণের পর উঠিল। মনে করিল, ভবির সহিত একবার দেখা হইল না? কতক্ষণ পর্যন্ত শূন্য নয়নে বাড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাচীরের বাহির হইয়া দেখিল—তাহার সেই বাগানের গাছপালা নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। দেখিল—দ্বিতীয় তলের যে গৃহে তাহার পিতা থাকিতেন, যে গৃহে সে তাহার পিতার সহিত কতদিন খেলা করিয়াছে, সে গৃহের দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, ভিতরে একটি ভগ্ন খাট পড়িয়া আছে, তাহার সম্মুখে নিস্তেজ একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। কতক্ষণের পর নিশ্বাস ফেলিয়া করুণা ফিরিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কতক দূর গিয়া আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই বিজন কক্ষে একটিমাত্র মুমূর্ষু প্রদীপ জ্বলিতেছে। ছেলেবেলা যাহারা করুণাকে সুখে খেলা করিতে দেখিয়াছে তাহারা সকলেই আপন কুটীরে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাদের সেই কুটীরের সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে করুণা চলিয়া গেল। আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল তাহার পিতার কক্ষে এখনো সেই প্রদীপটি জ্বলিতেছে।

সেই গভীর নীরব নিশীথে অসংখ্য তারকা নিমেষহীন স্থির নেত্রে নিম্নে চাহিয়া দেখিল—দিগন্তপ্রসারিত জনশূন্য অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়া একটি রমণী একাকিনী চলিয়া যাইতেছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতমহাশয় সকালে উঠিয়া দেখিলেন কাত্যায়নী ঠাকুরানী গৃহে নাই। ভাবিলেন গৃহিণী বুঝি পাড়ার কোনো মেয়েমহলে গল্প ফাঁদিতে গিয়াছেন। অনেক বেলা হইল, তথাপি তাহার দেখা নাই। তা, মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি এরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু পণ্ডিতমহাশয় আর বেশিক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না, যেখানে যেখানে ঠাকুরানীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল খোঁজ লইতে গেলেন। মেয়েরা চোখ-টেপাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল; কহিল, 'মিন্‌সা এক দণ্ড আর কাত্যায়নী-পিসিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না! কোথায় গিয়াছে বুঝি, তাই খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। কিন্তু পুরুষমানুষের অতটা ভালো দেখায় না।' তাহার মানে, তাঁহাদের স্বামীরা অতটা করেন না, কিন্তু যদি করিতেন তবে বড়ো সুখের হইত।

যেখানে কাত্যায়নীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল সেখানে তো পণ্ডিতমহাশয় খুঁজিয়া পাইলেন না, যেখানে সম্ভাবনা ছিল না সেখানেও খুঁজিতে গেলেন—সেখানেও পাইলেন না। এই তো পণ্ডিতমহাশয় ব্যাকুল হইয়া মুহুর্মুহু নস্য লইতে লাগিলেন। ঊর্ধ্বশ্বাসে নিধিদের বাড়ি গিয়া পড়িলেন।

নিধি জিজ্ঞাসা করিল, ঘোষেদের বাড়ি দেখিয়াছেন? মিত্রদের বাড়ি দেখিয়াছেন? দত্তদের বাড়ি খোঁজ লইয়াছেন? এইরূপে মুখুজ্জে চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে ইত্যাদি যত বাড়ি জানিত প্রায় সকলগুলিরই উল্লেখ করিল, কিন্তু সকল-তাতেই অমঙ্গল উত্তর পাইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য ভাবিতে

লাগিল। অবশেষে নিধি নিজে নরেন্দ্রের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। শূন্য গৃহ যেন হাঁ হাঁ করিতেছে। বিষণ্ণ বাড়ির চারি দিক যেন কেমন অন্ধকার হইয়া আছে, একটা কথা কহিলে দশটা প্রতিধ্বনি যেন ধমক দিয়া উঠিতেছে। একটা চাকর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে সোপানের উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, নিধি তাহাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'গদাধরবাবু কোথায়।'

সে কহিল, 'কাল রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আজও আসেন নাই—বোধ হয় কলিকাতায় গিয়া থাকিবেন।'

নিধি ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে কহিল, 'যদি খুঁজিতে হয় তো কলিকাতায় গিয়া খোঁজো গে।'

পণ্ডিতমহাশয় তো এ কথার ভাবই বুঝিতে পারিলেন না। নিধি কহিল, 'গদাধর নামে একটি বাবু আসিয়াছেন, দেখিয়াছ?'

পণ্ডিতমহাশয় শূন্যগর্ভ একটি হাঁ দিয়া গেলেন। নিধি কহিল, 'সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে কাত্যায়নী-পিসি কলিকাতা ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন।'

পণ্ডিতমহাশয়ের মুখ শুকাইয়া গেল, কিন্তু তিনি এ কথা কোনোক্রমেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। তিনি কহিলেন, তিনি নন্দীদের বাড়ি ভালো করিয়া দেখেন নাই, সেখানেই নিশ্চয় আছেন। এই বলিয়া নন্দী আদি করিয়া আর-একবার সমস্ত বাড়ি অন্বেষণ করিয়া আসিলেন, কোথাও সন্ধান পাইলেন না। ম্লানবদনে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

নিধি কহিল, 'আমি তো পূর্বেই বলিয়াছিলাম যে, এরূপ ঘটিবে।'

কিন্তু তিনি পূর্বে কোনোদিন এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন নাই।

সিন্দুক খুলিতে গিয়া পণ্ডিতমহাশয় দেখিলেন, কাত্যায়নী ঠাকুরানী শুদ্ধ যে নিজে গিয়াছেন এমন নহে, যত-কিছু গহনাপত্র টাকাকড়ি ছিল তাহার সমস্ত লইয়া গিয়াছেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া পণ্ডিতমহাশয় সমস্ত দিন কাঁদিলেন।

নিধি কহিল, 'এ সমস্তই নরেন্দ্রের ষড়যন্ত্রে ঘটিয়াছে, তাহার নামে নালিশ করা হউক, আমি সাক্ষী তৈয়ার করিয়া দিব।'

নিধি এরূপ একটা কাজ হাতে পাইলেই বাঁচিয়া যায়। পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, যাহা তাঁহার ভাগ্যে ছিল হইয়াছে, তাই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রের নামে নালিশ করিতে পারেন না।

নিধিকে লইয়া পণ্ডিতমহাশয় কলিকাতায় আসিলেন। একদিন দুই প্রহরের রৌদ্রে পণ্ডিত-মহাশয়ের শ্রান্ত স্থূল দেহ কালীঘাটের ভিড়ের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে, এমন সময়ে সম্মুখে একটি সেকেন্‌ড্‌ ক্লাসের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিতমহাশয়ের মন্দির দেখা হইয়াছে, কালীঘাট হইতে চলিয়া যাইবেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন। গাড়ি দেখিয়া তাহা অধিকার করিবার আশায় কোনোপ্রকারে ভিড় ঠেলিয়া-ঠুলিয়া সেই দিকে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন গাড়ি হইতে প্রথমে একটি বাবু ও তাঁহার পরে একটি রমণী হাসিতে হাসিতে, পান চিবাইতে চিবাইতে, গাড়ি হইতে নামিলেন ও হেলিতে-দুলিতে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। পণ্ডিতমহাশয় সে রমণীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। সে রমণীটি তাঁহারই কাত্যায়নী ঠাকুরানী!

তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—কাত্যায়নী তাঁহার উচ্চতম স্বরে কহিলেন, 'কে রে মিন্‌সে। গায়ের উপর আসিয়া পড়িস যে! মরণ আর-কি!'

এইরূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা গালাগালি বর্ষণ করিয়া অবশেষে পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার 'চোখের মাতা' খাইয়াছেন কি না ও বুড়া বয়সে এরূপ অসদাচরণ করিতে লজ্জা করেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতমহাশয় দুইটি প্রশ্নের কোনোটির উত্তর না দিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল যেন এখনি মূর্ছিত হইয়া পড়িবেন। কাত্যায়নীর সঙ্গে যে বাবু ছিলেন তিনি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার স্টীকের বাড়ি পণ্ডিতমহাশয়কে দুই একটা

গোঁজা মারিয়া ও বিজাতীয় ভাষায় যথেষ্ট মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া, ইংরাজি অর্ধস্ফুট স্বরে 'পাহারাওয়ালা পাহারাওয়ালা' করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

পাহারাওয়ালা আসিল ও পণ্ডিতমহাশয়কে ঘিরিয়া দশ সহস্র লোক জমা হইল। বাবু কহিলেন, এই লোকটি তাঁহার পকেট হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছে।

পণ্ডিতমহাশয় ভয়ে আকুল হইলেন ও কাঁদো-কাঁদো স্বরে কহিলেন, 'না বাবা, আমি লই নাই। তবে তোমার ভ্রম হইয়া থাকিবে, আর কেহ লইয়া থাকিবে।'

'চোর চোর' বলিয়া একটা ভারি কলরব উঠিল, চারি দিকে কতকগুলা ছোঁড়া জমিল, কেহ তাঁহার টিকি ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ তাঁহাকে চিমটি কাটিতে লাগিল— পণ্ডিতমহাশয় থতমত খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ট্যাঁকে যত টাকা ছিল সমস্ত লইয়া বাবুটিকে কহিলেন, 'বাবা, তোমার টাকা হারাইয়া থাকে যদি, তবে এই লও। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমার পায়ে পড়িতেছি— আমাকে রক্ষা করো।'

ইহাতে তাঁহার দোষ অধিকতর সপ্রমাণ হইল, পাহারাওয়ালা তাঁহার হাত ধরিল।

এমন সময়ে নিধি চোখ মুখ রাঙাইয়া ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধির এক-সুট চাপকান পেন্টুলুন ছিল, কলিকাতায় সে চাপকান-পেন্টুলুন ব্যতীত ঘর হইতে বাহির হইত না। চাপকান-পেন্টুলুন-পরা নিধি আসিয়া যখন গম্ভীর স্বরে কহিল 'কোন্ হ্যায় রে!' তখন অমনি চারি দিক স্তব্ধ হইয়া গেল। নিধি পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ ও পেন্‌সিল বাহির করিয়া পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল তাহার নম্বর কত ও সে কোন্ থানায় থাকে, এবং উত্তর না পাইতে পাইতে সম্মুখস্থ ছ্যাকরা গাড়ির কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল, 'লালদিঘির এণ্ড্রু-সাহেবের বাড়ি জানো?'

পাহারাওয়ালা ভাবিল না জানি এণ্ড্রুসাহেব কে হইবে ও দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে 'বাবু বাবু' করিতে লাগিল। নিধি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, আপনার বাড়ি কোথায়। নাম কী।'

বাবুটি গোলমালে সট করিয়া সরিয়া পড়িলেন এবং সে পাহারাওয়ালাটিও অধিক উচ্চবাচ্য না করিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া পড়িল।

ভিড় চুকিয়া গেল, নিধি ধরাধরি করিয়া পণ্ডিতমহাশয়কে একটি গাড়িতে লইয়া গিয়া তুলিল এবং সেই রাত্রেই দেশে যাত্রা করিল। বেচারি পণ্ডিতমহাশয় লজ্জায় দুঃখে কষ্টে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

নিধি কহিল, কাত্যায়নীর নামে গহনা ও টাকা চুরির নালিশ করা যাক। পণ্ডিতমহাশয় কোনোমতে সম্মত হইলেন না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতমহাশয় করুণার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন। তিনি কহিলেন, 'এ গ্রামে থাকিয়া আর কী করিব। শূন্য গৃহ ত্যাগ করে কাশী চলিলাম। বিশ্বেশ্বরের চরণে এ প্রাণ বিসর্জন করিব।'

এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয় ঘর দুয়ার সমস্ত বিক্রয় করিয়া কাশী চলিলেন। পাড়ার সমস্ত বালকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, অশ্রুপূর্ণনয়নে তিনি সকলকে আদর করিলেন। এমন একটি বালক ছিল না যে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলে নাই।

এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিতমহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক লোক দেখিয়াছি কিন্তু তেমন ভালোমানুষ আর দেখিলাম না।

নরেন্দ্রের বাড়িঘর সমস্ত নিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় আছে কে জানে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে রজনী মনে করিল, 'আমিই বুঝি মহেন্দ্রের চলিয়া যাইবার কারণ!'

মহেন্দ্রের মাতা মনে করিলেন যে, রজনী বুঝি মহেন্দ্রের উপর কোনো কর্কশ ব্যবহার করিয়াছে; আসিয়া কহিলেন, 'পোড়ারমুখী ভালো এক ডাকিনীকে ঘরে আনিয়াছিলাম!'

রজনীর শ্বশুর আসিয়া কহিলেন, 'রাক্ষসী, তুই এ সংসার ছারখার করিয়া দিলি!'

রজনীর ননদ আসিয়া কহিলেন, 'হতভাগিনীর সহিত দাদার কী কুক্ষণেই বিবাহ হইয়াছিল!'

রজনী একটি কথাও বলিল না। রজনীর নিজেরই যে আপনার প্রতি দারুণ ঘৃণা জন্মিয়াছিল, সেই ঘৃণার যন্ত্রণায় সে মনে করিল—বুঝি ইহার একটি কথাও অন্যায় নহে। সে মনে করিল, যে তিরস্কার তাহাকে করা হইতেছে সে তিরস্কার বুঝি তাহার যথার্থই পাওয়া উচিত। রজনী কাহাকেও কিছু বলিল না, একবার কাঁদিলও না। এ কয়দিন তাহার মুখশ্রী অতিশয় গম্ভীর—অতিশয় শান্ত—যেন মনে-মনে কী একটি সংকল্প করিয়াছে, মনে-মনে কী একটি প্রতিজ্ঞা বাঁধিয়াছে।

এই দুই মাস হইল মহেন্দ্র বিদেশে গিয়াছে—এই দুই মাস ধরিয়া রজনী যেন কী একটা ভাবিতেছিল, এত দিনে সে ভাবনা যেন শেষ হইল, তাই রজনীর মুখ অতি গম্ভীর অতি শান্ত দেখাইতেছে।

সন্ধ্যা হইলে ধীরে ধীরে সে মোহিনীর বাড়িতে গেল। মোহিনীর সহিত দেখা হইল, থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। যেন কী কথা বলিতে গিয়াছিল, বলিতে পারিল না, বলিতে সাহস করিল না। মোহিনী অতি স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, 'কী রজনী। কি বলিতে আসিয়াছিস।'

রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কহিল, 'দিদি, আমার একটি কথা রাখতে হবে।'

মোহিনী আগ্রহের সঙ্গে কহিল, 'কী কথা বলো।'

রজনী কতবার 'না বলি' 'না বলি' করিয়া অনেক পীড়াপীড়ির পর আস্তে আস্তে কহিল মোহিনীকে একটি চিঠি লিখিতে হইবে। কাহাকে লিখিতে হইবে। মহেন্দ্রকে। কী লিখিতে হইবে। না, তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আসুন, তাঁহাকে আর অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হবে না। রজনী তাহার দিদির বাড়িতে থাকিবে। বলিতে বলিতে রজনী কাঁদিয়া ফেলিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। রাশি রাশি ধুলি উড়াইয়া গ্রামের পথ দিয়া মাঝে মাঝে দুই-একটা গোরুর গাড়ি মন্থর গমনে যাইতেছে। দুই-একজন মাত্র পথিক নিভৃত পথে হন হন করিয়া চলিয়াছে। স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবল একটি গ্রাম্য বাঁশির স্বর শুনা যাইতেছে, বোধ হয় কোনো রাখাল মাঠে গোরু ছাড়িয়া দিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া বাজাইতেছে।

করুণা সমস্ত রাত চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত হইয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে। করুণা যে কোনো কুটীরে আতিথ্য লইবে, কাহারও কাছে কোনো প্রার্থনা করিবে, সে স্বভাবেরই নয়। কী করিলে কি হইবে, কী বলিতে হয়, কী কহিতে হয়, তাহার কিছু যদি ভাবিয়া পায়। লোক দেখিলে সে ভয়ে আকুল হইয়া পড়ে। এক-একজন করিয়া পথিক চলিয়া যাইতেছে, করুণার ভয় হইতেছে—'এইবার এই বুঝি আমার কাছে আসিবে, ইহার বুঝি কোনো দুরভিসন্ধি আছে!'

বেলা প্রায় তিন প্রহর হইবে, এখনো পর্যন্ত করুণা কিছু আহার করে নাই। পথশ্রমে, ধুলায়, অনিদ্রায়, অনাহারে, ভাবনায় করুণা একদিনের মধ্যে এমন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, এমন বিষণ্ণ বিবর্ণ মলিন শীর্ণ হইয়া গিয়াছে যে দেখিলে সহসা চিনা যায় না।

ঐ একজন পথিক আসিতেছে। দেখিয়া ভালো মনে হইল না। করুণার দিকে তার ভারি নজর—বিদ্যাসুন্দরের মালিনী-মাসির সম্পর্কের একটা গান ধরিল—কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিপ্রহর রসিকতা করিবার ভালো অবসর নয় বুঝিয়া সে তো গান গাইতে গাইতে পিছনে ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। আর-একজন, আর-একজন, আর-একজন—এইরূপ এক এক করিয়া কত পথিক চলিয়া গেল। এ পর্যন্ত করুণা ভদ্র পথিক একজনও দেখিতে পায় নাই। কিন্তু কী সর্বনাশ। ঐ একজন প্যান্টলুন-চাপকান-ধারী আসিতেছে। অনেক সময়ে ভদ্রলোকদের (ভদ্র কথা সাধারণ অর্থে যেরূপে ব্যবহৃত হয়) যত ভয় হয় এত আর কাহাদেরও নয়। ঐ দেখো, করুণা যে গাছের তলায় বসিয়াছিল সেই দিকেই আসিতেছে। করুণা তো ভয়ে আকুল, মাটির দিকে চাহিয়া থরথর কাঁপিতে লাগিল। পথিকটি তো, বলা নয় কহা নয়, অতি শান্ত ভাবে আসিয়া, সেই গাছের তলাটিতে আসিয়া বসিল কেন। বসিতে কি আর জায়গা ছিল না। পথের ধারে কি আর গাছ ছিল না।

পথিকটি স্বরূপবাবু। স্বরূপবাবুর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যে একটা স্বাভাবিক টান ছিল তাহারই আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া গাছের তলায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন না যে করুণাকে সেখানে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যখন করুণাকে দেখিলেন, চিনিলেন। তখন তাঁহার বিস্ময়ের ও আনন্দের অবধি রহিল না। করুণা দেখে নাই পথিকটি কে। সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে উঠিয়া যাইবে-যাইবে মনে করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। কিছুক্ষণ তো বিস্ময় ও আনন্দের তোড় সামলাইতে গেল, তার পর স্বরূপ অতি মধুর গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, 'করুণা!'

করুণা এই সম্বোধন শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল, পথিকের দিকে চাহিল, দেখিল স্বরূপবাবু! তাহার চেয়ে একটা সাপ যদি দেখিত করুণা কম ভয় পাইত।

করুণা কিছুই উত্তর দিল না। স্বরূপ অনেক কথা বলিতে লাগিল, এ কয় রাত্রি সে করুণার জন্যে কত কষ্ট পাইয়াছিল তাহার সমস্ত বর্ণনা করিল। সেই সুখরাত্রে তাহাদের প্রেমালাপের যখন সবে সূত্রপাত হইয়াছিল, এমন সময়ে ভঙ্গ হওয়াতে অনেক দুঃখ করিল। সে অতি হতভাগ্য, বিধাতা তাহাকে চিরজীবন দুঃখী করিবার জন্যই বুঝি সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহার কোনো আশাই সফল হয় না। অবশেষে, করুণা নরেন্দ্রের বাড়ি হইতে যে বাহির হইয়া আসিয়াছে, ইহা লইয়া অনেক আনন্দ প্রকাশ করিল। কহিল—আরো ভালোই হইয়াছে, তাহাদের দুইজনের যে প্রেম, যে স্বর্গীয় প্রেম, তাহা নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে পারিবে। আরো এমন অনেক কথা বলিল, তাহা যদি লিখিয়া লওয়া যাইত তাহা হইলে অনেক বড়ো বড়ো নভেলের রাজপুত ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য মহা মহা নায়কের মুখে স্বচ্ছন্দে বসানো যাইত। কিন্তু করুণা তাহার রসাস্বাদন করিতে পারে নাই।

স্বরূপ এলাহাবাদে যাইবে, তাই স্টেশনে যাইতেছিল। পথের মধ্যে এই-সকল ঘটনা। স্বরূপ প্রস্তাব করিল করুণা তাহার সঙ্গে পশ্চিমে চলুক, তাহা হইলে আর কোনো ভাবনা ভাবিতে হবে না।

করুণা কাল রাত্রি হইতে ভাবিতেছিল কোথায় যাইবে, কী করিবে। কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। আজিকার দিন তো প্রায় যায়-যায়—রাত্রি আসিবে, তখন কী করিবে, কত প্রকার লোক পথ দিয়া যাওয়া-আসা করিতেছে, এই-সকল নানান ভাবনার সময় এ প্রস্তাবটা করুণার মন্দ লাগিল না। ছেলেবেলা হইতে যে চিরকাল গৃহের বাহিরে কখনো যায় নাই, সে এই অনাবৃত পৃথিবীর দৃষ্টি কী করিয়া সহিবে বলো। সে একটা আশ্রয় পাইলে, লোকের চোখের আড়াল হইতে পারিলে বাঁচে।

তার মনে হইতেছে, যেন সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহা ছাড়া করুণা এমন শ্রান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে আর সে সহিতে পারে না। একবার মনে করিল স্বরূপের প্রস্তাবে সায় দিয়া যাইবে। কিন্তু স্বরূপের উপর তাহার এমন একটা ভয় আছে যে পা আর উঠিতে চায় না। করুণা ভাবিল, 'এই গাছের তলায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকি, না খাইয়া না দাইয়া মরিয়া যাইব।' কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে কত সহিবে বলো—এ ভাবনা আর বেশিক্ষণ স্থান পাইল না। স্বরূপের প্রস্তাবে সম্মত হইল। সন্ধ্যা হইল।

করুণা ও স্বরূপ এখন ট্রেনের মধ্যে।

বিংশ পরিচ্ছেদ

স্বরূপ ও করুণা কাশীতে আছে। করুণার দুরবস্থা বলিবার নহে। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিয়া সে যে কী অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে তাহা সেই জানে। স্বরূপের ভ্রম অনেক দিন হইল ভাঙিয়াছে, এখন বুঝিয়াছে করুণা তাহাকে ভালোবাসে না। সে ভাবিতেছে 'একি উৎপাত! এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম—সকলই ব্যর্থ হইল!' সে যে বিরক্ত হইয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। সে মনে করিয়াছিল এতদিন কবিতায় যাহা লিখিয়া আসিয়াছে, কল্পনায় চিত্র করিয়াছে, আজ সেই প্রেমের সুখ উপভোগ করিবে। কিন্তু সে কাছে আসিলে করুণা ভয়ে জড়োসড়ো আড়ষ্ট হইয়া মরিয়া যায়, তাহার সঙ্গে কথাই কহে না। স্বরূপ ভাবিল, 'একি উৎপাত! এ গলগ্রহ বিদায় করিতে পারিলে যে বাঁচি।' ভাবিল দিন-কতক কাছে থাকিতে থাকিতেই ভালোবাসা হইবে। স্বরূপ তো তাহার যথাসাধ্য করিল, কিন্তু করুণার ভালোবাসার কোনো চিহ্ন দেখিল না।

করুণা বেচারির তো আরাম বিশ্রাম নাই। এক তো সর্বক্ষণ পরের বাড়িতে অচেনা পুরুষের সঙ্গে আছে বলিয়া সর্বদাই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে। তাহা ছাড়া স্বরূপের ভাব-গতিক দেখিয়া সে তো ভয়ে আকুল—সে কাছে বসিয়া গান গায়, কবিতা শুনাইতে থাকে, মনের দুঃখ নিবেদন করে, অবশেষে মহা রুক্ষভাবে গাড়িভাড়ার টাকার জন্য নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণা যে কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না, ভয়ে বেচারি সারা হইতেছে। স্বরূপ রাত দিন খিট খিট করে, এমন-কি, করুণাকে মাঝে মাঝে ধমকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণার কিছু বলিবার মুখ নাই, সে শুধু কাঁদিতে থাকে।

এইরূপে কত দিন যায়, স্বরূপের এলাহাবাদে যাইবার সময় হইয়াছে। সে ভাবিতেছে, 'এখন করুণাকে লইয়া কী করি। এইখানে কি ফেলিয়া যাইব। না, এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম, এতদিন রাখিলাম, অবশেষে কি ফেলিয়া যাইব। আরো দিন-কতক দেখা যাক।'

অনেক ভাবিয়া-সাবিয়া করুণাকে তো ডাকিল। করুণা ভাবিল, 'যাইব কি না। কিন্তু না যাইয়াই বা কী করি। এখানে কোথায় থাকিব। এত দূর দেশে অচেনা জায়গায় কার কাছে যাইব। দেশে থাকিতাম তবু কথা থাকিত।'

করুণা চলিল। উভয়ে স্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ি ছাড়িতে এখনো দেরি আছে। জিনিসপত্র পুঁটুলি-বোঁচকা লইয়া যাত্রিগণ মহা কোলাহল করিতেছে। কানে-কলম-গোঁজা রেলওয়ে ক্লার্কগণ ভারি উঁচু চালে ব্যস্তভাবে ইতস্তত ফর ফর করিয়া বেড়াইতেছেন। পান সোডাওয়াটার নানাপ্রকার মিষ্টান্নের বোঝা লইয়া ফেরিওয়ালারা আগামী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এইরূপ তো অবস্থা। এমন সময়ে একজন পুরুষ করুণার পাশে সেই বেঞ্চে আসিয়া বসিল।

করুণা উঠিয়া যাইবে-যাইবে করিতেছে, এমন সময়ে তাহার পার্শ্বস্থ পুরুষ বিস্ময়ের স্বরে কহিয়া উঠিল, 'মা, তুমি যে এখানে!'

করুণা পণ্ডিতমহাশয়ের স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিল না। অনেকক্ষণ নির্জল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া, কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'সার্বভৌম-মহাশয়, আমার ভাগ্যে কী ছিল!'

পণ্ডিতমহাশয় তো আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন না। গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, 'মা, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তাহার জন্য আর ভাবিয়ো না। আমি প্রয়াগে যাইতেছি, আমার সঙ্গে আইস। পৃথিবীতে আর আমার কেহই নাই— যে কয়টা দিন বাঁচিয়া আছি ততদিন আমার কাছে থাকো, ততদিন আর তোমার কোনো ভাবনা নাই।'

করুণা অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে নিধি আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধি পণ্ডিতমহাশয়ের খরচে কাশী দর্শন করিতে আসিয়াছেন। পণ্ডিতমহাশয় তজ্জন্য নিধির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছেন। তিনি বলেন, নিধির ঋণ তিনি এ জন্মে শোধ করিতে পারিবেন না। করুণাকে দেখিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল; কহিল, 'ভট্টাচার্যমহাশয়, একটা কথা আছে।'

পণ্ডিতমহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া গেলেন। নিধি কহিল, 'ঐ বাবুটিকে দেখিতেছেন?'

পণ্ডিতমহাশয় চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন— স্বরূপ। নিধি কহিল, 'দেখিলেন! করুণার ব্যবহারটা একবার দেখিলেন! ছি-ছি, স্বর্গীয় কর্তার নামটা একেবারে ডুবাইল।'

পণ্ডিতমহাশয় অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে হাত উল্‌টাইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন—

'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।'

নিধি কহিল, 'আহা, নরেন্দ্র এমন ভালো লোক ছিল। ঐ রাক্ষসীই তো তাহাকে নষ্ট করিয়াছে।'

নরেন্দ্র যে ভালো লোক ছিল সে বিষয়ে পণ্ডিতমহাশয়ের সংশয় ছিল না, এখন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাইয়াছেন, কিন্তু এতক্ষণে কেন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহার কারণটা জানিতে পারিলেন। পণ্ডিতমহাশয়ের স্ত্রীজাতির উপর দারুণ ঘৃণা জন্মাইল। পণ্ডিত-মহাশয় ভাবিলেন, আর না— স্ত্রীলোকেই তাঁহার সর্বনাশ করিয়াছে, স্ত্রীজাতিকে আর বিশ্বাস করিবেন না।

নিধি লাল হইয়া কহিল, 'দেখুন দেখি, মহাশয়, পাপাচরণ করিবার আর কি স্থান নাই। এই কাশীতে!'

এ কথা পণ্ডিতমহাশয় এতক্ষণ ভাবেন নাই। শুনিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে অবাক হইয়া নিধির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; ভাবিলেন, 'সত্যই তো!'

একটা ঘণ্টা বাজিল, মহা ছুটাছুটি চেঁচামেচি পড়িয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয় বেঞ্চের কাছে বোঁচকা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি লইতে গেলেন। এমন সময় স্বরূপ তাড়াতাড়ি করুণাকে ডাকিতে আসিল— পণ্ডিতমহাশয়কে দেখিয়া সট করিয়া সরিয়া পড়িল। করুণা কাতর-স্বরে পণ্ডিতমহাশয়কে কহিল, 'সার্বভৌমমহাশয়, আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না।'

পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, 'মা, অনেক প্রতারণা সহিয়াছি— মনে করিয়াছি বৃদ্ধবয়সে আর কোনো দিকে মন দিব না— দেবসেবায় কয়েকটি দিন কাটাইয়া দিব।'

করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিতমহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল; কহিল, 'আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না— আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না।'

পণ্ডিতমহাশয়ের নেত্রে অশ্রু পুরিয়া আসিল; ভাবিলেন, 'যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে— ইহাকে তো ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।'

নিধি ছুটিয়া আসিয়া মহা একটা ধমক দিয়া কহিল, 'এখানে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে কী হইবে। গাড়ি যে চলিয়া যায়!'

এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া একটা গাড়ির মধ্যে পুরিয়া দিল।

করুণা অন্ধকার দেখিতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া মুখচক্ষু বিবর্ণ হইয়া সেইখানে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। স্বরূপের দেখাসাক্ষাৎ নাই, সে গোলেমালে অনেকক্ষণ হইল গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিময় অঙ্কুশের তাপে আর্তনাদ করিয়া লৌহময় গজ হন হন করিয়া অগ্রসর হইল। স্টেশনে আর বড়ো লোক নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

এই সময়ে মহেন্দ্রের নিকট হইতে যে-সকল পত্র পাইয়াছিলাম, তাহার একখানি নিম্নে উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম—

ভাই! যে কষ্টে, যে লজ্জায়, যে আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় পাগল হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিলাম তাহা তোমার কাছে গোপন করি নাই। সেই আঁধার রাত্রে বিজন পথ দিয়া যখন যাইতেছিলাম— কোনো কারণ নাই, কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো গম্য স্থান নাই— তখন কেন যাইতেছি, কোথায় যাইতেছি কিছুই ভাবি নাই। মনে করিয়াছিলাম এ পথের যেন অন্ত নাই, এমনি করিয়াই যেন আমাকে চিরজীবন চলিতে হইবে— চলিয়া, চলিয়া, চলিয়া তবু পথ ফুরাইবে না— রাত্রি পোহাইবে না। মনের ভিতর কেমন এক প্রকার ঔদাস্যের অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু রাত্রের অন্ধকার যত হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, দিনের কোলাহল যতই জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই আমার মনের আবেগ কমিয়া আসিল। তখন ভালো করিয়া সমস্ত ভাবিবার সময় আসিল। কিন্তু তখনো দেশে ফিরিবার জন্য এক তিলও ইচ্ছা হয় নি। কত দেশ দেখিলাম, কত স্থানে ভ্রমণ করিলাম, কত দিন কত মাস চলিয়া গেল, কিন্তু কী দেখিলাম কী করিলাম কিছু যদি মনে আছে! চোকের উপর কত পর্বত নদী অরণ্য মন্দির অট্টালিকা গ্রাম উঠিত, কিন্তু সে-সকল যেন কী। কিছুই নয়। যেন স্বপ্নের মতো, যেন মায়ার মতো, যেন মেঘের পর্বত-অরণ্যের মতো। চোখের উপর পড়িত তাই দেখিতাম, আর কিছুই নহে। এইরূপ করিয়া যে কত দিন গেল তাহা বলিতে পারি না— আমার মনে হইয়াছিল এক বৎসর হইবে, কিন্তু পরে গণনা করিয়া দেখিলাম চার মাস। ক্রমে ক্রমে আমার মন শান্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন ভবিষ্যৎ ও অতীত ভাবিবার অবসর পাইলাম। আমি এখন লাহোরে আসিয়াছি। এখানকার একজন বাঙালিবাবুর বাড়িতে আশ্রয় লইলাম, ও অল্প অল্প করিয়া ডাক্তারি করিতে আরম্ভ করিলাম। এখন আমার মন্দ আয় হইতেছে না। কিন্তু আয়ের জন্য ভাবি না ভাই, আমার হৃদয়ে যে নূতন মনস্তাপ উত্থিত হইয়াছে তাহাতে যে আমাকে কী অস্থির করিয়া তুলিয়াছে বলিতে পারি না। আমার নিজের উপর যে কী ঘৃণা হইয়াছে তাহা কী করিয়া প্রকাশ করিব। যখন দেশে ছিলাম তখন রজনীর জন্যে একদিনও ভাবি নাই, যখন দেশ ছাড়িয়া আসিলাম তখনো এক মুহূর্তের জন্য রজনীর ভাবনা মনে উদিত হয় নাই, কিন্তু দেশ হইতে যত দূরে গিয়াছি— যত দিন চলিয়া গিয়াছে— হতভাগিনী রজনীর কথা ততই মনে পড়িয়াছে— আপনাকে ততই মনে পড়িয়াছে— আপনাকে ততই নিষ্ঠুর পিশাচ বলিয়া মনে হইয়াছে। আমার ইচ্ছা করে এখনই দেশে ফিরিয়া যাই, তাহাকে যত্ন করি, তাহাকে ভালোবাসি, তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। সে হয়তো এতদিনে আমার কলঙ্কের কথা শুনিয়াছে। আমি তাহার কাছে কী বলিয়া দাঁড়াইব। না ভাই, আমি তাহা পারিব না।...

মহেন্দ্র

আমি দেখিতেছি, যে-সকল বাহ্য কারণে মহেন্দ্রের রজনীর উপর বিরাগ ছিল, সে-সকল কারণ হইতে দূরে থাকিয়া মহেন্দ্র একটু ভাবিবার অবসর পাইয়াছে। যতই তাহার আপনার নিষ্ঠুরাচরণ মনে উদিত হইয়াছে ততই রজনীর উপর মমতা তাহার দৃঢ়মূল হইয়াছে। মহেন্দ্র এখন ভাবিয়াই পাইতেছে না তাহাকে কেন ভালোবাসে নাই— এমন মৃদু, কোমল, স্নিগ্ধ স্বভাব, তাহাকে ভালোবাসে না এমন পিশাচ আছে! কেন, তাহাকে দেখিতেই বা কী মন্দ! মন্দ? কেন, অমন সুন্দর স্নেহপূর্ণ চক্ষু! অমন কোমল ভাবব্যঞ্জক মুখশ্রী! ভাব লইয়া রূপ, না, বর্ণ লইয়া? রজনীর যাহা-কিছু ভালো তাহাই মহেন্দ্রের মনে পড়িতে লাগিল, আর তাহার যাহা-কিছু মন্দ তাহাও মহেন্দ্র ভালো বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে রজনীকে যতই ভালো বলিয়া বুঝিল, আপনাকে ততই পিশাচ বলিয়া মনে হইল।

মহেন্দ্রের সেখানে বিলক্ষণ পসার হইয়াছে। মাসে প্রায় দুই শত টাকা উপার্জন করিত। কিন্তু প্রায় সমস্তই রজনীর কাছে পাঠাইয়া দিত, নিজের জন্য এত অল্প টাকা রাখিয়া দিত যে, আমি ভাবিয়া পাই না কী করিয়া তাহার খরচ চলিত!

অনেক দিন হইয়া গেছে মহেন্দ্রের বাড়ি আসিতে বড়োই ইচ্ছা হয়, কিন্তু সকল কথা মনে উঠিলে আর ফিরিয়া আসিতে পা সরে না। মহেন্দ্র একটা চিঠি পাইয়াছে, পাইয়া অবধি বড়োই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সেই মোহিনীর চিঠি। চিঠির শেষ ভাগে লিখা আছে— 'আপনি যদি রজনীকে নিতান্তই দেখিতে না পারেন, যদি রজনী এখানে আছে বলিয়া আপনি নিতান্তই আসিতে না চান তবে আপনার আশঙ্কা করিবার বিশেষ কোনো কারণ নাই, সে তাহার দিদির বাড়ি চলিয়া যাইবে। রজনী লিখিতে জানে না বলিয়া আমি তাহার হইয়া লিখিয়া দিলাম। সে লিখিতে জানিলেও হয়তো আপনাকে লিখিতে সাহস করিত না।'

ইহার মৃদু তিরস্কার মহেন্দ্রের মর্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়াছে। সে স্থির করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া যাইবে।

রজনীর শরীর দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। মুখ বিবর্ণ ও বিষণ্ণতর হইতেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে মোহিনীর গলা ধরিয়া বলিল, 'দিদি, আর আমি বেশিদিন বাঁচিব না।'

মোহিনী কহিল, 'সেকি রজনী, ও কথা বলিতে নাই।'

রজনী বলিল, 'হাঁ দিদি, আমি জানি, আর আমি বেশিদিন বাঁচিব না। যদি এর মধ্যে তিনি না আসেন তবে তাঁকে এই টাকাগুলি দিয়ো। তিনি আমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিতেন, কিন্তু আমার খরচ করিবার দরকার হয় নাই, সমস্ত জমাইয়া রাখিয়াছি।'

মোহিনী অতিশয় স্নেহের সহিত রজনীর মুখ তাহার বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, 'চুপ কর্, ও-সব কথা বলিস নে।'

মোহিনী অনেক কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া মনে মনে কহিল, 'মা ভগবতি, আমি যদি এর দুঃখের কারণ হয়ে থাকি, তবে আমার তাতে কোনো দোষ নাই।'

হাত-অবসর পাইলেই রজনীর শাশুড়ি রজনীকে লইয়া পড়িতেন, নানা জন্তুর সহিত তাহার রূপের তুলনা করিতেন, আর বলিতেন যে বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া অবধিই তিনি জানিতেন যে এইরূপ একটা দুর্ঘটনা হইবে— তবে জানিয়া শুনিয়া কেন যে বিবাহ দিলেন সে কথা উত্থাপন করিতেন না। রজনী না থাকিলে মহেন্দ্রবিয়োগে তাঁহার মাতার অধিকতর কষ্ট হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই-যে মাঝে মাঝে মন খুলিয়া তিরস্কার করিতে পান, ইহাতে তাঁহার মন অনেকটা ভালো আছে। মহেন্দ্রের মাতার স্বভাব যত দূর জানি তাহাতে তো এক-একবার আমার মনে হয়— এই-যে তিরস্কার করিবার তিনি সুযোগ পাইয়াছেন ইহাতে বোধ হয় মহেন্দ্রের বিয়োগও তিনি ভাগ্য বলিয়া মানেন। মহেন্দ্রের অবস্থান-কালে, রজনী যেদিন কোনো দোষ না করিত সেদিন মহেন্দ্রের মাতা মহা মুশকিলে পড়িয়া যাইতেন। অবশেষে ভাবিয়া ভাবিয়া দুই বৎসরের পুরানো

কথা লইয়া তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া আসিতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁহার তিরস্কারের ভাণ্ডার সর্বদাই মজুত রহিয়াছে, অবসর পাইলেই হয়।

ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের মা মহেন্দ্রকে এক লোভনীয় পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার 'বাবা'কে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে কহিয়াছেন ও সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার জন্য একটি সুন্দরী কন্যা অনুসন্ধান করা যাইতেছে। এই চিঠি পাইয়া মহেন্দ্রের আপনার উপর দ্বিগুণ লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে—'তবে সকলেই মনে করিয়াছে আমি রূপের কাঙাল! রজনী দেখিতে ভালো নয় বলিয়াই আমি তাহার উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি? লোকের কাছে মুখ দেখাইব কোন্ লজ্জায়।'

কিন্তু রজনীর আজকাল অল্প তিরস্কারই অত্যন্ত মনে লাগে, আগেকার অপেক্ষাও সে কেমন ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শরীর যতই খারাপ হইতেছে ততই সে ভয়ে ত্রস্ত ও তিরস্কারে অধিকতর ব্যথিত হইয়া পড়িতেছে, ক্রমাগত তিরস্কার শুনিয়া শুনিয়া আপনাকে সত্য-সত্যই দোষী বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। মোহিনী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাহার কাছে আসিত—প্রত্যহ তাহাকে যথাসাধ্য যত্ন করিত ও প্রত্যহ দেখিত সে দিনে দিনে অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। একদিন রজনী সংবাদ পাইল মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার কিসের আহ্লাদ! মহেন্দ্র তো তাহাকে সেই ঘৃণাচক্ষে দেখিবে। তাহা হউক, কিন্তু তাহার জন্য মহেন্দ্র যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে কষ্ট পাইতেছে এ আত্মগ্লানির যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল—যে কারণেই হউক, মহেন্দ্র যে বিদেশে গিয়া কষ্ট পাইতেছে ইহা রজনীর অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কাশীর স্টেশনে করুণা-সংক্রান্ত যে-সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছিল, একজন ভদ্রলোক তাহা সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। স্বরূপকে দেখিয়া তিনি কেমন লজ্জিত ও সংকুচিত হইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন সকলে চলিয়া গেল এবং করুণা মূর্ছিত হইয়া পড়িল তখন তিনি তাহাকে একটা গাড়িতে তুলিয়া তাঁহার বাসাবাড়িতে লইয়া যান—তাঁহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যাওয়া হইল না। করুণার মুখ দেখিয়া, এমন কে আছে যে তাহাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে? মহেন্দ্রও তাহাকে সন্দেহ করে নাই। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম—সেই ভদ্রলোকটি মহেন্দ্র।

লাহোর হইতে আসিবার সময় একবার কাশীতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতার ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই-সমস্ত ঘটনা ঘটে। করুণা চেতনা পাইলে মহেন্দ্র তাহাকে তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেন্দ্রের মুখে এমন দয়ার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল যে, করুণা শীঘ্রই সাহস পাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে কহিল এবং ঠিক সে যেমন করিয়া ভাবিকে জিজ্ঞাসা করিত তেমন করিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন নরেন্দ্র তাহার উপর অমন রাগ করিল। মহেন্দ্র বালিকার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না—কিন্তু এই প্রশ্ন শুনিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। নরেন্দ্রকে মহেন্দ্র বেশ চেনে, সে সমস্ত ঘটনা বেশ বুঝিতে পারিল। পণ্ডিতমহাশয় যে কেন তাহাকে অমন করিয়া ফেলিয়া গেলেন তাহাও করুণা ভাবিয়া পাইতেছিল না, অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া তাহাও মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল। মহেন্দ্র তাহার যথার্থ কারণ যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা গোপন করিয়া নানারূপে বুঝাইয়া দিলেন।

এখন করুণাকে লইয়া যে কী করিবে মহেন্দ্র তাহাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল তাহাদের বাড়িতেই লইয়া যাইবে। মহেন্দ্র করুণার নিকট তাহার বাড়ির বর্ণনা করিল। কহিল— তাহাদের বাড়ির সামনেই একটি প্রাচীর-দেওয়া বাগান আছে, বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, পুষ্করিণীর উপরে একটি বাঁধানো শানের ঘাট। কহিল—তাহাদের বাড়িতে গেলে করুণা তাহার একটি দিদি পাইবে, তেমন স্নেহশালিনী—তেমন কোমলহৃদয়—তেমন ক্ষমাশীলা (আরো অসংখ্য বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছিল) দিদি কেহই কখনও পায় নাই। করুণা অমনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল সেখানে কি ভবির দেখা পাইবে! মহেন্দ্র ভবির সন্ধান করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন করুণা তাঁহাকে ভ্রাতার মতো দেখিবে কি না, করুণার তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। যাহা হউক, এতদিন পরে করুণার মুখ প্রফুল্ল দেখিলাম, এতদিন পরে সে তবু আশ্রয় পাইল। কিন্তু বারবার করুণা মহেন্দ্রকে পণ্ডিতমহাশয়ের তাহার উপর রাগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

অবশেষে তাহারা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কাশী পরিত্যাগ করিয়া চলিল। কে কী বলিবে, কে কী করিবে, কখন কী হইবে—এই-সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে ও যদি কেহ কিছু বলে তবে তাহার কী উত্তর দিবে, যদি কেহ কিছু করে তবে তাহার কী প্রতিবিধান করিবে, যদি কখনো কিছু হয় তবে সে অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিবে—এই-সমস্ত ঠিক করিতে করিতে মহেন্দ্র গ্রামের রাস্তায় গিয়া পৌঁছিল। লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া, সংকোচে অভিভূত হইয়া, পথিকদিগের চক্ষু এড়াইয়া ও কোনোমতে পথ পার হইয়া গৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল।

কতবার সাত-পাঁচ করিয়া পরে প্রবেশ করিল। দাদাবাবুকে দেখিয়াই ঝি ঝাঁটা রাখিয়া ছুটিয়া বড়োমা'কে খবর দিতে গেল। বড়োমা তখন রজনীর সুমুখে বসিয়া রজনীর রূপের ব্যাখ্যান করিতেছিলেন, এমন সময়ে খবর পাইলেন যে আর-একটি নূতন বধূ লইয়া তাহার 'বাবা' ঘরে আসিয়াছেন।

মহেন্দ্রের ও করুণার সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইল, যখন সকলে মিলিয়া উলু দিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মহেন্দ্র তাঁহাদিগকে করুণা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। সে-সমস্ত বৃত্তান্ত মহেন্দ্রের মাতার বড়ো ভালো লাগে নাই। মহেন্দ্রের সম্মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু সেই রাত্রে মহেন্দ্রের পিতার সহিত তাঁহার ভারি একটা পরামর্শ হইয়া গিয়াছিল ও অবশেষে রজনী পোড়ারমুখীই যে এই-সমস্ত বিপত্তির কারণ তাহা অবধারিত হইয়া গিয়াছিল। এই কথাটা লইয়া মহেন্দ্রের পিতার অতিরিক্ত আনা-দুয়েকের তামাকু ব্যয় হইয়াছিল ও দুই-চারিজন বৃদ্ধ বিজ্ঞ প্রতিবাসীদিগের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর অধিক কিছু দুর্ঘটনা হয় নাই।

রজনী তাহার দিদির বাড়ি যাইবার সমস্তই বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাঁহার শ্বশুর শাশুড়িরা এই বন্দোবস্তে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু রজনী বড়ো দুর্বল বলিয়া এখনো সমাধা হইয়া উঠে নাই। এই খবরটি আসিয়াই মহেন্দ্র তাঁহার মাতার নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন। আশ্চর্যের স্বরে কহিলেন, 'দিদির বাড়ি যাইবে, তার অর্থ কী। আমি আসিলাম আর অমনি দিদির বাড়ি যাইবে।'

মহেন্দ্রের মা'ও অবাক, মহেন্দ্রের পিতা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন—পরে ঠুঙি হইতে চশমা বাহির করিয়া পরিলেন এবং মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন—যেন তিনি মিলাইয়া দেখিতে চান যে এ মহেন্দ্রের সহিত পূর্বকার মহেন্দ্রের কোনো আদল আছে কি না। এ মহেন্দ্র ঝুটো মহেন্দ্র কি না! মহেন্দ্র অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ রজনীর ঘরে চলিয়া গেলেন ও কর্তা গৃহিণীতে মিলিয়া ফুস ফুস করিয়া মহাপরামর্শ করিতে লাগিলেন।

রজনী মহেন্দ্রকে দেখিয়া মহা শশব্যস্ত হইয়া পড়িল, কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে মনে করিতে লাগিল, মহেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া কি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে! তাহার তাড়াতাড়ি বলিবার

ইচ্ছা হইল যে, 'আমি এখনই যাইতেছি, আমার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে।' যখন সে এই গোলমালে পড়িয়া কী করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না, তখন মহেন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল। কী ভাগ্য! বিষণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি নাকি আজই দিদির বাড়ি যাবে। কেন রজনী।'

আর কি উত্তর দিবার জো আছে।—'আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধ করিয়াছি, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু তাহা কি ক্ষমা করিবে না।'

ওকি মহেন্দ্র! অমন করিয়া বলিয়ো না, রজনীর বুক ফাটিয়া যাইতেছে—'বলো, তাহা কি ক্ষমা করিবে না।'

রজনীর উত্তর দিবার কি ক্ষমতা আছে। সে পূর্ণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'একবার বলো ক্ষমা করিলে।'

রজনী ভাবিল—সেকি কথা। মহেন্দ্র কেন ক্ষমা চাহিতেছেন। সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, সেই মহেন্দ্রের নিকট অপরাধী, কেননা তাহার জন্যই মহেন্দ্র এত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, গৃহ ত্যাগ করিয়া কত বৎসর বিদেশে কাল যাপন করিয়াছেন, সে কোথায় মহেন্দ্রের নিকট ক্ষমা চাহিবে—তাহা না হইয়া একি বিপরীত! ক্ষমা চাহিবে কী, সে নিজেই ক্ষমা চাহিতে সাহস করে নাই। সে কি ক্ষমার যোগ্য। মহেন্দ্র রজনীর দুর্বল মস্তক কোলে তুলিয়া লইল। রজনী ভাবিল, 'এই সময়ে যদি মরি তবে কী সুখে মরি!' তাহার কেমন সংকোচ বোধ হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের ক্রোড় তাহার নিকট যেন ভিখারির নিকট সিংহাসন।

মহেন্দ্র তাহাকে কত কী কথা বলিল, সে-সকল কথার উত্তর দিতে পারিল না। সে ভাবিল 'এ মধুর স্বপ্ন চিরস্থায়ী নহে—এই মুহূর্তে মরিতে পাইলে কী সুখী হই! কিন্তু এ অবস্থা কতক্ষণ রহিবে!' রজনীর এ সংকোচ শীঘ্র দূর হইল। রজনী তাহার কোলে মাথা রাখিয়া কতক্ষণ কত কী কথা কহিল—কত অশ্রুজল, কত কথা, কত হাসি, সে বলিবার নহে।

মহেন্দ্র যখন উঠিয়া যাইতে চাহিল তখন রজনী তাহাকে আর-একটু বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিল, যাহা আর কখনো করিতে সাহস করে নাই। রজনীর একি পরিবর্তন! যে সুখ সে কখনো আশা করে নাই, আপনাকে যে সুখ পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করে নাই, সেই সুখ সহসা পাইয়াছে—আহ্লাদে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—সে কী করিবে ভাবিয়া পাইতে-ছিল না।

সেই সন্ধ্যাবেলাই সে মোহিনীর বাড়িতে গেল, তাড়াতাড়ি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে বসিল। মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন রজনী, কী হয়েছে।'

সে মনে করিল মহেন্দ্র না জানি আবার কী অন্যায়াচরণ করিয়াছে।

রজনী তাহাকে সকল কথা বলিতে লাগিল—শুনিয়া মোহিনীও আহ্লাদে কাঁদিতে লাগিল। রজনীর দুই-এক মাসের মধ্যে যে কোনো ব্যাধি বা দুর্বলতা হইয়াছিল তাহার কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর কখনো রজনীর ঘরকন্নার কাজে এত উৎসাহ কেহ দেখে নাই—শাশুড়ি মহা উগ্রভাবে কহিলেন, 'হয়েছে, হয়েছে, ঢের হয়েছে, আর গিন্নিপনা করে কাজ নেই, দুদিন উপোস করে আছেন, সবে আজ ভাত খেয়েছেন, ওঁর গিন্নিপনা দেখে আর বাঁচি নে।'

এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক—রজনী যে দুদিন উপোস করিয়া ছিল সে দুদিন কাজ করিতে পারে নি বলিয়া তাহার শাশুড়ি মহা বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও ভবিষ্যতে যখনই রজনীর দোষের অভাব পড়িবে সেই দুই দিনের কথা লইয়া আবার বক্তৃতা যে দিবেন ইহাও নিশ্চিত, এ বিষয়ে কোনো পাঠকের সন্দেহ উপস্থিত না হয়।

দেখিতে দেখিতে করুণার সহিত রজনীর মহা ভাব হইয়া গেল। দুইজনের ফুস ফুস করিয়া মহা মনের কথা পড়িয়া গেল—তাহাদের কথা আর ফুরায় না। তাহাদের স্বামীদের কত দিনকার

সামান্য বস্তু, সামান্য আদরটুকু তাহারা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছে— তাহাই কত মহান ঘটনার মতো বলাবলি করিত। কিন্তু এ বিষয়ে তো দুইজনেরই ভাণ্ডার অতি সামান্য, তবে কী যে কথা হইত তাহারাই জানে। হয়তো সে-সব কথা লিখিলে পাঠকেরা তাহার গাম্ভীর্য বুঝিতে পারিবেন না, হয়তো হাসিবেন, হয়তো মনে করিবেন এ-সব কোনো কাজেরই কথা নয়। কিন্তু সে বালিকারা যে-সকল কথা লইয়া অতি গুপ্তভাবে অতি সাবধানে আন্দোলন করিয়াছে তাহাই লইয়া যে সকলে হাসিবে, সকল কথা তুচ্ছভাবে উড়াইয়া দিবে তাহা মনে করিলে কষ্ট হয়। কিন্তু করুণার সঙ্গে রজনী পারিয়া উঠে না— সে এক কথা সাতবার করিয়া বলিয়া, সব কথা একেবারে বলিতে চেষ্টা করিয়া, কোনো কথাই ভালো করিয়া বুঝাইতে না পারিয়া রজনীর এক প্রকার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই কথা ফুরায় নাই তো কেমন করে সে রজনীর কথা শুনিবে! তাহার কি একটা-আধটা কথা। তাহার পাখির কথা, তাহার ভবির কথা, তাহার কাঠবিড়ালির গল্প— সে কবে কী স্বপ্ন দেখিয়াছিল— তাহার পিতার নিকট দুই রাজার কী গল্প শুনিয়াছিল— এ-সমস্ত কথা তাহার বলা আবশ্যক। আবার বলিতে বলিতে যখন হাসি পাইত তখন তাহাই বা থামায় কে। আর, কেন যে হাসি পাইল তাহাই বা বুঝে কাহার সাধ্য। রজনীবেচারির বড়ো বেশি কথা বলিবার ছিল না, কিন্তু বেশি কথা নীরবে শুনিবার এমন আর উপযুক্ত পাত্র নাই। রজনী কিছুতেই বিরক্ত হইত না, তবে এক-এক সময়ে অন্যমনস্ক হইত বটে— তা, তাহাতে করুণার কী ক্ষতি। করুণার বলা লইয়া বিষয়।

করুণাকে লইয়া মহেন্দ্রের মাতা বড়ো ভাবিত আছেন। তাঁহার বয়স বড়ো কম নহে, পঞ্চান্ন বৎসর— এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞতায় তিনি ভদ্রলোকের ঘরে এমন বেহায়া মেয়ে কখনো দেখেন নাই, আবার তাঁহার প্রতিবেশিনীরা তাহাদের বাপের বয়সেও এমন মেয়ে কখনো দেখে নাই বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গেল। মহেন্দ্রের পিতা তামাকু খাইতে খাইতে কহিতেন যে, ছেলেমেয়েরা সবাই খৃষ্টান হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের মাতা কহিতেন সে কথা মিছা নয়, মহেন্দ্রের মাতা মাঝে মাঝে রজনীকে সম্বোধন করিয়া করুণার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কহিতেন, 'আজ বাগানে বড়ো গলা বাহির করা হইতেছিল! লজ্জা করে না!' কিন্তু তাহাতে করুণা কিছুই সাবধান হয় নাই। কিন্তু এ তো করুণার শান্ত অবস্থা, করুণা যখন মনের সুখে তাহার পিতৃভবনে থাকিত তখন যদি এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞ গৃহিণী তাহাকে দেখিতেন তবে কী করিতেন বলিতে পারি না।

আবার এক-একবার যখন বিষণ্ণ ভাব করুণার মনে আসিত তখন তাহার মূর্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তাহার কথা নাই, হাসি নাই, গল্প নাই, সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে— রজনী পাশে বসিয়া 'লক্ষ্মী দিদি আমার' বলিয়া কত সাধাসাধি করিলে উত্তর নাই। করুণা প্রায় মাঝে মাঝে এমনি বিষণ্ণ হইত, কতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তবে সে শান্ত হইত। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, 'নরেন্দ্র কোথায়।'

মহেন্দ্র কহিল, 'আমি তো জানি না।'

করুণা কহিল, 'কেন জান না।'

কেন জানে না সে কথা মহেন্দ্র ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না, তবে নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে স্বীকার করিল।

কিন্তু নরেন্দ্রের অধিক সন্ধান করিতে হইল না। নরেন্দ্র কেমন করিয়া তাহার সন্ধান পাইয়াছে। একদিন করুণা যখন রজনীর নিকট দুই রাজার গল্প করিতে ভারি ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে ডাকে তাহার নামে একখানি চিঠি আসিল। এ পর্যন্তও তাহার বয়সে সে কখনো নিজের নামের চিঠি দেখে নাই। এ চিঠি পাইয়া করুণার মহা আহ্লাদ হইল, সে জানিত চিঠি পাওয়া এক মহা কাণ্ড, রাজা-রাজড়াদেরই অধিকার। আস্ত চিঠি ছিঁড়িয়া খুলিতে তাহার কেমন মায়া হইতে লাগিল, আগে সকলকে দেখাইয়া অনেক অনিচ্ছার সহিত লেফাফা খুলিল, চিঠি পড়িল, চিঠি পড়িয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠি মহেন্দ্রকে দিল।

নরেন্দ্র লিখিতেছেন—'তিন শত টাকা আমার প্রয়োজন, না পাইলে আমার সর্বনাশ, না পাইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব। ইতি।'

করুণা কাঁদিয়া উঠিল। করুণা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হবে।'

মহেন্দ্র কহিল কোনো ভাবনা নাই, এখনি টাকা লইয়া সে যাইতেছে। নরেন্দ্রের ঠিকানা চিঠিতে লিখা ছিল, সেই ঠিকানা-উদ্দেশ্যে মহেন্দ্র চলিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র দেশে আসিয়া অবধি মোহিনীর বড়ো খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না। মহেন্দ্র তো তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পায় না—'একদিন কী অপরাধ করিয়াছিলাম তাহার জন্য কি দুইজনের এ জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হইবে?' সে মনে করিল হয়তো মোহিনী রাগ করিয়াছে, হয়তো মোহিনী তাহাকে ভালোবাসে না। পাঠকেরা শুনিলে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবেন না যে, মহেন্দ্র এখনো মোহিনীকে ভালোবাসে। কিন্তু মহেন্দ্রের সে ভালোবাসার পক্ষে যে যুক্তি কত, তাহা শুনিলে কাহারো আর কথা কহিবার জো থাকিবে না। সে বলে, 'মানুষকে ভালোবাসিতে দোষ কী। আমি তো মোহিনীকে তেমন ভালোবাসি না, আমি তাহাকে ভগিনীর মতো, বন্ধুর মতো ভালোবাসি—আমি কখনো তাহার অধিক তাহাকে ভালোবাসি না।' এই কথা এত বিশেষ করিয়া ও এত বার বার বলিত যে তাহাতেই বুঝা যাইত তদপেক্ষাও অধিক ভালোবাসে। সে আপনার মনকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিত, সুতরাং ঐ এক কথা তাহাকে বার বার বিশেষ করিয়া বলিতে হইত। ঐ এক কথা বার বার বলিয়া তাহার মনকে বিশ্বাস করাইতে চাহিত, তাহার মন এক-একবার অল্প-অল্প বিশ্বাস করিত। সে বলিত, 'আপনার ভগিনীর মতো, বন্ধুর মতো যদি মোহিনী মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসে তাহাতে দোষ কী। বরং না আসিলেই দোষ। কেন, মোহিনী তো আর-সকলের সঙ্গেই দেখা করিতে পারে, তবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে না কেন। যেন সত্য-সত্যই আমাদের মধ্যে কোনো সমাজবিরুদ্ধ ভাব আছে—কিন্তু তাহা তো নাই, নিশ্চয় তাহা নাই, তাহা থাকা অসম্ভব। আমি রজনীকে প্রেমের ভাবে ভালোবাসি, সকলের অপেক্ষা ভালোবাসি—আমি মোহিনীকে কেবল ভগিনীর মতো ভালোবাসি।' মহেন্দ্র এইরূপে মনের মধ্যে সকল কথা তোলাপাড়া করিত। এমন-কি, রজনীকেও তাহার এই-সকল যুক্তি বুঝাইয়াছিল। রজনীর বুঝিতে কিছুই গোল বাধে নাই, সে বেশ স্পষ্টই বুঝিয়াছিল। সে নিজে গিয়া মোহিনীকে ঐ-সমস্ত কথা বুঝাইল, মোহিনী বিশেষ কিছুই উত্তর দিল না। মনে-মনে কহিল, 'সকলের মন জানি না, কিন্তু আমার নিজের মনের উপর আমার বিশ্বাস নাই।' মোহিনী ভাবিল—আর না, আর এখানে থাকা শ্রেয় নহে। মোহিনী কাশী যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিল, বাড়ির লোকেরা তাহাতে অসম্মত হইল না।

কাশী যাইবার সময় করুণা ও রজনীর সহিত একবার দেখা করিল। করুণা কহিল, 'তুমি কাশী যাইতেছ, যদি আমাদের পণ্ডিতমহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয় তবে তাঁহাকে বলিয়ো আমি ভালো আছি।'

করুণা জানিত যে, পণ্ডিতমহাশয় নিশ্চয় তাহার কুশলসংবাদ পাইবার জন্য আকুল আছেন।

করুণা যাহা মনে করিয়াছিল তাহা মিথ্যা নহে। নিধির পীড়াপীড়িতে রেলের গাড়িতে চড়িয়া পণ্ডিতমহাশয়ের এমন অনুতাপ হইয়াছিল যে অনেকবার তিনি চীৎকার করিয়া গাড়ি থামাইতে

অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'গাড়োয়ান' যখন কিছুতেই ব্রাহ্মণের দোহাই মানিল না, তখন তিনি ক্ষান্ত হন। কিন্তু বার বার কাতরস্বরে নিধিকে বলিতে লাগিলেন 'কাজটা ভালো হইল না'। দুই-চার-বার এইরূপ বলিতেই নিধি মহা বিরক্ত হইয়া বিলক্ষণ একটি ধমক দিয়া উঠিল। পণ্ডিতমহাশয় নিধিকে আর-কিছু বলিতে সাহস করিলেন না; কিন্তু গাড়ির কোণে বসিয়া এক ডিবা নস্য সমস্ত নিঃশেষ করিয়াছিলেন ও তাঁহার চাদরের এক অংশ অশ্রুজলে সম্পূর্ণরূপে ভিজাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল গাড়িতে নয়, যেখানে গিয়াছেন নিধিকে বার-বার ঐ এক কথা বলিয়া বিরক্ত করিয়াছেন। কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া যখন করুণাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার আর অনুতাপের পরিসীমা রহিল না। নিধিকে ঐ এক কথা বলিয়া এমন বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন যে, সে একদিন কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছিল।

মোহিনী কহিল, 'তোমাদের পণ্ডিতমহাশয়কে তো আমি চিনি না, যদি চিনাশুনা হয়, তবে বলিব।'

করুণা একেবারে অবাক হইয়া গেল। পণ্ডিতমহাশয়কে চিনে না! সে জানিত পণ্ডিতমহাশয়কে সকলেই চিনে। সে মোহিনীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল কোন্ পণ্ডিতমহাশয়ের কথা কহিতেছে, কিন্তু তাহাতেও যখন মোহিনী পণ্ডিতমহাশয়কে চিনিল না তখন করুণা নিরাশ ও অবাক হইয়া গেল।

কাঁদিতে কাঁদিতে রজনীর কাছে বিদায় লইয়া মোহিনী কাশী চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বর্ষা কাল। দুই দিন ধরিয়া বাদলার বিরাম নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতার রাস্তায় ছাতির অরণ্য পড়িয়া গিয়াছে। সসংকোচ পথিকদের সর্বাঙ্গে কাদা বর্ষণ করিতে করিতে গাড়ি ছুটিতেছে।

মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। বড়ো রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাইয়া একটি অতি সংকীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুটা-একটা খোলার ঘর ভাঙিয়া-চুরিয়া পড়িতেছে ও তাহার দুই প্রৌঢ়া অধিবাসিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া অবশেষে চুলাচুলি করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। ভাঙা হাঁড়ি, পচা ভাত, আমের আঁটি ও পৃথিবীর আবর্জনা গলির যেখানে সেখানে রাশীকৃত রহিয়াছে।

একটি দুর্গন্ধ পুষ্করিণীর তীরে আস্তাবল-রক্ষকের মহিলারা আঁচল ভরিয়া তাঁহাদের আহারের জন্য উদ্ভিজ্জ সঞ্চয় করিতেছেন। হুঁচট খাইতে খাইতে—কখনো-বা এক-হাঁটু কাদায় কখনো-বা এক-হাঁটু ঘোলা জলে জুতা ও পেন্টলুন্‌টাকে পেন্সন দিবার কল্পনা করিতে করিতে—সর্বাঙ্গে কাদামাখা দুই-চারিটা কুকুরের নিকট হইতে অশ্রান্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতে মহেন্দ্র গোবর-আচ্ছাদিত একটি অতি মুমূর্ষু বাটীতে গিয়া পেঁৗছিলেন। দ্বারে আঘাত করিলেন, জীর্ণ শীর্ণ দ্বার বিরক্ত রোগীর মতো মৃদু আর্তনাদ করিতে করিতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র গৃহে ছিলেন, কিন্তু বৎসর-কয়েকের মধ্যে পুলিসের কনস্টেবল ছাড়া নরেন্দ্রের গৃহে আর-কোনো অতিথি আসে নাই—এইজন্য দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিয়াই নরেন্দ্র অন্তর্ধান করিয়াছেন।

দ্বার খুলিয়াই মহেন্দ্র আবর্জনা ও দুর্গন্ধ-ময় এক প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন। সে প্রাঙ্গণের এক পাশে একটা কূপ আছে, সে কূপের কাছে কতকগুলা আমের আঁটি হইতে ছোটো ছোটো চারা উঠিয়াছে। সে কূপের উপরে একটা পেয়ারা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রাঙ্গণ পার হইয়া সংকুচিত মহেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। এমন নিম্ন ও এমন স্যাঁৎসেঁতে ঘর বুঝি মহেন্দ্র আর

কখনো দেখে নাই, ঘর হইতে এক প্রকার ভিজা ভাপসা গন্ধ বাহির হইতেছে। বৃষ্টির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগ্ন জানালায় একটা ছিন্ন দরমার আচ্ছাদন রহিয়াছে। সে গৃহের দেয়ালে যে এক কালে বালি ছিল, সে পাড়ায় এইরূপ একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এক জায়গায় ইঁটের মধ্যে একটি গর্তে খানিকটা তামাক গোঁজা আছে। গৃহসজ্জার মধ্যে একখানি অবিশ্বাসজনক তক্তা (যদি তাহার প্রাণ থাকিত তবে তাহা ব্যবহার করিলে পশুনৃশংসতানিবারণী সভায় অনেক টাকা জরিমানা দিতে হইত)—তাহার উপরে মললিপ্ত মসীবর্ণ একখানি মাদুর ও তদুপযুক্ত বালিশ ও সর্বোপরি স্বকার্যে অক্ষম দীনহীন একটি মশারি।

গৃহে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র একটি দাসীকে দেখিতে পাইলেন। সে দাসীটি তাঁহাকে দেখিয়াই ঈষৎ হাসিতে হাসিতে মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে কহিল, 'কেন গো বাবু, মানুষের গায়ের উপর না পড়িলেই কি নয়।'

মহেন্দ্র তাহার নিকট হইতে অন্তত দুই হস্ত ব্যবধানে ছিলেন ও তাহার দুর্গন্ধ বস্ত্র ও ভয়-জনক মুখশ্রী দেখিয়া আরো দুই হস্ত ব্যবধানে যাইবার সংকল্প করিতেছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রের যে তাহার কাছে যাওয়াই লক্ষ্য ছিল, ইহা কল্পনা করিয়া সে দাসীটি মনে-মনে মহা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই দাসী গিয়া ভীত নরেন্দ্রকে অনেক আশ্বাস দিয়া ডাকিয়া আনিল। নরেন্দ্র মহেন্দ্রকে দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য হইল না, সে যেন তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কিন্তু মহেন্দ্র নরেন্দ্রকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—এমন পরিবর্তন সে আর কাহারও দেখে নাই। অনাবৃত দেহ, অল্পপরিসর জীর্ণ মলিন বস্ত্রে হাঁটু পর্যন্ত আচ্ছাদিত। মুখশ্রী অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে, চক্ষু জ্যোতিহীন, কেশপাশ অপরিচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল, সর্বদাই হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ণ এমন মলিন হইয়া গিয়াছে যে আশ্চর্য হইতে হয়—তাহাকে দেখিলেই কেমন এক প্রকার ঘৃণা ও সংকোচ উপস্থিত হয়। নরেন্দ্র অতি শান্তভাবে মহেন্দ্রকে তাঁহার নিজের ও তাঁহার সংক্রান্ত সমস্ত লোকের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কাজকর্ম কিরূপ চলিতেছে তাহাও খোঁজ লইলেন। মহেন্দ্র নরেন্দ্রের এই অতি শান্তভাব দেখিয়া অত্যন্ত অবাক হইয়া গিয়াছেন—মহেন্দ্রকে দেখিয়া নরেন্দ্র কিছুমাত্র লজ্জা বা সংকোচ বোধ করেন নাই।

মহেন্দ্র আর কিছু না বলিয়া নরেন্দ্রের চিঠিটি তাহার হস্তে দিল। সে অবিচলিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'হাঁ মশায়, সম্প্রতি অবস্থা মন্দ হওয়াতে কিছু দেনা হইয়াছে, তাই বড়ো জড়াইয়া পড়িয়াছি।'

মহেন্দ্র কহিলেন, 'তা, আপনার স্ত্রীর নিকট সাহায্য চাহিবার অর্থ কী। উপার্জনের ভার তো আপনার হাতে। আর, তিনি অর্থ পাইবেন কোথা।'

নির্লজ্জ নরেন্দ্র কহিল, 'সেকি কথা! আমি সন্ধান লইয়াছি, আজকাল সে খুব উপার্জন করিতেছে। দিনকতক স্বরূপবাবু তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, শুনিলাম আজকাল আর কোনো বাবুর আশ্রয়ে আছে।'

মহেন্দ্র ইচ্ছাপূর্বক কথাটার মন্দ অর্থ না লইয়া কিঞ্চিৎ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, 'আপনি জানেন তিনি আমার বাটীতেই আছেন।'

নরেন্দ্র কহিলেন, 'আপনারই বাটীতে? সে তো ভালোই।'

মহেন্দ্র কহিলেন, 'কিন্তু তাঁহার কাছে অর্থ থাকিবার তো কোনো সম্ভাবনা নাই।'

নরেন্দ্র কহিলেন, 'তা যদি হয়, তবে আমার চিঠির উত্তরে সে কথা লিখিয়া দিলেই হইত।'

মহেন্দ্র যেরূপ ভালো মানুষ, অধিক গোলযোগ করা তাঁহার কর্ম নয়। বকাবকি করিতে আরম্ভ করিলে তাহার আর অন্ত হইবে না জানিয়া মহেন্দ্র প্রস্তাব করিলেন—নরেন্দ্র যদি তাঁহার কু-অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করেন তবে তিনি তাঁহার সাহায্য করিবেন।

নরেন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল; কহিল, 'কু-অভ্যাস কী মশায়! নূতন কু-অভ্যাস তো আমার কিছুই হয় নাই, আমার যা অভ্যাস আছে সে তো আপনি সমস্ত জানেন।'

এই কথায় ভালোমানুষ মহেন্দ্র কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, সে তেমন ভালো উত্তর দিতে পারিল না। নরেন্দ্র পূর্বে এত কথা কহিতে জানিত না, বিশেষ মহেন্দ্রের কাছে কেমন একটু সংকোচ অনুভব করিত—সম্প্রতি দেখিতেছি সে ভারি কথা কাটাকাটি করিতে শিখিয়াছে। তাহার স্বভাব আশ্চর্য বদল হইয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র তাহার সহিত মীমাংসা করিয়া লইয়া তাহাকে টাকা দিলেন ও কহিলেন, ভবিষ্যতে নরেন্দ্র যেন তাঁহার স্ত্রীকে অন্যায় ভয় দেখাইয়া চিঠি না লেখেন। মহেন্দ্র সেই আর্দ্র বাষ্পময় ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন ও পথের মধ্যে একটা ডাক্তারখানা হইতে একশিশি কুইনাইন কিনিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। দ্বারের নিকট দাসীটি বসিয়াছিল, সে মহেন্দ্রকে দেখিয়া অতি মধুর দুই-তিনটি হাস্য ও কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও মনে-মনে ঠিক দিয়া রাখিল—সেই কটাক্ষের প্রভাবে, মলয়সমীরণে, চন্দ্রকিরণে মহেন্দ্র বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আজকাল রজনী ভারি গিন্নি হইয়াছে। এখন তাহার হাতে টাকাকড়ি আসে। পাড়ার অধিকাংশ বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া গৃহিণীরা রজনীর শাশুড়ির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শিঙ ভাঙিয়া রজনীর দলে মিশিয়াছেন। তাঁহারা ঘন্টাখানেক ধরিয়া রজনীর কাছে দেশের লোকের নিন্দা করিয়া, উঠিয়া যাইবার সময় হাই তুলিতে তুলিতে পুনশ্চ নিবেদনের মধ্যে আবশ্যকমত টাকাটা-শিকিটা ধার করিয়া লইতেন এবং রজনীর স্বামীর, রজনীর উচ্চবংশের ও চোখের জল মুছিতে মুছিতে রজনীর মৃত লক্ষ্মী-স্বভাবা মাতার প্রশংসা করিয়া শীঘ্র সে ধারগুলি শুধিতে না হয় এমন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। কিন্তু এই পিসি-মাসি শ্রেণীর মধ্যে করুণার দুর্নাম আর ঘুচিল না। ঘুচিবে কিরূপে বলো। মাসি যখন সন্তোষজনকরূপে ভূমিকাটি শেষ করিয়া রজনীর কাছে কাজের কথা পাড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে হয়তো করুণা কোথা হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া রজনীকে টানিয়া লইয়া বাগানে চলিল। মাঝে মাঝে তাঁহারা করুণার ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'তুমি কেমন-ধারা গা?' সে যে কেমন-ধারা করুণা তাহার কোনো হিসাব দিতে চেষ্টা করিত না। কোনো পিসির বিশেষ কথা, বিশেষ অঙ্গভঙ্গি বা বিশেষ মুখশ্রী দেখিলে এক-এক সময় তাহার এমন হাসি পাইত যে, সে সামলাইয়া উঠা দায় হইত, সে রজনীর গলা ধরিয়া মহা হাসির কল্লোল তুলিত—রজনীসুদ্ধ বিব্রত হইয়া উঠিত। তাহা ছাড়া রজনীর গিন্নিপনা দেখিয়া সে এক-এক সময়ে হাসিয়া আর বাঁচিত না।

কিছুদিন হইতে মহেন্দ্র দেখিতেছেন বাড়িটা যেন শান্ত হইয়াছে। করুণার আমোদ আহ্লাদ থামিয়াছে। কিন্তু সে শান্তি প্রার্থনীয় নহে—হাস্যময়ী বালিকা হাসিয়া খেলিয়া বাড়ির সর্বত্র যেন উৎসবময় করিয়া রাখিত—সে একদিনের জন্য নীরব হইলে বাড়িটা যেন শূন্য-শূন্য ঠেকিত, কী যেন অভাব বোধ হইত। কয়দিন হইতে করুণা এমন বিষণ্ণ হইয়া গিয়াছিল—সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কাঁদিত, কিছুতেই প্রবোধ মানিত না। করুণা যখন এইরূপ বিষণ্ণ হইয়া থাকে তখন রজনীর বড়ো কষ্ট হয়—সে বালিকার হাসি আহ্লাদ না দেখিতে পাইলে সমস্ত দিন তাহার কেমন কোনো কাজই হয় না।

নরেন্দ্রের বাড়ি যাইবে বলিয়া করুণা মহেন্দ্রকে ভারি ধরিয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্র বলিল, সে বাড়ি অনেক দূরে। করুণা বলিল, তা হোক। মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়ি বড়ো খারাপ। করুণা কহিল, তা হোক। মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়িতে থাকিবার জায়গা নাই। করুণা উত্তর দিল, তা হোক। সকল

আপত্তির বিরুদ্ধে এই 'তা হোক' শুনিয়া মহেন্দ্র ভাবিলেন, নরেন্দ্রকে একটি ভালো বাড়িতে আনাইবেন ও সেইখানে করুণাকে লইয়া যাইবেন। নরেন্দ্রের সন্ধানে চলিলেন।

বাড়িভাড়া দিবার সময় হইয়াছে বলিয়াই হউক বা মহেন্দ্র তাঁহার বাড়ির ঠিকানা জানিতে পারিয়াছে বলিয়াই হউক, নরেন্দ্র সে বাড়ি হইতে উঠিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্র তাঁহার বৃথা অন্বেষণ করিলেন, পাইলেন না।

এই বার্তা শুনিয়া অবধি করুণার আর হাসি নাই। বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ সময়ে সহসা এক-একটা কথা শুনিলে যেমন বুকে আঘাত লাগে, করুণার তেমনি আঘাত লাগিয়াছে। কেন, এতদিনেও কি করুণার সহিয়া যায় নাই। নরেন্দ্র করুণার উপর কত শত দুর্ব্যবহার করিয়াছে, আর আজ তাহার এক স্থানান্তর সংবাদ পাইয়াই কি তাহার এত লাগিল। কে জানে, করুণার বড়ো লাগিয়াছে। বোধ হয় ক্রমাগত জ্বালাতন হইয়া হইয়া তাহার হৃদয় কেমন জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ এই একটি সামান্য আঘাতেই ভাঙিয়া পড়িল। বোধ হয় এবার বেচারি করুণা বড়োই আশা করিয়াছিল যে বুঝি নরেন্দ্রের সহিত আবার দেখা-সাক্ষাৎ হইবে। তাহাতে নিরাশ হইয়া সে পৃথিবীর সমুদয় বিষয়ে নিরাশ হইয়াছে, হয়তো এই এক নিরাশা হইতেই তাহার বিশ্বাস হইয়াছে তাহার আর কিছুতেই সুখ হইবে না! করুণার মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল— যে ভাবনা করুণার মতো বালিকার মনে আসা প্রায় অসম্ভব, সেই মরণের ভাবনা তাহার মনে হইল। তাহার মনে হইল, এ সংসারে সে কেমন শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে আর পারিয়া ওঠে না, এখন তাহার মরণ হইলে বাঁচে। এখন আর অধিক লোকজন তাহার কাছে আসিলে তাহার কেমন কষ্ট হয়। সে মনে করে, 'আমাকে এইখানে একলা রাখিয়া দিক, আপনার মনে একলা পড়িয়া থাকিয়া মরি।' সে সকল লোকের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া উঠিতে আর পারে না। সে সকল বিষয়েই কেমন বিরক্ত উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। রজনী বেচারি কত কাঁদিয়া তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করিয়াছে, কিন্তু এই আহত লতাটি জন্মের মতো ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে— বর্ষার সলিলসেকে, বসন্তের বায়ুবীজনে, আর সে মাথা তুলিতে পারিবে না।

কিন্তু একি সংবাদ! মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধান আবার পাইয়াছে শুনিতেছি। মহেন্দ্র করুণা ও নরেন্দ্রের জন্য একটি ভালো বাড়ি ভাড়া করিয়াছে। নরেন্দ্র মহেন্দ্রের ব্যয়ে সে বাড়িতে বাস করিতে সহজেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু একবার মন ভাঙিয়া গেলে তাহাতে আর স্ফূর্তি হওয়া সহজ নহে— করুণা এই সংবাদ শুনিল, কিন্তু তাহার অবসন্ন মন আর তেমন জাগিয়া উঠিল না। করুণা মহেন্দ্রদের বাড়ি হইতে বিদায় হইল— যাইবার দিন রজনী করুণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কতই কাঁদিতে লাগিল। করুণা চলিয়া গেলে সে বাড়ি যেন কেমন শূন্য-শূন্য হইয়া গেল। সেই যে করুণা গেল, আর সে ফিরিল না। সে বাড়িতে সেই অবধি করুণার সেই সুমধুর হাসির ধ্বনি একদিনের জন্যও আর শুনা গেল না।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পীড়িত অবস্থায় করুণা নরেন্দ্রের নিকট আসিল। মহেন্দ্র প্রায় মাঝে মাঝে করুণাকে দেখিতে আসিতেন; করুণা কখনো খারাপ থাকিত, কখনো ভালো থাকিত। এমনি করিয়া দিন চলিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র করুণাকে মনে মনে ঘৃণা করিত, কেবল মহেন্দ্রের ভয়ে এখনো তাহার উপর কোনো অসদ্‌ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু নরেন্দ্র প্রায় বাড়িতে থাকিত না— দুই-এক দিন বাদে যে অবস্থায় বাড়িতে আসিত, তখন করুণার কাছে না আসিলেই ভালো হইত। তাহার

অবর্তমানে পীড়িতা করুণাকে দেখিবার কেহ লোক নাই। কেবল সেই দাসীটি মাঝে মাঝে আসিয়া বিরক্তির স্বরে কহিত, 'তোমার কি ব্যামো কিছুতেই সারবে না গা। কী যন্ত্রণা!'

নরেন্দ্রের উপর এই দাসীটির মহা আধিপত্য ছিল। নরেন্দ্র যখন মাঝে মাঝে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইত, তখন ইহার যত ঈর্ষা হইত, এত আর কাহারও নয়। এমন-কি, নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিলে তাহাকে মাঝে মাঝে ঝাঁটাইতে ত্রুটি করিত না। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর ইহার অভিমানই বা দেখে কে। করুণার উপরেও ইহার ভারি আক্রোশ ছিল, করুণাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া জ্বালাতন করিয়া মারিত। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের সহিত ইহার মহা মারামারি বাধিয়া যাইত— দুজনেই দুজনের উপর গালাগালি ও কিল চাপড় বর্ষণ করিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিত। কিন্তু এইরূপ জনশ্রুতি আছে, নরেন্দ্র তাহার বিপদের দিনে ইহার সাহায্যে দিনযাপন করিতেন।

নরেন্দ্রের ব্যবহার ক্রমেই স্ফূর্তি পাইতে লাগিল। যখন তখন আসিয়া মাতলামি করিত, সেই দাসীটির সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়া দিত। করুণা এই-সমস্ত দেখিতে পাইত, কিন্তু তাহার কেমন একপ্রকারের ভাব হইয়াছে—সে মনে করে যাহা হইতেছে হউক, যাহা যাইতেছে চলিয়া যাক! দাসীটা মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর রাগিয়া করুণার নিকট গর গর করিয়া মুখ নাড়িয়া যাইত; করুণা চুপ করিয়া থাকিত, কিছুই উত্তর দিত না। নরেন্দ্র আবশ্যকমত গৃহসজ্জা বিক্রয় করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাতেও কিছু হইল না—অর্থসাহায্য চাহিয়া মহেন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। করুণা বেচারি কোথায় একটু নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কোথায় সে মনে করিতেছে 'যে যাহা করে করুক—আমাকে একটু একেলা থাকিতে দিক', না, তাহাকে লইয়াই এই-সমস্ত হাঙ্গাম! সে কী করে, মাঝে মাঝে লিখিয়া দিত। কিন্তু বার বার এমন কী করিয়া লিখিবে। মহেন্দ্রের নিকট হইতে বার বার অর্থ চাহিতে তাহার কেমন কষ্ট হইত, তদ্ভিন্ন সে জানিত অর্থ পাইলেই নরেন্দ্র তাহা দুষ্কর্মে ব্যয় করিবে মাত্র।

একদিন সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র আসিয়া মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'পায়ে পড়ি, আমাকে আর চিঠি লিখিতে বলিয়ো না।'

সেই সময় সেই দাসীটি আসিয়া পড়িল, সেও নরেন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিল—কহিল, 'তুমি অমন একগুঁয়ে মেয়ে কেন গা! টাকা না থাকলে গিলবে কী।'

নরেন্দ্র ক্রুদ্ধভাবে কহিল, 'লিখিতেই হইবে।'

করুণা নরেন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'ক্ষমা করো, আমি লিখিতে পারিব না।'

'লিখিবি না? হতভাগিনী, লিখিবি না?'

ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া নরেন্দ্র করুণাকে প্রহার করিতে লাগিল। এমন সময় সহসা দ্বার খুলিয়া পণ্ডিতমহাশয় প্রবেশ করিলেন; তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া নরেন্দ্রকে ছাড়াইয়া দিলেন, দেখিলেন দুর্বল করুণা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

পূর্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিতমহাশয় নিধির টানাটানিতে গাড়িতে উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন কখনোই ভালো ছিল না। তিনি প্রায়ই মাঝে মাঝে মনে করিতেন, তাঁহার স্নেহভাগিনী করুণার দশা কী হইল! এইরূপ অনুতাপে যখন কষ্ট পাইতেছিলেন এমন সময়ে দৈবক্রমে মোহিনীর সহিত সত্য-সত্যই তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

তাহার নিকট করুণার সমস্ত সংবাদ পাইয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিলেন। প্রথমে মহেন্দ্রের কাছে গেলেন, সেখানে নরেন্দ্রের বাড়ির সন্ধান লইলেন—বাড়িতে আসিয়াই নরেন্দ্রের ঐ নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখিতে পাইলেন।

সেই মূর্ছার পর হইতে করুণার বার বার মূর্ছা হইতে লাগিল। পণ্ডিতমহাশয় মহা অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি যে কী করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এই সময়ে তিনি নিধির অভাব অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মহেন্দ্রকে ডাকিতে গেলেন। মহেন্দ্র ও রজনী উভয়েই আসিল। মহেন্দ্র যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। করুণা মাঝে মাঝে রজনীর হাত ধরিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে কথা কহিত; পণ্ডিতমহাশয় যখন অনুতপ্তহৃদয়ে করুণার নিকট আপনাকে ধিক্কার দিতেন, যখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, 'মা, আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়াছি', তখন করুণা অশ্রুপূর্ণনেত্রে অতি ধীরস্বরে তাঁহাকে বারণ করিত। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, 'নরেন্দ্রকে ডাকিয়া দিবে?' সে কহিত, 'কাজ নাই।'

সে জানিত নরেন্দ্র কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র।

আজ রাত্রে করুণার পীড়া বড়ো বাড়িয়াছে। শিয়রে বসিয়া রজনী কাঁদিতেছে। আর পণ্ডিতমহাশয় কিছুতেই ঘরের মধ্যে স্থির থাকিতে না পারিয়া বাহিরে গিয়া শিশুর ন্যায় অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতেছেন। নরেন্দ্র গৃহে নাই। আজ করুণা একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিল। নরেন্দ্র যখন গৃহে আসিলেন, তাঁহার চক্ষু লাল, মুখ ফুলিয়াছে, কেশ ও বস্ত্র বিশৃঙ্খল। হতবুদ্ধিপ্রায় নরেন্দ্রকে করুণার শয্যার পার্শ্বে সকলে বসাইয়া দিল। করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল, কিন্তু কিছু কহিল না।

আশ্বিন ১২৮৪—ভাদ্র ১২৮৫

প্রথম ছত্রের সূচী

উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত গান, কবিতা, শ্লোকের প্রথম ছত্র এই সূচীর অন্তর্গত

Rabindra-Rachanavali, Ashtam Khanda, Upanyasa: Collected Works of Rabindranath Tagore (1861-1941), Volume Eight, Novel, Government of West Bengal, Calcutta, 1986.

25 cm. × 16 cm.; pp. [8] + 568; 6 Illustrations.